ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২২শ বর্ষ

১৩৫৬

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

রামধনু কার্য্যালয়

১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫

বার্ষিক মূল্য ৪৲ প্রতি সংখ্যা।৵০ ষাণ্মাসিক ২।০

রামধনু

সূচীপত্র

২২শ বর্ষ (বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৫৬)

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
অতিথি (গল্প)	ডাঃ নলিনীমোহন সান্যাল, এম্. এ, পি-এইচ্.ডি	৪৫৬
অনর্থের মূল (গল্প)	শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী	৩৭৭
অনর্থের মূল ? (গল্প)	ব্রহ্মচারী মুকুন্দ	৫১৪
আত্মোন্নতি সমিতির গল্প (স্মৃতি-কথা)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম. এ., বি. এস্-সি	২০, ৮৩, ১৩৪, ১৮৭, ২৩৯, ৩৫৪, ৩৯৮, ৪৪৭, ৪৯৯, ৫৪২, ৫৮৬
আড়ি (কবিতা)	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	৩৭২
আমাদের সংবাদপত্র বিভাগ		৫৫, ১০৯, ১৬৯, ২১৩, ২৭০, ৩৩৫, ৩৭৯, ৪২৮, ৪৭৫, ৫২৪, ৫৭৮, ৬৩৩
আমার সেই ছোট্ট কালো গাধাটা (গল্প)	শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী	৮৭
আমি যখন ছোট ছিলাম (স্মৃতিকথা)	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৪৩৮
আমি যদি হ'তেম (কবিতা)	শ্রীসলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৪০
আয়াল'ও (প্রবন্ধ)	শ্রীঅনিলকুমার দাশগুপ্ত	২০১
উজানে (কবিতা)	অধ্যাপক শ্রীবিনায়ক সান্যাল, এম্. এ	৩৮৯
উল্টো বুঝলি রাম (গল্প)	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম. এ., বি. এল্	৪৮
একটা খুনের গল্প (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	২৮৪
একটি ছোট্ট কাহিনী	অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম. এ	৫৪৮
একটি দৈব দুর্ঘটনা (গল্প)	শ্রীকমলা দত্ত	৪৬৬
এক রাত্রির কাহিনী (গল্প)	শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার	১২৮
এত্তোটুকু ছেলে (কবিতা)	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	৪৭৭
এবারকার বিজ্ঞান-কংগ্রেস (প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৫১৬
কবি রঙ্গলাল (জীবন-কথা)	শ্রীসুনীল ঘোষ এম্. এ	৬৯
কালাহারির যাযাবর (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৪৬০
কালিদাসের বাবা (গল্প)	শ্রীগৌরী দেবী	২০৪
কিচ্ছু নষ্ট ক'র না (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৩৩
কিশোরগঞ্জের পাগ্‌লা হাতী (প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	১৫০
কেঁচোর চাষ (ঐ)	শ্রীঅরুণমোহন চক্রবর্ত্তী	৪৯৭

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
কোচবিহার (দেশবিদেশের কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৬১৪
খেলা (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক	৩১১
খেলাধূলা	শ্রীঅমলকুমার মিত্র	৪৫৭, ৫৯৩
খেলাধূলা	শ্রীসুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়	৫০২
খোকাখুকুর গল্প (কবিতা)	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	৫৮১
খোকাবাবু (কবিতা)	শ্রীনগেন্দ্রকিশোর নান্যসী, বি. এ	২২৮
গল্প না—সত্যি ! (প্রবন্ধ)	ক্যাপ্‌টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এস্-সি., এম্. বি	৫৫০
গাছপালার অসুখ (বিজ্ঞান)	শ্রীগজেন্দ্রকুমার দত্ত, বি. এস্-সি (কৃষি)	৫৮৮
গ্রীষ্ম (কবিতা)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	৯৯
ঘুম যেদিন ভাঙলো (গল্প)	শ্রীশামুক	২৩৫
চন্দননগর (দেশবিদেশের কথা)	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ., বি. এল্	৫১১
চিঠিপত্র		৬২, ১১৭, ১৬০, ২২০, ২৬৮, ৩৩৭, ৩৮১, ৪২৯, ৪৭৩, ৫২২, ৫৭১, ৬২৭
চিত্রপরিচয়		৩৩৮, ৬৩৬
ছবির ভূত (গল্প)	শ্রীকল্যাণী দেবী, বি. এ	৩১২
ছেলেটা (গল্প)	শ্রীনারায়ণ দত্ত	৪১০
ছেলেধরা (গল্প)	শ্রীশামুক	৩৬৫
ছেলেবেলাকার ভয় (প্রবন্ধ)	শ্রীঅমলশঙ্কর রায়	৩৯১
ছোট্ট কবিতা (কবিতা)	শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু	৩১৪
জন্মদিন (প্রবন্ধ)	ক্যাপ্‌টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এস্-সি, এম. বি	১৯৪
জ্যাঠা (গল্প)	শ্রীসুবোধ বসু	২৯০
জ্যোতিষী (গল্প)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৫৫২
টাকার ম্যাজিক	যাদুকর মিঃ গসেন	৩৬৯
টেলিভিশন (বিজ্ঞান)	শ্রীপুষ্পেন্দু মুখোপাধ্যায়	৩১৫
ঢেউ (কবিতা)	শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায় চৌধুরী	৪২০
তরু বালক (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৭১
তাজ্জব (চিত্র)	... ...	৩৬০
তিনটি প্রশ্ন (গল্প)	শ্রীশান্তা দেবী	৫২
তেতলা বাড়ীর ছেলে (গল্প)	শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী	১৪৬
তোমাদের স্মরণ করি (চিত্র)	... ...	৫০৭, ৫৫৭
দলের লোকদের বলো (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৬০২
দানবীর (গল্প)	শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্. এ.	২৯৫

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
দুপুর (নক্সা)	... শ্রীদেবকুমার বসু	... ৫৬১
ধন্বন্তরী (গল্প)	... শ্রীঅরবিন্দ গুহ	... ৯৬
ধরা-ছোঁয়ার বাইরে (প্রবন্ধ)	... শ্রীহিরণকুমার গুপ্ত, বি. এস্-সি	... ২৩২
ধাঁধা ও ধাঁধার উত্তর		৬৪, ৬৫, ১১৮, ১৭০, ২২২, ২৭৩, ৩৩৯, ৩৮৮, ৪৩৬, ৪৮৪, ৫৩২, ৫৮০, ৬৩৫
নতুন বই	... ...	২২২, ২৫৫
নানা প্রসঙ্গ	... শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	... ১০৪
নিঃশব্দ যে শব্দ (বিজ্ঞান)	... শ্রীদিলীপ ঘোষ, বি. এস্-সি	... ৫৪৫
পথের ডাক (গল্প)	... শ্রীকমলা দত্ত	... ২৪৬
পথের সাথী (নক্সা)	... শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল	... ৪৪২
পরলোকে শরৎচন্দ্র (জীবন-কথা)	... ...	... ৬২৫
পাখীদের শিক্ষা (কবিতা)	... শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	... ৪৩৭
পাঁচ মিশেলী		৪১, ১০০, ১৫৪, ২০৭, ২৫৭, ৩৩০, ৩৭৩, ৪২১, ৪৭০, ৫১৯, ৫৬৪, ৬১৯
পানিহাটি (দেশবিদেশের কথা)	... শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়	... ১৪১
পুণ্যবান্ (কবিতা)	... শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	... ৪৬৫
পুতুল (প্রবন্ধ)	... শ্রীবরেন ঘোষাল	... ৪০২
পুরস্কার-প্রতিযোগিতা ও ফলাফল	...	১১৫, ৩৪০, ৪২৭, ৫৭২, ৬৩৫
পোর্ট ক্যানিং (দেশবিদেশের কথা)	শ্রীগৌরী দেবী	... ৪৫
প্রণাম (কবিতা)	... শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	... ৫৩৩
প্রিয়ঙ্গু (ধারাবাহিক উপন্যাস)	... শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪৫৩, ৪৯৫, ৫৩৯, ৫৮২
বনান্তরাল (চিত্র)	... শ্রীসুকুমার দে সরকার	... ৩৪৯
বন্ধুর চিঠি (কবিতা)	... বন্দে আলী	... ৩০৯
বরেন বাবুর বিপদ্ (গল্প)	... শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ., বি. এল্	... ৬০৭
বলো তো কিসের ছবি? (চিত্র)	...	... ৬১৩
বর্ষা (কবিতা)	... শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	... ১৯৩
বার্নার্ড শ'র জন্মদিনে	... শ্রীঅমলকুমার মিত্র	... ২৪৪
বাংলা মায়ের পাগল ছেলে (জীবন-কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	... ৩২৪
বাংলার শিশু (কবিতা)	... শ্রীবেণুগঙ্গোপাধ্যায়, এম্. এ, বিদ্যাবিনোদ	... ৪২০
বিচার (গল্প)	... শ্রীগৌরী দেবী	... ৪২৫
বিচিত্র জগৎ (চিত্র)	...	... ৪৫১
বিদেহী আত্মা (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	২৯, ৭৬, ১৩৮, ১৮৯, ২২৯, ৩৪২, ৩৯৪
বিশু আর ঠাকুমা (প্রবন্ধ)	ক্যাপ্টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এস্-সি, এম্. বি	... ৫৯৫

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
বিশ্বাস কর আর নাই কর	... শ্রীঅমলকুমার মিত্র	... ৩৩২
বুড়া মিঞা (কবিতা)	... ৺অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	... ৫৪৯
ব্যাগ্-রহস্য (গল্প)	... শ্রীতপনকুমার চক্রবর্ত্তী	... ১৯৭
ভগবান্ (কবিতা)	... শ্রীসুধীররঞ্জন ঘোষ, এম্. এ, বি. এল	... ৪০
ভয় (গল্প)	... শ্রীশামুক	... ১৫
ভাদ্র (কবিতা)	... শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্. এ	... ২৭২
ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক		১১৬, ১৬২, ২১২, ২৬১, ৩৩৩, ৩৭৮, ৪৪৩, ৪৮৩, ৫৫৯, ৬২৩
ভ্যাম্পায়ার (সচিত্র প্রবন্ধ)	... শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	... ৩১৯
মণিমঞ্জুষা	... ...	... ৫৯৮
মণ্টুর চৈতন্য (সচিত্র প্রবন্ধ)	ক্যাপ্টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এস্-সি. এম্. বি	... ৯০
মণ্টুর মনস্তাপ (ঐ)	ঐ	... ৯
মলিয়েরের অভিনয়	অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ	... ৩৯৭
মাটি ছাড়া চাষ (বিজ্ঞান)	... শ্রীঅরুণমোহন চক্রবর্ত্তী	... ৪০৫
মাতৃপূজা (কবিতা)	... শ্রীবিশ্বেশ্বর ভটাচার্য্য	... ৩০৮
মিথ্যে হবার নয় (গল্প)	শ্রীঅরবিন্দ গুহ	... ৩৫৫
মুনির খেয়াল (গল্প)	... শ্রীগৌরী দেবী	... ১৫৭
মেঘ-পরী (কবিতা)	... শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্. এ	... ১৩৩
ম্যাজিকের কথা	... যাদুকর মিঃ গসেন	... ২১০
যাঁদের মৃত্যু নেই (জীবন-কথা)	... রঞ্জিত ভাই	... ৪৯২
যে রসে রস নেই (প্রবন্ধ)	... শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্-সি	... ২৪২
রক্ত-কাহিনী (বিজ্ঞান)	অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এস্-সি, এম্. বি	... ৯৪
রক্তের কথা (ঐ)	ঐ	... ৪০৭
রাজার সাজা (গল্প)	... শ্রীগৌরী দেবী	... ২৫৩
রাধামাধবের চাকরী-জীবনের দু'টি দিন (গল্প)	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	... ৫৩৪
রামধনু (কবিতা)	... শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	... ৩৪১
রামধনু (প্রবন্ধ)	ক্যাপটেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এস্-সি, এম্. বি.	... ৩৫৭
রূপকী নদীর জল (কবিতা)	... শ্রীঅচিন্ত্য মিত্র	... ৩৮
রুণু-টুনুর এডভেঞ্চার (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৫৭, ১১১, ১৬৪, ২১৫, ২৬৩, ৩৮৩, ৪৩১, ৪৭৮, ৫২৬, ৫৭৩, ৬২৯
রূপকথার রাজ্য (কবিতা)	... শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	... ২২৩
লেনিনের ঋণ	... অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ	... ৩৬৮
শরতের গান (কবিতা)	... শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	... ২৭৫

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)		লেখক	পৃষ্ঠা
শরৎ (কবিতা)	...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	... ২৩৮
শরৎ-প্রসঙ্গ (জীবন-কথা)	...	শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়	... ৩০১
শান্তিনিকেতনে কয়েকটা দিন	...	শ্রীমনীষা দাশগুপ্ত	... ৪১৬
শিশুসাহিত্য-সংবাদ	...	...	১৫৯, ৩৬৩, ৫৬৮
শিশুসাহিত্যিক নলিনীভূষণ (জীবনী)		...	... ৫০৫
সন্তোষ (কবিতা)	...	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	... ১১৯
সন্দেশ	...		৬৪, ১১৬, ১৬৩, ২৭২, ৩৮৭, ৫৬৯
সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর	...		৬৫, ২৭৪, ৩৮৮, ৪৩৬, ৫৮০
সাবধানের মার নেই (প্রবন্ধ)	...	অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ	... ২৮০
সাঁওতালিয়া গৎ (কবিতা)	...	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	... ১
সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালেস্ (ইতিহাসের গল্প)		শ্রীহিরণকুমার গুপ্ত	... ৩৬১
সিংহশিশু ও পারাবত-শাবক (গল্প)		শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	... ১৭৯
সুইডেনে কয়েকদিন (দেশবিদেশের কথা)		শ্রীরবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী, এম্. এ. বি. এল.	৫, ৭২, ১২৪, ১৭৬, ২৫০
সুইডেনের স্মৃতি (ঐ)	...	ঐ	... ৩৪৫
সূত্র (গল্প)	...	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	... ৪৮৭
সে রূপকথার দেশ (কবিতা)	...	শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত	... ৪৮৫
স্মরণে (কবিতা)	...	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়	৫১০
হারিয়ে যাবো (কবিতা)	...	শ্রীশ্যামল দত্ত	১৯
হাসি চোর (কবিতা)	...	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৭
হিরোসিমার শেষ পর্য্যায় (প্রবন্ধ)		অধ্যাপক ডাঃ দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ডি. এস্-সি	১৮৪
হে বীর, প্রণাম করি (ঐতিহাসিক উপন্যাস)		শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	২৪, ৭৯, ১২০, ১৭৩, ২২৫, ২৭৭
হৈমন্তী (কবিতা)	...	শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী	৩৭১
হোঁৎকা বাবু (কবিতা)	...	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্. এ, বি. টি	৬২২

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৪৲, যাণ্মাসিক ২।০ ; প্রতি সংখ্যা ।৵০ ; ভি. পি. চার্জ্জ
বৈশাখ মাস হইতে রামধনুর বৎসর গণনা করা হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ ঐ মাসের ২০
মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। রামধনু মাসের প্রথম
প্রকাশিত হয়

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে
অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না বা সে সম্বন্ধে মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্ব
রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন ও সঙ্গে ডাকটিকেট পাঠাইবেন না।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন। গ্রাহক ন
না থাকিলে কোন কিছুরই ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। প্রতি মাসে মোড়কের ঠিকানার উপর গ্রাহক নং লেখা

৫। ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র যিনি
তিনিই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

৬। বিজ্ঞাপনের হারের জন্য কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র দিবেন।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫
ফোন নং সাউথ ১২৬
শাখা কার্য্যালয় ঃ ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

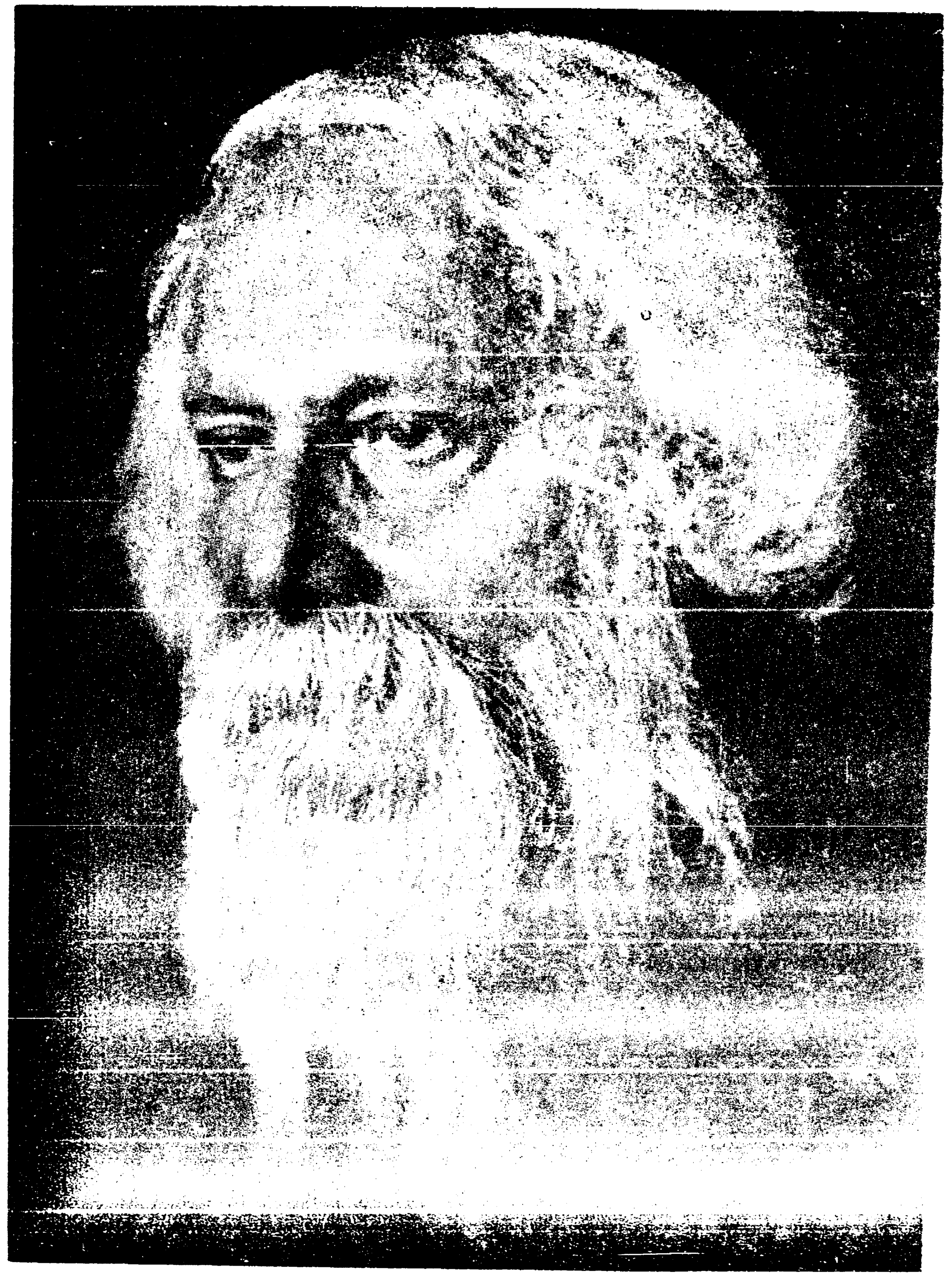

—রবীন্দ্রনাথ—

"উদয় দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে,
মোর চিত্তমাঝে
চিরনূতনেরে দিল ডাক—
পঁচিশে বৈশাখ।"

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২২শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৫৬ { ১ম সংখ্যা

সাঁওতালিয়া গৎ

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

বনের মাঝে মস্ত পাহাড়, পাশ দিয়ে তার পথ রে—
পাশ দিয়ে তার পথ,
তারই ধারে মংলা বাজায় সাঁওতালিয়া গৎ রে—
সাঁওতালিয়া গৎ।
চৈতী-বেলা ঝিমিয়ে আসে,
হাই তুলে যায় ধীর বাতাসে,
লাল-পলাশের রঙীন নিশান্ ঐ ওড়ে পৎ পৎ রে—
ঐ ওড়ে পৎ পৎ;
তারই তলে মংলা বাজায় জংলা সুরের গৎ রে—
জংলা সুরের গৎ।

সাঁওতালদের ছোট্ট ছেলে, পাহাড়-তলে বাস রে—
পাহাড়-তলে বাস,
দেখতে পাবি রোজই তাকে সেথায় যদি যাস রে—
সেথায় যদি যাস্।

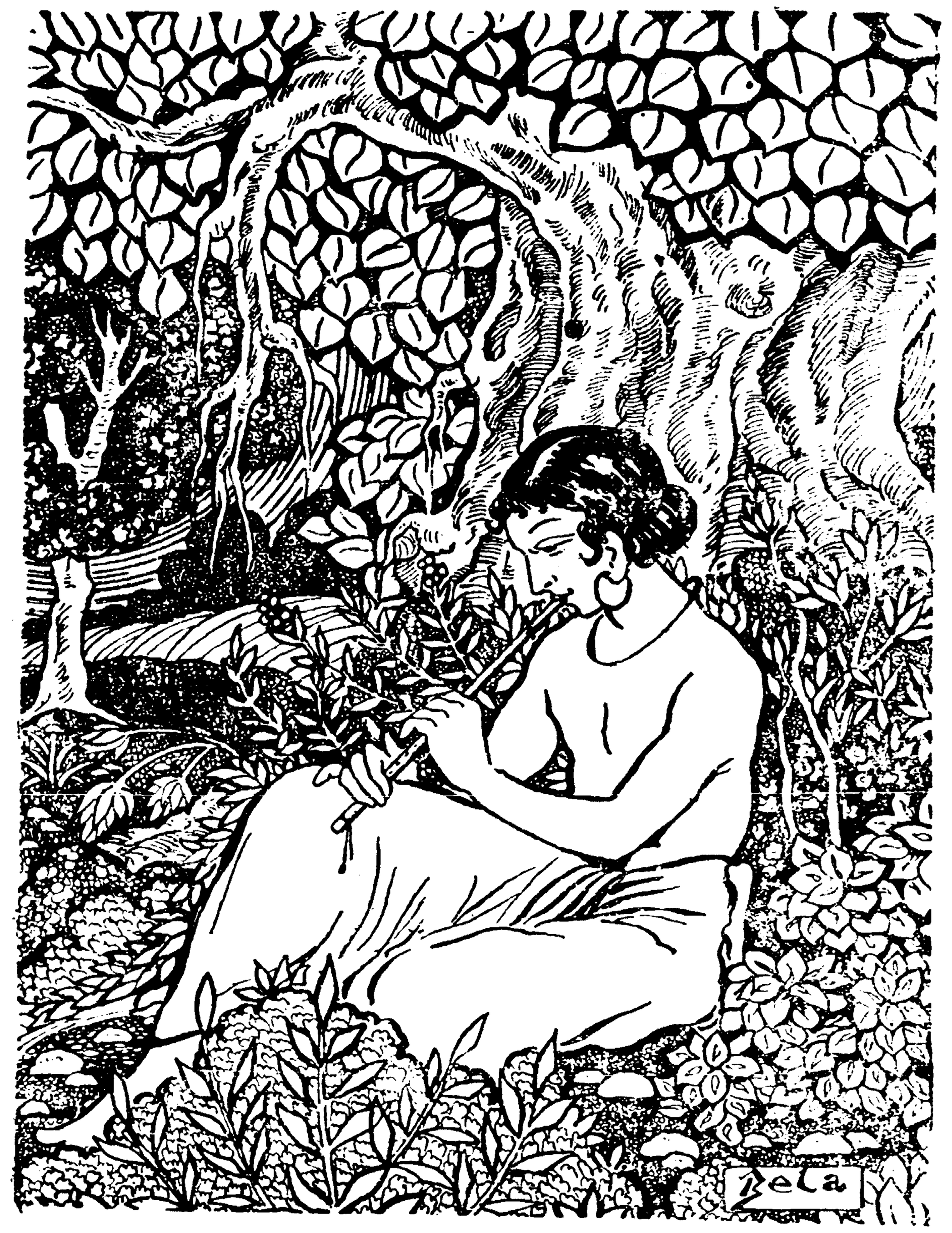

পাহাড়-ধারে নিত্য আসি'
সন্ধ্যা বেলায় বাজায় বাঁশী,
নান্‌কু-ভায়া সঙ্গে করে মাদলে সঙ্গত্ রে—
মাদলে সঙ্গত্;
তারই সাথে মংলা বাজায় জংলা সুরের গৎ রে—
জংলা সুরের গৎ।

বাঁশী বাজে 'তুতুর্‌-তু-আ' বনের নিরালায় রে—
বনের নিরালায়,
'দিপির্‌-দিপাং' মাদল বাজে, শুনবি যদি আয় রে—
শুনবি যদি আয়।
বন-নিরালা পাহাড়-তলে
সূর্য তখন পড়ছে ঢলে,
অস্ত-আলোয় রঙীন হোলো মস্ত সে পর্বত্ রে—
মস্ত সে পর্বত;
বনের কোণায় মনের সুখে মংলা বাজায় গৎ রে—
মংলা বাজায় গৎ।

সে সুর শোনে বনের পাখী, বনের পশুর দল রে—
বনের পশুর দল,
সে সুরখানি কাঁপিয়ে তোলে নির্জন জঙ্গল রে—
নির্জন জঙ্গল।
পাহাড়-তলীর পথটি ধরে
চল্‌তে দূরে গো-যান চড়ে'
সে সুর হঠাৎ আমার কানে লাগ্‌লো মধুবৎ রে—
লাগ্‌লো মধুবৎ;
আপন-ভোলা মংলা বাজায় জংলা সুরের গৎ রে—
জংলা সুরের গৎ।

থাম্‌লো আমার গরুর গাড়ী চৈতালী সন্ধ্যায় রে—
চৈতালী সন্ধ্যায়,
সাঁওতালদের বস্তি হেরি পাহাড়ী বন-গাঁয় রে—
পাহাড়ী বন-গাঁয়;
জল চাইতে তাদের ডেকে,
আন্‌লো ছুটে ঘরের থেকে
ঝক্‌ঝকে এক লোটায় ভরা গুড়-গোলা সরবৎ রে—
গুড়-গোলা সরবৎ;

আবার তারা ধরলো দু'জন মাদল-বাঁশীর গৎ রে—
মাদল-বাঁশীর গৎ।

চল্‌ল আমার গরুর গাড়ী আবার গ্রামান্তর রে—
আবার গ্রামান্তর,
পার হয়ে যাই একান্তে আজ জঙ্গল-প্রান্তর রে—
জঙ্গল-প্রান্তর।
মিলিয়ে গেল দিনের আলো,
নাম্‌লো আঁধার ঝাপ্‌সা-কালো,
হারিয়ে গেল অন্ধকারে পাহাড় সুবৃহৎ রে—
পাহাড় সুবৃহৎ;
অনেক দূরে বাজ্‌ছে শুনি সাঁওতালিয়া গৎ রে—
সাঁওতালিয়া গৎ।

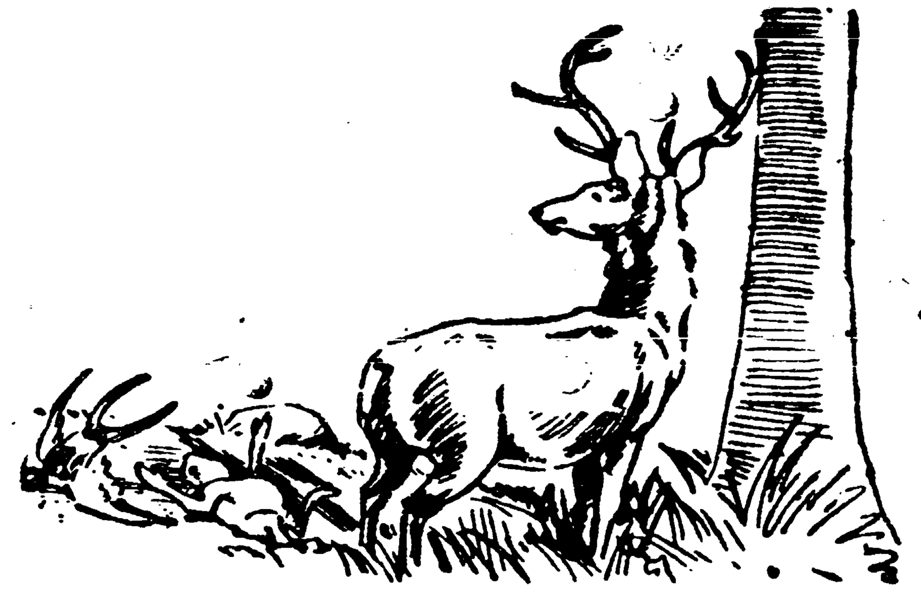

সুইডেনে কয়েক দিন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী, এম্‌. এ, বি. এল্‌

বিলেতে এলাম, তখন মহাযুদ্ধের শেষ দিক্‌। গোটা পৃথিবীর অবস্থা—যাকে সাধু ভাষায় বলে "আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি"—তা একেবারে অন্ধকারে ঢাকা, আর তার সঙ্গে ভারতেরও ভবিষ্যৎ। এ দেশে আসি শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধির আশায়। আর, এতদিন এ দেশের নানা দোষ-ত্রুটি আলোচনা করেই ভাবতাম তাইতেই বুঝি আমার নিজের দেশকে বড় করা হচ্ছে—ওটা বুঝি দেশাত্মবোধের অঙ্গ। এখন বেশ বুঝতে পারছি, এতে করেছি নিজের মনকে আরও নীচু। স্বাধীন জগতে সমান আসন পেয়েছি আমরা—আমাদের এখন আলোচনা-সমালোচনার দিন গিয়েছে—পৃথিবীর যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর, আহরণ করে সাজাতে হবে আমাদের দেশ। এই মনের পরিবর্ত্তন এসেছে অনেকের মধ্যে। লক্ষ্য করি নি এতদিন, কিন্তু হঠাৎ অনুভব করলাম নিজের মনের পরিবর্ত্তন—যখন এল সুইডেন থেকে এক নিমন্ত্রণ। হাসেলবি ভিলাষ্টাডে 'আন্তর্জ্জাতিক তরুণ-তরুণী শান্তি-শিবির" বসছে; সেক্রেটারী শ্রীকাল গার্ণার ক্রুটসন্‌ তা'তে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার উপায় ছিল না।

বেরিয়ে পড়লাম সুইডেনের উদ্দেশে। বেশ সুন্দর শ্রীমণ্ডিত বাড়ী দেখে যেমন মনে তৃপ্তি হয় তেমনি মনের ভাব নিয়ে দেশ দেখে ফিরলাম। তাদের যা কিছু সুন্দর, তাদের মধ্যে যা শেখার জিনিষ সেগুলিই দেখেছি বড় করে, এবং সেগুলিই লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করব। এতে হয়তো অনেক মামুলি

সামান্য জিনিষেরও বর্ণনা থাকবে, কিন্তু আমার বিশ্বাস সেগুলিও নিতান্ত অবান্তর নয়।

২৮শে জুন, ১৯৪৮—যাত্রা করলাম সুইডিস লয়েড কোম্পানীর জাহাজে। ইংল্যাণ্ডে দেখি ঘোলাটে আকাশ। অনেক দিন পর সমুদ্রের ওপর আকাশে রংএর খেলা দেখে মনে পড়ছিল আমাদের দেশের কথা। সমুদ্রের ওপর শান্ত সূর্য্যাস্ত মনে সুন্দর প্রশান্ত ভাব এনে দিল।

৩০শে জুন সকাল—সুইডেনের পশ্চিম তীরের বন্দর গোটেনবার্গে পৌছলাম। মেঘে ঢাকা মন ভার-করা সকাল। সঙ্গে ছিলেন পরিচিত সুইডিস্ ভদ্রমহিলা মিস্ মারগিট হালাণ্ডার। তিনি আশ্বাস দিলেন—এ মেঘ অস্থায়ী। দেখলাম সত্যি তাঁর কথা। কুড়ি দিন সুইডেন বাসের মধ্যে পেয়েছিলাম মাত্র একদিন বৃষ্টি, আর অন্য দিনগুলি ছিল রোদ্দুরে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে।

ম্যালার্ হ্রদের ওপর সূর্য্যাস্ত

জাহাজেই পাস্‌পোর্ট পরীক্ষা হ'ল, আর সেই সঙ্গে পেলাম রেষ্টুরাঁয় খাবার 'কুপন'। সুইডেনে খাদ্যসামগ্রী, দুধ, মাখন পাওয়া যায় প্রচুর, তবুও, সাধারণ লোকেরা যাতে সমস্ত জিনিষ ভালো ভাবে পায় তার জন্য, র‍্যাশনের ব্যবস্থা। রেষ্টুরাঁতে খেতে লাগে কুপন—মাংস, মাখন, দুধ আর রুটির। সাধারণ (বাড়ীর) দৈনিক র‍্যাশনিং-এর অংশও বদলিয়ে পাওয়া যায় দোকানে খাওয়ার কুপন। কুড়ি দিনের অভিজ্ঞতায় দেখলাম এখানে র‍্যাশনিং বেশ সুশৃঙ্খলায় চলছে। সুইডেনের সুনাম শুনেছিলাম ইংল্যাণ্ডেই—যে ওখানে ব্ল্যাক্ মার্কেটের আধিপত্য নেই।

কথাটা মিথ্যা নয়। র‍্যাশনিংএ লোকেদের একটু অসুবিধা হ'লেও তারা জানে তাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা। তাই তারা হাসিমুখে সহ্য করে দেশের জন্যে সামান্য অসুবিধাগুলি। অবশ্য এটি যে সম্ভব হয়েছে তার কারণ—এখানে প্রায় সকলেই উপার্জ্জন করে, খবরের কাগজ পড়ার প্রচলন খুব বেশী, আর সকলেই জানে লিখ্‌তে পড়তে। আর সব চেয়ে বড় কথা—এখানে লোকের সংখ্যা অনুযায়ী খাদ্যসংস্থান রয়েছে।

গোটেনবার্গের 'কাষ্টাম্‌স্' পেরিয়ে উঠ্‌লাম ট্রেনে। সেখান থেকে এলাম সেন্ট্রাল ষ্টেশনে। ষ্টেশনটি সুন্দর, খুব পরিষ্কার আর বড় হলুটি ফুলের গাছে সাজানো। ষ্টকহোল্‌ম অভিমুখে রওনা হ'লাম ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনে। সুইডেন নদী, জলপ্রপাত আর হ্রদে ভরা। পাইন ও বার্চ বনে ঢাকা উঁচু-নীচু পাহাড়ে জমি এখানকার, আর মধ্যে মধ্যে শস্যশ্যামলা সবুজ মাঠ। এই গ্রীষ্মের সময়ে—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সুইডেনের অপূর্ব্ব!

সুইডেন কৃষিকাজে খুব উন্নত। দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী শস্য উৎপাদন যথেষ্ট। শিল্পের দিক্ দিয়েও এ দেশ নগণ্য নয়। দেশের আছে লোহা ও আরও মহামূল্য ধাতু। নেই এখানে কয়লা, কিন্তু তার অভাব পূরণ করেছে নদী ও জলপ্রপাতের সাহায্যে 'ইলেক্‌ট্রিসিটি' আর কাঠকয়লা। এ দেশে আবার বিভিন্ন শিল্প-কাজ অনুপাতে লোকের সংখ্যা খুবই কম। দেশের আয়তন বেশ বড় কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র প্রতি বর্গ মাইলে তেতাল্লিশ জন। কিন্তু তা'তে অসুবিধা হয় নি। লোকের অভাব পূরণ করা হয়েছে নানান্ যন্ত্রপাতি ও কলকারখানার সাহায্য নিয়ে। অবশ্য বেশীর ভাগ কলকারখানা চলে ইলেক্‌ট্রিসিটিতে। সুইডিস্ 'হাই গ্রেড ষ্টীল', কাগজ আর দেশলাই পৃথিবী-বিখ্যাত। সুইডেনে, আগেই বলেছি, পাইন ও নানান্ গাছের বন আছে এবং সেই কারণেই এখানে 'প্লাস্টিক্' শিল্পও বেড়ে চলেছে খুব দ্রুতগতিতে। এ ছাড়া আছে এদের জাহাজ, সাইকেল, ট্রেন তৈরী। কৃষি-কাজের ছোটখাট যন্ত্রপাতিও প্রচুর তৈরী হয় এ দেশে।

ইউরোপের ট্রেন বেশীর ভাগ 'করিডোর ট্রেন'। কলকাতা থেকে বোম্বাই আসার 'ব্লু' ট্রেনে যারা চড়েছ তারা বুঝতে পারবে। কিন্তু যাত্রীদের সুবিধার জন্য সুইডিস্ ট্রেনে সুন্দর ব্যবস্থা। গাড়ীর শ্রেণী নির্বিশেষে প্রত্যেক কামরায় ভালো গদি লাগানো বসার জায়গা। আর লক্ষ্য করবার জিনিষ—প্রত্যেক

কামরায় আছে খাবার জলের পাত্র, কাগজের গেলাস, কাগজের গেলাস ইত্যাদি ফেলার জন্য ময়লা ফেলার টুক্‌রি। নিজে পরিষ্কার থাকা এবং যে জিনিষ অন্যে ব্যবহার করবে তাকে পরিষ্কার রাখা এদের অত্যন্ত সাধারণ অভ্যাস। গাড়ীর স্নানের ঘরে একটা নিবেদন পড়ে খুব ভালো লাগ্‌ল। তার ভাবার্থ হ'ল—"ঘরটা ব্যবহারের পর এমন ভাবে রেখো যেমন তুমি চাও অন্যে তোমার জন্যে রাখবে।" প্রত্যেক ষ্টেশন আসার আগে গাড়ীর টিকেট-চেকার গাড়ীতে গাড়ীতে এসে ষ্টেশনের নাম জানিয়ে যায়। প্রত্যেক গাড়ীতে আছে 'রেষ্টুরাঁ' আর চা, কফি খাবার গাড়ী। খাবার জন্য ওয়েটার সময় মত জানিয়ে যায় খাবার সময়। রেল কোম্পানী গবর্ণমেন্টের, তাই সাধারণ লোকের সুখ-সুবিধার ওপর এদের এত নজর।

জাহাজে ছিলেন আমার সঙ্গে ইংরেজি-জানা সুইডিস্ মহিলা। তিনি গোটেনবার্গ থেকেই হ'লেন অন্য পথযাত্রী। ট্রেনে উঠে পথের দু'ধারের সুন্দর দৃশ্য দেখ্‌তে ভালো লাগছিল বেশ। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়েছিল, হয়ত এই দীর্ঘ নয় ঘণ্টার ট্রেন-পথ আমায় মৌনী হয়েই থাকতে হয় বা। দেখলাম, আমার সহযাত্রীরা ইংল্যাণ্ডের ট্রেনের সহযাত্রীদের মত নয়। অনেকেই এলেন নিজে থেকে আলাপ করতে। মনে রাখার মত আলাপ হ'ল অনেকগুলি সুইডিস্ যুবক এবং একজন ফিন্‌ল্যাণ্ডবাসীর সঙ্গে। এঁরা অল্প কথাবার্ত্তার পরেই সহজ ভাবে বন্ধুর মত ব্যবহার করলেন। এ-দেশী লোকের মধ্যে আছে শান্ত, ধীর ভাব। সাধারণ ইংরেজের মত এরা জাহির করে না যে এরা সবজান্তা। এরা গল্প করে সমান বন্ধুর মত। জান্‌তে চায় বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে নানান্ কথা। এঁদের সঙ্গে আলাপ করে তাই খুব আনন্দ পেলাম। আবার দেখে আশ্চর্য্য হলাম এঁদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মাজীর ভক্ত, আর অনেকেই চেনেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে। ফিন্‌ল্যাণ্ডের ভদ্রলোকটি গল্প করলেন তাঁর দেশের কথা, রাশিয়ার আক্রমণের কথা, ফিন্‌ল্যাণ্ডের বীরদের কথা, আর তাঁর বাড়ীর কথা। নিজে বিদ্বান্ ও লেখক, এবং ছয়টি বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বেশ দখল আছে। অথচ আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতই অমায়িক।

সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলাম ষ্টকহোল্মে। পথে নেমে গিয়েছেন আমাদের সহযাত্রীরা। ষ্টকহোল্মএ নেমে প্রথম ভোগ করলাম ভাষা-বিভ্রাটের অসুবিধা।

চারিদিকে রোমান্ অক্ষরে (অর্থাৎ ইংরাজী হরপে) নানা বিজ্ঞাপন, নিবেদন নির্দ্দেশন লেখা—পড়তে পারি সব অথচ বুঝ্‌তে পারি না তার এক বিন্দুও। —সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা। লণ্ডনে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম হাসেল্‌বি ভিলাষ্টাড ষ্টকহোল্মের সহরতলী এবং লোকাল্ ট্রেনে যেতে হয় সহর থেকে। বুকিং অফিস্ খুঁজতে লণ্ডনের শিক্ষায় গেলাম পুলিশের কাছে। দেখি সে আমার কথা বোঝে না। কিন্তু আমার এই অসুবিধা ভোগ মাত্র ১০।১৫ মিনিট। ইংরেজি-জানা সুইডিস্ ভদ্রলোকেরা এগিয়ে এলেন আমাকে সাহায্য করতে। অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তুচ্ছ, তবু মনে এর ছাপ থেকে গিয়েছে।

হাসেলবির ট্রেনে দেখা হ'ল রুটসনের সঙ্গে। নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। সেই ট্রেনেই আসছিল একদল সুইস, ফরাসী, ড্যানিস ও ডাচ্ ছেলেমেয়ে। তাঁদের সঙ্গেও আলাপ হ'ল।

শিবিরে এসে পৌঁছলাম; ঘড়ি হিসাবে রাত তখন, অথচ তখনও দিনের আলো। ম্যালার্ন্ হ্রদের ধারে পাইন বনের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে হয়েছে শিবির। প্রাকৃতিক আবেষ্টনের শান্ত গাম্ভীর্য্য সুন্দর। এইখানেই আপাততঃ দিন কুড়ি কাটাতে হবে। সে অভিজ্ঞতার কথা আর একদিন বল্‌ব।

মণ্টুর মনস্তাপ

ক্যাপ্‌টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এস্-সি, এম্. বি

বিপক্ষ দলের ঘন ঘন হাততালি ও চীৎকারের মধ্যে মণ্টু মাথা নীচু করে ব্যাট হাতে ফিরে এলো। প্রথম বলেই সে আউট হয়েছে। গত বছর পর্য্যন্ত মণ্টুই তাদের দলের সেরা খেলোয়াড় ছিল। প্রত্যেক ম্যাচে তারই ওপর ভরসা করত সবাই। কিন্তু এবার পর পর প্রত্যেকটি খেলায় প্রায় এই রকম হচ্ছে। কিন্তু কেন?

মণ্টু নিশ্চয়ই বল্‌টা দেখতে পায় নি। যদি পেত তা হ'লে এ দশা হ'ত না। দেখতে না পাওয়ার মধ্যেও আবার দু'টো কারণ হ'তে পারে। প্রথম,—হয় তার

দৃষ্টিশক্তি গত বছরের তুলনায় বেশ কিছু কমে গেছে; অথবা ঠিক সেই মুহূর্তে সে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।

যদি আমরা ধরি যে মণ্টুর দৃষ্টিশক্তিই কমে গেছে আগের চেয়ে, তখন ভাবতে হবে এই এক বছরের মধ্যেই তার এই অবস্থা হয়েছে। তোমরা ত' দেখছ তোমাদের আশে-পাশে তোমাদের মতই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে কতজন চশমা দিয়ে তবে ভাল দেখতে পায়। তাদেরও চোখ একদিন ভালই ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাদের দৃষ্টিশক্তির অবনতি হয়েছে। এই অবনতির মূলে আছে খুব সামান্য ছোট ছোট কয়েকটি নিয়মের প্রতি অবহেলা। অবশ্য সে সব অপরাধ তোমরা অজানতেই করে আসছো।

কি ভাবে বই পড়া উচিত: বাঁ দিকের (সামনের) ছেলেটিই ঠিক ভাবে পড়ছে, অন্য দু'জন নয়। আলোটা ঠিক ভাবেই রাখা হয়েছে।

তোমরা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে যে বড় সহরে, যেমন কলকাতায়, স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে চশমা পরা যত দেখা যায়—গ্রামের স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ততটা নয়। এর কারণ কি? গ্রামের ছেলেদের চোখ সব সময়েই দূরের—অতি দূরের জিনিষ দেখতে অভ্যস্ত। আর সহরে যেদিকে তাকাও সামনে তিন-চার তলা বাড়ী। দৃষ্টিশক্তির প্রসারতা হবে কি করে? কেউ ত' আর কেবল আকাশের দিকে চেয়ে দূরে পাখী উড়ছে বা নানান্ রকমের মেঘ ভেসে যাচ্ছে, দেখতে থাকে না। তাই সহরের ছেলেরা যত বড় হ'তে থাকে, ততই কোথায় চোখের দৃষ্টিশক্তিও সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে, না ক্রমেই ক্ষীণ হতে থাকে।

গ্রামের ছেলে স্বভাবত: বেশ স্বাস্থ্যবান্, অবশ্য যাদের ম্যালেরিয়া ধরে নি। তারা প্রচুর রোদ, বাতাস পায়, পায় টাটকা, ভেজাল-হীন পুষ্টিকর খাদ্য। খেলাধূলা, ব্যায়ামের জায়গা প্রচুর। কিন্তু সহরের ছেলেদের ভাগ্যে এর প্রায়

কোনটাই ঠিক মত জোটে না। প্রায় বাড়ীতেই ভাল করে রোদ ঢোকে না, হাওয়া বয় না। বইলেও তা বিশুদ্ধ নয়। খেলবার মাঠ নেই। আর পুষ্টিকর খাদ্যের কথা তো ছেড়েই দাও—ব্ল্যাক্ মার্কেট ও র‍্যাশনিংএর দৌলতে। এত সব অসুবিধার মধ্যে যদি তাদের বেড়ে উঠতে হয়, তবে শারীরিক সামর্থ্য আর চোখের দৃষ্টিশক্তি যে কমে যাবে তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

এই রোদ-বাতাস, ভাল পুষ্টিকর খাওয়া এ সবের ওপর ত' তোমাদের কোন হাত নেই। কিন্তু এ সব ছাড়াও তোমাদের নিজেদেরও অনেক দোষ-ত্রুটি আছে। যেমন ধর—একদৃষ্টে চেয়ে থাকা। ফলে হয় কি,—প্রথমটা যেমন ভালো দেখতে পাচ্ছিলে, পরে আর তা পাও না। অথচ দেখবার জন্যে খুবই চেষ্টা করতে থাকো। শেষে হয় যে,—চোখ টন্‌টন্ করে ওঠে, ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যায়। চোখ ও ঘাড় একেবারে স্থির করে রেখে, খানিকক্ষণ কোন জিনিষের দিকে চেয়ে থেকে পরীক্ষা করে দেখ ঘাড়ে ও চোখে ব্যথা হয় কি না! চোখের প্রকৃতি চঞ্চল, ঠিক

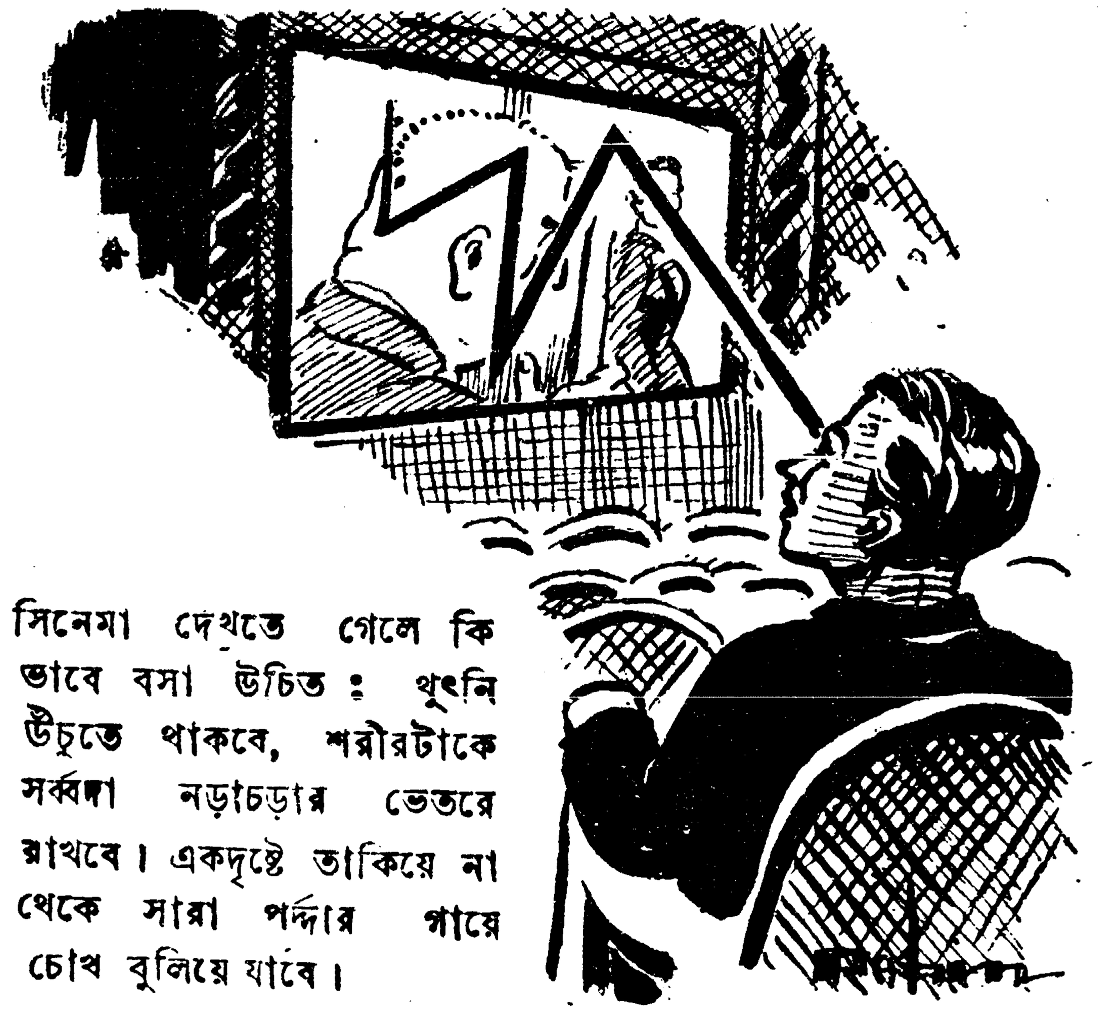

সিনেমা দেখতে গেলে কি ভাবে বসা উচিত: থুৎনি উঁচুতে থাকবে, শরীরটাকে সর্ব্বদা নড়াচড়ার ভেতরে রাখবে। একদৃষ্টে তাকিয়ে না থেকে সারা পর্দ্দার গায়ে চোখ বুলিয়ে যাবে।

তোমাদেরই মত। তোমাকে যদি তোমার দিদি শাস্তি দেন যে, ঘরের কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, একেবারে নড়বে না; তুমি কতক্ষণ ঐ রকম চুপ করে থাকতে পার? একটু পরেই উস্‌খুস্ করতে থাকবে, আর খানিক বাদে অজানতেই নড়তে চড়তে সুরু করবে,—এই তোমাদের স্বভাব। দিদির সতর্ক দৃষ্টি যদি সর্বদা তোমার ওপর থাকে—নড়তে গেলেই ধমকানি খাও, তখন দেখবে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পরই সমস্ত শরীরে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার উদ্ভব হ'বে। তেমনি চোখকেও যদি অনবরত ঐ রকম শাসনে রাখো, কেবল একদৃষ্টে চাইয়ে রাখো—তা হ'লে কিছু দিন পরে চোখের স্বাভাবিক শক্তি কমে আসবেই।

চোখকে স্থির করে রাখতে গেলে তোমরা ঘাড়কেও শাস্তি দিতে কসুর কর না। তোমরা অনেকেই সিনেমা দেখতে গেলে মাথা-ধরা, চোখ-ব্যথা, শিরদাঁড়া ও ঘাড়-টন্‌টনানি প্রভৃতি অনেক উপসর্গ ভোগ কর। তার কারণই হচ্ছে অতি আগ্রহে, একদৃষ্টে ছবি দেখা। ফলে হয় কি,—কোমর থেকে ঘাড় পর্য্যন্ত এক অবস্থায় স্থির করে রাখো—ঘাড় নড়ে না, আর চোখের ত' কথাই নেই,—স্থির হয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ ঝাপ্‌সা হ'য়ে ওঠে! তখন অজানতেই চোখ একটু নড়ে নেয়, কিন্তু ঘাড় ও শিরদাঁড়া একই অবস্থায় থাকে। তা হ'লেই বুঝতে পারছ, আরামে সিনেমা দেখতে গেলে কি করতে হবে। সমস্ত শরীরটাকে সর্বদা নড়াচড়ার ভেতর রাখবে। কখনও ঝুঁকে পড়ে দেখছ, কখনও সোজা হয়ে, কখনও হেলান দিয়ে। কখনও বা এ পাশে, কখনও বা ওপাশে নড়ে-চড়ে নেবে। আর ছবিটা যখন দেখবে একদৃষ্টে একজনের মুখের দিকে না চেয়ে থেকে সমস্ত ছবিটাতেই চোখ বুলিয়ে নেবে। যে কথা বলছে একবার তার মাথার দিকে, পর মুহূর্ত্তে তার পায়ের দিকে, আবার কখনও মুহূর্ত্তের জন্যে অন্য লোকের দিকে বা পেছনের গাছ, পাহাড় প্রভৃতি দৃশ্যের দিকে। এই রকম করে সব সময়ই চোখ ঘুরে বেড়াবে। অবশ্য কেবল চোখ তু'টো ঘোরালেই হবে না, সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ও ঘুরবে। এমনি করে মনে রেখে যদি ছবি দেখ, তা হ'লে আর কোন কষ্ট হবে না।

কি ভাবে সেলাই করা উচিত: চোখের দৃষ্টি সর্বদা সূচের গতির সঙ্গে সঙ্গে ঘোরাতে হবে।

মেয়েরা খানিকক্ষণ সেলাই করতে গেলেই ঐ রকম ঘাড়ে-চোখে টন্‌টনানির জন্যে আর সেলাই ক'রতে পারে না। এর পেছনেও ঐ একই কারণ। চোখ তু'টো সেলাইএর দিকে স্থির থাকা,—সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ও। এই অবস্থার হাত থেকে বাঁচতে গেলে কি করতে হবে? চোখ তু'টো দিয়ে সূচটাই যদি দেখ তবে সব গোলমাল চুকে যায়। কাপড়ে ফোঁড় দিয়ে সূচ যেই মুখ বার করলো, অমনি তার দিকে চাইলে। হাত শুদ্ধ সূচ ওপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, আবার নীচে আসতে সুরু কর্‌ল। তোমার চোখও সেই সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল,

—যতক্ষণ না আবার কাপড়ে ঢুকল। এতে তোমার চোখ ও ঘাড় সব সময়েই নড়তে থাক্‌ল—ফলে ব্যথা আর হবে না। অবশ্য এই রকম "মনে করে" সেলাই করতে প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধাই হবে—কেননা, তোমরা ত' এ রকমে অভ্যস্ত নও! কিন্তু একবার অভ্যাস করলে দেখ্‌বে, চোখের ব্যথাও চলে গেছে আর চোখ খারাপের সম্ভাবনাও অনেক কমে গেছে।

এখন বুঝলে, তোমরা অজান্‌তে কতকগুলি দোষ করে ফেল যার জন্যে কিছু দিন পরে চোখ খারাপ হ'য়ে আসে। তা হ'লে তোমরা সর্বদা মনে করে রাখবে—"দেখবার নিয়ম"। যখন বই পড়তে বস্‌বে তখন—

১। বইটা টেবিলে রেখে শরীরটা সোজা রেখে পড়বে। যদি মেঝেতে বসে পড়তে হয় তবে হয়ত বইটাকে একটু উঁচু করে ধর্‌তে হবে বা অন্য একখানা মোটা বইএর ওপর রেখে পড়তে হ'বে—যাতে ঝুঁকে পড়ার দরকার হবে না।

২। বইয়েতে যেন আলোর পরিমাণ উপযুক্ত থাকে।

৩। প্রতি লাইনের অক্ষর বা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে চোখ ও ঘাড়ও ঐ দিকে নড়বে। এক লাইন পড়া শেষ হলেই চোখ ও ঘাড় আবার দ্বিতীয় লাইনের প্রথম শব্দ দেখবে।

৪। মাঝে মাঝে "মনে করে" চোখ পিট্‌পিট্‌ করে নেবে।

আর যদি দূরের জিনিষ দেখতে হয় তবে—

৫। চিবুক একটু উঁচু করে চোখের সঙ্গে সমান্তরাল রেখে দূরের জিনিষটি দেখ্‌বে।

৬। রোজ তু'-একবার করে দূরের কোন লেখা,—যেমন বাড়ীর পাশের কোন দোকানের "সাইন বোর্ডের" বড় বড় অক্ষরের ওপর চোখ বুলিয়ে যাবে। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি অক্ষর যেন পেন্সিল দিয়ে না বুলিয়ে "নজর" দিয়ে বুলিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অবশ্য দেখবার সময়ে মাঝে মাঝে চোখ পিট্‌পিট্‌ করে নেবে।

এই রকম ভাবে দেখতে শিখলে চোখ কোনদিন খারাপ হবে না, আর চশমা নেওয়ার তুর্ভোগও ভুগ্‌তে হবে না।

তা ছাড়া মনে রাখবে, এখন আমাদের দেশ স্বাধীন, আর তোমরাই সেই স্বাধীনতা রক্ষার ভবিষ্যৎ কর্ণধার। সৈন্য-বাহিনী, বিমান-বাহিনী বা নৌ-বাহিনীতে চোখের দোষ থাকলে প্রবেশ নিষেধ।

বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ের চোখ খারাপ সেয়ে যাবে কিছুদিন নিয়মিত "চক্ষুচর্চা" করলে। চশমার সাহায্য ছাড়াই তখন বেশ দেখতে পারবে।

ভয়

শ্রীশামুক

আমার মনে ভয়ের খামখেয়ালী উৎপাত সুরু হয় ছোট কাকুর কাছে গল্প শোনা থেকে।

বাবাকে কতবার বলতে শুনেছি,—দেখ সাতু, আমার মনে হয় ঐ সব গল্প বাচ্চাদের না বলাই ভাল। সারা জীবন ভয়ে বড় কষ্ট পাবে—নয় কি?

—না দাদা, তুমি ভেবো না কিছু। বরং এ সমস্ত শুনলে ভয় আর মনে বাসা বাঁধতে পারবে না, ভবিষ্যতে চেষ্টা করবে আমার মত হতে। ওদের সামনে সব সময়ে খুব স্পষ্ট দৃষ্টান্ত ধরে রাখা উচিত।

কাকুর প্রত্যেকটি গল্পের নায়ক হতেন তিনি নিজেই। তাঁকে কেন্দ্র করেই ঘটে যেত যত রাজ্যের অসাধারণ—অসম্ভব সব ঘটনা। হয় লুঠেরা এসে ঘিরে ধরেছে, নয় রণ-পা চেপে ডাবা-হাঁকা একদল ডাকাত, নয় তো রাতের আঁধারে যারা মিশিয়ে অদৃশ্য হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—দিনের আলো নিভে গেলেই যাদের আর নাম করতে নেই—হ্যাঁ, তারা।

কাকু কিন্তু একাই একশো। তাঁর মাত্র দু'খানি হাত বিপদে পড়লেই রাজা রাবণের মত হাজার হাত হয়ে যেত। তখন বর্শা, বল্লম, সড়কি পাটকাঠির মত টুকরো টুকরো করা, চড়-চাপড়ে হাড়গোড় ভাঙ্গা, চুল ধরে টেনে পটাপট মুণ্ড ছিঁড়ে ফেলা বা ভূত-প্রেতদের বেদম ঠেঙিয়ে দেশ-ছাড়া করা—এমনি একটানা একটা কিছু হয়ে মহা উৎসাহে, পরম উত্তেজনায় এবং বিষম ভয়ের সংগে গল্প হ'ত শেষ।

কাকু বেশীর ভাগ দেশের বাড়ীতে থাকতেন। আসলে তাঁর কলকাতা এতটুকু ভাল লাগত না। দেশে দল বেঁধে শিকারে যাওয়া আছে, ঘোর বর্ষার দিনে বা চাঁদনি রাতে মাছ ধরা আছে; এ সবের সুবিধা শহরে কোথায়?

কিন্তু যেই দু'-একদিনের জন্যেও এসে পৌঁছাতেন অমনি আমাদের মধ্যে বিষম সাড়া পড়ে যেত—এবারে গল্প শোনা যাবে। সন্ধ্যার পর স্নান করে যেই হাঁক দিতেন—কইরে?—আমরা সকলে এক্কেবারে তৈরি। ওঁর পিছু পিছু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে তিন-তলার ছাদে উঠতাম সারিবন্দী।

কাকুর মাথায় গোটানো মাদুর, কাকুর বগলে বালিশ, অন্যদের হাতে হাতে পানের ডিবে, দোক্তার কৌটো, পিকদানি প্রভৃতি। যেন হিমালয় অভিযানে চলেছি। কাকু আধ-শোওয়া হয়ে গল্প বলে যেতেন আর যখন ভয়ানক কিছু ঘটছে তখনই হ'ত ওঁর পান খাবার বা ধীরে-সুস্থে পিচ্ ফেলবার অফুরন্ত সময়—যখন আমাদের আর এতটুকু তর সইছে না তখনই।

কাকুর একটি কাহিনী বিশেষ ক'রে কত বার যে শুনেছি তার ঠিক-ঠিকানা নেই, কিন্তু পুরানো হ'ত না। গল্পটি ওঁর ভাষাতেই যথা সম্ভব ছোট করে বলি :

জ্যোৎস্না রাতে ঝিলের ধারে মাছ ধরতে বসলাম একলা। অনেকক্ষণ পরে মাছ পড়লো একটি বেশ বড়সড়। ছিপের সুতো গুটিয়ে হাতে মাছ ঝুলিয়ে যখন বাড়ীর পথে পা বাড়ালাম তখন মাঝ রাত পেরিয়ে গেছে।

পোড়ো জমি পেরিয়ে বাঁশ-জংগলের ভেতর দিয়ে একটা সহজ পথে তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌছানো যায়। কিন্তু এ পথে রাত-ভিতে কি সন্ধ্যার আগে থেকেই যাওয়া-আসা বন্ধ,—অনেকগুলি অপঘাত হয়ে গেছে কিনা। আমি সেই পথই ধরলাম। পোড়ো জমি থেকেই যে একটা খারাপ শব্দ আমার পিছু নিয়েছে বুঝতে পারি, কিন্তু আমোল দিলাম না। কয়েকবার দমকা বাতাস এসে হাতের মাছ ছিনিয়ে নিয়ে যাবারও চেষ্টা করলে।

বাঁশ-জংগলের মাঝামাঝি এসেছি, হঠাৎ মড়মড় করে পাতা সমেত একটি বড় বাঁশ সামনে পড়ে লম্বালম্বি আমার পথ আটকে দিল।

হেঁকে বলি—কে হে নবাবের পুষ্যিপুত্তুর, বলি সারা দেশটা ইজারা করে নিয়েছ নাকি? নিরীহ পথিকের ওপর এমন জুলুমের মানেটা কি? মনে রেখো সাতু চক্কোত্তির সঙ্গে চালাকি করতে এসেছ। এই ছিপের বাড়িতে গায়ে বিছুটির জ্বালা ধরিয়ে দেবো। তখন ডোবার জলে ডুবে বসলেও নিস্তার পাবে না।

এক অদ্ভুত খিনখিনে হাসিতে বাতাস শিরশির করে কেঁপে ওঠে, আর সামনে এসে দাঁড়ায় কিছু অস্পষ্ট কিন্তু ভয়ঙ্কর এক প্রেতমূর্তি।

আবার বলি,—আরে, এ যে গোবিন ভট্চায ! বলি কি মনে করে আমার ওপর আজ দয়া করতে এলে?

—মাঁছ খাঁবো।

—মাছের ওপর যখন এত লোভ তখন ভাল করে সাঁতার না শিখে বন্যার নদীতে মাছ ধরতে গিছলে কেন? তার জন্যেই তো এই ভূতের দশা।

—মাঁছ খাঁবো—বড় খিঁদে পেঁয়েছে।

—তা খাবে তো খাবে, কে বলছে না? তবে বামুনের ছেলে, কেন আর জন্তু-জানোয়ারের মতন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁচা মাছ গিলবে? চল, বাড়ী গিয়ে মাছ ভেজে দিচ্ছি।

ভাঙা বাঁশ জমি থেকে খাড়া উঠে জোড়া লেগে গেল আবার। পথ খোলা পেয়ে এগিয়ে চলি। পিছনে আনন্দের এক বিকট চাপা আওয়াজ করতে করতে আসে গোবিন। বাড়ীতে কারুর ঘুম না ভাঙিয়ে সোজা গেলাম রান্নাঘরে। মাছ কুটতে কুটতে বলি—এই চারখানা দাগার মাছ তোমায় দেওয়া যাবে। দাগার মাছই ভাজলে মজে বেশী।

কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে মাছ ভাজতে বসি, অন্য একখানা বেশ বড় খুন্তি আগুনে গুঁজে দিয়ে। রান্নাঘরের পশ্চিমের জানলার বাইরে যে গোবিন অপেক্ষা করছে তা ওর নানা অদ্ভুত আওয়াজে জানতে পারি।

সমস্ত ভাজা শেষ হয়ে গেলে বলি,—এই নাও গোবিন, হাত পেতে নিয়ে যাও; আর কোন দিন কিন্তু জ্বালাতে এলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!

এক অতি বীভৎস শির-ওঠা ও গাঁট বার-করা কালো হাত জানলা দিয়ে লম্বা ঘরের মধ্যে এসে পৌছাতেই টকটকে লাল সেই খুন্তিটি ঠিক তেলোর মাঝখানে ধরলাম চেপে।

সমস্ত গ্রামের লোকেরা হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনলে এক ভীষণ চীৎকার ও কাতরানি—ওরে বাঁপরে! পুঁড়িয়ে মেরে ফেঁললে রে!—আর কোঁন দিন এদিঁকে আঁসবো নারে!

দুই

বড় হয়ে উঠলাম। মনের মধ্যে ভয়ও সংগে সংগে বড় হয়ে ওঠে। কত জিনিসে ভয় পাই, কত বার আচমকা চমকে উঠি, কিন্তু তা তো আর কারুর কাছে প্রকাশ ক'রে বলা যায় না—বড় হয়ে গেছি যে! সবচেয়ে ভূতের ভয় ভয়ানক ভাবে পেয়ে বসে। যেন বিশ্ব দুনিয়ায় মানুষের চেয়ে ভূতের সংখ্যাই বেশী আর তারা সব জোট পাকিয়ে মাত্র আমার পেছনেই লেগে আছে।

আরো বড় হ'লাম। একটি বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাজে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয় হরদম। দু'-এক জায়গায় গিয়েই বুঝলাম আসল বিপদটি কি। স্থানে-অস্থানে রাত কাটাতে হয় একলা, এ তো বড়ই বিষম কথা! এদিকে টাকাকড়ি খুব ভাল পাওয়া যাচ্ছে, কাজ ছেড়েও দেওয়া অসম্ভব। বুদ্ধি ক'রে এক ষণ্ডা গোছের গুর্খা চাকর রাখলাম।

দিন তিনেকের মত কাজ নিয়ে টনকপুরে নামলাম রাত্রি বেলায়। ষ্টেশনে শুনলাম একটি মাত্র হোটেল আছে কিছু দূরে। থাপার পিঠে মোটঘাট চাপিয়ে চলতে চলতে এক সরু রাস্তায় থমকে দাঁড়াতে হ'ল। একটি গাছের ডাল ভেঙে আড়াআড়ি পথ যুড়ে আছে না? ভুল ভাঙলো কাছে যেতে। উলটো দিকের এক গাছের ছায়া—চাঁদের আলো বাধা পেয়ে ঐ রহস্যের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু ঐ হ'ল যথেষ্ট। বহুদিন পরে আবার কাকুর বাঁশের ডাল ভেঙে পড়ার গল্পটি হুবহু গেল মনে পড়ে।

হোটেলে পৌছে দেখি সব খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে—শীতের রাত কিনা! হাঁক-ডাক করে মালিককে তোলা গেল। বলে জায়গা নেই। আরে, বললেই হ'ল কিনা—এত রাত্রে যাই কোথায় এই অচেনা স্থানে? বেশী টাকার লোভ দেখাতে, বলে, একটা খারাপ ঘর আছে, কোন অসুবিধা হ'লে কিন্তু দোষ নেই।

ঘরখানি বহুদিন বন্ধ ছিল নিশ্চয়ই, কারণ ভেতরে ভারি গুমসানি গন্ধ। যাই হোক, সামান্য কিছু খেয়ে মাথা পর্যন্ত লেপমুড়ি দিয়ে খাটের ওপর কুঁকড়ে শুয়ে পড়লাম। থাপা শুলো ঠিক নীচেই!

ছনাৎ করে ঘুম ভেঙে গেল শীত পেয়ে। দেখি লেপটি খানিকটা সরে গেছে গা থেকে। হাতড়ে টর্চ খুঁজি, পাই না কোথাও। একটা কি শব্দ না ঘরের ভেতরই! ঐ

যে কে এগিয়ে আসছে সাদা কাপড়ে আগাপাশতলা ঢাকা! কপালে হাত রাখলে কে? উঃ, কী ঠাণ্ডা সে হাতের স্পর্শ! ঠক্ঠক্ করে কাঁপতে থাকি এবারে—শীতে নয়, ভয়ে। গলা থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে ডাক দেয়—থাপা, থাপা! ততক্ষণে টুঁটি চেপে ধরেছে জমপেশ।

আশ্চর্য সজাগ ঘুম থাপার! ধড়ফড় করে উঠে আলো জেলে কাছে এসে যায়, গায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে সাড়া দেয়, জিজ্ঞাসা করে,—ব্যাপার কি? একটু সজ্ঞান অবস্থায় ফিরে আসতে বলে ফেলি—ভূত—ভূত এসেছিল একটু আগে।

হাসলে না থাপা। বুঝিয়ে বলে এ রকম অনেক লোক ভয় পায় বটে হামাশা। সে মূখ্য মানুষ, ঠিক জানে না জিন আছে কি নেই। তবে অনেক অদ্ভুত জানোয়ার তো আছে পৃথিবীতে, হয়তো তাদের মতনই আছে জিন। কিন্তু তাদের কোন ক্ষতি না করলে আমাদের ক্ষতি হবে কেন? লিখতে লজ্জা লাগলেও বলি সে রাত্রে আলো জেলে থাপা আমাকে আগলে বসে রইলো সারা রাত, আর আমি কখনো কখনো এক-আধটু তন্দ্রার ঘোরে ঝিমালাম।

সকালে উঠে দেখি থাপা নেই ঘরে। শুয়ে শুয়ে ভাবলাম তার কথাগুলি অনেকক্ষণ। ও অশিক্ষিত মানুষ, কেমন সহজে জিনের সংগে মিটমাট করে নিয়েছে, আর আমি বই পড়ে দেখেছি ভূত নেই, তবু ভয় পেয়ে যাবো সারা জীবন? ধিক্কার আসে মনে।

একটু পরে দরজা খুলে বাইরে এসে যা দেখলাম ও শুনলাম একেবারে সর্বশরীর জ্বলে গেল রাগে। অনেকগুলি লোক দরজার চারপাশে নানা ভংগী করে দাঁড়িয়ে ছিল। একজন কাছে এসে দাঁত বার করে বলে,—উস্, আপনি তো খুব সাহসী, ভূতের ঘরে রাত কাটিয়েছেন! বহুদিন ঐ ঘরের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় নি কেউ। কি কি দেখলেন বলুন দেখি?

হঠাৎ রাগের মাথায় না ভেবে-চিন্তে বলে ফেলি—দেখেছি বৈকি, এক এয়া সাহেব ভূত। আমার কপালে অনেকক্ষণ হাত বুলিয়েছে।—আরে বাপরে, বলেন কি?—তবু বেঁচে আছেন? কিছু কথা বলেছে?—হ্যাঁ বলেছে যে যতদিন আমি এখানে থাকবো ততদিন সে দু'-নম্বর ঘরে গিয়ে থাকবে, আমাকে আর বিরক্ত করবে না।

দু'টি জিনিসে আশ্চর্য মিল হয়ে গেল হঠাৎ। সত্যি বহুদিন পূর্বে একজন সাহেব যায় মারা ঐ ঘরটিতে, তারপর হোটেল হ'ল। দু'-একজন বিনা কারণে ভয় পেয়ে চেঁচামিচি করার পর থেকে ঐ ঘর সম্বন্ধে সকলের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল। এবং দু'নম্বর ঘর হ'ল আমার প্রশ্নকর্তার নিজেরই।

বাকিটা তাড়াতাড়ি বলে শেষ করে দি। সে রাত্রে আমার ঘরে কিছু হবার আগেই দু'নম্বর থেকে ভীষণ চীৎকার। দেখি অবস্থা শোচনীয়। সাহেব-ভূত এসে কপালে ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিয়েছে। হট্টগোলে রাতটি কেটে গেল মন্দ নয়।

পরের দিন সকালে আবার কি দুর্বুদ্ধি হ'ল। অন্যদের সংগে আলোচনায় বলে

বসলাম যে সাহেব আমার কাছে এসেছিল ভোর রাতে। বলেছে যে, দু'নম্বরটা ভারি ছেলে-মানুষ, শুধু শুধু চীৎকার করে বিরক্ত করেছে। সে জন্যে আজ রাত্রে সে পাঁচ নম্বরে থাকবে। এর পর আর কি? পাঁচ নম্বরে সারারাত মজাদার জলসা।

সকাল হ'তেই কিন্তু আমাকে হোটেল ত্যাগ করতে হ'ল। মালিক যোড় হাত করে এবং মিষ্টি কথায় বলেছে বটে, তবে সোজা কথায় বলতে গেলে আমাকে তাড়িয়েই দিল। হোটেলের প্রতি ঘরখানি নাকি আমি ভূতের ঘর বানিয়ে দিচ্ছিলাম।

টনকপুর ছাড়বার আগে, একটি জিনিস আমাকে ছেড়ে গেছে বরাবরের মত—তা হ'ল ভূতের ভয়। নিজের চোখে যা ঘটতে দেখলাম তাতে বুঝতে পারলাম যে সে রাত্রে পথের ওপর গাছের ছায়া আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল কাকুর ভূতের কাহিনী। এর পর মনের ভয়ের সুযোগ নিয়ে কল্পনা এক ভূত তৈরী করে মাঝরাতে সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। আমার কথায় অন্যদের মনেও সৃষ্টি হয়ে গেল ভূত, আর তারাও ভয় পেয়ে মরলো—এ ছাড়া আর কি?

আজ আমার ভূতের ভয় মনে এতটুকুও নেই। এখন বুঝেছি আমাদের মন ভারি চতুর যাদুকর, এ সমস্ত তারই কারসাজি বা ভোজবাজি। বিশ্বাস না হয় নিজে নিজে পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

ধর, রাতের বেলা ঘুম ভেঙ্গেছে হঠাৎ। মনে কর ঐ শব্দ হচ্ছে—ঠিক শব্দ হবে। এবারে মনে কর ঐ আসছে এগিয়ে—দেখবে ঠিক এসে গেছে ভূত-প্রেত, যক্ষ বা দানব কেউ না কেউ। তারপর যেই মনকে ধমক দিয়ে বলবে—ধেৎ, কিচ্ছু নেই কোথাও, সমস্ত বাজে ভয়—বাস্, উড়ে গেল ফুড়ুৎ—সব ফরসা।

এবারে নিশ্চিন্ত মনে ডাক দাও—আয় ঘুম আয়; ঘুমিয়ে নেতিয়ে পড়বে তখুনি।

হারিয়ে যাবো

শ্রীশ্যামল দত্ত

হারিয়ে যাবো চাঁদের আলোয় চম্পা ফুলের বনে,
হারিয়ে যাবো মেঘের দেশে নীল গগনের কোণে।
হারিয়ে যাবো তরুর ছায়ে, রামধনুকের দেশে,
হারিয়ে যাবো সাগর-ঢেউয়ে অনেক দূরে ভেসে।
হারিয়ে যাবো দীঘির জলে—নদীর খেয়া-ঘাটে,
হারিয়ে যাবো শিউলি-ঝরা শিশির-ভেজা-মাঠে।

আত্মোন্নতি সমিতির গল্প

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
এম্. এ, বি. এস্-সি

রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদের ইতিপূর্ব্বে কথা প্রসঙ্গে একবার সুকুমারের কথা বলিয়াছিলাম। (চৈত্র, ১৩৫৫)। আজ তার সম্বন্ধে আর একটু বলিব। সুকুমার সান্যাল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। বাড়ি ছিল বোধ হয় যশোর জেলায়। সে বেশ সৌখীন লোক ও আমাদের মধ্যে একমাত্র কবি ছিল। মাঝে মাঝে তার কবিতা শুনাইত, আর শুনাইত তার প্রিয় কাব্য—'দশানন বধ কাব্য'। কে রচয়িতা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। কাব্য তোটকাদি বিচিত্র সংস্কৃত ছন্দে লেখা। এক লাইন পড়িতে গেলে ছু'-তিন বার অভিধান খুলিতে হইত। কবি সান্যাল কিন্তু হইয়া পড়িল ডাক্তার,—এম্. বি পাশ করা। কলিকাতায় যতদিন ছিল আমার বাড়িতে সে-ই গৃহ-চিকিৎসক ছিল। একদিন আসিয়া বলিল, "আমার আর কলিকাতায় প্র্যাক্টিস করা হইল না। চাকরীর চেষ্টা করিতেছি।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?" বলিল, "কলিকাতায় পসার জমাইতে যে সকল দোকানদারী করা আবশ্যক তাহা করিতে আমার কবি-প্রকৃতি বাধা দেয়। সেদিন এক বাড়িতে গিয়াছিলাম। বুঝিলাম ছেলেটির সামান্য সর্দ্দিজ্বর, তিন দিনের দিন ছাড়িয়া যাইবে। ভাবিলাম ভদ্রলোকের মিছামিছি ঔষধ কিনিবার খরচ করিয়া দেই কেন! বলিলাম, সামান্য অসুখ, ছু'-এক দিনেই সারিয়া যাইবে; ঔষধের আবশ্যক নেই। একটু তুলসী পাতার রস ও মধু দিতে পারেন। শুনিলাম সে বাড়িতে আমার পসার নষ্ট হইয়াছে। তাহারা আর এক ডাক্তার ডাকে, সে মস্ত প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ লেখে। অসুখ অবশ্য তিন দিনেই সারে।"

সুকুমার য়্যাসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জন হইয়া মধ্যপ্রদেশে যায়। কলিকাতায়

আমার বাসায় মাঝে মাঝে আসিত। সে সুচিকিৎসক ছিল, কিন্তু ঔষধে তার বিশেষ ভক্তি ছিল না। এই অভক্তি-সূচক ছু'টা গল্প সে প্রায়ই করিত। কম্পাউণ্ডার মাঝে মাঝে ভুল করিয়া এক রোগীর ঔষধের লেবেল অন্য রোগীর ঔষধে লাগাইয়া দিত। কিন্তু তাহাতেই প্রায় রোগীই ভালই হইত। ইহাদের ঔষধের উপর এমনই সরল বিশ্বাস যে যে কোন জিনিষকে ঔষধ বলিয়া লেবেল মারিয়া দিলেই উপকার হয়।

আর একটা গল্প:—ম্যাণ্ডালায় থাকার সময়ের গল্প। 'সরকারী ডাক্তারখানায় অনেক দূর হইতে লোকে ঔষধ লইতে আসিত। অত্যন্ত গরীব দেশ, সব সময়ে রোগীকে বহিয়া আনিতে পারিত না। রোগের বর্ণনা শুনিয়াই কখনও কখনও প্রেসক্রিপসন লিখিয়া ঔষধ দেওয়াইতাম। এক চাষা আসিয়া তাহার স্ত্রীর পীড়ার যে বর্ণনা করিল তাহাতে বুঝিলাম টন্‌সিল্ ফুলাতেই এই পীড়া হইয়াছে। একটা পেণ্ট্ লিখিয়া কম্পাউণ্ডারকে বলিলাম উহা কেমন করিয়া লাগাইতে হইবে তাহা চাষাকে বুঝাইয়া দাও। দিন আষ্টেক বাদে লোকটি আসিয়া উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরে, তোর স্ত্রী কেমন আছে?" "আজ্ঞে, সে ভাল হইয়াছে কিন্তু আমার গলায় বড় ব্যথা হইয়াছে।" পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম বুদ্ধিমান্ পেণ্টটা স্ত্রীর টন্‌সিলে না লাগাইয়া নিজেরটায় লাগাইয়াছে। অথচ স্ত্রী ইতিমধ্যে আপনিই সারিয়া গিয়াছে। তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল স্বামীর টন্‌সিলে ঔষধ প্রলেপ দিলে স্ত্রীর অসুখ সারে।'

সুকুমার পরে সিভিল সার্জ্জন হইয়াছিল। কিন্তু এ সম্মান তাহার বেশী দিন ভোগ হয় নাই। অল্প বয়সেই সে মারা যায়।

এবার আত্মোন্নতি সমিতির বক্সিং বিভাগ সম্বন্ধে আর একটু বলিব।

ওয়েলিংটন স্ট্রীটে সাহেবদের কাছে মার খাইয়া আমাদের বক্সিং শিখিবার আগ্রহ বাড়িয়া গেল—তাহার ফলেই বক্সিং বিভাগের সৃষ্টি।

মুষ্টিযুদ্ধ শিখার পর উহার প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন আমার এ যাবৎ কালের মধ্যে (প্রায় ৪৪ বৎসর) মাত্র একবার হইয়াছিল। আমি ও জীবন একদিন ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্ দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিতেছিলাম। এমন সময় এক ফিরিঙ্গী বেশ একটু জোর করিয়া আমাদের ধাক্কা দিয়া পথ করিয়া অগ্রসর হইল। জীবন বলিল, "লোকটা, দেখ তো, আমাদের যেন ইচ্ছা করিয়াই ধাক্কা দিয়া গেল!" আমি দ্রুত অগ্রসর হইয়া তাহার পাশে গিয়া হাজির

হইলাম—ধাক্কা দিবার অভিপ্রায়ে। লোকটা তাহা বুঝিতে পারিয়াই সহসা ফিরিয়াই তাহার হাতের একটা মোটা বেতের লাঠি দিয়া আমার মাথায় আঘাত করিল। লাঠিটা ধরিয়া ফেলা সত্ত্বেও মাথায় বেশ একটা আবের মত ফুলিয়া উঠিল। আমি তাহার লাঠিটা এক হাতে ধরিয়া তাহার মুখে কয়েকটা ঘুষি মারিয়াছিলাম। সে আমাকে আক্রমণ না করিয়া আমার কোটের আস্তিন ধরিয়া 'পুলিস, পুলিস!' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। বেশ লোক জড় হইয়া পড়িল। তবে স্বদেশী জনতা, তাহারা আমাদের দু'-জনকে পৃথক্ করিয়া দিল। জন কয়েক আমাকে বলিল, "আপনি এই ভিড়ের সুযোগে সরিয়া পড়ুন; উহার নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে, পুলিস আসিতেছে।" আমিও তাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিলাম। কারণ তখনকার দিনের আদালতে নেটিভ ও সাহেবের মামলার ফল সুবিদিত ছিল। একই লোকের মুষ্টিযুদ্ধ শিখিবার পর মারামারি করিবার দক্ষতা কি রকম অসাধারণ রূপে বর্দ্ধিত হয় তাহাই দেখাইবার জন্য এই কাহিনীটি লিখিলাম।

জীবনের কাহিনী আর বিস্তৃত হইবে না। এই পবিত্র দেশভক্ত আত্মা অল্প বয়সেই পরলোকে গমন করে। তাহার স্ত্রীও অল্প দিনের মধ্যে মারা যায়।

গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হইবার পর কয়েকটি নিয়ম হয়। দেশের কাজে সকল লোকেরই প্রয়োজন। তাহাদের সকলকেই দলে লইতে হইবে। কার্য্য-শক্তি সবারই সমান নহে। রামচন্দ্রের কার্য্যে কাঠবিড়ালীরও প্রয়োজন হইয়াছিল। যাহার যা শক্তি তাহাকে সেই অনুযায়ী কাজ দিতে হইবে। যে অর্থ দিতে পারে সে অর্থ দিবে, যে বলিতে কহিতে পারে সে প্রচার-কার্য্য করিবে, যে লিখিতে পারে সে লিখিয়া প্রচার করিবে, যে উগ্রকর্ম্মী সে নিজ গুণানুরূপ উগ্রকর্ম্ম করিবে। উগ্রকর্ম্মে যাহারা লিপ্ত থাকিবে তাহারা যে কার্য্যে সংযুক্ত থাকিবে তদতিরিক্ত কিছুই জানিবে না। এমন কি সকল সঙ্গীকেও জানিবে না। সংকেত দ্বারা তাহাদের পরিচয় হইবে। কেহ কাহাকেও প্রশ্ন করিবে না এবং অন্য রূপেও তাহাদের সম্বন্ধে কিছু জানিতে চেষ্টা করিবে না। কেহ কোনও রূপ ডায়েরী রাখিবে না বা কোনও সঙ্গী বা সমিতির উগ্রকার্য্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবে না। যাহারা অর্থ সাহায্য করিবে তাহাদের নামও কোথাও লিখিয়া রাখিবে না। ঐ শেষোক্ত ব্যবস্থাটি সমিতির সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই ঘটাইয়াছে। বেশীর ভাগ লোকই নামের জন্য দান করে, নিষ্কাম দান খুব কম লোকেই করে। কাজেই

দেশভক্ত গুপ্ত সমিতিগুলির অর্থ সাহায্য বেশী আসিত না। নিষ্কাম দাতার সংখ্যা বিরল। কাজেই অর্থ সাহায্য খুব কমই আসে। অথচ অর্থ ব্যতীত বর্ত্তমান যুগে কোনও কাজই অসম্ভব। এই কারণে পরবর্ত্তী কালে অনেক সমিতি রাজনৈতিক ডাকাতিতে মন দিয়াছিল। আত্মোন্নতি সমিতির ঐ সকল নিয়ম থাকায় বিশ্বাসঘাতকে সমিতির বেশী অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

ঘটনা লিপিবদ্ধ না থাকার ফলে কিন্তু ঐতিহাসিকের বিপদ্ ঘটিতেছে। এই সময়ে আত্মোন্নতি সমিতির এত দ্রুত সর্ব্ববিষয়িনী প্রসার হইয়া পড়ে যে ঘটনাবলীর সাময়িক ক্রম গোলমাল হইয়া যাইতেছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনার বিবরণ শুধু স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে হইতেছে। একই ঘটনায় ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন কাল ও পাত্র বর্ণনা করিতেছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের ঘটনা বর্ণনার মধ্যেও আমরা বিভিন্ন লেখকের লেখায় কাল ও পাত্রের এই রকম পার্থক্য দেখিতে পাই। চব্বিশ বছর বয়সে কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু রাঢ় দেশে কয়েক দিন ভ্রমণ করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে ঐ ঘটনার বর্ণনায় বেশ পার্থক্য আছে। ঐ দুই গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবন দাস উভয়েই পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া যে মিথ্যা লিখিয়াছিলেন উহা হইতে পারে না। তাঁহারা বিশ্বাস্য লোকের মুখে যে কাহিনী শুনিয়াছিলেন তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

১৮৯৯ খৃঃ অব্দের পর হইতেই আত্মোন্নতির জীবন ঘটনাবহুল হইয়া পড়িল।

আত্মোন্নতির লাঠি খেলা বিভাগ ঠিক কখন হইয়াছিল মনে পড়িতেছে না। অনুশীলন সমিতির লাঠি খেলা বেশ বিখ্যাত হইয়া পড়ে। সুপ্রসিদ্ধা সরলা দেবী তাঁহার বালিগঞ্জের বাড়ীতে এক অসি-শিক্ষার আখড়া খুলেন। স্বাধীনতার ইতিহাসে এই মহীয়সী মহিলার নাম স্বর্ণাক্ষরে থাকিবে। সুন্দরী, বিদুষী, ভারতীর সম্পাদিকা হিসাবে সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠা, সঙ্গীতজ্ঞা, রবীন্দ্র-নাথের ভাগিনেয়ী—তৎকালীন ফ্যাসান-ওয়ালা সমাজের অন্যতম শীর্ষস্থানীয়া এই মহিলা তৎকালীন যুবকদিগের মধ্যে লাঠি খেলার মত "চোয়ারের খেলা" (তখনকার অনেকের মতে) ফ্যাসান-সঙ্গত করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। আত্মোন্নতি, অনুশীলন, সরলা দেবীর সমিতি ও অন্যান্য সমিতি এবং মোহনবাগান প্রভৃতি ফুটবল ক্লাব দেশের অনেক যুবকের মধ্যে যে

ব্যায়াম শিক্ষার বীজ বপন করিয়াছিল, তাহাতেই পরবর্ত্তী যুগে "ডিরেক্ট্-য়্যাক্‌শনের" দাঙ্গায় কলিকাতা রক্ষা পাইয়াছিল।

সরলা দেবীর সমিতিতে মর্ত্তজা নামক এক পশ্চিমা মুসলমান (বোধ হয় নিজেকে তুর্ক বলিত) অসিযুদ্ধ শিখাইত। আত্মোন্নতি সমিতির টাকা-পয়সা তেমন না থাকায় নামজাদা ওস্তাদ্ সংগ্রহ হয় নাই। আশু চক্রবর্ত্তী নামক আমাদেরই সম বয়সী জনৈক যুবক দেশে লাঠি খেলা শিখিয়াছিল, তাহারই কাছে আমরা লাঠি খেলা শিখিতে লাগিলাম। এ ক্ষেত্রেও ছাত্রদের প্রগাঢ় উৎসাহে আত্মোন্নতিতে ভাল ভাল লাঠিয়াল হইয়া গেল। ইতিমধ্যে লড সাহেবের কাছ হইতে ইংরাজি কায়দায় অসি চালনাও কতকটা আয়ত্ত করিলাম।

পূর্ব্বকথা ঃ—গ্রীক্ সম্রাট্ মিনান্দার ভারত বিজয়ে বেরিয়েছেন। বিলাসী, অকর্ম্মণ্য মগধ-সম্রাট্ বৃহদ্রথ প্রচুর যুদ্ধোপকরণ উপঢৌকন পাঠিয়ে তাঁকে শান্ত করতে চান। মথুরার পুষ্পমিত্র ও বজ্রাচার্য্য গ্রীকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। ভরতপুরের রাজা কুমারসেনেরও সেই পণ। রাজভগিনী মালবিকার পাণিপ্রার্থী বিশ্বাসঘাতক বীরসিংহের সাহায্যে গ্রীক্‌রা ভরতপুর দুর্গ দখল করল। মালবিকা বন্দিনী হয়ে হ'ল গ্রীক্ সম্রাজ্ঞীর পরিচারিকা। হনুমানগড়ের অগ্নিমিত্রের সাহায্যে সুমতিসেন ভরতপুর পুনর্দখল করলেন, পুষ্পমিত্রও কৌশলে মগধের প্রেরিত উপঢৌকন লুঠ করলেন। মিনান্দার একসঙ্গে ভরতপুর ও পুষ্পমিত্রের দলকে অবরোধ করলে পুষ্পমিত্র সূচীব্যূহে গ্রীকবাহিনী ভেদ করে চলে গেলেন কিন্তু অগ্নিমিত্র যুদ্ধে বন্দী হ'ল। কিন্তু তার পরই মালবিকা কৌশলে তাকে মুক্ত করে দু'জনে পলায়ন করল। ওদিকে মগধের রাণী যুদ্ধভীত বৃহদ্রথকে তাঁর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তখন সচেতন করছিলেন। তার পর পড়।

—তেত্রিশ—

প্রয়াগের গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। গঙ্গার তীরে নিরিবিলিতে এক গাছতলায় বসে পুষ্পমিত্র কত কি ভাবছিলেন। চারিপাশে চতুর্দ্দশীর অন্ধকার, মাথার উপর এক আকাশ ঝিকৃমিকে তারা। গঙ্গার কুলু কুলু শব্দ ভেসে আসছে। সেই অন্ধকারের পানে তাকিয়ে ভারতের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথাই তিনি ভাবছিলেন। অনেক আশা করে তিনি প্রয়াগে এসে-ছিলেন, আজ মধ্যাহ্নে দুর্গাধিপের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছিলেন, কিন্তু দুর্গাধিপ বলেছেন—'মগধ-সম্রাট্ গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান না, মগধের সাহায্য না পেলে আমরা বিরাট গ্রীক বাহিনীর সঙ্গে ক'দিন যুদ্ধ চালাতে পারব? কাল প্রত্যুষেই আপনি প্রয়াগ ত্যাগ করুন, না হ'লে গ্রীক সম্রাটের রোষবহ্নি থেকে প্রয়াগ রক্ষা করা যাবে না। মগধ-সম্রাটের আদেশ ব্যতিরেকে আমি কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হ'তে পারি না, অকারণে প্রজাদের উপর দুর্যোগ ঘনিয়ে তুলতে পারি না।' এর পর আর কথা চলে না, কাল প্রত্যুষেই তাঁকে প্রয়াগ ত্যাগ করতে হবে। গ্রীকেরা বিরাট বাহিনী নিয়ে পিছনে আসছে, তাদের প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থাই হবে না। গ্রীক বাহিনী বিনা বাধায় প্রয়াগ অধিকার করবে। তারপর এখান থেকে পাটলিপুত্র আর কতদূর! গ্রীক বাহিনীর গতি হবে স্বচ্ছন্দ, অপ্রতিহত। এতদিন ধরে গ্রীক বিতাড়নের যে সাধনা তিনি করেছেন তা ব্যর্থ হ'ল; এতগুলি রণহস্তী ও যুদ্ধাশ্ব লুণ্ঠন করে কোন কাজেই লাগানো গেল না। পাটলিপুত্রে গেলে মগধ-সম্রাটের যে কোন সমর্থন পাওয়া যাবে তাও তো মনে হয় না!

সহসা কে যেন তাঁকে নিম্নস্বরে ডাকলো—আচার্য পুষ্পমিত্র!

পুষ্পমিত্র পিছনে অন্ধকারের পানে তাকালেন, কিন্তু গাছপালার মধ্যে কিছুই ঠাহর করতে পারলেন না। মুহূর্ত কয় পরে মনে হ'ল গাছের ছায়ায় কি যেন একটা নড়ছে। পুষ্পমিত্র কোমরবন্ধের তলোয়ারে হাত দিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—কে আপনি?

মনুষ্যমূর্ত্তি কাছে এলো; পুষ্পমিত্র উঠে দাঁড়ালেন। মূর্ত্তি ক্রমশঃ সাম্‌না সাম্‌নি এসে দাঁড়ালো, বললো—অন্ধকারে আমাকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে, না?

এবার পুষ্পমিত্র চিনতে পারলেন, আগন্তুক বজ্রাচার্য্য।

বজ্রাচার্য্য বললেন—আমি পাটলিপুত্র থেকে বরাবর আপনার কাছে এলাম, অনেক কথা আছে, বসুন।

বজ্রাচার্য্য ও পুষ্পমিত্র আসন গ্রহণ করলেন। কথাবার্তা সুরু হ'ল।

—চৌত্রিশ—

মগধের মহাবলাধ্যক্ষ বসে বসে সতরঞ্চি খেলছিলেন। একাই খেলছিলেন। সম্রাটের সঙ্গে খেলতে খেলতে একটা চাল ভুল হয়ে গেছে। আজ সন্ধ্যায়, তার ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই মাৎ হয়ে গেছেন। চালটা তাঁর মনে আছে, রাত্রে আহারাদির পর ছকের উপর

রাজা মন্ত্রী সাজিয়ে তিনি সেই চালটা ঠিক করে দেবার চেষ্টা করছেন, দু'পক্ষের খেলাই তিনি খেলছেন একা একা। সবে প্রতিপক্ষকে মাৎ করার চালটা স্থির করেছেন এমন সময়ে দৌবারিক এসে সংবাদ দিল—সম্রাজ্ঞী আপনাকে আহ্বান করেছেন।

—কে, সম্রাট্? এত রাত্রে!

—সম্রাট্ নন্, সম্রাজ্ঞী।

—সম্রাজ্ঞী এত রাত্রে আমাকে আহ্বান করেছেন! ব্যাপার কি বল ত'?

—আপনার জন্য তিনি মন্ত্রণা-কক্ষে অপেক্ষা করছেন।

মহাবলাধ্যক্ষ কিস্তির চাল দিতে ভুলে গেলেন, বারেক দৌবারিকের মুখের পানে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—আচ্ছা, তুমি যাও, আমি এখনি যাচ্ছি।

দৌবারিক প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিল, মহাবলাধ্যক্ষ কয়েক লহমা স্থাণুর মত বসে রইলেন। ত্রিশ বছর ধরে তিনি মহাবলাধ্যক্ষের পদে আছেন, আজ অবধি একটীও যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্মুখীন হ'তে হয় নি। পিতা ছিলেন মহাবলাধ্যক্ষ, সেই সূত্রে উত্তরাধিকার-গৌরবে তিনি এই পদ পেয়েছেন। কিন্তু ত্রিশ বছরের মধ্যে একদিনও তো রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাঁর আহ্বান আসে নি! আজ নিশ্চয়ই কোন অচিন্ত্যনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। এত রাত্রে যখন আহ্বান এসেছে তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সহজসাধ্য সাধারণ কিছু নয়! তাড়াতাড়ি হাঁটুতে একটা প্রকাণ্ড পট্টি বেঁধে তিনি চারপাইয়ায় গিয়ে উঠলেন। চারজন বরকন্দাজ তাঁকে বহন করে নিয়ে এলো প্রাসাদে। কোন রকমে একজন দৌবারিকের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি রাণীমার সামনে উপস্থিত হলেন।

সম্রাজ্ঞী বললেন—আপনার কি হ'ল?

—আর বলেন কেন, সোপানে পদস্খলনের ফলে বড় আঘাত পেয়েছি, ভালোভাবে চলতে পারছি না। কয়েকটা দিন একান্ত বিশ্রামের প্রয়োজন; কিন্তু আপনার আহ্বান তো অবহেলা করতে পারি না, তাই বাড়ী থেকে বেরুতে হল।

—বসুন।

হাঁটু ভেঙ্গে বসতে পারবো না, মহাদেবী!

মহারাণী কিছুক্ষণ সেনাপতির মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন—যে জন্য আপনাকে প্রয়োজন হয়েছিল তা আর সম্ভব নয়, আপনি গৃহে গিয়ে বিশ্রাম করুন গে।

মুখখানি যন্ত্রণাকাতর করে সেনাপতি দৌবারিকের কাঁধে ভর দিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন, এমন সময়ে মন্ত্রণা-কক্ষের দ্বারপথে বজ্রাচার্য্যকে দেখা গেল।—শুভমস্তু মহারাণী! মহাবলাধ্যক্ষ এখানে এসেছেন শুনে বরাবর আমি ভিতরে চলে এলাম, ক্ষমা করবেন। তারপর মহাবলাধ্যক্ষ, আপনার হাঁটুতে কি হ'ল?

মহাবলাধ্যক্ষ কোন উত্তর দিলেন না, হাঁটুতে একবার হাত বুলিয়ে, 'উঃ' বলে যন্ত্রণা-সূচক একটা শব্দ করলেন শুধু।

বজ্রাচার্য্য মৃদু হেসে বললেন—আপনার হাঁটুতে আঘাত লেগেছে বুঝি? বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন বুঝি? আহাঃ! আচ্ছা আসুন, আমি সারিয়ে দিচ্ছি—

মহাবলাধ্যক্ষের সামনে নত হয়ে পায়ের পট্টিতে তিনি হাত দিলেন, সেনাপতি বলে উঠলেন—আহা-হা, করেন কি? করেন কি?

—দেখুন না, আপনাকে এখুনি আমি নিরাময় করে দিচ্ছি,—বলে ক্ষিপ্রহস্তে তিনি পায়ের পট্টিটা সব খুলে দিলেন; তারপর হাঁটুতে মৃদু একটা করাঘাত করে বললেন—মহাবলাধ্যক্ষ, ত্রিশ বছর আপনি মগধের রাজস্ব থেকে বেতন নিচ্ছেন, সে কি মগধের দুদিনে মিথ্যাচরণ করার জন্য? আপনি হাঁটুতে মোটেই আঘাত পান নি, শুধু কর্মে অনিচ্ছার জন্যই মিথ্যা ভাণ করেছেন।

—কি বলছেন আপনি, আমি!...

—চুপ করুন, মিথ্যা কথা বললে আপনার ওই হাঁটু সারা জীবনের মত আমি অক্ষম করে দেব,। যান—

মহাবলাধ্যক্ষ দৌবারিকের কাঁধে হাত দিয়ে এক পা অগ্রসর হলেন, বজ্রাচার্য্য বললেন—আবার দৌবারিকের কাঁধে হাত কেন? সোজা হেঁটে চলে যান—

মহাবলাধ্যক্ষ মাথা নত করে সহজ ভাবে হেঁটে চলে গেলেন।

বজ্রাচার্য্য বললেন—এই মিথ্যাচারী অকর্মণ্য লোকগুলোই আজ মগধ সাম্রাজ্যকে ধ্বংসোন্মুখ করেছে।

সম্রাজ্ঞী এবার কথা বললেন, বললেন—উনি আজ সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছেন।

—মিথ্যা কথা, কাজের ভয়ে আহতের ভাণ করেছে। আপনাকে বোঝানো সহজ কিন্তু আমার দৃষ্টিকে ফাঁকী দেওয়া তত সহজ নয় মহাদেবী! যাক্, ওসব অকর্মণ্য কর্মভীত কর্ম্মচারীর কথা ছেড়ে দিন, আমরা এখনকার কর্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করি। গ্রীক বাহিনী প্রয়াগের উপকণ্ঠে এসে পড়েছে। তাদের প্রতিরোধ করার জন্য অবিলম্বে সৈন্য বাহিনীর প্রয়োজন। অবিলম্বে নতুন সেনানায়ক নিযুক্ত করে তাকে প্রয়াগে পাঠাতে হবে। প্রয়াগ দুর্গের পতন হ'লে পাটলিপুত্রের সমূহ বিপদ।

—কিন্তু সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করবে কে?

—উত্তরাপথের ধর্মচক্র বিশ্বস্ত পাত্র নির্বাচন করে দিয়েছেন। আপনি যদি তার উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করেন, তা হ'লে আমরা সুখী হব।

—কে তিনি?

—হনুমানগড়ের মহামণ্ডলেশ্বর, তক্ষশীলার রণনীতির অধ্যাপক আচার্য্য পুষ্পমিত্র।

—হনুমানগড় তো বহুদিন যবনের করতলগত হয়েছে।

—আচার্য্য জীবিত আছেন, ধর্মচক্রের মহাস্থবিরেরা তাঁকে আমার সঙ্গে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

—উত্তম, তাঁকে আপনি ভিতরে আহ্বান করুন।

—আপনিই কি নিয়োগ করবেন?

—হ্যাঁ। সম্রাট্ সন্ধ্যা থেকেই মাথার যন্ত্রণায় শয্যা গ্রহণ করেছেন, তাঁর সুস্থ হবার জন্য অপেক্ষা করতে হ'লে অনেক সময় বৃথা নষ্ট হবে। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান্!

বজ্রাচার্য্য আর কিছু বললেন না, পুষ্পমিত্র বাহিরে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁকে ভিতরে ডেকে আনলেন। মহারাণী পুষ্পমিত্রের আপাদমস্তক একবার দেখে নিলেন, তারপর বললেন—মগধের সেনাবাহিনী পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে আপনি প্রস্তুত আছেন?

—আমি প্রস্তুত।

—কিন্তু তৎপূর্বে দেশের নামে ও ধর্মের নামে আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে গ্রীকদের পরাজিত না করে আপনি ফিরে আসবেন না।

—গ্রীকদের বিতাড়ন করার ব্রত গ্রহণ করে গত সাত বৎসর ধরে আমি কোজাগরী সন্ন্যাস পালন করছি। আমার একমাত্র পুত্র গ্রীকদের হস্তে নিহত হয়েছে, আমার স্ত্রী অপমানের ভয়ে আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছে। রক্ত দিয়ে রক্তের দাগ আমি মুছে ফেলতে চাই। সেই প্রতিজ্ঞা কি আবার নতুন করে গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে রাণীমা?

মহারাণী কিছু বলার আগেই বজ্রাচার্য্য বললেন—আপনার পুত্র নিহত হয়নি আচার্য্য, ভরতপুর দুর্গে আহত হয়ে সে সম্প্রতি গ্রীকদের হাতে বন্দী হয়েছে। তাকে উদ্ধার করতে হ'লে গ্রীকদের বিধ্বস্ত করতে হবে, পিতা হিসাবে সে দায়িত্ব আপনার উপরেই বর্তেছে।

—আমার পুত্র!

—হ্যাঁ, আপনার পুত্র অগ্নিমিত্র।

আনন্দ ও চাঞ্চল্য মুহূর্তেকের জন্য পুষ্পমিত্রকে বিকল করে তুললো। যে পুত্রকে তিনি মৃত বলে ভেবেছিলেন, যে পুত্রের আশা তিনি চিরদিনের মত ত্যাগ করেছিলেন সে জীবিত আছে শুনে তিনি নূতন সম্ভাবনায় উদ্বেল হয়ে উঠলেন।

রাণীমা এবার কথা বললেন,—আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন, প্রত্যূষেই আপনাকে যাত্রা করতে হবে।

পুষ্পমিত্র নিজেকে তখন সংযত করে নিয়েছেন, বললেন—কিন্তু রাণীমা···

—কি বলুন?

—আমি শুনেছি পাটলিপুত্রে মাত্র আশী হাজার সৈন্য আছে, আর প্রয়াগ দুর্গে আছে দশ হাজার। কিন্তু মিনান্দারের অধীনে গ্রীক সেনা আছে প্রায় চার লক্ষ। আমাদের আরো সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে, তার জন্য অর্থের প্রয়োজন।

রাণীর মুখে বারেক চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো, তারপর বললেন—উত্তম, প্রয়োজনীয় অর্থ আপনি পাবেন।

রাণীমা কোষাধ্যক্ষকে ডেকে তখনই আদেশ দিলেন—রাজগৃহের সোনভাণ্ডার গুহায় আমাদের যে সুবর্ণ সঞ্চিত আছে তা অবিলম্বে পাটলিপুত্রে আনার ব্যবস্থা কর। (ক্রমশঃ)

———

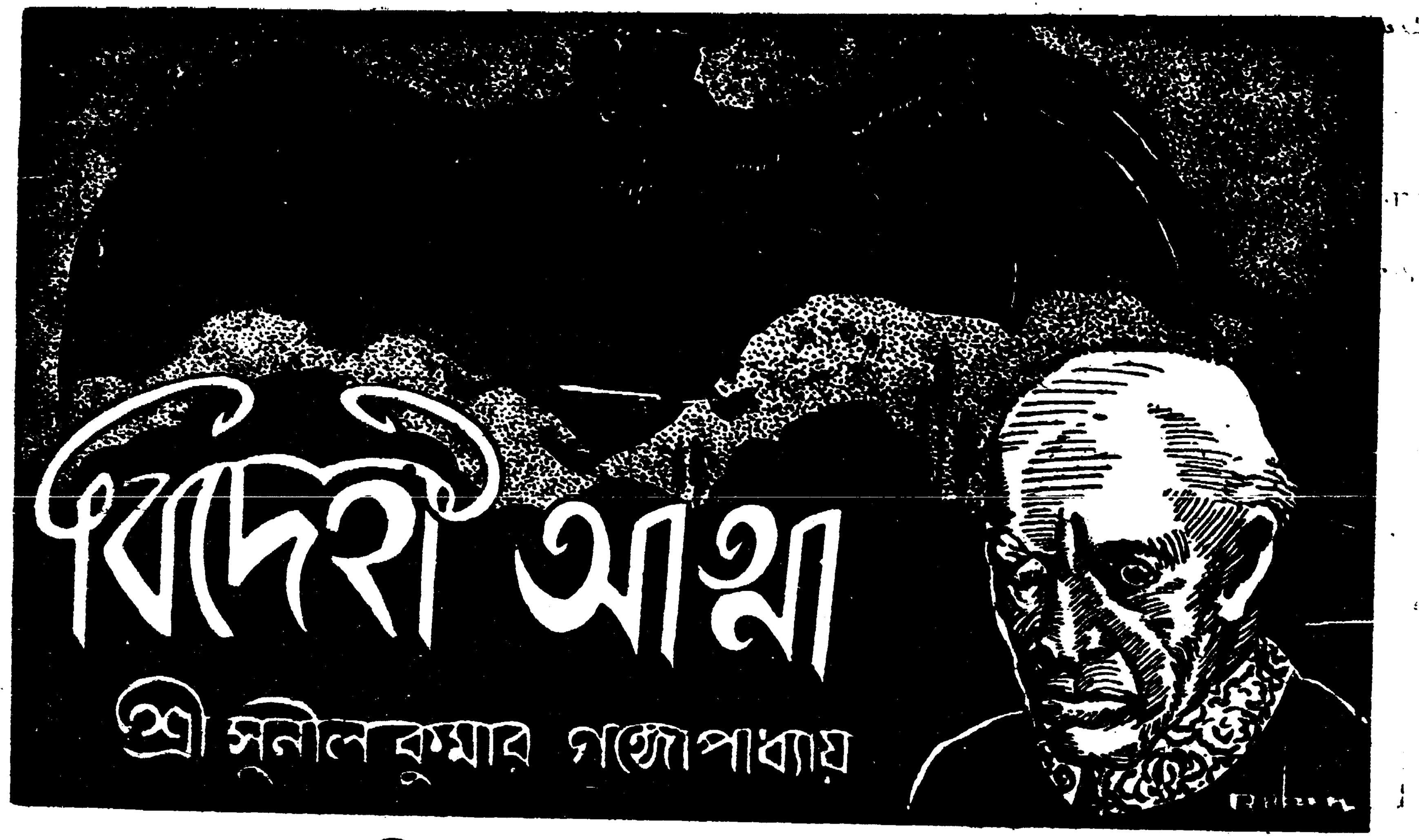

এর আগে যা বেরিয়েছেঃ—অশোক লাহিড়ীর ডায়েরীতে আমরা আসামের অরণ্যসঙ্কুল ভীষণগড়ের জমিদার কৃতান্তবর্ম্মার বিভীষিকাময় ভৌতিক লীলার আভাস পেয়েছি। কি ভাবে এই অ-মৃত দানবকে অনুচর সহ ৫০টি কাঠের বাক্সের মধ্যে ভরে কলকাতার উপকণ্ঠে দুর্দ্দমগড়ের পোড়ো বাড়ীতে আনা হ'ল, তাও। তারপর ডাক্তার অরূপ করের ডায়েরী। পাগলা-গারদের অদ্ভুত রোগী বিনায়কের কথা, অশোক লাহিড়ীর ছেলে অলকের বন্ধু শিবুর হঠাৎ রক্তশূন্য হয়ে যাওয়া, মানসিক ব্যাধির বিশেষজ্ঞ, প্রেততত্ত্ববিদ্ ডাঃ চক্রবর্ত্তীর আগমন, শিবুর অদ্ভুত ভাবে উধাও হয়ে যাওয়া, শেষে তার অশান্ত, অ-মৃত অবস্থা ও পরিণতি। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর কাছে থেকে বিদেহী কৃতান্তবর্ম্মার স্বরূপ জানা গেল;—কি করে এই অ-মৃত শয়তান অসংখ্য অ-মৃত অনুচরকে সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন ক'রে পৃথিবীর ওপর আধিপত্যের চেষ্টা করছে—জীবন্ত মানুষের রক্তপানে শক্তি সঞ্চয় ক'রে! একে ধ্বংস করতে না পারলে পৃথিবীর শান্তি নেই। ডাঃ চক্রবর্ত্তী তাঁর দলবল সহ তাই একদিন দুর্দ্দমগড়ে অভিযান করে এলেন। দেখলেন ইতিমধ্যে ৫০ টার মধ্যে ২১টা বাক্স সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তারপর পড়।

—আঠারো—

ডাক্তার অরূপ করের ডায়েরী

প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজে ব্যস্ত। সকলেরই উদ্দেশ্য, সকলেরই সঙ্কল্প কৃতান্তবর্ম্মাকে একেবারে চূর্ণ করা। তাই আমার শত কাজ থাকা সত্বেও আবার বেরিয়ে পড়তে হ'ল। যে গরুর গাড়ির গাড়োয়ান কৃতান্তবর্ম্মার কাঠের বাক্সগুলো দুর্দ্দমগড়ে এনেছিল তাকেই আমার চাই। আমাদের এই সহরতলীতে গরুর গাড়ি বেশী নেই, প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রায় মুখ-চেনা, তাই গাড়োয়ানকে ধরতে বেশী কঠিন হবে না। সে অন্য বাক্সগুলো না সরালেও তার সন্ধান দিতে পারে! এই আশায় পথে বেরিয়ে পড়লাম।

ভাগ্যটা ভালই ছিল, পথের মধ্যেই তাকে পেয়ে গেলাম। একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা টাকা হাতে দিয়ে বললাম—"শোন, একটা কথা আছে। ঠিকমত উত্তর দিতে পারলে আর এক টাকা বকশিষ দেব।"

সে একটু ভয় পেয়ে গেছিল, বলল—"কিছু অন্যায় হয়েছে?"

বললাম—"না, না। তুমি ওই বড় বাড়ি থেকে মোট ক'টা বাক্স কলকাতায় নিয়ে গেছ, বল ত'?"

সে যেন আশ্বস্ত হ'ল, বলল—"ও, এই কথা। আমি মোট ন'টা কাঠের বাক্স বালিগঞ্জে নিয়ে গেছিলাম। বাবাঃ, কি ভারী সেই বাক্সগুলো!"

"সে বাড়ির নম্বর মনে আছে?"

"আজ্ঞে না। তবে বড় রাস্তার উপর নতুন পার্কের চারটা কি পাঁচটা বাড়ি পরেই প্রকাণ্ড পুরোনো সেই বাড়ি। বাড়িতে কেউ নেই?"

জিজ্ঞাসা করলাম—"যদি কেউ না থাকবে তো বাড়িতে ঢুকলে কি করে?"

"একটা দাড়িওয়ালা বুড়ো আমার গাড়িতে বাক্সগুলো তুলে দিয়ে রাস্তা বলে দিয়ে চলে গেল। তারপর বাড়ির কাছে আসামাত্র সে আমাকে ডেকে নিল। কিন্তু ও রকম গায়ে জোর এর আগে আর কারও দেখি নি বাবু! ওই ভারি ভারি বাক্সগুলোকে যেন পাশবালিশের মত কোলে তুলে নিল!"

"তোমার বাড়ির নম্বরটা কি একেবারেই মনে নেই?"

"আজ্ঞে না। তবে আপনার বাড়িটা খুঁজতে কষ্ট পেতে হবে না। ওই বাড়ির সামনে কতগুলো সিঁড়ি আছে, গেলেই দেখতে পাবেন।"

তাকে আর এক টাকা দিয়ে বিদায় দিয়ে আমি বালিগঞ্জের দিকে চললাম।

বাড়িটা খুঁজে বের করতে সত্যিই আমার বেগ পেতে হ'ল না। গাড়োয়ানের কথা মত গিয়ে প্রথম দৃষ্টিতেই বাড়ীটাকে ঠিক চিনতে পারলাম। বাড়ীটা কত দিনের বলা কঠিন, অনেক দিন অব্যবহৃত থাকায় অনেক পুরোনো বলে মনে হয়। কৃতান্তবর্ম্মা সত্যিই বাড়ীটা কিনেছে কিনা খোঁজ নেওয়া দরকার। পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তর দিলেন—"ও বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। নতুন মালিকের ভাড়া দেওয়ার ইচ্ছা নেই।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"তবু কে কিনেছে বলতে পারেন?"

উত্তর হ'ল—"ঠিক বলতে পারলাম না। এই কয়দিনের মধ্যে মাত্র একবার

এক বুড়ো চাকরকে দেখলাম। সে বলল—তার মনিব আসামের কোথাকার রাজা—না কি!"

তবে কৃতান্তবর্ম্মাই! এইখানেই তার কিংবা আমাদের শেষ সমাধি রইবে। অন্য সকলকে খবরটা দেওয়া দরকার।

বাড়িতে ফিরে গিয়ে সবাইকে সমস্ত কথা খুলে বললাম। সমস্ত শুনে ডক্টর চক্রবর্ত্তী বললেন—"তুমি প্রচুর কাজ করেছ অরূপ! যদি ওই বাড়িতে আমরা সমস্ত হারানো বাক্স খুঁজে পাই তো আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। যদি কয়েকটা তখনও নিখোঁজ থাকে, তবে প্রত্যেকটা খুঁজে বের করে নষ্ট করতে হবে। তারপর আমাদের শেষ লড়াই। সেই বিদেহী নর-দানবকে চিরকালের জন্য হত্যা করতে হবে।"

সনাতন জিজ্ঞাসা করল—"কিন্তু আমরা ও-বাড়িতে ঢুকব কি করে?"

"আমরা এর আগে আর এক বাড়িতেও ঢুকেছি,"—তরুণ উত্তর দিল।

অশোক বাবু বললেন—"কিন্তু নির্জ্জন সহরতলীর এক ধারে দুর্দ্দমগড়, আর কলকাতা সহরের বুকে বড় রাস্তার উপর এই বাড়ি—এ দু'টো তো এক নয়! এখানে দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢোকা কি বোকামি হবে না?"

তরুণ উত্তর দিল—"আমরা দরজা ভাঙা নিয়ে বড্ড বেশী মাথা ঘামাচ্ছি। আসল কাজের সময় বুদ্ধি যোগাবেই।"

তার পরের রাত। আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্য-পন্থা নিয়ে সকলে আলোচনা করছি, হঠাৎ নার্স ছুটে ঘরে ঢুকল। বিনায়ক হঠাৎ আঘাতে মাটিতে থুবড়ে পড়েছে, আর সারা ঘর রক্তে একাকার হয়ে গেছে।

রক্ত! বিনায়ক! আমার বুকের মধ্যে কে যেন এক ধারালো তরোয়াল বসিয়ে দিল, আমার সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে উঠল।

বিনায়কের ঘরে এসে দেখলাম সে মেঝের উপর বাঁদিকে কাৎ হয়ে এক রক্তস্রোতের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ওর মুখ দেখে মনে হ'ল, কে যেন মুখটাকে ধরে মাটিতে দু'চারবার প্রচণ্ড জোরে আছড়েছে এবং ওই মুখ দিয়েই তার সমস্ত রক্ত পড়েছে।

নার্স বলল—"আমার মনে হচ্ছে, ওর পিঠ একেবারে ভেঙে গেছে। কিন্তু এ কি করে সম্ভব! ইচ্ছা করলে বিনায়ক নিজে মাথা মাটিতে ঠুকে মুখের

ওরকম দশা করতে পারে, কিন্তু খাটের উপর থেকে পড়ে পিঠ ভেঙে গেলে তো আর তা করা সম্ভব নয়! এ রকম দু'টো আঘাত এক সঙ্গে কি করে সম্ভব?"

নার্সকে বিদায় দিলাম। কি করে যে তার এই আঘাত—আমার মনে তার একটা ক্ষীণ সন্দেহ ক্রমে ক্রমে দানা বাঁধতে সুরু করে দিল। তরুণ আর সনাতন বাবু বিনায়কের খাটের উপর মুহ্যমানের মত বসে পড়লেন, আমি আর ডক্টর চক্রবর্ত্তী রইলাম বিনায়কের পাশে। ভাল করে পরীক্ষা করে বোঝা গেল যে মুখের উপরের আঘাত তেমন কিছু নয়, মাথার খুলিতেই গুরুতর আঘাত লেগেছে। ডক্টর চক্রবর্ত্তী বললেন—"ব্রেনের গোলমাল হয়ে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা; তাই এখুনি একটা 'ট্রিফাইন' করা দরকার।"

অপারেশন হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য তার নিঃশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হ'ল। তারপরে এত বড় একটা নিঃশ্বাস পড়ল যে মনে হ'ল যেন তার বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে। হঠাৎ বিনায়ক চোখ খুলল, কিন্তু সে চোখে কোনও রকম জ্যোতিঃ নেই—নিষ্পলক দৃষ্টিতে সে একদিকে তাকিয়ে রইল। তারপর তার চোখ-মুখে যেন স্বাভাবিকতা ফিরে এল, আস্তে আস্তে বল্‌ল—"আমি ভাল হয়ে যাব, ডাক্তার বাবু! একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি বলে আমাকে এত দুর্ব্বল মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমার মুখে কি হয়েছে। অসহ্য ব্যথা!"

ডক্টর চক্রবর্ত্তী বললেন—"তোমার দুঃস্বপ্নটা আমাদের বল তো দেখি?"

বিনায়ক যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠে বল্‌ল—"আপনাদের মিথ্যা বলে লাভ নেই। ওটা দুঃস্বপ্ন নয়,—এক বীভৎস সত্য।"

(ক্রমশঃ)

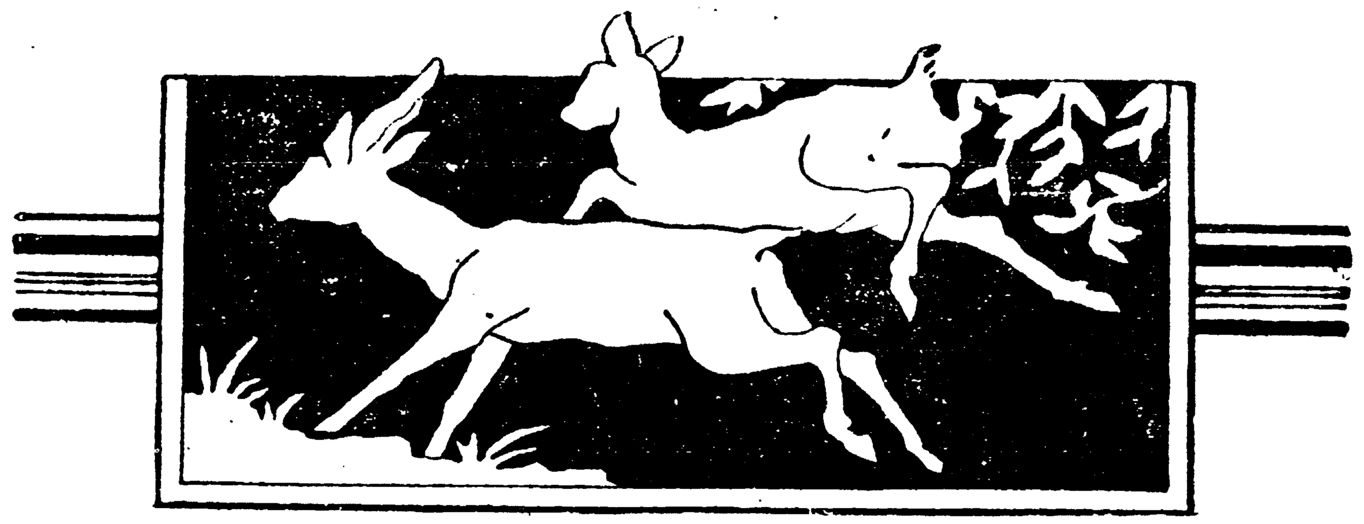

কিচ্ছু নষ্ট ক'র না

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

ফুটপাথের ধারে এক ফেরিওয়ালা বসেছে, তাকে ঘিরে অসম্ভব ভীড়। কি ব্যাপার? না, সে নাকি রেশমী কাপড় বেচছে জলের দরে। কাছে গিয়ে দেখলাম বাস্তবিকই তাই। পাশে স্তূপাকার রংবেরংএর রেশমী কাপড় পড়ে আছে, আর ফেরিওয়ালা হেঁড়ে গলায় সমানে চেঁচাচ্ছে—"সস্তাওয়ালা—সস্তাওয়ালা, লে যাও বাবু—সস্তাওয়ালা! ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না।" ইত্যাদি।

কাপড়গুলি কিন্তু ঠিক মিলের কাপড়ের মত চার কোণা নয়, দেখলেই সন্দেহ হয় বড় কোন একটা জিনিষ থেকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে নেওয়া হয়েছে। আর একটু লক্ষ্য করতেই 'সস্তাওয়ালা'র রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। ওগুলো প্যারাসুটের কাপড়। পুরোনো প্যারাসুট কেটে তৈরী করা হয়েছে, তাই অত সস্তা!

ভাবতে কেমন লাগে, না? ওই কাপড়ের টুকরোটার সঙ্গে না জানি কত ভয়ঙ্কর স্মৃতি জড়িয়ে আছে! হয়তো কোন ঘোরতর আকাশযুদ্ধের পর মেশিন্ গানের গুলিতে এরোপ্লেন ভেঙ্গে পড়বার সময়ে তার কোনও তরুণ আরোহী এই প্যারাসুট্‌টাকেই অবলম্বন ক'রে মহাশূন্যে ঝাঁপ দিয়েছিল। কিংবা হয়তো কোনও সাহসী যোদ্ধা শত্রুশিবির আক্রমণ করার জন্য এই প্যারাসুট্‌টাকেই পিঠে বেঁধে নির্ভয়ে মহাকাশ থেকে নেমে এসেছিল। কে জানে তখন সে শত্রুদলের সামনে পড়েছিল কিনা! হয়তো বা এরই কোনও অংশ ভেদ ক'রে শন্ শন্ ক'রে শত্রুর বুলেট বেরিয়ে গেছে! কত কি হ'তে পারে।

কিন্তু সে যাই হোক্, কল্পনা ছেড়ে এস এবার আমরা বাস্তব জগতে নেমে আসি। যুদ্ধে ব্যবহৃত ঐ প্যারাসুট সাধারণ একজন ফেরিওয়ালার হাতে কি ক'রে

এল? এর উত্তর খুবই সোজা। ফেরিওয়ালা নিশ্চয়ই যুদ্ধ জিতে ওগুলো দখল করে নি, সে সস্তায় নীলামের দরে কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে ওগুলো কিনে নিয়েছে। নিজে না কিনলেও কোন বড় ব্যাপারী তা কেনার পর তার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে, এবং এখন তাই কেটে খুচরো ভাবে বিক্রী ক'রে দু'পয়সা রোজগার করছে।

শুধু প্যারাসুট নয়, যুদ্ধের জন্য তৈরী,—ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত, এ রকম নানা ধরণের খুচরো জিনিষ আজও পথেঘাটে সস্তায় বিক্রী হতে দেখা যায়; কিছুদিন আগে আরও বেশী দেখা যেত। জামা-কাপড়, টিনে ভর্ত্তি নানা রকম খাবার, ভাঁজ করা খাট, থলে, ব্যাগ, কম্বল—কত কি! এরই কল্যাণে আমরা কিছুদিন শুকনো ডিমের গুঁড়ো, কস্মিন্-কালে-না-চাখা বিলিতী মাছ, নোনতা বাদাম, সিদ্ধ বীন, মটর ইত্যাদি সৈনিক-সুলভ খাদ্য চেখে জীবন ও রসনা সার্থক করেছিলাম।

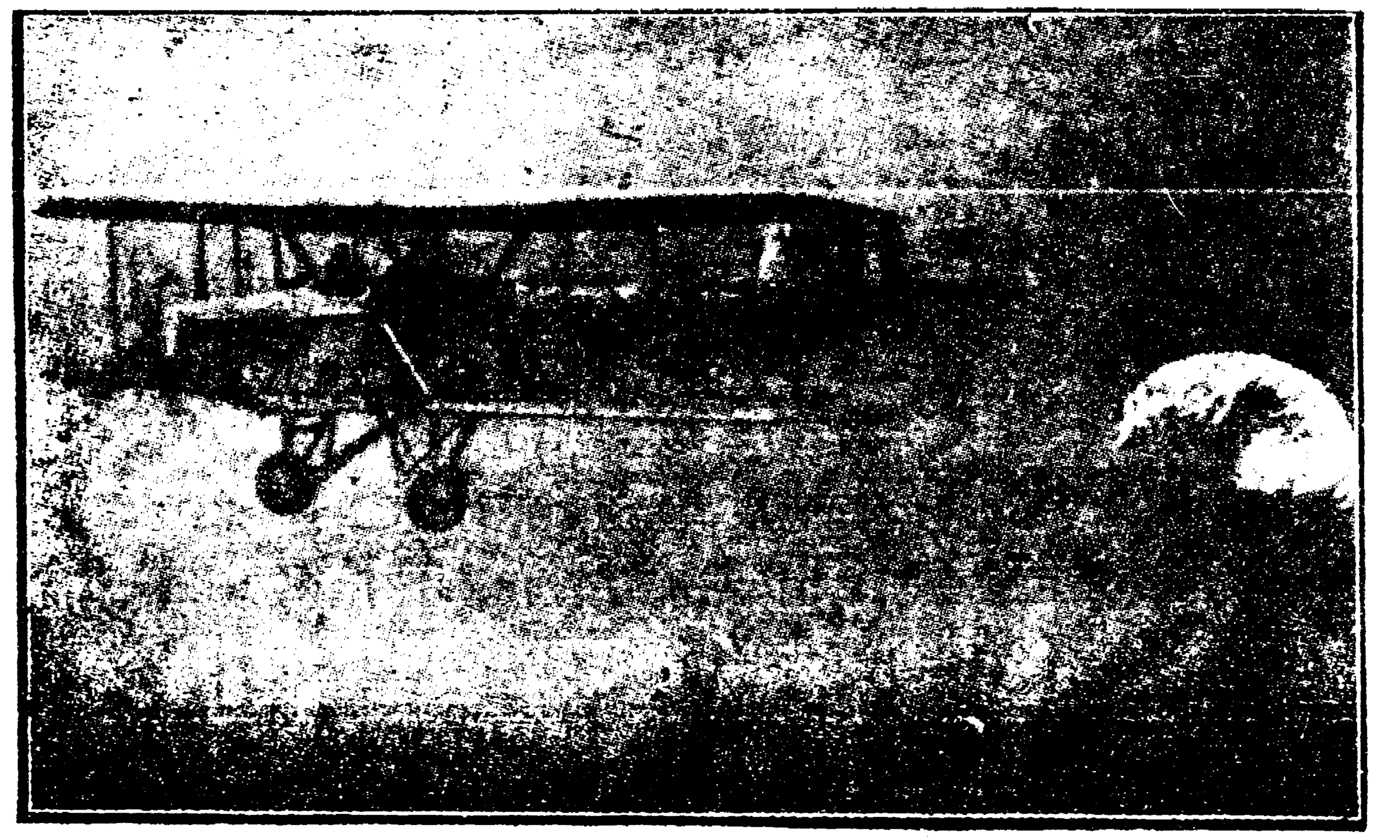

এরোপ্লেন ও প্যারাসুট

এক-একটা যুদ্ধ চালাতে তো কম জিনিষের দরকার হয় না! সরকারের তখন টাকার মায়া করলে চলে না, 'যেন তেন' প্রকারে যুদ্ধ জেতাই হচ্ছে আসল কথা। দলে দলে লোক সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে,—তাদের সব রকম প্রয়োজন, সব রকম সুখ-সুবিধা মেটাতে হবে; খাবার-দাবার পোষাক-পরিচ্ছদ সব কিছু। কৃপণতা করলে চলবে কেন? কিন্তু এ ছাড়াও আছে আর একটা বড় খরচ—সেইটাই প্রধান বলতে পার। সেটি হচ্ছে রণসম্ভার, অর্থাৎ গোলা-গুলি, বোমা, গ্যাস-মুখস, বেতার ও অন্যান্য নানা রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি;

তার পর আছে ট্যাঙ্ক, মোটর লরী, জীপ গাড়ী, এরোপ্লেন, মায় যুদ্ধজাহাজ—অর্থাৎ কোটি কোটি টাকার ব্যাপার!

অবশেষে যুদ্ধ তো থাম্‌ল। এবার এক নতুন সমস্যা। যুদ্ধের জন্য এবং যুদ্ধের কাজে তৈরী এই বিপুল সমর-সম্ভার নিয়ে কি করা যায়! ছোটখাট খুচরো জিনিষ—যা নাকি সাধারণ লোকে নিত্যি ব্যবহার করে থাকে, তা না হয় নীলাম ক'রে বেচে দেওয়া গেল। ভাল ভাল জিনিষ, সস্তায় পেলে কিনবার লোকের অভাব হবে না। কিন্তু বাদ বাকি?

যে সব জিনিষ সাধারণ লোকের কোনই কাজে আসবে না অথচ মূল্যবান্ সেগুলো, অক্ষত থাকলে, অবশ্যি যত্ন ক'রেই রেখে দিতে হবে—

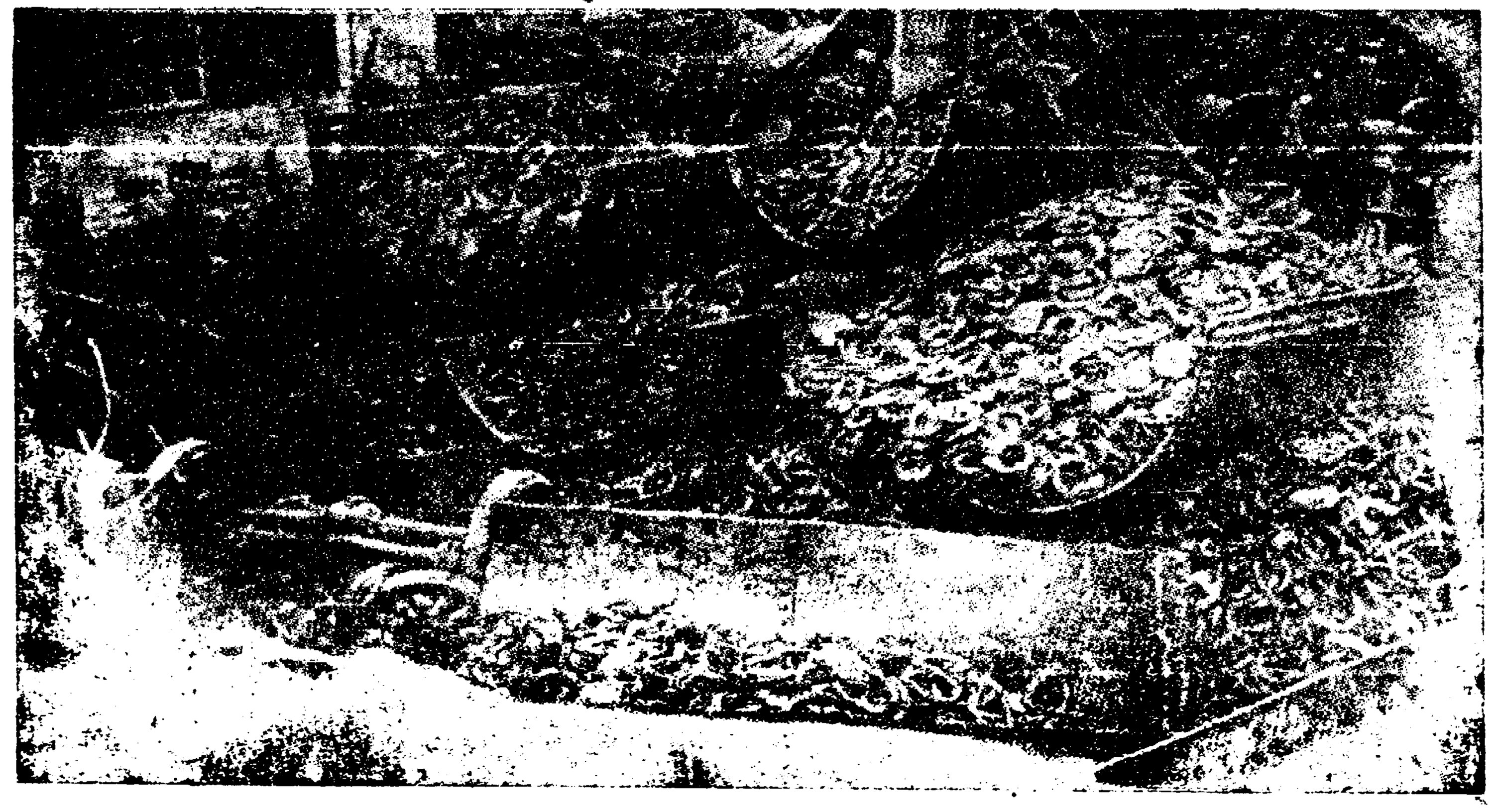

ভাঙ্গা জাহাজ থেকে নানা অংশ বাছাই করে সাজান হচ্ছে।

ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য। যেমন ধর কামান, বন্দুক, বোমারু বিমান, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলো যদি যুদ্ধে ঘায়েল হয়ে অকেজো হয়ে গিয়ে থাকে তা হলেই ভাবনার কথা। ডানা-ভাঙ্গা একটা এরোপ্লেন বা টোল-খাওয়া, ঘাড়-তোবড়ানো একটা ট্যাঙ্ক,—এগুলো কীই বা কাজে আসবে! তেমন তেমন ভাবে জখম-হওয়া একটা যুদ্ধজাহাজের সম্বন্ধেও ঐ কথাই খাটে। এগুলো জড় ক'রে গুছিয়ে রাখতে যেমন জায়গার দরকার, মেহনৎও তার পেছনে কম নয়। আর শেষ পর্য্যন্ত রেখেই বা কি হবে? অথচ—

'অথচ' বলতে কি বলতে চাই বোধ হয় বুঝতে পারছ? এ রকম তো এক-আধটা জিনিষ নয়, হাজার হাজার রয়েছে। জখম হ'লেও ওগুলোর দাম তো বড় সহজ নয়!

যুদ্ধরত দেশের কর্ত্তারা প্রথমটা এই সব নিয়ে বেশ মুস্কিলেই পড়েছিলেন। অবশেষে বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের ডাকা হ'ল। তাঁরা পরামর্শ ক'রে বললেন, "কুছ্ পরোয়া নেই। মরা হাতী লাখ টাকা। বিংশ শতাব্দীতে এগুলিই আমাদের হাতী, এই থেকেই আমরা লাখ টাকা তুল্‌ব। —কিচ্ছু নষ্ট হবে না।"

তার পর চল্‌ল তাঁদের গবেষণা। মাথা খাটিয়ে তাঁরা যে সব উপায় বার করলেন তা যেমনি কৌতূহলপ্রদ তেমনি শিখবার মত। তারই কয়েকটার কথা শোন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, দেখা গেল, যুদ্ধের পর পাঁচ লক্ষ গ্যাস-মুখস নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা বললেন, কোন ভাবনা নেই, গ্যাস-মুখসের বিভিন্ন অংশগুলো খুলে ফেল। রবারের টিউবগুলো নিয়ে অনায়াসে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে লাগান যাবে, টেনিস র‍্যাকেটেও চলতে পারে। কাঁচের লেন্সগুলো নিয়ে হবে চমৎকার গগ্‌ল্‌স্ বা চোখ-ঢাকা চশমা। বাক্সটা তো নানা ভাবেই ব্যবহার করা যেতে পারে। আর বাকি যেটুকু রইল মুখসের মত দেখতে তা দিয়ে মুখসই হোক্,—ছেলেদের খেলনার মুখস। ও জিনিষও তো বাজারে কম বিক্রী হয় না! এমনি ভাবে বৈদ্যুতিক যন্ত্র দিয়ে বৈদ্যুতিক ষ্টোভ, বোমারু বিমানের বিভিন্ন ভাঙ্গা অংশ থেকে কলেজে পড়াবার নানা যন্ত্রপাতি, রান্নাঘরের টুকিটাকি তৈরী করার ব্যবস্থা হ'ল।

কি ভাবে? জীপ্ গাড়ী, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ইত্যাদি অল্প জখম হ'লে তার অংশ বিশেষ বদলে নতুন করে বানিয়ে নাও। বেশী জখম হ'লে টুক্‌রো টুক্‌রো কেটে ভাল অংশগুলো পাঠিয়ে দাও কারখানায়—যেখানে নতুন গাড়ী, নতুন ট্যাঙ্ক বা নতুন এরোপ্লেন তৈরী হচ্ছে। ধর, এরোপ্লেনের আর সবটা তুবড়ে গেছে, শুধু ডানা দু'টো আস্ত আছে। কারখানায় সেইটুকুই খুলে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। নতুন এরোপ্লেনের গায়ে সেই পুরোনো ডানা যুড়ে দিতে কোন বাধা নেই। ভাঙ্গা এরোপ্লেনের বাকি অংশ, যা প্রায় সবটাই এলুমিনিয়ামের তৈরী, টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে গালিয়ে ফেললে পাওয়া যাবে তরল এলুমিনিয়াম্। সেই তরল এলুমিনিয়াম্ ছাঁচে ফেলে চাদর তৈরী

ক'রে নিয়ে তা দিয়ে সব রকম বাসনপত্রই তৈরী করা যেতে পারে। এরোপ্লেন বানাবার মত মজবুত না হ'লেও সে এলুমিনিয়াম্ বাসন-কোসনের পক্ষে বেশ টেঁকসই—সস্‌প্যান্, ডেকচী, কেটলি, থালা, ঘটি, বাটি—যা খুসী বানাও না কেন। এমন কি সে এলুমিনিয়াম্ দিয়ে ঘরের আসবাবপত্র—চেয়ার, টেবিল, আলনা, হাল্কা বুক্‌শেল্‌ফ্ প্রভৃতিও বানান যেতে পারে। এক ভদ্রলোক তাই এই রকম এলুমিনিয়াম্ দিয়ে তৈরী কেটলি থেকে জল ঢালতে ঢালতে ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন, "আমার এই কেট্‌লিটা দু'দিন আগেও আকাশে উড়ে বেড়াত। এখন দিব্যি ঠাণ্ডা হয়ে রান্নাঘরে বাসা বেঁধেছে।"

আমেরিকার সামরিক বিভাগ এই রকম ভাঙ্গা যুদ্ধোপকরণ থেকে পাওয়া খুঁটিনাটি খুচরো জিনিষ কাজে লাগাবার জন্য যে আয়োজন করেছেন তার বিবরণ শুনলে অবাক্ লাগে। বিরাট্ জায়গা যুড়ে তৈরী হয়েছে তাঁদের গুদাম। শত শত লোক—মেয়ে-পুরুষ সেখানে এই সব যুদ্ধের ভাঙ্গা সরঞ্জাম থেকে নানান্ দরকারী জিনিষ বাছাই ক'রে, লেবেল এঁটে, সাজিয়ে রাখছে। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা ক'রে তার কোন্‌টা কি অবস্থায় আছে, কোন্ প্রয়োজনে লাগতে পারে তার শ্রেণী বিভাগ করে দিচ্ছেন। তার পর দস্তুর মত ক্যাটালগ্ তৈরী করিয়ে সেই সব জিনিষের ফর্দ্দ বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করা হচ্ছে—যাতে, যার দরকার, এখান থেকেই পেতে পারে। ভাঙ্গা যুদ্ধজাহাজ থেকে সংগ্রহ করা এই সব জিনিষের বিরাট্ মিউজিয়াম্ নাকি একটা দেখবার জিনিষ। সেখানে কড়ি-বরগা, পেরেক, স্ক্রু, বোল্ট, নাট্, মোটর, এঞ্জিন, নানা রকম ধাতুর চাদর, বৈদ্যুতিক ও বেতার যন্ত্রপাতি—কী যে নেই বলা কঠিন! দূর দূরান্তর থেকে নিত্য অর্ডার আসছে—অমুক জিনিষটা পাঠাও, অমুক জিনিষটার অমুক অংশ আমাদের ভেঙ্গে গেছে, তোমাদের ক্যাটালগে দেখছি ওটা রয়েছে, আমাদের চাই। এই ভাবে শুধু অর্থই নয়, সময় এবং সব দিক্ থেকেই ঝঞ্ঝাট কমানো সম্ভব হচ্ছে।

হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে থাকেন অনেক শিল্পী। কেউ কেউ পেশাদার শিল্পী না হ'লেও সখের শিল্প-কাজ বেশ ভাল রকমই জানেন। হাসপাতালে এসে রোগের প্রথম চোটটা কেটে গেলেও তাঁদের অনেক সময়ে আরও বহু-দিন হাসপাতালে থাকতে হয়—সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পর্য্যন্ত। এই অবস্থায় সময় কাটানো কাজের লোকের পক্ষে এক মহা বিরক্তিকর ব্যাপার। আজ-

কাল তাই এই সব রোগীদের জন্যও যুদ্ধ-সরঞ্জামের নানা রকম ভাঙ্গাচোরা টুক্‌রো সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয়েছে ;—যেমন ধর তামা, নিকেল, এলুমিনিয়াম্ ইত্যাদির পাত, চামড়া, রবার ইত্যাদির ছেঁড়া টুকরো। সামান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাঁরা তাই দিয়ে বানাচ্ছেন নানা শিল্পদ্রব্য—সিগারেট-কেস্, য়্যাশ্-ট্রে কাগজ-চাপা, বুক্-কেস্, মনি-ব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, টেবিল বা ঘর সাজাবার আরও কত টুকিটাকি জিনিষ!

ঐ জিনিষই যখন বাজারে আসছে তখন কারও বুঝবার সাধ্য নেই কি থেকে ও তৈরী!

মোট কথা, এই যন্ত্রযুগে বৈজ্ঞানিক আর শিল্পী একত্র হ'লে কিছুই নষ্ট হবার যো নেই!

রুণ্‌কী নদীর জল

শ্রীঅচিন্ত্য মিত্র

চল্‌ছে ছুটে, চল্‌ছে নেচে রুণ্‌কী নদীর জল,
নাচের তালে গানের ধ্বনি উঠ্‌ছে অবিরল ;
কোন্ অজানায় কাহার টানে,
হরষ জাগে তাহার প্রাণে,
খুশীর নেশায় বইছে সে যে, হাস্‌ছে খলোখল্ ;
ঢেউয়ের দোলায় কাঁপ্‌ছে শালুক, কাঁপ্‌ছে শতদল।

ছোট্ট নদী—দুইধারে তার মাটির ভাঙা পাড় ;
শীর্ণ গরু চর্‌ছে সেথা, নাইক' রাখাল তার।
কোথাও তীরে কাশের বনে
ঘুর্‌ছে বালক সঙ্গোপনে,
ক্বচিৎ কোথাও যায় বা দেখা তাল-নারিকেল সার ;
সবুজ ঘাসে প্রজাপতি বস্‌ছে বারে বার।

জলের বুকে ছোট্ট তরী চালায় জেলে কোন্,
ভাঙা ঘাটে সাঁতার কাটে দামাল ছেলেগণ।
গ্রামের ছোট পথটি ধরে
কলস কাঁখে যায় কে ঘরে,
দম্‌কা হাওয়া বইছে কভু, কাঁপ্‌ছে কাশের বন ;
রাখাল ছেলের বাঁশের বাঁশী উতল করে মন।

আবার যখন নাম্‌বে আঁধার রুণ্‌কী নদীর 'পর,
মধুর হাওয়ায় গাছের পাতা কাঁপবে থরোথর্ ;
ফিরবে পাখী আপন নীড়ে,
ডাকবে ঝিঁঝি তাদের ঘিরে,
শাঁখের আওয়াজ কর্‌বে মুখর তীরের ঠাকুর-ঘর ;
ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌বে ধীরে রুণ্‌কী নদীর চর।

দৃষ্টি হবে রুদ্ধ—তবু শব্দ 'ছলাৎ ছল্'—
রুণ্‌কী নদীর বুকের 'পরে জাগ্‌বে অবিরল ;
জলের সোঁদা গন্ধে ভরা
বইবে বাতাস পাগল-করা,
রুণ্‌কী নদী ছোট্ট—তবু নাই বুঝি তার তল ;
চল্‌বে ছুটে, চল্‌বে নেচে রুণ্‌কী নদীর জল।

ভগবান্

(টেনিসন্ থেকে)

শ্রীসুধীররঞ্জন ঘোষ, এম্.এ, বি.এল্

শিশু মাকে শুধায় ডেকে,
'কেমন করে স্বর্গ থেকে
আমার কথা শোনেন ভগবান্ ?'
মা শুনে ক'ন বুকে ধরে,
'কেমন করে বোঝাই তোরে—
তিনি যে রে সকল শক্তিমান্ !'

শিশু আবার শুধায় মা'কে,
'পাপ যদি' মা করেই থাকে
তোমার ছেলে লুকিয়ে ঘরের কোণে ?'
মা হেসে ক'ন, 'দেখেন তিনি
সবার ওপর আছেন যিনি,
দৃষ্টি যে তাঁর সকল প্রাণে মনে।'

শুধায় শিশু—'মিথ্যা যদি
বসি আমি কণ্ঠ রোধি',
শুন্‌তে পাবে তোমার ভগবান্ ?'
'ওরে বোকা,' মা ক'ন হেসে,
'সব খবরই সেথায় পশে—
বুকের মাঝে আছে যে তাঁর কান।'

আবার শিশু শুধায় মাকে,
'তোমার ঠাকুর কোথায় থাকে,
দয়া আমায় করেন তিনি এসে ?'
মা ক'ন যুড়ে হাত দু'টি তাঁর,
'দয়া যে তাঁর অসীম অপার—
বিশাল জগৎ তাঁরই বুকে মেশে।'

আমি যদি হ'তেম

শ্রীসলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আমি যদি হ'তেম গুরুমশাই,
গুরুমশাই হ'তেন যদি মোনা—
তা হ'লে কি ভাবনা ছিলো কোনো,
সকাল-সন্ধ্যে থাকৃত পড়াশোনা ?
তখন আমি গুরুমশাই হ'য়ে
সন্ধ্যে-সকাল হাঁক লাগাতুম কষে';
গুরুমশাই সকল খেলা ফেলে
হ-য-ব-র লিখ্‌তো বসে বসে।
আমি তখন আরাম ক'রে ব'সে
পিপে খানিক নস্যি নিতেম নাকে ;
টিকিসুদ্ধ নড়ত মাথা আর
কাঁপতো পাড়া আমারি হাঁক্-ডাকে।
তখন যদি বাবা কিম্বা দাদা
বল্‌ত এসে—'মোনা,' এদিক্
শোনো,'—
সম্‌ঝে দিতাম—'গুরুমশাই আমি,
মোনা মোরে ব'লো না কক্ষনো।'
পাড়ার ভুলো, বাপ্পা এবং চিনু
বল্‌ত যদি—'খেল্‌বে চলো মোনা',—
বলে দিতাম, 'গুরুমশাই আমি,
মোনার সাথে নেইকো জানাশোনা !'

* * *

আমি যদি হ'তেম গুরুমশাই,
মোনা যদি হ'ত তাঁহার নাম ;
আহা, তবে মন্দ হ'ত নাকো,
পড়াশোনার থাকতো না হাঙ্গাম !

কি ও কেন

তেল কেন জলে ভাসে ?

জলের ওপর খানিকটা তেল ফেলে দাও, দেখবে তেল জলের ওপর ভাসছে। একটা শিশির মধ্যে খানিকটা জল ভরে তার পর তা'তে খানিকটা তেল ঢেলে দাও এবং খানিকক্ষণ ঝেঁকে ফেলে রাখ। খানিক পরেই দেখবে শিশির ভিতর ২টো থাক হয়ে গেছে ; নীচেরটা জলের, ওপরেরটা তেলের। কেন এমন হয় ? ঠিক যে কারণে সোলা ভাসে, কাঠ ভাসে, সেই কারণেই তেলও ভাসে। এক টুকরো কাঠের যা ওজন সেই আয়তনের জলের ওজন তার চেয়ে বেশী, কাজেই কাঠ জলের ওপর ভাসে। সেই রকম সমান আয়তনের তেলের ওজন জলের চেয়ে কম হওয়ায় তেল জলের ওপরে ভাসে।

লোহা কি কখনও ভাসে ?

ঠিক তেলের মতই, যদি এক টুকরো লোহা তার সমান আয়তনের কোন তরল পদার্থের চেয়ে ওজনে কম হয় তবেই তার ওপর ভাসবে। জলের ওজন সে রকম নয়—লোহার চেয়ে অনেক কম, তাই লোহা জলে ডুবে যাবে। কিন্তু যদি খানিকটা তরল পারা—ভাল কথায় যাকে বলে পারদ (যা থার্মোমিটারের ভিতর থাকে) নিয়ে তার মধ্যে ঐ লোহার টুকরো ফেলে দাও, দেখবে সেটা দিব্যি ভাসছে।

রঙ্গিন জিনিষ কি সব সময়েই রঙ্গিন থাকে ?

প্রশ্নটা শুনতে একটু অদ্ভুত, কিন্তু উত্তরটা সহজ—"না"। যেখানে আলো নেই সেখানে রংও নেই। অর্থাৎ অন্ধকারে কোন রঙ্গিন জিনিষই আর রঙ্গিন থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ একটা গাছের পাতা নিয়ে ধরা যাক্। ওর কি রং ? তোমরা বলবে সবুজ। কথাটা ঠিক, কিন্তু আসলে ওর রং ততক্ষণই সবুজ যতক্ষণ আমরা সূর্য্যালোক বা সাদা আলো দিয়ে ওকে দেখছি। সাদা আলোর মধ্যে সাত রকম রংএর আলো মেশান আছে তা হয়তো জান। এখন, সাদা আলো যখন গাছের পাতার ওপর পড়ছে তখন পাতা অন্য সব রংএর আলো শুষে নিয়ে শুধু সবুজ আলোটা ঠিকরে বের করে দিচ্ছে। সেই জন্যই

তাকে আমরা সবুজ দেখছি। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে কোন আলোই না থাকায় সে কোনটাই শুষে নিতে পারে না, ঠিকরে বার ক'রে দিতেও পারে না; কাজেই তখন আর তার কোন রং নেই। গাছের পাতার মত প্রত্যেক রঙ্গিন জিনিষের বেলায়ই কথাটা সত্যি।

তোমার সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা কর

(উত্তর শেষ পৃষ্ঠায়)

(১) আলো বেশী তাড়াতাড়ি যায় না ছায়া বেশী তাড়াতাড়ি যায়?

(২) আলো বেশী তাড়াতাড়ি ছোটে না শব্দ বেশী তাড়াতাড়ি ছোটে?

(৩) তাপ বেশী তাড়াতাড়ি যায় না ঠাণ্ডা বেশী তাড়াতাড়ি যায়?

(৪) পিতল জিনিষটা কি? ওটা কি একটা ধাতু?

(৫) দারচিনি, সুপারি, লবঙ্গ, চা, সজনে, পোস্তদানা—এগুলির কোন্‌টা গাছের কোন্ অংশ থেকে পাওয়া যায়?

(৬) ভারতবর্ষের প্রথম ভারতীয় গভর্ণর কে? তিনি কোন্ প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন?

(৭) নীচের লাইন ক'টি কার লেখা?—

(ক) 'দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি,
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা,
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।'

(খ) মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্ত্তি ধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।'

(৮) নীচের পত্রিকাগুলির প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন?—
বঙ্গদর্শন, অমৃতবাজার পত্রিকা, সন্দেশ, রামধনু।

(৯) পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় দ্বীপ কোন্‌টি?

(১০) এগুলি বলতে কি বোঝায়?—
স্পীকার, ইমন কল্যাণ, আঙ্কল্ শ্যাম, বয়লার, ডিউস্।

প্রবাদ

পৃথিবীর সব দেশেই প্রবাদ বাক্যের চল আছে। আবার মজা, এক দেশের প্রচলিত প্রবাদের সঙ্গে অন্য দেশের প্রবাদের অর্থের আশ্চর্য্য রকম মিল দেখা যায়। আমরা নানা দেশের প্রবাদ বাক্য থেকে এই রকম ২০টি প্রবাদ সংগ্রহ করে তুলে দিচ্ছি। তোমরা বল দেখি এর কোন্‌টার সঙ্গে কোন্‌টা এক অর্থে ব্যবহার করা হয়? ঠিক উত্তর শেষ পৃষ্ঠায় পাবে।

(১) শুধু কথা দিয়ে কখনো বেড়ালের পেট ভরানো যায়? (২) আগুনে

পোড়া বেড়ালের ঠাণ্ডা জলে ভয়। (৩) আনাড়ি মিস্ত্রী তার যন্ত্রপাতির সঙ্গে ঝগড়া করে। (৪) কাকের মাংস কাকে খায় না (৫) ঝরণা থেকে জল নিয়ে নদীতে ঢালা। (৬) বোকার ওষুধ লাঠি। (৭) কাজে কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে। (৮) ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়। (৯) কাছিমের পিঠে কামড় দিলে মাছিরই ঠোঁট ভাঙ্গে। (১০) শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। (১১) নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। (১২) ছেলেটা যদি বলে দড়ি দিয়ে জল বাঁধব, জিজ্ঞেস ক'র পুকুরের জল না কলসীর জল। (১৩) রামের কাছ থেকে ধার নিয়ে শ্যামকে শোধ করা। (১৪) গাধার গাধামী ভাঙ্গতে দরকার লম্বা বাঁশ। (১৫) কাজের বেলা গায়ে কাঁটা, খাবার বেলায় লাল ঝরে। (১৬) মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। (১৭) পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার। (১৮) বোকার জবাব বোকামী দিয়েই দিতে হয়। (১৯) কাকের চোখ কি কাকে ওপড়ায়? (২০) শিকারী পাখী বলে, আমায় যে মেরেছে তার ওপর আমার তত রাগ নেই যত রাগ তার ওপর যে আমায় মারার পর আছড়েছে।

তুমি কি জান?

নীচের কথাগুলি কথা প্রসঙ্গে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। ওর আসল অর্থ জান? নীচে দেখ:—

ক্রেমলিন—মস্কো সহরের একটি প্রাসাদের নাম। আগে ওখানে রাশিয়ার জার বাস করতেন, এখন ওটা সোভিয়েট সরকারের দপ্তর। তাই 'ক্রেমলিন' কথাটা অনেক সময়ে সোভিয়েট সরকারের সম-অর্থে ব্যবহৃত হয়।

টোরী—ইংল্যাণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টে রক্ষণশীল (কন্‌জারভেটিভ) নামে যে রাজনৈতিক দল আছে তাদের আগেকার নাম ছিল টোরী দল। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ঐ নাম বর্জ্জন করা হয়েছে। কিন্তু গোঁড়া রক্ষণশীলদের আজও অনেকে ঐ পুরোনো নামেই [illegible]হিত করেন। চার্চিল সাহেব এই দলের একজন। এখন এঁরাই ইংলণ্ডের পার্লিয়া-[illegible] প্রধান সরকার-বিরোধী দল।

ডিক্‌টেটর—শব্দটি ল্যাটিন থেকে এসেছে। শাসিতদের মতামতের অপেক্ষা না রেখে মাত্র একজনের হাতে শাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হ'লে সেই লোককে বলা হয় ডিকটেটর। এই প্রথা প্রাচীন রোমান্‌দের আমলে প্রথম দেখা যায়। রোমে ছিল সাধারণতন্ত্র,—সেনেটের সদস্যদের ওপর ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার ভার। কিন্তু তেমন তেমন জরুরী অবস্থায় সেনেটের সদস্যরা মাত্র একজনকে ডিকটেটর নির্ব্বাচিত ক'রে তাঁর হাতে সাত বছরের জন্য সম্পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারতেন। হিটলারের হাতেও এই রকম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

উত্তরায়ণ—কথাটার অর্থ উত্তরে গতি। সূর্য্য বছরের মধ্যে ৬ মাস আকাশের দক্ষিণ থেকে উত্তরে এবং বাকি ৬ মাস উত্তর থেকে দক্ষিণে ঘেঁষে যায়। প্রথম ৬ মাসকে (১১ই পৌষ থেকে ৬ মাস) সূর্য্যের উত্তরায়ণ বলে, বাকি ৬ মাসকে বলে দক্ষিণায়ন।

মলয়—দক্ষিণ ভারতের পর্ব্বতমালা। এই পাহাড় চন্দন গাছের জন্য বিখ্যাত। বসন্ত কালে যে দক্ষিণের হাওয়া বইতে থাকে তা এই সব পাহাড় থেকে সুগন্ধ বয়ে আনে ব'লে তাকে মলয় পবন বলে।

আজব সখ

পশুপাখী থেকে সুরু ক'রে পোকামাকড় পর্য্যন্ত কোন কিছুই মানুষ পুষতে বাকি রাখে নি। একদিকে যেমন বাঘ, সিংহ, ভালুক, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র জন্তু, তেমনি অন্য দিকে খরগোস, গিনিপিগ প্রভৃতি নেহাৎ ভীরু প্রকৃতির জীব—সবই পুষতে দেখা গেছে। আর পাখীর তো কথাই নেই! পিঁপড়ে, মৌমাছি—এদেরও অনেকে পুষে থাকে, কেউ ব্যবসার জন্য, কেউ বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের জন্য, আর কেউ বা নেহাৎই সখ ক'রে। সেদিন কাগজে দেখলাম প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ফ্রিশ নামে প্রাণিবিজ্ঞানের এক অধ্যাপক বলছেন যে তিনি বহু বছর ধরে মৌমাছি পুষে পুষে তাদের সম্বন্ধে এমন জ্ঞান অর্জ্জন করেছেন যে এখন তিনি তাদের ভাষাও দিব্যি বুঝতে পারেন। আমেরিকার ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ঐ বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছে। লর্ড আভেব্রী একটি পিঁপড়েকে পুষে সাত বছর বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। জ্যান্ত প্রজাপতি পোষার বাতিক অনেকের আছে—প্রজাপতির সুন্দর চেহারার জন্যই তার এই খাতির। পোষা মাকড়সা, পোষা টিকটিকি, পোষা শূঁয়োপোকা—এদের গল্পও আমরা বইএ পড়েছি। আমারই এক বন্ধুর বাতিক ছিল নানা ধরণের জ্যান্ত পোকামাকড় সংগ্রহ ক'রে তাদের হালচাল লক্ষ করা। এ জন্য তাকে ২।১ বার বিপদেও পড়তে হয়েছিল বিষাক্ত পোকার কামড় খেয়ে।

চীন দেশের নানা জায়গায় ঝিঁঝি পোকা পোষা একটা সাধারণ ব্যাপার। ঝিঁঝি-পোকার শব্দ বা গান নাকি তাদের খুব প্রিয়। তা ছাড়া ঝিঁঝি পোকার লড়াই দেখা সেখানকার একটা বড় আমোদ। আমাদের দেশে যেমন একশ'-দেড়শ' বছর আগে বুলবুলির লড়াই দেখা একটা বড় আমোদের ব্যাপার ছিল, জাভা, বালি প্রভৃতি দ্বীপে যেমন এখনও মুরগীর লড়াই দেখা একটা মজার আমোদ, অনেকটা সেই রকম আর কি!

এই ঝিঁঝি পোকার পেছনে অবস্থাপন্ন চীনারা অনেক সময়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। তাদের জন্য দামী দামী কারুকার্য্য করা খাঁচা তৈরী করে। হাতীর দাঁতের খাঁচা, চন্দন কাঠের খাঁচা—এ সব হামেশাই দেখা যায়। পোকাগুলোকেও এমন তোয়াজ করা হয় যে শুনলে হয়তো তোমাদের হিংসে হবে। তাদের জন্য ভাল ভাল ফলের রস, শশার কুচি, মেওয়া সিদ্ধ, পদ্মবীজ ইত্যাদি নানা খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া লড়ায়ে পোকাগুলোকে প্রচুর রক্ত-ভরা তাজা মশাও

খেতে দেওয়া হয়। অনেক মালিক মশা সংগ্রহ ক'রে নিজেরাই তার কামড় খায়; তার পর সেই মশা যখন রক্ত খেয়ে আর নড়তে চড়তে পারে না তখন তাকে ধরে নিজের পোষা ঝিঁঝিপোকাকে দেয় খেতে।

প্রায়ই বিভিন্ন মালিকের মধ্যে বাজি রেখে তাদের নিজের নিজের ঝিঁঝি পোকার লড়াই বাধিয়ে দেওয়া হয়। যারটা জেতে তার সম্মান বড় কম নয়। এ ছাড়া ঝিঁঝি পোকার গান শুনবার জন্য তাকে সুড়সুড়ি দেবার নানা কৌশলও এরা আয়ত্ত করে। সুড়সুড়ি পেলেই নাকি ঝিঁঝি পোকা সুরু করে তার গান।

ঝিঁঝি পোকা পালন সম্বন্ধে চীনে ভাষায় অনেক ভাল ভাল বইও বেরিয়েছে।

পোর্ট ক্যানিং

শ্রীগৌরী দেবী

গাল-ভরা ইংরেজী নাম শুনে কেউ কেউ হয়তো ভাবছ আমি সুদূর অষ্ট্রেলিয়া বা ইয়োরোপের কোন এক বন্দরের গল্প শোনাতে বসেছি। কিন্তু মোটেই তা নয়, এ আমাদের খাঁটী বাংলা দেশের ব্যাপার—কলকাতা থেকে মাত্র ২৮ মাইল দূরের একটি জায়গা।

তবে ইংরেজী নাম কেন? দেশী নামও একটা আছে বৈকি—মাতলা। যে নদীর ওপর এই বন্দর তার নাম মাতলা, জায়গাটিকেও স্থানীয় লোকেরা মাতলা

ব'লেই বলে। ইংরেজী নামটা হয়েছিল লর্ড ক্যানিংএর নাম থেকে। কি ক'রে বলছি।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি। লর্ড্ ক্যানিং তখন ভারতের বড়লাট। এই সময়ে কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী এবং প্রধান বন্দর। কিন্তু হঠাৎ কলকাতার গঙ্গায় অতিমাত্রায় পলি পড়তে সুরু করল। সকলে ভাবল হায় হায়, কলকাতার বন্দর বুঝি নষ্ট হয়ে গেল! গঙ্গায় পলি পড়ে বুঁজে গেলে আর তো সেখানে বড় বড় জাহাজ আসতে পারবে না—কলকাতার প্রধান্যও যাবে শেষ হয়ে। কি করা যায়! কলকাতার কাছাকাছি কোথাও বন্দর সরিয়ে নেওয়া যায় না কি?

ভেবে-চিন্তে শেষে ঠিক হ'ল মাতলায় এই বন্দর সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। মাতলা নদী তখন গঙ্গার মতই বড়, আর প্রবল তার স্রোত। কলকাতার খুব কাছে ব'লে এখানে বন্দর পত্তন করা খুব কঠিন নয়। তা ছাড়া এর উত্তরে আছে আরও একটা নদী—বিদ্যাধরী।

তোড়জোড় সুরু হ'ল। মাতলার ওপর জাহাজ ভিড়াবার জন্য তৈরী হ'ল পাঁচটা বড় বড় জেটি, ডক ইত্যাদি। বিদ্যাধরীতেও বস্‌ল গোটা দুই। জাহাজও আসতে সুরু করল। লোকে ভাবল মাতলা বুঝি এবার দ্বিতীয় কলকাতাই হয়ে যায় বা! আর এমন একটা জায়গার নাম কি মাতলা মানায়? তার চেয়ে নাম বদলে রাখা হোক্ পোর্ট্ ক্যানিং। ক্যানিংএর "রাজত্বকাল" চলছে, এই নামই মানাবে ভাল।

কিন্তু যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তা আর হ'ল না। কলকাতার গঙ্গায় বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না, কলকাতার বন্দর যেমন ছিল তেমনি টিকে গেল। ফলে পোর্ট ক্যানিং গড়ে ওঠা সম্বন্ধে যে বিরাট সম্ভাবনা ছিল তা আর কাজে পরিণত হ'ল না। জাহাজ আসা বন্ধ হ'ল, জেটি, ডক ইত্যাদিও ক্রমে ক্রমে লোপ পেল।

কিন্তু বড় বন্দর হ'তে না পারলেও ক্যানিং জায়গাটি আজও দেখবার মত। নদীর জলস্রোত থেকে বন্দর রক্ষা করার জন্য উঁচু লম্বা বাঁধ বরাবর চলে গেছে। বেড়াবার পক্ষে জায়গাটি চমৎকার। নদীর দৃশ্যও সেখান থেকে কম লোভনীয় নয়। ভেতরে ভেতরে চর পড়ে গেলেও নদীটি নেহাৎ ছোট নয়—বিশেষতঃ বর্ষাকালে তার শোভা এক কথায় অপরূপ। কলকাতা থেকে বহু লোক এখানে

চড়ুইভাতি করতে আসে। আমরাও কত বার গেছি। বাঁধের ওপর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে কোন একটা ছায়াঘন বনস্পতির নীচে সতরঞ্চি বিছিয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিয়েছি। সামনে নদী বয়ে চলেছে, পাল তুলে নৌকো চলেছে। সে দৃশ্য যেন আর পুরোনো হয় না।

নৌকো ক'রে নদী পার হয়ে ওপারে গেলে ভারী মজার একটা দৃশ্য দেখা যায়। দূর থেকে মনে হয় নদীর বেলাভূমি কিসে যেন লালে লাল হয়ে আছে। কিন্তু কাছে গেলেই অবাক্ কাণ্ড, লাল রং কোথায় মিলিয়ে গেছে, পড়ে আছে শুধু ভিজে বালির একখানা চাদর! ঐ লাল জিনিষগুলি কি জান? লাল কাঁকড়া। একটা নয়, দু'টো নয়—শত শত—হাজার হাজার, লাখ লাখ বললেও বোধ হয় ভুল হবে না। যখন সারা নদীর পাড়টা ছেয়ে থাকে তখন মনে হয় কে যেন একখানা লাল চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। মানুষের পায়ের শব্দ পেলেই চকিতের মধ্যে কাঁকড়াগুলো বালির ভিতর ঢুকে পড়ে, পাড়ের রং যায় একেবারে বদলে। তাই বলছিলাম ভারী মজার!

ক্যানিংএর বন্দর গড়ে উঠতে না পারলেও এটি কিন্তু একটি বড় ব্যবসার কেন্দ্র। কারণ, ধরতে গেলে, ক্যানিংএর ওপার থেকেই আসল সুন্দরবন আরম্ভ। ধান, চাল, কাঠ, হোগলা প্রভৃতির কারবারের জন্য জায়গাটি বিখ্যাত। ধানের চাষের জন্যও জায়গাটির সুনাম আছে।

ক্যানিংএর কাছাকাছি আরও কিছু ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এর উত্তরে বিদ্যাধরী আর মাতলার মোহনায় এক সময়ে একটি বড় দুর্গ ছিল। শোনা যায় রাজা প্রতাপাদিত্যই সেই দুর্গ তৈরী করেছিলেন। এখনও ঐ অঞ্চলে বুরুজখানা নামে একটা উঁচু ঢিবি বাংলার সেই গৌরব-যুগের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

তোমরা, যারা কলকাতায় বা তার কাছাকাছি থাক এবং ক্যানিং দেখ নি, তারা সুবিধা পেলেই একবার এই সুন্দর জায়গাটি ঘুরে আসতে ভুল না। শিয়ালদহ (বেলেঘাটা) ষ্টেশন থেকে একটা রেল লাইন ক্যানিং পর্য্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে।

উল্‌টো বুঝ্‌লি রাম

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি.এল্

আমাদের পাড়ার বটুক বাবুর মত পরোপকারী লোক আর দু'টী দেখা যায় না। তুমি চাও আর না-ই চাও, তোমার কোনও দরকার থাকুক আর না-ই থাকুক, তোমার উপকার না করে তিনি ছাড়বেনই না, তাতে তাঁর যতই অসুবিধে হোক্ না কেন।

চেনাশোনা কোনও লোক কোনও দায়ে ঠেকেছেন, যেমন, ধর, মেয়ের বিয়ে দেবেন কিম্বা জানালার পর্দা কিনতে যাবেন অথবা ঝি খুঁজছেন, এ খবর একবার বটুক বাবুর কাণে এলেই হ'ল! অচেনা লোক হ'লেও তিনি পেছপাও ন'ন, কেননা পরের কাজ না করে দিতে পারলে তাঁর ভাত হজম হয় না।

পাড়ায় একটা ক্লাব ছিল। তাস-পাশায় রুচি না থাকলেও বটুক বাবু রোজ আসতেন সেখানে। পাড়াশুদ্ধ লোকের কার কি দরকার সে খবর ঐ একজায়গায় বসেই পাওয়া যেত কিনা!

সেদিন আমি একটু বেশী রাত্তিরে ক্লাবে ঢুকবার মুখে দেখি যে বটুক বাবু বেরুবার উদ্যোগ করছেন। মুখখানা আহ্লাদে চকচক করছে। দেখেই বুঝলাম যে কোনও বিপন্ন হতভাগ্যের খোঁজ পেয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়ী চললেন নাকি, বটুকদা'?

বর্ষাতি কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে তিনি বললেন, হ্যাঁ, এই একটু ঘুরে তার পর বাড়ী যাব।

—এখন আবার ঘুরতে চললেন কোথায়? বিষ্টি এল যে!

—কি আর করি? এই মাত্র শুনলাম যে আমাদের গাঁয়ের হীরু নতুন চাকরী পেয়ে এই আজই তার বউকে নিয়ে এখানে এসেছে। একবার দেখতে যেতে হয়। না জানি নতুন জায়গায় এসে কতই অসুবিধে হচ্ছে বেচারাদের!

—কোথায় উঠেছে তারা?

—শুনলাম, ঘুঘুডাঙ্গায়।

—বলেন কি? এখন ঘুঘুডাঙ্গা যাবেন? পৌছতেই তো রাত এগারোটা বেজে যাবে!

—তা যাবে। ঠিকানাটাও বের করে নিতে হবে কিনা। তাতে কি? সে সব আমার অভ্যেস আছে। ক'খানাই বা বাড়ী আছে ঘুঘুডাঙ্গায়! এ তো আর আমাদের যাদবপুর নয়! এই কষ্টটুকুর ভয়ে যদি তাদের দেখতে না যাই তা হ'লে কি ভাববে হীরু?

—ভাববে কেন? আপনাকে তো তারা খবরই দেয় নি!

—খবর কি দিতে চাও তোমরা, আজকালকার ছেলেরা? মুখ বুজে কষ্ট সইবে, এই একটা বাহাদুরী। তা বলে তো আর আমাদেরও চুপ করে থাকাটা উচিত হয় না। আচ্ছা, চলি?

এই বলে পরোপকার করবার উত্তেজনায় ছাতা না খুলেই তিনি বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

পরদিন ট্রামে দেখা হ'ল। বললাম, আপনার হীরুর দেখা পেলেন কাল?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। খান আঠারো-উনিশ বাড়ীতে খোঁজ করতে না করতেই বাড়ীটা পেয়ে গেলুম। তবে, সব বাড়ীর লোকেরাই ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে, একটু যা দেরী হয়ে গেল।

—আর হীরুরা?

—তারাও শুয়ে পড়েছিল। ভেবে দেখ, লোকে মিছিমিছি আর কত রাত্ত জাগতে পারে? নতুন জায়গা, সঙ্গী নেই, সাথী নেই! আমি গিয়ে বার আষ্টেক-দশ ডাকবার পর হীরু ওপরের বারান্দা থেকে চোখ মুছতে মুছতে বললে, 'কে রে?' আমি বললাম, 'আমি বটুক।' হীরু একটু লজ্জা পেয়ে বললে, 'ও! কাকাবাবু? এত রাত্তিরে যে? আমরা তো অনেকক্ষণ হ'ল শুয়ে পড়েছি!' আমি বললাম, 'তাতে কি? কিচ্ছু অন্যায় হয় নি।' বলে, দরজা খুলিয়ে ওপরে উঠে গেলাম। হীরু আর বৌমা দু'জনেই মহা ব্যস্ত, বললে, 'কাকাবাবু, আর রাত জেগে শরীর নষ্ট করবেন না। বাড়তি একটা বিছানা আছে, এক্ষুনি শুয়ে পড়ুন।' তা কি হয়? আমি গিয়েছি তাদের আনন্দ দিতে। একটা ঝুড়ির ওপর বসেই গল্প জুড়ে দিলাম। গোড়ায় তো কথাই বলছিল না, খালি হাই তুলতে আর ঢুলতে লাগল। এতক্ষণ একলাটী থেকে বড্ড মুষড়ে পড়েছিল কিনা! খানিক বাদে আমার কথাবার্ত্তার গুণে দু'জনেই এক-আধটা কথা বলতে সুরু করল।

—কি বললে তারা?

—এ একবার বলে, 'উঃ, অনেক রাত হ'ল!' ও আর একবার বলে, 'সাড়ে বারোটা বেজে গেল যে!' আমার জন্যেই ভেবে মরে দু'জনে। খানিক বাদে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাকাবাবু, আপনি কখন শোন্?' আবার বললে, 'দুটো বাজতে চল্‌ল, আপনার শরীর খারাপ হয়ে পড়বে যে!' শেষটায় একরকম জোর করেই আমাকে তুলে দিলে। আজ আবার যাব, সব গোছগাছ করে দিয়ে আসব।

তারপর মধ্যে মধ্যে হীরুদের খবর বটুক বাবুর কাছে পেতে লাগলাম। একদিন বললেন, কাল হীরুদের ওখানে গিয়ে কতক গোছগাছ ক'রে দিয়ে এলাম। ফটোগুলো পর্য্যন্ত ভুল টাঙিয়েছিল। সব নামিয়ে ঠিক করতে খান তিন-চার ভেঙে গেল, এমন বিশ্রী-ভাবে টাঙানো হয়েছিল। তবু ভাগ্যি যে তিন-চারখানার ওপর দিয়ে গেছে। আমি না দেখলে আরও ক'খানা যেত তা কে জানে?

আর একদিন বললেন, হীরুদের বাড়ীটা বদলে দিলাম হে! অত দূরে থাকলে কি সর্ব্বদা খবর নেওয়া যায়? এই ঢাকুরের দিকেই একখানা বাড়ী দেখে দিলাম। সহজে কি আসতে চায়? বলে, আপনার কষ্ট হবে। হাঃ, হাঃ! আমার আবার কষ্ট!

তারপর শুনলাম একটা অর্গ্যান কেনা হ'ল হীরুর বউএর জন্য। তারপর হীরুর সাইকেল। ক'দিন বাদে উনুনটা ভেঙে নতুন ক'রে গড়া হ'ল। রোজ এই রকম।

ক'দিন বাদে দেখা হ'তেই খুব উদ্বিগ্নভাবে বললেন, হীরুর অসুখ, শুনেছ?

জিজ্ঞাসা করলাম, হয়েছে কি?

—কি জানি? শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। হাত-পা কাঁপে, চোখে কি রকম একটা চাউনি! ডাক্তার তো কিছুই ধরতে পারছে না। বলে, বোধ হয় কোনও একটা চাপা দুর্ভাবনার মধ্যে অনবরত থাকতে থাকতে এ রকম হয়েছে। হীরুর সব ভাবনা তো আমিই মাথা পেতে নিয়েছি, তার আবার ভাবনা কি? কিচ্ছু জানে না ডাক্তারটা! বিলেত থেকে কেবল শিখে এসেছে ষোলটা টাকা গুণে নিতে। তক্ষুনি ডাক্তার বদলে দিলাম। আমাদের আপিসের অতুল বাবু। বাড়ীতে 'পারিবারিক চিকিৎসা' ছাড়া আর কিছু পড়েন না, বেশ বিচক্ষণ চিকিৎসক। তিনিই এখন দেখছেন।

—কিছু উবগার দেখা যায় তা'তে?

—এখুনি কি হে? এই তো মোটে আট দিন কাটল! কাল তো একটু বাড়াবাড়িই হয়েছিল। রাত তিনটের সময় হীরু ভুল বকতে লাগল। যেন কেউ তার পেছনে ধাওয়া করেছে, এই ভাবের সব কথা। একবার বললে, 'আপদটা বিদেয় হচ্ছে না কেন?' আমি তাড়াতাড়ি ব্যাগের বরফ বদলে দিলুম। তারপর তাকে সান্ত্বনা দিলুম, 'বাবা হীরু! আমি ছাড়া আর কেউ তো আসে নি এখানে। তুমি নিশ্চিন্তি থাক।' তা'তে একটু কাজ হ'ল। চোখ খুলে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে সে পাশ ফিরে খালি একটা 'উঃ' বলে চুপ করে রইল। হীরুর বউ তো আমার জন্যেই ব্যস্ত। বললে, 'আপনি একটু ওঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন, কাকাবাবু! আপনার কথা ভেবেই উনি শান্তি পাচ্ছেন না। আপনার যদি একটা অসুখ-বিসুখ হয়ে পড়ে?' আমি বললাম, 'আরে পাগলী! তোরাই তো আমার সব। হীরুকে এ অবস্থায় ফেলে আমি কখনও জিরুতে যেতে পারি?'

বোধ হয় বটুক বাবুর শুশ্রূষার চোটে শেষ পর্য্যন্ত হীরুর অসুখটা ছেড়ে গেল। মাসখানেক বাদে তাঁর কাছে সে কথা শুনলাম। আপিস-ফেরতা একবার ঢাকুরের ওদিকে হয়ে আসছিলাম, দেখি বটুক বাবু একটা বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়ছেন। বললাম, একি বটুকদা'! এখানে যে?

তিনি বললেন, এই তো হারুদের বাড়ী।

—তার খবর কি?

—তোমাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে সে ভাল হ'য়ে উঠেছে, ভাই! এখন আপিসেও বেরুচ্ছে আজ ক'দিন হ'ল। বড্ড ধকলটা গেল আমারও। তেইশ দিন আপিস্ কামাই, রাতদিন হীরুর কাছে থাকতে হ'ত কিনা! বৌমা তো হীরুকে হাসপাতালেই দিতে চেয়েছিল। আমি থাকতে আর তা করতে দি কি ক'রে?

—আপনি এতও পারেন, বটুকদা'!

—তা যা বল! কিন্তু এর বদলে লোকের যা ভালবাসা পাই, তারও তুলনা নেই। হীরুদের কথাই ধর না। দু'জনে দিনরাত ভাবছে কি ক'রে আমাকে একটু স্বস্তি দেবে। বৌমা

ব'লে, 'কাকাবাবু! আপনি বরং কিছু বেশী দিনের জন্যে একবার বাইরে ঘুরে আসুন না। ষ্টীমারে কলম্বো গেলে কেমন হয়?' হীরুটাও এমনি পাগল, এই কথা বলা মাত্রই খান চারেক টাইম টেব্‌ল্ পেড়ে নিয়ে দেখতে বস্‌ল। আমি বললাম, 'না, না, জাহাজ-টাহাজে আমি চড়তে পারব না, জলে আমার বড় ভয়!' হীরু অমনি বললে, 'ঠিক্ কথা। কলম্বো আর একটা বেশী দূর কি? আপনি বরং পাহাড়ে চলে যান। কালিম্পং হ'য়ে হাঁটা-পথে তিব্বত! খরচাও কম। ভুটিয়াদের একটা ঝব্ব-টব্ব পেলে তার পিঠে চেপে যেতে পারলে তো কথাই নেই, আরামে যেতে পরেবেন। তিব্বতে মন না টেঁকে তো আরও উত্তরে আল্‌টাই পাহাড়-টাহাড় ঘুরে আসতে পারেন। মোটের ওপর, কিছু বেশী দিন থেকে শরীরটা একেবারে সারিয়ে তবে ফিরবেন।' সঙ্গে সঙ্গে বৌমা বললে, 'এবার আর আপনার কোনও কথা শুনব না, কাকাবাবু! কবে যাচ্ছেন, তাই বলুন?' হীরু অমনি উঠে পড়ল, বললে, 'চলুন, আপনার বিছ্‌নাপত্তর বেঁধে দিয়ে আসি।'

বললাম, বাঃ, কি ভয়ানক কৃতজ্ঞতা!

গদগদ হ'য়ে বটুক বাবু বললেন, হ্যাঁ ভাই! আপন বলতে আমার কেউ নেই, তোমাদের পাঁচজনের এই শ্রদ্ধা, ভালবাসাটুকুই আমার সম্বল। পাছে আমার কষ্ট হয় ব'লে কেউ বিপদে পড়লে আমাকে খবরটুকু পর্য্যন্ত দেয় না, এত ভালবাসে আমাকে সবাই। এই হীরুকেই দেখ! বললে বিশ্বেস করবে না, এই হীরুর চাকরটা সে দিন আমাকে বলছিল যে আপিস্ থেকে বাড়ী ফিরে এসেই হীরু তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে, 'কাকাবাবু এসেছে নাকি?' দিনরাতই আমার কথা ভাবছে। শুনে যে কি ভালই লাগে!

বলতে বলতে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন বটুক বাবু। তার পর চশমা খুলে রুমালে চোখ মুছে বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন। এদিকে আমার জুতোয় একটা পেরেক উঠেছিল, আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ঠুকে সেটা ঠিক করতে লাগলাম।

এমন সময় দেখি একটী ভদ্রলোক এসে আস্তে আস্তে দরজার কড়া নাড়লেন। ভয়-পাওয়া চড়ুই পাখীর মত তাঁর চাউনি। চাকর এসে দরজা খুলে দিল। ভদ্রলোক বাড়ীতে না ঢুকে তাকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাকাবাবু এসেছে নাকি রে?'

চাকরটা জবাব দিল, 'এজ্ঞে, তিনি এই মাত্তোর এস্‌তেছেন। ওপর বাগে যেয়েছেন।'

শুনে ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না। আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পালিয়ে গেলেন। দেখলাম, তিনি বার বার পেছন ফিরে দেখছেন যে কেউ দোতলা থেকে তাঁকে দেখছে কিনা।

জুতো জোড়া হাতে নিয়ে আমিও বাড়ীর দিকে রওনা হ'লাম।

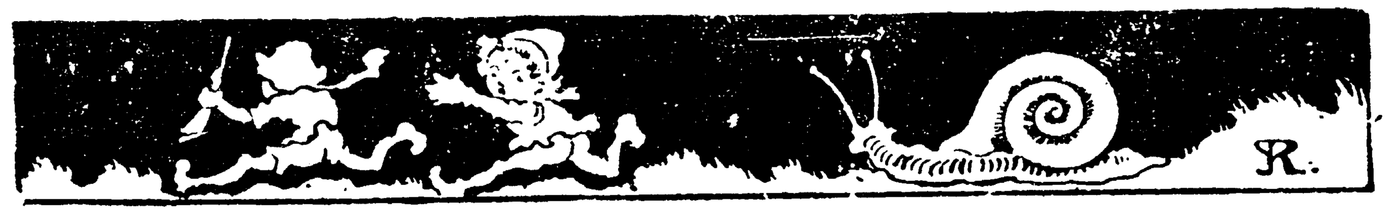

তিনটি প্রশ্ন

শ্রীশান্তা দেবী

রাজামশাই বড় চিন্তায় পড়ে গেছেন। রাজা হবার পর থেকেই তিনি ভেবেছিলেন এমন ভাবে রাজকার্য্য চালিয়ে যাবেন যার মধ্যে কেউ কোন খুঁত খুঁজে পাবে না। "আদর্শ রাজা" বলতে লোকে তাঁরই নাম করবে সকলের আগে। কিন্তু এখন দেখছেন রাজা হওয়ার ঝঞ্ঝাট বড় কম নয়। প্রত্যেকটা কাজ সুরু করতে হ'লে ঠিক কোন্ সময়টা তার উপযুক্ত সময় এ নিয়ে বেশ গোলমালে পড়তে হয়। তার পর কোন সময়ে ঠিক কোন্ লোকটি যে সকলকার চেয়ে প্রয়োজনীয় এও ঠিক করা বড় মুশ্‌কিল। তা ছাড়া কোন্ সময়ে কোন্ কাজটা সব চেয়ে দরকারী এ নিয়েও কম মাথা ঘামাতে হয় না। অন্ততঃ এ তিনটে সমস্যার উত্তর যদি কেউ ঠিক ঠিক বলে দিতে পারত তা হ'লে হয়তো তাঁর ভাবনা ঘুচত। শেষে রাজামশাই ঘোষণা করে দিলেন, যে তাঁর এই তিনটি প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারবে তাঁকে তিনি দেবেন প্রচুর পুরস্কার।

পুরস্কারের লোভে নানা দেশ থেকে লোক আসতে লাগ্‌ল, বড় বড় পণ্ডিতে রাজসভা ছেয়ে গেল; কিন্তু না, কারও উত্তরই রাজার মনে ধরল না। শেষে তিনি ঠিক করলেন নিজেই বেরোবেন উত্তরের সন্ধানে।

হঠাৎ রাজামশাই খবর পেলেন—বনের মধ্যে থাকেন এক সাধু, তিনি নাকি পরম জ্ঞানী। তাঁর কাছে হয়তো এ প্রশ্নগুলির উত্তর মিলতে পারে। সাধু কিন্তু বনের বাইরে কোথাও যান না, কোন বড়লোকেরও ধার ধারেন ন। তবে সাধারণ গরীব লোকদের সঙ্গে আলাপ করতে তিনি ভালবাসেন।

বনের মধ্যে কিছু দূরে দেহরক্ষী সেনাদের রেখে রাজামশাই সাধারণ লোকের মত পোষাক পরে নিলেন, তার পর একা একা পায়ে হেঁটেই হাজির হলেন গিয়ে সাধুর আশ্রমে।

গিয়ে দেখেন সাধু কোদাল দিয়ে একমনে মাটী কোপাচ্ছেন। রাজা সরাসরি তাঁর কাছে প্রশ্ন ক'টির উত্তর জানতে চাইলেন। সাধু ধীর ভাবে প্রশ্নগুলি শুনলেন কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না, যেমন মাটী কোপাচ্ছিলেন তেমনি কোপাতে লাগলেন। পরিশ্রমে তাঁর গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল।

রাজা এবার এগিয়ে এসে বললেন, "আপনাকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে. আপনি বরঞ্চ একটু বিশ্রাম করুন, আমি একটু মাটী কোপাই।" সাধু বিনা বাক্যব্যয়ে কোদালটা রাজার হাতে তুলে দিলেন।

রাজামশাই মাটী কুপিয়েই চলেছেন, সাধু আর প্রশ্নের জবাব দেবার নাম করেন না। দেখতে দেখতে কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল, রাজা দস্তুরমত হাঁপিয়ে উঠলেন। ওদিকে বেলাও কাবার হয়ে গেল, ঘনিয়ে এল সাঁঝের অন্ধকার।

রাজামশাই কোদাল রেখে সাধুকে আবার প্রশ্ন তিনটির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, বললেন, "আপনি যদি বলতে না পারেন, আমাকে বিদায় দিন।"

এমন সময় একজন লোক বনের ভিতর থেকে বিদ্যুৎ-বেগে বেরিয়ে এল। তার মুখ দেখে মনে হ'ল যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। কাছে আসতেই দেখা গেল তার পেটে একটা গভীর ক্ষত, এবং সেটা বেয়ে টপ্ টপ্ ক'রে রক্ত পড়ছে। আশ্রমের কাছে এসেই সে চীৎকার করে মাটীতে লুটিয়ে পড়ল।

রাজামশাই সাধুর সাহায্যে তাকে ধরাধরি করে তুলে ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন, ক্ষতস্থান ভাল করে ধুয়ে নিজের কাপড় ছিঁড়ে সেখানটা ভাল করে বেঁধে দিলেন। মনে হ'ল লোকটা যেন একটু আরাম বোধ করছে। এবারে সে চোখ মেলে চাইল। রাজা মশাই তার মুখে একটু জল এনে দিতেই সে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ল, তার পর আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল। রাজা দরজার গোড়ায় বসে রইলেন; সারাদিনের পরিশ্রমে তাঁরও ক্লান্তি আসছিল। ওদিকে রাতও হয়েছিল বেশ। একটু পরে তিনিও ঘুমে ঢুলে পড়লেন।

যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন বেশ বেলা হয়েছে। আহত লোকটিও জেগেছে এবং এক দৃষ্টিতে রাজামশাইএর দিকেই তাকিয়ে আছে। হঠাৎ সে করুণ কণ্ঠে বলে উঠল, "মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন।"

রাজা তো অবাক্। এ লোকটা তা হ'লে তাঁকে চেনে! কিন্তু ক্ষমা চাইছে কেন? কি অপরাধ করল সে!

লোকটি বুঝল, বল্‌ল, "আপনি আমায় চেনেন না কিন্তু আমি আপনাকে খুব ভাল ক'রেই চিনি; এবং, বলতে কি, আজ যে আমি এই বনে এসেছিলাম সে শুধু আপনাকে হত্যা করবার জন্যই। কিছুদিন আগে আমার ভাই একটা গুরুতর অপরাধ করায় আপনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন এবং তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। তাই আমি ঠিক করেছিলাম আপনাকেও হত্যা ক'রে তার শোধ নেব। আপনি এই আশ্রমে এসেছেন জানতে পেরে আমি বনের মধ্যে লুকিয়েছিলাম আপনাকে ফেরার পথে মারব ব'লে। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেল, আপনি আর ফিরলেন না, এবং শেষে আপনার রক্ষীরা আমায় দেখে ফেল্‌ল। তাদেরই অস্ত্রে আমি আহত হয়েছি। কিন্তু এখন দেখছি যাঁকে আমি মারতে চেয়েছিলাম তিনিই আমায় জীবন দান করলেন। আপনার এ ঋণ আমি কি দিয়ে শোধ করব? আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন জেনে রাজামশাই খুসীই হলেন; লোকটিকে অভয় দিয়ে তিনি এলেন সাধুর খোঁজে। সাধু তখন আগের দিনকার কোপানো জায়গাটায় বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন, রাজাকে দেখে সুপ্রভাত জানালেন।

"আমি কিন্তু এখনও আমার প্রশ্ন তিনটির জবাব পাই নি!" রাজা মশাই ভূমিকা না ক'রে জানালেন।

"কেন, প্রশ্নের জবাব তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে!"

"বাঃ, কখন?"—রাজামশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

সাধু বললেন, "কালকের ঘটনাগুলি ভাল ক'রে ভেবে দেখুন। আপনি যদি কাল আমার ক্লান্তি দেখে দয়া করে আমায় সাহায্য করতে এগিয়ে না আসতেন্ তা হ'লে কালই আপনাকে ফিরে যেতে হ'ত এবং ফিরবার পথে ঐ লোকটির হাতে হয়তো আপনার মৃত্যু হ'ত। সুতরাং কাল ঐ সময়টাই ছিল আপনার কাজ সুরু করার সব চেয়ে উপযুক্ত সময়। আর সেই সময়ে আমিই ছিলাম আপনার কাছে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় লোক এবং আমার উপকার করাই ছিল আপনার সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ।

"তারপর ঐ লোকটি এল আহত অবস্থায়। তখন ওর সেবা করাই হ'ল আপনার সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ। নইলে ও মারা যেত এবং আপনার সংস্পর্শে এসে ওর মনের যে পরিবর্তন হ'ল তা হ'ত না। সুতরাং ঐ লোকটিই তখন আপনার কাছে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় লোক এবং ঐ সময়টাই ছিল আপনার সেবা-কার্য্য সুরু করার সব চেয়ে উপযুক্ত সময়।"

"অর্থাৎ?—"

তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে সাধু বললেন, "অর্থাৎ সমস্ত কাজই সুরু করার উপযুক্ত সময় হচ্ছে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত। কারণ ওই সময়টুকুর ওপরই আমাদের যা কিছু হাত আছে; পরে কি হবে কেউ বলতে পারে না। আর এই মুহূর্ত্তে আপনি যার সঙ্গে রয়েছেন সেই হচ্ছে আপনার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় লোক। পরে তার সঙ্গে কাজ করার সুবিধা হবে কিনা তাও কেউ বলতে পারে না। এবং তখন সব চেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে ঐ লোকটির উপকার করা। কারণ কেবল ঐ উদ্দেশ্যেই ভগবান্ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।" *

* বিখ্যাত রুশ গল্প থেকে।

ভ্রম সংশোধন

গত চৈত্র সংখ্যায় 'আমাদের কলকাতা' লেখাটিতে অসতর্কতার জন্য কয়েকটি ভুল ছাপা হয়েছিল। চার্ণকের কবর যে জায়গাটায় তার নাম সেণ্ট জন্ গীর্জ্জা—তারই প্রাঙ্গণে ঐ কবর। অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভও ঐখানেই রাখা হয়েছে। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম্ দুর্গের নামকরণ হয় রাজা ৩য় উইলিয়ামের নামে, প্রথম দুর্গটি তৈরী হয় তাঁরই রাজত্বকালে।

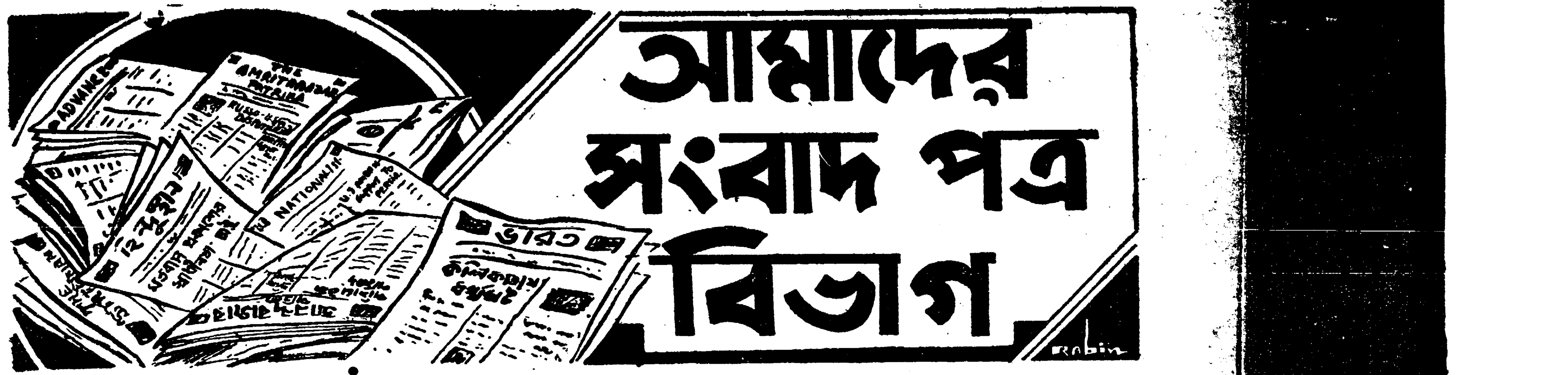

মানভূম-সমস্যা

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ ভাগ করার দাবী উঠলে পাছে বিহারের বাংলা ভাষাভাষী জেলাগুলো আগেকার মত আবার বাংলায় ফিরে যায় এ জন্য বিহার সরকার—বিশেষতঃ তাঁদের কয়েকজন উৎকট-কর্ম্মী কর্ম্মচারী নানা অস্বাভাবিক উপায়ে সেখানকার বাঙ্গালীরা যে বাঙ্গালী নয় তাই প্রমাণ করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। এর ফলে মানভূম জেলার বাঙ্গালী-সমাজের ওপর নানা নির্য্যাতনও সুরু হয়েছে। সেখানকার ইস্কুলে এতদিন বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হ'ত, আদালতে বাংলা ভাষার চল ছিল, সে সব বন্ধ হয়েছে। এক কথায় বাঙ্গালীকে তার মাতৃভাষা, তার পূর্ব্বপুরুষের সংস্কৃতি ভুলতে বাধ্য করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য মানভূমবাসীর পক্ষে স্বাধীনতা-অর্জ্জনের পরই এই সব অন্যায়-অবিচার সহ্য করা সম্ভব হয় নি—ফলে সেখানকার বহু নিষ্ঠাবান্ কংগ্রেসী গান্ধীজির আদর্শে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সুরু করেছেন। একদল গুণ্ডা শ্রেণীর লোক এঁদের বিরুদ্ধে পাল্টা আন্দোলন করতে গিয়ে নানা রকম হিংসাত্মক আক্রমণ চালাচ্ছে, কিন্তু আশ্চর্য্য, বিহার সরকার এ বিষয়ে নির্ব্বিকার,—মনে হচ্ছে তাঁরা যেন গুণ্ডা দলকেই প্রশ্রয় দিতে চান। এমন কি বিহার ব্যবস্থা পরিষদে দাঁড়িয়ে এক উৎসাহী "কংগ্রেসী" সদস্য হুমকি দিয়েছেন—অন্য কোন দেশ হ'লে নাকি মান-ভূমের আন্দোলনকারীদের (সত্যাগ্রহীদের?) কামানের গোলায় উড়িয়ে দেওয়া হ'ত!

ক্ষুদিরামের স্মৃতি

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে মজঃফরপুর সহরে ক্ষুদিরাম বসু নামে ১৮ বছর বয়সের একটি বাঙ্গালী কিশোর দেশের সম্মান রাখবার জন্য এক বিদেশী বর্ব্বর রাজকর্ম্মচারীর উদ্দেশে বোমা নিক্ষেপ করে। ভুলক্রমে আসল অপরাধী পার পেয়ে যায়, কয়েকটি নিরপরাধের প্রাণহানি হয়। কিশোরটি ধরা পড়ে এবং হাসিমুখে ফাঁসীর মঞ্চে জীবন বিসর্জ্জন দেয়। এই ঘটনা ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে অমর হয়ে আছে এবং পরবর্ত্তীকালে বহু দেশপ্রেমিককে স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে। সম্প্রতি মজঃফরপুরে যে জায়গায় ক্ষুদিরাম তার বোমা ফেলেছিল সে জায়গাটিতে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে এবং তার ভিত্তিপ্রস্তর বসানো হয়ে গেছে। কথা ছিল ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল এই ভিত্তিপ্রস্তর বসাবেন, কিন্তু তিনি শেষ মুহূর্ত্তে

এই ব'লে আপত্তি জানান যে ক্ষুদিরামের অবলম্বিত পন্থা কংগ্রেসের অহিংস নীতির সঙ্গে খাপ খায় না। পণ্ডিতজীর এই উক্তিতে স্বাধীনতার পূজারী অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। অনেক কংগ্রেসী নেতাও তাঁর সঙ্গে একমত হ'তে পারেন নি। তাঁদের মতে ক্ষুদিরামের আত্মবিসর্জ্জন সিপাহী-যুদ্ধের মতই এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সে যুগে কংগ্রেসের অহিংসবাদের সৃষ্টি হয় নি, এবং ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে একশ' বছর এগিয়ে দিয়ে গেছে। পরবর্ত্তী কালে কংগ্রেস, এমন কি গান্ধীজিও, এমন বহু দেশপ্রেমিককে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন যাঁদের কর্ম্মপন্থা অহিংস ছিল না, কিন্তু লক্ষ্য ছিল একই।

পরলোকে বীরবল সাহানী

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বীরবল সাহানীর মৃত্যুতে দেশ সত্যিকারের একটি সুসন্তানকে হারাল। বীরবল ছিলেন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ এবং এ দিক্ দিয়ে তাঁর খ্যাতি ছিল আন্তর্জ্জাতিক। বহু বিদেশী বিদ্বজ্জন-সভা তাঁকে নানা ভাবে সম্মানিত করেছিল, ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটিও তাঁকে সদস্য পদে বরণ করেছিল। আর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের তো কথাই নেই! প্রাচীন যুগের উদ্ভিদ্ নিয়ে তিনি যে গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তাই তাঁকে অমর ক'রে রাখবে।

আর একটি নতুন সাধারণতন্ত্র

১৮ই এপ্রিল ইষ্টারের পুণ্য সোমবারে আয়াল্যাণ্ড ইংলণ্ডের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে স্বাধীন সাধারণতন্ত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করল। আয়াল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভারতের মতই বর্ত্তমান যুগের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯১৬ সনে ঠিক এই তারিখটিতে বিখ্যাত আইরিশ বিদ্রোহ সুরু হয়, যার ফলে বহু দেশপ্রেমিককে বন্দুকের গুলিতে, ফাঁসীর মঞ্চে এবং আরও নানা ভাবে প্রাণ দিতে হয়েছিল। আয়াল্যাণ্ডবাসীরা তাই সেই স্মরণীয় দিনটিকেই তাঁদের পূর্ণ স্বাধীনতার দিন হিসাবে বেছে নিয়েছে।

এবারকার হকি লীগ্

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে কলকাতার হকি লীগ্ প্রতিযোগিতা এবারকার ম'ত শেষ হ'ল। গত বারের বিজয়ী পোর্ট্ কমিশনার্স্ দল এবারেও লীগ্ বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করেছে। রানার্স্ আপ্ বা ২য় স্থান অধিকার করেছে মোহনবাগান দল। এই দুই দলের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল এবং শেষ খেলার আগে পর্য্যন্ত দু'দলেরই ছিল সমান সংখ্যক পয়েন্ট। কিন্তু শেষ খেলায় পোর্ট দল মোহনবাগানকে এক গোলে হারিয়ে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি ক'রে নিয়েছে। পাঞ্জাব স্পোর্টস্ প্রথম দিকে খুব ভাল খেলেও শেষ রাখতে পারে নি। ইষ্ট বেঙ্গল দল শেষ দিকে ভাল খেলেছিল। তালিকার সব চেয়ে নীচে হয়েছে যে দল তারা কোন খেলাতেই জেতা তো দূরের কথা, ড্রও রাখতে পারে নি। লীগের পর বাইটন্ কাপ প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে।

রুণু-টুনুর এড্‌ভেঞ্চার

শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

প্রথম

টুনু

সে হচ্ছে অরণ্যের স্বদেশ। এবং যারা সেখানে বাস করে, সাধারণত জীব হ'লেও তারা মানুষ নয়।

সেখানে বনে বনে ঘুরে বেড়ায় হাতীর পাল, নদীর তীরে তীরে জলপান ক'রতে আসে হরিণের দল এবং এখানে-সেখানে তাদের উপরে হানা দিতে চায় বড় বড় বাঘ। প্রকাণ্ড বন্য বরাহ ও তারও চেয়ে বড় আর হিংস্র বয়ার, নেকড়ে এবং বিষধর সর্প প্রভৃতি এ-সব কিছুরই অভাব নেই সেখানে।

সে যেন সবুজের সাম্রাজ্য। বন আর বন আর বন এবং মাঝে মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের পর পাহাড়! কত রকম বড় বড় গাছ, কত রকম ফুলন্ত লতা এবং মাঝে মাঝে ঘাসের মখমলে ঢাকা শ্যামল মাঠ। কত রঙের কত রকম বনফুল, আদর ক'রে কেউ তাদের নাম রাখেনি আজ পর্য্যন্ত। এখান থেকে বহুদূরে নির্ব্বাসিত হ'য়ে আছে নাগরিক সভ্যতা। স্নিগ্ধ শ্যামলতায় চোখ জুড়িয়ে যায়, বিহঙ্গ-রাগিণীর ঝঙ্কারে শ্রবণ পূর্ণ হয়ে যায়, কলনাদিনী তটিনীর নৃত্যলীলা দেখে পরিতৃপ্ত হয়ে যায় নয়ন-মন।

সারা বনভূমি জুড়ে দিনের বেলায় গাছের উপরে বা গাছের নীচে খেলা করে ময়ূর-ময়ূরী, হিমালয়ের পারাবত, বন্য হংস ও আর আর নানান জাতের রঙ-বেরঙের পাখী। যতক্ষণ আকাশের পটে মাখানো থাকে রোদের সোনালী,

ততক্ষণ তাদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ছন্দ রেখে জেগে থাকে অরণ্যের অশ্রান্ত মর্ম্মরধ্বনির কাব্যসঙ্গীত।

কিন্তু সন্ধ্যা এসে যেই আলো মুছে চারিদিকে মাখিয়ে দেয় অন্ধকারের কালো রঙ, তখনি থেমে যায় মর্ম্মর-সঙ্গীতের সঙ্গে গীতকারী বিহঙ্গদের সঙ্গত। তারপরে সেখানে জাগ্রত হয় যে-সব ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি, তা শ্রবণ ক'রলে মনের মধ্যে পাওয়া যায় না কিছুমাত্র আশ্বস্তির ইঙ্গিত। গাছে গাছে পেচকদের চীৎকার আনে অমঙ্গলের সম্ভাবনা এবং বনে বনে ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুদের ভৈরব গর্জ্জনে সর্ব্বাঙ্গ হ'য়ে ওঠে রোমাঞ্চিত। থেকে থেকে শোনা যায় আসন্ন মৃত্যুর কবলগত আহত জীবদের আর্ত্তনাদ। কখনো হুড়মুড় ক'রে ঝোপঝাপ তুলিয়ে ও পদশব্দে পৃথিবীর মাটি কাঁপিয়ে ছুটে চ'লে যায় বন্য বরাহের দল। আবার কখনো বা শোনা যায় হস্তিজননীর কাতর আহ্বান-ধ্বনি —হয়তো জঙ্গলের কোথায় হারিয়ে গিয়েছে তার শাবক। কখনো অন্য কোথাও জাগে বিষম এক ঝটপটানির শব্দ—হয়তো অজগরের মৃত্যুপাকে জড়িয়ে পড়েছে কোন হতভাগ্য হরিণ।

যতক্ষণ থাকে রাত্রি, যতক্ষণ থাকে অন্ধকার, যতক্ষণ আকাশে ওড়ে বাদুড় আর পেচকরা, ততক্ষণ কিছুতেই নিঃশব্দ হ'তে পারে না অরণ্যের নির্জ্জনতা। ধ্বনি আর ধ্বনি আর ধ্বনি এবং প্রত্যেক ধ্বনি দিচ্ছে কেবল মৃত্যুর আর হত্যার আর রক্তপাতের সাংঘাতিক ইঙ্গিত। এমন কি, দিনের বেলায় বনস্পতিদের যে মর্ম্মরধ্বনির মধ্যে পাওয়া যায় কাব্যের আনন্দ, রাত্রে ভয়াল অন্ধকারের ছোঁয়াচ পেয়ে সে-ধ্বনিও হয়ে ওঠে ভয়াবহ। বাতাসে গাছের পরে গাছ ন'ড়ে ন'ড়ে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় পৃথিবীর উপরে যেন বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলছে অপার্থিব অভিশপ্ত আত্মারা। বনের আনাচে কানাচে যে-দিকে চলে দৃষ্টি, সেই দিকেই যেন ওৎ পেতে অপেক্ষা ক'রে থাকে কোন না কোন মূর্ত্তিমান্ ও মারাত্মক বিপদ। এখানকার একমাত্র নীতি হচ্ছে—হয় মারো, নয় মরো। দয়ামায়া আসতে পারে না এখানকার ত্রিসীমানায়।

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর স্থানেও মানুষের আনাগোনা বন্ধ নেই। কাঠ কাটবার বা মধু সংগ্রহের জন্যে এখানে আসে অনেক লোক। ব্যাধরা বেড়ায় জঙ্গলে জঙ্গলে পশুপক্ষী বধ বা বন্দী করবার জন্যে। আরো নানা কাজে আসে আরো নানান্ রকম লোক। তারা অনেকেই হিংস্র পশুর পাল্লায় প'ড়ে প্রাণ

দেয়, কিন্তু নাগরিক মানুষের তাগিদ মেটাবার জন্যে তবু তাদের এখানে আসতে হয় বারংবার। তারা সবাই যে প্রত্যহ বনে এসে আবার বন ছেড়ে বাইরে চ'লে যায়, তা নয়; তাদের অনেকেই বনের এখানে সেখানে দল বেঁধে বসতি স্থাপন করে। এবং সেই সব বসতির ভিতরে তাদের সঙ্গে থাকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও।

যেখান থেকে সবে আরম্ভ হয়েছে বনের রেখা, সেইখানেই এক জায়গায় আছে একখানি বাংলো। সেই বাংলোর ভিতরে বাস করেন অরণ্যপাল বা বনরক্ষক। জাতে তিনি বাঙালী, নাম তাঁর অসিতকুমার রায়। আমাদের কাহিনী সুরু হবে এই বাংলোখানি থেকেই।

ছোটখাটো বাংলো। খান তিনেক ঘর। তার পরেই একটুখানি উঠোনের মত জায়গা এবং তার পরেই আরো তিনখানি ছোট ছোট মেটে ঘর। রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর ও দাসদাসীদের থাকবার ঘর। বাংলোর চারিপাশেই আছে খানিকটা ক'রে খোলা জমি। তার মধ্যে আছে শাক-শব্জী ও ফুলগাছ দিয়ে বাগান-রচনার চেষ্টা। জমির চারিদিকেই বাঁশ ও লতাপাতার সাহায্যে বেড়া দেওয়া হয়েছে।

সকাল। ঝিলমিলে গাছের সবুজের উপরে চিকণ রোদের স্বচ্ছ সোনার পাত। চারিদিকে গানের আসর জমিয়েছে কোকিল, শ্যামা ও অন্যান্য পাখীর দল এবং তারই মধ্যে থেকে থেকে ছন্দপাত করছে বেসুরো কাকের দল।

বাংলোর বারান্দায় একটি গোল টেবিলের ধারে ব'সে অসিত ও তার স্ত্রী সুরমা প্রভাতী চা পান করছিল। অসিতের বয়স তিরিশের বেশী নয় এবং সুরমা তারও চেয়ে দশ বছরের ছোট। টেবিলের আর এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মেয়ে রেণুকা, ডাক নাম টুনু। এই মেয়েটি ছাড়া তাদের আর কোন সন্তান হয় নি।

টুনুর বয়স বছর পাঁচ। ফুটফুটে গায়ের রঙ, মুখখানি সুন্দর। ঠিক যেন একটি জ্যান্ত মোমের পুতুল।

টুনু এখনো চা খেতে শেখেনি, কিন্তু তার লোভ চায়ের সঙ্গের খাবার-গুলোর দিকে। দু'খানি বিস্কুট ও একখানি জেলি-মাখানো খণ্ড রুটি পেয়ে টুনু যখন বুঝলে আপাতত আর কোন খাবার পাবার আশা নেই, তখন মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলি দুলিয়ে নাচতে নাচতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল বাংলোর বাগানে।

রোজ সকালে-বিকালে টুনুর খেলার জায়গা ছিল এই বাগানটি। এরই মধ্যে ব'সে ব'সে সে ধুলো-মাটি দিয়ে ঘর বানায়, লতাপাতা ছিঁড়ে রান্না করে খেলাঘরের তরকারি। তার আরো অনেক রকম খেলা আছে, সে সবের কথা এখানে না বললেও চলবে। সেদিন টুনু বাগানের এদিকে ওদিকে একটু ছুটোছুটি ক'রেই দেখতে পেলে, একটা ফুলগাছের উপরে ব'সে আছে মস্ত একটি প্রজাপতি। কী চমৎকার তার ডানা দু'টির রঙ্! রামধনুকেও অত রকম রঙের বাহার থাকে না! অতএব টুনুর আজকের খেলা হ'ল ঐ প্রজাপতিটিকে বন্দী করবার চেষ্টা।

কিন্তু প্রজাপতি ধরা দেয় না। টুনু যেই তার কাছে যায়, অমনি সে ফুস্ ক'রে এ-গাছ থেকে উড়ে অন্য গাছে গিয়ে বসে। টুনুর রোখ চেপে গেল, আজ সে ঐ প্রজাপতিটিকে ধরবেই ধরবে। প্রজাপতি ডানা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে যত ওড়ে, টুনুও তার পিছনে পিছনে তত ছোটে। সে যেন এক নতুন রকম মজার চোর-চোর খেলা।

প্রজাপতি উড়ছে, টুনুও হাত বাড়িয়ে ছুটছে। প্রজাপতি উড়তে উড়তে বাগানের ফটক পেরিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল, টুনুও তার পিছু ছাড়লে না। তার দৃষ্টি আর কোন দিকেই নেই এবং তার চোখের সুমুখ থেকে যেন মুছে গিয়েছে ঐ প্রজাপতি ছাড়া পৃথিবীর আর সব দৃশ্যই। সে কোন দিনই বাগানের ফটকের বাইরে যায় না, বাপ-মায়ের মানা আছে। কিন্তু আজ সে যে ফটকের বাইরে চ'লে গিয়েছে, এ খেয়ালও তার ছিল না।

প্রজাপতি উড়ে পালায়, টুনুও ছোটে পিছনে পিছনে। প্রায় মিনিট দশ ধ'রে চলল এই ছুটোছুটি। রোদের তাপ লেগে টুনুর কচি মুখখানি রাঙা হ'য়ে উঠল, কপালে দেখা দিলে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। তা'র ছোট ছোট পা দু'খানি শ্রান্ত হয়ে এল, তবু প্রজাপতির সঙ্গ ছাড়তে পারলে না।

অবশেষে একটা ঝোপের কাছে এসে প্রজাপতি হঠাৎ আকাশের দিকে উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়। টুনু খানিকক্ষণ আকাশের দিকে চোখ তুলে হতাশ ভাবে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল এবং দুষ্ট প্রজাপতির এই অন্যায় ও অসঙ্গত ব্যবহার দেখে তা'র নরম ঠোঁট দুখানি ফুলে ফুলে উঠতে লাগল দারুণ অভিমানে।

এতক্ষণ পরে তার হুঁস হ'ল, সে বাগানের ফটক পেরিয়ে এসেছে। চারদিকে তাকিয়েও সে তার বাড়ী বা বাগান দেখতে পেলে না। এখানে চারদিকেই রয়েছে জঙ্গল আর ঝোপঝাড়। কোন্ দিকে তাদের বাড়ী আছে, তা-ও সে বুঝতে পারলে না। শেষটা আন্দাজে, একটা দিক্ ধ'রে আবার ছুটতে সুরু করলে।

কতক্ষণ ধ'রে সে ছুটলে, তা' সে জানে না। তবে এটুকু বুঝলে, যতই সে ছুটছে, জঙ্গল হয়ে উঠছে ততই নিবিড়। এদিকে নিশ্চয়ই তাদের বাড়ী নেই।

তখন সে আর একদিক্ ধ'রে আবার ছুটতে লাগল। কিন্তু অনেকক্ষণ ধ'রে ছুটে সেদিকেও বাড়ী পাওয়া গেল না, কেবল অরণ্য হয়ে উঠল আরও গভীর।

তখন বনের কাঁটাঝোপে লেগে তার ঘাগরার নানা জায়গা গেছে ছিঁড়ে এবং পায়ে কাঁটা ফুটে বেরুচ্ছে রক্ত। টুনু আর ছুটতে পারলে না, সেইখানেই ব'সে প'ড়ে সভয়ে করুণ স্বরে কেঁদে উঠল—"মামণি, বাবা গো!"

কিন্তু মা বা বাবার কোনই সাড়া পাওয়া গেল না।

ওদিকে চা-পানের পর খানিকক্ষণ ব'সে ব'সে গল্প করলে অসিত ও সুরমা। টুনু এমন সময় রোজই বাগানের ভিতরে গিয়ে খেলা করে, সুতরাং তার জন্যে তাদের কোনই ভাবনা হ'ল না।

তার পর সুরমা বললে, "টুনু বাগানে গিয়ে কি করছে বল তো? কালকের মত আজও আবার ফুলগাছ ছিঁড়ছে না তো?"

অসিত বললে, "টুনু দিনে দিনে ভারি দুষ্ট হয়ে উঠছে। তুমি একবার গিয়ে দেখ তো, সে কি- করছে!"

সুরমা নিশ্চিন্ত ভাবেই বাগানের দিকে নেমে গেল। তার খানিক পরেই তাড়াতাড়ি ব্যস্ত ভাবে ফিরে এসে বললে, "ওগো, টুনু তো বাগানের ভেতরে নেই!"

অসিত বললে, "বাগানের ভেতরে নেই! সে কি?—টুনু! টুনু! ও টুনু!"

ডাকাডাকির পরেও টুনুর কোনই সাড়া পাওয়া গেল না। অসিত তখন উদ্বিগ্ন মুখে বাগানের বাইরে চ'লে গেল দ্রুতপদে।

সুরমা সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলে, অসিত খুব চেঁচিয়ে "টুনু, টুনু" ব'লে বারবার ডাকাডাকি করছে। স্বামীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই দূরে, আরো দূরে চ'লে গেল, তারপর ক্রমেই ক্ষীণ হ'য়ে আর তা শোনা গেল না।

সুরমার মায়ের প্রাণ ভয়ে তখন সারা হয়ে উঠেছে। সে তো জানে, বাগানের বাইরে এই বনের ভিতরেই আছে কত রকম বিপদ-আপদ! কাঠের পুতুলের মতন আড়ষ্ট হ'য়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

একঘণ্টা কেটে গেল, তখনো অসিত বা টুনুর দেখা নেই। নিশ্চয়ই এখনো টুনুকে পাওয়া যায় নি, নইলে এতক্ষণে তা'র স্বামী নিশ্চয়ই ফিরে আসত। নানা রকম অমঙ্গলের দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে কেটে গেল আরো অনেকক্ষণ। সুরমার দু'চোখ দিয়েই ঝরছে তখন অশ্রুজল।

আরো কতক্ষণ পরে অসিত ফিরে এল মাতালের মত টলতে টলতে। স্বামীর ভাবভঙ্গী দেখেই সুরমার বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে খুঁজে পাওয়া যায় নি তার বুকের নিধিকে। অসিত বারান্দায় উঠে ধুপ ক'রে একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে পড়ল, কিন্তু কোন কথাই কইতে পারলে না।

আশার বিরুদ্ধেও আশা ক'রে সুরমা থেমে থেমে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "টুনুকে খুঁজে পেলে না?"

—"না। সে বনের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে।"

তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ ক'রে সুরমা অজ্ঞান হয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

(ক্রমশঃ)

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

নতুন বছরে রামধনুর নতুন জন্মদিনে আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। এই সুযোগে তোমাদের লেখা যে অসংখ্য চিঠি আমার সামনে স্তূপাকার হয়ে আছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এর সবগুলির মধ্যেই যে রামধনুর জন্য রাশি রাশি স্নেহ ছড়ান! অনেকে আমার শারীরিক অসুস্থতার কথা শুনে উদ্বেগও প্রকাশ করেছ। এর পরেও কি আর বিছানায় পড়ে থাকতে পারি? তবে ডাক্তারেরা খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বড় উৎপাত সুরু করেছেন। আরও বেশ কিছু দিন নাকি অনেক কিছুই খাওয়া চলবে না। কি ভীষণ কথা বল দেখি!

কিন্তু নিজের কথা যাক্, এবার তোমাদের কথা বল।

মানভূম থেকে একটি গ্রাহক সেখানকার সাম্প্রতিক অবস্থার বিবরণ দিয়ে যে চিঠি দিয়েছেন তা পড়লে ক্ষোভের অন্ত থাকে না। মনে হয় এত দিনের সংগ্রামের পর এই কি হ'ল

আমাদের স্বাধীনতা! নিজের মাতৃভাষাটুকুও শিখবার অধিকার পাব না? তিনি লিখেছেন, "আমরা কেউই হিন্দী শেখার বিরোধী নই, বরঞ্চ রাষ্ট্রভাষা হিসাবে (যদিও সে সম্বন্ধে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি) সে ভাষা শিখতে আমাদের আগ্রহ কারো চেয়ে কম নয়। কিন্তু বাংলা ভাষা—নিজের মাতৃভাষা ভুলে গিয়ে বলতে হবে "হিন্দীই আমার মাতৃভাষা"—এ অন্যায় জুলুম আমরা কিছুতেই মানব না—মানব না—মানব না!...আজকাল এ প্রদেশের অনেকে আবার বলতে সুরু করেছেন 'হিন্দী হচ্ছে ভারতের জাতীয় ভাষা।' এই অসত্য বাক্যেরও আমরা প্রশ্রয় দিতে রাজী নই। রাষ্ট্রভাষা যাই হোক না কেন, বাঙ্গালীর—তা সে মানভূমেরই হোক, পশ্চিম বাংলারই হোক্ বা পূর্ব্ব বাংলারই হোক্, জাতীয় ভাষা চিরদিন বাংলাই থাকবে।" আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এ কথা সমর্থন করি। এর মধ্যে প্রাদেশিকতার কিছু নেই—আছে আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা।

বাংলা ভাষার প্রতি একটা উৎকট—অহেতুক বিদ্বেষ শুধু বিহারে নয়, কিছুটা উড়িষ্যায় এবং বিশেষ ক'রে আসামেও নানা জায়গায় সুরু হয়েছে। বিহার ভাবছে—এ না করলে বাংলা ভাষাভাষী জেলাগুলি বুঝি বিহার থেকে ফস্‌কে পশ্চিম বঙ্গে চলে যাবে! আসামে, শুনতে পাই, স্কুলে বাংলায় পড়ান থেকে সুরু করে বাঙ্গালীর দোকানের বাংলা হরফে লেখা সাইন-বোর্ড্‌গুলি পর্য্যন্ত এই আক্রোশের লক্ষ্য হচ্ছে। আসাম-প্রবাসী বাঙ্গালীরা এবং বাংলা ভাষাভাষী আসামবাসীরা নিজেদের সুবিধার জন্য অসমীয় ভাষা নিশ্চয়ই শিখবে এবং তাকে যথোচিত শ্রদ্ধাও করবে, কিন্তু তার জন্য মাতৃভাষাকে ভুলতে যাবে কেন? এ বিষয়ে আসামের গভর্ণর যুক্তপ্রদেশবাসী শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ সেদিন নববর্ষ উপলক্ষ্যে শিলংএর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে যে সুন্দর কথাগুলি বলেছেন তা প্রত্যেক আসামবাসীর ভেবে দেখা উচিত। জোর ক'রে অপরের ওপর নিজের ভাষা চাপিয়ে দেবার চেষ্টাকে তীব্র নিন্দা ক'রে তিনি বলেছেন, ভারতে বাংলার মত এমন সুন্দর ভাষা—এমন সুন্দর সাহিত্য নেই। বাংলা ভাষা নিজের অধিকারে বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতীয়ের এই ভাষা শেখা উচিত। বলা বাহুল্য তিনি নিজে এ ভাষার রস আস্বাদন করেছেন ব'লেই এ কথা বলতে পেরেছেন।

আর একটি গ্রাহকের চিঠি বেশ মজার লাগ্‌ল।—"আমি বোধ হয় আগামী বৎসর আর গ্রাহক থাকব না। কিন্তু রামধনুর উপর আমার একান্ত ভালবাসা ও ভক্তি রইল জানবেন। আবার যদি কোন দিন ছোটদের পত্রিকার গ্রাহক হই তো একমাত্র রামধনুরই হব। আপনি যেন মনে করবেন না যে যাবার বেলায় রামধনুকে বেশ একটু তোয়াজ করে যাচ্ছি। ও রকম কাজ আমার নয়। এত কথা না ব'লে পারলাম না কারণ আমি রামধনুকে ভালবাসি। তাই যাবার সময় ঠিক যেতে পারছি না।"

গ্রাহক শ্রীঅরুণ সান্যালের কাছ থেকে একটি করুণ চিঠি পেলাম। তাঁর ছোট বোন ডলি—যে নাকি রামধনুকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাস্‌ত, সে আর নেই। খবরটিতে আমরাও আত্মীয়বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করছি। কি ব'লে সান্ত্বনা দেব?

এ মাসের রামধনুতে আরও কয়েকটি নতুন বিভাগ দেবার ইচ্ছা ছিল। বারান্তরে তার ব্যবস্থা হবে। আবার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মত ছুটী নেই। জয় হিন্দ।—ইতি রাঃ সঃ

কয়েকজন্ নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মাথার চুল পরীক্ষা ক'রে মানুষের জাতি নির্ণয়ের প্রথা বার করেছেন। তাঁদের মতে চীন ও জাপানের লোকদের, অর্থাৎ মঙ্গোলিয়ান্‌দের, চুল সব চেয়ে ভারী; তার পর কালো চুলওয়ালা জাতির, কটা চুলওয়ালা জাতির এবং সব শেষে নিগ্রোদের। পুরুষের মাথার চুল মেয়েদের চেয়ে সাধারণতঃ শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ বেশী ভারী।

* * *

তূলোর বীচিকে তোমরা হয়তো তাচ্ছিল্য কর, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা ওর ভিতর থেকে কত জিনিষ বার করেন শুনবে? রান্নার তেল, গরু-ভেড়ার পুষ্টিকর খাদ্য, জমির সার, নকল রেশম, নকল চামড়া, গদীর ভিতরকার ছোবড়া, মোটা সুতো, দড়ি, কাগজ, ফটো তুলবার ফিল্‌ম্ এবং আরও অনেক কিছু। ফেলে-দেওয়া তূলোর বীচি থেকে এই ভাবে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষ তৈরী হয়ে থাকে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

গয়া, কানপুর, কটক, লাহোর, পাটনা, পুনা, কাশী, কিওটো, নানকিন, ওহিও, কলম্বো, রোম, মিউনিক, হেগ, ডারবান, আমেদাবাদ, নাগপুর, খুলনা, লিভারপুল, সিডনী।

উত্তরদাতাদের নাম:—মঞ্জু, বাপ্পা, কুশ, লব, কাকীমা, মা (ভবানীপুর); সুস্নাত গংগোপাধ্যায় (কলিকাতা ২৬); কৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা ২৯); নমিতা বসু (ভবানীপুর); ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান); তুহিন বসু (কলিকাতা ২০); কনককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পানিহাটী); সবিতা ও এম্. এ, সালেহিন (রাজসাহী); বিজয় পাল (সারেঙ্গা); হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী (চক্রধরপুর); মহিউদ্দীন আহম্মদ (পার্ব্বতীপুর); নীতীশচন্দ্র বসু (টাকী); রুণু ও মা (লক্ষ্ণৌ); বিবেকানন্দ (বাতু) মুখোপাধ্যায় (হাওড়া); অনু, মঞ্জু, বিজলী ঘোষ (বজ্‌বজ্); ছন্দা ঘোষ (এলাহাবাদ); স্বপন, তপন, টুনু, কাকু, মান্তু (কাশীপুর—নৈনিতাল); রামেন্দু, বাবলু, তপন, বুলি, কাত্তিক, গোরা (নাকড়াকোন্দা); অহিভূষণ চৌধুরী (রাজসাহী); নিতাইচন্দ্র রায় (পানিহাটী); দিলীপ সমাদ্দার (ভাঙ্গা); সুব্রত সানাতনি (বনারস); চিত্র, তপন, স্বপন, রঞ্জু, জটাই, মটাই, বাচ্চু, বাসু, আভা, সুমন্ত (নয়া দিল্লী); বুদ্ধদেব ঘোষ (দেওঘর); তরুণকুমার সান্যাল (বর্দ্ধমান); বিভাসবিহারী বসু (পাটনা); শান্তি মুখোপাধ্যায়, শোভাদি (এলাহাবাদ); মুকুল ও বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য (মাদারীপুর); জয়নারায়ণ মিত্র (খড়গপুর); কিরণশংকর মৈত্র (চাঁদকাঠিবাজার); মঞ্জু, রঞ্জু ও গৌরী (দিল্লী); লীলী মুখোপাধ্যায় (খুরজা); নমিতা, সবিতা, সুচেতা, চিত্রলেখা, সমীর, চন্দন মামা (বালীগঞ্জ); বীরু কাকা, মিণ্টু, বেবী, দীপু, অপু, বাচ্চু, রেখা, মমতা (জামসেদপুর); অমলকুমার মিত্র, মনোতোষ মিশ্র (গৌহাটী); দীপ্তি ও দীপালি সেনগুপ্তা (গৌহাটী); কৃষ্ণা, বন্দনা ও সমীরকুমার ঘোষ (ডালটনগঞ্জ); মালবিকা দত্ত (করিমগঞ্জ); বাণী সাধুখাঁ (কলিকাতা ১৩); অপূর্ব্ব, ছবি, সীমা ও চিত্রভানু (করিমগঞ্জ); রীণা ও অরুণা সেনগুপ্তা (পাটনা); জয়া দত্ত (বেহালা); সুতপা ও সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় (কাশী)।

নূতন ধাঁধা

১। সামনে থেকে দেখলে মনে হয় পাখী, পেছন থেকে দেখলে মনে হয় মাছ। সে কোন্ অদ্ভুত জীব?

২। কোন্ পাখী উল্টে গেলে পুজোয় লাগে, আর সোজা হয়ে পড়লে আওয়াজে বাড়ী কাঁপতে থাকে?

৩। কোন্ পাখী শুধু ওপরের দিকেই উঠছে?

৪। কোন্ পাখী দেখতে বেশ সুন্দর, কিন্তু দেখালেই লোকে চটে যায়?

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর (পৃঃ ৪২ দেখ)

(১) আলোর অভাবই ছায়া, কাজেই এ প্রশ্নের অর্থ নেই। (২) আলো। (৩) তাপের অভাবকেই ঠাণ্ডা বলে, কাজেই এ প্রশ্নটিও নিরর্থক। (৪) দু'টি ধাতু—তামা ও দস্তার সংমিশ্রণ। (৫) যথাক্রমে গাছের ছাল, আঁঠি, কোরক, পাতা, ফল ও বীচি থেকে পাওয়া যায়। (৬) লর্ড সিংহ, বিহারের। (৭) (ক) কাশীরাম দাস, (খ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (৮) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য। (৯) অষ্ট্রেলিয়া (১০) পার্লিয়ামেণ্টের বা ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি, গানের সুর, আমেরিকার প্রতীক, এঞ্জিনের যেখানে জল থেকে বাষ্প তৈরী হয়, টেনিস্ খেলায় উভয় পক্ষের সমান পয়েণ্ট (৪০) হওয়া অথবা ইটালীয় ভাষায় 'নেতা" (মুসোলিনীকে বলা হ'ত)।

প্রবাদের মিল:—১—১০, ২—৮, ৩—১১, ৪—১৯, ৫—১৩, ৬—১৪, ৭—১৫, ৯—১৭, ১২—১৮, ১৬—২০।

কবি প্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু)
সম্পাদিত কৈশোর মাসিক
"ভাই-বোন"
১৩৫৬ সালের বৈশাখে ৬ষ্ঠ বর্ষ সুরু।

অন্য মাসিক নিলেও 'ভাই-বোন' নেওয়া যায়, কারণ এ পত্রিকাখানি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ভাই-বোন পছন্দ করে আট থেকে আশী বছর বয়সের পাঠক-পাঠিকা। এ ধরণের কাগজ তোমরা দেখো নি। বাংলা দেশের প্রথম চিঠি—"কাকাবাবুর চিঠি"র আকর্ষণ অসাধারণ—যোগ দিলেই বুঝতে পারবে। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাকটিকিট পাঠাও। বার্ষিক ৪৲, ষান্মাসিক ২।০, প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা। বিবরণের জন্য লেখো:—কার্য্যাধ্যক্ষ ভাই-বোন, ৪-এ ঈশ্বর মিল লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা ৬।

—ছেলেমেয়েদের জন্য—

প্রকাশিত হইয়াছে

কবিতা * গল্প * উপন্যাস * জীবনী * ভ্রমণ * শিকার * বিদেশী সাহিত্য

* নাটক * খেলাধূলা * ও ব্যায়াম * বিজ্ঞান * বৈচিত্র্য * ইতিহাস * ভূগোল ধাঁধা-রহস্য

ঝক্‌ঝকে চিত্র-সমুজ্জ্বল!

১৩৫৪, ফাল্গুন মাস থেকে ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা আরম্ভ

দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা বাহির হইল।

প্রত্যেকখানির মূল্য ছয় আনা

বার্ষিক সডাক ৪৲ টাকা

আজই গ্রাহক হউন

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ৯

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

রামধনু-সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

নতুন সংস্করণ
দাম একটাকা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

Regd. No. C—1641

সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্মী ঘি

গত ৫০ বছরের উপর লক্ষ্মী ঘি দেশের কল্যাণে
জাতির স্বাস্থ্য ও শক্তি রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।
লক্ষ্মী ঘি সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ, সুস্বাদু ও টাটকা।
খাঁটি ঘি বলিতে 'লক্ষ্মী ঘি'কেই বুঝায়।

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

৮নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

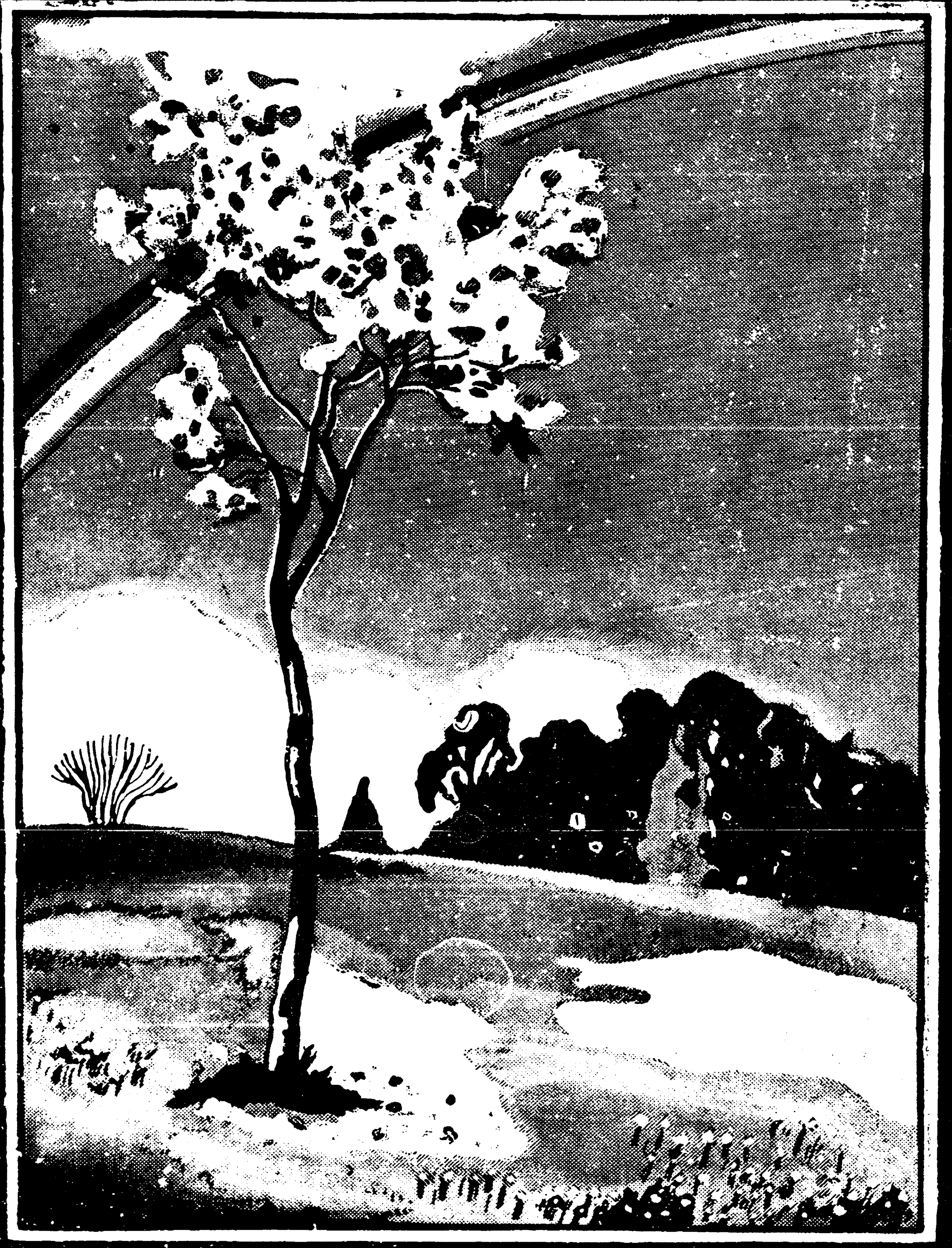

২২শ বর্ষ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬
ব. ৪৲ ষান্মাসিক ২।॰
প্রতি সংখ্যা ।৵॰

ছোটদের মনের মত বই

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ১৲

৺মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি ১।৹

শ্রীঅমলেন্দু সেন অনূদিত
দি লাষ্ট্ অফ্ দি মোহিকান্স্ ৷৷৵৹

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত
অলিভার টুইষ্ট্ ৷৷৵৹

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

কবি প্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু)
সম্পাদিত কৈশোর মাসিক

"ভাই-বোন"

১৩৫৬ সালের বৈশাখে ৬ষ্ঠ বর্ষ সুরু

অন্য মাসিক নিলেও 'ভাই-বোন' নেওয়া যায়, কারণ এ পত্রিকাখানি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ভাই-বোন পছন্দ করে আট থেকে আশী বছর বয়সের পাঠক-পাঠিকা। এ ধরণের কাগজ তোমরা দেখো নি। বাংলা দেশের প্রথম চিঠি—"কাকাবাবুর চিঠি"র আকর্ষণ অসাধারণ—যোগ দিলেই বুঝতে পারবে। নমুনার জন্য ।৵৹ আনার ডাকটিকিট পাঠাও; বার্ষিক ৪৲, ষান্মাসিক ২।৹, প্রতি সংখ্যা ।৵৹ আনা। বিবরণের জন্য লেখো:—কার্য্যাধ্যক্ষ ভাই-বোন, ৪-এ ঈশ্বর মিল লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা ৬।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রামধনু—

তরমুজ

শিল্পী মুরিলোর আঁকা একখানি বিখ্যাত ছবি

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

[illegible] বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ { ২য় সংখ্যা

হাসি-চোর

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আস্‌বে সে মা, পাহাড়-পাড়ের বনের ওপার থেকে,
সাত-রঙা তার ওড়না দিয়ে আকাশ দেবে ঢেকে।
ছুটিয়ে ঘোড়া চলে যাবে তেপান্তরের কোলে—
নতুন নতুন দেশে যেথা নতুন নিশান দোলে।

সামার ভেকেশানের ছুটি প্রথম যেদিন এলো
খবর তারি পেয়েছিলাম হাওয়ায় এলোমেলো।
পাখীর ডাকে-জাগা সকাল—সাঁঝের তারার দিঠি
সেদিন দিলে এনে আমায় আলো-ছায়ার চিঠি।

তার সাথে মা, অনেক দিনই আমার জানাশোনা,
আমার দেশ আর তার দেশেতে কতই আনাগোনা।
কোন্ দুপুরের গোঠের বাটে রাখাল-বেণু-তানে
ভাব করেছি তার সাথে মা,—সবাই তা তো জানে!

আসে সে মা, তোমার কাছে ডাকের পিয়ন হয়ে—
বাবার লেখা তিনটে চিঠি ঝোলার ভিতর বয়ে।
বুবুর খেলার হলুদ পুতুল ঝাঁপির ভিতর নিয়ে
হিজল-তলায় বসে সে মা, রথের মেলায় গিয়ে।

পাই দেখা তার বাদল-বেলায় কাজল আষাঢ়-ভোরে,
শরৎ-দিনে তার হাসিতেই শিউলি পড়ে ঝ'রে।
ফাগুন-সাঁঝে ডাকে আমায় নতুন ফুলের দেশে,
সবায় ভালবাসি আমি—তারেই ভালবেসে।

সাথীরা তার ভুবন যুড়ে ফিরছে সারা বেলা—
রামধনুকের রূপকথা আর ছুটির দিনের খেলা।
খুকুর চোখের নিঝুম ঘুম আর খোকার ঠোঁটের হাসি
সে আনে তার রঙিন ঝোলায়—আনে আমার বাঁশী।

পিদিম-জ্বালা ছায়ায় ভরা আঁধার ঘরের কোণে
ঘুমিয়ে পড়ি তোমার কোলে আমরা ভাই আর বোনে।
তোমার চোখে ঘুমটি নামে রাতটি হ'লে ঘোর—
পালিয়ে তখন যায় সে কোথা খুকুর হাসি-চোর।

কবি রঙ্গলাল

শ্রীসুনীল ঘোষ, এম্. এ

আজ যাঁর কথা বলতে যাচ্ছি তিনি হচ্চেন একজন বিদ্রোহী কবি। ১২১ বছর আগে এঁর জন্ম হয়। দেশাত্মবোধের আদর্শে উদ্বোধিত যে কয়জন কবি কাব্যের মধ্যে দিয়ে দেশাত্মবোধ প্রচার করতে চেষ্টা করেছেন রঙ্গলাল তাঁদেরই একজন।

বাংলা ১২৩৪ সালে কালনার কাছে বাকুলিয়া গ্রামে কবির জন্ম হয়। তাঁর বাবা রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাবের একজন দেওয়ান। কিন্তু মাত্র আট বছর বয়সেই রঙ্গলাল পিতাকে হারান।

খুব ছোট বয়স থেকেই রঙ্গলালের লেখাপড়া আরম্ভ হয়েছিল। বাকুলিয়ার মিশনারী স্কুলে বাংলা শিখে ইনি হুগলি কলেজে ইংরিজী শিখতে আরম্ভ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ থাকায় বেশীদিন এ ভাবে লেখাপড়া করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না। তবুও শেখার ইচ্ছা যাঁর আছে তাঁর কাছে কোন বাধাই বাধা নয়। তিনি নিজের চেষ্টায় বাড়ীতে বসেই লেখাপড়া শিখতে

আরম্ভ করলেন। সত্যি কথা বলতে কি, এই ভাবে তিনি ভারতীয় প্রায় সমস্ত ভাষাগুলিতেই পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন ; এমন কি ইউরোপীয় তিন-চারটি ভাষাতেও তাঁর বেশ দখল জমে গেল। তখনকার দিনে এ বড় সোজা কথা নয়!

তখনকার প্রথা অনুসারে মাত্র ১৪ বছর বয়সে রঙ্গলালের বিয়ে হয়। এর পর কিছুদিন তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বারিক মাষ্টারের দেওয়ানি করেন। কিছুকাল শিক্ষকতার কাজও যে করেন নি এমন নয়। তা ছাড়া কিছুদিন দু'-একটি পত্রিকার সম্পাদক অথবা সহ-সম্পাদক হিসেবেও তাঁকে কাজ করতে দেখা গেছে। তারপর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইনি ইনকাম্ ট্যাক্সের ডেপুটি কালেক্টার নিযুক্ত হ'ন। ১৮৬৪ সনে চাকরির খাতিরে যান বালেশ্বর—প্রথম স্পেশাল ডেপুটি কালেক্টারের পদ নিয়ে। তারপর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টারের পদ নিয়ে কটকে বদলী হ'ন।

দেশের দারিদ্র্য সম্বন্ধে সচেতন মনোবৃত্তি নিয়েই তিনি সব সময়ে চলা-ফেরা করতেন, তাই বিদেশীদের কোন অবিচারকেই তিনি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে সমর্থন করতে পারতেন না। একবার, শোনা যায়, কোন একটি গ্রামের দু'টি মেয়েকে সেই গ্রামের মিশনারীরা ধরে নিয়ে যায় ; এর বিচার হয় রঙ্গলালেরই আদালতে। সেই মোকদ্দমায় রঙ্গলাল মিশনারীদের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় রায় দেন। এতে মিশনারীরা ক্ষেপে গিয়ে গভর্ণমেণ্টের কাছে নালিশ জানায়—সেই সঙ্গে রঙ্গলালকে পদচ্যুত করাবারও চেষ্টা করে। ইংরেজ আমলে মিশনারীদের প্রতাপ তো বড় কম ছিল না! কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। ১২৯৪ সালে ৩১শে বৈশাখ রঙ্গলাল পরলোক গমন করেন।

কোন কবিকে জানতে হ'লে তাঁর কাব্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় দরকার ; কারণ কাব্যই কবির প্রকৃত জীবন-ইতিহাস। স্বভাবকবি বলতে যা বোঝা যায় রঙ্গলাল ছিলেন তাই। ছেলেবেলা থেকেই এঁর কবিতা রচনার ওপর বেশ ঝোঁক ছিল। শোনা যায় কুড়ি বছর বয়সেই ইনি "কাশীযাত্রা" বলে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকরে"ও ইনি নিয়মিত কবিতা লিখতেন।

রঙ্গলালের রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রধান হচ্ছে—পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮), কর্ম্মদেবী (১৮৬২), শূরসুন্দরী (১৮৬৮), কাঞ্চীকাবেরী (১৮৭৯)। এ ছাড়া তিনি "নীতিকুসুমাঞ্জলি" ও কুমারসম্ভব কাব্যও রচনা করেন। প্রথমটি

কতকগুলি নীতিবাক্যের সংকলন, দ্বিতীয়টি কালিদাসের মহাকাব্যের অনুবাদ। তাঁর অন্যান্য অনুবাদ :—ঋতুসংহার, লক্ষ্মণবিজয় (উত্তররামচরিতের অনুবাদ), চন্দ্রহংস নাটক।

কয়েকটি পত্রিকাতেও বিভিন্ন যোগ্যতায় রঙ্গলাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন ; যেমন—রসসাগরের (সংবাদপত্র) তিনি ছিলেন সম্পাদক ; উৎকল-দর্পণ নামক ওড়িয়া সংবাদপত্রেরও তিনি সম্পাদক ছিলেন। আর ছিলেন বিখ্যাত এডুকেশন গেজেটের সহকারী সম্পাদক (১৮৫৫, ১৮৬৩)।

রঙ্গলালের লেখা প্রবন্ধের বইএর মধ্যে নীচের ক'খানির নাম করা যেতে পারে—বাঙ্গালা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ, "শরীরসাধিনী বিদ্যার গুণকীর্ত্তন, রাজকীয় কর্ম্মচারীদের জন্য ভারতীয় ভাষায় ব্যাকরণ প্রধান।

এইবার রঙ্গলালের ভাষার একটু নমুনা শোন। যে বিদ্রোহের বহ্নি তাঁর শিরায় শিরায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারই সামান্য একটা প্রকাশ হ'ল এই কবিতায়—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গসুখ তায় হে—
স্বর্গসুখ তায়।" (পদ্মিনী উপাখ্যান)

তাঁর নীতিবাক্য, যেমন—

"গ্রন্থগত বিদ্যা, পরহস্তগত ধন।
নহে বিদ্যা, নহে ধন, হ'লে প্রয়োজন॥"

কিংবা

"স্বজাতীয় বিনা বৈরী পরাভূত নয়।
হীরাতেই ছিদ্র করে মণিমুক্তাচয়॥

বিখ্যাত হয়ে আছে। যুদ্ধের বর্ণনায়—

"কত মল্ল, করে ভল্ল, সাজে থাকে থাকে।
মারে লম্ফ, দিয়ে ঝম্প, ধায় ঝাঁকে ঝাঁকে॥

* * * *

দন্তগুলা, যেন মূলা, অতিতীক্ষ্ণ দাঁড়।
কড় মড়, মড় মড়, চিবাইছে হাড়॥ (কাঞ্চীকাবেরী)

রঙ্গলালের গদ্য রচনার কাঠামোটা একটু শক্ত; তবুও প্রাঞ্জলতার অভাব নেই; তারপর তখনকার দিনে এর চেয়ে ভাল বাংলা আর কেউ আশা করতে পারত না। যেমন—

"রাজকার্য্যের অনুরোধে বহু বৎসর হইল আমি উৎকল দেশে প্রবাস করিয়াছিলাম। আমি প্রথমে আসিয়া এই দেশের যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, শতগুণে তদবস্থার সংশোধন হইয়া আসিয়াছে। মৃণ্ময় রথ্যা সকলের [মাটির রাস্তার = কাঁচা রাস্তার] পরিবর্তে ইষ্টকময় রাজপথ সকল [পাকা রাস্তা] প্রস্তুত হইয়াছে।" ইত্যাদি (কাঞ্চীকাবেরী—প্রস্তাবনা) ।

সুইডেনে কয়েকদিন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী, এম্. এ, বি. এল্

২

হাসেলবি ভিলাষ্টাডে "আন্তর্জ্জাতিক তরুণ-তরুণী শান্তিশিবির" বসেছে। তারই নিমন্ত্রণে এসেছি সুইডেন। ম্যালার্ণ হ্রদের তীরে পাইন বনের মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে তৈরী হয়েছে আমাদের শিবির।

শিবিরে আলাপ হ'লো শিবির-পরিদর্শক শ্রীব্রোহ্‌র এড্‌বেহ্‌র ও নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ডের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে।

শিবিরে থাকার একটা সর্ত্ত, আমাদের কৃষিকাজ করতে হবে। এখন

ইউরোপে এক দেশ থেকে অন্য দেশে টাকা আনার অসুবিধা ব'লে এঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের নিমন্ত্রণ করেন ছুটিতে কৃষকের কাজ করার জন্যে এবং সেই কাজের জন্যে 'ফারমার' (অর্থাৎ বড় কৃষক, যার অধীনে অনেক কৃষক দিন-মজুরী নিয়ে কাজ করে) গবর্ণমেণ্ট-নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা মতো দিন-মজুরী দেন। তা ছাড়া, সুইডেন সীমান্ত থেকে শিবির পর্য্যন্ত ট্রেন খরচও পায় ছেলেমেয়েরা। যারা থাকে এখানে চার সপ্তাহের ওপর তারা পায় দু'তরফা ভাড়া আর যারা থাকে চার সপ্তাহের কম অথচ ১৫ দিনের ওপর, তারা পায় এক দিকের ভাড়া। শিবিরেই আছে খাওয়ার ব্যবস্থা। তার জন্যে অবশ্য মজুরী থেকে কিছু কেটে রাখে এরা।

দেখলাম, পৃথিবীতে যাতে স্থায়ী শান্তি আসে তার জন্যে খাওয়ার জায়গায় শিক্ষামূলক ছবি, ইউ. এন্. ওর ছবি ও পোষ্টার লাগিয়েছে। আর টেবিলে টেবিলে আছে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা। দেখলাম পোষ্টারের ছবিতে ভারতের পতাকা 'ইউনিয়ান জ্যাক্', নতুন পোষ্টার এরা পায় নি। আমার কাছে ছোট জাতীয় পতাকা ছিলো না, সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম মাঝারি মাপের পতাকা আর একটি কাগজ, যাতে ছাপানো ছিলো ভারতের জাতীয় পতাকার ছবি এবং তার নীচে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ। সেক্রেটারীকে দিলাম সেগুলি। তিনি যথাযোগ্য সম্মান দিলেন আমাদের জাতীয় পতাকাকে এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা সমেত জাতীয় পতাকার ছবি ইউ. এন্. ওর কাগজের সঙ্গে প্রধান স্থানে দিলেন ঝুলিয়ে।

সামনে বাঁ দিক্ থেকে ৩য় ব্যক্তি—ক্যাম্প ম্যানেজার ব্রোহ্‌র এড্‌বেহ্‌র। ৪র্থ—হেন্‌রি ফিল্লেরুদ। পিছনে ১ম—কার্ল গার্ণার কুটসন্, ২য়—লেখক।

পরের দিন—১লা জুলাই। আমরা কাজ আরম্ভ করতে পারলাম না। গবর্ণমেণ্টের আইনে শিবিরে থাকার আগে সকলের শরীর পরীক্ষা করাতে হয়। আমাদের যেতে হ'লো রাজধানীতে, অর্থাৎ ষ্টকহোল্মে। সেখানে হ'লো শরীরের 'এক্স্-রে' পরীক্ষা। পরের দিন সকালে ডাক্তার ক্যাম্পে এসে থুতু নিয়ে

গেলেন পরীক্ষার জন্য। শুনেছিলাম সুইডেনের চিকিৎসা-বিভাগ খুব কর্ম্মতৎপর। সাধারণের স্বাস্থ্যের ওপর এঁদের লক্ষ্য খুব। এখানকার লোকেরা যে দীর্ঘজীবী তার একটা কারণ চিকিৎসা-বিভাগের কর্ম্মতৎপরতা। আমাদের শরীর পরীক্ষার ব্যবস্থা তার একটা নিদর্শন।

ডাক্তারের ছাড়পত্র পাওয়ার পর আমরা কাজ আরম্ভ করলাম ২রা তারিখ থেকে।

কাজের সময় সকাল ৭॥ থেকে ১২টা, তারপর ১॥ থেকে বিকেল ৫॥টা পর্য্যন্ত। গবর্ণমেণ্টের লোক এলেন শিবিরে। নাম তাঁর হেনরী ফিন্নেরুদ। আমরা দল বেঁধে সাইকেলে চল্‌লাম ফিন্নেরুদের সঙ্গে। হাসেলবি ছোট, বড়, মাঝারি বাগানে, ক্ষেতে, হট্ হাউসে উৎপাদন করা ফুটি, শসা, শালগম, বীট, আলু, পাবস্লে, গুজবেরী, আপেল ইত্যাদি রকমারি ফল, তরিতরকারী, আনাজ ও নানান্ জাতীয় ফুলের জন্য বিখ্যাত। ছোট্ট জায়গা, এবং লোকসংখ্যাও খুব কম। অথচ এখানে আছে শ' দুয়েকের ওপর হট্ হাউস আর দূরে দূরে ছড়ানো নানান্ আনাজের বড় বড় ক্ষেত। বিভিন্ন বাগান ও ক্ষেত ঘুরে আমাদের শিবিরের ছেলেমেয়েদের কাজে লাগানোর পর এলো আমায় কাজ দেখানোর পালা। ফিন্নেরুদ ইংরেজি না জানায় নিয়ে গেলেন তাঁদের অফিসে। সেখানে ইংরেজি-জানা এক ভদ্রলোক আমাকে অভ্যর্থনা করলেন এবং নিয়ে গেলেন এক গরু-ঘোড়ার আস্তাবলে। ভদ্রলোকটি আমায় আস্তাবলের কাজ দেখালেন। অবশ্য কি কাজ করতে হ'লো না বলাই ভালো। তাঁদের আস্তাবলে কি রকম কাজ হয় আমাকে বল্‌লেন। দেখালেন দরজার সামনে ঝোলানো কালো বোর্ড, তাতে লেখা গরু, বলদ, বাছুরের সংখ্যা আর তার সঙ্গে আগের এবং বর্ত্তমান মাসের প্রতিদিনের প্রত্যেক গরুর এবং গড়পড়তা গরুর দুধের মাপ। যে লোকেরা ওখানে কাজ করে তাদের দৈনন্দিন কাজের হিসাবও লেখা বোর্ডে। গোয়ালে গরুর সংখ্যা ৫১টি, আর বলদ, বাছুর, ঘোড়া মিলিয়ে আরও ২০টি জন্তু থাকে ওই

ষ্টকহোল্মে কিংস্ গার্ডেনের অর্থাৎ রাজ-উদ্যানের একদিক্।

আস্তাবলে। অথচ এই আস্তাবলের কাজ চালায় মাত্র দু'জন লোক, আর তারা পায় পালা ক'রে সপ্তাহে একদিন ছুটি। সময়-সঙ্ক্ষেপ-করা কল ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং তাদের সুস্থ সবল কর্ম্মঠ শরীরের দৌলতে তারা করে এত কাজ।

আমার কাজ ছিলো সামান্য। বিকালে যেতে হ'লো অন্য কাজে—বীট ক্ষেতে কাঁটাগাছ, আগাছা, ঘাস ইত্যাদি তুল্‌তে। কুটসন বলেছিলেন কৃষিকাজ অত্যন্ত সোজা। কিন্তু কাজ আরম্ভ ক'রে দেখলাম কাজ সোজা বটে কিন্তু কোমর ও পায়ের ব্যথায় নিজেকে সোজা রাখাও একটা কাজ হয়ে দাঁড়ালো।

৩রা তারিখ—শনিবার। ক্ষেতের কাজ ১২টা পর্য্যন্ত। বিকেলে খাওয়া সেরে গেলাম এখানকার ফোক পার্ক-এ। শনি ও রবিবারে সাধারণ লোকদের ...কা কাটানোর উদ্দেশ্যে একটি জায়গা ঘিরে ফোক পার্কের ব্যবস্থা। সাধারণ লোকেদের সহযোগিতায় এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে চলে এই ফোক পার্ক। প্রায় প্রত্যেক সহর ও গ্রামে আছে এই ব্যবস্থা। পুরোনো এবং নতুন নাচের ব্যবস্থা, গান, খাওয়া-দাওয়া এবং হৈ-হুল্লোড়ের ব্যবস্থা আছে এইখানে। এমন কি ...য়ো খেলাও বাদ নেই। আশা ছিল এদের সহজ গ্রাম্য নৃত্য দেখতে পাবো—দেখলাম এদের পুরানো হালের নাচে দ্রুত বাজনার তালে তালে শ্রীছন্দহীন ...ত নৃত্য। এদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে এই রকম আয়োজনের হয়তো প্রয়োজন আছে। আমি অবশ্য এদের শনি-রবিবারের আনন্দ-উৎসবের ব্যবস্থা দেখে নিরাশ হয়ে ফিরলাম।

শিবিরে আরম্ভ হ'লো 'ক্যাম্প ফায়ার'। দু'জন গীটারবাদক এসেছিলেন। গীটারের সঙ্গে আরম্ভ হ'লো সুইডিস ও অন্য দেশের সমবেত লোক-সঙ্গীত। আকাশের রং চক্‌চকে রূপালী, আর পাইন গাছের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে ম্যালার্ণের তক্‌তকে জল। এই সুন্দর আবেষ্টনে জমে উঠল 'ক্যাম্প ফায়ার'। নাচ আরম্ভ হ'লো দু'টি ফিনল্যাণ্ডের মেয়ের। তারা তাদের জমকালো জাতীয় পোষাক পরে দেখালো তাদের গ্রাম্য নৃত্য। সবল, সতেজ দেহ আর তাদের সহজ নৃত্যভঙ্গীর মাধুর্য্য খুবই মনোরম।

ভারত-প্রান্তের প্রতিনিধি আমি। সকলে অনুরোধ করলো লোক-রঞ্জনের জন্য আমাকে কিছু দেখাতে অথবা গাইতে। আমার অবস্থা বিনা-জলের মাছের মতো—গাইতে অথবা অন্য কোন রকম সভা-মাতানো রঙ্গ করতেও জানি না। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি ক'রে পেলাম নিষ্কৃতি। ক্যাম্প ফায়ারের

সুরে সুর না মিললেও দেখলাম অনেকের ভালো লেগেছিলো কবিতাগুলি। বলা বাহুল্য কবিতাগুলি ইংরেজি অনুবাদ। সভা ভাঙার আগে আরম্ভ হ'লো বিভিন্ন দেশের জাতীয় সঙ্গীত। সমান গাম্ভীর্য্যে বিভিন্ন দেশের জাতীয় সঙ্গীত সকলে গাইলো। আমিও ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' বেসুরো ভাঙা গলায় গাইলাম; কিন্তু জাতীয় সঙ্গীতের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিলো সকলে।

ডাক্তার অরূপ করের ডায়েরী

—উনিশ—

বিনায়ক সুরু করল:

"সে রাত্রে আমি আপনাদের আমাকে ছেড়ে দেবার কথা বলেছিলাম, কিন্তু কোন কারণ বলতে পারি নি। তার কারণ এই নয় যে কোনও কারণ ছিল না, কিংবা আমি প্রকৃতিস্থ ছিলাম না। আমার তখন এমন সাহস ছিল না যে সে কথা আপনাদের জানাই, এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে সে কথা বলতে দেয় নি। আপনারা চলে গেলে পর এক গভীর হতাশা আমাকে খানিকক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখল। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। হঠাৎ দেখলাম

একটা ঘন কুয়াশা সারা আকাশকে ঘিরে ফেলছে। বুঝলাম সে আসছে, আসছে। এর আগেও ঠিক কুয়াশার মধ্যেই সেই মৃত্যুঞ্জয়ী রক্ত-পাগলের আবির্ভাব আমি দেখেছি। সে জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। এবার কিন্তু তার আগের ভৌতিক চেহারা নয়, রক্ত-মাংসের পরিপূর্ণ শরীর, কেবল চোখ দু'টো তার হিংস্র পশুর মত জ্বলছে। সে তার রক্তমুখে হাসছে। আমি জানি, তাকে কেউ না ডাকলে সে প্রথমে বাড়িতে ঢুকতে পারে না। সেইজন্যে আমি বুঝতে পারলাম সে চাইছে আমি যেন তাকে বাড়ির ভেতরে ডাকি।

"ফিস্‌ফিস্ করে সে আমায় বললে—"ইঁদুর! ইঁদুর! যত চাও তত! একশ', হাজার, লক্ষ কোটি—যত চাও! প্রত্যেকে নূতন প্রাণে জীবন্ত—কুকুর, বিড়াল যা চাও! প্রত্যেকের মধ্যেই তাজা প্রাণ, তাজা লাল রক্ত—হাজার হাজার বছরের প্রাণ তার মধ্যে পূর্ণ। এ শুধু মাছি নয়, মাকড়সা নয়—যাদের এক ফোঁটা রক্ত নেই।' সে হাত নাড়তে লাগল। দেখলাম তার হাত নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের উপর একরাশ অন্ধকার এগিয়ে আসছে। সেই অন্ধকার হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল। স্পষ্ট দেখলাম লক্ষ লক্ষ ইঁদুর এগিয়ে আসছে। আমাকে সে বলল—'এই সমস্ত তোমাকে দিয়ে দেব। আরও চাইলে আরও দেব, শুধু তুমি আমাকে তোমার প্রভু বলে স্বীকার করে নাও।' তারপর হঠাৎ এক লাল মেঘে আমার চোখ-মুখ ঢেকে ফেলল, আমি যেন সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলছিলাম। কি করতে চলেছি মনে হ'ল না, শুধু অল্প অল্প মনে আছে যে আমি জানলাটা সামান্য একটু খুলে বললাম—'ভিতরে আসুন, আমার প্রভু, আমার দেবতা!' সমস্ত ইঁদুর কোথায় মিলিয়ে গেল, আর সে টুক করে খোলা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল—যদিও জানলা এক ইঞ্চির বেশী খুলি নি।

"তার পর সারাদিন আমি তার জন্য অপেক্ষা করলাম, কিন্তু সে আমাকে কিছুই পাঠাল না—একটা মাছি পর্য্যন্ত না। সন্ধ্যা হ'লে পর রাগে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। রাত্রে সে আমাকে না ডেকেই বন্ধ জানলা দিয়ে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল দেখে আমি রাগে পাগল হয়ে গেলাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসতে লাগল, এমন ভাবে হাঁটতে চলতে লাগল যে আমি যেন এ ঘরের কেউ নই, সে-ই এ বাড়ির একমাত্র মালিক।

"তার পর বিকেলে এই জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম অশোক বাবুর ছেলে অলককে। তার চেহারা দেখে আমি চমকে উঠলাম—এত সুন্দর চেহারা হঠাৎ এত খারাপ হ'ল কি করে? তক্ষুণি মনে হ'ল সেই শয়তানের কথা। তবে কি সে অলকেরও রক্ত পান করছে? অলক! ভাবলাম, আজই তার বিশ্বাসঘাতকতার শোধ নেব। রাত্রে আবার সে এল, ঘন কুয়াশায় চারদিক্ ঢেকে। তখনই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি তার গলা টিপে ধরলাম। কিন্তু পরক্ষণেই তার চোখের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল। সে চোখ দু'টোর আগুনে আমার সমস্ত শক্তি যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেল, আমার হাত শিথিল হয়ে এল। এর পর সে আমাকে এক হাতে তুলে ধরে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিল। চোখের সামনে

এক রাশ লাল ধোঁয়া দেখলাম, বজ্রপাতের মত একটা শব্দ, তার পর দরজা দিয়ে সমস্ত কুয়াশা বাইরে মিলিয়ে গেল।"

বিনায়কের কণ্ঠস্বর আস্তে আস্তে থেমে আসছিল, নিঃশ্বাসও ঘন ঘন পড়তে লাগল। ডক্টর চক্রবর্ত্তী সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন—"আমরা জানি বিনায়কের কি হবে। কিন্তু এর চেয়েও বড় কর্ত্তব্য এখন আছে। সেই শয়তান এখন এই বাড়িতে, এই মুহূর্ত্তে তাকে আমাদের আক্রমণ করতে হবে। চল সবাই প্রস্তুত হয়ে অশোক বাবুর ঘরে।"

অশোক বাবুর ঘরের সামনে এসে ডক্টর চক্রবর্ত্তী হাতল ঘোরালেন, দরজা খুল্‌ল না। আমরা সকলে এক সঙ্গে দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, দরজা ভেঙে ফাঁক হয়ে গেল। কিন্তু ঘরে ঢুকেই আমার সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, বুকের ধুকধুকানিও যেন এক মুহূর্ত্ত থেমে গেল।

বিছানার একপাশে অশোক বাবু নিঝুম হয়ে পড়ে আছেন। আর এক পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে অলক, আর তার উপর ঝুঁকে পড়ে সেই পিশাচ কৃতান্তবর্ম্মা অলকের গলায় মুখ লাগিয়ে রক্ত শুষে নিচ্ছে। কৃতান্তবর্ম্মার মুখের কষ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত অলকের জামায় পড়ে তাকে রক্তাক্ত করে তুলছে। আমরা ঘরে ঢোকামাত্র কৃতান্তবর্ম্মা মুখ তুলে তাকাল। রাগে তার দাঁত কড় কড় করে উঠল। এক মুহূর্ত্তে সে অলককে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমাদের দিকে লাফিয়ে এল। এর মধ্যে ডক্টর চক্রবর্ত্তী উঠে দাঁড়িয়েছেন, তিনি তাঁর হাতের সেই ফুলগুলো তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। কৃতান্তবর্ম্মা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল, তারপর পিছু হঠতে সুরু করল। আমরা যত এগুতে লাগলাম সে ততই ভয়ে কুঁকড়িয়ে পিছিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ যেন সমস্ত আলো নিবে গেল, একটা কালো মেঘ সারা আকাশ ছেয়ে ফেলল, তার পর কৃতান্তবর্ম্মার আর দেখা পাওয়া গেল না। তরুণ আর সনাতন বাবু ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরেই অশোক বাবুর জ্ঞান হ'ল। তিনি চীৎকার করে উঠলেন—"কি হয়েছে অরূপ বাবু! অলকের জামায় এত রক্ত কেন? তবে কি, তবে কি সেই শয়তান—য়্যা!"

এমন সময় তরুণ আর সনাতন বাবু ফিরে এলেন। তরুণ বলল—"নাঃ, চলে গেছে। কিন্তু যাবার আগে সমস্ত ঘর তছ্‌নছ্‌ করে জিনিষপত্তর ভেঙে-চুরে দিয়ে গেছে। বিনায়কের ঘরে গিয়ে দেখলাম, তার মাথা কে যেন ফাটিয়ে একেবারে চৌচির ক'রে দিয়েছে, পা দু'টো দুমড়িয়ে ভেঙে শরীর থেকে আলাদা করে দিয়েছে। বিনায়ক আর বেঁচে নেই।"

সনাতন বাবু বললেন, "আমিও তাকে খুঁজে পাই নি। তবে বিনায়কের ঘরের জানলা দিয়ে একটা মস্ত বাদুড়কে কলকাতার দিকে উড়ে যেতে দেখলাম। দুর্দ্দমগড়ে এখন ফিরবে বলে মনে হয় না, কারণ ভোর হয়ে আসছে।"

(ক্রমশঃ)

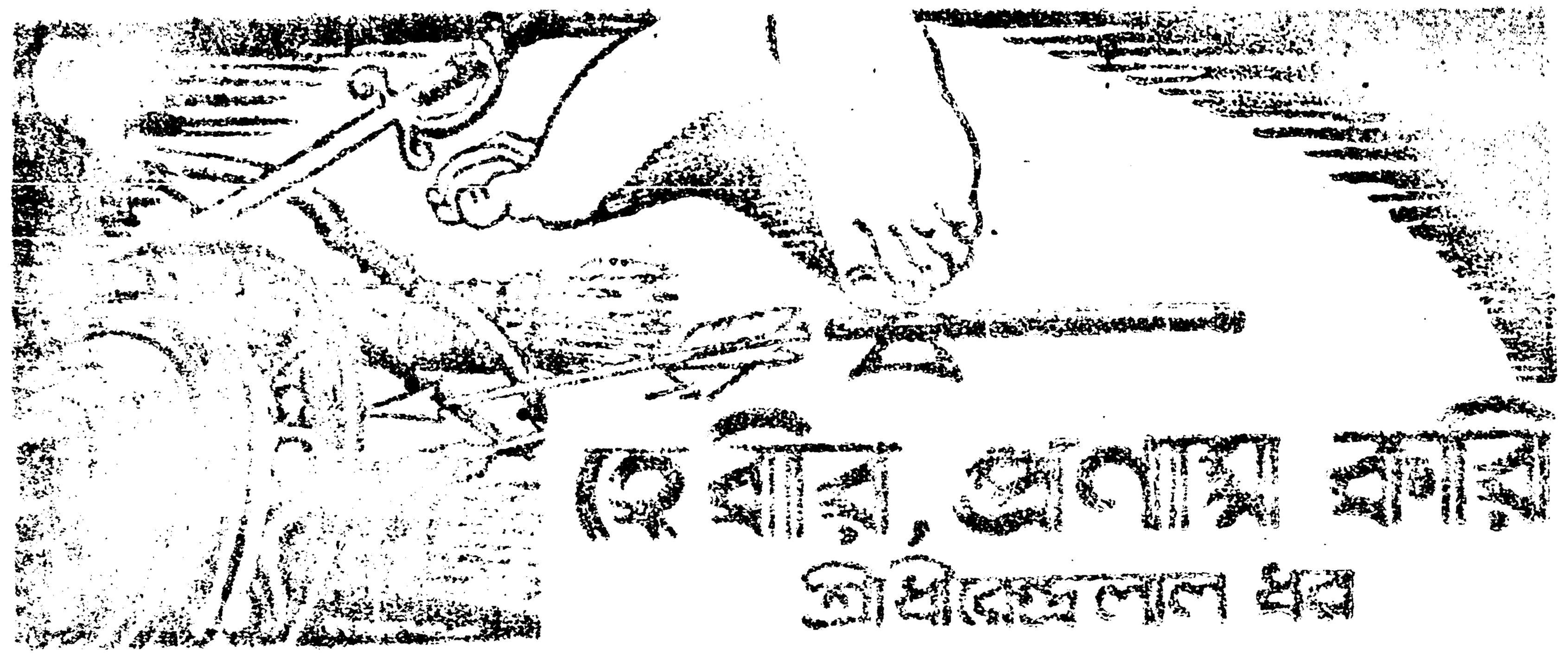

হে বীর, প্রণাম লহ

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—পঁয়ত্রিশ—

প্রভাতে রাজকীয় ভেরীঘোষা পাটলিপুত্রের রাজপথগুলি প্রতিধ্বনিত করে তুললো: গ্রীকেরা মগধ আক্রমণ করেছে, শত্রুর প্রতিরোধ করতে হবে—ধর্ম, দেশ ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে। সম্রাটের আদেশে প্রত্যেকটি যুবককে অস্ত্রসজ্জা করতে হবে। তোমরা রাজার অস্ত্রাগারে সকলে সমবেত হও, অস্ত্র গ্রহণ কর।

ঘোষকের চারিপাশে নাগরিকের দল সমবেত হয়।

ঘোষক ঘোষণা করে—আমরা পরাধীনতা বরণ করে নিতে পারি না। হিন্দুস্থানের নরনারীরা গ্রীকদের ক্রীতদাসের পর্য্যায়ে নামতে পারে না। ধর্ম ও সমাজকে, শিশু ও নারীকে রক্ষা করার জন্য সম্রাট্ তোমাদের আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের তরুণ ও যুবকের দল, এসো, দলে দলে তোমরা সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দাও, শত্রুকে বিধ্বস্ত কর।

ভীড়ের মধ্যে থেকে এক যুবক প্রশ্ন করলো—স্বাধীন-পরাধীনে আমাদের কি আসে যায়? আমরা লড়াই করে মরবো আর মহারাজা বসে বসে দাবা খেলবেন! সম্পদ্ ও স্বাচ্ছন্দ্য যা কিছু সবই রাজার প্রাপ্য, আর প্রাণ খরচ করবে গরীব প্রজারা? চমৎকার যুক্তি!

আর একজন বলে উঠলো—আমরা নগর ছেড়ে চলে যাব।

একজন বললো—সম্রাট্ যদি নিজে লড়েন তবেই আমরা লড়তে পারি। তাঁকে থাকতে হবে আমাদের পুরোভাগে।

সবাই বল্‌ল—ঠিক কথা! ঠিক কথা!

ঘোষক বললে—সম্রাট্ নগর ছেড়ে যেতে পারেন না, যাবেন সেনাপতি।

—তা হ'লে তিনি একাই লড়বেন।

কিন্তু কলরব সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল যখন ঘোষক ঘোষণা করলে যে যারা সৈনিক

হবে সম্রাট্ তাদেরকে যথারীতি বেতন দেবেন, তাদের আত্মীয়দের ভূমিদান করবেন; কারণ যদি রণক্ষেত্রে কেউ নিহত হয় তা হ'লে তার পোষ্যরা যেন উপবাস না করে।

এবার দরিদ্র শ্রোতাদের মধ্যে কিছুটা ঔৎসুক্য প্রকাশ পেল। ঘোষককে ঘিরে এবার তারা প্রশ্ন সুরু করলো—কতখানি ভূমি দেবে? বেতন কত মুদ্রা?

বেলা প্রথম প্রহর শেষ হ'তে-না-হ'তেই পাটলিপুত্রের প্রাসাদ-দ্বারে একে একে যুবকের দল আসতে লাগলো সেনা-বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য।

বেলা দ্বিপ্রহর থেকে প্রাসাদ-দ্বারে যুবকদের জনতা দেখা দিল,—দেশ ও ধর্মকে রক্ষা করার জন্য যারা সংগ্রাম করতে চায় তাদের জনতা।

মহাবলাধ্যক্ষ গৃহে এক দাবার ছক পেতে গুটি সাজিয়ে একটির পর একটি চাল ঠিক করছিলেন, পুত্র অজয়নাথ ঘরে এসে ঢুকলো, বললো—বাবা, আপনি এখনও দাবা খেলছেন? যুদ্ধে যাবেন না?

মহাবলাধ্যক্ষ বিরক্তির সঙ্গে একবার চোখ তুলে তাকালেন, তারপর বললেন—আমি অসুস্থ।

—আপনি অসুস্থ!

—হুঁ।

অজয়নাথ আর কিছু বলতে সাহস পেল না, কক্ষ ত্যাগ করলো।

একটু পরেই গৃহিণী এসে উপস্থিত হলেন, ঝঙ্কার দিয়ে বললেন—কী, তুমি এখনও দাবার চাল কষছ, ওদিকে ছেলে যে যুদ্ধে চললো!

—গেল তো আমি কি করব?

—আমি কি করুব? একমাত্র ছেলে, আমার সবে ধন নীলমণি—বংশের প্রদীপ, সে-ই যদি গেল তা হ'লে আমাদের আর রইল কি? গ্রীকদের সঙ্গে লড়তে গেলে সে কি আর ফিরবে? নিজে তো ভয়ে ঘর থেকে বেরোও না, আর ছেলেটাকে যমের মুখে ঠেলে দিচ্ছ? এখনই যাও, গিয়ে মহারাজকে বলে ওকে নিরস্ত কর গে—

অজয়নাথ মায়ের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, বললো—না মা, তা আর হয় না। আমি সেনাপতির পুত্র, আমি যুদ্ধে না গেলে জনসাধারণ কি বলবে? পিতা তা হ'লে সকলের চোখে অত্যন্ত হেয় হয়ে পড়বেন।

মা বললেন,—ওসব মান-অপমানের কথা তুই রাখ্, তোর কিছুতেই যাওয়া হবে না। তোকে ওই যমের মুখে ঠেলে দিতে আমি পারবো না। গ্রীকদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে আজ অবধি কেউ ফিরেছে? হয় মরেছে, না হয় বন্দী হয়েছে। বন্দীদের পায়ে শিকল বেঁধে ওরা দেশে নিয়ে গিয়ে বেচে তা জানিস তো?

—এবার আর ওদের দেশে যেতে হবে না মা! এবার এমন লড়াই হবে যা গ্রীকেরা কখনও ভাবে নি। দেশশুদ্ধ ছেলে এবার সৈন্য হচ্ছে!

—সে যে হচ্ছে হোক্ গে, তোর কিছুতেই যাওয়া হবে না।

শেষ অবধি গৃহিণীর কথায় মহাবলাধ্যক্ষকে গৃহ থেকে বাহির হ'তে হ'ল।

মহাবলাধ্যক্ষ বরাবর রাজ-সমীপে গেলেন না, এক অধিনায়কের বাড়ী হয়ে গেলেন। অনেক মুখরোচক তথ্য আহরণ করে তিনি রাজ-সমীপে উপস্থিত হলেন। রাজবৈদ্য তখন সম্রাট্‌কে বটিকা সেবন করাচ্ছেন। বৃহদ্রথ মহাবলাধ্যক্ষকে দেখে খুসি হলেন, বললেন—ঠিক সময় এসে পড়েছ; এসো, এক হাত খেলা যাক!

রাজবৈদ্য বললেন—কিন্তু মহারাজ, বেশীক্ষণ এক ভাবে উপবেশন করে মস্তিষ্ক চালনা করা আপনার পক্ষে এখন অনুচিত।

—কিছু না, কিছু না। খেললে আমি বরং বেশী সুস্থ বোধ করি।

—আপনার ধমনীর গতি বড় দুর্বল, আপনার একান্ত বিশ্রামের প্রয়োজন।

—তুমি আর বক' না রাজবৈদ্য, আমার নিজের শরীর কি আর আমার চেয়ে তুমি ভাল বুঝবে? নাও, সেনাপতি, দাবা সাজাও।

রাজবৈদ্য প্রস্থান করলেন, মহাবলাধ্যক্ষ ছকের উপর ঘোড়ে সাজাতে সাজাতে কথা পাড়লেন—মহারাজ, শুনেছেন? সোন-ভাণ্ডারের সমস্ত স্বর্ণ সংগ্রহ করে রাণীমা গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োগ করেছেন?

রাণীমা সম্রাটের কাছে কথাটা গোপন রেখেছিলেন, সেনানায়কের মুখে কথাটা শুনে সম্রাট্ বিস্ময় প্রকাশ করলেন, তারপর বললেন—তা তুমি সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে যাচ্ছ তো?

—না মহারাজ, আমি রাণীমাকে গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলাম। জানেন তো মহারাজ, এক এক সময়ে এক একটি জাতি জগতের শীর্ষে গিয়ে ওঠে, তাদের সে তখন তুঙ্গে। গ্রীকদেরও আজ সেই উত্থানের সময়। এখন তাদের বিপক্ষে যারাই দাঁড়াবে তারা যতই শক্তিমান্ হোক না কেন, তাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। আমি রাণীমাকে সেই কথাই বলেছিলাম, কিন্তু রাণীমা আমার কথা শুনলেন না। সেই যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীটী আছে—বজ্রাচার্য্য, তারই মন্ত্রণায় রাণীমা যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করে নতুন সেনাপতির অধীনে মিনান্দারের বিরুদ্ধে অভিযান করছেন।

—নতুন সেনাপতি? কই, আমি তো কিছু জানি না!

—উত্তরাপথের ধর্মচক্র লোক নির্বাচন করে দিয়েছেন। সংগ্রামকে পরিহার করার জন্য, প্রজাগণকে আসন্ন অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য গ্রীক-সম্রাটের কাছে আপনি যে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন যিনি সেগুলি লুঠ করেছেন তিনিই হয়েছেন এই অভিযানের অধিনায়ক। তাঁর নাম আচার্য্য পুষ্পমিত্র।

বৃহদ্রথ কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইলেন সেনাপতির মুখের পানে, কথাটী বুঝতে তাঁর কিছুক্ষণ সময় লাগল। তারপর প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা, সোন-ভাণ্ডারের সব সঞ্চয়ই কি মহারাণী গ্রহণ করেছেন?

—তা তো বলতে পারি না, গিয়ে দেখতে হয়।

—বেশ, চল, আমি এখনই যাব।

সম্রাট্ করতালি দিলেন। গৃহদ্বারে প্রতিহারী অপেক্ষা করছিল, ভিতরে এসে দাঁড়াল। বৃহদ্রথ বললেন,—আমার হস্তী প্রস্তুত করতে বল, আমি এখনি রাজগৃহে যাব।

—আপনি অসুস্থ, রাজবৈদ্য আপনাকে গৃহের বাহির হ'তে নিষেধ করেছেন, প্রভু!

—কী! তুমি ভুলে যাচ্ছ তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ!

—রাণীমারও অনুরূপ আদেশ আছে।

—মহারাণীকে গিয়ে বল গে, মগধ-সম্রাট্ মহারাণীর অধীন ন'ন, তাঁর উপর কারো আদেশ চলবে না। আমার হস্তী এখনই প্রস্তুত হওয়া চাই।

—এ আদেশ নয় প্রভু, আপনার জীবনরক্ষার জন্য এটুকু প্রয়োজন।

—আবার কথা? যাও, আদেশ পালন কর গে—

দৌবারিক নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল।

সম্রাট্ কাঁপতে কাঁপতে বললেন,—কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে?

সেনাপতি এবার মৃদু হেসে বললেন—স্বাস্থ্যের কারণে আজ আপনি প্রাসাদ-মধ্যে নজরবন্দী!...প্রতিহারী, তুমি বাহিরে গিয়ে অপেক্ষা কর গে—

সম্রাট্ বললেন—কিন্তু আমি এত সইব না। আমি এখনই এর প্রতিকার করতে চাই!

—অত ব্যস্ত হবেন না সম্রাট্, বিপদি ধৈর্য্যম্। আপনি চুপ করে থাকুন, আমি ইতিমধ্যে সোন-ভাণ্ডার গুহার সব তথ্য আহরণ করি।

—বেশ, তুমি যাবার ব্যবস্থা কর, আমি আজ মধ্যরাত্রে ছদ্মবেশে প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাজগৃহে যাত্রা করবো।

এর পর আর খেলা জমে না।

অল্পক্ষণ পরে সেনাপতি গৃহে ফিরলেন, গৃহিণীকে বললেন—দেখ, সেনা-বাহিনী আজ থেকে যুদ্ধযাত্রা করবে। অজয়কে বুঝিয়ে ব'ল, এখন না যায়, এই ক'টা দিন বাদ দিয়ে যেন ত্রয়োদশীর দিনে যাত্রা করে।

—তা'তে আর কি সুবিধে হবে?

—ব্যাপার যা পাকিয়েছে তা'তে শেষ অবধি বোধ হয় আর যুদ্ধে যেতে হবে না, মগধ-সম্রাট্ যুদ্ধের ব্যয়ে কোষাগার শূন্য হবার ভয়ে আগেই সন্ধি করবেন। (ক্রমশঃ)

আত্মোন্নতি সমিতির গল্প

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
এম্. এ, বি. এস্-সি

আত্মোন্নতি সমিতির গল্প বলিতে গিয়া ইতিপূর্ব্বে তোমাদের সরলা দেবীর গল্প বলিয়াছি। আমরাও এই সময়ে সরলা দেবীর সহিত পরিচিত হই। আমাদের গুপ্ত সমিতির কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত খুসী হইলেন। বলিলেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনিও এক গুপ্ত সমিতি করিয়াছেন, আমাদের সহিত একযোগে কাজ করিবার ইচ্ছাও তিনি জানাইলেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের দেশ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহার দেশ-হিতৈষণা ও বিপদে ঝাঁপাইয়া পড়িবার সাহস আমাদের মুগ্ধ করিল। ইহার পর তাঁহার বীরাষ্টমী সমিতিতে আমাদের আত্মোন্নতিও যোগদান করিতে সুরু করিল। মনে পড়ে এক উৎসবে আত্মোন্নতি সমিতির তিন বক্সার উপস্থিত হয়। রাজমোহন দাস, শিবনন্দন সিং ও শিবশরণ সিং। শেষোক্ত দু'জন আমাদের স্কুলের দ্বারোয়ানের ছেলে। তাহাদের সমকক্ষ বাঙ্গালী প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া গেল না। তাহারা দুই জন নিজেদের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ করিয়া দেখাইল। রাজমোহন দাসের সহিত শৈলেন বোসের দলের এক বক্সারের মুষ্টিযুদ্ধ হয়। হারলড সাহেব ও ডাক্তার চৌধুরী মধ্যস্থ নির্ব্বাচিত হন। পয়েণ্ট অনুসারে হার-জিত নির্দ্ধারিত হইল। রাজমোহন জয়লাভ করে। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষাকৃত কৃশ ও ক্ষিপ্রকারী ছিল, কিন্তু রাজমোহনের প্রবল মুষ্টিবেগের সামনে সে বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না। লাঠি বা তরবারি খেলায় কিন্তু আত্মোন্নতি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। সরলা দেবীর সমিতির সভ্যগণ ও অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ এ বিষয়ে নাম অর্জ্জন করিয়াছিল।

এইবার আত্মোন্নতি সমিতির সভ্যবৃন্দের কথা কিছু লিখিব।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মাইনর পাশ করিয়া খেলতচন্দ্র ইনষ্টিটিউসন মেনে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে স্কুলটি ছিল। এই-খানে সতীশের সহিত আমার আলাপ ও বন্ধুত্ব। এ বন্ধুত্ব আজীবন স্থায়ী হইয়াছিল। সতীশ এক বৎসরেরও কিছু বেশী হইল মারা গিয়াছে। সে সর্ব্বান্তঃকরণে আমার ভারতের স্বাধীনতা সম্পাদনার্থ গুপ্ত সমিতি সংগঠন কার্য্যের প্রস্তাব গ্রহণ করিল। হরিশ শিকদার, ভুবনেশ্বর সেন, রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধারমণ দাশ আমাদের দলে যোগ দিল। উপরের পাঁচ জনকে আত্মোন্নতি সমিতির সংস্থাপন-সভ্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই সময়ে সতীশের দেশ-হিতৈষণা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। সে সমিতির কাজ বিশেষ উৎসাহের সহিত করিতে থাকে। পরবর্ত্তীকালে সতীশ অরবিন্দের এক চিঠি লইয়া মহারাষ্ট্র দেশে যায় এবং তিলক প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিক নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করে। সতীশ দেখিতে ছোটখাট মানুষটি ও অত্যন্ত শান্ত লোক ছিল। তাহার জীবনের বৈপ্লবিক অংশের কথা অল্প লোকেই জানে। প্রথম জীবনে তাহার সাংসারিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। কিন্তু তাহা সত্বেও সে সমিতির জন্য যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতে বিরত ছিল না। পরবর্ত্তীকালে সতীশ রসায়নের অধ্যাপক হয়। প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজে, পরে চট্টগ্রাম কলেজে এবং সর্ব্বশেষে হুগলী কলেজের রসায়নের প্রধান অধ্যাপক হইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করে।

হরিশচন্দ্র শিকদার

আত্মোন্নতির উন্নতিকল্পে হরিশ শিকদারের দানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিশ পড়াশুনায় বেশী উন্নতি করে নাই কিন্তু তার বৈপ্লবিক নেতৃত্ব-শক্তি খুব বেশী ছিল। যশোর জেলার কোনও গ্রামে হরিশের বাড়ী ছিল; আর কলিকাতায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের উপর, বহুবাজার আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীট জংশনের সন্নিকটে তাহাদের পৈতৃক কতকগুলি খোলার ঘর ছিল। কুল্পীওয়ালা, আমওয়ালা প্রভৃতি অনেক ফেরিওয়ালা উহার ভাড়াটে ছিল। এই সকল লোকের নিকট হরিশ জমিদারের সম্মান পাইত। হরিশ অতি অল্পবয়সে জগুমোহন

নামক বাঙ্গালী ভাবাপন্ন এক উড়িয়া ভদ্রলোকের জিমনাষ্টিকের আখড়ায় খেলা শিখিত। জগুমোহনের সার্কাস করিবার ইচ্ছা ছিল। হরিশ অনেক খেলাতে সিদ্ধহস্ত হয়। আমরা দেখিতাম হরিশ হাতের উপর ভর দিয়া, পা দু'টি শূন্যে তুলিয়া অবলীলাক্রমে বিচরণ করিত। তার হাড়গুলি অত্যন্ত শক্ত ছিল। আমাদের হাড়ের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হইলে মনে হইত যেন কাঠ বা পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লাগিতেছে।

জগুমোহনের শত্রুরা তাহাকে গুণ্ডা বলিত। সে ন্যায়-অন্যায় অনেক-বিধ দাঙ্গা করিত। হরিশ তাহার শিক্ষায় দাঙ্গা ব্যাপারে বেশ পোক্ত হইয়া উঠে। আমরা সঠিক খবর পাইয়াছি—তিন-চার জন ছেলে হরিশকে আক্রমণ করিয়াছে। ব্যাপার সুবিধাজনক নয় বলিয়া হরিশ পশ্চাৎপদ হইল। হরিশের কিন্তু পেছনের দিকেও দৃষ্টি আছে। আক্রমণকারী যদি বেশী উৎসাহী হইয়া হরিশের কাছাকাছি যাইত, হরিশ তখনই ফিরিয়া অগ্রগামী শত্রুকে কয়েকটা ঘুষি বসাইয়া দিয়া অন্যেরা তাহার সাহায্যার্থে আসিবার পূর্ব্বেই চম্পট দিত। হরিশের নেতৃত্বের প্রধান গুণ ছিল যে সে আক্রমণ করিতে ও পলাইতে উভয় কাজেই দক্ষ ছিল। হরিশ ছোটখাট মানুষটি ছিল। গায়ের জোরে সে আমাদের চেয়ে কম হইলেও তাহার ক্ষিপ্রকারিতা খুব বেশী ছিল।

পরবর্ত্তী কালে পুলিসের তীক্ষ্ণ নজরের জন্য আত্মোন্নতি সমিতির বিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করিবার ব্যবস্থা হইল। হরিশ তখন নিজেই একটা দল গঠন করিয়া নেতা হইয়া উঠিল। এই সম্পর্কে তাহার যে সকল কাজ তাহা আমার অজ্ঞাত। এই কাহিনীতে শুধু আমার যাহা জানা আছে তাহাই লিখিতেছি। এইভাবে অন্যেরাও নিজেদের জানা বিষয়টুকুর বর্ণনা করিলেই ক্রমশ: জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসের উপাদান সংগৃহীত হইবে।

আত্মোন্নতি সমিতির সভ্যগণ পরস্পরের প্রতি কিরূপ সদ্ভাব-সম্পন্ন ছিল তাহার একটি ছোট আখ্যায়িকা বলি। কয়েক মাস হইল প্রভাস দে এক ভদ্রলোককে আমার সহিত পরিচিত করিবার জন্য আনিল। পরিচয়ে জানা গেল শিবপদ মুখোপাধ্যায় আত্মোন্নতি সমিতির একজন বিশিষ্ট সদস্য, দেশের জন্য রাজবন্দী হইয়াছিল। বন্দী অবস্থায় পড়াশুনা করিয়া সে ভোটাধিকার সম্বন্ধে এক সুন্দর পুস্তক লিখিয়াছে। আমার কাছে আসার কারণ, যদি আমি হাইকোর্টের কোনও বিচারপতির সহিত আলাপ করাইয়া দিতে পারি, যাহাদের সহিত

শিবপদ নিজ পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারে। আমি শ্রীযুক্ত ফণী চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বিজন মুখোপাধ্যায় মহাশয় দ্বয়ের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিই। উভয়েই তাহাকে বিশেষ সৌজন্যের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ জানিলাম বন্দী অবস্থায় শিবপদ শ্রীপ্রফুল্ল সেন (বর্ত্তমানে মন্ত্রী) ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ রাজনীতিকগণের সহিত পরিচিত হন। শিবপদর পুস্তকে উৎসর্গ-পত্রে দেখিলাম পুস্তকখানি উৎসর্গ করা হইয়াছে পরলোকগত গিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গিরিন্দ্র শিবপদর রাজনৈতিক গুরু। সে বহুবাজার হাই স্কুলের হেডমাষ্টার ছিল,—দেশের জন্য বন্দী জীবন ও নানা দুর্গতি বরণ করিয়াছিল। শিবপদ নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। পুস্তকখানি সে প্রায় চার হাজার টাকা ব্যয়ে প্রকাশ করিয়াছে। কোনও বড় লোকের নামে উহা উৎসর্গ করিলে তাহার হয়তো কিছু ঐহিক সুবিধা হইত। কিন্তু সে তাহা না করিয়া নিজের পরলোকগত গুরুর নামে উৎসর্গ করিয়াছে।

এই গিরিন বন্দ্যোপাধ্যায় হরিশের রাজনৈতিক শিষ্য এবং বন্ধু ছিল। হরিশের মৃত্যুর পর গিরিন তাহার এক জীবন-চরিত লিখিয়া নিজেকে ও আত্মোন্নতিকে স্মরণীয় করিয়াছে।

হরিশের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। বিশেষ, বন্দী হওয়ার জন্য তাহাদের ভাড়াটিয়া ঘরগুলির আদায়পত্র সম্বন্ধে বিশৃঙ্খল হইয়া অবস্থা আরও কাহিল হইয়া পড়ে। তাহার শ্বশুর পল্লীগ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারাই, শুনিয়াছিলাম, তাহার স্ত্রাপুত্রাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হরিশের আর্থিক বিপদে সতীশ ও আমাকে মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিত ভুবনেশ্বর। তাহার কথা আর একদিন বলিব।

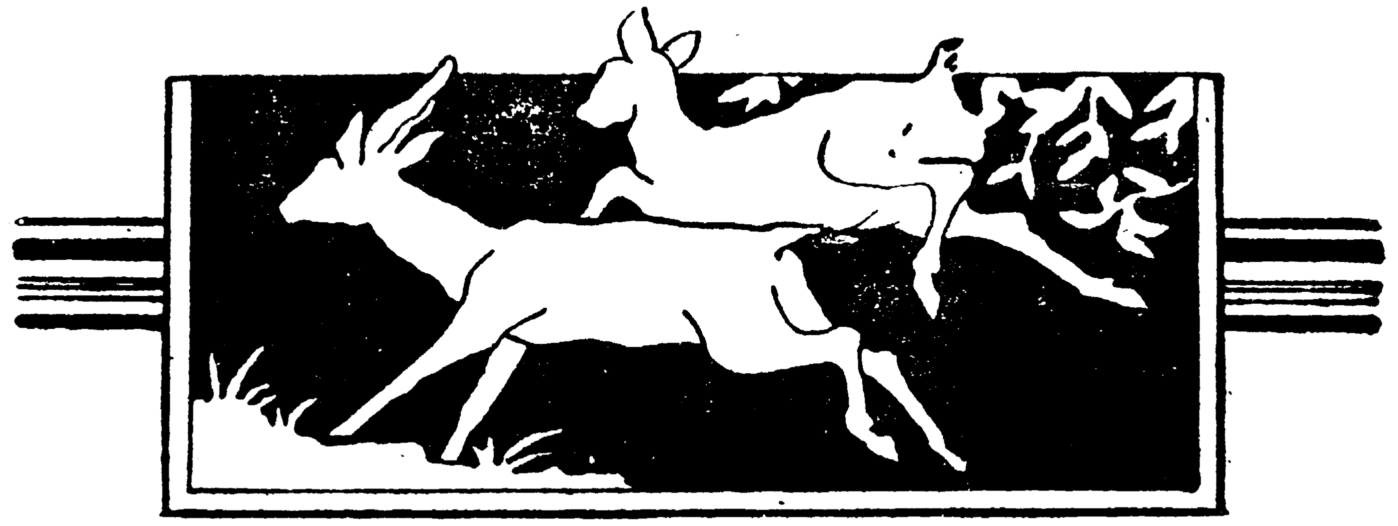

আমার সেই ছোট্ট কালো গাধাটা

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

আমার সেই ছোট্ট কালো গাধাটার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় একটা মেলায়। একটা বেড়ার ধারে আমাদের দিকে পেছন ফিরে সে দাঁড়িয়ে ছিল। জগতের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে সে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন, জগৎও তার সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী ছিল না। প্রথম দর্শনেই ওকে আমার ভারী পছন্দ হয়ে গেল। হেঁটে হেঁটে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম; একটা গাধা আর না হ'লেই নয়। এ কি আর মালপত্র সমেত আমাকে বহন করতে পারবে না? দামেও সস্তা হবে হয়তো।

সারা সহর খুঁজে তবে তার মালিকের সন্ধান মিল্‌ল। একটা দোকানের সামনে গান গেয়ে গেয়ে সে পয়সা উপার্জ্জন করছিল।

"য়্যাঃ, গাধাটা বিক্রীর কথা বলছেন? হ্যাঁ, তা উপযুক্ত দাম পেলে আর আপত্তি কি? তবে, বিক্রী আমি করতাম না, নেহাৎ দিন-কাল খারাপ পড়েছে, তাই। এমন চমৎকার গাধা আর দু'টি পাবেন না মশাই! দিনে বিশ মাইল পথ চলবে, আর মাসে যদি এক মুঠোও দানা খাওয়াতে পারেন তো যে কোন রেসের ঘোড়াকে পেছনে ফেলে যাবে।"

পঞ্চমুখে সে তার গাধার প্রশংসা করে চল্‌ল।—"ওর একটা কি অভ্যাস আছে জানেন? সকালে যদি ওকে একটু দানা খেতে দেন, তার অর্ধেকটা ও বাঁচিয়ে রাখবে—পাছে পরের দিন অভাবে পড়তে হয়। সত্যি বলছি, দিব্যি ক'রে বলছি। ও বুদ্ধি ক'রে নিজের খাবারের থেকে খানিকটা ক'রে বাঁচিয়ে রাখে ব'লে কত দিন এমন হয়েছে যে দুরবস্থায় পড়ে আমাকে ওর সেই সঞ্চয় থেকে চুরি করতে হয়েছে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার এই গাধা তার মালিক আর প্রতিবেশীর দানার তফাৎ করতে পারে কি?"

সে জিভ কেটে বলল, "ওর মত সাধু ত্রিভুবনে আর একটি খুঁজে পাবেন না। স্বয়ং গুরুঠাকুরের মতই ও পবিত্র। সমস্ত পশু যদি ওর মত ধামিক হ'ত তা হ'লে আর বেড়া দেবার কোন বালাই-ই থাকত না।"

ইতিমধ্যে রীতিমত লোক জমে গেছে। তার ছেলেগুলোও ছিল সেখানে—এক ডজনের সব ক'টাই ছিল কিনা অবশ্য বলতে পারব না, তবে, সারা পৃথিবী খুঁজেও যে ওদের জুড়ি পাওয়া যাবে না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। অভব্যতায় প্রত্যেকে প্রত্যেককে ছাড়িয়ে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তার স্ত্রীও ছিল সেখানে—নোংরা, ছেঁড়া পোষাক,—বন্য চেহারা।

তার স্ত্রী বল্‌ল, "তোমার মনে আছে, সেবার যখন আমাদের ছোট খোকা নদীতে ভেসে যাচ্ছিল? ও-ই তো সাঁতরে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে!"

"মনে থাকবে না? বল কি!—মনে পড়ে তোমার, সেই যে ভদ্রলোক ষাট টাকা দিয়ে ওকে কেনবার জন্যে কত খোসামোদ করেছিল?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ষাট টাকা, পূরো ষাট টাকা হাতে দিয়ে—"

"দরদস্তুর সব ঠিক হয়ে গেল, টাকাও পেয়ে গেলাম—"

"কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ও বাগড়া দিলে। আমাদের ছেড়ে যেতে হবে শুনে ওর সে কী কান্না! চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল আর কি! এ সব দেখে-শুনে আর ওকে বিক্রী করা হ'ল না।"

"চুপ্, চুপ্!"—তার স্বামী বলে উঠল, "আস্তে কথা কও! ভুলে যেও না, আমাদের প্রত্যেকটি কথা ও বুঝতে পারে! দেখছ না, কেমন কান খাড়া করে রয়েছে?"

আমি দশ টাকা দর দিলাম।

"দশ টাকা!" চীৎকার ক'রে উঠল সে। "দশ টাকা!" আর্ত্তনাদ করে উঠল তার স্ত্রী। অসহ্য বিস্ময়ে দু'জনেই মুহ্যমান হয়ে পড়ল।

গাধাটাকে আমার বেশ লাগছিল; বেশ কাজ দেবে। অন্ততঃ কতকটা পথ তো ও আমাকে নিয়ে চলুক, তারপর না হয় বিক্রী ক'রেই দেব, নেহাৎ বিরক্ত লাগে যদি।

"দশ টাকা"—আবার দর দিলাম।

"কুড়ি টাকা।"—বলে উঠল সে।

"হায় হায় হায়, আমার এমন সুন্দর গাধা কিনা মাত্র কুড়ি টাকায় বিক্রী হয়ে যাচ্ছে!" তার স্ত্রী আবার আর্ত্তনাদ করে উঠল।

"দশ টাকায়।"—ওকে সংশোধন ক'রে বললাম।

"আচ্ছা বেশ, দশ টাকা, আর ছেলেদের প্রত্যেককে আট আনা ক'রে।"

রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু এখন মনে হয়, তার ঐ অগুণ্তি সন্তান-সন্ততিদের আট আনা ক'রে দেওয়ার চেয়ে কুড়ি টাকায় রাজী হয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হ'ত।

রীতিমত সমারোহের সঙ্গে আমি গ্রাম থেকে বিদায় নিলাম। ডাইনে বিক্রেতা, বাঁয়ে তার স্ত্রী, আর চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ছেলেমেয়ে,—সকলেই আমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করল।

হরেক রকম উপদেশ দিতে দিতে গ্রামের ছেলেরা আমার সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল। ও নাকি ওখানকার শ্রেষ্ঠ রেস্-ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। কেউ বল্‌ল, "সাবধান কিন্তু, হঠাৎ না অদৃশ্য হয়ে যায়!" আমাকে তার পিঠে উঠতে দেখে তাদের হাবভাবে মনে হ'ল, এমন কৌতুককর দৃশ্য এর আগে তারা কখনো দেখে নি।

বিদায়ের সময়ে ছেলেদের করুণ বিলাপে চতুর্দ্দিক মুখরিত হ'ল। পিতা সুরু করতেই মাতা তা'তে সুর যুড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও যোগ দিল তা'তে। তাদের মর্ম্মান্তিক ক্রন্দনে বনভূমি মুখরিত হ'ল।

* * * * *

এতক্ষণে আমরা একা—আমি, আর আমার ছোট্ট কালো গর্দ্দভ।

আমাকে নিয়ে তীরবেগে সে বনের পথে ধেয়ে চল্‌ল। বেশ ভাল সওদা করেছি; এমন তেজী গাধা কেউ কখনো দেখেছে?

বনপথ পেরিয়ে যাবার পর কিন্তু ব্যাপারটা একটু অন্য রকম দাঁড়াল। আর এক পা-ও এগোবে না সে—আমার ঐ পক্ষিরাজ। অনেক অনুনয়-বিনয়, শেষ পর্য্যন্ত অনেক প্রহারেও সে নট্ নড়ন-চড়ন, নট্ কিচ্ছু।

মেলা-ফেরৎ লোকেরা আমাকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে অনেক রকম উপদেশ দিল। একজন বল্‌ল, "পিঠে করে নিয়ে যান না মশাই!"

শেষ পর্য্যন্ত তার পিঠ থেকে নেমে তাকে টেনে নিয়ে চললাম। তাও কি সে রাজী হয়?

এক অদ্ভুত ব্যাপার এতক্ষণে আমার চোখে পড়ল। গাধাটা যেন একটু ঘাবড়ে গেছে; গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে হাওয়ার শব্দ এসে ওকে চমকে দিচ্ছে যেন! চলতে চলতে পথের ধারের একটা গাছের তলায় এসে পৌঁছতেই হঠাৎ ওর সমস্ত আড়ষ্টতা কেটে গেল,—সামলে রাখাই দায়। প্রথমে একটা কান খাড়া করল, তার পর সারা শরীরে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল—জল থেকে উঠে কুকুর যেমন ক'রে গা-ঝাড়া দেয়। পরক্ষণেই সে ঘূর্ণি হাওয়ার মত সবেগে বেরিয়ে গেল। কিছু দূর গিয়ে কিন্তু আবার চুপ্‌চাপ।

আমার ভাগ্য ভাল, এতক্ষণে ওর ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।

ওকে বেঁধে রেখে পাশের জঙ্গল থেকে কতকগুলো ঘাসপাতা ছিঁড়ে আনলাম। তারপর সেগুলো দিয়ে মালা তৈরী করে সযত্নে ওর গলায় আর দু' কানে পরিয়ে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে ও নক্ষত্রবেগে ছুটতে সুরু করল। কানে ওর বনের সঙ্গীত প্রবেশ করেছে, আর কি স্থির থাকতে পারে! মনে করল, ও বুঝি এখনো বনেই রয়ে গিয়েছে!

পরের গ্রামে পৌঁছতে এই অভিনব বিস্ময়,—আমি আর আমার সেই মাল্যশোভিত গর্দ্দভ, দেখবার জন্য সারা গ্রাম ভেঙে পড়ল।

* * * *

সেই ছোট্ট কালো গর্দ্দভটি আজও আমার মনে আছে;—যতদিন সে বেঁচে থাকবে, থাকবেও। শত রকমের প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সত্ত্বেও আমরা মাইলের পর মাইল অতিক্রম করেছি। কিছু পরিবর্ত্তন হয়ত তার মধ্যে দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার প্রভু ঠিক যেমনটি ছিল তেমনিই আছে। এবং তার প্রভু সম্বন্ধে এ অমূল্য তথ্য তারও অজানা নেই।

কিন্তু আজকাল তার সে কী অহঙ্কার! সবুজ রঙের সুন্দর গাড়ীটা কিনে দেবার পর গর্ব্বে তার মাটিতে পা পড়ে না। ক্রমশঃই তার বয়স যেন কমে যাচ্ছে! প্রথম যেদিন তাকে গাড়ীটা কিনে দেওয়া হয়, তার পরে এত বছর কেটে গেল, তবুও তার সেই প্রথম যৌবনের সজীবতা একটুও কমে যায় নি। *

* একটি বিদেশী গল্প থেকে।

মণ্টুর চৈতন্য

ক্যাপ্টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এস্-সি, এম্. বি

হৃষীকেশকে মণ্টু বেশ একটু কৃপার চোখে দেখ্ত। মণ্টু বড়লোকের ছেলে,—স্বাচ্ছন্দ্য আর বিলাসিতার আব্হাওয়ার মধ্যে মানুষ, আর হৃষীকেশ বাস্তুহারা, সহায়-সম্পদহীন;—মণ্টুর ছোট বোন দু'টিকে পড়াবার জন্য সম্প্রতি মণ্টুর বাবা তাকে নিযুক্ত করেছেন। গরীব হ'লেও তার ব্যক্তিত্ব তাঁর ভাল লেগেছিল।

এবার মণ্টুর জন্মদিনে বাবা তাকে একটা "ডার্ট্" খেলা দিয়েছেন। একটা বড় গোল চাকতির গায়ে পর পর অনেকগুলি বৃত্ত আঁকা—একটার ভিতর একটা,—এই ভাবে। মাঝখানে কালো দাগ—'বুল্‌স্ আই'। দূর থেকে তীর ছুঁড়ে সেটাকে বিদ্ধ করতে হবে। এই লক্ষ্যভেদের খেলা মণ্টুকে বিশেষ উত্তেজিত ক'রে তুলেছে।

বন্ধুদের আর বোনদের নিয়ে মণ্টু খেলা সুরু করল। কিন্তু খেলতে গিয়ে দেখল, যত সহজ ভেবেছিল তত নয়। প্রত্যেকের তীরই 'ডার্টে''র ভিতরে না লেগে অনেক বাইরে দিয়ে যেতে লাগল। ফলে একটু পরেই সকলের উৎসাহ এল কমে।

মণ্টু কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নয়। সে ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড়,—বোলার হিসাবে তার একটু নামও ছিল; এ খেলাতেও সবাইকে হারাতে না পার্‌লে মান থাকে কোথায়? কয়েক দিন অভ্যাসের পর সে আবার একদিন তার বন্ধুবান্ধবদের চ্যালেঞ্জ করল। হৃষীকেশকেও ডাকল; সে কোনদিন এ খেলা খেলে নি, নিশ্চয়ই একেবারে কেলেঙ্কারি ক'রে বসবে, এবং তাইতেই মণ্টুর আনন্দ।

খেলা সুরু হ'তেই কিন্তু দেখা গেল উল্টো ব্যাপার। মণ্টু অবশ্যি ঘন ঘন অভ্যাসের ফলে তার বন্ধুদের চেয়ে ভালই করল, কিন্তু তার তীর লক্ষ্যের কাছাকাছিও যেতে পারল না, বুল্‌স্ আই থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়ল। অথচ, আশ্চর্য্য, হৃষীকেশের তীর প্রথম বারেই একেবারে বুল্‌স্ আই ভেদ ক'রে ফেল্‌ল। এবং তার পর প্রতিবারেই।

বলা বাহুল্য মণ্টু প্রথমটা খুবই আহত এবং বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু সে

বুদ্ধিমান্ ছেলে, একটু পরেই বুঝল নিশ্চয়ই তার এমন কোন ত্রুটি হচ্ছে যার জন্য এত চেষ্টা ক'রেও সে সফল হ'তে পারছে না। অবশেষে সে আত্ম-অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে হৃষীকেশের কাছে হাজির হ'ল; হৃষীকেশ হয়তো তার ভুল বুঝিয়ে দিতে পারবে।

হৃষীকেশ একটু অবাক্ হ'লেও খুসীও হ'ল যথেষ্ট। বল্‌ল, "বেশ তো, এস, এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক্।

"প্রথমেই ধর, তুমি লক্ষ্যস্থানটি ভাল ক'রে দেখতে পাও নি নিশ্চয়। তুমি যদি বল, না, তোমার দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর, তা হ'লে মনে করতে হবে তুমি ওটা দেখেছ বটে কিন্তু ঠিক দেখার মত ক'রে দেখ নি। ঠিক মত দেখতে গেলে লক্ষ্যস্থলের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও ভাল ক'রে দেখে নিতে হবে যে! বোর্ড্‌টার ঠিক কোন্‌খানে গোল দাগটা আছে, সেখান থেকে ওপরটা, নীচেটা, এ-পাশটা, ও-পাশটা কতখানি দূরে আছে তাও আন্দাজ করতে হবে; বৃত্তগুলির দূরত্বও। তা ছাড়া তোমার কাছ থেকে বোর্ডের দূরত্বটাও আন্দাজ করা দরকার। এই অভিনিবেশ সহকারে দেখার ওপরই নির্ভর করে কৃতকার্য্য হওয়া। আর এই দেখা কাজটা শুধু যে আমাদের চোখ দিয়েই হচ্ছে তা নয়, চোখের পেছনে যে মনটা সংযুক্ত আছে তারই কাজ হচ্ছে এখানে বেশী। যখন তুমি দেখছ সেই সময় মন যদি অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে তা হ'লে তোমার দেখাতে ব্যাঘাত ঘটবেই। যেমন ধর, বই পড়তে পড়তে যদি খেলার কথা ভাব তা হ'লে দেখবে একটু পরে বইএর লেখা কিছুই মনে পড়ছে না। লেখার অক্ষরগুলো তোমার চোখে ঠিকই পড়ছে কিন্তু মনের মধ্যে তার ছাপ পড়ছে না। তাই ঐ রকম হচ্ছে। কাজেই ভেবে দেখ, তুমি কি মন ঠাণ্ডা রেখে—অচঞ্চল রেখে লক্ষ্যস্থল দেখছিলে?

"শুধু এই নয়, আরও একটি বড় কারণ আছে তোমার অসাফল্যের। দেখবার সময় তুমি হয়তো শুধু লক্ষ্যটাই দেখছ না, তার চার পাশে আরও অনেকখানি দেখছ। ফলে মন যা চায় তার বাড়তির মধ্যে পড়ে ঘুলিয়ে যাচ্ছে। মহাভারতে অর্জ্জুনের সেই গল্পটা জান তো? গুরু দ্রোণাচার্য্য যখন দুর্য্যোধন, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি শিষ্যদের লক্ষ্যভেদের পরীক্ষা করবার আগে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি দেখছ?' উত্তর এল—'গাছ', 'ডাল', 'পাখী'। আর এদিকে সবাই হ'ল লক্ষ্যভ্রষ্ট। কিন্তু তিনি যখন অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি

বললেন, 'কেবল পাখীর চোখই দেখছি।' এবং কেবল তিনিই লক্ষ্যভেদে কৃতকার্য্য হ'লেন। তাঁর সেই অদ্ভুত মানসিক স্থৈর্য্য আর সাধনার জোরেই তিনি অত বড় হ'তে পেরেছিলেন।

"আর একটি বিষয়ে সচেতন হ'তে হবে। লক্ষ্যস্থল যখন ঠিক দেখতে চোখ অভ্যস্ত হয়ে পড়ল তখন মনকে আন্দাজ করতে হবে হাত কতখানি ওপরে তুললে, কি রকম অবস্থাতে শরীরের বিভিন্ন অংশকে রাখলে এবং তীরটা কত হাল্কা বা ভারী ভাবে—কত জোরে ছুঁড়লে তবে গিয়ে লক্ষ্যস্থলে বিঁধবে। এই "অবস্থান-অনুভবের" শক্তিকে বাড়াতে হবে, তবেই এ সব ক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হ'তে পারবে।

"এখন দেখা যাক্, কি ক'রে এই চোখ আর মনকে এক যোগে কাজ করাবার সাধনা করা যায়। ঘড়িতে দেখেছ, ১২ ঘণ্টার ১২টি সংখ্যা, আর ৬০ মিনিটের ৬০টি দাগ। দু'টো কাঁটার অবস্থান দেখে আমরা বলে দিই ক'টা বেজে ক' মিনিট হয়েছে। চোখ আর মনের একত্র হয়ে কাজ করার শক্তি যখন বাড়তে থাকবে তখন আমরা কেবল ১২, ৩, ৬, ৯ এই সংখ্যাগুলো দেখেই ঠিক সময় বলে দিতে পারব; এবং ক্রমে সংখ্যা ছাড়াও কেবল কাঁটা দু'টি দেখেই বলা চলবে। এমন কি শুধু ছোট কাঁটা দেখেই ঠিক ঠিক সময় বলে দেওয়াও অসম্ভব হবে না। অবশ্যি তা'তে সময়ের দরকার।

"মনকে সংযত ক'রে কি ভাবে একটা বিষয়ে নিবদ্ধ করা যায় তার একটা প্রক্রিয়া বলে দিচ্ছি। শরীর ও মনকে বেশ ঢিলে ক'রে আরামে এক জায়গায় বস। চোখ বন্ধ ক'রে দু'হাত দিয়ে চোখ দু'টিকে ঢেকে দাও, যেন চোখে ও নাকে অযথা চাপ না পড়ে। তখন কিছুই দেখতে পাবে না। কেবল অন্ধকার, তাও খুব গাঢ় নয়। চোখেই যেন দেখতে পেলে না কিন্তু মনটি ছুটে চলেছে দড়ি-ছেঁড়া গরুর মতন এদিকে ওদিকে। তাকেও সংযত করতে হবে। কি ক'রে? কোন একটা সুখকর অথচ গতিশীল বিষয়ের কথা ভাবতে হবে—যেমন ধর ফুটবল খেলা, স্পোর্টসের দৌড়, চলন্ত ট্রেনে ভ্রমণ বা সিনেমাতে ঘোড়ার বা মোটর গাড়ীর তীব্রবেগে চোর-ডাকাতের পেছনে তাড়া করা ইত্যাদি। রোজ নিয়মিত এই রকম ৫।১০ মিনিট করলে শরীর ও মনের সদা-আড়ষ্ট ভাবটা কেটে যাবে। তখন দেখবে চোখ বন্ধ করলেই কেবল কালো—কালো—আর কালো! তখনই বুঝবে চোখ ও মনের বন্ধুত্ব বেশ গাঢ় হয়েছে, আর সব কাজেতেই

মনঃসংযোগ করবার শক্তি অনেক বেড়ে গেছে। একাগ্রতা ও দৃষ্টিশক্তির প্রখরতাও সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে।

"এমনি ক'রেই মনকে সংযত ক'রে একটা বিষয়ে নিবদ্ধ করতে হবে। কি ক'রে? এর জন্য একটা মজার কৌশল আছে মন আর চোখকে একত্র কাজ করাতে শেখাবার। সেটাও দেখাচ্ছি।" এই ব'লে হৃষীকেশ তার টেবিলের একখানা বইএর মধ্যে থেকে একটা ছবি বার করে নিয়ে এসে বললে—"এতে ক'টা ব্লক্ দেখতে পাচ্ছ?" মণ্টু দেখেই বললে, "ছ'টা।" কিন্তু পরক্ষণেই দেখলে সাতটা। আবার দেখছে ছ'টা। চোখের সঙ্গে যেন বেশ লুকোচুরী খেলছে। মণ্টুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে হৃষীকেশ বল্‌লে, "তুমি দেখছ ছ'টা। যখনই তোমার মন চাইবে দেখতে সাতটা তখনই কিন্তু তুমি সাতটা দেখতে পাচ্ছ না। হঠাৎ আপনা থেকে কখন সাতটা হয়ে যাচ্ছে! এখন, চোখকে শিক্ষা দিতে হবে দেখবার জন্যে ছ'টা বা সাতটা, মন যখন যেটা দেখতে চাইবে। তুমি যতই জোর ক'রে দেখতে চেষ্টা করবে, ততই ছয় যেন আর সাতে পরিবর্ত্তিত হ'তে চাইবে না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে চোখ ও মন ঢিলে ক'রে দিয়ে সাধারণ ভাবে ওটাকে দেখ্‌বে, তখনই সাত ছয় হবে বা ছয় সাত হবে। এই রকম ক'রে চোখকে

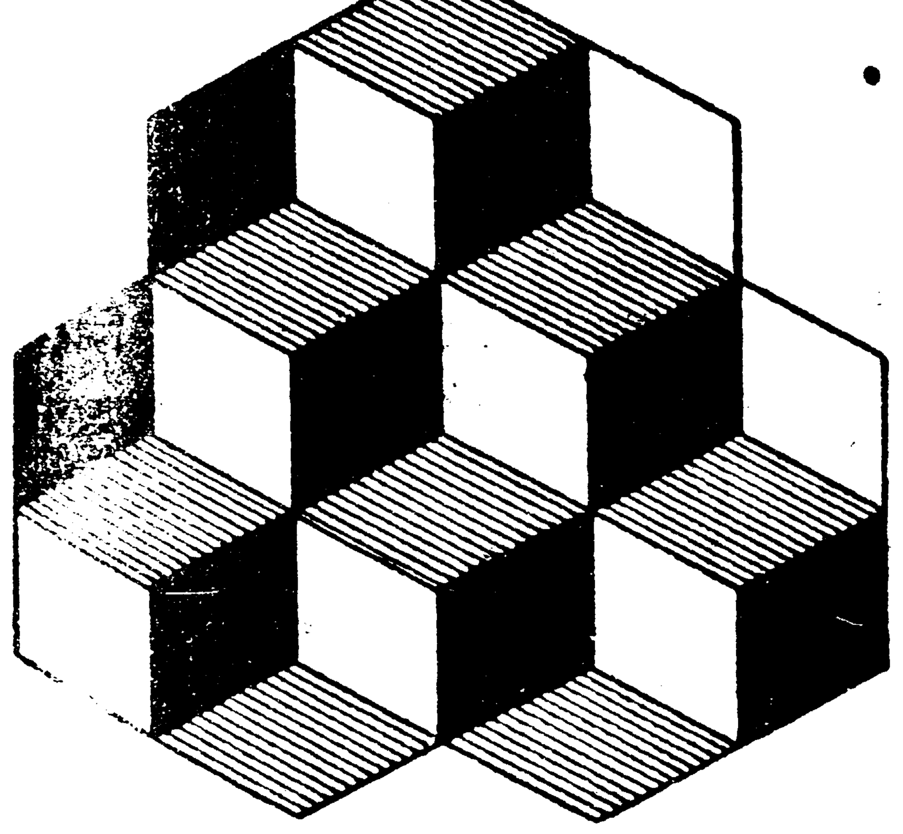

এতে ক'টা ব্লক্ দেখতে পাচ্ছ?

শিক্ষা দিলে ক্ষীণদৃষ্টিও প্রখর হবে এবং সব কাজেই মনঃসংযোগ করবার শক্তিও বেড়ে যাবে।"

মণ্টু লজ্জিত হ'ল। বাস্তবিক তাই-ই তো! লক্ষ্যভেদের সময় তার মনে ছিল হিংসা আর কুচিন্তা. একাগ্রতা মোটেই ছিল না। তাই সে খেলায় আনন্দও পায় নি, কৃতকার্য্যও হয় নি।

চোখকে "ঠিক মত" দেখবার শিক্ষা দিলে চোখ খারাপের দুর্ভাবনা থেকে উদ্ধার পাবে, আর খারাপ চোখও ভাল হয়ে যাবে।

রক্ত-কাহিনী

অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এস্-সি, এম্. বি

আমাদের শরীরে রক্তের দরকার এত বেশী যে কারো এক ফোঁটা রক্তপাত হ'তে দেখ্‌লেই আমরা শিউরে উঠি। বলি, এক সের রক্তপাত হ'ল—না জানি কি অনর্থ ঘট্‌বে! অথচ রক্ত সম্বন্ধে মোটামুটী একটা ধারণা আমাদের প্রায় কারুরই নেই।

আমাদের শরীরের জীবকোষগুলি রক্তের সাহায্যে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। তাদের দরকারী জিনিষ বাইরে থেকে রক্তের দ্বারা সংগ্রহ করে ফবং জঞ্জালগুলি রক্তের মধ্য দিয়েই বাইরে ফেলে দেয়। তোমরা হয়তো জান যে রক্ত থাকে শরীরের ভিতর রক্তবাহী নালীর মধ্যে, আর হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনের ফলে তা ইতস্ততঃ চলে বেড়ায়। এইভাবে আমাদের অন্ত্রগুলির ভিতর দিয়ে যখন রক্ত চলাচল করে তখন তা সেখান থেকে জীর্ণ খাদ্যদ্রব্যগুলি সংগ্রহ ক'রে জীবকোষে জোগান দেয়, আর ফুস্‌ফুস্ থেকে অক্সিজেন বাষ্প নিয়ে সেখানে সরবরাহ করে। ফলে জীবকোষগুলি পুষ্টিলাভ করে এবং খাদ্যদ্রব্য দহন ক'রে জীবধর্ম্ম পালনের শক্তি পায়। এই দহনের ফলে যে সব অঙ্গারাম্ল ও অন্যান্য দূষিত বস্তু উৎপন্ন হয়, তারা রক্তের সাথে বৃক্ক, ত্বক্ ও ফুস্‌ফুসে চলে আসে, তারপর শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। সুতরাং জীবকোষদের পক্ষে বাইরের জগতের সঙ্গে আদান-প্রদান রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে—সতত প্রবহমান রক্ত। তোমরা মনে করতে পার যে সর্ব্বদা লেন-দেনের ফলে রক্তের উপাদান ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রক্তের উপাদানের তারতম্য ঘটে না, তার পরিমাণও সর্ব্বদা এক রকম, এমন কি উত্তাপেরও ব্যতিক্রম নেই।

আমাদের শরীরে মোটামুটী ৫½ লিটার অর্থাৎ প্রায় ৬ সের রক্ত আছে; এক লিটার হচ্ছে ৩৫ আউন্স। কিন্তু রক্তবাহী নালীদের আয়তন ওর চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং আমাদের এত রক্ত নেই যে শরীরের সমস্ত রক্তবাহী নালীগুলিকে সব সময়ে সমানভাবে রক্ত দিয়ে পূর্ণ ক'রে রাখা যায়। কাজেই রক্তসঞ্চালন যন্ত্রকে এমন ভাবে কাজ করতে হয় যে শরীরের যে অঙ্গ যখন ক্রিয়াশীল এবং যেখানে সেইজন্যে বেশী রক্তের দরকার, সেখানে বেশী রক্ত যায়

এবং অন্যান্য জায়গায় রক্তের অভাব ঘটে। এই জন্যে এক সঙ্গে দু'-তিন রকমের কাজ মানুষ সমান ভাল ভাবে করতে পারে না। বেশী খাবার পরে পরিপাক-ক্রিয়ার জন্য বেশীর ভাগ রক্ত যখন অন্ত্রে জমা হয় তখন মস্তিষ্কে বা মাংস-পেশীতে রক্তের অভাব ঘটে। সেই জন্য পরিপূর্ণ আহারের পর মস্তিষ্ক চালনা বা দৈহিক পরিশ্রমের কাজ আমরা ভাল ক'রে করতে পারি না। সেই কারণেই অত্যধিক মস্তিষ্ক চালনাকারী লোকেরা অজীর্ণ রোগে ভোগেন।

রক্ত লাল, অস্বচ্ছ, তরল জিনিষ। রক্তের রংএর ও অস্বচ্ছতার কারণ হচ্ছে যে ওর মধ্যে রক্তরস নামে স্বচ্ছ তরল পদার্থে তিন রকম জিনিষ ভাসমান অবস্থায় আছে। তাদের মধ্যে প্রধান জিনিষ হচ্ছে লোহিত রক্ত-কণিকাগুলি এবং এদের জন্যেই রক্তের রং লাল। বাকী জিনিষগুলির নাম শ্বেত রক্তকণিকা ও অনুচক্রিকা। এবারে এদের বিষয়ে একে একে আলোচনা করা যাক্।

সমগ্র রক্তে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ কোটী এবং তাদের প্রধান উপাদান হ'চ্ছে ৮০০।৯০০ গ্র্যাম (প্রায় এক সের) হিমোগ্লবিন নামে লৌহ-গঠিত লাল পদার্থ। এই হিমোগ্লবিনের সাহায্যে লোহিত রক্তকণিকারা ফুস্‌ফুস্ থেকে অক্সিজেন বাষ্প সংগ্রহ করে ও তা বহন ক'রে জীবকোষসমূহে জোগান দেয়, এবং জীবকোষে তৈরী অঙ্গারাম্ল বাষ্প ফুস্‌ফুসে ফেরৎ এনে দেয়। এই জন্য শরীর থেকে বিষাক্ত অঙ্গারাম্ল বাষ্পের নিষ্ক্রমণের হেতুও হিমোগ্লবিন ও লোহিত রক্তকণিকাসমূহ। সুতরাং আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াও লোহিত রক্তকণিকা ও হিমোগ্লবিনের উপর নির্ভর করে। এদের অভাবে এনিমিয়া বা রক্তাল্পতা রোগ হয় এবং হিমোগ্লবিনের অল্পতার দরুণ অক্সিজেন বাষ্প পাওয়ার বা অঙ্গারাম্ল বাষ্প বার করে দেবার বাধা ঘ'টে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়।

লোহিত রক্তকণিকা গোষ্ঠীকে এরিথ্রন বলা হয়। এদের সমষ্টিভূত আয়-তন হচ্ছে ২½ লিটার (প্রায় ৩ সের), এবং সমষ্টীভূত তল হচ্ছে ৩৫০০০ বর্গ ফুট (প্রায় ২½ বিঘা)। এরা ১ লিটার অক্সিজেন বাষ্প একসঙ্গে বহন করতে পারে এবং রক্তবাহিত অঙ্গারাম্ল বাষ্পেরও চতুর্থাংশ বহন করে। এই লোহিত রক্ত-কণিকারা মৃত জীবকোষ। জীবকোষের ভিতর যে 'নিউক্লিয়াস' থাকে তা এদের মধ্যে নেই। এরা আকৃতিতে চক্রাকার কিন্তু মাঝখানটা পরিধি থেকে সূক্ষ্মতর। এদের প্রত্যেকের ব্যাস ৮ মাইক্রন এবং স্থূলতা ২ মাইক্রন। ১ মাইক্রন হচ্ছে ১/১০০০০০০ মিটার, এবং এক মিটার হচ্ছে ৩৯·৩৭ ইঞ্চি। প্রত্যেক লোহিত রক্ত-

কণিকাতে ৩০ গ্যামা গ্যামা হিমোগ্লবিন থাকে(১ গ্যামা গ্যামা = $\frac{১}{১০০০০০০০০০০০০}$ গ্র্যাম্। একটী লোহিত রক্তকণিকার আয়তন ৯০ ঘন মাইক্রন এবং তল ১২৮ বর্গ মাইক্রন। এক ফোঁটা রক্তে প্রায় ২৫ কোটী লোহিত রক্তকণিকা থাকে।

লোহিত রক্তকণিকারা রক্তে ২।৩ মাস থাকার পর নষ্ট হ'য়ে যায়। হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে আমাদের প্রত্যেকের শরীরে দৈনিক ১৫০০ কোটী লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংস হচ্ছে। সুতরাং রক্তের সমতা রক্ষার জন্য প্রত্যহ ১৫০০ কোটী লোহিত রক্তকণিকা আমাদের তৈরী করতে হচ্ছে। এর জন্যে প্রত্যহ ২৫ গ্র্যাম হিমোগ্লবিন দরকার, এবং তার জন্য ৮০ মিলিগ্রাম লোহা, ভাল প্রোটিন্ খাবার ও বিভিন্ন ভিটামিনেরও আবশ্যকতা আছে। এদের অভাবে লোহিত রক্তকণিকা যথেষ্ট মাত্রায় তৈরী হয় না—ফলে রক্তাল্পতা ঘটে। আজকালকার দুর্ম্মূল্যের বাজারে ঠিক মত খাদ্যের অভাবে তাই বহু লোকে অল্পবিস্তর রক্তাল্পতায় ভুগ্ছে। রক্তকণিকা তৈরীর কারখানা হচ্ছে অস্থিমজ্জা।

রক্তের অন্যান্য উপাদান সম্বন্ধে তোমাদের আর একদিন বল্ব।

ধন্বন্তরী

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

আশ্চর্য্য কাণ্ড!

আসলে অসুখটা যে কি তা-ই ধরতে পাচ্ছেন না গদাধর বাবু! বোঝ তা হ'লে ব্যাপারখানা! যে সে ডাক্তার নয় তো, গদাধর মিত্র স্বয়ং,—জি, ডি. মিটার এম্ বি, এল্. ডি. টি. এস্ (ফিলাডেলফিয়া), আর. জেড (হ্যালিফ্যাক্স)। যাঁর নাম শুনলে খোঁড়ারও নাকি পা গজিয়ে ওঠে!

ষ্টেথসকোপের মুখটাকে আর একবার নিজের বুকের ওপর চেপে ধরলেন গদাধর বাবু। না, কই! ঠিক আছে ব'লেই তো মনে হচ্ছে সব! শুয়ে শুয়ে যত রকম করা যায় কিছুই বাকি রাখেন নি—এই আধঘণ্টাখানেক ধ'রে। ফুস্ফুস্, লিভার, নাড়ি-ভুঁড়ি, পাকস্থলী, কিড্নী—কোথায় যে বেকায়দা বুঝতে পাচ্ছেন না। অথচ এমন অসহ্য যন্ত্রণা—!

গদাধর মিত্রের কপালে এই শীতেও ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠল। আর কতক্ষণই বা? সবই তো ফুরোলো ব'লে! গদাধর বাবু চোখ বুঁজলেন। চোখের কোল বেয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো বালিশে। অস্পষ্ট গলায় বড় ছেলেকে বললেন—"যে রকম বলি, লিখে যাও;—আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির—"

চোখে আঁচল চেপে গিন্নী এবার হু-হু ক'রে কেঁদে উঠলেন। যাকে বলে মড়া-কান্না! গদাধর চমকে উঠলেন। তা হ'লে সত্যিই মরে গেলেন নাকি তিনি? নিজের গায়ে চিমটি কেটে পরখ করলেন। কই না, এখনো তো মরেন নি! কিন্তু আর কি আশা আছে?

—"ডক্টর দত্তগুপ্তকে একবার ফোন করবো বাবা?"—কানের কাছে মুখ নিয়ে শিবেন চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞেস করলো একবার। তৎক্ষণে, কে জানে কেন, যন্ত্রণাটা খানিক প'ড়ে গেছে গদাধর মিত্রের। (এতদিন রোগ নিয়ে খেলা করেছেন ডাক্তার, এবারে রোগ একটু ডাক্তারকে নিয়ে খেলা করছে নাকি?) সে যাক গে। কথাটা শুনে এমন চোখ ক'রে তাকালেন গদাধর, যে ছেলের আর দু'বার দত্তগুপ্তর নাম উচ্চারণ করবার সাহস রইলো না।

"এখনো বয়স অল্প আছে তোমার শিবেন, এখনো অনেক কিছু দেখতে-শুনতে বাকি। আমার তো জানতে বাকি নেই কোন ব্যাটার মগজে ক' তোলা ঘিলু!......যদি ডাকতেই হয় তো একবার ব্রজেন চাটুয্যেকে ডাক। হুঁ। একমাত্র সে-ই পারবে যদি পারার হয়।"

য়্যাঃ, এ কি প্রলাপ সুরু হ'ল! ব্রজেন চটুয্যে! যার প্যান্টে কম ক'রেও পাঁচটা তালি, জুতোয় সাতটা; যার ভুঁড়ি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়লেও কোট সেই একটাই আছে, ফলে শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস বাধ্য হয়েই যার বোতামগুলো খুলে রাখতে হয়।—সেই ভাঙ্গা ষ্টেথস্কোপ গলায় হাতুড়ে ডাক্তার ব্রজেন চাটুয্যে!

গদাধর একটু থেমে বল্লেন, "অবাক্ হচ্ছ? হুঁ। কিন্তু আমরা এক সঙ্গেই ডাক্তারী পড়্তাম হে! ফাইনালে ওই ফার্ষ্ট হয়েছিল্ কিন্তু। আর আমি ফোর্থ।"

তখন ফোর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু এখন চৌতালা বাড়ী মিত্তিরের, আর চাটুয্যের একতলাও জোটে নি!

সাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে গদাধর আবার মিহিগলায় বললেন—"যদি কাউকে ডাকতে হয় তো ব্রজেনকে।—"

তবুও একটুকাল দাঁড়িয়ে রইলো শিবেন। কিছু বলতে সাহস করলো না, কিন্তু এবার সন্দেহ হ'ল অসুখটা বাবার পেটে না মগজে!

ব্রজেন ডাক্তার কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু একটু পরেই সে ভাবটা সামলে নিয়ে বললেন, "আচ্ছা, তুমি যাও, আমি একটু বাদেই আসছি।"

তবু একটু আপত্তি তুল্লো শিবেন—"গাড়ী নিয়েই এসেছি একেবারে।"

"না না, বললাম তো একটু পরে যাবো।"—গলাটা একটু বেশী চড়াই হয়ে গেলো বুঝি!

কি একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলো শিবেন। আট আনা ভিজিট দিয়েও কেউ ডাকে না এমন ডাক্তার,—তার আবার তেজ দেখ না!

কিন্তু আজ তার কাছেই দরকার, আজ ভিজে বেড়ালের মতই থাকতে হবে।

শিবেনকে বিদায় ব্রজেন চাটুয্যে মন ঠিক ক'রে ফেললেন। সেই ছাত্রজীবন থেকে

গদাধর তাঁর সঙ্গে শুধু শত্রুতাই করে এসেছে। অত ভাল ছাত্র হ'য়েও জীবনে তিনি কিছুই করতে পারেন নি, সে কার জন্য? ঐ গদাধরেরই চক্রান্তে। পদে পদে অপমান, পদে পদে ষড়যন্ত্র। গদাধরই তো তাঁর জীবন মরুভূমি করে দিয়েছে! কী শাস্তি দেওয়া যায়? কী শাস্তি আবার! একেবারেই দাও না গদাই মিত্তিরের ভবলীলা সাঙ্গ ক'রে! ডাক্তারের নিজের অসুখ হ'লে সে আর ডাক্তার থাকে না। সাপের বিষ দিলেও ওষুধ ব'লে চেটে খেয়ে নেবে। আর—

আর ওষুধ যদি না ধরে তবে কি ডাক্তার দায়ী?

ব্রজেন চাটুয্যেকে দেখেই গদু মিত্তির কেঁদে ফেললেন। চাটুয্যে মনে মনে বললেন, 'কাঁদো, কাঁদো, প্রাণ খুলে কেঁদে নাও এ-জন্মের মত। আর কতক্ষণ বা আছ!'

"আমাকে, ভাই, বাঁচিয়ে দে। তুই যা চাস্—।"

কিন্তু ভূতের মুখে রাম নাম শুনে গলবার পাত্তোর ব্রজেন চাটুয্যে ন'ন। তবু, মনের কথা তো মুখে বলা যায় না! হাতের ওপর আস্তে একটু আঙ্গুল ছুঁইয়ে বলতে হ'ল—"চাওয়া-পাওয়ার আছে কি? তোকে সারানোই তো আমার সব পাওয়া!"

মনে মনে বল্লেন, 'হ্যাঁ, সারাতে হ'বে বৈকি, দফাটিই সেরে দিতে হবে।'

খস্‌খস্ ক'রে একটা মিকশ্চার লিখে দেন ব্রজেন চাটুয্যে। বলেন—"আজ রাত্তিরে দু' দাগ খাইয়ে দিও, তারপরে কাল ভোরে—।"

ভোর হবার দেরী আছে ঢের। কিন্তু কিছুতে দু'চোখের পাতা এক করতে পাচ্ছেন না ব্রজেন চাটুয্যে। একা একা ঘরময় পায়চারী ক'রে বেড়াচ্ছেন। কাটা পাঁঠার মত ছট্‌ফট্ করছে বুকের ভেতরটা।

সাধারণ পেট-ব্যথার রোগী,—তাকে দিয়েছেন কিনা ক্যানসারের ওষুধ!—গোখরো সাপের বিষ থেকে যা তৈরী! এতক্ষণে হয়ত কাজ শেষ হয়ে গেছে। চলে গেছে হয়ত সটান কেওড়াতলায়। কিন্তু শত্তুরের তো শেষ নেই চারদিকে, এখন আবার পুলিশের হাঙ্গামা না হ'লে বাঁচোয়া!

ফড়েপুকুরের ব্রজেন চাটুয্যের ঝুরঝুরে বাড়ীর সামনে চকচকে গাড়ীর থেকে অ-ত সকালে হাসিখুসি মুখে নামলেন স্বয়ং গদাধর মিত্তির। আর তাঁকে দেখে পিলে চমকে গেলো চাটুয্যের, মাথার চুল লাফিয়ে লাফিয়ে খাড়া হয়ে উঠলো। রাম, রাম, রাম, রাম। পতিত-পাবন সীতারাম!

কিন্তু কই! নাঃ, ভূত হ'লে এতক্ষণে মিলিয়ে যেত নির্ঘাত! দস্তুর মত এসে হতভম্ব ব্রজেন চাটুয্যের ডান হাতখানা ধ'রে একখানা রাম ঝাঁকুনি দিলেন জলজ্যান্ত গদাধর

মিত্তির। তারপর সারা মুখে পেটেন্ট একটি অমায়িক মধুর হাসি ছড়িয়ে বললেন—"আমি তখুনি বলেছিলাম না! যদি কেউ আসল অসুখ ধরতে পারে তো ব্রজেন আমাদের। আমারও যেন অমনি মনে হয়েছিল একবার, তবে তুই একেবারে ঠিকই ধরেছিলি। কেবল উৎকট ক্যান্সার কিনা, সেজন্যে দু' দাগ ওষুধেই কাজ হয়ে গেছে। দেখছিস্ না, এক রাত্তিরেই কেমন ঝরঝরে হয়ে গেছি?"

গ্রীষ্ম

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

বাষ্পপূরিত তপ্ত গগন,
ক্ষীণ জলাশয়-বারি,
রবির কিরণে সবাই ক্লিষ্ট,
দিশাহারা পথচারী।
থাকিয়া থাকিয়া ঝটিকার দাপ,—
বিষম প্রমাদ জানি
ঝঞ্ঝা ডাকিছে পবনের মায়ে
বাঁচাতে কুটীরখানি।
শিলার লোষ্ট্র কখন বরষে,
হরষে বালকদল
সংগ্রহ তরে ব্যস্ত চরণে
তুচ্ছে ঝড়ের বল।

চাতকের সম পল্লীকৃষক
চাহিছে ঊর্দ্ধদৃষ্টি,
ধনীর হর্ম্ম্যে কত না নর্ম্মে
শীতকক্ষের সৃষ্টি!
বিদ্যুৎ-বলে করে নাগরিক
স্নিগ্ধ আপন কায়া,
গ্রাম্য শ্রমিক— সম্বল তার
বটবৃক্ষের ছায়া।
অসহ্য দাহে ছুটিছে মহিষ
শীর্ণ তটিনী-নীরে,
হাটে মাঠে বাটে চলে হলবাহী
জীর্ণ বস্ত্র শিরে।

উদ্যানে পাকে আম্র কাঁঠাল,
কদলী, লিচু না কত,
নাহি লাগে ভোগে তাদের, যাহারা
প্রস্তুতে ইহা রত।
হাসে মল্লিকা কুসুম কাননে,
যূথিকা গন্ধরাজ,

কৃষ্ণকলিকা হাসিছে সলাজে,
পাটলীর কিবা সাজ!
গরমে শান্তি ভুঞ্জ এবার,
স্কুল কলেজের ছুটি,
ছোট আছ যারা খাও গো তাহারা
আনন্দে লুটোপুটী।

সেকালের গল্প: জলধর দা'র চা পান

সকালে উঠেই এক পেয়ালা গরম চা খেতে না পেলে তোমাদের অনেকেরই বোধ হয় শরীরের জড়তা ভাঙ্গে না। বিশেষ ক'রে সহর অঞ্চলে তো কথাই নেই, প্রত্যেক ঘরে ঘরে ভোরে উঠেই চায়ের পাট। এমন কি রাস্তার মুটে, মজুর, জমাদার, ঝাড়ুদার—এরাও অনেকে চা ছাড়া থাকতে পারে না। পাড়াগাঁয়েও চায়ের রেওয়াজ আজকাল নেহাৎ কম নয়।

কিন্তু এমনটা বরাবর ছিল না। চা যদিও আমাদের বাংলা দেশেরই অঞ্চল বিশেষে উৎপন্ন হয় তবুও চা খেতে শিখেছি আমরা সাহেবদেরই কাছে। ৭০।৮০ বছর আগে পাড়াগাঁয়ে তো দূরের কথা, সহরেও খুব আধুনিক পরিবার ছাড়া চায়ের আদর বড় একটা দেখা যেত না। তখনকার দিনের চা খাওয়ার একটা গল্প তোমাদের শোনাচ্ছি। গল্পটি বলেছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক জলধর সেন মশাই—যিনি নাকি ছিলেন ছোট-বড় সব সাহিত্যিকেরই সরকারী দাদা—"জলধর দা"।

প্রায় ৭৫ বছর আগেকার কথা। জলধর দা'র তখন বয়স অল্প, থাকতেন নিজেদেরই গ্রামে। সেই গ্রামেরই এক ভদ্রলোক পোষ্ট অফিসের চাকরী নিয়ে "সুদূর" জলপাইগুড়ি

জেলায় বদলী হলেন। 'সুদূর' কথাটা শুনে হেস না—কেননা বাংলার অন্যান্য জায়গা থেকে জলপাইগুড়ি তখন সুদূরই ছিল। তখনও ওদিকে ট্রেন হয় নি, নৌকো ক'রে নানা পথ ঘুরে পদ্মা ডিঙ্গিয়ে সেখানে পৌছতে অনেক দিন লেগে যেত।

যাই হোক্, সে সময়ে বিদেশে যাঁরা চাকরী করতে যেতেন তাঁরা সুবিধে পেলেই নানা ভাবে সাহেবিয়ানা দেখাতেন। এ ভদ্রলোকটিরও সে অভ্যাস ছিল। তিনি নিজের পদবী 'চক্রবর্ত্তী' পাল্‌টিয়ে বলতেন "চেকারভেটি"। ফলে হ'ল এই, গাঁয়ের লোকেরা অত সাহেবী নাম সামলে উঠতে না পেরে সংক্ষেপে তাঁকে ডাকত 'চেকার বাবু' ব'লে। জলধর দা'রাও ঐ নামেই ডাকতেন।

একবার। কিসের একটা ছুটী উপলক্ষ্যে চেকার বাবু বাড়ী এলেন, সঙ্গে বহু লাটবহর। পাড়াপড়শীরা দেখা করতে গেলেন, জলধর দা'ও সঙ্গে গেলেন। নানা কথাবার্ত্তার পর চেকার বাবু ছেলেদের ডেকে বললেন, "বিকেলে আসিস্, একটা নতুন জিনিষ খাওয়াব।"

বিকেলে কৌতূহলী জনতা চেকার বাবুর বাড়ীতে ভেঙ্গে পড়ল। ছেলেদের সংখ্যাই বেশী, বুড়োও কেউ কেউ এসেছেন। দেখা গেল, চেকার বাবুর বাড়ীর বাইরের বারান্দায় একটা উনুনের ওপর বড় হাঁড়ীতে জল চাপান হয়েছে। চেকার বাবু হাঁড়ীর মুখে সরা চাপা দিয়ে মোড়া পেতে বসে অপেক্ষা করছেন। বাড়ীর মেয়েরা ও-সব ম্লেচ্ছ খাদ্য তাঁদের রান্নাঘরে ঢুকতে দেন নি।

খানিক বাদে হাঁড়ী নামান হ'ল। চেকার বাবু একটা কাগজে মোড়া প্যাকেট থেকে কালো কালো কি খানিকটা নিয়ে হাঁড়ীর মধ্যে ফেলে দিলেন, তার পর খানিকটা লাল চিনি আর দুধও তার মধ্যে মেশান হ'ল। এইবার জিনিষটা গামছা দিয়ে ছেঁকে ফেলা হ'ল।

এর পর খাবার পালা। চেকার বাবু ছেলেদের লক্ষ্য ক'রে দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, বাড়ীর মেয়েরা তাঁদের বাসনে ক'রে এ জিনিষ পরিবেশন করতে কিছুতেই রাজী হন নি—তাতে নাকি বাসনের জাত যাবে। তাই তাদের হাত পেতে অঞ্জলি ক'রে এ জিনিষ চাখা ছাড়া উপায় নেই। ছেলেরা যে ভাবে অঞ্জলি পেতে পূজোর চরণামৃত নেয় সেই ভাবে হাত পাতল, চেকার বাবু একটা হাতা ক'রে প্রত্যেকের হাতে হাতে খানিকটা ক'রে সেই আশ্চর্য্য জিনিষ ঢেলে দিতে লাগলেন। জলধর দা'র ভাগে যা পড়ল তা পরিমাণে পূজোর চরণামৃতের চাইতে বেশী নয়।

চেকার বাবু বললেন, "এর নাম চা। এ এক আশ্চর্য্য পানীয়। কিন্তু বেশী খেতে নেই, চরণামৃতের মত ঐটুকুই খেতে হয়—নইলে মাথা ঘোরে, নেশায় ধরে, সারা রাত ছটফট করতে হয় ঘুমের অভাবে।"

'এরই নাম চা!' জলধর দা' তো অবাক্! এর আগে 'বস্তুবিচার' নামে একটা বইএ তিনি চায়ের কথা পড়েছিলেন বটে কিন্তু সেটি যে কি ধরণের পদার্থ সে সম্বন্ধে তাঁর

কোনই ধারণা ছিল না। যাই হোক, খেতে যেমনই লাগুক, প্রথম চা পানের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা ব'লে মনে হ'ল—বন্ধুবান্ধবদের কাছে গর্ব্ব ক'রে বলবার মত একটা কিছু!

যা তোমরাও পার

আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য অনেক জিনিষ আমরা নিজেরাই ঘরে তৈরী ক'রে নিতে পারি। এতে যে শুধু খরচই কম পড়ে তা নয়, নিজের হাতে তৈরী জিনিষ ব্যবহারের আনন্দও বড় কম হয় না। আজ তোমাদের কি ক'রে, অত্যন্ত সহজ উপায়ে, ঘরে কাপড়-কাচা সাবান তৈরী করা যেতে পারে তা ব'লে দিচ্ছি।

সাধারণ সাবান তৈরী করতে অনেক মেহনৎ,—ঠিক মত জ্বাল দেওয়া একটা কঠিন কাজ; আর ভাল গায়ে-মাখা সাবান তৈরী করতে গেলে অনেক যন্ত্রপাতিও দরকার। কিন্তু এই নিয়মে তৈরী সাবানে শুধু সাজসরঞ্জামই কম লাগে না—আগুনের কোন কারবারই নেই এর মধ্যে। তাই একে বলা হয় "ঠাণ্ডা প্রক্রিয়ার সাবান"।

এর জন্য দরকার কিছু পরিষ্কার তেল (সরষের তেল নয় কিন্তু,—নারকেল তেল, রেড়ীর তেল, মাহুয়া তেল এই সব। নারকেল তেলই সব চেয়ে ভাল) বা চর্ব্বি, কষ্টিক্ সোডা, দু'টি কাঠের বা কলাই করা গামলা (একটি বেশ বড়সড়), একটি কাঠের খুন্তি বা ঐ রকম নাড়বার উপযোগী কাঠের টুকরো, এক বা একাধিক ছোট্ট কাঠের বাক্স—যার ধারগুলো ইচ্ছে করলে খুলে ফেলা যায় (বাক্সের অভাবে মাটীর খুঁড়ি বা ছোট্ট হাঁড়ীতেও কাজ চলতে পারে), আর, ইচ্ছে হ'লে, কিছু সুগন্ধি—যেমন লেবুর তেল বা ঐ রকম কিছু আর রং। কষ্টিক সোডা যারা রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রী করে তাদের কাছে পাবে। অনেক বেনের দোকানেও পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে কয়েক টুকরো পুরোনো ছেঁড়া গরম কাপড় যোগাড় করতে পারলে আরও ভাল।

প্রথমে একটা গামলার মধ্যে পোয়াটেক খানেক কষ্টিক সোডা রেখে তার মধ্যে সের খানেক জল মিশিয়ে কাঠের খুন্তি দিয়ে বেশ ক'রে নাড়তে থাক (ভিতরে হাত দিও না)। একটু পরেই কষ্টিক সোডা গলে যাবে এবং সমস্ত জিনিষটা খুব গরম হয়ে উঠবে। তখন সেটা ঠাণ্ডা হবার জন্য খানিকক্ষণ রেখে দিতে হবে। ইতিমধ্যে বড় গামলাটায় পৌণে দু' সের মত তেল বা চর্ব্বি নিয়ে গালিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখ। অর্থাৎ যেন জমে না থাকে। তারপর কষ্টিক সোডার জল ঠাণ্ডা হ'লে সেটা নিয়ে আস্তে আস্তে ঐ তেলের বা চর্ব্বির সঙ্গে মেশাতে থাক এবং কাঠের খুন্তি দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে থাক। এই ভাবে যখন সমস্তটা কষ্টিক সোডার জল মেশান হয়ে যাবে এবং নাড়তে নাড়তে জিনিষটা 'মধু'র মত হয়ে যাবে তখন বুঝবে কাজ শেষ হয়ে এসেছে। ইচ্ছে করলে এই বার সাবানটা সুগন্ধি এবং দেখতে সুন্দর করার জন্য তার মধ্যে সামান্য একটু গন্ধ ও রং মিশিয়ে দিতে পার। অবশ্যি এ না দিলেও কোন ক্ষতি নেই। এই বার ঐ ঘন জিনিষটা নিয়ে কাঠের ছোট্ট বাক্স বা মাটীর খুঁড়িগুলির মধ্যে ঢেলে ছেঁড়া গরম কাপড় চাপা দিয়ে ফেলে রেখে দাও ২৪ ঘণ্টা। বাক্সে বা খুঁড়ির ভিতরে

একটু জল মাখিয়ে নিও। যেখানে রাখবে সে জায়গাটা যেন খুব ঠাণ্ডা, স্যাঁৎসেঁতে না হয়। ২৪ ঘণ্টা পরে কাঠের বাক্স খুলে ফেললে কিংবা মাটীর খুঁড়ি ভেঙ্গে ফেললেই দেখবে চমৎকার জমাট সাবানের চাঁই বেরিয়ে আসবে। যদি দেখ সাবানের গায়ে শিশিরের মত "ঘাম" বেরুচ্ছে তা হ'লে সামান্য কিছু ষ্টার্চ বা শ্বেতসার (অভাবে য়্যারারুট বা ময়দা) মিশিয়ে নিতে পার। ঠিক মত করতে পারলে এই সাবান বাজারে কেনা কাপড়-কাচা সাবানের চেয়ে কোনও অংশে খারাপ হবে না।

তুমি কি জান!

নীচের কথাগুলি আমরা প্রায়ই খবরের কাগজে বা বইএ পড়ি, কথাবার্ত্তায়ও ব্যবহার করি। কিন্তু ওর আসল অর্থ সম্বন্ধে অনেকেরই হয়তো ধারণা নেই। এগুলি জেনে রাখা ভাল।

হুইপ—ব্যবস্থা-পরিষদে, পালিয়ামেণ্টে প্রত্যেক দলের একজন সদস্যকে এই পদ দেওয়া হয়। এঁর কাজ হচ্ছে ভোটের বন্দোবস্ত রাখা। কোন বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হ'লে যখন ভোট গণনা করা হয় তখন হুইপকেই দেখতে হয় দলের জয়লাভের জন্য পর্য্যাপ্ত সংখ্যক সদস্য ভোট দিতে হাজির আছেন কিনা। না থাকলে তার ব্যবস্থা করার ভার তাঁরই ওপর।

ক্লাইভ ষ্ট্রীট—কলকাতার একটি রাস্তা। এটি সহরের একটি বড় ব্যবসা-কেন্দ্র এবং বহু বড় বড় সাহেবী সওদাগরী অফিস ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এই রাস্তায় থাকায় সাহেব ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কেই সংক্ষেপে "ক্লাইভ ষ্ট্রীট" ব'লে অভিহিত করা হয়। কিছু দিন হ'ল এই রাস্তার নাম বদলে নেতাজী সুভাষ রোড করা হয়েছে, কিন্তু 'ক্লাইভ ষ্ট্রীটের' সাঙ্কেতিক অর্থের এখনও পরিবর্ত্তন হয় নি। নিউ ইয়র্ক সহরের "ওয়াল্ ষ্ট্রীট্"ও ঠিক এই রকম ব্যবসায়ীদের আড্ডা ব'লে সম-অর্থে ব্যবহার করা হয়।

জন্ বুল্—ইংল্যাণ্ডের প্রতীক। জন বুল্ বলতে (ব্যঙ্গার্থে) ইংল্যাণ্ডের লোককে বোঝায়। এ নাম কি ক'রে হ'ল শোন। স্কটল্যাণ্ডে আরবুথ্‌নট্ নামে এক ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তার হ'লেও তিনি ছিলেন খুব রসিক আর সুলেখক। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তিনি "হিষ্ট্রি অব্ জন্ বুল্" নামে একখানা ব্যঙ্গ-পুস্তক লেখেন। এই বইএর এক-একটি চরিত্র ছিল এক-একটি দেশ। বইএর নায়ক জন্ বুল্ ছিল ইংল্যাণ্ডের প্রতীক। ইংল্যাণ্ডের সে সময়কার রাণী য়্যানিকে চিত্রিত করা হয়েছিল মিসেস্ জন্ বুল্ রূপে। এই বই থেকেই ইংল্যাণ্ডকে বোঝাতে জন্ বুল্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

নানা প্রসঙ্গ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

চিড়িয়াখানার দুগ্ধপোষ্য

দিন কয়েক আগে কলকাতার চিড়িয়াখানায় একটি ছোট্ট হাতীর বাচ্চা এসেছিল, সে খবর খবরের কাগজের দৌলতে অনেকেই হয়ত পেয়েছিলে। এই হাতীর বাচ্চাটাকে ধ'রে আনা হয়েছিল আসাম থেকে, আর তার নাম রাখা হয়েছিল 'সাবিত্রী'। আসাম থেকে লণ্ডন যাবার পথে সাবিত্রী কয়েকদিন আলিপুরে বিশ্রাম ক'রে গেছে। সেই সময়ে তাকে দেখবার জন্য আলিপুরে খুব জনসমাগম হ'ত। চিড়িয়াখানার কর্ত্তারা সাবিত্রীকে অনেক ভাল ভাল জিনিষ খেতে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল কনডেন্স্‌ড্ মিল্ক বা জমাট দুধ। জিনিষটা বোধ হয় সাবিত্রীর খুবই ভাল লেগে গিয়েছিল, কারণ এর পর, যখন এরোপ্লেনে চেপে সে লণ্ডন রওনা হ'ল তখন, পথের মাঝখানে সে নাকি একবার খাঁচা খুলে বেরিয়ে আসে,—সহযাত্রীদের মতে ঐ জিনিষটিরই লোভে! শেষে করাচীতে তাকে নামিয়ে সঙ্গে প্রচুর কনডেন্স্‌ড্ মিল্কের কৌটো দিয়ে আবার উড়ো-জাহাজে তুলে দেওয়া হয়। এর পর (সম্ভবতঃ ঐ কনডেন্স্‌ড্ মিল্কের দৌলতেই) পথে সে আর কোন গণ্ডগোল করেছে ব'লে শোনা যায় নি। সম্প্রতি খবর এসেছে—সাবিত্রী নির্ব্বিঘ্নে লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় অধিষ্ঠান করছে এবং সেখানকার ছেলেমেয়েরা তাকে নিয়ে খুব মেতে উঠেছে। অবশ্যি তার অমন সুন্দর "সাবিত্রী" নামটা (তাদের মুখে যেটা দাঁড়িয়েছিল 'স্যাভিট্রি') নাকি তাদের পছন্দ হয় নি, তারা ওর নাম বদলে নতুন নাম রেখেছে 'ডিম্বো'। লণ্ডনে গিয়েও ডিম্বো আরামে কনডেন্স্‌ড্ মিল্ক খাচ্ছে।

শুধু সাবিত্রীই নয়, চিড়িয়াখানায় কচি বাচ্চার আবির্ভাব হামেশাই হয়ে থাকে। এই তো কিছুদিন আগে আলিপুরে একটা হিপ্পোর বাচ্চা হয়েছে। বেশ

দিব্যি নাদুসনুদুস তেল-চুকচুকে চেহারা। সেদিন গিয়ে দেখে এলাম। এটি অবশ্যি বাপ-মা'র কাছেই আছে এবং মায়ের দুধ খেয়েই 'মানুষ' (অর্থাৎ হিপ্পো) হচ্ছে। কাজেই ওকে নিয়ে কোন ভাবনা নেই। কিন্তু সময় বিশেষে চিড়িয়াখানার কর্ত্তারা বেশ একটু ভাবনাতেই পড়েন বৈকি। বেশী নয়, দিন পনেরো আগের কথা, তোমরাও হয়তো কাগজে পড়েছ, কলকাতার বৌবাজারের মোড়ে দিনে দুপুরে একটি চিতাবাঘের বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একেবারে বেওয়ারিশ। কে এনেছে, কে পুষেছে, ওখানেই বা এল কোথা থেকে, তার কোনই পাত্তা নেই! মায়ের হদিস তো নেই-ই! শেষটা ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল আলিপুর চিড়িয়াখানায়। একেবারে দুধের শিশু, দুধ ছাড়া আর কী-ই বা খাবে? কিন্তু বাঘের বাচ্চা, সাহস ক'রে কাছে এগোতেও ভয় হয়। শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তারা ওর জন্য একটি ধাই-মা যোগাড় করেছেন। একটি বড়সড় ছাগ-জননী। চিতার ছানা ছাগ-মাতার বাঁটে মুখ দিয়ে চুষে চুষে দুধ খাচ্ছে এ ছবিও তার পর কাগজে দেখেছি।

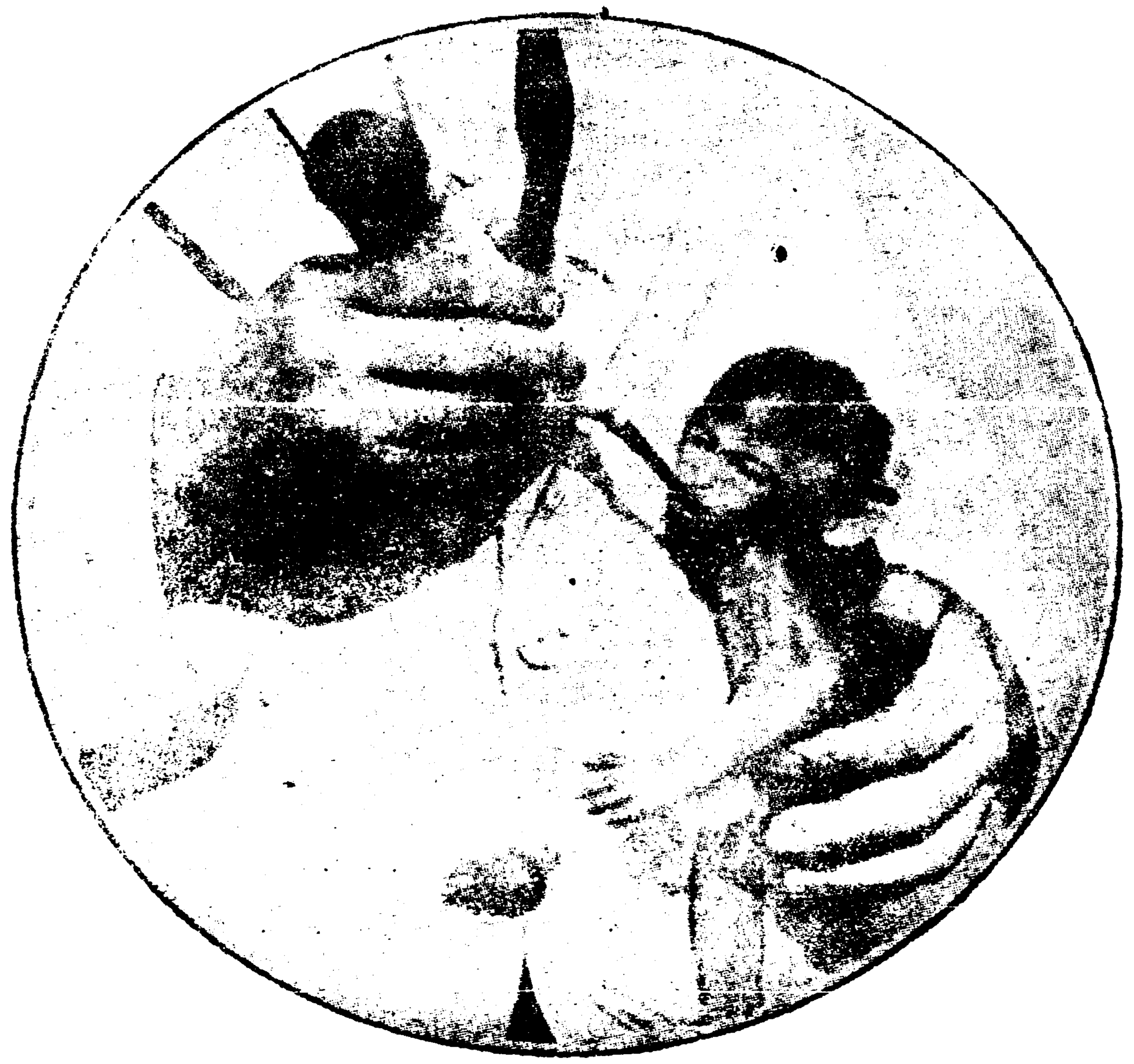

বানর-ছানাকে ফিডিং বোতলে ক'রে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে।

বাস্তবিক, চিড়িয়াখানায় অনেক জানোয়ারই খুব শিশু অবস্থায় এসে হাজির হয়। এদের অধিকাংশেরই মা নেই—অর্থাৎ মায়ের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি বা মা মরে গেছে, কিংবা হয়তো মায়ের চোখে ফাঁকি দিয়েই ওদেরকে ধরে আনা হয়েছে। বড় জানোয়ার ধরা সাধারণতঃ একটু কষ্টকর, এবং ধরা পড়লেও

স্বাধীন জীবন থেকে বন্দী জীবনে এসে তারা প্রায়ই বেশী দিন বাঁচে না। তাই শিকারীরা চিড়িয়াখানার জন্য বাচ্চা জানোয়ারই সাধারণতঃ পছন্দ করেন। কিন্তু পছন্দ করলেই তো হ'ল না, ওদের তো সেই সঙ্গে খাইয়ে 'মানুষ' করতেও হবে। বড় জানোয়ারদের খাবার যোগাড় করা বরঞ্চ সহজ, কিন্তু ওদের ?

ওদের খাবার যোগাড় করাও কিন্তু খুব কঠিন নয়—কারণ, মানুষের মতই, প্রায় জন্তুরই ছেলেবেলার খোরাক হচ্ছে শুধু দুধ। এমন কি, যে সব জীব স্তন্যপায়ী নয়, তাদেরও। যেমন ধর সাপ। স্তন্যপায়ী জীব না হ'লেও সাপ যে দুধের ভক্ত এবং সময় সময় গরুর বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খায় এ কাহিনী হয়তো তোমাদের অজানা নয়।

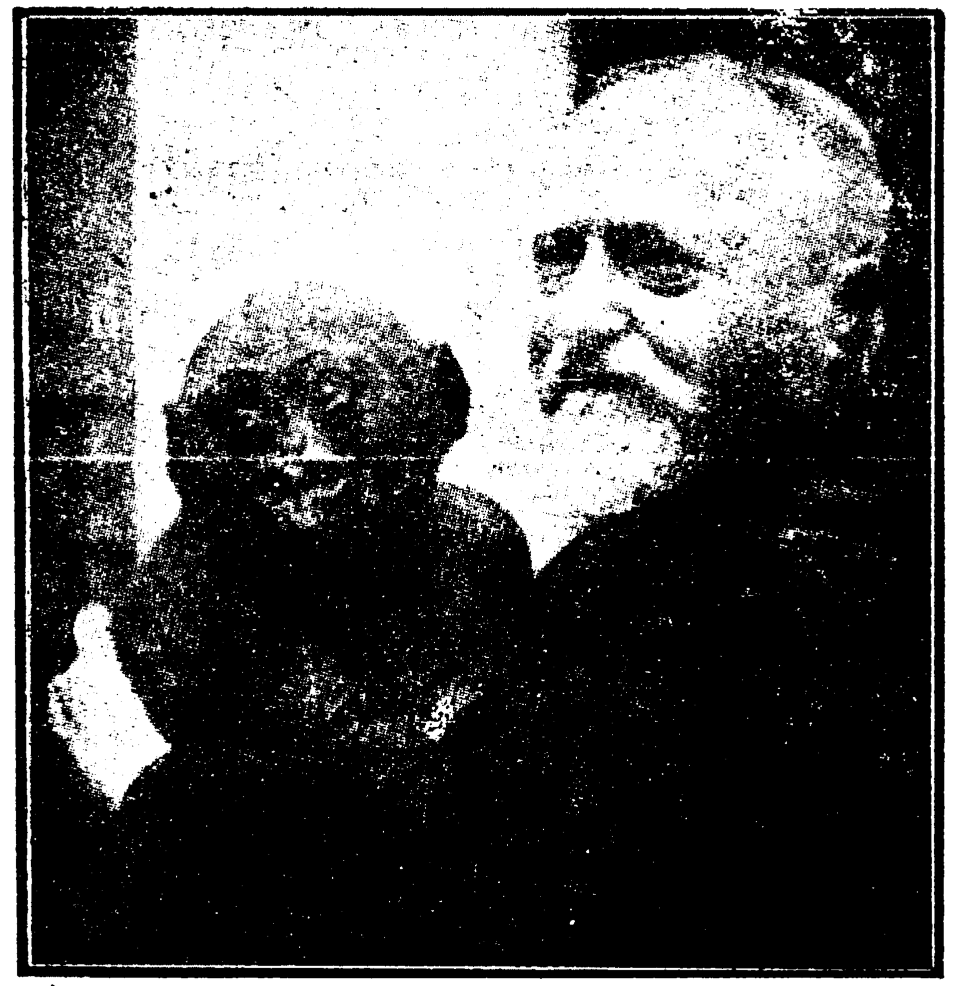

পালকের কোলে গরিলার ছানা। এর জন্যও ছাগলের দুধের ব্যবস্থা আছে।

যাই হোক, চিড়িয়াখানার কর্ত্তাদের বাচ্চা জানোয়ারদের জন্য সর্ব্বদাই দুধের যোগাড় রাখতে হয়। দুধ বলতে যে শুধু গরুর দুধ—তা মনে ক'র না। হরেক রকম দুধের দরকার। যে জানোয়ারের বাচ্চা সে জানোয়ারের দুধ পেলে তো কথাই নেই, অভাবে সেই জাতীয় জীবের দুধ পেলে ভাল হয়। এ জন্য গরুর দুধ, ঘোড়ার দুধ, গাধার দুধ, ছাগলের দুধ, কুকুরের দুধ—এমন কি বাঘ-সিংহীর দুধ পর্য্যন্ত যোগাড় করতে হয়। শেষ দু'টি অবশ্য দোহন করা সম্ভব নয়, ওই জাতের বাচ্চাকে দুগ্ধবতী বাঘিনী বা সিংহীর কাছে পালিত পুত্রের মত ছেড়ে দিতে হয়। খাঁটী দুধের অভাবে জমাট দুধ, গুঁড়ো দুধ—এগুলোও আজকাল যথেষ্ট ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাচ্চার যদি ঘন দুধ হজম না হয় তবে জল মিশিয়ে দুধকে পাৎলা ক'রে নেওয়া বা ওষুধ মিশিয়ে দুধকে সহজপাচ্য ক'রে নেওয়া—এ সব নিয়মও আছে। এ জন্য প্রত্যেক বড় বড় চিড়িয়াখানাতেই বিশেষজ্ঞ লোক থাকেন তত্ত্বাবধানের জন্য।

ছাগলের দুধটাই নাকি বেশীর ভাগ জানোয়ার পছন্দ করে—এবং তাদের পুষ্টির পক্ষেও নাকি এটাই সব চেয়ে ভাল। কিন্তু সব জানোয়ারের বাচ্চার খোরাক এক রকম নয়। খাইয়ে বলে নাম আছে হিপ্পোপটেমাসের ছানার। একটা হিপ্পোর বাচ্চা দিনে ২৫।৩০টি ছাগলের দুধ একাই শেষ ক'রে দেয়। এই হিসেবে হাতীর বাচ্চার আরও বেশী লাগা উচিত, কিন্তু হিপ্পোর ছানা এদিক্ দিয়ে হাতীর ছানাকে ছাড়িয়ে গেছে। আসল হাতী তো নয়—জলহস্তী কিনা, আসলের চেয়ে দড় তো হবেই!

যে সব বাচ্চা বাটী থেকে মুখ দিয়ে দুধ খেতে পারে না তাদের খাওয়াতে হয় ফিডিং বোতলের সাহায্যে। এ ভাবে দুধ খেতে নাকি অনেকেই পছন্দ করে—এমন কি বাঘ-সিংহের জাঁদরেল বাচ্চারাও। যারা আরও ছোট, তাদের খাওয়াতে হয় পলতে করে। ওষুধ ঢালার মত কাচের ড্রপারে ক'রেও কাউকে কাউকে খাওয়াতে হয়,—নইলে বিষম খাবার ভয় আছে।

এই সব জানোয়ারই বড় হয়ে কি রকম হিংস্র মূর্ত্তি ধারণ করে ভাবলে অবাক্ লাগে নাকি ?

সেলোফেন জিনিষটা কি ?

আজকাল তোমরা প্রায়ই দেখতে পাও বইএর মলাটের ওপর—বিশেষ ক'রে উপহারের জন্য যে সব বই তৈরী হয় তার মলাটের ওপর কেমন চকচকে, কাচের মত স্বচ্ছ, পাৎলা এক রকম কাগজ লাগানো থাকে। ওর ফলে রংচংএ বইখানাকে আরও চক্‌চকে—আরও সুন্দর দেখায় এবং দেখলেই কিনতে ইচ্ছে করে। শুধু বই কেন, আজকাল বহু মনোহারী জিনিষ—যেমন ধর সাবানের বাক্স, তেলের শিশি, বিস্কুটের টিন, নানা রকম পেটেণ্ট ওষুধের কৌটো, সিগারেটের প্যাকেট এই রকম স্বচ্ছ কাগজে মুড়ে সুদৃশ্য ক'রে বাজারে ছাড়বার রেওয়াজ হয়েছে। সময় সময় সেগুলো আবার রং-বেরংএরও হ'তে দেখা যায়। বলা বাহুল্য ক্রেতাকে আকৃষ্ট করার জন্যই ওই রকম লোভনীয় মোড়কের ব্যবস্থা।

তোমাদের মধ্যে যারা একটু-আধটু খবর রাখ তারা হয়তো জান এগুলিকে বলা হয় 'সেলোফেন"; চলতি কথায় বলে—'সেলোফেন পেপার' বা সেলোফেন কাগজ। কাগজ বলা হয় বটে এবং দেখতেও যদিও ঠিক কাগজেরই মত, কিন্তু তবু সেলোফেন জিনিষটা আসলে কাগজ নয়। কাগজ যে ভাবে তৈরী হয় সেলোফেন

সে ভাবে তৈরী হয় না, ওর প্রস্তুত-প্রণালী সম্পূর্ণ আলাদা। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিকের চোখে ওদের জাতও ঠিক এক নয়। বরঞ্চ সেলুলয়েডের সঙ্গে ওর খানিকটা মিল আছে বলা যায়।

সেলোফেন অবশ্যি তৈরী হয় কাগজেরই মত সেলুলোজ্ থেকে। এই সেলুলোজ্ আবার পাওয়া যায় কাঠ, তুলো, ছেঁড়া নেকড়া—এই সব থেকে। তবে সাধারণতঃ কাঠের কুচি, কাঠের গুঁড়ো আর তুলো—এই থেকেই সেলুলোজ্ সংগ্রহ করা হয়। বিলেতে বার্চ, ফার, পপ্লার প্রভৃতি গাছ এই জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। এই গাছগুলো থেকে যে সেলুলোজ্ বেরোয় তা গুণেও যেমন ভালো, পরিমাণেও তেমনি বেশী।

সেলোফেন তৈরীর প্রথম কাজ হচ্ছে তুলো এবং কাঠগুলোকে নিয়ে খুব কুচি কুচি ক'রে কাটা। গুঁড়ো হ'লে তো হাঙ্গামাই নেই! তার পর সেগুলো খুব পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে ক্ষার-জল দিয়ে বাষ্পের সাহায্যে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করলেই সেলুলোজ্ টুকু বেরিয়ে আলাদা হয়ে যায়, বাকি অংশ ময়লা জলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

এইবার সেই সেলুলোজ্ ছেঁকে তাকে রূপান্তরিত করা হয় নাইট্রো-সেলুলোজে। এর জন্য প্রধানতঃ দরকার নাইট্রিক এসিডের, কিন্তু তার মধ্যে আরও অনেক রাসায়নিক কারিকুরি আছে। তার পর সেই নাইট্রো-সেলুলোজের সঙ্গে মেশান হয় ইথার আর য়্যাল্‌কহল এবং সেই অবস্থায় জিনিষটা কিছু দিন ফেলে রাখতে হয়। কিছুদিন পড়ে থাকলে জিনিষটা হয়ে দাঁড়ায় চট্‌চটে আঠার মত। এবার সেই আঠাল জিনিষটাকে খুব চাপ দিয়ে একটা যন্ত্রের ভিতর দিয়ে নিয়ে ঢালা হয় গ্লিসারিন পূর্ণ একটি পাত্রের মধ্যে। ঐ যন্ত্রটির চেহারায় আবার একটু বাহাদুরী আছে। যেখান দিয়ে আঠাল জিনিষটা যাবে সেই খাঁজটা থাকে খুব সরু কিন্তু বেশ চওড়া চট্‌চটে। ফলে জিনিষটা ওর ভিতর দিয়ে যাবার সময়ে ঠিক একটা কাগজের থানের মত চেহারা নিয়ে বেরোয় এবং গ্লিসারিনে পড়েই জমে গিয়ে সত্যি সত্যি পাৎলা কাগজের আকার ধারণ করে। এইবার সেই পাৎলা কাগজ রোলারে জড়িয়ে নিলেই হ'ল। এরই নাম সেলোফেন।

রঙ্গিন সেলোফেন তৈরী করতে হ'লে আঠাল জিনিষটার সঙ্গে ইচ্ছেমত নানা রং ব্যবহার করা চলে—হলদে, নীল, লাল, সবুজ—যে রং খুসী। সেলোফেন কাচের মত স্বচ্ছ হওয়ায় রঙ্গিন সেলোফেনের কদর আরো বেড়েছে। আগে যে সব কাজে রঙ্গিন কাচ ব্যবহার করা ছাড়া উপায় ছিল না আজকাল তার অনেক

ক্ষেত্রে সস্তা রঙ্গিন সেলোফেন দিয়েই কাজ চালান হয়। আজকাল বিলেতে আরও হরেক কাজে সেলোফেন ব্যবহার করা হচ্ছে। এমন কি সেলোফেনের তৈরী জামা-কাপড়েরও চল হয়েছে। তেমন টেকসই না হ'লেও এ জামা এত হাল্কা আর এত সুন্দর যে গরমের দিনে সৌখীন মেমসাহেবরা হরদম এই সব জামা ব্যবহার করছেন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মণ সেলোফেন তৈরী হচ্ছে। ইয়োরোপেও। আমাদের দেশে এখনও এ জিনিষ তৈরী হয়েছে বলে শুনি নি, তবে হ'তে কতক্ষণ?

পরলোকে মরিস্ মেটারলিঙ্ক

সম্প্রতি ৮৮ বছর বয়সে জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক মরিস মেটারলিঙ্ক পরলোক গমন করেছেন। এঁর বাড়ী ছিল বেলজিয়ামে, কিন্তু ইনি করতেন প্যারিসে আইনের ব্যবসা। অবশ্যি পরবর্ত্তী জীবনে ইনি সাহিত্যসাধনাই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। এঁর লেখা 'নীল পাখী'—যার ইংরেজী নাম "ব্লু বার্ড্" পৃথিবীর একখানি বিখ্যাত নাটক ব'লে সমাদৃত হয়েছে। "মনা ভানা"ও আর একখানি নাম-করা বই। বড় হয়ে তোমরা এগুলি নিশ্চয়ই পড়বে। মেটারলিঙ্ক সাহিত্যের জন্য সুবিখ্যাত নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন ১৯১১ সনে।

বেথুন বিদ্যালয় শতবার্ষিকী

কলকাতার বেথুন কলেজ ও স্কুল এ দেশে মেয়েদের শিক্ষার একটি প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। মহাত্মা জন্ ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁরই নাম থেকে উক্ত

শিক্ষামন্দিরের নামকরণ হয়। যে জায়গায় এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় যে জায়গাটি দান করেন ৺দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি এই বিদ্যালয়ের বয়স একশ' বছর পূর্ণ হওয়ায় সমারোহের সঙ্গে এর শতবার্ষিকী উৎসব হয়ে গেছে। উৎসবের কর্ম্মসূচীর মধ্যে বৈদিক প্রথায় বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একটি অশোক ও দু'টি বকুল গাছ রোপণ অনুষ্ঠানটি খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। বিদ্যালয়ের দু'জন খুব প্রাচীনা ছাত্রী এতে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

লণ্ডনে কমনওয়েল্‌থ্‌ সম্মেলন

কয়েক দিন আগে লণ্ডনে কমনওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ডোমিনিয়নের প্রধান মন্ত্রীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হয়ে গেল। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহ্‌রু এই সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে ভারত কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌-এর ভিতর থাকতে রাজী আছে কিন্তু ডোমিনিয়ন্‌ হিসাবে নয়—স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে। এতদিন পর্য্যন্ত ডোমিনিয়ন্‌ রাষ্ট্রগুলিকে ইংল্যাণ্ডের রাজার আনুগত্য মেনে চলতে হ'ত, ভারত প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করলে সে আনুগত্য আর মেনে নেবে না। তবে কমনওয়েল্‌থ্‌-এর অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষক হিসাবে রাজাকেই কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌এর প্রধান হিসাবে রাখা হবে। সম্মেলনে নেহ্‌রুর এই সর্ত্ত মেনে নেওয়া হয়েছে এবং সম্প্রতি ভারতীয় গণপরিষদেও এ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পাকিস্থান ও অন্যান্য ডোমিনিয়ন্‌গুলি আগেকার মতই ডোমিনিয়ন্‌ রাষ্ট্র হিসাবে কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌এ থাকবে। পণ্ডিত নেহ্‌রুর মতে এই নতুন ব্যবস্থায় ভারতের স্বাধীন মর্য্যাদায় কিছু মাত্র ব্যাঘাত হবে না, বরঞ্চ নানা দিক্‌ দিয়ে ভারত শক্তিশালীই হবে। কোন কোন নেতা অবশ্য এ কথা মানতে রাজী হন নি। তাঁরা স্বাধীন ভারতকে আগেভাগেই বাইরের কোন রাষ্ট্রীয় দলের সঙ্গে চুক্তিতে বাঁধতে চান না।

আমেরিকায় নতুন ভারতীয় দূত

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এত দিন রাশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন, সম্প্রতি তাঁকে আমেরিকায় পাঠান হয়েছে রাষ্ট্রদূত ক'রে। শ্রীযুক্তা পণ্ডিত ইতিমধ্যেই এই নতুন কাজে যোগদান করেছেন। রাশিয়ায় তাঁর বদলে কা'কে পাঠান হবে এখনও ঠিক হয় নি, তবে এই সম্পর্কে সুপণ্ডিত ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের নাম শোনা যাচ্ছে।

খেলাধূলার খবর

কলকাতার হকি মরশুম এ বছরের মত শেষ হ'ল বাইটন্‌ প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে। এবারের বাইটন্‌ বিজয়ী হয়েছে বোম্বাইএর টাটা স্পোর্টস্‌ ক্লাব। ফাইনালে তারা কলকাতার পাঞ্জাব স্পোর্টস্‌ দলকে ২—১ গোলে হারিয়ে এই সম্মান অর্জ্জন করল।

হকির পর ফুটবল। কলকাতার ফুটবল লীগ্‌ও সুরু হ'ল। ইষ্টবেঙ্গল, মহমেডন স্পোর্টিং আরম্ভ ভালই করেছে কিন্তু গতবারের শীল্ডবিজয়ী জনপ্রিয় মোহনবাগান দল গোড়াতেই ভণ্ডুল বাধিয়ে বসেছে। প্রথম তিনটি খেলার দু'টিতেই তারা পরাজিত হয়েছে। মোহনবাগানের ইতিহাসে বোধ হয় এমনটা আর কখনও হয় নি।

স্যর আশুতোষের গ্রন্থাগার

মনীষী স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শুধু বড় বিচারপতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জনক হিসাবেই খ্যাত ছিলেন না, তাঁর সময়ে তাঁর মত মহাপণ্ডিত এ দেশে খুব বেশী ছিলেন না। স্যর আশুতোষের বিদ্যানুরাগের পরিচায়ক তাঁর বিরাট গ্রন্থাগার। অত বড় পারিবারিক গ্রন্থাগার এ দেশে বড় একটা দেখা যায় না। সম্প্রতি আশুতোষের ছেলেরা তাঁর সেই বিরাট গ্রন্থাগারের বইগুলি সাধারণের ব্যবহারের জন্ত ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে (যার আগে নাম ছিল ইম্পিরিয়াল্‌ লাইব্রেরী) দান করেছেন। এই বই সংখ্যায় কত জান?—প্রায় ৮০ হাজার।

দ্বিতীয়

বৎসহারা

সেটি হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড সরোবর। মানুষের হাতে কাটা নয়, স্বাভাবিক সরোবর। গ্রীষ্মকালে জল হয় অগভীর, কিন্তু বর্ষাকালে জল ওঠে তার কূল ছাপিয়ে।

জায়গাটি মনোরম। অনেক দূরে উত্তর দিকে আকাশের গায়ে আঁকা নীল মেঘের মত দেখা যাচ্ছে একটি পাহাড়। সরোবরের পূর্ব্ব আর পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে আছে ঘনশ্যাম অরণ্যের প্রাচীর। দক্ষিণ দিকে মস্ত একটা নতোন্নত প্রান্তর করছে ধূ ধূ। সরোবরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অনেকগুলো গাছ যেন সকৌতূহলে জলের উপরে ঝুঁকে পড়েছে নিজেদের চেহারা

দেখবার জন্যে। সেখানে খানিকটা জায়গা জুড়ে বাতাসের দোলায় হিন্দোলিত সরোবরের জলের সঙ্গে দুলে দুলে উঠছে স্নিগ্ধ ছায়ার মিষ্ট মায়া।

রোজ দুপুরবেলায় রোদের ঝাঁঝে যখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পৃথিবী, তখন একদল হাতী সরোবরের এই ছায়া-ঢাকা অংশটাতে জলের ভিতরে গা ডুবিয়ে আরাম উপভোগ ক'রতে আসে। কতকাল থেকে তারা যে এই জায়গাটিতে অবগাহন-স্নান ক'রে আসছে, সে খবর কেউ রাখে না। কিন্তু গ্রীষ্মের যে কোন দুপুরে এখানে এলেই তাদের দেখা পাওয়া যায়। এবং প্রতিদিনই সেই সময় এখানকার আকাশ বাতাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত ক'রে জেগে ওঠে তাদের ঘন ঘন বৃংহিতধ্বনি। সেই ধ্বনি শুনতে পেলে কেঁদো বাঘগুলো পর্য্যন্ত দূর থেকেই স'রে পড়ে মানে মানে।

এই সরোবরে দুপুরে স্নান ক'রতে আসে বয়ার বা বন্য মহিষরাও। কিন্তু তারা থাকে সরোবরের অন্য দিকে, হাতীদের কাছ থেকে নিরাপদ ব্যবধানে। হরিণরাও এখানে আসে অনেক দূর থেকে জল পান করবার জন্যে। আবার সাঁতার কাটবার জন্যে আসে পালে পালে বালি-হাঁসরাও। পক্ষী-রাজ্যের ধীবর-জাতীয় মাছরাঙারাও থেকে থেকে গাছের ডাল ছেড়ে হঠাৎ জলের উপরে ছোঁ মেরে আবার উড়ে যায় এক একটা রঙীন বিদ্যুতের মত। ভণ্ড বকেরাও জলের ধারে চিত্রার্পিতের মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে লোক-দেখানো ও মাছ-ভোলানো তপস্যা করে। জল তেষ্টা পেলে বন্য বরাহদেরও মনে পড়ে এই সরোবরটি। আরো আসে কত জাতের জানোয়ার, সকলকার নাম বলতে গেলে বেড়ে যাবে পুঁথি। মোট কথা, এই সরোবরের চারিদিকটা হচ্ছে যেন বনবাসী জানোয়ারদের মিলনের ক্ষেত্র। তারা কেউ কারুর সঙ্গে কথা কয় না বটে, কিন্তু তাদের বিভিন্ন কণ্ঠস্বরগুলো সারাদিনই মুখর ক'রে তোলে এই স্থানটিকে। তাদের অনেকেরই গলার আওয়াজ শুনে ও গায়ের গন্ধ পেয়ে কেঁদো বাঘ এবং আমিষের ভক্ত অন্যান্য জীবদের রসনা রীতিমত সরস হ'য়ে ওঠে। কিন্তু এ অঞ্চলে দিনের বেলায় তাদের প্রবেশ নিষেধ। কারণ তাদের দেখলেই শিং উঁচিয়ে আর শুঁড় তুলে বয়ার এবং হাতীরা অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করতে উদ্যত হয়। মোষ আর হাতীদের বাচ্ছাদের বাগে পেলে কেঁদো বাঘেরা ছেড়ে কথা কয় না। সেইজন্যেই বাঘেদের উপরে এদের এত রাগ।

বাঘদের আমরা হিংস্র জীব বলি, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে হিংস্র জীব কে? এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে, মানুষ। সিংহ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী

জানোয়ার জীবহত্যা করে নিজেরা বাঁচবে ব'লে। মাংস না খেলে তাদের চলে না। কিন্তু মানুষ বনবাসী জন্তুদের বধ করে প্রায় অকারণ পুলকেই। যে-সব জন্তু তাদের কোনই অপকার করে না এবং যে-সব জন্তুর মাংসও তারা খায় না, মানুষরা বধ করে তাদেরও। কিন্তু জানোয়ারদের সব চেয়ে বড় শত্রু মানুষরা এই সরোবরের সন্ধান পায় নি, তাই রক্ষা। মানুষরা যদি একবার খবর পায় যে, এই জায়গাটি হচ্ছে বনবাসী জন্তুদের মিলন-ক্ষেত্র, তা হ'লে দু-দিনেই এখান থেকে লুপ্ত হ'য়ে যেত জানোয়ারদের এই বিপুল 'জনতা'। না, এখানে মানুষের গন্ধ পায় না কেউ।

সেদিন দুপুরেও ব'সেছে হাতীদের জলের আসর এবং পূরোদমে চলছে তাদের জলকেলি। জলের ভিতরে কোন কোন হাতী প্রায় সর্ব্বাঙ্গ ডুবিয়ে শুঁড় দিয়ে জল তুলে চারিদিকে ছিটিয়ে দিচ্ছে সকৌতুকে। কোন কোন হাতী জলের ভিতরে স্থির হয়ে ব'সে এক মনে উপভোগ করছে অবগাহন-স্নানের আরাম। কোন কোন হাতী সাঁতার কেটে সরোবরের মাঝখান পর্য্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসছে গা ভাসিয়ে। কয়েকটা বাচ্ছা হাতী জলে নেমে অত্যন্ত দাপাদাপি করছে। কোন কোন হাতী থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে অতিরিক্ত আনন্দে। আমরা বলি তাকে বৃংহিত, কিন্তু হাতীদের সভায় বোধ হয় সেটা সঙ্গীত ব'লেই গণ্য হয়।

কেবল একটি হাতী জলে নামে নি, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল একটা বাঁশ-ঝাড়ের পাশেই। হাতী না ব'লে তাকে হস্তিনী বলাই উচিত। বাঁশের কচি পাতা হাতীদের অত্যন্ত আদরের খাবার। কিন্তু এই হস্তিনীটির লক্ষ্য বাঁশের পাতার দিকেও নেই। দেখলেই মনে হয়, সে যেন অতিশয় মন-মরা ও বিমর্ষ হয়ে আছে। তার ছোট ছোট চোখ দুটিও কেমন ক্লান্তি মাখানো!

তা, হস্তিনীর বিমর্ষ হবার কারণও আছে। আজ দুদিন হ'ল, তার ছোট বাচ্ছাটি বনের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে। বাচ্ছাটির বয়স দু' মাসের বেশী নয়। খুব সম্ভব সে হয়েছে কেঁদো বাঘের খোরাক। সেই বাচ্ছার শোকেই হস্তিনী হ'য়ে আছে আচ্ছন্নের মত। তার স্তন দুধের ভারে টন্‌টন্ করছে, কিন্তু দুধ পান করবার কেউ নেই। হঠাৎ কি একটা শব্দ শুনে সচমকে হস্তিনীর দুই কান খাড়া হ'য়ে উঠল।

বনের ভিতরে দূর থেকে ভেসে এল একটা ক্রন্দনধ্বনি। শিশুকণ্ঠে শোনা গেল, "ওগো মামণি, মামণি গো!"

বছর তিনেক আগে একবার মানুষের হাতে বন্দিনী হয়েছিল এই হস্তিনী। কিন্তু বছর দুই বন্দী অবস্থায় কাটিয়ে আবার সে পেয়েছিল পালিয়ে আসবার সুযোগ। সেই দুই বৎসরেই মানুষের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে সে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই লাভ করেছিল। ঐ কান্না আর কথা শুনেই হস্তিনীর বুঝতে দেরি লাগল না যে, বনের ভিতরে এসেছে একটি মানুষের শিশু!

শিশু-কণ্ঠস্বর আবার সক্রন্দনে বললে, "ওগো মামণি, তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাও, আমার যে বড্ড ভয় করছে! আমার যে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে!"

হস্তিনীর আচ্ছন্নভাবটা একেবারে কেটে গেল। যেদিক্ থেকে কান্নার আওয়াজ আসছিল, সে বেগে ছুটে গেল সেই দিকেই।

জঙ্গল ভেঙে খানিকটা এগিয়ে গিয়েই সে দেখলে, একটি ঝোপের ধারে মাটির উপরে ব'সে হাপুস চোখে কাঁদছে মানুষদের একটি ছোট্ট মেয়ে। বলা বাহুল্য, মেয়েটি হচ্ছে আমাদের টুনু।

জঙ্গলের ভিতর থেকে মস্ত বড় একটা হাতীকে বেরিয়ে আসতে দেখেই টুনুর তো চক্ষুস্থির! ভয়ে তার কান্না হ'য়ে গেল বন্ধ।

তারপর বিস্ফারিত চোখে টুনু দেখলে হাতীটা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে তারই দিকে। সে তাড়াতাড়ি পাশের ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

কিন্তু হস্তিনী তাকে ছাড়লে না। ঝোপের কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে শুঁড় বাড়িয়ে খুব আল্‌তো ভাবে তার দেহটি জড়িয়ে ধরলে– সঙ্গে সঙ্গে টুনুর কী পরিত্রাহি চীৎকার!

হস্তিনী টুনুকে শুঁড়ে ক'রে তুলে ধ'রে নিজের মাথার উপরে বসিয়ে দিলে। দারুণ আতঙ্কে টুনু প্রাণপণে চীৎকার করছিল বটে, কিন্তু তখনো সে নিজের বুদ্ধিটুকু হারিয়ে ফেলে নি। হাতীর শুঁড় তাকে ছেড়ে দিতেই সে বুঝে ফেললে যে এখনি দুম ক'রে তার মাটির উপরে প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা। সে তাড়াতাড়ি দুই হাত দিয়ে হাতীর দু'খানা কুলোর মত কান চেপে ধরলে খুব জোরে। তার পরে আবার সে জুড়ে দিলে কান্না।

আমরা বোকা লোককে 'হস্তীমূর্খ" ব'লে ডাকি বটে, কিন্তু আমাদের এই হস্তিনীটি তার হাতী-বুদ্ধিতে বুঝে নিলে যে, মানুষের এতটুকু শিশু কখনো মা ছাড়া থাকে না। তার নিজের বাচ্ছার মত এই শিশুটিও নিশ্চয় বনের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে এবং এখন এত কাঁদছে তার মায়ের কাছে ফিরে যাবার জন্যেই। অবশ্য তাকে দেখে মেয়েটির ভয়ও হয়েছে। মানুষদের দেশে সে যখন থাকত, তখন বরাবরই দেখে এসেছে, বয়স্ক মানুষরাও তাকে দেখে পেত রীতিমত ভয়।

হস্তিনীর মনে পড়ল নিজের বাচ্ছার কথা। হয়তো এখনো সে বেঁচে আছে, হয়তো সেও এখন তারি জন্যে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে বনে বনে।

হস্তিনীর মায়ের প্রাণ এই মাতৃহারা মনুষ্য-শিশুটির জন্যে সমবেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু কি ক'রে যে তাকে সান্ত্বনা দেবে, এটা কিছুতেই সে আন্দাজ করতে পারলে না।

হস্তিনী আবার ভাবলে, হয়তো এই শিশুটির খুব ক্ষিদে পেয়েছে। হয়তো খাবার পেলে সে একটু শান্ত হ'তে পারে।

কিন্তু বড় ফাঁপরে পড়ল সে। এ হচ্ছে মানুষের শিশু, তার নিজের বাচ্ছার মত এ তো আর হাতীর স্তনের দুধ বা বাঁশগাছের পাতা খেতে পারবে না! আর এই গহন বনে মানুষের খোরাকই বা পাওয়া যাবে কোথায়?

কিছুদূরে কি একটা বুনো ফলের গাছ ছিল, হঠাৎ হস্তিনীর চোখ পড়ল তার দিকে। তখনি তার মনে পড়ল, মানুষের বাচ্ছাদের সে ফল খেতে দেখেছে। সে তখন মাথার উপরে টুনুকে নিয়ে ধীরে ধীরে সেই ফল গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর শুঁড় দিয়ে একটি ফল ছিঁড়ে এগিয়ে দিলে টুনুর কাছে। কিন্তু টুনু ফলের দিকে চেয়েও দেখলে না, সমান চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল।

হস্তিনী বোধ হয় ভাবলে, আচ্ছা মুস্কিল তো বাপু! মানুষের এই বাচ্ছাটা ফলও খাবে না, কান্নাও থামাবে না! এখন একে নিয়ে কী করা যায়? এর কি জলতেষ্টা পেয়েছে? দেখি একবার সরোবরের কাছে গিয়ে।

হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে টুনুকে মাথায় ক'রে হস্তিনী চলল সরোবরের দিকে।

(ক্রমশঃ)

মনোরঞ্জন-চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত চৈত্র (১৩৫৫) সংখ্যায় প্রকাশিত পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল নীচে দেওয়া হ'ল। যাঁদের বয়স ১২ বছরের উপরে তাঁদের মধ্যে পুরস্কার পাবেন শ্রীরমা মৈত্র (দিল্লী), এবং যাঁদের বয়স ১২ বছরের নীচে তাঁদের মধ্যে পুরস্কার পাবেন শ্রীজয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)।

এ ছাড়া শ্রীসুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীতরুণকুমার সান্যাল, শ্রীমঞ্জরী গুহ, এম্. সালেহিন— এঁদের লেখাও ভাল হয়েছে।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

ভোর

কুমারী প্রকৃতি পণ্ডিত

আকাশবাতাস জেগেছে, এসেছে প্রভাতী আলো,
তপন-কিরণে গেল দূরে—গেল রাতের কালো।
উদয়-অচলে স্বর্ণ সূর্য্য টেনেছে রাশ,
ফোটা ফুলদল বাতাসে ছড়ায়ে দিয়েছে বাস।
সারাটি ভুবনে পড়েছে ছড়ায়ে সোনালী আলো,
আজিকার ভোর নয়নে আমার লেগেছে ভালো।

পাতার আঁচল ফেলেছে খুলিয়া যূথিকা রাণী,
শিশিরের ফোঁটা জানায় সবারে বিদায়-বাণী।
রক্তগোলাপ লুটিছে খুশীতে মৃদুল বায়ে,
রবির কিরণ পড়েছে তাদের পেলব গায়ে।
অরুণের করে গিয়াছে চলিয়া রাতের কালো,
আজিকার ভোর আমার নয়নে লেগেছে ভালো।

ঘাসের বুকেতে পড়েছে ছড়ায়ে ছোট্ট ফুল,
ঝুমকো লতারা দুলিছে বাতাসে দোদুল দুল।
ওই আকাশের সুনীল অধরে ফুটেছে হাসি,
বনে ও বাগানে উঠেছে ফুটিয়া খুশীর রাশি।
অনিল কহিছে "ফোটা ফুলদল, সুবাস ঢালো",
আজিকে প্রভাত নয়নে আমার দিয়েছে আলো।

উষা

শ্রীজয়ন্তকুমার দাশ

উষা দিল দেখা নিশার আঁধার টুটি',
ঘুচে গেল দূরে রাত্রির যত ভয়,
পূরবপ্রান্তে আলোক উঠিল ফুটি',
বিহঙ্গকুল গাহে সূর্য্যের জয়।
বাতাস শিহরি' পরশ করিল হিয়া,
কুলুকুলু রবে নদী করে কলতান;
সূর্য্যকিরণ আলোর আভাস নিয়া
গাহে আজ তার আগমন-বাণী গান।

সন্দেশ

নিউ ব্রাইটন সহরে কুকুরদের জন্য একটা স্কুল আছে। সেখানে ইস্কুলের পড়ুয়াদের মতই কুকুরেরা মাইনে দিয়ে পড়ে, পরীক্ষা দিয়ে পাশ ক'রে এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে উঠতে হয়। শেষ পরীক্ষায় পাশ করলে দস্তুর মত 'ডিপ্লোমা' দেওয়া হয়। শিক্ষা বলতে অবশ্যি মনে ক'র না কুকুরেরা এ বি সি ডি পড়ে বা গ্রামার-অঙ্ক-ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামায়। এদের শেখান হয় কি ক'রে রাত্রে চোর ধরতে হয়, ক্ষেত পাহারা দিতে হয়, চিঠি দিয়ে আসতে হয়, ছেলেদের গাড়ী ঠেলে নিতে হয় ইত্যাদি। সব চেয়ে চালাক কুকুরদের শেখান হয় পুলিশের গোয়েন্দাগিরি।

* * * * *

ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ গাছ তোমরা অনেকে দেখে থাকবে। সুন্দর সাদা ধবধবে গাছগুলো, খাড়া উঁচুতে উঠে গেছে। এত লম্বা গাছ পৃথিবীতে কমই হয়। ৩০০।৪০০ ফুট উঁচু ইউক্যালিপ-টাস্‌ গাছও নাকি দেখা গেছে। এই গাছের নানা গুণ। এর তেল ওষুধ হিসাবে খুব উপকারী। তা ছাড়া এর ছাল থেকে কাগজ, দড়ি ইত্যাদিও তৈরী হচ্ছে। ম্যালেরিয়া রোগ তাড়াবার পক্ষে এই গাছের বাগান আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। এই গাছ অষ্ট্রেলিয়ার নিজস্ব।

ছাপার ভুল : পৃঃ ১০৮, ২৩ পংক্তি : 'চট্‌চটে' শব্দটা বসবে 'ফলে'র পরে।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

২৫শে বৈশাখ মহাকবি রবীন্দ্রনাথের পুণ্য জন্মোৎসব হয়ে গেল নানা জায়গায়। তোমাদের কাছ থেকে—তোমাদের নানা প্রতিষ্ঠান থেকে বহু আমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছিলাম, তার জন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু একা আর কত জায়গায় যাওয়া যায়? পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত মাত্র একটি জায়গায় যেতে পেরেছিলাম এবার—শোভাবাজার রাজবাড়ীতে। এখানে স্থানীয় ছেলেমেয়েরা কবিগুরুর বিসর্জ্জন নাটকখানি অভিনয় করেছিলেন। অতি সুন্দর হয়েছিল সে অভিনয়। এর জন্য প্রথমেই এই উৎসবের পরিচালক সু-অভিনেতা শ্রীমান্ অজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশংসা করতে হয়। এ ছাড়া প্রসূন, চিত্রলেখা, প্রতিমা, নমিতা, সুলতা ও চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝর্ণা, বীথি ও তাপস সিংহ, বরুণ ঘোষ, শীলা দেব, সম্পূর্ণা বসু, রেবা রায়, সুশীল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও সুন্দর অভিনয় করেছিলেন।

বৈশাখে রামধনুর প্রশংসাসূচক অনেক চিঠি পেয়েছি। তার থেকে কিছু কিছু তুলে দেবার লোভ হচ্ছে। (আত্মপ্রশংসা নিশ্চয়ই ভাল নয়, কিন্তু তার দুর্ব্বলতা কাটানোও তেমন সহজ নয়!) যেমন ধর—"আমি ভেবেছিলাম এ বৎসর থেকে আমি আর রামধনু নেবো না, কিন্তু এ বৎসরের রামধনু দেখে লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। তাই নিতে হ'লো।" (শ্রীবাসুদেব লস্কর—পাটনা); "...রামধনু রূপ-রস-গন্ধ বেসাতীর সাজি হাতে নিয়ে পাহাড়ী মেয়ের মত নাচতে নাচতে হাজির হয়েছে।...আরাধ্য দেবতার কাছে জানাচ্ছি ও যেন থুনখুনে বুড়ো হয়।" (এম্. এ. সালেহিন—রাজসাহী); "আজও আমি রামধনুকে কিশোর সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন পাবার যোগ্য মনে করি।" (শ্রীশর্ম্মিলা সরকার—কলিকাতা); "নতুন বছরের রামধনু দেখে এত আশাতীত ভাবে খুশি হয়েছি যে তাকে ভাষায় রূপ দেওয়া আমার সাধ্যাতীত খুব ভালো লাগল নতুন ধরণের তিন-রঙা মলাটটি।" (সুব্রত গংগোপাধ্যায়); "ভাই রামধনু, তুমি এত সুন্দর—এত চমৎকার! সারা জীবন যেন তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ না হয়। (শ্রীকনক বসু—খুলনা); "...এবারের রামধনুর দেরী দেখে হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম, এমন সময় আবিষ্কার করলাম আমার ছোট ভাই ছোটকু রামধনু সব-প্রথম পিওনের কাছ থেকে পেয়েই লুকিয়ে ফেলেছিল,—নিজে সবটা পড়ে তার পর আমাদের দেখিয়েছে। তাই আপনার কাছে নালিশ করছি—কি সাজা দেবেন ওকে বলুন!

ওঃ; রামধনু না পেয়ে আমরা ছটফট করে মরছি, আর ও দিব্যি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়বে! বিশ্বাসঘাতক কোথাকার!" (শ্রীতপতী দাশগুপ্ত—এলাহাবাদ)।

শ্রীঅমিতা বসু মল্লিক এবং কুমারী দীপ্তি ও দীপালী সেনগুপ্ত ছোটদের কয়েকখানি ইংরেজী পত্রিকার নাম-ঠিকানা চেয়েছেন। কয়েকখানার কথা বোধ হয় আগে লিখেছিলাম, আবার দিচ্ছি—চিল্‌ড্রেন্‌স্‌ নিউজপেপার (সাপ্তাহিক), কলিং অল্‌ বয়েজ্‌, কলিং অল্‌ গার্ল্‌স্‌, কলিং অল্‌ কিড্‌স্‌, বয়েজ লাইজ, চাইল্ড লাইফ, চিল্‌ড্রেন্‌স্‌ একটিভিটিস্‌, আমেরিকান্‌ গার্ল (মাসিক)। এগুলির গ্রাহক হ'তে হ'লে প্রথমটির জন্য ইণ্টারন্যাশনাল বুক হাউস লিঃ, ৯ য়্যাশ্‌ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই এবং শেষ ক'টির জন্য রীডার্স সার্ভিস, ১৬৬ হর্ণবি রোড, বোম্বাই—এই ঠিকানায় ইংরেজীতে চিঠি দিলে ওঁরাই সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। জয় হিন্দ। ইতি—রাঃ সঃ

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। শালিখ—খলিশা ২। বাজ ৩। চড়াই ৪। বক।

উত্তরদাতাদের নামঃ নির্ভুলঃ—সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা ২৬); দুলাল, মীরা, বীণা বৌদি, হরপ্রসাদ কুশারী (কলিকাতা ২৯); মায়া, লক্ষ্মী, খুকু, মঞ্জু, রুবি, স্বপন (কারমাটার); দেবী বিশ্বাস, আপুষকিট্‌লু (বেলগাছিয়া), রত্না, স্বপ্না, জয়ন্ত, ছন্দা(বাঁকিপুর); করবী চ্যাটার্জ্জী (ঢাকুরিয়া); তপন, দেবেশ, জয়শ্রী, রঞ্জনা, স্বপন, বাসুদেব, সুকুমার, নমিতা, আভা, অশোক (নয়া দিল্লী); কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত (কলিকাতা ২৯); গুণু গুহ (বরিশাল); লব, কুশ, বাপ্পা, রামু, নেবু (কলিকাতা)। আংশিকঃ—অদিতি (সিমলা); শ্রীপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ (কাজলধারা); অমলকুমার মিত্র, অবিনাশ চক্রবর্ত্তী (গৌহাটী); দীপ্তি ও দীপালী সেনগুপ্তা (গৌহাটী); নীতিশচন্দ্র বসু (ভন) (সৈদপুর—টাকী); রুণু ও মা (লক্ষ্ণৌ)।

নূতন ধাঁধা

শ্রীসীতা দেবী

১৯৪২ সনে যখন কলকাতায় বোমা পড়ল তখন রাম বাবুর বাড়ীর ছাদেরও খানিকটা ভেঙ্গে পড়ল। বাড়ীখানার ওপর রাম বাবুর বড্ড মায়া, কারণ ওটা তৈরী করেছিলেন তাঁর ঠাকুরদা—যিনি নাকি রাম বাবুকে অত্যন্ত ভাল বাসতেন। যাই হোক, বোমার হিড়িক কমলে রাম বাবু মিস্ত্রী ডেকে বাড়ী মেরামত করালেন, মিস্ত্রীকে বললেন আগে যেমন ছিল হুবহু তেমনি ক'রে দিতে হবে। মিস্ত্রী মেরামত করতে গিয়ে দেখে ছাদের পাঁচীলে যেখানে বাড়ী তৈরীর ইংরেজী সন খোদাই করা ছিল সেটা ভেঙ্গে প্রত্যেকটি অক্ষর আলাদা হয়ে গেছে। সে প্রথমটা একটু মুশকিলেই পড়েছিল, তার পর ভেবে-চিন্তে সেগুলো ইচ্ছে মত যুড়ে বসিয়ে দিল। আসলে কিন্তু সে একেবারে উল্টো বসাল কিন্তু মেরামতের পর রাম বাবু আর তা ধরতে পারলেন না। বল দেখি বাড়ীটা কোন্‌ সনে তৈরী হয়েছিল?

"বিশালগড়ের দুঃশাসন" ২৲
হেমেন্দ্রকুমার রায়
বিদেহী আত্মা ড্রাকুলার ভয়াবহ কাহিনী
ছোটদের পক্ষে রাত্রে না পড়াই ভাল।

"চব্বিশে এপ্রিল, চুপ্‌" ১৲
সুকুমার দে সরকার
সম্পূর্ণ নূতন ধরণের রহস্যময়
অপূর্ব্ব কিশোর উপন্যাস।

"এইচ্‌ জি ওয়েল্‌সের গল্প" ২৸০
সম্পাদক—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
বিশ্ববিখ্যাত গল্পসংগ্রহের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের "অদৃশ্য কালো হাত" কিরীটি রায়ের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি—৸০

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
"সুলুসাগরের ভুতুড়ে দেশ" ১৷৹
"হত্যা এবং তারপর" ১৲
"প্রেতাত্মার প্রতিশোধ" ৸০

মণিলাল অধিকারীর
"রক্তাভ বুদ্ধ" ১।০
"লাল মাকড়সা" ১৲
"চাঁদের দেশে মঞ্জু" ৷৵০
"মৃত্যু-বিভীষিকা" ৸৵০

অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তীর
ব্ল্যাকমেল" ১৲
"দ্বীপান্তরের কয়েদী" ৷৵০

"দি-আইল্যাণ্ড অব্‌ ডক্টর মোরো"—এইচ্‌ জি ওয়েল্‌স্‌। ২৸০

V. P. P.র জন্য লেখো—অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, ১০৯-এ লেক রোড, কলিকাতা ২৯

ছেলেমেয়েদের হাতে
কবির শেষ উপহার
গ ল্প স ল্প
গল্প ও কবিতা
শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অঙ্কিত মলাট
।কবির আঁকা মুখপাতের ছবি ॥
কবির শেষ বয়সের একখানি
ফটোগ্রাফও আছে।
কাগজের মলাট ১৷৹
সুদৃশ্য বাঁধাই ২৷৹

বিশ্বভারতী
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—ছেলেমেয়েদের জন্য—

প্রকাশিত হইয়াছে

কবিতা *
গল্প *
উপন্যাস *
জীবনী *
ভ্রমণ *
শিকার *
বিদেশী
সাহিত্য

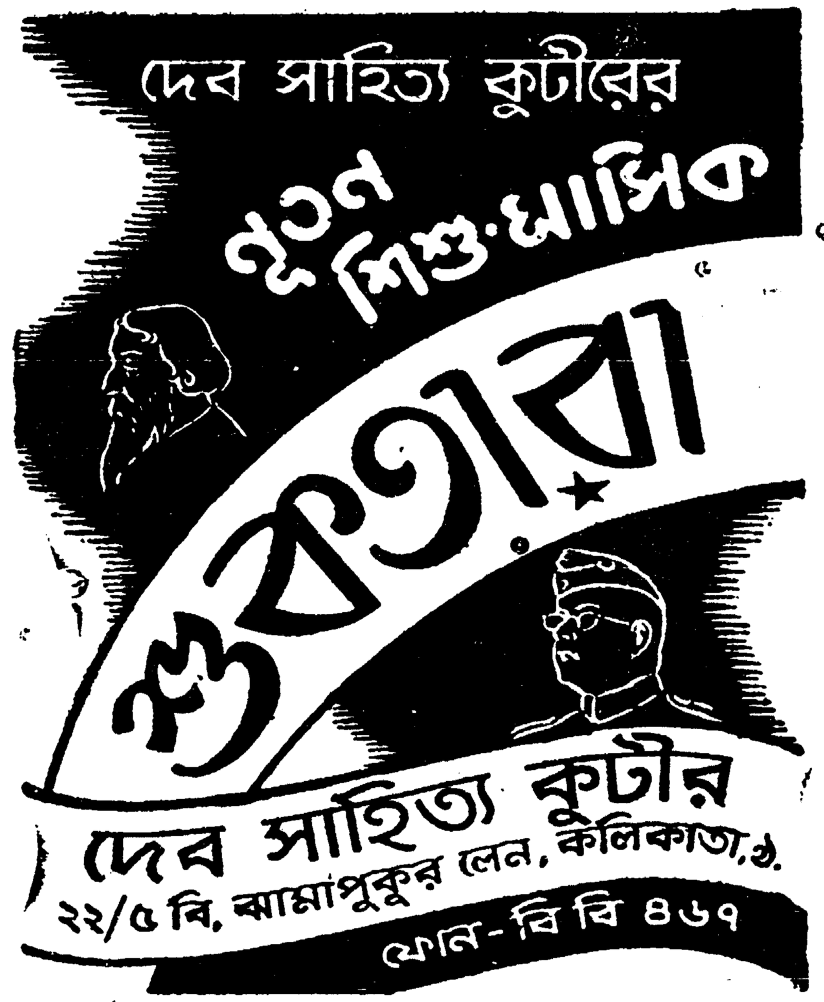

* নাটক
* খেলাধূলা
* ও ব্যায়াম
* বিজ্ঞান
* বৈচিত্র্য
* ইতিহাস
* ভূগোল
ধাঁধা-
রহস্য

ঝক্‌ঝকে চিত্র-সমুজ্জ্বল!

১৩৫৪, ফাল্গুন মাস থেকে ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা আরম্ভ

দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা বাহির হইল।

প্রত্যেকখানির মূল্য ছয় আনা

বার্ষিক সডাক ৪৲ টাকা

আজই গ্রাহক হউন

দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ৯

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

রামধনু-সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

নতুন সংস্করণ

দাম একটাকা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্মী ঘি এখন থেকে এক সের টিনে পাবেন। লক্ষ্মী ঘিয়ের অগণিত পৃষ্ঠপোষক ও ক্রেতাগণের পক্ষে ইহা এক সুবর্ণ সুযোগ।

INTENTIONAL

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৪৲, ষাণ্মাসিক ২।০ ; প্রতি সংখ্যা ।৵০ ; ভি. পি. চার্জ
বৈশাখ মাস হইতে রামধনুর বৎসর গণনা করা হয়।

২। গ্রাহকগণ কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খোঁজ লইবেন এবং উত্তরসহ ঐ মাসের
মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যা মূল্য দিয়া লইতে হইবে। রামধনু মাসের প্রথম
প্রকাশিত হয়

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে কার্য্যালয়ে পাঠাইতে
অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না বা সে সম্বন্ধে মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না। লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক
রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন ও সঙ্গে ডাকটিকেট পাঠাইবেন না।

৪। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময়ে গ্রাহক নম্বর অথবা "নূতন গ্রাহক" লিখিয়া দিবেন। গ্রাহক নং
না থাকিলে কোন কিছুরই ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। প্রতি মাসে মোড়কের ঠিকানার উপর গ্রাহক নং লেখা

৫ ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইলে মাসের ২০শে তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হয়। কেবল মাত্র গ্রাহক
তিনিই উত্তর পাঠাইতে পারিবেন।

৬। বিজ্ঞাপনের হারের জন্য কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র দিবেন।

১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫
ফোন নং সাউথ ১২৬
শাখা কার্য্যালয় : ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১।বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

'রামধনু' কার্য্যাধ্যক্ষ

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রী ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পাহাড়ী হরিণ

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিমণ্ডিত

[illegible] { আষাঢ়, ১৩৫৬ { ৩য় সংখ্যা

সন্তোষ

(রাজযোগী কবি ভর্তৃহরি হইতে)

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

বল্কলে সন্তুষ্ট মোরা,
পট্টবাসে সন্তোষ তোমার,
উভয়েই তুল্য তুষ্ট,
সমজ্ঞান বিশেষ আমার।

বিশাল আকাঙ্ক্ষা যার
রয়ে যায় দরিদ্র সে জন,
কে বা ধনী কে দরিদ্র,
পরিতুষ্ট থাকে যদি মন।

হে বীর, প্রণাম করি

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—ছত্রিশ—

মহাস্থবির নাগসেন যে কূপটীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন সেটী শুষ্ক হ'লেও তার নীচে কিছু পাঁক জমে ছিল, অতটা উঁচু থেকে পড়লেও সেই পাঁকের জন্যই তিনি রক্ষা পান। কোমর অবধি পাঁকে নিমজ্জিত হয়েও তিনি মোটেই বিচলিত হলেন না, শান্ত উদাত্ত কণ্ঠে তিনি তথাগতকে স্মরণ করলেন:

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি! ধম্মং শরণং গচ্ছামি!! সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি!!!
ওঁ শ্রীমণিপদ্মে হুঁ! ওঁ শ্রীমণিপদ্মে হুঁ!! ওঁ শ্রীমণিপদ্মে হুঁ!!!

মহাস্থবিরের উদাত্ত কণ্ঠ কূপের চারিপাশের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তোলে।

ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। দূরে গ্রীক-শিবিরে এক একটি মশাল জ্বলে ওঠে। রাত্রির স্তব্ধতা থম্ থম্ করতে থাকে প্রান্তরের বুকে।

দু'জন গ্রীক সৈনিক এসে দাঁড়ায় কূপের পাশে, কূপের মুখে নত হ'য়ে অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—মহাথের, শুনছেন?

নাগসেনের মন্ত্রোচ্চারণ বন্ধ হ'ল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কে?

—আমি অগ্নিমিত্র। আপনি এই দড়িটা কোমরে বাঁধুন, আমরা আপনাকে তুলে নিচ্ছি। অগ্নিমিত্র খানিকটা রজ্জু নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিলে।

অল্পক্ষণের মধ্যে দু'জনে নাগসেনকে কূপ থেকে টেনে উপরে তুললো। নাগসেনের সর্বাঙ্গ তখন কর্দমাক্ত। অগ্নিমিত্র বললো—আসুন, কাছেই একটী নদী আছে, আপনার স্নানের ব্যবস্থা করে দিই।

নাগসেন বললেন—তোমাকে তো চিনলাম, ইনি কে?

দ্বিতীয় সৈনিক মৃদু হেসে বললো—আমাকে চিনতে পারছেন না মহাথের, আমি মালবিকা!

নাগসেন বললেন—তোমাদের দুর্জয় সাহসের প্রশংসা করি।

অগ্নিমিত্র বললেন—অদম্য শত্রুকে জয় করতে হ'লে দুর্জয় সাহসের প্রয়োজন হয় মহাথের!

কথায় কথায় অগ্নিমিত্র নাগসেনকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে চাইলেন, কিন্তু নাগসেন সম্মত হলেন না, বললেন—আমার কর্ত্তব্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, আমি গ্রীক শিবির ছেড়ে এখন যেতে পারি না, অগ্নিমিত্র!

রাত্রি দ্বিপ্রহরে শত শত মশালের আলো জ্বলে উঠলো, গ্রীকেরা প্রয়াগ দুর্গ আক্রমণ করলো। প্রয়াগের দুর্গাধিপ কিছুটা প্রস্তুত ছিলেন। দুর্গপ্রাকারের উপর শস্ত্রপাণি রক্ষীদের প্রস্তুত রেখেছিলেন, তাদের বিষাক্ত তীর গ্রীকদের প্রতিহত করলো। গ্রীক হস্তীযূথ দুর্গদ্বার আক্রমণ করার চেষ্টা করলো, দুর্গরক্ষীরা তীরের মুখে অগ্নিগোলক বেঁধে নিক্ষেপ করতে লাগলো। অগ্নিভীতি রণহস্তীগুলিকে চঞ্চল করে তুললো, তারা আর এগুতে পারলো না। সারারাত ধরে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করার চেষ্টা চললো, কিন্তু দুর্গপ্রাকার অবধি গ্রীক বাহিনী পৌঁছাতে পারলো না। উষালোকে মিনান্দার দেখলেন কিছু গ্রীক বাহিনী আহত হয়েছে। অকারণে সেনাক্ষয় করার মত মানুষ তিনি ছিলেন না, তিনি সেনাবাহিনীকে ফিরিয়ে আনলেন। অপর পক্ষের সেনাবাহিনী সাড়া তুললো—মগধ-সম্রাটের জয়!

কিন্তু গ্রীকদের সঙ্গে সংগ্রামে জয়-পরাজয় অত সহজ ছিল না। প্রয়াগ দুর্গের সামনে থেকে মিনান্দার সেনা অপসরণ করলেন বটে কিন্তু প্রয়াগ নগরী অবরোধ করে রাখলেন। সদম্ভে বললেন—ওরা কতদিন নগরীর মধ্যে বসে থাকতে পারে আমি দেখতে চাই। খাদ্যাভাবে একদিন ওদেরকে মাথা নত করতেই হবে।

সেনানায়ক আন্তিওকাস্ পাশেই ছিলেন, তিনি বললেন—সেদিন কিন্তু আমাদের প্রচণ্ড সংগ্রামের সম্মুখীন হ'তে হবে সম্রাট্! ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র অতীব ভয়ঙ্কর! হিন্দুরা প্রাণ দেবে কিন্তু বিদেশীর কাছে মাথা নত করবে না! ওরা শুধু পুরুষেরাই মরে না, মেয়েরাও মরতে জানে। সেবার যখন আমরা মাধ্যমিকার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'লাম, যে ক'টা গৃহ আমরা অতিক্রম করেছিলাম সবই ভস্মীভূত। বাড়ীর মেয়েরা প্রতিটি গৃহে অগ্নিসংযোগ করে পুড়ে মরেছে, শিশুরা মায়ের কোলে জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে, তবু নগরবাসীরা আমাদের কাছে পরাভব মানে নি। এমন না হ'লে হিন্দুরা এত বড় হতে পারত না। এইটা ওদের কাছ থেকে আমাদেরকে শিখতে হবে। যারা নির্ভয়ে মরতে জানে তাদেরকে বাইরে থেকে মারা শক্ত!

মিনান্দার মৃদু হেসে বললেন—কিন্তু সব মানুষ তো সমান হবে না আন্তিওকাস! এদেশের মানুষ চিরদিনই মরতে ভয় পায়। যাদের বিত্ত আছে, সাচ্ছন্দ্য ও বিলাসকে যারা বড় করে দেখে, তারা মরতে যাবে কোন্ দুঃখে? তারা শান্তিতে সম্পত্তি ভোগ করতে চায়। সাধারণের ভিতর থেকে তাদের ছেঁকে তুলতে হবে। তাদেরকে পদগৌরব দিলেই সমগ্র জাতিকে তারাই আয়ত্তে রেখে দেবে।

—তা তো জানি সম্রাট, সেই জন্যই কোন নগরে প্রবেশ করার আগে সৈনিকদের আমি বার বার স্মরণ করিয়ে দিই, নগরের মধ্যে যত বড় বড় বাড়ী দেখবে তাদের গৃহস্বামীকে আঘাত করবে না, পাকড়াও করে আনবে আমার কাছে...

—ঠিক! বড়লোকেরা নিজের দেশের চেয়ে নিজের পয়সাটিকেই বড় ব'লে মনে করে,

ওদেরকে শুধু এক একটা উচ্চ পদ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে ওদের বিষয়-সম্পত্তি ওরা সাচ্ছন্দ্যে ভোগ করতে পারবে! তা হ'লেই বাকী প্রজাদেরকে নিয়ে আর আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। ওরাই সব মেরে ধরে ঠিক করবে, বৎসারান্তে রাজস্ব আমাদের হাতে ঠিকই আসবে।

—হনুমানগড় থেকে মাধ্যমিকা অবধি তাই তো দেখলাম, এখানেও ওই নীতি সফল হবে।

—বিজিত দেশে শান্তি স্থাপনা করতে হ'লে এই নীতিই হচ্ছে বিজেতার একমাত্র নীতি—সর্ব দেশে সর্ব কালেই প্রযোজ্য।

সহসা তাঁবুর পর্দা ঠেলে ভিতরে এসে ঢুকলেন নাগসেন, মিনান্দার চমকে উঠলেন। শান্ত কণ্ঠে নাগসেন বললেন—আপনারা যে ভাবে শান্তি কামনা করেন সে ভাবে কোনদিন শান্তি আসে না সম্রাট্! শত শত গৃহের ভস্মস্তূপের উপর দিয়ে, শত শত মানুষের শবের উপর দিয়ে আপনার অশ্ব যখন অগ্রসর হবে, রক্তসিক্ত রাজপথে ঘোড়ার ক্ষুর যখন পিছলে পড়বে, আহত সৈনিকেরা যখন আর্তনাদ করতে করতে আপনার গমনপথের পানে তাকিয়ে আপনাকে অভিশাপ দেবে, তখন কি সত্যই আপনি শান্তি পাবেন? এই যদি সত্যই আপনার অভিপ্রেত শান্তি হয়, তা হ'লে বুঝতে হবে আপনার প্রকৃতি মনুষ্যধর্ম্ম-বিরোধী। কিন্তু আপনি তো তা নন্!

মিনান্দারের চোখ বিরক্তিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠলো, বললেন—এই দুষ্ট সন্ন্যাসীকে আমি অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে আদেশ দিয়েছিলাম, শান্ত্রীরা আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছে। অবিলম্বে তাদের উপযুক্ত শাস্তির বিধান কর।

নাগসেন বললেন—তারা আপনার আদেশ যথারীতিই পালন করেছিল সম্রাট্, কিন্তু ভগবান্ তথাগতের কৃপায় আমার জীবন রক্ষা পেয়েছে। আমার কর্ম এখনও অসমাপ্ত রয়েছে, তা শেষ না হ'লে তো এ পৃথিবী থেকে আমি বিদায় নিতে পারি না সম্রাট!

—উত্তম, এবার দেখা যাবে, আমি বড় কি তোমার ভগবান্ বড়! প্রতিহারী, অবিলম্বে একে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ কর।

নাগসেন শান্ত উদাত্ত কণ্ঠে বললেন—অপরের জন্য দুঃখ বরণ করাই আমার ধর্ম। আপনি আমাকে হত্যা করতে চান, করুন; কিন্তু আমাকে নিহত করার আগে আপনার যত অসৎ গুণ—আপনার অহঙ্কার, আপনার জয়ের আকাঙ্ক্ষা, আপনার নিষ্ঠুরতা আমাকে ভিক্ষা দিন সম্রাট্! আমার মৃত্যুর পর, আমার কথাটা শুধু একবার ভেবে দেখবেন—কেন একে মারলাম, কেন মাধ্যমিকা থেকে প্রয়াগ পর্য্যন্ত হত্যার অভিযান চালালাম? যাদের সঙ্গে কোন দিন কোন পরিচয় ছিল না, তাদের কেন খুন করলাম? অনন্ত কাল-সমুদ্রে এই জীবন কতটুকু, ক'দিনের জন্য এই সাম্রাজ্যের বিলাস? এই কথা ভাবতে ভাবতেই আপনার আত্মশুদ্ধি হবে, আপনি সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন, আপনি বুঝতে

পারবেন হিংসার চেয়ে অহিংসা বড়। সম্রাট্ অশোক বিনা অস্ত্রে যে দিগ্বিজয় করেছেন, সেকেন্দার শা লাখ লাখ নরহত্যা করে তা পারেন নি।

সম্রাট্ শান্ত্রীকে বললেন—নিয়ে যাও!

নাগসেন বললেন—আজ হয়ত আমার কথাগুলি আপনার মর্মস্পর্শ করছে না, কারণ আজ অবধি আপনি কোন্ পরাজয় মানেন নি। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যখন পরাজয় ঘনিয়ে আসবে, তখন আমার কথাগুলি ভেবে দেখবেন সম্রাট্!

সম্রাট্ শান্ত্রীর উপর রুক্ষ হয়ে উঠলেন—নিয়ে যাও!

শান্ত্রী নাগসেনকে ধরার জন্য অগ্রসর হ'ল, কিন্তু তার গায় হাত দেবার আগেই সহসা তাঁবুর প্রবেশ-পথে বজ্রাচার্য্যকে দেখা গেল; বজ্রকণ্ঠে তিনি আদেশ দিলেন—তিষ্ঠ!

উপস্থিত সকলেই বিস্মিত হ'ল।

বজ্রাচার্য্য বললেন—উত্তরাপথের ধর্মচক্রের মহাস্থবিরের গায়ে হাত তুলতে পারে এমন মানুষ আজও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নি।...মহাথের, আপনি আসুন!

সম্রাট্ এবার উত্তেজিত হ'য়ে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন, কোষ থেকে তলোয়ার বার করে এগিয়ে আসতে চাইলেন, কিন্তু তিনি এক পা অগ্রসর হতে পারলেন না, তাঁর মনে হ'ল পা দু'খানি যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেছে।

বজ্রাচার্য্য হা-হা করে হেসে উঠলেন, বললেন—সম্রাট্, সামান্য ভূখণ্ড, বিত্ত ও জনবল আয়ত্ত ক'রে আপনি মনে করেছেন আপনি যা ইচ্ছা তাই করবেন, আপনার ইচ্ছাই শত সহস্রের উপর জোর করে চাপিয়ে দেবেন! তা হয় না সম্রাট, নিজের উপর অতটা অহঙ্কার রাখবেন না! একজন সন্ন্যাসী অনায়াসে আপনাকে শক্তিহীন করতে পারে, আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে আপনার সমগ্র সাম্রাজ্যের শক্তি নগণ্য!...আসুন মহাথের—

নাগসেন বললেন—কিন্তু আমার কাজ যে এখনও সম্পূর্ণ হয় নি বজ্রাচার্য্য!

—কিন্তু তা ব'লে আপনার মত সম্মানিতকে এমন ভাবে অপমানিত হ'তে দিতে আমরা পারি না।

—মান-অপমান অহঙ্কারের কথা, বজ্রাচার্য্য! আমার অহঙ্কার বোধকে আমি তথাগতের চরণে সমর্পণ করেছি; ভিক্ষুর মান-অপমান বলে তো কিছু নেই!

—আপনি যে কথাই বলুন মহাথের, আপনাকে এ ভাবে অপমানিত করা মানে সমস্ত ধর্মচক্রের অপমান। আমাদের দেহে প্রাণ থাকতে তা হবে না, আপনি আসুন—

চারিপাশে একবার রক্তচক্ষুর দৃষ্টি বিকীরণ করে বজ্রাচার্য্য মহাথের নাগসেনের হাত ধরে বাহির হয়ে গেলেন। বস্ত্রাবাসের মধ্যে কিছুক্ষণ কারুর বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না, কেউ নড়তে-চড়তে অবধি পারলো না।

(ক্রমশঃ)

সুইডেনে কয়েকদিন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী, এম্. এ, বি. এল্

৩

আন্তর্জাতিক তরুণ-তরুণী শিবিরে যোগ দেবার জন্য এসেছি সুইডেন। ম্যালার্ণ হ্রদের তীরে পাইন-বনের মধ্যে পড়েছে আমাদের তাঁবু, সে কথা আগেই শুনেছ। তার পর শোন :

রবিবার গেলাম ষ্টকহোল্ম বেড়াতে। মামুলি প্রথামত আর্ট গ্যালারী, রাজপ্রাসাদ, রীকস্‌টাগ, ন্যাশনাল মিউজিয়াম্ ইত্যাদির বাড়ীগুলি বাইরে থেকে ঘুরে দেখলাম।

সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহোল্‌ম্। আশেপাশে হ্রদে ঘেরা ; ছোটবড় দ্বীপপুঞ্জে বাড়ী আর কারখানা তৈরী হয়ে সুন্দর এই সহরটি গড়ে উঠেছে। এখানকার রাজা পঞ্চম গুস্তাভ অনেকটা ইংল্যাণ্ডের রাজার মতই। রাজত্ব চালায় দেশের লোকেরা পার্লামেণ্টের দ্বারা। রাজা রাষ্ট্রের প্রধান বটে কিন্তু প্রধান মন্ত্রীই হলেন গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাজার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই।

সুইডেনের পার্লামেণ্টের নাম রীকস্‌টাগ। এই পার্লামেণ্টে দু'টি চেম্বার। একুশ বছরের ওপর যে কোন সুইডিসের অধিকার আছে পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য ভোট দেবার।

প্রথম চেম্বারে ১৫০ জন সদস্য—যাদের প্রত্যেকের বয়স হওয়া চাই ৩৫ বছরের ওপর। এই চেম্বারে সদস্য নির্ব্বাচন করার প্রথা একটু ঘোরানো।

সাধারণ লোকেরা আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি বা কলিকাতা কর্পোরেশনের মত এদের সহর এবং কাউন্‌টি কাউন্‌সিলের সদস্য নির্ব্বাচন করে ভোটের দ্বারা। এই সিটি ও কাউন্টি কাউনসিলের সদস্যেরা নির্ব্বাচন করেন প্রথম চেম্বারের সদস্যদের। এই চেম্বারের অফিসের আয়ু আট বছর একভাবে, কিন্তু প্রতি বছর সদস্যদের আট ভাগের একভাগ সদস্য বদলানো হয়।

দ্বিতীয় চেম্বারের সভ্যসংখ্যা হ'ল ২৩০ জন, যাদের বয়স ২৫ বছরের চেয়ে কম হ'লে চল্‌বে না। এই চেম্বারে সদস্যেরা সাধারণ লোকের ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত। প্রতি চার বছরে নতুন নির্ব্বাচন হয়।

মন্ত্রিমণ্ডলীতে আছেন পনের•জন মন্ত্রী। প্রধান মন্ত্রীর নাম হ'ল টুগ. আরলাণ্ডার। সুইডেনে 'সোসাল ডেমোক্রাটিক' দল এখন প্রধান। এটি 'লেবার'—অর্থাৎ মজুরদের দল। পার্লামেণ্টের দুই চেম্বারেই এরা এখন জনসংখ্যায় বেশী। এই গভর্ণমেণ্ট দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করছে। তাকে বলা হয় 'প্লানিং'। এই পরিকল্পনার মধ্যে প্রধান হচ্ছে (১) সকলের উপার্জনের জন্য কাজ, (২) লোকের অবস্থা ভাল করার জন্য দেশের ধনদৌলত সকলের মধ্যে ন্যায্য ভাবে বণ্টন, আর (৩) দেশের উৎপাদন-শক্তি বাড়ানো এবং শিল্পের কাজে 'ডেমোক্রাসী' অর্থাৎ 'সাম্য' আনা। এখানকার পার্লামেণ্টে পাঁচটি দল—কন্‌জারভেটিভ, ফারমার, লিবারাল, সোসাল ডেমোক্রাটিক আর কমিউনিষ্ট। শুধু কন্‌জারভেটিভ পার্টি অর্থাৎ রক্ষণশীল দলই এই প্লানিংর বিরুদ্ধে।

ব্লুম কাইস্তের হট্ হাউস ও আনাজ
পিছনে দণ্ডায়মান ব্লুম কাইস্তের স্ত্রী, ব্লুম কাইস্ত আর ছবির ডানদিকে তাদের মেয়ে ইন্‌গেয়ার্ড ও তার বন্ধু।

সেদিনকার মত ফিরে এলাম। উপর উপর দেখায় কোন আনন্দ পেলাম না। আরও ভাল করে সহর দেখার ইচ্ছা রইল মনে, আর তার সঙ্গে রইল ষ্টক্‌হোল্মে

বিশেষ করে এদের বিখ্যাত কোঅপারিটিভ সোসাইটিগুলি এবং তাদের কাজের প্রণালীগুলি দেখার ইচ্ছা। শিবিরে এসে ক্নুটসন্‌কে আমার ইচ্ছা জানালাম। ক'দিন পরেই দেখি শ্রীহেন্‌রি ফিন্নেরুদ আমার কোঅপারিটিভ সোসাইটি দেখার ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়েছেন।

সোমবার এলো। কাজ করে চলেছি বীট ক্ষেতে। বিকালে এলেন আমার কাজ পরিদর্শনে শ্রীএড্‌বেরী—আর একজন ইংরাজি-জানা নরওয়েজিয়ান ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। কাজের পরিমাণ হেঁটে মাপলে হয় ৫০০ পা, অর্থাৎ চার সারি বীটের গাছের ক্ষেতের ৫০০ পা (১৩০০।১৪০০ ফুট) আমি আগাছা তুলেছি। এড্‌বেরী বল্‌লেন, মজুরীর দিক্‌ থেকে আমার কাজ হয়েছে অত্যন্ত সামান্য—অত সুনিপুণভাবে সমস্ত ঘাস, আগাছা তোলার প্রয়োজন ছিল না। গরমে রোদ্দুরে একা একা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করার পর তাঁর কথাগুলি বিশেষ ভালো লাগ্‌ল না। তাঁকে বললাম, 'শান্তি-শিবিরের" উদ্দেশ্য রক্ষা করার জন্যে বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ক্ষেতের কাজ করে উপার্জ্জন করা প্রয়োজনীয় হ'তে পারে, কিন্তু ক্ষেতের কাজ গৌণ, এবং আমি এসেছি সত্যিকার আন্তর্জাতিক মনোভাব নিয়ে। অথচ কাজের পরিমাণ, সময় এবং ব্যবস্থায় শিবিরের বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েদের এবং সুইডিস লোকেদের সঙ্গে মেলামেশার সময় এবং সুযোগ এত কম যে এই আন্তর্জাতিক শান্তি-শিবিরের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার ওপর আমার আশা-ভরসা কমে যাচ্ছে।'

রাজপ্রাসাদ—ডরটিংহোল্ম

পরের দিন দেখি তিনি আমাকে পাঠালেন জুলিয়াস ব্লুম কাইস্ত নামে

এক ফারমারের কাজে। সেখানে কাজ করছিল আমাদের শিবিরের দু'টি নরওয়েজিয়ান মেয়ে—টুরিড এবং সিগরিন।

ব্লুম কাইস্ত সুইডেনের খাঁটি অর্থাৎ 'টিপিকাল' ফার্মার। ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা, মধ্যবয়সী—অর্থাৎ তাঁর বয়স ৫২ বছর। তাঁর বাড়ীর লোক বল্‌তে তিনি, তাঁর স্ত্রী আর তাঁর মেয়ে ইন্‌গ্‌গেয়ার্ড। ছবির মত সুন্দর তাঁর সাজানো বাড়ী। বাড়ীর সঙ্গে জমি খুব বড়—সেই জমিতেই আছে তাঁর ক্ষেত আর চারটে বড় 'হট হাউস'। শ্রম লাঘব-করা যন্ত্রপাতি এঁরা ব্যবহার করেন অনেক, তবুও ক্ষেতের দৈহিক কাজের শেষ নেই। এঁরা ক্ষেতের কাজের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জিনিষের ওপর লক্ষ্য রাখেন। গ্রীষ্মকালের দিন প্রকাণ্ড, আর এঁরা এই সময়ের এক মুহূর্ত্তও অপচয় করেন না।

টুরিড ও সিগরিন আমায় আলাপ করাল ব্লুম কাইস্তের সঙ্গে। তিনি তখন তাঁর কাজের পোষাক পরে কুলিদের সঙ্গে সমান কাজ করে চলেছেন। আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর তাঁর বাগানের দিকে হাত দেখিয়ে তিনি অনেক কিছু বল্‌লেন সুইডিস ভাষায়, যার অর্থ কিছুই আমার বোধগম্য হ'ল না। সিগরিন আমায় ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিল, আমায় কি কাজ করতে হবে তার বিষয় কথা হচ্ছে।

এইখানে কাজ করলাম দিন পনের। রকম-বেরকমের দৈহিক কাজ—যেমন আগাছা তোলা, মাটি কোপানো, জঙ্গল পরিষ্কার করা, হট্‌ হাউসের মধ্যে গাছের পাতা কাটা, শসা গাছের গোড়ায় সার ও মাটি ঠিকমত লাগান, হট হাউসের বাইরেটা লোহার বুরুষে চেঁচে পরিষ্কার করা ইত্যাদি। এ ছাড়া কিছুক্ষণের জন্য চালিয়ে দেখেছি ছোট মাটী কোপানোর কল।

আমি কাজ করতাম ফার্মের এক সুইডিস ছেলের সঙ্গে। সে জানে দু'-একটি ইংরেজি কথা কিন্তু হাবে ভাবে সে আমার সঙ্গে অনেক আলাপ করেছে। বেশ কর্ম্মঠ ছেলেটি, আর স্বভাবটাও তার ভারী সুন্দর।

একদিন ব্লুম কাইস্তের সঙ্গে কাজ করতে হ'ল। তিনি, টুরিড ইংরেজি জানে ব'লে তাকে মাঝে রেখে, আমাকে নানান্‌ বিষয় প্রশ্ন করলেন। জান্‌তে চাইলেন আমাদের দেশের চাষবাসের কথা, চাষীদের আয় কেমন, কি ফসল হয়, নতুন গভর্ণমেণ্টে অবস্থার কেমন উন্নতি হচ্ছে ইত্যাদি নানা কথা। তারপর তুল্‌লেন মহাত্মাজীর কথা।—দেখলাম তিনি মহাত্মাজীর ভারী ভক্ত। তাঁর

বিষয়ে আমার সবচেয়ে ভাল লাগ্‌ল,—তিনি নিজে বড় ফারমার, কিন্তু তাঁর মজুরদের সঙ্গে তিনি, তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্ষেতে কাজ করেন—শারীরিক পরিশ্রমের কাজ। কাজের পরে বিশ্রাম করেন তাঁর সুন্দর সাজানো ছবির মত বাড়ীতে, নয়ত যান সকলকে নিয়ে তাঁর গাড়ীতে ক'রে এদিক্ ওদিক্ বেড়াতে। আমাদেরও তিনি একদিন বেড়াতে নিয়ে গেলেন ডরটিংহোল্মে রাজার গ্রীষ্মের প্রাসাদ ও বাগান এবং চীনা-ভবন দেখাতে। আর একদিন রবিবারে তাঁর আদেশে তাঁর মেয়ে আমাদের ষ্টকহোল্ম সহর দেখিয়ে আনল,—সে সব বর্ণনা পরে করব। তা ছাড়া তাঁর বাড়ীতে আছে বেশ ভাল এক লাইব্রেরী—যার বেশীর ভাগ বই-ই চাষবাস সংক্রান্ত, বোটানী বা উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানের অথবা অন্য জ্ঞানমূলক বই। উপন্যাসের সংখ্যা কম।

এক রাত্রির কাহিনী

শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার

দুপুরের রোদ শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, চীনাবাদামের খোসা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে চষা ভূঁই আর একঘেয়ে ঘাস-বন ভরা মাঠ দেখতে দেখতে শেষ পর্য্যন্ত এসে পৌছলাম। কপালের ঘাম মুছে একবার চোখ মেলে দেখলাম, নাঃ, এসে গিয়েছি। সিগন্যাল দেখতে পাচ্ছি, তখন আর কথা কি আছে? অতএব বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে দরজার কাছে এনে জড় করলাম। এক মিনিটও থামবে না এ ষ্টেশনে, একেবারে অজ পল্লীগ্রাম।

নামটাও তেমনি। কোন ষ্টেশনের নাম শ্যাওড়াতলা হ'তে পারে চারদিন আগে পর্য্যন্ত আমার তা জানা ছিল না। নামটা অবশ্যি সার্থক, এ মানতেই হবে। সমস্ত ষ্টেশনের মধ্যে যাত্রী বলতে আমিই ছিলাম। দূরে একটা কুলি ময়লা চাদরে কান ঢাকা দিয়ে বসে ছিল। তা ছাড়া আর যারা ছিল তারা প্রাণী নয়, পাশাপাশি কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ান এক দঙ্গল শ্যাওড়া গাছ। শ্যাওড়াতলাই বটে!

ষ্টেশন মাষ্টার মুখে ভ্রূকুটি করে আমার টিকিটটা নিলেন, তারপর নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে একবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'যাবেন কোথায়?'

বললাম, 'ডোঙ্গাজুলি।'

'ওঃ, আপনি এখানকার নতুন ডাক্তার? ষ্টেশন মাষ্টারের মুখের ভ্রূকুটি মিলিয়ে একটু যেন আলোর আভা দেখা গেল। ভারী গলায় তিনি হাঁক দিলেন, 'এ চণ্ডু—!'

পকেট থেকে কাগজটা খুলে ঠিকানাটা একবার ভাল করে দেখে বলতে যাচ্ছিলাম, ষ্টেশন মাষ্টার থামিয়ে বললেন, 'রায় মশায়ের বাড়ী যাবেন ত'?'

বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এস্ রায়ই বটে।'

উনি কুলিকে বললেন, 'রায় মশায়ের বাড়ী নিয়ে যা। তারপর আমার দিকে নমস্কার করে বললেন, 'আচ্ছা, আবার কাল দেখা হবে। কাল কেন, এর পর হয়ত রোজই দেখা হবে!'

হেসে প্রতি-নমস্কার করলাম।

ষ্টেশন ছাড়িয়ে শুকনো মাঠের মধ্যে নেমে পড়লাম। ফাটা চড়চড়ে হয়ে গেছে মাঠ। বোধ হয় কোন শূয়োরের পাল এসে হানা দিয়েছিল। জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রতিপদেই হোঁচট খেতে লাগলাম। এখনো দিনের আলো আছে তবু এরই মধ্যে একপাল শিয়াল বেশ গম্ভীরভাবে ধীরেসুস্থে পথ দিয়ে চলে গেল। দূরে কোন্ রাখালের গরু হারিয়েছে, তারই একটানা ডাক শোনা যাচ্ছে ক্রমাগত।

কোন্ ফাঁকে এরই মধ্যে টুক করে সূর্য্য ডুবে গেল। প্রায় আধ হাত জিভ বেরিয়ে এসেছে। চণ্ডুকে বললাম, 'আর কতদূর রে?' উত্তর এল, 'ওই যে বাবু, হোতা; আলো দেখা যেছে।'

হ্যাঁ, আলো দেখা যাচ্ছে বটে। একটু বাদেই আলোর কাছাকাছি গিয়ে পৌছলাম। চণ্ডু হাঁক দিল, 'রায় বাবু গো—!'

মোটাসোটা একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে। মোটা গলায় হাঁকলেন, 'কে রে?'

তারপর আমার দিকে এক মুহূর্ত্ত চেয়ে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে ফেটে পড়লেন, বললেন, 'ওঃ, নতুন ডাক্তার বাবু! আসুন, আসুন। ওরে চণ্ডু, তামাকটা সাজত রে শূয়ার! বড্ডো অন্যায়, বড্ডো অন্যায় করে ফেলেছি মশায়! আমারই ষ্টেশন যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যত সব দশ তালের ধান্দা, পেয়ারাতলা যেতে হ'ল জরিপ করতে। বললাম বেলাবেলি আসব কিন্তু ব্যাটারা সব গয়ংগচ্ছ, উঠতে বসতে বেলা পাঁচটা বাজিয়ে দিল! এই ত' এলাম মশায়! তা এক হিসাবে ভালই হয়েছে, ব্যাটাদের ওখান থেকে মুর্গী নিয়ে এসেছি একটা মশায়! যাক আপনিও এসেছেন, ভালই হ'ল। নয়ত একটা মুর্গী কি একা একা ভরব? রাত্তিরে শীতও পড়বে বেশ জমাট—খাসা জমবে আজ।' তারপর হঠাৎ কি খেয়াল হ'তে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মুর্গী খান ত' আপনি?'

এতক্ষণে মুখের বাক্যবাণ একটু থামল। বললাম, 'বিলক্ষণ, খাওয়ার দিক থেকে আমার তেমন বিচার-টিচার নেই।'

ভদ্রলোক প্রশ্ন করে এমন হাঁ করে তাকিয়েছিলেন যেন আমার উত্তরের ওপর তাঁর জীবন-মরণ নির্ভর করছে। আমার কথা শুনেই হা হা করে হেসে ফেটে পড়লেন, শেষ পর্য্যন্ত আনন্দের চোটে একটা চড়ও দিয়ে বসলেন আমার কাঁধে। বললেন, 'এই ত'

পুরুষের মত কথা! খাব মশাই, সব খাব,—এই ত' মরদ কি বাত! তা না মেয়েদের মত নাকি—এটা খাব না, সেটা খাব না—যত সব!' তারপর বললেন, 'আপনি যান, চট্ করে হাত-পা ধুয়ে ফেলুন গে ঐ টিউবওয়েলে; আমি গিয়ে মাংসটা ছাড়াই। চাকর-বাকর কেউ নেই মশাই, চাকর বলতেও আমি, বাবু বলতেও আমি।'

টিউবওয়েলের জলে মুখ-হাত ধুতে নীচে নেমে গেলাম।

একটু বাদেই প্রমাণ হ'ল ভদ্রলোকের জিভে সর্ব্ববিধ রুচি। হাত-পা ধুয়ে বসতেই উনি এসে বললেন, 'চা আপনাকে খাওয়াচ্ছি দাদা, কিন্তু তাতে কি মৌজ হবে? বেশ ভাল করে সিদ্ধি ঘুঁটেছি আজ, একেবারে এক ফোঁটা জিভে ঠেকাবেন কি চন্‌মন্ করে উঠবে শরীর।' বলেই দু' গ্লাস সিদ্ধির সরবৎ এনে হাজির করলেন।

হাত যোড় করে বললাম, 'দেখুন, আমি জীবনে সিদ্ধি খাই নি, কাজেই মাপ করবেন। ঐ যে চায়ের কেটলি চাপিয়েছেন ওতেই আমার যথেষ্ট, সিদ্ধিটা আমি খেতে শিখি নি।'

ভদ্রলোক মুষড়ে পড়লেন না। বললেন, 'তা ভাল, তা ভাল। অভ্যাস না থাকলে কাউকে অনুরোধ না করাই ভাল। তবে কি জানেন দাদা, সিদ্ধি জিনিসটা বড় ভাল ওষুধ। শীতের দিনে শরীরকে একেবারে গরম করে ছেড়ে দেয়, আর গরমের দিনে ঠাণ্ডা।'

বললাম, 'নতুন কথা শুনলাম আজ অনেক কিছুই।'

ভদ্রলোক বললেন, 'নতুন না দাদা, আপনি খোঁজ রাখেন না বলেই জানেন না। আমরা, দাদা, পশ্চিমে মানুষ, সিদ্ধি আমাদের ত' রোজকার জলখাবার! বাবা নামও দিয়েছিলেন সিদ্ধিনাথ, নামের অমর্য্যাদা করি নি এখনো কোনদিন।' ভদ্রলোক শেষে চুমুক দিয়ে দু'টো গ্লাসই নিঃশেষ করলেন।

একটু থেমে বললেন, 'সিদ্ধির চাইতেও সস্তায় ভাল নেশা হচ্ছে তাড়ি। কিন্তু ভদ্রলোকে খেতে পারে না। আমাদের গোমস্তা ছিল তারিণী তালুকদার, সে ব্যাটা খেত একেবারে চুর হয়ে। বলত, বাবু, সিদ্ধিতে কি মৌজ হয়, যা হয় এই তালের রসে! আমারও, মশাই, গোঁ চেপে গেল। একদিন ভাল করে ঘুঁটলাম সিদ্ধি আচ্ছা করে, তারপর ডাকলাম তারিণী ব্যাটাকে। সে ব্যাটা এক গ্লাস খেয়ে সেদিন ফিরে গেল, এল তার পরের পরের দিন। এসেই আমার পা জড়িয়ে পড়ল, ব্যাটার তখনো নেশা কাটে নি।'

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন সিদ্ধিনাথ বাবু, বললেন, 'সিদ্ধি বানাবার ব্যাপারে আমার সত্যি নাম-ডাক আছে দাদা!'

মনে মনে শিউরে উঠলাম, খেলেই গিয়েছিলাম আর কি!

বললাম, 'সিদ্ধিনাথ বাবু, আপনার মাংস বোধ হয় ফুটে উঠল।'

ভদ্রলোক আবার হাত যোড় করলেন, বললেন, 'দেখুন, ও নামটা পিতৃদত্ত হ'লে কি হবে দাদা, কেউ আমায় ঐ নামে ডাকে না। আপনি আমায় বিলু বাবু বলেই ডাকবেন।' তারপর বললেন, 'দাঁড়ান, দেখে আসছি।' একটু বাদেই ফিরে এসে বললেন। 'প্রায় হয়ে গেল বলে, ক'টা বাজে আপনার ঘড়ীতে দাদা?'

বললাম, 'সাড়ে ন'টা।'

পাড়াগাঁয়ের রাত্রি, সাড়ে ন'টাতেই প্রায় রাত দুপুরের নিস্তব্ধতা। ঝিঁঝি পোকার একটানা ডাক ত' সেই সন্ধ্যা থেকেই সুরু হয়েছিল। জানলাটা খুলে দিতেই একেবারে হাড়-কাঁপান কন্‌কনে হাওয়া খোলা মাঠটা থেকে ছুটে আসতে লাগল। বাপরে, শীত বটে একখানা! গায়ের র‍্যাপারটা তুলে কানে জড়িয়ে লণ্ঠনের আলোতে খবরের কাগজটার বিজ্ঞাপন দেখতে লাগলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে। বেশ খিদে জমেছিল পেটে, কতক্ষণে যে সিদ্ধিনাথ বাবু ওরফে বিলু বাবুর ডাক আসবে খাবার জন্যে!

এমন সময়ে ডাক পড়ল, 'খাবার হয়েছে মশায়, চলে আসুন।' আলোটা নিয়ে উঠে বসলাম, তারপর এগিয়ে বারান্দায় গিয়ে দেখি দু' থাল ভাত বাড়া হয়েছে আর তা থেকে ধোঁয়া উঠছে ধূপের মত। দু'টো গ্লাশে জল ভর্ত্তি করে বিলু বাবু গ্যাঁট হয়ে বসে বললেন, 'নিন দাদা, সুরু করুন, কবজি ডুবিয়ে খেতে পারেন এমন বাটি দিয়েছি। মাংসের এখানে অভাব নেই দাদা!'

কবজি ডুবিয়েই খেলাম। আর খাবার পর যখন হুঁস হ'ল তখন দেখি গলা অবধি ভরে গেছে। ট্রেনের ক্লান্তিতে একেবারে রাক্ষসের মত খেয়েছি। শেষ পর্য্যন্ত দেয়াল ধরে কোন রকমে পৌঁছতে পারলে হয়।

যাক, শেষ পর্য্যন্ত সবই মিটল। 'গুরু গুরু' ব'লে দু'টো তুড়ি দিয়ে বিলু বাবু শয্যা নিলেন। এতক্ষণ একটানা বকেছেন, অথচ কোন ক্লান্তি নেই। ভেবেছিলাম লণ্ঠন নিভিয়ে দেবার পর বোধ হয় একটু রেহাই পাব। কাল সকালে আবার একগাদা কাজে বের হ'তে হবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? পাশাপাশি দু'টো খাট পাতা, একটাতে শুয়ে য্যায়সা গাঁজাখুরি গল্প সুরু করলেন বিলু বাবু যে কার সাধ্যি চোখের দু'পাতা এক করবে? নিজেই বলছেন, নিজেই হেসে উঠছেন হো হো করে, একেবারে নিশুতি রাতের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে। আমি শুধু কুকুরকুণ্ডলী হয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে 'হুঁ হুঁ' করে যাচ্ছি। শেষকালে কোন এক মুহূর্ত্তে নিদ্রাদেবী এসে আমার সকল দুঃখ হরণ করে নিলেন।

আচমকা কিসের শব্দে যেন ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ কচলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। ঘরেরই এক কোণায় কোথায় যেন কিছু এসেছে। কেবলই একটা শব্দ উঠছে থেকে থেকে—কট্ ক—ট্ কট্, কট্ ক—ট কট্। প্রথমে মনে করলাম চোর নাকি, কমসম হ'লেও প্রায় শ' খানেক টাকা আছে স্যুটকেসে, আর যা যথাসর্ব্বস্ব সবই ত' ঐখানে! গা ছম্ ছম্ ক'রে উঠল। ভগবান্‌কে মনে মনে ডেকে লেপের ভিতর থেকে সাহস সঞ্চয় করে যা থাকে কপালে ব'লে টর্চ্চ লাইট জ্বেলে ফেললাম। কিন্তু কই? ঘরের এককোণ থেকে আর এক কোণ পর্য্যন্ত ফর্সা আলোয় ভরে গেল। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমার স্যুটকেস অক্ষত ভাবেই রয়েছে, এ পাশে বিলু বাবু গভীরভাবে ঘুমে ডুবে আছেন, কোথাও কিছু অসঙ্গতির চিহ্নও নেই!

নাঃ, আমারই মনের ভুল! টর্চ্চ নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু কই, আওয়াজ ত' থামছে না! আবার আওয়াজ হ'ল কট্ ক—ট্ কট্, কট্ ক—ট্ কট, প্রায় আধ মিনিট অন্তর আওয়াজ উঠছে থেকে থেকে। আবার লাইট জ্বাললাম, টর্চ্চের আলোয় আবার রাত্তিরকে দিন করে খাটের তলাটা একবার দেখে নিলাম। নাঃ, কিচ্ছু নেই। জানলার বাইরেটা একটু দেখতে যাবো ভাবছি, এমন সময়ে আচমকা টর্চ্চের আলো গেল নিভে। সর্ব্বনাশ, খেয়ালই ছিল না ওর মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে।

নিঝুম নিশুতি রাত্রির অন্ধকার কাঁপিয়ে বাইরে কোন গাবগাছের পাতায় চোখ মুছে কোন প্যাঁচা ডেকে উঠল, বধুম্—ধুম্, বুধুম্—ধুম্, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ করতে করতে কোন একটা পাখী উড়ে পালাল। তাদের আওয়াজ থামতেই এদের আওয়াজ আবার জেগে উঠল, কট্ ক—ট্ কট, কট্ ক—ট্ কট।

বুকের ভিতরটায় কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল, মনে হ'ল তার বৈদ্যুতিক অনুভূতিটা যেন পায়ের আঙ্গুলের ডগা পর্য্যন্ত ছুটে গিয়ে এক নিমিষে আমার ভিতরটা ওলট-পালট করে দিল। মনে হ'ল এই নিশুতি রাতে আমি কোথায় এসেছি? কে এই বিলু বাবু? কি এমন প্রমাণ ছিল যে তিনিই এস্ রায়? কি গ্রাম এই ডোঙ্গাজুলি, লোক নেই কেন? মড়কে শেষ হয়ে গেছে? এ ঘরের অস্তিত্ব কি সত্যি? এই খাটের? বিছানার? ভীতের মত একবার আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করলাম। মনে হ'ল কাল ভোরে হয়ত দেখব কোন শ্মশানের ছাই গাদায় ইট পেতে শুয়ে আছি, রাত্রির কোন জিনিসেরই ইহলোকে অস্তিত্ব নেই। আবার আওয়াজ হ'ল কট্ ক—ট্ কট্।

কানের মধ্যে তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল একশ'খানা হয়ে। এই কালো আলকাতরার মত রাত্রিতে বার বার মনে হ'তে লাগল দুনিয়াতে আর কিছুতে ভয় নেই—সাপ, খুন, রক্ত, ছোরা মারায়। কিন্তু ভয় আছে, ভয় আছে, সে কারুর প্রতিচ্ছায়ায় নয়, ভ্রূকুটিতে নয়, সে ভয় আওয়াজের। মৃদু অথচ মর্ম্মভেদী, সূক্ষ্ম অথচ তা'তে বিদ্যুতের আগুন! এই শীতের রাত্রিতে আমি ঘেমে নেয়ে উঠলাম।

প্রেতযোনি নিয়ে চর্চ্চা করত নরেন রায়, অগাধ জ্ঞান ছিল তার এ বিষয়ে। তার কাছ থেকে শুনেছি কবরের তলার আত্মার ডাক এ দেশে এসে সম্পূর্ণ পৌঁছয় না, বাতাসের গায়ে খানিকটা বুদ্বুদই সৃষ্টি করে মাত্র। তাদের মনের অনুভূতির স্পষ্ট মর্ম্ম ধরা কঠিন। কে জানে, হয়ত এ ঘরের আশপাশের লাখো লাখো মাইল মাটির নীচের আত্মা তার কবর থেকে পৃথিবীর আলো-হাওয়ার কাছে আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছে! তার আর্ত্তনাদের বুদ্বুদ উঠছে আর তখনই তা মরে যাচ্ছে!

একবার মনে হ'তে লাগল ভুল শুনেছি, ভুল শুনেছি। মনের মধ্যেই কেবল ভেসে আসছে আওয়াজ, কানে ত' সত্যিই কিছু আসছে না! কান পাতলাম, তীক্ষ্ণ অনুভূতিগুলির প্রত্যেকটিকে সজাগ রেখে সতর্ক কান পাতলাম। বিড়ালের নিঃশব্দ পায়ের আওয়াজও শব্দপাত করবে সে কানের পর্দ্দায়। নাঃ, কিছু না, কিছু না ত'!

আবার হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে সেই শব্দ হ'ল—কট্ ক—ট্ কট্।

পাগলের মত অন্ধকারের মধ্যেই ছুটে গিয়ে পাশের খাটে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বিলু বাবুকে ঠেলতে লাগলাম—'বিলু বাবু! বিলু বাবু!' সে ডাকে মরা মানুষও জেগে ওঠে, তবু বিলু বাবুর সাড়া নেই—গভীর ঘুমে একেবারে অচৈতন্য। যত সিদ্ধিখোর মাতালের ঘুম! আবার প্রচণ্ড ধাক্কা দিলাম, 'বিলু বাবু! বিলু বাবু!' এবার তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল, উঠে বসে টর্চ্চটা জ্বালিয়ে বললেন, 'য়্যাঁ, কি বলছেন?'

তাঁর লাল চোখে তখনও নেশার ঘোর কাটে নি, তাই আর একটা ঝাঁকানি দিয়ে সজাগ করলাম। বললাম, 'একটা আওয়াজ আসছে সেই তখন থেকে, ঠিক ভূতুড়ে আওয়াজের মত ভয়ানক, কিছুতেই থামছে না।'

বিলু বাবু ধীরে ধীরে চোখ না মেলেই বললেন, 'প্যাঁচার ডাক শুনেছেন নাকি?'

কাঁপা গলায় বললাম, 'না না, আওয়াজটা হচ্ছে কেবল কট্ ক—ট্ কট্ করে। কিছুতেই থামছে না। সেই মাঝরাত থেকে শুনে চলেছি।'

এবার হঠাৎ লাল চোখ দু'টো মেললেন বিলু বাবু, তারপর আমার দিকে চেয়ে ডুকরে হেসে উঠলেন একবার, তারপরই ফেটে পড়লেন একেবারে আকাশ-ফাটা হা-হা হাসিতে। তারপর অনেকক্ষণ বাদে কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে হাসি থামিয়ে বললেন, 'আচ্ছা ভীতু লোক ত' আপনি মশাই! একটু কট্ কট্ আওয়াজ শুনেই ভয় পেয়ে গেছেন! একটু ভাবলেনও না, দেখলেনও না, একবার হিসেব করলেনও না, জিজ্ঞেস করলেনও না! ঘুমের ঘোরে আমার যে ঠাণ্ডা লেগে ভয়ানক কান কট্ কট্ করে মশাই!'

মেঘ-পরী

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্. এ

মেঘ-পরী উড়ে যায়—যায়—যায়—যায়,
খুকুমণি ডাকে তারে আয়—আয়—আয়!
আয় মেঘ, সাথে নিয়ে ইলশে গুঁড়ি,
খেতে দেব জাম পাকা, কাঁঠাল, মুড়ি।
হাসানুহানায় দেব হাত ভরায়ে,
মাথে দেব কদমের সীঁথি পরায়ে।
টগরের গড়ে মালা দোলাব গলে,
নাচ তুমি তাতা-থৈ ঘোর বাদলে!

আত্মোন্নতি সমিতির গল্প

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
এম্. এ, বি. এস্-সি

ভুবনেশ্বর সেন

ভুবনেশ্বর সোনার বেনের ছেলে। তাহার মত উদার-স্বভাব লোক কম দেখিয়াছি। বহুবাজার মদন দত্ত লেনে তাহার বাড়ি ছিল। তখনকার মানে তাহাকে আমরা বড় লোকের ছেলে বলিয়াই জানিতাম। তাহার পিতা বনমালী সেন আবদুল নামে এক মুসলমান বালককে কিছু টাকা সাহায্য করিয়া মিউনিসিপাল্ মার্কেটে একটি ছোট ষ্টেশনারী দোকান করিয়া দেন। আবদুলের মা, শুনিয়াছি, খুব ধার্ম্মিকা ছিলেন। তিনি ছেলেকে বলিয়াছিলেন, 'বাবু তোমার দুরবস্থার সময়ে উপকার করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে কখনও বেইমানী করিও না। ঈশ্বর তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন।' সেন আবদুল কোম্পানী ক্রমে হগ্-মার্কেটের এক বিখ্যাত দোকানে পরিণত হয় এবং খুব লাভের ব্যবসায়ে দাঁড়ায়।

ভুবনেশ্বরের মামা গোকুল মল্লিক ভাল ব্যায়ামী (য়্যাথ্লেট্) ছিলেন। তাঁহার মত সুবিকসিত মাংসপেশীবান্ ব্যক্তি খুব কম দেখিয়াছি। এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা মনে পড়িতেছে। বাঁকুড়ার রামদাস মুখোপাধ্যায়। তাঁহার দেহের মাংসপেশী বোধ হয় আর একটু ভাল ছিল। ভুবনেশ্বর মামার ব্যায়ামাগারে সমান্তরাল দণ্ড (প্যারালাল বার) প্রভৃতি ব্যায়াম করিয়া ভীমবল হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের দলের মধ্যে সে-ই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। সে ও হরিশ আমাদের মারামারি ব্যাপারসমূহের নেতা ছিল। অথচ ভুবনেশ্বর ছিল অত্যন্ত শান্ত লোক। হরিশ তাহার বিপরীত,— হাঙ্গামাতেই তাহার আনন্দ হইত, তাহাতেই সে যেন নিজের উপযুক্ত কার্য্য-কেন্দ্র পাইত!

ভুবনেশ্বরের মত বলবান্ আর একটি ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়িত। সে সতীশ মজুমদার। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের যুদ্ধ উপলক্ষে তাহার নাম করিয়াছি। সে শীঘ্র স্কুল ছাড়িয়া অন্যত্র যায়। তাহার আর কোনও সংবাদ পাই নাই। ঐ যুদ্ধে উক্ত সারদা দাস সম্বন্ধেও পরে আর কোনও সংবাদ জানি না। আত্মোন্নতি সমিতির বক্সিং বিভাগের আর এক সভ্য—মুরারিমোহন বসুরও মাংসপেশী বেশ সুবিকশিত ছিল। মুরারির বাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলায়। সেও ভাল মুষ্টি-যুদ্ধবিদ্ হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম সে পরে পুলিশের সাব্-ইন্সপেক্টার হইয়াছিল। তাহার পরবর্ত্তী ইতিহাস আমার জানা নাই।

ভুবনেশ্বরের মামার ব্যায়ামশালা ছিল অক্রুর দত্তের গলির নিকটে একটা অতি অপ্রশস্ত ছোট গলিতে। আখড়ার জমিও বোধ হয় ১৫০।২০০ বর্গ ফুটের বেশী ছিল না। এই সামান্য স্থানে ব্যায়াম করিয়া গোকুল মল্লিক ও তাহার শিষ্যগণ বেশ বলবান্ হইয়াছিল। এ কথা লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে মনের উৎসাহ ও চেষ্টা থাকিলে মানুষ সহজেই শরীর গঠন করিয়া লইতে পারে। কাশীতে অত্যন্ত এঁদো গলিতে কুস্তি-করা সুপুষ্টদেহ হিন্দুস্থানীর ছেলে দেখিয়াছি। অহীন চট্টোপাধ্যায়ের (ইনিও আত্মোন্নতি সমিতির সভ্য, চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকের দোকানের প্রথম সংস্থাপক) বাড়িতে একদিন কয়েকটি সুপুষ্ট-দেহ বাঙ্গালীর ছেলে দেখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম। অহীন বলিল, 'ইহারা আমার দেশ বেলঘরের ছেলে। দেশে খুব ম্যালেরিয়া ছিল। ইহারা এক ব্যায়ামের আখড়া করিয়া ব্যায়াম চর্চ্চায় মনোযোগ দেয়। ফলে ইহাদের শরীর সুন্দর হইয়াছে, আর ম্যালেরিয়ায় ভোগে না। ইহারা সবাই সাধারণ গৃহস্থ ঘরের ছেলে। কোনও বিশেষ রূপ খাদ্যের ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য নাই। ছোলা, ডাল এই সব জিনিস হইতেই ইহারা নিজেদের মাংস-পেশী পুষ্টকারী খাদ্য (প্রোটীন) গ্রহণ করে।

হরিশের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ সঙ্কটে সতীশ, ভুবনেশ্বর ও আমি সাহায্য করিতাম। আত্মোন্নতি সমিতির তৎকালীন সভ্যগণের মধ্যে ভুবনেশ্বরের অবস্থাই ভাল ছিল। হরিশের অন্নসমস্যার মীমাংসার জন্য ভুবনেশ্বর কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিল। একবার হরিশের দেশ—যশোরে এক সম্পত্তি কেনে। ইহাতে উভয়ের কাহারোই বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল মনে হয় না। পরে ভুবনেশ্বর গঙ্গাতীরে পলতা রেল ষ্টেশনে হরিশকে এক চালের কারবার করিতে সাহায্য করে। হরিশের ব্যবসায়-বুদ্ধি ছিল না। বৈপ্লবিক কার্য্য ও ব্যবসায় দুই একসঙ্গে কৃতকার্য্য হয় না। ব্যবসায়ে

লোকসান যায়। শুনিয়াছি ইহাতে ভুবনেশ্বরের অনেক টাকা ক্ষতি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যাহা হয় তাহা হয় নাই। ভুবনেশ্বরকে কখনও হরিশের বিপক্ষে কিছু বলিতে শুনি নাই।

নরেন বসু আত্মোন্নতি সমিতির আর একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিল। আমি তাহার সম্বন্ধে বেশী জানি না। আত্মোন্নতি সমিতি কেন্দ্রবিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সে হরিশ ও ইন্দ্রনাথের সহিত বৈপ্লবিক কার্য্য করিয়াছিল। নরেন ভাল ব্যায়ামী ছিল,—লাঠি ও মুষ্টিযুদ্ধ উভয় ব্যাপারেই নৈপুণ্য লাভ করে। তাহারও আর্থিক কৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইলে ভুবনেশ্বর তাহাকে এক চায়ের ব্যবসা করিতে সাহায্য করে। এই কারবারও কিছুকাল পরে ফেল হয় এবং ভুবনেশ্বরের বেশ মোটা রকম ক্ষতি হয়। অন্য লোককে নরেনের বিপক্ষে দু'-এক কথা বলিতে শুনিয়াছি কিন্তু ভুবনেশ্বর তাহার বিপক্ষে কোন দিন কোন কথা বলে নাই।

ভুবনেশ্বর নিজে নানা ব্যবসা করিয়াছিল; লাভও করিয়াছিল। পরে সে প্রসিদ্ধ ঈশান ঘোষের সহিত মিলিয়া শেয়ার কেনা-বেচার কারবার করিত। এই কারবারে দু'জনাই একবার ক্ষতিগ্রস্ত হন। ঈশান ঘোষ পরে সামলাইয়া বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ভুবনেশ্বর সামলাইতে পারে নাই। তাহার রক্তচাপ বৃদ্ধি ব্যাধি হয় এবং একবার অজ্ঞান হইয়া যায়। ইহার পর আর সে ভাল হইলেও পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় নাই। এই সময়ে সে পারিবারিক অশান্তির জন্য পৈতৃক বাড়ি ছাড়িয়া কসবায় এক বাড়ি ভাড়া করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে।

তাহার অর্থকৃচ্ছ্রতা আরম্ভ হয়। আমার কাছে মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা ধার করিত ও শোধ করিত। শেষ বারের টাকাটা শোধ করিতে পারে নাই। এত কাছে থাকিয়াও তাহার মৃত্যুর সময়ে কাছে যাই নাই বলিয়া বন্ধুগণ কেহ কেহ অনুযোগ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলাম, আমার তখন যাওয়াটা কতকটা তাগাদার মত দেখাইত। তাহার শেষ জীবনে একটা গ্লানি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করি নাই। আমার টাকা গিয়াছে কিন্তু সেজন্য মনে কোনও ক্ষোভ নাই। ভুবনেশ্বরের মত উদার পুরুষ কম দেখিয়াছি।

রাধারমণ দাস ও রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐ দুই জন আত্মোন্নতি সমিতির অপর স্থাপক সভ্য। রাধারমণের বাড়ি ছিল লেডি ডাফ্‌রিন হাসপাতালের সন্নিকটে এক গলিতে। রাধারমণের পূর্ব্ব-

পুরুষ উড়িয়া ছিলেন। তাঁহারা কলিকাতায় বাড়ি করিয়া বসবাস করিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। রাধারমণ বলিত তাহাদের বাড়িতে মেয়েরা তখনও উড়িয়া ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত। কিন্তু রাধারমণের কথা একেবারে কলিকাতাবাসীর মত ছিল। সে বাপের একমাত্র ছেলে, আদরে পালিত। বড় লোক না হইলেও বাড়ির অবস্থা ভালই ছিল। রাধারমণ দেখিতে ছিল প্রকাণ্ডকায়, তবে তাহাকে ঠিক ব্যায়ামবিদ্ বলা যায় না। তাহার প্রকাণ্ড দেহ আমাদের মারামারি ব্যাপারে বিশেষ উপকার করিত। যেখানে মারামারি করিবার প্রয়োজন নাই, শুধু শত্রুকে ভয় দেখান প্রয়োজন সেখানে রাধারমণ দলে থাকিলেই কাজ হইত। রাধারমণ অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও দেশপ্রাণ ব্যক্তি ছিল। অনেক দিন হইল সেও মারা গিয়াছে।

রঘুনাথের বাড়ি ছিল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সন্নিকটে ওয়েলিংটন লেনে। রঘুনাথদের অবস্থাও বেশ ভালই ছিল। বাপ নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী বড় চাকরী করিতেন। তিনি কলিকাতার সৎসঙ্গী সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। প্রসিদ্ধ বক্তা, লেখক ও কলেজ-অধ্যক্ষ নগেন ঘোষ ঐ সম্প্রদায়ে যোগ দেন। রঘুনাথদের বাড়িটিও বেশ বড় ছিল। সেইখানে রবিবারে রবিবারে সৎসঙ্গের আসর হইত। রঘুনাথের নিমন্ত্রণে আমরাও সেখানে যোগ দিতাম। সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ভজন হইত। হিন্দী গ্রন্থ আমরা ভাল বুঝিতাম না; কিন্তু বেশ ভাল লাগিত। অনেক ভিন্নদেশীয় লোক সে সঙ্গতে যোগ দিতেন। সকলেই বেশ ভক্তিমান্ ছিলেন। উপাসনার পরে ভোজ হইত। নিরামিষ, কিন্তু উপভোগ্য।

রঘুনাথ দেখিতে ছিল গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠদেহ, সুদর্শন। সে আত্মোন্নতির খুব উৎসাহী সভ্য ছিল। তাহার পড়িবার ঘরে আত্মোন্নতির অনেক মন্ত্রণা-সভা হইত। পরবর্ত্তীকালে রঘুনাথ ইন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়া বারীন ঘোষের দলে যোগ দেয় এবং বৈপ্লবিক কার্য্য করে। সে সকল কাজের বিবরণ আমার জানা নাই।

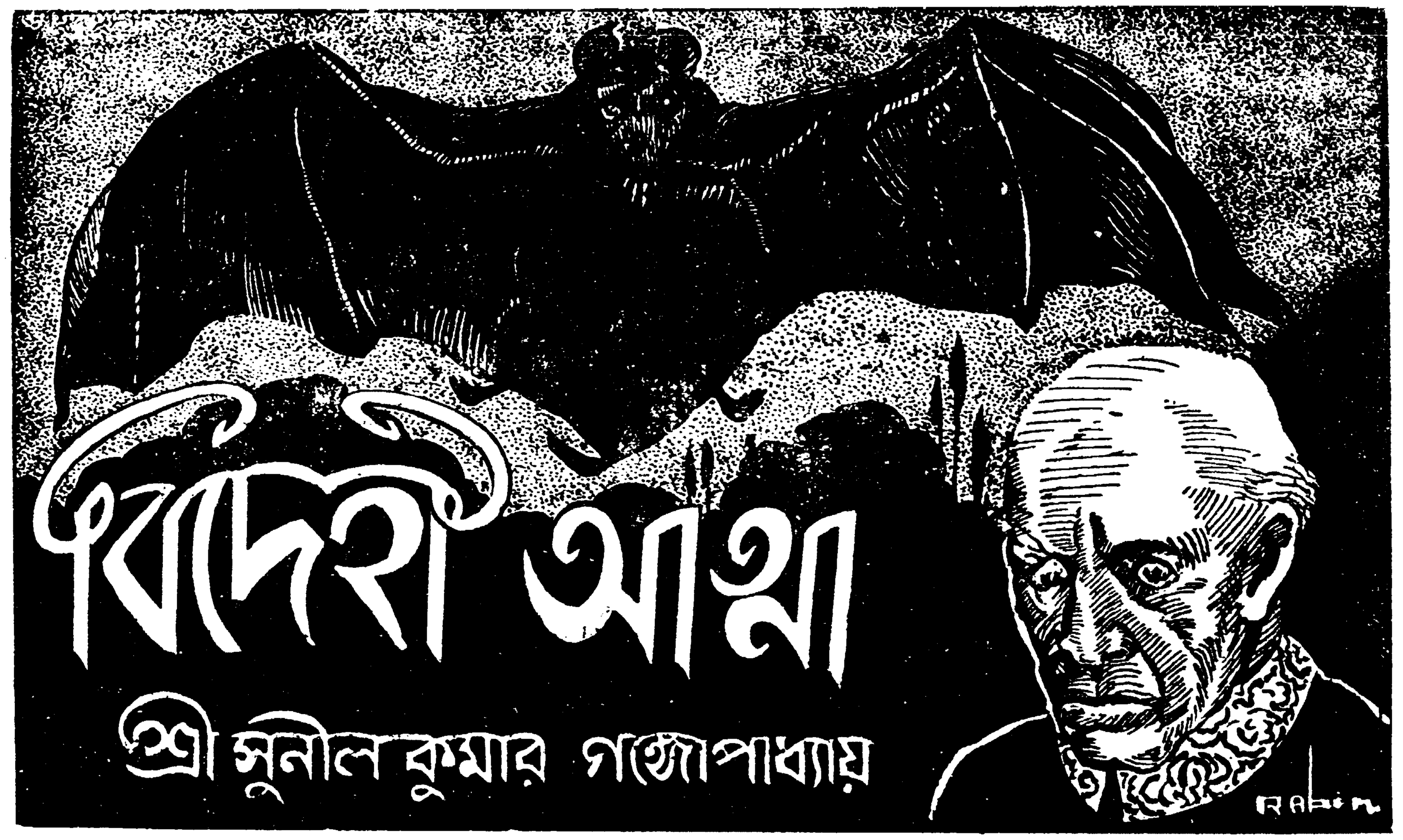

ডাক্তার অরূপ করের ডায়েরী

—কুড়ি—

ডক্টর চক্রবর্ত্তী অলককে বললেন—"এবার তুমি বল তো, আজ রাত্রের কথা তোমার কি মনে আছে?"

অলক বলতে লাগল—"বিছানায় শুয়ে আমার মোটে ঘুম আসছিল না। বাইরে কেমন কুয়াশা ঘনিয়ে আসছিল, আমার হঠাৎ ভয় করতে লাগল। বাবাকে জাগাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমের পর তিনি গভীরভাবে ঘুমোচ্ছিলেন। হঠাৎ ঘরে সমস্ত কুয়াশা ঢুকে পড়ল, আর সেই কুয়াশা ভেদ ক'রে আমার সামনে এসে দাঁড়াল এক অদ্ভুত মূর্ত্তি! তার মোমের মত সাদা মুখ, আগুনের ভাঁটার মত চোখ দেখেই বুঝতে পারলাম—আপনারা যাকে কৃতান্তবর্ম্মা বলেন, এ সে-ই নর-দানব। কোন ভনিতা না ক'রে সে বল্‌ল, 'একটা কথা বললেই তোমার বাবাকে মাটিতে আছড়ে মেরে ফেলব।' ভয়ে কোনও কথা বলতে পারলাম না। সে তখন আমাকে ধরে আমার গলায় মুখ লাগিয়ে রক্ত চুষতে লাগল। আমি যেন আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষে হারিয়ে ফেলছিলাম, আমার ঠিক জ্ঞান ছিল না। কতক্ষণ সে এই ভাবে রক্ত পান করেছে আমার মনে নেই, হঠাৎ সে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গহাসি হেসে বল্‌ল—"তুমিও বুঝি ওদের দলে? আজ ওরা আমার সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় নেমেছে, অথচ এদের জন্মেরও হাজার বছর আগে আমি এক সাম্রাজ্য

চালিয়েছি, এক জাতির হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা ছিলাম। লক্ষ লক্ষ সৈন্য আমার জন্য প্রাণ দিয়েছে। আজ ওরা দেখুক, ওদের সকলের আদরের তুমি—তুমিই আমার কথা মত উঠবে, বসবে। শুধু আর একদিন তোমার রক্ত পান করতে পারলে তুমি আমাকে তোমার প্রভু বলে স্বীকার করে নেবে।' আর আমার কিছু মনে নেই।"

আবার আমাদের আলোচনা-সভা বস্‌ল। প্রতিবারের মত ডক্টর চক্রবর্ত্তীই আলোচনা সুরু করলেন, বললেন—"সেদিন দুর্দ্দমগড়ে কৃতান্তবর্ম্মাকে খুঁজতে গিয়ে যে আমরা তার থাকবার জন্য মাটি-ভরা কাঠের বাক্সগুলো নষ্ট ক'রে দিয়ে আসি নি, তার ফল ভাল-ই হয়েছে। আমরা যদি সেদিন তা করতাম তবে কৃতান্তবর্ম্মা আমাদের মতলব আগে থেকে বুঝতে পারত এবং অন্যান্য জায়গায় রাখা তার বাক্সগুলোকে আমাদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা ভাল করেই করে রাখত। কিন্তু আজও সে আমাদের মতলব বুঝতে পারে নি। আমরা তাই আজ বালিগঞ্জের বাড়িতে গিয়ে তার অন্য বাক্স কয়টা নষ্ট করে দেব। তারপর বাকী থাকে আর বারোটা বাক্স খুঁজে বার করা। আজ সূর্য্যাস্তের মধ্যে সমস্ত কাজ করতে না পারলে কৃতান্তবর্ম্মা অনেক সময় পেয়ে যাবে। আমাদের এখন সমস্ত কাজ হবে কৃতান্তবর্ম্মার বালিগঞ্জের বাড়িতে। যদিও তার কলকাতায় আরো বাড়ি থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু বালিগঞ্জের এই বাড়িতেই তার বেশীর ভাগ জিনিষ থাকা সম্ভব। কারণ অত সৌখীন পল্লীতে কেউ কারও খোঁজ রাখে না বা রাখার চেষ্টা করে না—এমন কি নিজের পাশের বাড়িরও না। তাই ওই বাড়িতে কৃতান্তবর্ম্মা যা খুশি করতে পারে।"

অশোক বাবু চীৎকার করে উঠলেন—"তবে এক্ষুনি চলুন। নয়ত' বড় দেরী হয়ে যাবে।"

ডক্টর চক্রবর্ত্তী নড়লেন না, শুধু জিজ্ঞাসা করলেন—"কিন্তু বাড়িতে ঢোকার কি ব্যবস্থা হবে?"

"যে কোনও ভাবে। দরকার হ'লে দরজা ভেঙেও ঢুকতে হবে।"

"আর পুলিশ! তাদের কাছে কি জবাব দেবে?

তরুণ বলল—"বাড়িতে ঢোকা আর কঠিন কি? আমি ইচ্ছা করলেই সকলকে বাড়িতে যে কোনও সময়ে ঢুকিয়ে দিতে পারি।"

সকলের দৃষ্টি তার উপর পড়ল। সে বলল—"ধরুন না কেন, ও বাড়িটা আমার। আমার বাড়ির সদর দরজার তালার চাবি হারিয়ে গেছে। এখন, একজন ভাল তালা-চাবি-ওয়ালাকে ধরে এনে সকলের সামনেই একটা চাবি করিয়ে নিলে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। কারণ, বাড়ির মালিককে আজও ওপাড়ার কেউ দেখে নি। আমিই যে বাড়ির প্রকৃত মালিক নই তা তারা সন্দেহ করতেই পারবে না।"

সেই ব্যবস্থাই ঠিক হ'ল। ডক্টর চক্রবর্ত্তী যাবার আগে অলককে ডেকে বল্লেন, "সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমার কোনও ভয় নেই; আমরা সন্ধ্যার আগেই ফিরব যদি না,—কিন্তু 'যদি না' কেন? আমরা ফিরবই! আমাদের কেউ ধরে রাখতে পারবে না। শুধু তুমি

এই মাদুলিটা আর এই ফুলের মালা আজ সব সময় গলায় পরে থাকবে। তোমার কোনও ভয় নেই। বাড়িতে অন্যান্য চাকর-বাকর রইল।"

দুর্দ্দমগড়ে যেতে কোন অসুবিধা হ'ল না। সমস্ত জিনিষপত্তর ঠিক আগের মতই ছিল। আমরা সমস্ত কাঠের বাক্সের মধ্যে কতগুলো করে সেই উগ্রগন্ধা ফুল আর একটা ক'রে মাদুলি রেখে কাঁটা মেরে বাক্সগুলো আটকে দিলাম। উনত্রিশটা বাক্সকে কৃতান্তবর্ম্মার বাসের পক্ষে অযোগ্য করতে বেশী সময় লাগল না।

সেখান থেকে আমরা কয়েকজন 'বাস্' ধরে বালিগঞ্জে এলাম, এবং একটা চায়ের দোকানে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

তরুণ আর সনাতন আগেই একটা ট্যাক্সী ডেকে একজন চাবিওয়ালা সঙ্গে ক'রে চলে এসেছিল।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে দেখলাম, দূরে কৃতান্তবর্ম্মার বাড়ির দরজায় তরুণ আর সনাতন দাঁড়িয়ে, চাবিওয়ালা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ সুরু করে দিয়েছে। একটু পরেই তালা খুলে গেল। তরুণ খুশী মুখে মানিব্যাগ খুলে চাবিওয়ালার হাতে কি গুজে দিল, লোকটাও আনন্দে বিগলিত হয়ে চলে গেল। আরও লক্ষ্য করলাম, একজন লোকও কিন্তু এত সব ব্যাপার একটু উঁকি মেরেও দেখল না! আশ্চর্য্য পাড়া বলতে হবে!

লোকটা বেশ কিছু দূর চলে যাওয়ার পরও খানিকটা দেরী ক'রে আমরা রাস্তা পেরিয়ে এসে বাড়িটার দরজায় টোকা মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল।

সনাতন বাবু বললেন—"বাড়িতে এত বিশ্রী গন্ধ!—ঠিক যেন দুর্দ্দমগড়ের বাতাসের মত। মনে হয়, এখানে বেশ ক'দিন ধরে কৃতান্তবর্ম্মা আস্তানা বসিয়েছে। আমরা সব ঘরগুলো খুঁজে দেখলাম, কিন্তু মাত্র আটটা বাক্সের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। একটা বাক্সের কোন হদিস নেই। তবে টেবিলের একটা ড্রয়ারে একটা নোট-বইয়ে কৃতান্তবর্ম্মার আর একটা বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে। টালিগঞ্জের পোলের কাছেই সে বাড়ি। সেই ড্রয়ারে কতগুলো চাবিও ছিল। মনে হয়, এরই মধ্যে সেই বাড়ির সদর দরজার চাবিও আছে।"

তরুণ আর সনাতন বাবু সেই চাবিগুলো নিয়ে টালিগঞ্জের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। আর আমরা সেখানে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অপেক্ষা! হ্যাঁ, অপেক্ষা—তাদের দু'জনের প্রত্যাবর্ত্তনের—কিংবা কৃতান্তবর্ম্মার আগমনের!

কিন্তু কী দুঃসহ এই প্রতীক্ষা! সময় যেন একেবারে থেমে পড়েছে, একটু তার স্পন্দন নেই!

ডক্টর চক্রবর্ত্তী এক সময়ে বললেন—"এই দানবের সম্বন্ধে সমস্ত কাগজপত্র আমার হাতে আসার পর থেকে আমি তার সম্বন্ধে অনেক ভেবেছি; আর যতই ভেবেছি ততই মনে হয়েছে যে তাকে যত শীগ্‌গির সম্ভব চূর্ণ করা দরকার। দিনের পর দিন—বছরের পর বছর দেখছি শুধু তার এগিয়ে যাওয়া—শুধু শক্তিতে নয়, নিজের দানবিক শক্তির জ্ঞানে ও বিশ্বাসে। সে জীবিত অবস্থায় এক আশ্চর্য্য মানুষ ছিল। সেনানায়ক, সম্রাট্‌, রাজনীতিবিদ্ আর

বৈজ্ঞানিক!—তখনকার যুগের বিজ্ঞান যতদূর এগিয়েছিল কৃতান্তবর্ম্মা ততটুকু ভাল ক'রে জানত। তার বুদ্ধি ছিল অসীম, জ্ঞান ছিল অগাধ—জীবনে সে কোন দিন বিফলতা বা ভয় বলে কিছু জানে নি। কিন্তু তবু এক জায়গায় সে আজও সফল হয় নি। সে নিজে থেকে কোনও বাড়ীতে প্রথমে ঢুকতে পারে না, আর সে নিজে তার বিশ্রামের জায়গা বয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এই জন্য সে এখন তার সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু এ জ্ঞান আর সে কোন দিন আহরণ করতে পারবে না; আমরা তা হ'তে দেব না। আজ আমাদের দিন। যদি বেসামাল কোনও কাজ হঠাৎ না করে বসি—তবে কৃতান্তবর্ম্মার আজ শেষ! হ্যাঁ, আজ মানুষের সঙ্গে অমানুষের শক্তির আর বুদ্ধির পরীক্ষা,—মানুষ জিতবেই।"

হঠাৎ দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল। সকলেই চমকে উঠলাম, বুকের ধুকধুকানি এক মুহূর্ত্তে বেড়ে গেল। মাদুলি আর সেই ফুল শক্ত করে হাতে ধরে আমরা সদর দরজা খুলে ফেললাম।

(ক্রমশঃ)

পানিহাটী

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

"নিত্যানন্দ নৃত্যানন্দে বিলাল হেথায় নিত্যধন,
রঘুনাথ হেথা নিল ঝুলি-কাঁথা, তেয়াগি সকল বিত্তজন।"

স্নেহের ছায়া!

আমার গ্রাম পানিহাটীর কথা জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলে তুমি। আজ তাই সংক্ষেপে তার সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলব। প্রথমে শোন তার ঐতিহাসিক গৌরবের কথা; বাকিটুকু আর একদিন হবে।

পানিহাটী সুপ্রাচীন সপ্তগ্রামের অন্তর্গত, চব্বিশ পরগণার একটি বিশেষ সমৃদ্ধ গ্রাম; কলকাতা থেকে মাত্র ন' মাইল উত্তরে, সোদপুর রেল ষ্টেশন থেকে মাইল খানেক পশ্চিমে, গঙ্গার উপকূলে।

পানিহাটীর সঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। চৈতন্যদেবের পুণ্য জীবন-কথা হয়তো কিছু কিছু জান। বৃন্দাবন যাত্রার পথে ১৪৩৬ শকাব্দে (বাংলা ৯২১ সাল, ১৫১৪ খৃষ্টাব্দ) কার্ত্তিক কৃষ্ণা দ্বাদশীর দিনে তাঁর নৌকো এসে ভিড়ে এই পানিহাটীতে, এক প্রাচীন মহাবটের সংলগ্ন একটি ঘাটে। ওই ঘাটে পদার্পণ ক'রে মহাপ্রভু বটগাছটির নীচে বিশ্রাম করেন এবং সেখান থেকে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী যান।

বিশ্রামঘাটের বটগাছ—পানিহাটী

ওই বটগাছটী আনুমানিক সাতশ' বছরের প্রাচীন, এবং মহাপ্রভুর লীলার সাক্ষীরূপে সেটি আজও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। বটগাছটির মূলে একটি বিস্তৃত চাতাল এবং চাতালের উপর একটি বেদী আছে। ওই বেদীর উপর লেখা আছে অতীতের সেই পুণ্যময় কাহিনী, সুললিত ছন্দে—

"হে বন্ধু!

জান কি এ কোন্ পুণ্য স্থান?
অধন্য কলিরে যেঁহ ধন্য করিবারে
পরিপূর্ণ অবতারী স্বয়ং ভগবান্,
মূর্ত্ত ব্রহ্ম স্বয়ং সনাতন,
চির অনর্পিত প্রেম জীবে কৈলা বিতরণ,
এই সেই শ্রীচৈতন্য-বিশ্রামের স্থান।"

সেই অতীত গৌরবের স্মৃতিপূজা উপলক্ষে আজও প্রতি বছর কার্ত্তিক কৃষ্ণা দ্বাদশীর পরবর্ত্তী রবিবার এই পুণ্যস্থানে একটি 'মহোৎসব' হয়।

মহাপ্রভু পানিহাটী এলে পরে রাঘব পণ্ডিত (শ্রীরাঘবানন্দ বিদ্যাবাগীশ) বটগাছের তলায় উপস্থিত হ'ন এবং নিকটেই তাঁর বাড়ী "রাঘব-ভবনে" মহাপ্রভুকে নিয়ে যান। আগেই বলেছি, রাঘব পণ্ডিত ছিলেন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ—তাঁর "আদ্য অনুচর"। ইনি পানিহাটীর সন্তান এবং এঁরই আকর্ষণে পানিহাটীতে মহাপ্রভুর পদার্পণ,—পানিহাটীর ওই মহা-সৌভাগ্যের মূলে ইনিই। রাঘব পণ্ডিত সম্ভবতঃ ১৩০০, শকাব্দের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কালিকানন্দ তর্কচঞ্চু, মাতার নাম কৃপাময়ী দেবী। তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী দময়ন্তী দেবীও মহাপ্রভুর বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন।

রাঘব পণ্ডিতের বাড়ী বা "রাঘব-ভবন"—"শ্রীপাটভবন" বা "পাটবাড়ী" নামেও প্রচলিত। এটিও একটি মহা তীর্থস্থান। মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী—

"মাতার বন্ধনে আর শ্রীবাস-অঙ্গনে।
রাঘব-ভবনে আর নিতাই নর্ত্তনে॥
* * * * * *।
নিত্য মম আবির্ভাব শুন ভক্তগণে॥"

আবার মহাপ্রভু নিজমুখেই ব্যক্ত করেছেন—

"গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাম রাঘব-আলয়॥"

মাধবীকুঞ্জ—পানিহাটী

রাঘব-ভবন শ্রীপাট পানিহাটীর অন্তর্গত "ভবানীপুর" পল্লীতে। এখানে রাঘব পণ্ডিতের সেবিত ৺মদনমোহনের বিগ্রহ এবং ৺রাধারাণীর বিগ্রহ আজও পূজিত হয়। পাটবাড়ীকে তাই "মদনমোহনের বাড়ী"ও বলা হয়। ৺মদনমোহনের মূর্ত্তিটি কালো পাথরের তৈরী ও সুন্দর কারুকার্য্যসম্পন্ন।

রাঘব-ভবনের প্রবেশমুখে বাঁ দিকে "মাধবীকুঞ্জ" বা "মাধবীবিতান"। এটি রাঘব পণ্ডিতের সমাধিভূমি। মাধবী লতা নামে পরিচিত হ'লেও তার জায়গায় এখন দেখা যায় মালতী লতা। সমাধি-বেদীর মাঝখান থেকে এই লতাটি বেরিয়ে বিস্তৃত বংশমঞ্চে পরিব্যাপ্ত হয়ে সুশীতল ছায়ায় আচ্ছাদিত ক'রে রেখেছে নীচে সমাধিভূমিকে। মালতী ফুল মহাপ্রভুর বিশেষ প্রিয় ছিল। সেই বিখ্যাত লাইনটি নিশ্চয়ই শুনেছ,—"মালতী ফুলের মালাটি গৌর হিয়ার মাঝারে দোলে।"

মহাপ্রভু যখন পুরীতে ছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভুকে তিনি গৌড় দেশে পাঠান প্রেমধর্ম প্রচারের জন্যে। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁর ওই আদেশ পেয়ে প্রথমে পানিহাটীতে আসেন এবং একাদিক্রমে কয়েক মাস পানিহাটীতে রাঘব-ভবনে বাস করেন। ওই বটবৃক্ষ-মূলে তাঁর সংকীর্ত্তন-সভা বস্‌ত। পানিহাটীর, এবং কত দূর দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা মাতোয়ারা হয়েছিলেন সেই নামে—

"ত্রিবেণী পর্য্যন্ত আর পানিহাটী গ্রাম।
কীর্ত্তন দেখিতে লোক চলে অবিরাম॥"

হরিপ্রেমের বন্যায় দেশকে প্লাবিত করেছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু।

আমার চিঠির প্রথমেই উদ্ধৃতাংশে যে "রঘুনাথ"এর উল্লেখ আছে, এবার তাঁর কথা বলি। রঘুনাথ বা শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী ছিলেন সপ্তগ্রামের জমিদার গোবর্দ্ধনদাসের একমাত্র সন্তান। ১৪১৮ শকে (১৪৯৬ খৃঃ) তাঁর জন্ম হয়। সপ্তগ্রাম হুগলী জেলায় সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। সেই সময় (অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে) সরস্বতী নদী ছিল খুবই বড় এবং সপ্তগ্রাম ছিল বিরাট বাণিজ্য-কেন্দ্র। তখনকার পাঠান বাদশাহ জমিদারীর মত এই সপ্তগ্রাম গোবর্দ্ধনদাস ও তাঁর বড় ভাই হিরণ্যদাসকে ইজারা দেন। এই জমিদারীর আয় ছিল বিপুল, বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিয়েও প্রায় ১২ লক্ষ টাকা মুনাফা থাকতো। তখনকার দিনে ১২ লক্ষ টাকার দাম কত তা সঠিক অনুমান করাও কঠিন। হিরণ্যের কোন সন্তান না থাকায় রঘুনাথই ছিলেন এই বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই রঘুনাথ বিষয়ে উদাসী হ'ন এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অন্তরে উপলব্ধি করেন। তাঁর মনের এই গতি লক্ষ্য ক'রে পিতা গোবর্দ্ধনদাস এক পরমাসুন্দরী কন্যার সঙ্গে রঘুনাথের বিবাহ দেন। কিন্তু তাঁর বৈরাগ্যভাবের উপশম হয় না। শ্রীচৈতন্যদেব যখন শান্তিপুরে ছিলেন, রঘুনাথ সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁর সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁকে সংসারে ফিরে যেতে এবং বিষয়ে অনাসক্ত হয়ে সংসারের কর্ত্তব্য সমাধান করতে উপদেশ দেন। অগত্যা তিনি সপ্তগ্রামে ফিরে আসেন।

১৪৩৮ শকাব্দে (বাংলা ৯২৩ সাল, ১৫১৬ খৃষ্টাব্দ). নিত্যানন্দ প্রভু যখন পানিহাটীতে প্রেমধর্ম প্রচার করতে আসেন, রঘুনাথের তখন তাঁর কৃপাপ্রার্থী

হওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয় এবং পরবর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন তিনি গোপনে পানিহাটীতে আসেন।—

"পানিহাটী গ্রামে পাইলা প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে।
বসিয়াছে প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করে॥"

বলা বাহুল্য, ওই "বৃক্ষমূল" ই হচ্ছে সেই বটগাছটি—শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেখানে বিশ্রাম করেছিলেন। সেখানে উপস্থিত হ'য়েও রঘুনাথ প্রভুর কাছে না গিয়ে দূর থেকে লুকিয়ে তাঁকে দেখতে থাকেন। কিন্তু ভক্তের উপস্থিতি অগোচর থাকে না প্রভুর। নিত্যানন্দ বল্লেন—

"নিকটে না আস চোরা ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগ পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে॥
দধি চিঁড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হইল রঘুনাথ-মনে॥"

রঘুনাথ সে "দণ্ড" সানন্দে গ্রহণ করেন এবং সমবেত সমস্ত ভক্তদের 'চিঁড়া-দধি ভোজনে' ও দক্ষিণায় পরিতুষ্ট করেন। দণ্ডস্বরূপ সেদিন যে উৎসব হয় তা আজও হয়ে থাকে প্রতি বৎসর ওই তিথিতে। এই উৎসবকে "দণ্ড-মহোৎসব" বলা হয়। সেদিন সেই জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশীর পুণ্য তিথিতে দণ্ড-মহোৎসবের পর থেকেই রঘুনাথদাসের বৈরাগ্য পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়।

পানিহাটীতে ৺অমূল্যধন রায় ভট্ট বিদ্যাভূষণ সরস্বতীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে মহাপ্রভুর ব্যবহৃত অনেক জিনিস সংরক্ষিত আছে।

মহোৎসব উপলক্ষে একবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও সদলবলে পানিহাটীতে পদার্পণ করেছিলেন। সেও পানিহাটীর এক অমূল্য গৌরবের স্মৃতি।

প্রতি বছর ওই দু'টি মহোৎসব (কার্ত্তিক মাসে ও জ্যৈষ্ঠ মাসে) বিশেষ আড়ম্বরে পালিত হয়। নানা দেশ থেকে ভক্ত, বৈষ্ণব, পণ্ডিত ও সাহিত্যিকরা এখানে সমবেত হ'ন। আজ তোমায় লিখতে বসে মনে আসছে আমার গ্রামে কাটানো সেই বাল্যের ও কৈশোরের নানা রংএর দিনগুলির স্মৃতি। আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হ'ত যে সুমধুর সুর,—"গৌর এল পানিহাটীতে, চল যাই দেখিতে"—ভুলে-যাওয়া সেই সংকীর্ত্তনের মনে-থাকা একটি কলি, আজও বাজে

আমার কানে। সেদিন যে লোভী ছেলেটি ঘুরে বেড়াতে ‘মেলা’র দোকানে দোকানে তার কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে, আজ সে কোথায় হারিয়ে গেছে! তবু এই আমার জন্মভূমি—মহাপুরুষদের পায়ের ছোঁয়ায় যার ধূলো আজও পবিত্র হয়ে আছে—প্রবাসী মনের এ অনুভূতি বড আনন্দের—বড় গর্বের।

“গৌরপ্রেমের বাদর-প্লাবিত পূত পানিহাটী তুমি।
ভক্ত-পদরেণু মণ্ডিত তনু বার বার তোমা নমি॥” *

—তোমার কাকু।

* শ্রীছায়া দত্তকে (এলাহাবাদ) লিখিত। এই কাহিনী রচনায় ভক্তপ্রবর শ্রদ্ধেয় ডাক্তার সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় (আগড়পাড়া), পানিহাটী কংগ্রেস কমিটির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মিত্র, এম্. এ, বি. এল্ এবং শ্রীগৌরহরি রায় (পানিহাটী) আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন। ফটোগুলি শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (কলিকাতা) সৌজন্যে প্রাপ্ত।

তেতলা বাড়ীর ছেলে

শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী

প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ী। লাল,—রক্তের মত টকটকে তাজা লাল রঙ্ করা। লোহার ফটক পেরোলেই কুচো পাথর বিছানো একফালি পথ। পাথরকুচিগুলো কি চমৎকার শাদা দেখ্‌তে!—পায়ে মাড়াতে ইচ্ছে করে না। পথের দু’পাশে খানিকটা ফুলবাগান, কত ফুল—দেশী, বিদেশী! এক কথায়, যাকে বলে বাড়ীর মত বাড়ী। আমাদের গল্প এই বাড়ীর সন্তোষকে নিয়ে। সন্তোষ এ বাড়ীর মালিক রায় নির্মলচন্দ্র রায় বাহাদুরের একমাত্র সন্তান; সাত রাজার ধন এক মাণিক। বয়স তের-চৌদ্দ হ’বে। ইস্কুলে যায় না, বাড়ীতে মাষ্টার মশায় আসেন তিন জন;—সকালে, দুপুরে, আর সন্ধ্যায় পালা করে তাঁরা আসেন।

নির্মল বাবু ছেলের ইস্কুলে যাওয়া পছন্দ করেন না। হাজার ছেলের ভীড়ে মিশে ছেলের গোল্লায়-গমনের সমর্থক তিনি মোটেই ন’ন।

সন্তোষ কিন্তু ছেলে ভালো। বিকেলের মাষ্টার মশায় পড়িয়ে গেলে তবে সে বেড়াতে বেরোয়। মোটরে অবশ্যি। চলতি মোটরে বসে আধ ঘণ্টার জন্যে পথে চলমান এলোমেলো জনস্রোতের সংগে তার প্রতিদিন পরিচয় হয়—গড়ের মাঠে যাবার পথে। এইতেই সন্তুষ্ট সন্তোষ। এর বেশী কিছু পায়ও না, চায়ও না সে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দুধ আর মিষ্টি খেতে খেতে মাষ্টার মশায় আসেন, সুরু হয় পড়া। ন’টায় তিনি চলে যাবার পর স্নান করে দশটার মধ্যে খাওয়া। তারপর, দু’টো অবধি,—মানে, দুপুরের মাষ্টার মশায়ের না-আসা পর্যন্ত, শিশুসাহিত্যের স্তম্ভ—ঘ্যাড্‌ভেঞ্চার সিরিজের বই পড়া। প্রত্যেক সপ্তাহে ওর জন্যে বই আসে।

কিন্তু...একটা কেমন গণ্ডগোল বেধে গেল। কেমন করে? এবারে যে বইগুলো এসেছে তার মধ্যে একখানা অতি অদ্ভুত মজার বই এসেছে। বইখানা পড়ে তো অবাক্ সন্তোষ। এমন হয় না কি? বস্তীর ছেলেরা কেমন করে জীবন কাটায়, ইত্যাদির ওপর বইখানি। যে পারিপার্শ্বিকের মাঝে সন্তোষ অধিষ্ঠিত সেখানকার সংগে বস্তীর কোনই মিল নেই। আকাশ-পাতালের ব্যবধান! বস্তীর ছেলেরা—পাঁচ বছরের ছেলেও নাকি বিড়ি টানে! গালাগাল দেয়, মারামারি করে, পড়াশোনার ঝামেলা ওরা কেউ পোহায় না! এ কি সম্ভব? সত্যিই বস্তীর ছেলেরা এমন? বইটা ওপর ওপর তিনবার সন্তোষ পড়ে ফেল্‌লে, আর, প্রত্যেকবারই, তার বিস্ময় ক্রমবর্ধমান হতে লাগ্‌লো: হয় এমন?

বিশ্বাস কিছুতেই করতে পারে না ও। বস্তীর ছেলেরা নাকি জুয়া খেলে! জুয়া খেলাটা কি, তা সন্তোষ জানে না; তবে, নিশ্চয়ই, খেলাটা ভাল খেলা নয়—লুডো খেলার মতো; এটা ও নিজেই অনুমান করে নেয়।

একটা অসম্ভব চিন্তা (সন্তোষের পক্ষে অসম্ভব বৈকি!) ওর মাথায় এসে ঢোকে। একবার গিয়ে দেখলে হয় বস্তীর ছেলেদের।

তখনি ছুটলো সন্তোষ বাবার কাছে, তাঁর বিনানুমতিতে সে তো বস্তীতে যেতে পারে না!

‘বাবা!’— সন্তোষ কাঁচুমাচু মুখে বলে।

‘বল্। ভয় কেন অত?’

‘বল্‌ছিলাম কি— আমি বস্তীতে বেড়াতে যাবো—বাবা?’

‘কোথায়!’ নির্ম্মল বাবুর ভুরু কুঁচ্‌কে ওঠে: ‘কোথায় যাবে?’

সন্তোষ একটু ভয় পায় বাবার ভুরু কোঁচকানোয়: ‘এই—এই, বস্তী দেখতে যাবো—বল্‌ছিলাম।’

‘বস্তী কি সিনেমা, না ভিক্‌টোরিয়া মেমরিয়াল্? দেখতে যাবার কি আছে সেখানে? এ দুর্বুদ্ধি হঠাৎ হ’ল যে?’ নির্মল বাবুর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে আসে।

সন্তোষ চুপ্।

‘বল, চুপ করে রইলে কেন?’ নির্মল বাবুর কণ্ঠস্বর হঠাৎ বজ্রগর্জনের মত ভীষণ শোনায়: ‘বস্তী দেখ্‌তে কে বলেছে তোমায়?’

‘ব—বলে—এ—এ নি কেউ। প—প—পড়েছিলা—লাম ব—ব—বই—ই—য়ে।’ ভয়ে সে তোত্‌লাতে আরম্ভ করেছে।

‘বইয়ে পড়েছিলে?’

‘হ্যাঁ—হ্যাঁ—’

'কোথায় পেলে সে বই ? কি বই ?'

'এ—এ—এ—সে—ছে এ স্—সপ্তাহে। আ—আলো কা—কা—কালো নাম ব—ব—বইটার। তা—তেই ব—ব—স্—তীর—'

'থামো। বলতে হ'বে না আর।'

সন্তোষ অপরাধীর মতো কালো মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

'এ সব বই পাঠাতে বারণ করেছি পাব্লিশারকে, তবু এসেছে ? বন্ধ করে দেব বই নেওয়া, অন্য দোকানে ব্যবস্থা করব।' নির্মল বাবু আপন মনেই যেন বলেন। 'এ সব ছেলেদের মাথা-খাওয়া বই। এ সব বই ছাপায় কেন ? বস্তী নিয়ে লেখে কারা গল্প ?' সন্তোষের দিকে চেয়ে বলেন, 'সে বইটা আমায় এখুনি দিয়ে যাও। যাও, নিয়ে এসো গিয়ে।'

সন্তোষ বইটা নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে দিলো। তিনি একটি বার শুধু দেখলেন প্রথম পাতাটা খুলে, তারপর টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বললেন, 'এ রকম বাজে বই আর কখনও পড়বে না। বুঝেছ ?'

সন্তোষ মাথা হেলিয়ে জানালো—সে বুঝেছে।

রোজকার মতো বিকেলে বেড়াতে বেরুলো সন্তোষ। মোটর ছুটে চললো হু-হু হাওয়ার গতিতে। আজ আর ওর রাস্তার দিকে চেয়ে জনস্রোত দেখার আগ্রহ একটুও ছিল না। চোখ বুজে বসেছিল। এই বেড়ানোর সময়ে প্রতিদিন যে আনন্দ তার এক কণাও আজ ওর নেই। যেন কিছুই আর নেই ওর! কি যে হ'ল, কেন যে এমন হ'ল ভাবতে চেষ্টা সে একবারও করে নি। করলেও শূন্যের সীমানা পেতো না।

বেড়িয়ে ফিরে এসে যখন নিজের ঘরে কাপড়-জামা বদলাচ্ছিলো, ভৃত্য এসে জানালো, 'মা ডাকছেন, দাদাবাবু!' মার কাছে যেতে তিনি বল্‌লেন, 'উনি এ সব কি বলছিলেন, হ্যাঁ রে ?'

সন্তোষের বুঝতে দেরী হ'ল না—মাকে বাবা কি সব বলেছেন। তবু না জানার ভান করলে: 'কি বলেছেন বাবা ?'

'তুই নাকি বস্তীতে যেতে চেয়েছিলি বেড়াতে ?'

'হ্যাঁ, চেয়েছিলাম।'

'সব্বোনাশ!—' মা গালে হাত দিলেন: 'ওখানে কখনো কেউ বেড়াতে যায়? আমাদের মতো লোকেদের বেড়াবার জায়গা না কি ওটা? কেন, পার্ক নেই? সিনেমা নেই? দেখবার জিনিসের অভাব?'

'ওখানে যেতে নেই কেন, মা ?' সন্তোষ জিজ্ঞেস করলো।

মা বল্‌লেন, 'ওখানে থাকে—চোর, গুণ্ডা, বদমাইস সব লোক। দিন-রাত তারা মারামারি, গুণ্ডামী করে বেড়ায়। শুধু কি তাই? ও সব জায়গা এমন নোংরা—গেলেই বমি আস্‌বে, অসুখ করবে।'

'সত্যি!' যেন সন্তোষের বিশ্বাস হয় না,—'বস্তী' এমন জায়গা ?

'তাই নয় তো কি?' মা এমন ভাব-ভংগী গলার স্বরে আর সমস্ত শরীরে ফোটাতে

চাইলেন যাতে সন্তোষের বিশ্বাস হয়—কথাগুলোর একটি বর্ণও মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয় বস্তীর ওই ভীষণতা।

সন্তোষ চুপ করে রইলো। মা ভাবলেন, বুঝি ফল ধরেছে। আরো একটু টোপ তাই ফেল্‌লেন,—'তোমার সেজ-মামা মারা গেলেন কেমন করে, জানো তা ?'

'কেমন করে ?' সন্তোষ বলে, 'বস্তীর গুণ্ডা মেরেছিলো ?'

'না। বলি শোন। তোমার মামার কলে যারা কাজ করত—তারা একবার ডেকে-ছিলো তাঁকে, তাদের বস্তী দেখ্‌তে যাবার জন্যে। গেছ্‌লেন তোমার মামা। সেই রাত্রেই মারা গেলেন তিনি, বাড়ী ফিরেই হ'ল ভীষণ অসুখ। ডাক্তারেরা বাঁচাতে পারলে না।' বলে, একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেল্‌লেন মা।

'য়্যাঁ, তাই না কি!' সন্তোষ অবাক্: 'মামা বস্তীতে গেছ্‌লেন বলেই অসুখ হয়ে মারা গেলেন ?'

'হ্যাঁ।' মা বল্‌লেন।

সন্তোষ কিছু বল্‌লে না। এত ভীষণ বস্তী? একবার গিয়েই মামা মারা গেলেন! একটু পরে সে বল্‌লে, 'বস্তীর লোকেদের কিছু হয় না ?'

'তাদের হ'তে যাবে কেন? তাদের অভ্যেস যে!' বলে, মা আবার উদাহরণ দিয়ে কথাটা জলবৎ-তরল করবার জন্যে বল্‌লেন, 'আরসুলা আর প্রজাপতি, এরা কি সমান? প্রজাপতি ফুলে ফুলে বেড়ায়, আরসুলা থাকে ঘরের কোণের অন্ধকারে। সেই রকমই, বস্তীর লোকেদের সংগে আমাদের। বুঝ্‌তে পারলে ?'

সন্তোষ সমস্তই বুঝ্‌তে পেরেছে। বল্‌লে, 'হ্যাঁ।'

'এবার তুমি পড়তে বসো গে। মাষ্টার মশায় এসে বসে আছেন হয়তো! যাও।'

তবু সন্তোষ গেল না। মা বল্‌লেন, 'যা—দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?'

'একটা কথা বল্‌ব ?'

'কি কথা ?' মা'র ভয় হ'ল, এত বোঝানোর পরও আবার নতুন করে বায়না ধরবে নাকি বস্তী বেড়াবার? বললেন, 'চট্‌পট্‌ বলে ফেলো।'

'বাবার কাছ থেকে ওই বইটা আমায় তুমি ফিরিয়ে দাও।'

'কি বই ? ওই বস্তীর বইটা ?'

'হ্যাঁ।'

'ছিঃ, ও আবার একটা বই নাকি? যত সব নোংরা ব্যাপারের বর্ণনা। কালই তোমার জন্যে একেবারে তিন ডজন বই আনিয়ে দেব,—সব য়্যাড্‌ভেঞ্চারের।' বল্‌লেন মা। 'সরকার মশায়ের সংগে তুমিই গিয়ে কিনো'খন। এখন পড়তে যাও। আর অমন পাগলামি ক'র না।'

একসঙ্গে তিন ডজন বই! সব য়্যাড্‌ভেঞ্চারের! সন্তোষের মন খুসীতে ভরে উঠ্‌ল; কিন্তু ও বইটা ?—নাঃ, ওই নোংরামির চিন্তা না করাই ভাল। সন্তোষ মনকে ধমক দিলে।

কিন্তু তবু? …

কিশোরগঞ্জের পাগলা হাতী

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

নিরামিষ খেয়েও কি রকম শক্তিশালী হওয়া যায় তার প্রমাণ হচ্ছে হাতী—, ডাঙ্গার সব চেয়ে বড় জানোয়ার। তোমরা বুনো হাতীর নানা গল্প শুনেছ, বিশেষতঃ দল-ছাড়া হাতীর কথা। এ রকম বদ্‌রাগী জানোয়ার খুব কমই দেখা যায়। ঐ বিরাট্ দেহখানার সঙ্গে যদি মেজাজখানাও হয় সেই রকম ফর্‌মাস-দেওয়া, তা হ'লে ব্যাপার কি দাঁড়ায় তা আন্দাজ করা কঠিন নয়।

পোষা হাতীর মেজাজ কিন্তু অনেকটা মোলায়েম। ভাল বাসলে সে তার মর্য্যাদা দিতে জানে—অনুগত ভৃত্যের মত মানুষের কাজ ক'রে দেয়। অতি প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে হাতীকে বশ মানিয়ে নানা কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। কঠিন শ্রমসাধ্য কাজে, যুদ্ধ-বিগ্রহে, উৎসব-আয়োজনে, শোভাযাত্রায়।

কিন্তু পোষা হাতীও মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায়। এবং একবার ক্ষেপলে সেই ক্ষেপা হাতী যে কী রকম ভয়ঙ্কর হিংস্র ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে তার একটি গল্প আজ বল্‌ব। এ ঘটনাটি ঘটেছিল আমাদেরই বাংলা দেশে—ময়মনসিংহ জেলায়। অবশ্যি অনেক দিন আগে। সে সময়কার লেখা একখানা ইংরেজী বই থেকে কাহিনীটি তুলে দিচ্ছি।

ময়মনসিংহের এক অঞ্চলের নাম কিশোরগঞ্জ। সেখানে এক জমিদারের অনেকগুলি ভাল ভাল পোষা হাতী ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল নর-হাতী, জমিদারের ভারী আদরের। এখন, সে সময়ে বিয়ে-টিয়ে ব্যাপারে অনেকেই জমিদারদের কাছ থেকে হাতী চেয়ে নিয়ে যেত। বর শোভাযাত্রা ক'রে যাবে, হাতীতে চড়ে না গেলে মানায় কি? তা ছাড়া সে আমলে পথঘাটও তেমন ভাল ছিল না।

একবার জমিদারের এক বন্ধুর ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে এই রকম হাতী চেয়ে পাঠান হ'ল। জমিদার খুসী হয়েই কয়েকটা হাতী পাঠিয়ে দিলেন, তার মধ্যে ঐ নর-হাতীটাও ছিল।

বিয়ের ছু' দিন আগে সন্ধ্যাবেলা হাতী গিয়ে পৌঁছল, মাহুত আর পরিচারকের সঙ্গে। মাহুত রাত্রে হাতীকে খাইয়ে-দাইয়ে পায়ের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখল।

পর দিন। বিয়ে-বাড়ীতে উৎসবের ধুম পড়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, কত কি! মাহুত তা'তে এত মত্ত হয়ে গেছে যে হাতীর কথা আর তার মনেই নেই। সারাদিন গেল, হাতীকে না করানো হ'ল স্নান, না দেওয়া হ'ল কোন খাবার। শেষে দিন কেটে গিয়ে রাত হ'ল, হাতী সেই অবস্থায়ই পড়ে রইল।

পরদিন ছুপুর বেলা মাহুতের মনে পড়ল হাতীর কথা। ছু'দিন সে বেচারা কিছু খায় নি, স্নানও করে নি। সময়টা গ্রীষ্মকাল, আর গ্রীষ্মকালে হাতীকে রোজ ভালো ক'রে না নাওয়ালে হাতীর মাথা গরম হয়ে যাবার ভয় থাকে। মাহুত তখনই পরিচারককে পাঠিয়ে দিল হাতীটাকে খাইয়ে-দাইয়ে ঠাণ্ডা করার জন্য। বল্‌ল, "আমি যাচ্ছি একটু পরে, গিয়ে হাতীটাকে নাওয়াব।"

এদিকে যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল হ'লও তাই। ছু'দিন না খেয়ে, আর তার ওপর প্রচণ্ড গরমে না নেয়ে হাতীটা ততক্ষণে সত্যি সত্যি ক্ষেপে গেছে। পরিচারক গিয়ে দেখে, সে শুঁড় দিয়ে ধুলো-মাটী তুলে সারা গায়ে মেখে গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরিচারক কতকগুলো কলাগাছ-টাছ নিয়ে হাতীর সামনে এগিয়ে দিল, কিন্তু হাতী তেমনি চুপ চাপ দাঁড়িয়ে রইল। তখন লোকটি, একটু ইতস্ততঃ ক'রে, এগিয়ে এসে হাতীর পায়ের শিকলটা খুলে দিল। হাতী এরই জন্যে অপেক্ষা করছিল। চোখের নিমেষে সে পরিচারককে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরল; তার পর লোকে যেমন আছড়ে আছড়ে ধান ঝাড়ে তেমনি তাকে নিয়ে নিজের পায়ের ওপর আছড়াতে লাগল। মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিচারকের মাথার খুলি চৌচির হয়ে গেল। রক্তে মাংসে তালগোল পাকিয়ে তাকে আর চিনবার উপায় রইল না। এই সময়ে মাহুত এসে হাজির। কিন্তু হাতীর সেই মূর্ত্তি দেখে সে আর দাঁড়াল না, উর্দ্ধশ্বাসে পালাল।

পায়ে শিকল নেই, হাতী এবার একেবারে মুক্ত। আর যায় কোথা!

একবার শুঁড় উঁচু ক'রে তীব্র একটা গর্জ্জন ক'রেই সে ছুটে বেরুল। আকাশ-ফাটানো মেঘ-গর্জ্জনের মত সেই ঘন-বৃংহিত-ধ্বনিতে চার দিক্ কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সোরগোল উঠল,—পালা পালা—পাগলা হাতী—পাগলা হাতী!

আর পালা! হাতী তখন যাকে পাচ্ছে তাকেই পায়ে পিষে, শুঁড়ে জড়িয়ে, দাঁতে চিরে শেষ ক'রে দিচ্ছে। চোখ টক্‌টকে লাল, মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। সে এক পৈশাচিক দৃশ্য!

গাঁয়ের পাশেই ঘন জঙ্গল। খানিকক্ষণ ছুটোছুটি ক'রে হাতীটা শেষে সেই জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। আর বেরোয় না। লোকে ভাবল বুঝি আপদ্ চুকল। কিন্তু সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই দেখা গেল হাতী আবার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে লোক ঘায়েল করতে সুরু করেছে। এবারে তার ধরণটা আরও অদ্ভুত,—যেন মানুষ খুন করাই তার নেশা। গ্রামের বাড়ী—বেশীর ভাগই কাঁচা, কুঁড়ে ঘর। পাগলা হাতীর বিপুল শক্তির কাছে তা কিছুই না। দেখতে দেখতে গ্রামকে গ্রাম তছ্‌নছ্ ক'রে হাতী চল্‌ল আর এক গ্রামে।

আশপাশের দশ-বিশখানা গ্রামে আর লোকের চোখে ঘুম নেই। দিনের বেলা হাতীটা জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে, সেখানে তার খাবারের অভাব নেই—গাছ, পাতা, ডালপালা খেয়ে দিব্যি উদর পূর্ণ করে, তার পরে সন্ধ্যা হ'লেই তার দৌরাত্ম্য সুরু করে। গাঁয়ের পাশে গিয়ে ঘুপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকে; লোকের সাড়া পেলেই আক্রমণ করে; ঘর-দোর ভেঙ্গে,—জিনিষপত্র ছত্রছান ক'রে দেয়। আর জ্যান্ত মানুষ পেলে তো কথাই নেই! হাতীর ভয়ে লোকে সন্ধ্যা হ'লেই আলো নিভিয়ে ঘরে খিল দিয়ে বসে থাকে। সাহসী দু'-চার জন পালা ক'রে উঁচু গাছের ডালে বসে পাহারা দেয়—হাতী এলেই সাবধান ক'রে দেবে; কিন্তু তা সত্ত্বেও হাতীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল। এই ভাবে প্রায় দু'সপ্তাহ কেটে গেল।

একদিন। হাতী এর মধ্যে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, এক গয়লা এবং একটি রাখাল-ছেলেকে সাবাড় ক'রে, সেদিন আরও একজন লোকের পেছনে তাড়া করেছে। লোকটি প্রাণভয়ে মরি-বাঁচি হয়ে ছুটেছে, কিন্তু হাতীর সঙ্গে ছুটে পারবে কেন? সামনেই ছিল একটা ছোট নদী, আর তার পাড়ে একটা বড় তেঁতুল গাছ। উপায়ান্তর না দেখে সে শেষটায় তারই মাথায় উঠে পড়ল। এদিকে হাতের শিকার পালাচ্ছে দেখে হাতীরও মহারাগ। সহজে সে শিকার ছাড়বে না। সে

প্রাণপণে ঢুঁ মেরে মেরে গাছটাকে মাটীতে উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু শক্ত গাছ, সহজে বশ মানতে চাইল না। হাতীর তখন মাথায় এক বুদ্ধি এল। সে শুঁড়ে ক'রে নদী থেকে জল এনে গাছের গোড়ায় ঢালতে লাগল। খানিকক্ষণ জল ঢালতেই গাছের গোড়ার মাটীটা ভিজে একটু আল্‌গা হয়ে এল, গাছটাও কাৎ হয়ে পড়ল। ওপরের লোকটির অবস্থা ভেবে দেখ! কিন্তু তারও মাথায় এল এক বুদ্ধি। সে চট্‌পট্ একটা ডাল ভেঙ্গে নিয়ে পরনের কাপড়-খানা তার মধ্যে এমন ভাবে জড়িয়ে নিল যে হঠাৎ দেখলে ডালটাকেই মানুষ ব'লে ভুল হয়। তার পর যেই গাছটা মাটীতে উপড়ে পড়বে অমনি সে সেই কাপড় জড়ান ডালটা হাতীর সামনে ফেলে দিয়ে নিজে ঝাঁপিয়ে পড়ল নদীর জলে। হাজার হোক পশু, কাপড়ে জড়ান ডালটাকেই শিকার মনে ক'রে হাতী সেটা আছড়ে আছড়ে ভাঙ্গতে লাগল।

কিন্তু এ ভাবে আর তো চুপ করে থাকা যায় না! সদরে খবর গেল। সরকার থেকে হাতীর মালিকের ওপর চাপ দেওয়া হ'ল, হয় হাতীকে থামাও, নয় তো গুলি ক'রে মেরে ফেল। শেষে জমিদার আর ৫।৭টা পোষা হাতীর সাহায্যে অনেক কষ্টে পাগলা হাতীটাকে বন্দী করার ব্যবস্থা করলেন।

এইবার সুরু হ'ল ক্ষেপা হাতীর চিকিৎসা। বালতি বালতি জল এনে সারা দিন তার মাথায় ঢালা হ'ল, মণ মণ দই এনে তাকে খাওয়ান হ'ল, মাথায়ও কিছু ঢালা হ'ল। এই ভাবে ৭।৮ দিন চালাবার পর হাতী অনেকটা শান্ত হ'ল; লাল চোখ আবার স্বাভাবিক হয়ে এল, স্বাভাবিক খাদ্য—গাছপালা খেতেও সে কোন আপত্তি করল না। জমিদার নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন, আদরের হাতী তাঁ হ'য়ে এ যাত্রা সেরে উঠল।

ঠিক হ'ল হাতীটার বাঁধন এবার খুলে দেওয়া হবে। কিন্তু একজন অভিজ্ঞ লোক বললেন, একবার পরীক্ষা না ক'রে হাতীকে আবার ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। তাঁরই পরামর্শে খড়ের আঁটিতে কাপড়-চোপড় পরিয়ে ঠিক মানুষের আকারে একটি পুতুল তৈরী ক'রে হাতীর সামনে ফেলে দেওয়া হ'ল,—দেখা যাক হাতী কি করে। ও মা, পুতুলটা দেখা মাত্র হাতীর মুখে দেখা দিল পূর্ব্বেকার সেই হিংস্র ভাব! ওটাকে মানুষ মনে ক'রে সে চোখের পলকে তাকে আক্রমণ ক'রে বসল। শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে বারে বারে আছাড় দিয়েও তার যেন তৃপ্তি হয় না। শেষে সে দাঁত দিয়ে খড়ের পুতুলটাকে চিরে টুকরো টুকরো ক'রে ফেল্‌ল।

এর পর আর কি করা যায়? ঠিক হ'ল হাতীটাকে গুলি ক'রেই মারা হবে। এল বন্দুক। অল্প দূরে দাঁড়িয়ে হাতীর দিকে লক্ষ্য ক'রে ছোঁড়া হ'ল গুলি— একটা নয়, পর পর তেরোটা। প্রথমটা হাতীর চোখেমুখে ফুটে উঠল একটা অসহায় দৃষ্টি। তার পর সে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল, আর তার চোখ বেয়ে ঝর ঝর ক'রে জল পড়তে লাগল। তার পর প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পাহাড় ধ্বসে পড়ার মতই সে মাটীতে গড়িয়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

চিঠি

রামধনু আপিসের ডাকবাক্সে প্রত্যহ অসংখ্য চিঠি এসে জড় হয়। কোনটা দরকারী চিঠি—নতুন গ্রাহক হবার, ঠিকানা পালটাবার কিংবা হয়তো ডাকের গোলমালে কাগজ না পাবার অভিযোগ জানিয়ে লেখা। কোনটার মধ্যে থাকে ধাঁধার উত্তর বা সম্পাদকের কাছে লেখা গ্রাহকের ব্যক্তিগত সংবাদ। আর তা ছাড়া বেশীর ভাগ চিঠির সঙ্গেই থাকে পাঠ্য-অপাঠ্য নানা রকম রচনা, বিশেষ ক'রে কবিতা—যা নাকি সংখ্যায় শত শত বললেও ভুল হবে না।

মাত্র কয়েক পয়সার টিকেট কিনে ডাকবাক্সে ফেলে দিলেই ভারতের যে কোন প্রান্ত থেকে সে চিঠি এসে যথাস্থানে হাজির হবে।

কিন্তু এমন দিন চিরকাল ছিল না। দেশ যুড়ে ডাকের এমন সুব্যবস্থা এ দেশে কেন, কোন দেশেই ছিল না। সাধারণ লোকের পক্ষে চিঠিপত্র পাওয়া বা লেখা জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব'লেই মনে করা হ'ত সে যুগে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও চিঠিপত্রের চলন ছিল সব দেশেই। রাজা-রাজড়ারা তো বটেই, বড়লোকেরাও হামেশাই চিঠিপত্র পাঠাতেন এদিক্ সেদিক্। তবে সে চিঠির সঙ্গে একজন ক'রে লোকও পাঠাতে হ'ত বাহক হিসাবে, এবং দূরত্ব অনুসারে সে চিঠি পৌঁছতে দিন—মাস—এমন কি বছরও কেটে যেত। (অবশ্যি এখনও যে অমনটা হয় না তা নয়। এই তো সে দিন একটা চিঠি পেলাম যা নাকি লেখা হয়েছিল প্রায় দু' মাস আগে, এবং আসা উচিত ছিল অন্ততঃ ১ মাস ২৯ দিন আগে। খুব কর্ম্মকুশল কর্ম্মচারীর হাতে পড়লে ও রকম হয়ে থাকে।)

পৃথিবীতে চিঠি লেখা সুরু হয় কবে থেকে সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারেন নি তবে খুব পুরোনো দিনের লেখা অনেক চিঠি তাঁরা যোগাড় করেছেন। সব চেয়ে পুরোনো চিঠি এ পর্য্যন্ত যা পাওয়া গেছে তা আছে ইংল্যাণ্ডে। সেখানকার "এন্টিক ডিলারস্ সোসাইটি" নামক সমিতির সংগ্রহশালায় সেটা রাখা হয়েছে। এই চিঠিখানি লেখা হয়েছিল আড়াই হাজার বছরেরও আগে। ব্যাবিলন সহরের এক ভদ্রলোক সেখানকারই আর এক ভদ্রলোকের কাছে এক টুকরো জমি কিনবার ইচ্ছা জানিয়ে এই চিঠিখানা লিখেছিলেন। সেকালকার ব্যাবিলনে চলতি ভাষায় চিঠিখানি লেখা—পণ্ডিতেরা অনেক পরিশ্রমের পর, অনেক মাথা ঘামিয়ে তার পাঠোদ্ধার করেছেন। চিঠিখানা কিন্তু কাগজের ওপর কালির আঁচড়ে লেখা ব'লে মনে ক'র না। প্রকাণ্ড একখানা পাথরের ওপর ধারাল অস্ত্র দিয়ে খুদে খুদে চিঠিখানা লেখা হয়েছিল, আর তা ভরে রাখা হয়েছিল যে খামের মধ্যে সে খামটি ছিল মাটী দিয়ে তৈরী। খামের আকারটিও ছিল চিঠিরই অনুরূপ। খাম না বলে তাকে থাম বললেই মানায়। ঠিক থামেরই মত দেখতে, তেমনি মোটা, তবে লম্বা নয়—বেঁটে, এই যা তফাৎ!

পৃথিবীর সব চেয়ে পুরোনো চিঠির কথা তো শুনলে, সব চেয়ে ছোট চিঠি কোন্‌টি জান কি? এ চিঠিখানি লিখেছিলেন এক ফরাসী গ্রন্থকার তাঁর প্রকাশককে,—প্রকাশকের কাছ থেকে অনেকদিন কোন খবর না পাওয়ায়। চিঠিখানা হচ্ছে—'?' আর প্রকাশক তার জবাবে কি লিখেছিল জান?—'!'

সমুদ্রের সম্পদ্

দুনিয়ার কোন জিনিষই ফেলবার নয়। আজ যা নিতান্ত অকেজো ব'লে মনে হচ্ছে হয়তো দু'দিন বাদেই তা থেকে এমন জিনিষ আবিষ্কার হবে যার জন্য লোকে সেই জিনিষটিরই সন্ধানে চারদিক্ চষে বেড়াবে। তোমরা আলকাৎরার গল্প নিশ্চয়ই জান। এই অকেজো জিনিষটি বৈজ্ঞানিকদের হাতে পড়ে কেমন ক'রে প্রায় 'সোনা ফলাচ্ছে' সে খবরও হয়তো শুনেছ।

এই ধরণের আর একটি জিনিষ হচ্ছে—সমুদ্রের আগাছা। সমুদ্রে নানা রকম জলজ উদ্ভিদ্ জন্মায়, তার কোনটা থাকে গভীর সমুদ্রের নীচে, আবার কোনটা বা একেবারে জলের ওপরে ভেসে বেড়ায়। সমুদ্রের ধার দিয়ে একটু হাঁটলেই এই রকম স্রোতে-ভেসে-আসা অসংখ্য জলজ উদ্ভিদ্ চোখে পড়ে।

যে সব জায়গা সমুদ্রের গা ঘেঁষে রয়েছে সেখানে, এতদিন পর্য্যন্ত, এই উদ্ভিদ্ বা আগাছাগুলো ছিল একটা উপদ্রব বিশেষ। কোন কাজে লাগত না—শুধু স্তূপাকার ভাবে

ডাঙ্গায় জড় হয়ে লোকের অসুবিধা সৃষ্টি করা ছাড়া তাদের আর কোনও সার্থকতা আছে ব'লে মনে হ'ত না। তাই বিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকেই ভাবছিলেন এদের দিয়ে কোন লাভজনক জিনিষ তৈরী করা যায় কিনা। এ নিয়ে তাঁরা গবেষণাও চালাচ্ছিলেন বহু দিন থেকে।

শুনে সুখী হবে, এ বিষয়ে তাঁরা আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ করেছেন। সামুদ্রিক আগাছা থেকে তাঁরা য্যালজিন্ নামে এক রকম আঁশওয়ালা রাসায়নিক পদার্থ বার করেছেন—যা নাকি গুণে ঠিক সেলুলোজের মত। এই য্যাল্জিনের সঙ্গে অন্যান্য রাসায়নিক মশলা,—যেমন ধর কষ্টিক সোডা, ট্যানিন ইত্যাদি, মিশিয়ে তাঁরা ঠিক সেলোফেনের মত এক রকম সুদৃশ্য স্বচ্ছ কাগজ বার করেছেন—যা ঠিক সেলোফেনের মতই নানা কাজে—বিশেষ ক'রে বই, শিশি, কৌটো ইত্যাদির মোড়ক রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। য্যালজিনের সঙ্গে গন্ধক জাতীয় জিনিষ মিশিয়ে বানানো হচ্ছে নকল রবার। আবার ধাতব পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে বানানো হচ্ছে নকল রেশম। এ রেশম শুধু যে দেখতে সুন্দর আর চক্‌চকে তাই নয়,—এ রেশম আগুনেও পোড়ে না, জলেও ভেজে না। ফলে বর্ষাতি আর অগ্নিরোধক পোষাক বা পর্দা হিসাবে এর প্রচুর চাহিদা দেখা যাচ্ছে।

খোস গল্প
(সংগ্রহ)

মাষ্টার মশাই—বল দেখি চাঁদ আর সূর্য্যের মধ্যে কে বেশী উপকারী?

ছাত্র—চাঁদ।

মাষ্টার মশাই—কেন বল তো?

ছাত্র—কারণ চাঁদ আলো দেয় রাত্রির অন্ধকারে, যখন আলোর বিশেষ দরকার। আর সূর্য্য আলো দেয় দিনের বেলা—যখন আলো না হ'লেও কোন ক্ষতি নেই।

* * *

ডাক্তার—এখন বোধ হচ্ছে আপনার কাসিটা কালকের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে এসেছে।

রোগী—তা তো হবেই। কাল সারারাত ধরে অভ্যাস করেছি যে!

* * *

রমেশ—কাজকে অত ভয় পাও কেন? জান, সকাল বেলাতেই আমাকে কি ভীষণ কঠিন কাজ করতে হয়?

পরেশ—কি কাজ?

রমেশ—কেন, বিছানা ছেড়ে ওঠা!

* * *

ছেলে—বাবা, শুন্‌ছ ঘরের কোণে একটা ইঁদুর ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ করছে।

বাবা—ওর মুখে মরচে পড়েছে বোধ হয়। একটু তেল লাগিয়ে দে না, তা হ'লে আর ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করবে না।

* * *

"ভাই সন্তোষ, তুমি লিখেছ তোমার জামাইবাবু বামন, কিন্তু আমি তো দেখলাম তিনি কম ক'রে ৬ ফুট লম্বা।"—হরি চিঠিতে লিখল।

সন্তোষের জবাব এল—"ঠিকই লিখেছি। আমার জামাই বাবু সত্যিই বামন, তবে খুব লম্বা বামন।"

মুনির খেয়াল
(পুরাণের গল্প)

শ্রীগৌরী দেবী

জমদগ্নি মুনি ছিলেন খুব তেজাল মুনি, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর কেমন আজব সব খেয়াল চাপত। একবার তাঁর সখ হ'ল তীর-ধনুক ছোঁড়ার।

জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ গরম পড়েছে; মাঠে ছাতি-ফাটা রোদ। এরই মধ্যে জমদগ্নি মুনি তীর-ধনুক নিয়ে বাইরে বেরিয়েছেন, আর সঙ্গে ডেকে নিয়েছেন তাঁর স্ত্রী রেণুকাকে। রেণুকার ওপর হুকুম হয়েছে তীর ছোঁড়ার পর তা কুড়িয়ে আনতে হবে।

দেখতে দেখতে মুনি খেলায় একেবারে মেতে উঠলেন। ধনুকে তীর লাগিয়ে কান পর্য্যন্ত ধনুকের ছিলা টেনে ছেড়ে দেন, তীর অমনি হুস্ ক'রে গিয়ে ছিটকে পড়ে বহু দূরে, আহ্লাদে মুনির মুখ বেয়ে, দাড়ি বেয়ে হাসির ঢেউ খেলে যায়।

কিন্তু যত কষ্ট বেচারা রেণুকার। স্বামীর খেয়াল মেটাতে তাঁকে প্রত্যেক বার ছুটে যেতে হয় বহু দূরে, তীর কুড়িয়ে আনতে। তার ওপর মুনির উৎসাহ এত বেড়ে গেছে যে একটু দেরী সইতে তিনি নারাজ; অমনি চেঁচিয়ে-মেচিয়ে অস্থির—"কি করছ!—অত দেরী হচ্ছে কেন?—তোমাকে নিয়ে আর পারি না!—আবার?—আঃ!"

ক্রমে রোদ বেড়ে উঠল। মাথার ওপর প্রচণ্ড কড়া রোদ, পায়ের তলাকার মাটীও উঠেছে তেমনি তেতে, কিন্তু মুনির ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু বেচারী রেণুকা আর চলতে পারছেন না। মাথার চাঁদি ফেটে যাচ্ছে, গা বেয়ে ঝরছে দর দর ক'রে ঘাম। গরমে পায়ে ফোস্কা পড়ার গতিক! শেষে রেণুকা ক্লান্ত হয়ে বললেন, "ওগো, আর পারছি না। তোমার খেলা এবার বন্ধ কর। রোদের ঝাঁঝে যে আমার প্রাণ বেরিয়ে গেল!"

এতক্ষণে মুনির হুঁস হ'ল। তাই তো, রেণুকার ওপর বড় অবিচারই তো করেছেন তিনি! কিন্তু এর জন্য দায়ী হচ্ছে সূর্য্য ঠাকুর, সেই তো যত নষ্টের গোড়া। 'আচ্ছা, দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। তোমার ঐ চোখ আমি তীর মেরে কানা করে দেব।' মুনি ধনুতে তীর যোজনা করলেন।

এদিকে, ব্যাপার দেখে সুয্যি ঠাকুরের তো চক্ষুস্থির। কিন্তু সেকালের মুনি, তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। সুয্যি ঠাকুর তাড়াতাড়ি এক ব্রাহ্মণের রূপ ধরে নেমে এলেন মুনিকে বোঝাবার জন্য। বল্লেন, "সূর্য্যের দোষ কি? তার কাজ আলো দেওয়া, তাই সে দিচ্ছে। তারই জন্য তো সৃষ্টি টিঁকে আছে। আর তা ছাড়া সূর্য্যকে মারা কি সহজ হবে? সে তো আর আকাশে বসে নেই, সর্ব্বদাই ছুটে বেড়াচ্ছে!"

মুনি বল্লেন, "দেখ ঠাকুর, ও সব চালাকি ছাড়। আমার কাছে তুমি লুকোবে? তোমাকে কি আমি চিনতে পারি নি ভেবেছ? একটু সবুর কর। ঠিক দুপুর বেলা মাথার ওপর এসে এক মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে দাঁড়াতে হয় সে খবর কি আমি রাখি না ভাবছ? সেই সময়ে তোমার চোখ আমি কানা না ক'রে ছাড়ব না।"

ব্রাহ্মণবেশী সূর্য্য অনেকক্ষণ বোঝালেন, কিন্তু মুনি কিছুই শুনবেন না— বললেন, "দেখ তো, আমার স্ত্রীর কি হাল করেছ তুমি!"

তখন সূর্য্যের মাথায় এক বুদ্ধি এল। তিনি চাদরের ভেতর থেকে দু'টী অদ্ভুত জিনিষ বার ক'রে জমদগ্নির হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও, তোমার স্ত্রীকে এই দু'টি দিলেই সে ঠাণ্ডা হবে—আর তার কোন কষ্ট হবে না।"

মুনি সে দু'টি নেড়ে-চেড়ে অবাক্, বললেন, "এ কি অস্ত্র! এ তো আমি আগে কখনও দেখি নি! এ কি ক'রে ছুঁড়তে হয়?"

সূর্য্য ঠাকুর বল্লেন, "এ কোনও অস্ত্র নয়। এর নাম ছাতা, আর এর নাম জুতো। রোদের সময়ে এটি খুলে এই ভাবে মাথায় দেবে আর এই যোড়া নিয়ে এই ভাবে পায়ে দেবে—তা হ'লে আর কোনও কষ্ট হবে না।" ব'লে ব্রাহ্মণবেশী সূর্য্য অদৃশ্য হলেন।

তার পর মুনির কথামত রেণুকা সেই জুতো যোড়া পায়ে দিয়ে ছাতা খুলে মাথায় দিলেন। আর আশ্চর্য্য, কোথায় বা গেল মাথায় রোদের জ্বালা, আর কোথায় বা গেল পায়ে রোদের তাত! রেণুকা ভারী খুসী। আবার সুরু হ'ল জমদগ্নির তীরের খেলা। আবার রেণুকা তা কুড়িয়ে আনতে লাগলেন। কিন্তু দারুণ রোদের মধ্যেও এবার আর তাঁর কোন কষ্ট হ'ল না।

এই ভাবে সেই দিন থেকে পৃথিবীতে ছাতা আর জুতোর জন্ম হ'ল।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

বন্ধু চেনা বিষম দায়—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী। রীডার্স কর্ণার, কলিকাতা। দাম ১৷০

শিবরাম বাবুর নতুন গল্পের বই। শিবরাম বাবুর গল্প শিশুসাহিত্যে নতুন জিনিষ। গোমড়া-মুখো ছেলেমেয়ে তিনি পছন্দ করেন না, তাই কারণে-অকারণে তাদের হাসাবার আয়োজন করেন। তাঁর লেখার ভঙ্গী এমনই যে পড়লেই হাসি পায়। নিতান্ত তুচ্ছ একটা কথা নিয়ে, শুধু কথার কসরতেই তিনি সেটাকে হাস্যকর ক'রে তুলতে পারেন। এই গুণের জন্যই তিনি ছেলেমহলে বিশেষ প্রিয়। এই বইখানিতেও অনেকগুলি হাসির এবং মজার মজার গল্প আছে। শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তীর আঁকা ছবিগুলিও সে হাসির সঙ্গে তাল রেখে চলেছে।

স্বপন পরী—শ্রীশান্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থকুটীর, কলিকাতা। দাম ১৷০

ছোটদের জন্য লেখা কবিতার বই। পড়ে ছোটরা খুসী হবে। কতকগুলি কবিতা বেশ হাসির, কোন কোনটা আবৃত্তিরও উপযোগী। ভিতরের ছবিগুলিও সুন্দর। কিন্তু সব চেয়ে প্রশংসার যোগ্য হচ্ছে বইএর স্বপ্নময় মলাটটি।

মিথ্যে কিছুই নয়—শ্রীমলয়কুমার মজুমদার। গ্রন্থকুটীর, কলিকাতা। দাম ১৲।

ছোটদের জন্য লেখা কবিতার বই—সবই হাসির কবিতা। কোন কোনটি পড়তে বেশ মজা লাগে তবে সবগুলি সমান জমে নি। বইএর মলাটটির প্রতিও প্রকাশকের অবহেলা চোখে লাগে, এবং, সেই জন্যই, দামটা বেশী মনে হয়।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

আজ পুরোনো চিঠির ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল বহুদিন আগেকার খানকয়েক চিঠি; বেশীর ভাগই আমার ছেলেবেলার চিঠি,—পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের, আত্মীয়পরিজনদের লেখা। যাঁদের হাতের লেখা তাঁদের কত জনের সঙ্গে কত যুগ ধরে দেখা হয় না, কত জনের কথা একেবারে ভুলে গেছি, আবার কত জন আজ পৃথিবীর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন! খানিকক্ষণের জন্য যেন একটা নতুন জগতে চলে গেলাম। ফেলে-আসা সেই জগৎ,—অস্পষ্ট স্মৃতি ছাড়া যার আর এখন কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু কি মধুরই না লাগ্‌ল সেই স্মৃতি! তোমাদের মধ্যে যারা পুরোনো চিঠি নষ্ট কর না তারা, আজ নয়, ভবিষ্যতে—যখন বড় হবে তখন বুঝবে আজকের এই ছেলেমি-ভরা দিনগুলির স্মৃতিচিহ্ন-মাখা সেই চিঠিগুলির মধ্যে কি মধুর সম্পদ্‌ লুকিয়ে আছে! মনে পড়বে কবি রবীন্দ্রনাথের সেই লাইন ক'টি—

"দেখিলাম খান কয় পুরাতন চিঠি,
স্নেহমুগ্ধ হৃদয়ের চিহ্ন দু'চারিটি।"

তাই বলছি, যদি সম্ভব হয় পুরোনো চিঠি নষ্ট ক'র না—বিশেষ ক'রে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-পরিজনের লেখা চিঠিগুলি।

আমাদের সহযোগী অন্যান্য শিশুমাসিকের প্রায় সব ক'খানিতেই গ্রাহকদের ব্যক্তিগত চিঠি ধরে ধরে তার জবাব দেওয়ার রেওয়াজ আছে। গ্রাহকেরা কি লিখেছিলেন তার কোন উল্লেখ তা'তে থাকে না, থাকে শুধু সম্পাদক মশাইএর দেওয়া জবাবটুকু। জানি না এ রকম জবাব যাঁকে দেওয়া হচ্ছে তিনি ছাড়া আর সকলে কতখানি উপভোগ করেন, তবে যাঁকে দেওয়া হয় তাঁর নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগে। রামধনুতে এ যাবৎ ঠিক ও ভাবে কোন চিঠির জবাব দেওয়া হয় নি। আমরা শুধু উল্লেখযোগ্য চিঠিগুলিরই জবাব দিয়ে এসেছি, সেই সঙ্গে যে চিঠির জবাব সে চিঠিখানিরও সারাংশ প্রকাশ করেছি—যাতে সমস্ত পাঠকপাঠিকাই তার মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারেন। অনেকে বলেন, রামধনুর এটাই একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রত্যেক চিঠি ধরে ধরে ব্যক্তিগতভাবে তার জবাব

দেওয়ার অনুরোধও যে আমাদের কাছে কম আসে তা নয়। ইদানীং সে রকম অনুরোধ খুব বেশী আসছে। কাজেই এ ব্যাপারে আমরা তোমাদের মতামত ভাল ক'রে জানতে চাই। যদি অধিকাংশ গ্রাহক-গ্রাহিকাই ঐ রকম চান তবে, এই গণতন্ত্রের যুগে, তা মেনে নিতে হবে—অন্ততঃ পক্ষে পরীক্ষামূলক ভাবে। আশা করি তোমরা এ বিষয়ে তোমাদের মতামত জানাবে।

এ মাসে আর যে সব চিঠি পেয়েছি তার কয়েকখানি এখানে তুলে দিলাম:—"মাস কয়েক হ'ল রামধনুতে লেখক-পরিচয় দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। এটি রামধনু ছাড়া আর কোন কাগজে ছিল বলে আমার জানা নেই, তাই সে প্রথা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমরা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছি।"—শ্রীকনককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পানিহাটী)। (আবার দেওয়া যাবে।) "'মণ্টুর চৈতন্য' পড়ে খুব আনন্দিত হলাম।...ভবিষ্যতে এই ধরণের প্রবন্ধ দেখতে পেলে খুব খুশি হব।"—শ্রীশর্মিলা সরকার (কলিকাতা)। (দেওয়া হবে।) "গল্প এত কম থাকে কেন? বরং ধারাবাহিক এতগুলো উপন্যাস একসঙ্গে বের না করে পরিবর্ত্তে গল্পের সংখ্যা বাড়ানো উচিত।"—গুনু গুহ (বরিশাল)। (সকলেরই কি তাই মত?) "আমি খুব ভাল ভাল সৌন্দর্য্যের ফটো তুলেছি। রামধনুতে ছাপবেন কি না?"—বিমলভূষণ রায়। (রামধনু এখনও নিউজ-প্রিণ্টে ছাপতে হচ্ছে; এই কাগজে ফটো তেমন ভাল ওঠে না, অনেক সময়ে ফটোর ওপর অবিচার করা হয়। তাই "ছোটদের চিত্রশালা" বিভাগটির ওপর আপাততঃ তেমন ঝোঁক দেওয়া হচ্ছে না।) সুতো, কাপড় কলে তৈয়ার হচ্ছে। অমনি মাছ ধরার জাল বোনার কোন যন্ত্র আছে কি? জানালে আমাদের গাঁয়ের জেলেদের বলে দিতুম।—শ্রীবিষ্ণুপদ রায় (বালিঘাই)। (ঠিক জানা নেই, খোঁজ নিয়ে জানাব।) "পরে ক্ষিতীন দা (?), যদি আমার একটি অনুনয় আবেদন রাখেন তা হলে বোধ হয় জীবনে তাহা শোধ করিতে পারিব না। অজানা অতিথির প্রার্থনায় বোধ হয় পাষাণও কথা বলিবে, বলিবে ওগো অজানা, তুমি পূর্ণমনোরথ হও। তাই বোধ হয় আমি আমার কুড়ানো ক্ষিতীন্দ্রদা'কে (?) রাজী করতে পারব। ক্ষিতীন দা (?), আমার এই প্রার্থনা শুধু—যে দু'-একটি প্রবন্ধ ও কবিতা দিতে চাই আপনার রামধনুতে। তাহা যদি দয়া করিয়া গ্রহণ করেন তবে তাহাই হইবে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ। ইতি আপনার অজানা ভাই..."। (এর ওপর আর মন্তব্য নাই করলাম, সে ভার তোমরা নাও।) "আজকের ডাকে পুরস্কারের বইগুলো পেলাম। এতগুলি বই!—আমি ভাবতেও পারি নি। কি মজাই যে লাগছে! আবার কবে পুরস্কার-প্রতিযোগিতা দেবেন?" —শ্রীরমা মৈত্র (দিল্লী)। (২।১ মাসের মধ্যেই দেব।)

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। জয় হিন্দ।—ইতি রাঃ সঃ

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

(গ্রাহক-গ্রাহিকার লেখা)

ভারতের ডাক ও টেলিগ্রাফ

শ্রীঅমলকুমার মিত্র

শের শাহ ভারতে সর্ব্বপ্রথম ডাক বিভাগের প্রচলন করেন। এই ডাক ঘোড়ার পিঠে বহন করা হইত এবং কয়েক ক্রোশ অন্তর অন্তর এই ঘোড়া বদলী হইত। বাদশাহ আকবর রাজ্যের প্রধান রাস্তার উপর দশ মাইল অন্তর একটি করিয়া ডাক-কুটীর স্থাপন করেন, কিন্তু এই প্রথা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হইয়া যায়।

ইংরাজ রাজত্বে ক্লাইভের আমলে (১৭৬৬ খৃঃ) ভারতে সর্ব্বপ্রথম নিয়মিত ভাবে ডাক বিভাগের প্রচলন হয়। অবশ্য এই ডাক বিভাগ সাধারণতঃ রাজকীয় কর্ম্মের জন্যই ব্যবহৃত হইত। ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে ডাক বিভাগ জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য হয় এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা নিয়মিত ভাবে কাজ করিতে থাকে।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের একটি আইনের দ্বারা ভারতের ডাক বিভাগ আইনসঙ্গত ডাক বিভাগ বলিয়া গণ্য করা হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সমস্ত ডাক বিভাগ ডাইরেক্টর জেনারেলের অধীনে আসিল। তখন ডাক টিকিটেরও প্রচলন হয়; কিন্তু টিকিটের মূল্য নির্দ্ধারিত হইত দূরত্ব অনুসারে।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের রসায়ন বিদ্যার জনৈক অধ্যাপক ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ভারতে সর্ব্বপ্রথম টেলিগ্রাফের প্রচলন করেন। প্রথমে এই টেলিগ্রাফ লাইন কলিকাতা ও ডায়মণ্ড হারবারের মধ্যে ও অন্যান্য কয়েক স্থানের মধ্যে স্থাপিত হয়; ক্রমে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে দূরবর্ত্তী জায়গার মধ্যেও টেলিগ্রাফ লাইন বসে।

টেলিগ্রাফ বিভাগটি পূর্ব্বে একটি পৃথক্ প্রতিষ্ঠান ছিল, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে উহা ডাক বিভাগের সহিত একত্র হইয়া যায়।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে সর্ব্বপ্রথম ফটো-টেলিগ্রাফের কাজ আরম্ভ হয়। ইহার ফলে বেতারে ছবি পাঠানো সম্ভব হইয়াছে।

পাকিস্থান রাষ্ট্র পৃথক্ হইবার পূর্ব্বে সমস্ত ভারতে মোট ২৫৮৪১টি পোষ্ট্ অফিস ছিল। সব শুদ্ধ ১০৩৭৫২ মাইল টেলিগ্রাফের লাইন ছিল।

এবারে ডাক বিভাগের কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনার কথা বলি।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে চিঠির আদান প্রদানের ব্যবস্থা হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভি, পি, প্রথার এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মনি অর্ডারের প্রচলন হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক্ স্থাপিত হয়, এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম এয়ার মেলে চিঠি করাচীতে অবতরণ করে।

ঝড় ও বৃষ্টি

শ্রীহিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য

বুঝি ঝড় আসে,
হাওয়া লাগে বাঁশে
তূর্ণ।
নুয়ে পড়ে মাথা,
ঝরে বাঁশ পাতা
চূর্ণ।
ওড়ে ধূলি যত,
হয়ে যায় পথ
পূর্ণ।

বনপথে, ঘাসে
দ্রুত নেমে আসে
বৃষ্টি।
অঝোর ধারায়
বুঝি ভেসে যায়
সৃষ্টি।
আমি বাতায়নে
মেলি একমনে
দৃষ্টি।

সন্দেশ

নিউ ইয়র্ক সহরে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটা পুতুলের লাইব্রেরী আছে। বইএর লাইব্রেরী থেকে যেমন পড়বার জন্য বই বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া যায় তেমনি এখান থেকে পুতুল নিয়ে গিয়ে কয়েক দিন বাড়ীতে রেখে খেলে আবার ফেরৎ দেওয়া যায়। গরীব ছেলেমেয়েদের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

* * * *

ওস্তাদ্ লাফিয়ে বলে ক্যাঙ্গারুর খুব নাম আছে। কিন্তু সে লাফ যে কত বড় তা হয়তো জান না। তেমন তেমন বড় জাতের এক একটা ক্যাঙ্গারু এক এক লাফে ৪০ ফুট পর্য্যন্ত পার হয়ে যেতে পারে। এ বিষয়ে তারা ত্রেতা যুগের হনূমানের পরেই।

তৃতীয়

ওদিকে সরোবরের হাতীরা হস্তিনীর মাথায় টুনুকে দেখে বিপুল বিস্ময়ে একেবারে অবাক্ হয়ে গেল। সাঁতার-কাটা, খেলা, জল-ছোঁড়াছুঁড়ি ভুলে একদিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে হাতীর দল টুনুর দিকে তাকিয়ে রইল নিষ্পলক চোখে।

হস্তিনীর কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই, সোজা সরোবরের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে টুনুকে মাথার উপর থেকে নীচে নামাবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু টুনু তখন নীচে নামবে কি! একটার উপরে আবার এতগুলো হাতী দেখে সে আরো বেশী ভয় পেয়ে গেল। হাতীর কানদুটো আরো জোরে চেপে ধ'রে সে আরো চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

পাছে টুনুর ক'চি গায়ে লাগে, সেই ভয়ে হস্তিনী টুনুকে নিয়ে বেশী টানাটানি করতে সাহস করলে না। তার উপরে এটাও সে বুঝলে, হাতীর দল দেখে টুনু আরো বেশী ভয় পেয়েছে। কাজেই টুনুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সে স'রে পড়ল।

হস্তিনী অনেকক্ষণ জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত। এই বিপদজনক বনে মানুষের বাচ্ছাটিকে ছেড়ে দেওয়াও যায় না, আবার নিজের কাছে রাখাও চলে না। তার কাছে থাকলে এই মানুষের বাচ্ছাটি হয়তো অনাহারেই মারা পড়বে।

আমি হাতী নই, সুতরাং হস্তিনী ঠিক কোন্ কথা ভাবছিল তা আন্দাজ করতে পারছি না বটে, তবে সে অনেকটা ঐ রকম কিছুই যে ভাবছিল, সে বিষয়ে

আমার সন্দেহ নেই। তারপর ভাবতে ভাবতে বোধ হয় সে একটা উপায় আবিষ্কার ক'রে ফেললে এবং তখনি দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল অরণ্যের একদিকে।

টুনু এখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বটে, কিন্তু আর চীৎকার করছে না। এতক্ষণ পরে বোধ হয় তার কিছু সাহস হয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে, এই হাতীটা তার কোন অপকার করবে না।

বনের ভিতর দিয়ে' হাতী পার হ'য়ে গেল মাইলের পর মাইল। বনের পর বনের ভিতর দিয়ে, প্রান্তরের উপর দিয়ে এবং পাহাড়ের গা ঘেঁসে নদীর তীর দিয়ে সমান এগিয়ে চলল হস্তিনী।

টুনু ভাবতে লাগল, হাতীটা তাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? তার মায়ের কাছে নাকি? এই কথা মনে হতেই টুনু হ'ল অনেকটা আশ্বস্ত। সে কান্না থামিয়ে ফেললে। কচি কচি গলায় বললে, "লক্ষ্মী হাতী, সোনার হাতী, আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চল তো ভাই! তোমাকে আমি এক ঠোঙা লজেঞ্চুস খেতে দেব!"

হস্তিনী টুনুর কথার মানে বুঝতে না পারুক, কিন্তু সে যে কান্না থামিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, এইটুকু বুঝেই ভারি খুসি হ'য়ে উঠল। তাই চলতে চলতে মাঝে মাঝে টুনুর গায়ে আদর করে শুঁড় বুলিয়ে দিতে লাগল।

বৈকালের মুখে হস্তিনী যেখানে গিয়ে দাঁড়াল, সেটি হচ্ছে কাঠুরেদের একটি ছোট্ট গ্রামের মত। কাঠুরেরা তখনো বন থেকে ফেরে নি। কাঠুরে-বৌরা নিজের নিজের ঘরকন্নার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

একখানি ঘরের দাওয়ায় ব'সে খুন্তি নেড়ে রান্না করছিল একটি কাঠুরে-বৌ। নাম তার পার্ব্বতী।

বাইরের দিকে পিছন ক'রে খুন্তি নাড়তে নাড়তে পার্ব্বতী হঠাৎ সচমকে দেখলে, ঠিক তার পাশেই চাল থেকে যেন মাটির উপরে খ'সে পড়ল ছোট্ট একটি রাঙা টুকটুকে মেয়ে! তার পরেই ফিরে ব'সে দেখলে, দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একটা হাতী! দেখেই সে খুন্তি ফেলে দাঁড়িয়ে উঠে হাউ মাউ ক'রে ঘরের ভিতরে দিলে ছুট।

টুনু মাটির উপর ব'সে ব'সে দেখলে, হাতীটা আস্তে আস্তে আবার বনের দিকে ফিরে যাচ্ছে এবং যেতে যেতে মাঝে মাঝে আবার দাঁড়িয়ে প'ড়ে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখছে। তার পরে বনের ভিতরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জানোয়ারের পিঠ ছেড়ে মানুষের ঘরে এসে টুনু কতকটা আশ্বস্ত হ'ল বটে, কিন্তু এখনো মায়ের দেখা না পেয়ে তার ভারি মন কেমন করতে লাগল।

ইতিমধ্যে পার্ব্বতী জানলার উপর থেকে উঁকি মেরে দেখে নিয়েছে, সে মস্ত হাতীটা আর সেখানে নেই। তখন সে আস্তে আস্তে বাইরে এসে কৌতূহলী চোখে টুনুর দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। সে এত সুন্দর মেয়ে আর কখনো দেখে নি। যেমন তূলি দিয়ে আঁকা নাক, মুখ, চোখ, তেমনি দুধে-আলতা গায়ের রঙ্। আর গড়নটিও সুডৌল। দেখলেই আদর করতে আর ভালবাসতে সাধ হয়। হাতীর মাথায় চ'ড়ে এল যখন, তখন নিশ্চয়ই কোন রাজা-মহারাজার মেয়ে হবে।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কে, খুকুরাণী ?"

টুনু বললে, "আমি টুনু।"

—"তুমি কোথায় থাকো ?"

—"বাড়ীতে।"

—"তোমার বাবা বুঝি রাজা ?"

—"না, তিনি বাবা।"

—"তোমার মা আছেন ?"

—"হুঁ-উ-উ-উ।"

—"তোমার সঙ্গের লোকজনরা কোথায় ?"

টুনু এ প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারলে না। সে এগিয়ে গিয়ে নিজের ছোট ছোট হাত দু'খানি দিয়ে পার্ব্বতীর কাপড় ধ'রে টানতে টানতে বললে, "আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চল। নইলে আমি কেঁদে ফেলব।"

পার্ব্বতী বললে, "তোমার মা কোথায় থাকেন, খুকুমণি ?"

—"বাড়ীতে।"

—"তোমার বাড়ী কোথায় ?"

—"জানি না।"

—"তবে আমি কেমন ক'রে তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাব ?"

টুনু বললে, "প্রজাপতিটা ধরা দিলে না। ছাই প্রজাপতি, দুষ্টু প্রজাপতি! সে পালিয়ে গেল, আমি হারিয়ে গেলুম। ওই লক্ষ্মী হাতীটা আমাকে মাথায় ক'রে এখানে নিয়ে এসেছে। ভারি লক্ষ্মী, আমাকে একবারও বকে নি।"

এতক্ষণে পার্ব্বতী ব্যাপারটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারলে। এ কোন্ অভাগীর চোখের মণি, হারিয়ে গিয়েছে বনের কোথায়, একে কুড়িয়ে পেয়েছে বনের হাতী। এমন আশ্চর্য্য কথা পার্ব্বতী আর কখনো শোনে নি।

টুনু ছলছলে চোখে বললে, "আমার ক্ষিদে পেয়েছে। আমাকে খাবার দাও, নইলে আমি কাঁদব।"

সত্য, টুনু যে ক্ষুধার্ত্ত, সেটা তার শুক্‌নো মুখ দেখেই বেশ বোঝা যায়। কিন্তু এ কোন্ বড় ঘরের মেয়ে, বাড়ীতে কত ভালো ভালো খাবার খায়, গরীব কাঠুরে-বাড়ীর খাবারে তাঁর রুচি হবে কি ? এই ভাবতে ভাবতে পার্ব্বতী বললে, "টুনু, তুমি কি কি খাবার খাও ?"

উত্তরে টুনু এক নিশ্বাসে খুব লম্বা একটা খাবারের ফর্দ্দ দাখিল করলে।

পার্ব্বতী হেসে বললে, "আমাদের তো ও-সব খাবার নেই!"

টুনু ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, "তবে আমি কাঁদি ?"

পার্ব্বতী ব্যস্ত হয়ে বললে, "না খুকু, কেঁদ না। তুমি রুটি খাবে ? রুটি আর গুড় ?"

টুনু তক্ষনি উৎসাহিত হয়ে বললে, "পাটালি-গুড় তো ?"

দৈবক্রমে পার্ব্বতীর ঘরে সেদিন পাটালি-গুড় ছিল। সে তখনি একখানি সান্‌কিতে দু'খানি রুটি আর পাটালি-গুড় টুনুর সামনে ধরলে।

টুনু সেই কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছে, আর এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়। এতটুকু মেয়ে কি এতক্ষণ উপোস ক'রে থাকতে পারে ? দারুণ শোকে, ভয়ে আর দুর্ভাবনায় তার মন এতক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে ছিল ব'লেই ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা সে ভুলে গিয়েছিল। সানকির উপর থেকে দু'খানি মাত্র রুটি আর একখণ্ড পাটালি অদৃশ্য হতে দেরি লাগল না। তারপর টুনু বললে, "আরো রুটি খাব, আরো গুড় খাব।"

পার্ব্বতী তাকে আরো দু'খানি রুটি আর একখানি পাটালি এনে দিলে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে টুনু হাই তুলে বললে, "আমার ঘুম পেয়েছে, আমি ঘুমোব।"

পার্ব্বতী তাকে নিজের কোলের উপরে তুলে নিলে। দেখতে দেখতে ঘুমের ঘোরে টুনুর দুই চোখ গেল মিলিয়ে।

সন্ধ্যার সময় দুখীরাম ফিরে এল। সে হচ্ছে পার্ব্বতীর স্বামী।

বিছানার উপরে শুয়ে টুনু ঘুমোচ্ছিল। তার দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে দুখীরাম বললে, "এ আবার কে রে পার্ব্বতী ?"

পার্ব্বতী হাসতে হাসতে বললে, "আমাদের তো ছেলেপুলে নেই, ভগবান্ তাই দয়া ক'রে এই মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

ত্বখীরাম আরো আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "ভগবান্ মেয়ে পাঠিয়েছে কি রে? ও কার মেয়ে? কে ওকে এখানে নিয়ে এল?"

—"ও কার মেয়ে তা জানি না, তবে ওকে এখানে নিয়ে এসেছে একটা হাতী।"

ত্বই চক্ষু ছানাবড়ার মত ক'রে ত্বখীরাম বললে, "হাতী?"

—"হঁ্যা, একটা বনের হাতী।"

—"বনের হাতী নিয়ে এল মানুষের মেয়ে? তা কখনো হয়?"

—"তা হয় না ব'লেই তো বলছি, এ-সব ভগবানেরই লীলে।"

এইবারে একেবারে তাল ছেড়ে দিয়ে ত্বখীরাম ঘাড় নেড়ে বললে, "তোর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! তুই কি আমার সঙ্গে মস্করা করছিস?"

—"মস্করা নয় গো, মস্করা নয়। তবে শোনো।" পার্ব্বতী তখন একে একে সব কথা স্বামীর কাছে খুলে বললে।

সব শুনে ত্বখীরাম খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল চিন্তিত মুখে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "এ যে বড় ভাবনার কথা হ'ল রে!"

পার্ব্বতী বললে, "কেন?"

—"কেন তা বুঝতে পারছিস না? শেষটা কি মেয়ে চুরি করেছি ব'লে জেল খাটতে যাব? আমাদের কথা কে বিশ্বাস করবে? যদি বলি, মেয়ে পেয়েছি হাতীর কাছ থেকে, তাহলে জজ কি সে কথা মানবে? এ বড় বিপদের কথা রে পার্ব্বতী, ভারি বিপদের কথা।"

পার্ব্বতী বললে, "দেখ, তুমি এক কাজ কর। মেয়ে আপাততঃ আমাদের কাছেই থাক। তুমি বরং থানায় গিয়ে একটি খবর দিয়ে এস। তাহলেই তোমার উপর আর কোন ঝুক্কী পড়বে না। তারপর মেয়ের বাপ মেয়ে ফিরিয়ে নিতে আসে, ফিরিয়ে দেব। না আসে, মেয়ে আমাদের কাছেই থাকবে। মা ত্বগ্গা করুন, মেয়ের মা-বাপ যেন কোন খবর না পায়।"

ত্বখীরাম বিরক্ত স্বরে বললে, "ছি পার্ব্বতী, অমন কথা মুখেও আনিস নি। একবার ভেবে দ্যাখ দেখি, মেয়ের মা-বাপের কথা! তাদের বুকের ভিতরটা এখন কি করছে, তা কি বুঝতে পারছিস না? হে মা ত্বগ্গা, পার্ব্বতীর কোন অপরাধ নিও না মা, ও না বুঝে অমন পাপ-কথা ব'লে ফেলেছে।" (ক্রমশঃ)

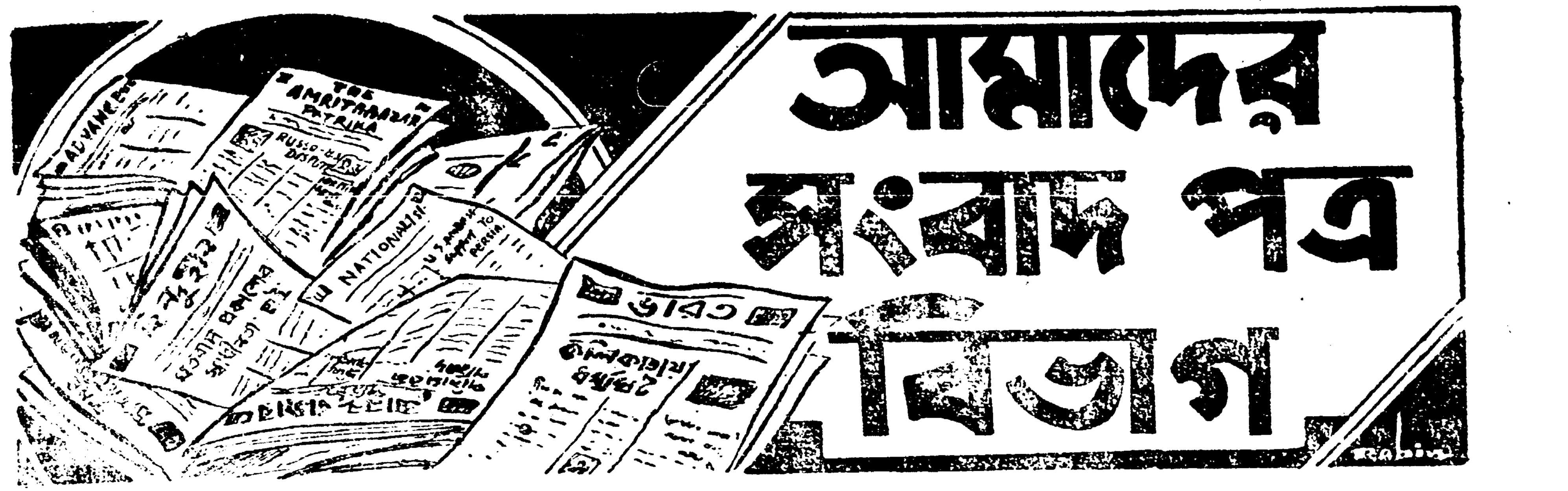

উপনির্ব্বাচন

তুমুল উত্তেজনার মধ্যে পশ্চিম বাংলা ব্যবস্থা পরিষদের উপনির্ব্বাচন শেষ হ'ল। দক্ষিণ কলকাতা থেকে পূর্ব্বনির্ব্বাচিত সদস্য সতীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে এই পদটি খালি হয়েছিল এবং এর জন্য দাঁড়িয়েছিলেন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস এবং বামপন্থী সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিক দলের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু। এ ছাড়া আরও ছিলেন তিন জন, কিন্তু আসল প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা হয় এঁদের তু'জনেরই মধ্যে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলালজী থেকে সুরু ক'রে সর্দ্দার প্যাটেল, রাষ্ট্রপতি পট্টভি সীতারামিয়া এবং কংগ্রেসের ছোট-বড় বহু নেতা এই ব্যাপারে সুরেশ চন্দ্রের পক্ষ নিয়ে এমন আন্দোলন সুরু করেন যে ব্যাপারটার গুরুত্ব স্থানীয় না হয়ে সর্ব্ব-ভারতীয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ভোটের ফল বেরোলে দেখা গেল শরৎচন্দ্র তাঁর প্রতিপক্ষকে বিপুল ভোটে পরাজিত ক'রে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। শরৎচন্দ্র যেখানে পেয়েছেন ১৯০৩০ ভোট, সেখানে সুরেশচন্দ্র পেয়েছেন মাত্র ৫৭৮০ ভোট। ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের পূজারী সেই কংগ্রেস—কোটি কোটি ভারত-বাসী বুকের রক্ত দিয়ে যাকে একদিন গড়ে তুলেছিল—স্বাধীন ভারতে তার কাছে লোকে অনেক কিছুই আশা করবে। কিন্তু মনে হচ্ছে, তাদের ধারণা, ক্ষমতা হাতে পেয়ে কংগ্রেস যেন আর সে কংগ্রেস নেই! লোকের এই মনোভাব বদলাবার জন্য কংগ্রেসের কর্ত্তারা এর পর সতর্ক হবেন বলেই আমরা আশা করি।

কিছুদিন আগে পূর্ব্ব বাংলায়ও অনেকটা এইভাবে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে মুসলিম লীগ প্রার্থীকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে।

চীনের গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে এল

চীনে জাতীয়তাবাদী অর্থাৎ কুওমিণ্টাং দলের সঙ্গে কমিউনিষ্ট দলের দীর্ঘ দিন যাবৎ গৃহযুদ্ধ চলছে সে খবর তোমরা জান। সম্প্রতি এই যুদ্ধ প্রায় শেষ পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে এবং কমিউনিষ্ট দল চীনের অধিকাংশ জায়গা দখল করে ফেলেছে। কুওমিণ্টাং দল তাদের রাজধানী ক্যাণ্টনে সরিয়ে নিয়ে গেছে, কিন্তু সেখানেও তারা ক'দিন টিকতে পারবে সন্দেহ। সুবিখ্যাত সাংহাই সহর রক্ষার জন্য তারা শেষ রক্ত দিয়ে যুঝবে বলেছিল কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট বাহিনী একরকম বিনা যুদ্ধেই সে সহর দখল করে নিয়েছে।

কলকাতার ফুটবল্

কলকাতার ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা এখনও চলছে। এখন পর্য্যন্ত ইষ্ট বেঙ্গল দলের

অবস্থাই সব চেয়ে ভাল, তারা তালিকার সব চেয়ে ওপরে রয়েছে। একমাত্র মোহনবাগান দল ছাড়া তারা এ পর্য্যন্ত আর কারও কাছে হারে নি। মোহনবাগান তাদের গোড়াকার বাধা অনেকটা কাটিয়ে এনেছিল, বিশেষতঃ ইষ্ট বেঙ্গল দলকে হারিয়ে খুব কৃতিত্বও দেখিয়েছিল, কিন্তু তার পর আবার একাধিক খেলায় ড্র রেখে কয়েকটি পয়েণ্ট নষ্ট করেছে। তবে এখনও তারা তালিকার ২য় স্থানে রয়েছে। তৃতীয় স্থানে আছে মহমেডান স্পোর্টিং দল। তারা মোহন-বাগানের নীচে থাকলেও মোহনবাগানের চাইতে খেলেছেও কম, কাজেই বাকিগুলোর ফলাফলের ওপর এদের অদৃষ্ট অনেকটা নির্ভর করছে। তালিকার সব চেয়ে নীচে আছে ক্যাল্‌কাটা গ্যারিসন নামক সৈনিক দল। তারা প্রথম দশটা ম্যাচে একটিও পয়েণ্ট লাভ করতে পারে নি—প্রত্যেকটিতেই হেরেছে। প্রথম বিভাগে খেলার অধিকার এরা কি করে পেল সেইটেই আশ্চর্য্য!

নূতন ধাঁধা

ছাপাখানায় কতকগুলি নতুন টাইপ এসেছে আর এসেছে এক আনাড়ি কম্পোজিটার। সর্দ্দারী করে সে কতকগুলো টাইপ এমন ভাবে কেসে পূরে রেখেছে যে প্রচলিত নিয়মের সঙ্গে তার কিছু মেলে না। যেমন ধর 'ক' এর ঘরে ফেলেছে 'ফ', 'ঝ'-এর ঘরে ফেলেছে 'চ',—এই রকম। অন্য কম্পোজিটাররা তো তা জানে না, তারা ঐ দিয়ে নিজেদের মত ক'রেই অক্ষর সাজিয়ে গেছে। ফলে যা দাঁড়িয়েছে তার একটু নমুনা দিচ্ছি—

কম ফীষ পৈফীষি ফবেফীর্মীয় ঘীহণ চড় ষইয়ী কেয়ীছি। পহু ক্বষির ক্ষমে ষইয়ীছি। শহু পড় পড় কীছ সতৃষি ঔংবীণেম ষইয়ীছি। যীফও ফয়িফজথ আীষম ষইয়ীছি। চড়ির সঙ্গি ব্রথুর পীরেবীম ষইয়ীছেষ। বথি ব্রীয় ফীতর জয দীড়ীইয়ী কেয়ীছেষ।

তোমরা এর পাঠোদ্ধার করতে পার?

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১৮৮১।

উত্তরদাতাদের নামঃ— মনোরমা দেবী, বাপ্পা, লব, কুশ, মঞ্জুশ্রী, রামু (ভবানীপুর); সুস্নাত গংগোপাধ্যায় (কলিকাতা ২৬); কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত (কলিকাতা); রত্না, জয়ন্ত, স্বপ্না, ছন্দা রায় (বাঁকীপুর); শর্মিলা সরকার (কলিকাতা); বিভাসবিহারী বসু (পাটনা); সতী, বাণী, তপন, বরুণ, শ্যামল, বিমল, নীতিন, রতীন মল্লিক (হাজারীবাগ); নান্যদেব ভট্টাচার্য্য (জামশেদপুর); উদ্ধারণকুমার দত্ত (বেলফুলিয়া—খুলনা); এষা সেনাগুপ্তা (নিউ দিল্লী); হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী (চক্রধরপুর); এম্‌. আহমদ (ডোমার—রংপুর); বৈদ্যনাথ সিংহ (বেলফুলিয়া—খুলনা); প্রয়াগ মণিমেলা সিভিল লাইন শিক্ষাকেন্দ্রের মণি ভাইবোন (এলাহাবাদ); বিষ্ণুপদ রায় (বালিঘাই—মেদিনীপুর); নীতিশচন্দ্র বসু (ভনু) (টাকী—সৈদপুর); মঞ্জু, রঞ্জু ও গৌরী (দিল্লী); অনু, ঝরণা, আভা, আরতি ও প্রণতি (বাদুড়তলা—বগুড়া); দীপক, অমল মিত্র ও ঝিণুক মিত্র (গোহাটী); দীপ্তি ও দীপালী সেনগুপ্ত (গোহাটী); অদিতি (শিমলা); গুণু গুহ (বরিশাল); কনককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পানিহাটী)।

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

বাংলার কিশোর-কিশোরীদের জন্য

দেব সাহিত্য-কুটীরের অনুপম দান

নবভাবে সম্পাদিত, সংক্ষিপ্ত, মূলের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সমেত

বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থ-মালা

সম্পাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া তাঁহার প্রত্যেকটী বিখ্যাত নভেল পর্য্যায়ক্রমে কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিশেষভাবে সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। ভূমিকা, সম্পাদকের নিবেদন, কাহিনীর ইতিহাস প্রভৃতি নূতন সংযোগগুলি বঙ্কিম-সাহিত্যে রসাস্বাদনে কিশোর-কিশোরীদের সবিশেষ সাহায্য করিবে।

বাংলার কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে

বঙ্কিম-সাহিত্য-প্রবেশের একমাত্র রাজপথ

সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে

এই সিরিজের প্রথম গ্রন্থ—"আনন্দমঠ"

দ্বিতীয় গ্রন্থ—"দেবী চৌধুরাণী" (বাহির হইল)

তৃতীয় গ্রন্থ—কপালকুণ্ডলা (যন্ত্রস্থ)

দেব সাহিত্য-কুটীর

২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ৯

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি	১।০
পদ্মরাগ	১॥০
সোনার হরিণ	১॥০
নূতন পুরাণ	৸৵০
হাস্য ও রহস্য	৸৵০
চায়ের ধোঁয়া	৸০
হুকাকাশির গল্প	৸০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের

মহাভারতের গল্পগুচ্ছ (১ম)	৸০
ঐ (২য়)	৸০
দিগ্বিজয়ী বীর	৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲

শ্রীলীলা মজুমদারের

বদ্যিনাথের বড়ি	৸০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	১৲
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲
আকাশের গল্প	১।০
আবিষ্কারের গল্প	৸০
ধূমকেতু	৸০
জন্মদিনের উপহার	৸৵০
ফুলের মূল্য	(যন্ত্রস্থ)

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা	১॥০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি	৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

দি লাষ্ট্ অফ্ দি মোহিকান্স্	॥৵০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের

অলিভার টুইষ্ট	॥৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রমা রোড, কলিকাতা ২৫

কবি প্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু)

সম্পাদিত কৈশোর মাসিক

"ভাই-বোন"

১৩৫৬ সালের বৈশাখে ৬ষ্ঠ বর্ষ সুরু

অন্য মাসিক নিলেও 'ভাই-বোন' নেওয়া যায়, কারণ এ পত্রিকাখানি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ভাই-বোন পছন্দ করে আট থেকে আশী বছর বয়সের পাঠক-পাঠিকা। এ ধরণের কাগজ তোমরা দেখো নি। বাংলা দেশের প্রথম চিঠি—"কাকাবাবুর চিঠি"র আকর্ষণ অসাধারণ—যোগ দিলেই বুঝতে পারবে। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাকটিকিট পাঠাও। বার্ষিক ৪৲, ষান্মাসিক ২।০, প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা। বিবরণের জন্য লেখো :—কার্য্যাধ্যক্ষ ভাই-বোন, ৪-এ ঈশ্বর মিল লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা ৬।

রামধনু-সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

নতুন সংস্করণ

দাম একটাকা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

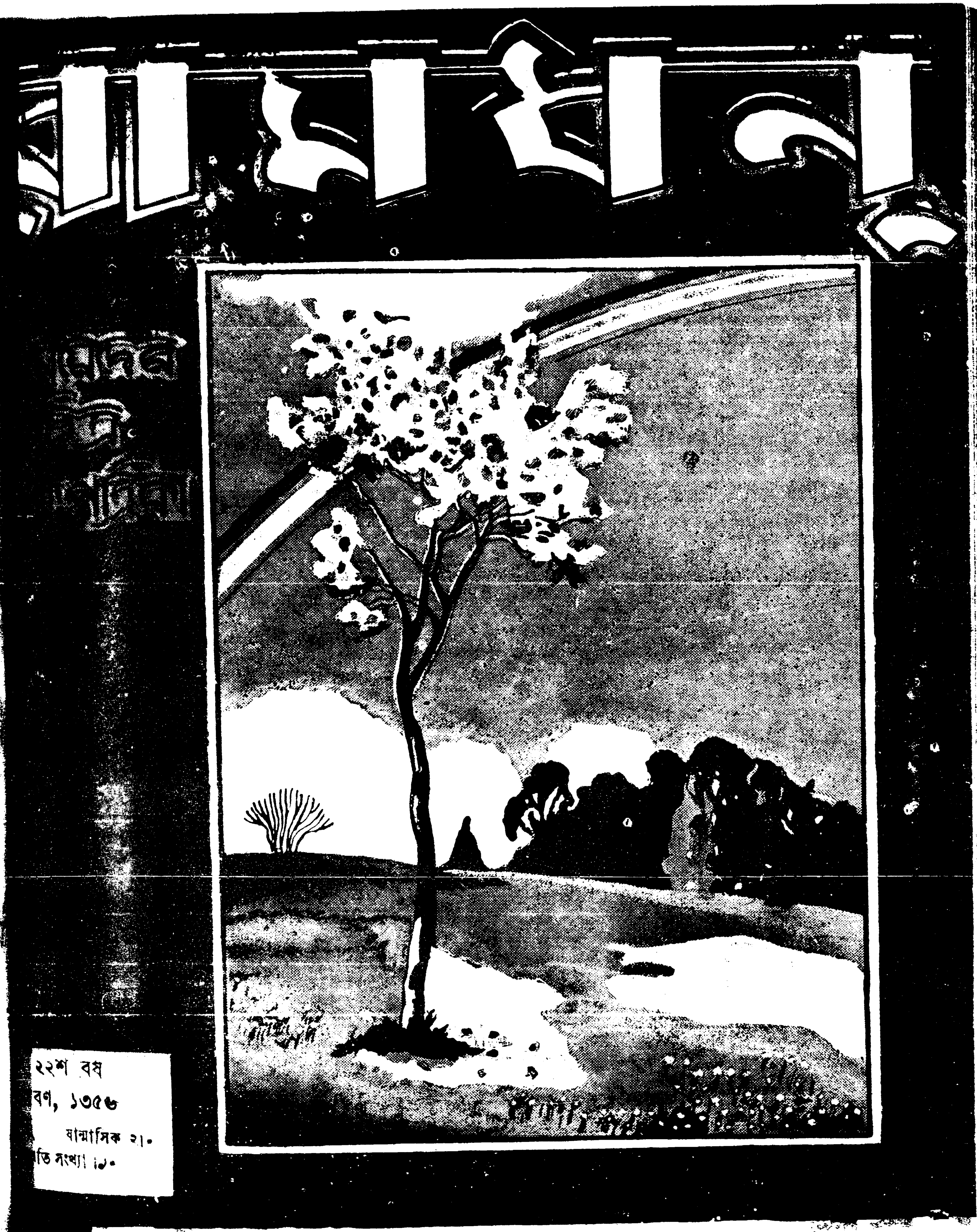

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের		শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি	১৷৹	বিজ্ঞানের জয়যাত্রা
পদ্মরাগ	১৷৷৹	বিজ্ঞান-বুড়ো
সোনার হরিণ	১৷৷৹	আকাশের গল্প

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

কবি প্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু)
সম্পাদিত কৈশোর মাসিক

"ভাই-বোন"

১৩৫৬ সালের বৈশাখে ৬ষ্ঠ বর্ষ সুরু

অন্য মাসিক নিলেও 'ভাই-বোন' নেওয়া যায়, কারণ এ পত্রিকাখানি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ভাই-বোন পছন্দ করে আট থেকে আশী বছর বয়সের পাঠক-পাঠিকা। এ ধরণের কাগ… তোমরা দেখো নি। বাংলা দেশের প্রথম চিঠি—"কাকাবাবুর চিঠি"র আকর্ষণ অসাধারণ—নো… দিলেই বুঝতে পারবে। নমুনার জন্য ।৵৹ আনার ডাকটিকিট পাঠাও। বার্ষিক ৪৲, ষাণ্মা… সিক ২।৹, প্রতি সংখ্যা ।৵৹ আনা। বিবরণের জন্য লেখো :—কার্য্যাধ্যক্ষ ভাই-বোন, ।… ঈশ্বর মিল লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা ৬।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্থুরের স্থষ্টি

শিল্পী কারপ্যাচিওর আঁকা একখানি বিখ্যাত ছবি

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরক্ষিত

২[illegible]শ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৫৬ | ৪র্থ সংখ্যা

তরু বালক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভবিষ্যতের ছায়াতরু এরা—
রসাল বিটপী এরা যে,
ফল-ফুলভারে নত হয়ে যেন
বন আলো করি বিরাজে।
এরা নারিকেল, এরাই যে তাল,
বেল, আবলুশ, সেগুন ও শাল,
সরল সবল সফল সকল
বনস্পতির সেরা যে!

অগ্নিগর্ভ শমী মহীরুহ—
জগৎ জুড়িয়া খ্যাতি গো,
বুক ভরা রস অল্প বয়স
কল্পতরুর জ্ঞাতি গো।
বংশের মাঝে বংশীর সুর,
যষ্টি কখনো যষ্টি মধুর,
অমর অশথ অক্ষয় বট—
শাখে বেঁধে রাখে হাতী গো!

কাশের ফুল্‌কো নয় এরা নয়—
আগুন ধরানো চলে না,
নহে বন-ঝাউ করি হাউ হাউ
বেদনার কথা বলে না।
তুঙ্গ গিরির শিরে এরা শোভে,
ঝঞ্ঝা এড়ায়, বজ্রকে লোফে,
চন্দন এরা—নহেক' ইক্ষু,
আখমা[illegible]লে না।

হে বীর, প্রণাম করি
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—সাঁইত্রিশ—

রাত্রিতে সম্রাট্ বৃহদ্রথ সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশে প্রাসাদ ত্যাগ করছিলেন, পুররক্ষক তাঁকে ধরে ফেললো।

বৃহদ্রথ সম্রাটের পাঞ্জা দেখালেন, পুররক্ষক বিশ্বাস করলো না, বললো—ওটা জাল কি আসল কি করে বুঝবো? আপনাকে আমি কখনও দেখি নি, আপনি গ্রীকদের গুপ্তচর কি না কি করে জানবো?

পুররক্ষক সম্রাট্‌কে বরাবর নিয়ে এলো রাণীর সামনে। রাণীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছদ্মবেশ ভেদ করে আসল মানুষটিকে চিনে ফেললো। হেসে সম্রাজ্ঞী বললেন—কি, সম্রাটের আবার এ বেশ কেন?

সম্রাট্ তখন রাগে গর গর করছেন, বললেন—আমি মগধের আধীশ্বর, না তুমি?

—সহসা এ অবান্তর প্রশ্ন কেন সম্রাট্?

—আমি জানতে চাই যে মগধ-সম্রাটের নিজ রাজ্যমধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করার অধিকার আছে কি নেই?

—আপনি অসুস্থ সম্রাট্!

—আমি অসুস্থ! অর্থাৎ আমি আজ প্রাসাদের মধ্যে নজরবন্দী!

—আপনি সুস্থ হলেই যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারবেন সম্রাট্!

—অর্থাৎ অসুস্থতার কারণে আমাকে প্রাসাদে বন্দী রেখে তোমরা স্বর্ণভাণ্ডার লুঠ করে আমাকে পথের ভিখারী করতে চাও?

—দেশকে রক্ষা করার জন্য আজ স্বর্ণভাণ্ডারের সমস্ত সুবর্ণের প্রয়োজন মহারাজ!

—দেখ মহারাণী, কখন্ কি প্রয়োজন তা তোমার কাছে শিক্ষা করতে আমি চাই

না। আমার বিনা অনুমতিতে তোমরা রাজগৃহের স্বর্ণভাণ্ডারের এক টুকরো স্বর্ণও গ্র করতে পার না। অবিলম্বে সমস্ত স্বর্ণ আমাকে বুঝিয়ে দাও।

—স্বর্ণভাণ্ডারের স্বর্ণ কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় সম্রাট, প্রজাসাধারণের প্রজাদের কল্যাণের জন্য সঞ্চিত করা ছিল, প্রজাদের মঙ্গলের জন্যই আজ তা ব্যয়িত হও প্রয়োজন।

—কি হওয়া প্রয়োজন, তা আমি তোমার চেয়ে কম বুঝি না। আমার সমস্ত সু আমাকে ফিরিয়ে দাও।

—তা আর হয় না সম্রাট্!

—আমার আদেশ।

রাণী চুপ করে রইলেন।

বৃহদ্রথ কিছুক্ষণ রাণীর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন—আমার আদে তুমি শুনবে না?

সহসা সম্রাট্ কটিবন্ধ থেকে ছুরিকা টেনে নিয়ে আত্মহত্যা করার উপক্রম করলেন রাণী তাড়াতাড়ি তাঁর হাতখানি চেপে ধরলেন। তারপর ছুরিকাখানি কেড়ে নিলেন তাঁ হাত থেকে। সম্রাট্ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে কক্ষ থেকে বাহির হয়ে গেলেন।

সেই রাত্রেই সম্রাট্ বৃহদ্রথ স্বর্ণের শোকে আত্মহত্যা করলেন। শেষ রাত্রে পুরর প্রাসাদ-অলিন্দে সম্রাটের রক্তাক্ত দেহ আবিষ্কার করলো। রাণী স্তম্ভিতা, কিংকর্তব্যবিমূ হয়ে পড়লেন। পাটলিপুত্র নগরীতে শোকের ছায়া পড়লো। উত্তরাপথের ধর্মচক্রের মহাস্থবিরে কুক্কুটারাম বিহারে পরামর্শ করতে বসলেন।

—আটত্রিশ—

গুপ্তচরের মুখে প্রয়াগের নগর-প্রাকারের এক দুর্বল স্থানের সন্ধান পেয়ে শেষ রা গ্রীক সেনারা সেইখানে আঘাত করলো। অন্ধকারে দু'দণ্ড সংগ্রাম চালাবার পর হাতী সাহায্যে প্রাকারের সেই অংশ ভগ্ন করে তারা নগরে প্রবেশ করলো। প্রত্যূষে মিনান্দা অশ্বপৃষ্ঠে নগরমধ্যে প্রবেশ করলেন। গ্রীকেরা তখন লুণ্ঠনের উল্লাসে উগ্র হয়ে উঠেছে। নগরের গৃহে গৃহে আগুন জ্বলছে, নাগরিকেরা নগর ত্যাগের প্রাক্কালে গৃহে গৃহে অগ্নি সংযোগ করে যাচ্ছে। আগুন দেখা যাচ্ছে না, আকাশের গায় দেখা যায় ধূমের কুণ্ডলী। মিনান্দার ঘুরে ফিরে দেখলেন, তারপর আপন মনেই বলে উঠলেন—আলেক্‌জান্দার যেখানে এসে পৌঁছাতে পারেন নি, মিনান্দার সেখানে এসে পৌঁছালো। পাটলিপুত্রের পথ আর সরল হয়ে গেল, অর্ধেক হিন্দুস্থান অদূর ভবিষ্যতে আমার করায়ত্ত হবে।

সম্রাট্‌কে দেখে চারিপাশের সৈন্যেরা উৎসাহিত হয়ে উঠলো, সাড়া তুললো—জয় সম্রাট্ মিনান্দারের জয়!

সম্রাটের দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তলোয়ারখানি মাথার উপর তুলে ধরে দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি বললেন—জয়, গ্রীকদের জয়!

নগরীর পথে পথে সারা দিন ধরে চললো সংগ্রাম—খুন কর অথবা খুন হও! নির্বিচার নিরপেক্ষ হত্যালীলা।

হিন্দুরা পিছু হটছে, যে অঞ্চল তারা ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে সেই অঞ্চলে তারা আগুন লাগিয়ে যাচ্ছে। সেই আগুন ঠেলে গ্রীক সেনারা এগুতে পারছে না। বহ্নিমান বাড়ীগুলির পিছনে সরে গিয়ে হিন্দুরা নতুন করে আত্মরক্ষার ব্যূহ রচনা করছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বিষাক্ত তীর এসে পড়ছে, অগ্রগামী গ্রীক অশ্বারোহী ও পদাতিকদের উপর। গ্রীকদের অগ্রগতি প্রতিহত হচ্ছে। লড়াই চলছে।

সাত দিনেও গ্রীকেরা সমগ্র প্রয়াগ দখল করতে পারলো না; দিনে যদিও তারা কিছুটা অগ্রসর হয়, রাত্রে তাদেরকে আবার পিছিয়ে আসতে হয়। রাত্রের অন্ধকারে হিন্দুদের অগ্নিমুখী তীর যুদ্ধাশ্বগুলিকে ভীত ও ত্রস্ত করে তোলে, সেনাকেন্দ্রগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। দিনে গ্রীকেরা অগ্রগামী হয়, রাত্রে করে আত্মরক্ষা।

সপ্তম দিনে সহসা একজন গুপ্তচর এসে সংবাদ দিল—প্রভু, দু'পাশের বনভূমি থেকে কিরাতকুল আমাদের আক্রমণ করেছে।

মিনান্দার তখনই সেনানায়কদের যথাবিহিত আদেশ দিলেন।

কিন্তু গ্রীকেরা যত সহজ বলে মনে করেছিল, কিরাতদের আক্রমণ তত সহজ হ'ল না। সত্যই তো কিরাতবাহিনী আসে নি, আসলে তারা ছিল মাগধী সৈন্য, তাদের পরিচালনা করছিলেন পুষ্পমিত্র, এবং মন্ত্রণা দিচ্ছিলেন বজ্রাচার্য্য।

সন্ধ্যার আবছায়ায় কিরাতকুল আক্রমণ চালিয়ে তিন-চার দণ্ডের মধ্যেই গ্রীক বাহিনীর পশ্চাদভাগ বিপর্য্যস্ত করে তুললো। পিছনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ভালো ক'রে গুরুত্ব উপলব্ধি করার আগেই ঊষালোকে মিনান্দার দেখলেন প্রয়াগ অবরোধ করতে এসে তিনিই সসৈন্যে অবরুদ্ধ হয়েছেন, মাগধী সেনারা চারিদিক থেকে গ্রীকদের ঘিরে ধরেছে। মিনান্দার ইতিপূর্বে আর কখনও পিছন দিক্ থেকে এ ভাবে আক্রান্ত হ'ন নি, তিনি বিপদ্ গণলেন; সেনানায়কদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বুঝলেন—জয়ের আশা কম। সমস্ত গ্রীক বাহিনী নিয়ে তিনি মাধ্যমিকায় পশ্চাদপসরণ করার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। কিন্তু পিছনে মাগধী সেনার ভিতর দিয়ে পথ করে নেওয়াও সহজ হ'ল না। প্রচণ্ড সংগ্রাম সুরু হ'ল। এদিকে প্রয়াগী সেনারাও মাগধী সেনার সাহায্যে উদ্দাম হয়ে উঠলো। চারিদিক্ থেকে আক্রান্ত হয়ে গ্রীকেরা বিহ্বল হয়ে পড়লো। তথাপি আত্মরক্ষার জন্য তারা জীবনপণ ক'রে লড়তে লাগলো।

মিনান্দার অশ্বপৃষ্ঠে স্বয়ং সেনাবাহিনী পরিচালনা করছিলেন, সহসা কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে এক বল্লমাঘাতে গ্রীক সম্রাটের ঘোড়াটি ধরাশয্যা গ্রহণ করলো। গ্রীক সেনারা হৈ-হৈ করে উঠলো, যারা দূরে ছিল তারা সম্রাট্ আহত হয়েছেন মনে করে নিরুৎসাহ হয়ে পড়লো। তারা ভাবলো—কার জন্য আর লড়বো! সেই দুর্বল মুহূর্তে পুষ্পমিত্রের বাহিনী গ্রীক বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে সম্রাট্‌কে বন্দী করলো।

(ক্রমশঃ)

সুইডেনে কয়েকদিন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী, এম্. এ, বি. এল্

৪

এর আগের বারে ব্লুম কাইস্তের কথা কিছু বলেছি—যাঁর ফার্মে আমাকে কাজ করতে হয়েছিল।

ব্লুম কাইস্ত তাঁর কর্ম্মশক্তি, সুন্দর ব্যবহার এবং সুন্দর রুচির জন্য আমাকে মুগ্ধ করেন। ক্রমশঃ খোঁজ নিয়ে জানলাম তাঁর কথা,—তাঁর ব্যবসার কথা।

ব্লুম কাইস্ত এবং তাঁর স্ত্রীর পূর্ব্বপুরুষ—সকলেই 'ফারমার'। ব্লুম কাইস্ত অতি অল্প বয়সে চাষবাসের কাজ আরম্ভ করেন দিনমজুর হিসাবে। তাঁর মূলধনের অভাব থাকায় ১৯২২ সনে তিনি তাঁর বাবার এবং স্ত্রীর কাছ থেকে ১৫০০ ক্রোণোর (প্রায় ১,৪০০৲ টাকা) ধার করে কাজ আরম্ভ করেন। যেখানে এখন তাঁর বাড়ী, ক্ষেত, হট্ হাউস, সে জায়গা ছিলো তখন পাইন-বনে ঢাকা। দুঃসাধ্য পরিশ্রম করে—গাছ কেটে, জমি পরিষ্কার করে তিনি গড়েছেন এই ব্যবসা।

তাঁর ক্ষেতের এবং হট্ হাউসের ফসল বেশীর ভাগ শাকসব্জী, এস্প্যারাগাস, শশা, ফুটি, তরমুজ, আলু, পারস্লে, বীট, গাজর, মূলো, পেঁয়াজকলি, কপি ইত্যাদি।

হট্ হাউসের উত্তাপের জন্যে আছে 'বয়লার'। উত্তাপ ঠিক রাখার জন্যে হট্ হাউসের মধ্যে আছে উত্তাপ-মাপক যন্ত্র—যার সঙ্গে লাগান আছে এলার্ম ঘণ্টা। প্রয়োজনের চেয়ে উত্তাপ কম অথবা বেশী হ'লে বেজে ওঠে এই

ঘণ্টা। ক্ষেতের কাজের যন্ত্রপাতিগুলি খুব আধুনিক, সময় এবং শ্রমলাঘবকর। একজনে চালানোর উপযোগী ক্রুড তেলে চলে এমন একটি মাটি কোপানোর যন্ত্রের কাজ দেখলাম। যন্ত্রটি সুইজারল্যাণ্ডে তৈরী, আর নাম হ'ল "JORD-FRESER"। বিরাট জমিতে ট্রাক্টার কাজের বটে কিন্তু আমাদের দেশের মত ছোট টুকরো টুকরো জমির পক্ষে এই রকম যন্ত্র খুব উপযোগী মনে হ'ল। আমি চালিয়েও দেখলাম, চালানো খুব শক্ত নয়।

ওঁর জমির অনেকটা অংশ এখনও পাইন-বনে ঢাকা। কাঠ চেরার ইলেক্ট্রিক যন্ত্র আছে। প্রয়োজন হ'লে কাজে লাগান হয় সে যন্ত্রকে। ক্ষেতে জল দেবার বন্দোবস্ত, জলের কল ইত্যাদি আধুনিক। বাগান, ক্ষেত ইত্যাদি বেশ ভালো নক্সায় করা। বাড়ীতে আছে 'টিউবওয়েল'। আর ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবহার করা হয় প্রায় সব রকম কাজেই। গ্রীষ্মকালে এঁদের কাজ করতে হয় অমানুষিক, প্রায় দিনে ১৮ ঘণ্টা। তাঁর বেতন-ভোগী কৃষকের সংখ্যা হ'ল সাত জন।

ব্লুম কাইস্তের বাড়ী। সামনে—(১) সিগরিন, (২) টুরিড, (৩) ব্লুম কাইস্ত, (৪) ইন্গেয়ার্ড

তারা প্রত্যেকেই বেশ মিলে মিশে কাজ করে। প্রধান কৃষককে তিনি দেন সপ্তাহে ১০০ ক্রোণোর (প্রায় ৯৫৲ টাকা)। সে বাড়ীর পাশে তাঁর আর একটা ছোট বাড়ীতে থাকতে পায়, আর তার নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁর জমিতে আনাজ উৎপাদনের এবং গরু চরানোর অধিকারও তার আছে। অন্যেরা তাদের কাজের অনুযায়ী পায় মাইনে। তবে গড়পড়তা প্রত্যেকের প্রতি ঘণ্টা মাইনে দাঁড়ায় ১ 'ক্রোণোর' ৯৫ 'ওরে'। তাঁর লোকেদের অন্য সুখসুবিধা হ'লো—কেউ অসুস্থ হ'লে অসুস্থ অবস্থার প্রথম তিন সপ্তাহ সে পায় পূরো মাইনে। তা ছাড়া অসুস্থতার ইন্সিওরেন্স আছে। আর হঠাৎ কাজের সময়ে দুর্ঘটনায় কাজ করতে অক্ষম হ'লে তিন ভাগের দু'ভাগ গড়পড়তা মজুরি তারা পায়।

সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে পড়লে সারা জীবনের জন্য তারা সামান্য মাসোহারা তাঁর কাছ থেকে পাবার অধিকারী।

এঁদের আনাজ, তরিতরকারি বাজারে বিক্রি করার সুন্দর ব্যবস্থা। এখানে লোকাল, ডিস্‌ট্রিক্‌ট্‌, প্রভিন্স—অর্থাৎ স্থানীয়, জেলা এবং প্রদেশের বাজার-সমিতি আছে। এই সমিতি বিভিন্ন সভ্যদের কাছ থেকে ফসল ইত্যাদি কিনে বাজারে করে খুচরো বিক্রি। এই সমিতির লাভের অংশ ভাগ হয় সভ্যদের মধ্যে। জিনিষের দাম অবশ্য ঠিক হয় চাহিদা ও সরবরাহের টানা পোড়েনের ওপর। ব্লুম কাইস্ত স্থানীয় সমিতির সভ্য। সাধারণ অর্থনীতির রীতি হিসাবে তাঁর ব্যবসা খুব লাভের। এই ব্যবসার লাভের টাকা থেকেই তিনি তৈরী করেছেন তাঁর বাড়ী-গুলি, অফিস-ঘর, কিন্‌তে পেরেছেন আধুনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আসবাবপত্র,—

ব্লুম কাইস্তের ক্ষেতে সিগরিন, টুব্রিড প্রভৃতি আন্তর্জাতিক তরুণ-তরুণী শিবিরের সদস্যেরা কাজ করছে।

যেমন মোটর, রেডিও, ভালো চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি। তাঁর বসতবাড়ীতে আছে তিনটি বড় ঘর, রান্না এবং খাবার ঘর। রান্নাঘরে উনুন, খাবার রাখার বাক্স, আলমারী, প্লেট ধোবার যন্ত্র সমস্ত অত্যন্ত আধুনিক। তা ছাড়া আছে আধুনিক স্নানের ঘর। সাধারণতঃ গবর্ণমেণ্ট বাড়ী তৈরী করার জন্যে নানা রকমের সাহায্য করে লোকেদের, কিন্তু তাঁকে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য নিতে হয় নি। লক্ষ্য করলাম তিনি এই ব্যবসা নিয়ে খুব সন্তুষ্ট এবং ভবিষ্যতে খুব একটা বিরাট উচ্চ আশা তাঁর নেই—কৃষিকাজই তাঁর সব। তাঁর কৃষিকাজের নতুন যন্ত্রপাতি নিয়ে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট কর্‌ছেন। তাঁর আশা ভবিষ্যতে সেগুলি কাজে লাগাতে পারবেন।

সুন্দর তাঁর পরিবার, সুন্দর তাঁর বাড়ী, আর তেমনি সুন্দর তাঁর পাঠাগার। বেশ শান্তিতেই তাঁর দিন কাটে। এই অসন্তোষের দিনে একজন কর্ম্মীর শান্ত জীবন দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারি নি।

সিংহশিশু ও পারাবত-শাবক

(নাটক নয়)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

[রাজাবাজারের পাশেই একটি অঞ্চলের এক ছোট গলি। গলিটি মিশেছে বড় রাস্তায়। অপর দিকে একটি ভাঙা পাঁচীল। পাঁচীলের পর একখানি ছোট চৌকো মাঠ; এককালে ওখানে একটি ছোট বস্তি ছিল। মাঠে ঘাস নেই। ঘাস জন্মাবার সময় পায় না, পায়ে পায়ে পিষে যায়, উঠে যায়, ছিঁড়ে যায়। মাঠ খুঁড়লে ওঠে খোলা, কাচ, ভাঙা ইট। মাঠের পশ্চিমে একটি পাঁচীল। পাঁচীলের পুরোনো, পচা, ঝুরঝুরে ইটগুলো একটার ঘাড়ে একটা দিব্যি সাজানো রয়েচে। দাঙ্গার সময় পাঁচীলটা হয়েছিল স্বদেশী গোলার কারখানা। যোদ্ধারা ওখান থেকে স্বচ্ছন্দে ইট খুলে মাঠে ভেঙে গাদা করে শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করেছিল। এখন পাঁচীলটির মাথা হয়েছে বসবার জায়গা। পাঁচীলের গায়ে একটা বড় গর্ত। গর্তটা যাতায়াতের পথ; তবে বয়স্কদের যাতায়াতের পথ নয়। ওধারে একটি খোলার বস্তি।

মাঠের উত্তরে ও পূবে খান কয়েক সেকেলে কোঠাবাড়ি—একতলা, দোতলা, তেতলা। দু'-একখানাতে একালের একটু-আধটু চিহ্ন।

গলিটার পূবধারে টিনের লম্বা মাট-কোঠা, পাঁচীল থেকে সুরু হয়ে প্রায় বড় রাস্তার শেষ। যেন দু'টো প্যাকিং বাক্স ওপর ওপর সাজানো।

পশ্চিম ধারে খান কয়েক কোঠাবাড়ি পিঠে পিঠ দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ মুখো হয়ে জোড়ায় জোড়ায় দাঁড়িয়ে। বাড়িগুলোর কোল বরাবর প্রায় বড় রাস্তা থেকে পাঁচীল অবধি টানা লোহার মাথা বাঁকা শিকের উঁচু বেড়া, যেমন আছে চিড়িয়াখানার সিংহের খাঁচায়। তবে সে শিকগুলোর মাথা ভেতর দিকে বাঁকা, যাতে সিংহ-পরিবার বেড়া ডিঙ্গিয়ে বাইরে না-আসতে পারে। আর, এ শিকগুলোর মাথা বাইরের দিকে বাঁকা ও চোখা যাতে বাইরে থেকে কেউ ভেতরে আস্‌তে না পারে। পূব-পশ্চিমের বাড়িগুলো দেখতে এক রকম। তাই একদিন এলে দ্বিতীয় দিন এসে নম্বর ভুলে গেলে আর ঢোকবার যো নেই! তখন মনে পড়বে "আলিবাবা ও চল্লিশজন দস্যুর" গল্পটি। এই পাড়াটির অর্থাৎ পূব-পশ্চিমের বাড়ি-গুলির মালিক মাত্র তিন জন। তাঁরা অবশ্য পরস্পরের আত্মীয় ন'ন, স্বজাতিও ন'ন। তবে বাড়িওয়ালা। কাজেই সমশ্রেণীর। তাঁদের দু'জন পরলোকে, একজন এখনও টিকে আছেন। বয়স আশী ছাড়ালো। বিষয় রক্ষার দুশ্চিন্তায় তাঁর যে-কোন একদিন হঠাৎ নাড়ি ছেড়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। যে দু'জন গত হয়েছেন, তাঁদের একজন ছিলেন বড়ই দুর্ভাগ্যবতী! তাঁর কাহিনী শুনলে চোখে জল আসে। তিনি একবার লটারিতে পেয়েছিলেন মোটে আটচল্লিশ হাজার দু'শো টাকা! তাই দিয়ে এই নব-সিংহের চারিটি খাঁচা কিনেছিলেন। নিজেও বছর কতক এর একটিতে শখ করে বাস করে পরলোকে চলে গেচেন। তাঁর আত্মার শান্তি হোক্।

এই খাঁচাগুলির সিংহ- ও প্যাকিং বাক্স দু'টির নিরীহ পারাবত-শাবকগুলির গ্রীষ্মের ছুটির মাত্র একটি দিনের কাহিনীই হ'ল আমার আজকের বর্ণনার বিষয়।]

ভোর সাড়ে পাঁচটা। হঠাৎ গলির একপ্রান্তে চার-পাঁচটি সরু গলার কলরব-কোলাহল, প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে। সেই সঙ্গে অনেকগুলি পায়ের ছুটে চলার শব্দ।

তারপরই "দেঁ আঁমার ঘুঁড়ি—"

পরক্ষণেই "ঠাস্—দুম্—"

"ওমা—আ—আ। ইহিঁ—ইহিঁ—ইহিঁ—"

হঠাৎ এক বামা-কণ্ঠ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, "কিঁ—হঁলো—কিঁ—"

সিংহ-শাবকটি তেম্নি কাঁদতে কাঁদতে একটি খাঁচায় ঢুকে বল্লে, "ভুলু আমায় মেরেচে। আমি কিচ্ছু করি নি—"

তারা থাকে খাঁচার নিচতলায়; ভুলুরা থাকে ওপরতলায়। এর পর যা হয়ে থাকে আশা করি পাঠক-পাঠিকারা অনুমান করে নেবে। সেটা আমাদের বর্ণনার বিষয় নয়। কারণ তা বয়স্কদের ব্যাপার। কিন্তু আসল ঘটনাটা বলা যেতে পারে। সেটা হ'ল, ভুলু ঘুম থেকে উঠেই খ্যাংরার কাঠি ও খবরের কাগজে নিজ হস্তে তৈরী ঘুড়ি ও তার মেজদা'র পেন্সিলে গাঁথা কাটিম দিয়ে তৈরী লাটাই নিয়ে মাঠে যাচ্ছিল ভোরের বাতাসে ওড়াতে। তার বয়স হবে ছ' বছর। নিচের তলার শাবকটির বয়সও প্রায় সেই রকম। সে ঘুম থেকে উঠে সামনের প্যাকিং বাক্সের রোয়াকে জন দুই সঙ্গীর সঙ্গে বসে ছিল কিসের আশায় জানি না। ভুলুর হাতে ঘুড়ি-লাটাই দেখেই ছুটে গিয়ে ঘুড়ির লেজে এক টান। তাতে ঘুড়িখানি লাঙ্গুলহীন হ'ল; তার অঙ্গেরও ক্ষতি হ'ল কিছু। তারই প্রতিক্রিয়া হ'ল শাবকটির গালে ও পিঠে, "ঠাস" ও "দুমে"। তারপর যা হ'ল আগেই বলে রেখেছি।...

একটু পরেই মাঠের দিক্ থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "ধর্, ধর্—"

গলির বিপরীত দিকে শোনা গেল "এই বিকু, ক'টার সময় যাবি?"

এবং সূর্য ছাদের মাথা বরাবর উঠতেই গলি ও মাঠ সিংহ- ও পারাবত-শাবকে গেল ভরে। হাসি, গান, শিষ, চীৎকার, পায়ের শব্দ, টিনের চালে ঢিল পড়ার আওয়াজ ছাড়া আর কিছু নেই। শাবকগুলির সকলেরই পরনে হাফ-প্যাণ্ট, খালি পা, খালি গা; চালানী কৈ মাছের মতো চেহারা—মাথা মোটা, শরীর রোগা—চোখে বুনো আলো, মাথার চুলগুলো রুক্ষপ্রায়, পায়ের গোছে ও কানের পাশে ধূলো-বালি-তেল-ঘামের কালো, শুক্নো পাতলা স্তর! এদের মধ্যে দু'-একজন বেশ নধর। তাদের পায়ে স্যাণ্ডাল, পরনে পরিষ্কার প্যাণ্ট, গায়ে হাতকাটা ছিটের কামিজ, মুখে লালিত্য, চোখে স্থৈর্য, মাথার চুল তেল চুকচুকে।

হঠাৎ দেখা গেল ছোটর দল, ছয় থেকে দশ অবধি, সূতোয় ঢিল, কয়লা বা নারকোলের

ছোবড়া বেঁধে ঢিল লগর ও কাটাকাটি খেলচে; বড়রা, এগারো-বারো থেকে পনেরো-ষোলো অবধি, সার বেঁধে বসে আছে প্যাকিং বাক্সের রোয়াকে।

তারপর দশ মিনিটও কাটলো না, গলি ফাঁকা! কেউ কোথাও নেই। মাঠ থেকে দু'টি-একটি কণ্ঠস্বর ভেসে আস্চে। গলির মোড়ে শেষ খাঁচাটির শেষ-সীমানা হ'ল একটি ষ্টীল ট্রাংকের কারখানা। সেখান থেকে ঢক্ ঢক্ ঠঙ্ ঠঙ্ শব্দ আসচে আর আসচে বাদাম তেলে কচুরি ভাজার গন্ধ। পাশেই খোট্টা হালুইকরের দোকান। কারখানার এক-ধারে এক বেচারা পেয়ারা গাছ অতি ভয়ে ভয়ে আকাশ-পানে উঁচু হয়ে উঠেছে। তার জীবনের প্রতি তেমন ভরসা নেই। দেখা গেল, পেয়ারা গাছটি দুল্চে; কারখানার টিনের চালেও খড় খড় শব্দ হচ্চে। গলিতে ঢোকবার মুখেই একটি পাঁচীল। পাঁচীলটির মাথায় গুটি দুই শাবক, কষটে পেয়ারা খেয়ে পরস্পরের গায়ে ছিব্ড়ে নিক্ষেপের আনন্দ উপভোগে মত্ত। অপেক্ষাকৃত বড় যারা তারা পাড়া থেকে অদৃশ্য!

কিছুক্ষণ পরেই মাঠ থেকে আনন্দ-কোলাহল শোনা যেতে লাগ্লো। বল্ খেলা হচ্চে, ফুটবল,—মানে একটি টেনিস বল্। গলি ফাঁকা হয়ে গেচে, পেয়ারা গাছটি স্থির হয়ে আছে, টিনের চাল খালি, পাঁচীলের মাথায় কেউ নেই। রোদ উঠেছে চনমনিয়ে, বেলা হবে দশটা।

হঠাৎ উঠলো, "পালা, পালা" রব।

"পালিয়ে আয়—মার্ ইট মার্—ঐ আস্চে—বল্ নিয়ে পালালো—ওকে খুন্ করবো—ইটিয়ে মাথার ঘিলু বার করে দেবো—পাগল না বদমায়েশ—" ইত্যাদি মন্তব্য, বাসনা ও আস্ফালন শোনা যেতে লাগলো অন্ততঃ বিশটি কণ্ঠে।

দেখা গেল, মাঠের একধারে ইট, রাবিশ, লোহার ডাণ্ডা হাতে ছোট বড় বিশ-পঁচিশটি সিংহ- ও পারাবত-শাবক, এবং মাঠের অপর ধারে একখানি বাড়ির দরজায় পিছনে হাত দু'টি দিয়ে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। তাঁর মাথা খারাপ। আরও খারাপ হয় এই শাবকগুলিকে মাঠে খেল্তে দেখ্লে। ছুটে এসে বল্ কেড়ে নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে বঁটি দিয়ে বল্টা কেটে ফেলেন। সেদিনও তাই করে দরজায় এসে চুপ্ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

সিংহের বাচ্চাদের দু'-একজন, যারা এখানকার ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় দৌড়ে প্রথম হয়, তারাই ভদ্রলোকটির সামনে হাত পনেরোর মধ্যে এগিয়ে গিয়ে বলচে, "পাগল না হাতী—" বাকি সকলে আছে তাদের অনেক পিছনে। দু'-একটি ঢিল গিয়ে পড়লো তাঁর সামনে। তিনি ঢিলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সিংহশিশু ও পারাবত-শাবক ক'টিকে তাড়া করলেন। নিমেষে মাঠ ফাঁকা, গলি ভরে উঠ্লো। রোয়াকে বসে চলতে লাগলো আস্ফালন, উত্তেজিত মন্তব্য, ও কি করে লোকটিকে জব্দ করা যায় তারই পরামর্শ।

এই সমর-পরিষদের সদস্যদের মধ্যে মতভেদ ঘট্লো; তা থেকে কথা কাটাকাটি; একটু পরে পরস্পরের পিতামাতাকে গালাগালি। পরক্ষণেই দু'টি-চারটি ঘুষি! তাই

ব্যাপারটি ঢুকলো খাঁচায় ও প্যাকিং বাক্সে, উঠলো বয়স্কদের কানে। তার পরের ঘটনা আমার বর্ণনার বিষয় নয়।

কিছু পরে, মানে বেলা প্রায় বারোটায়, ঘর্মাক্ত, ধূলি-ধূসরিত, ক্ষুধার্ত দেহে ও ক্ষুণ্ণ মনে শাবকগুলি একে একে বা জোড়ায় অথবা তিনটি করে বিবরে ঢুকলো।

দারুণ গ্রীষ্ম। শহরের মিউনিসিপ্যালিটি আছে, আছে পল্‌তা—পটোলের পাতা নয়, আছে টালার জলের ট্যাংক, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি। কিন্তু জলের সে তোড় আর নেই। গল্পে শুনেচি, কর্তাদের আমলে ছেলেরা দোষ করলে তাদের মাথার গাঁট্টা না মেরে—তখন স্কুলেও গাঁট্টা মারা ছিল, এখন উঠে গেছে—কলের তলায় বসিয়ে কল খুলে দেওয়া হ'ত! (আহা, কি দিনই ছিল! তখন শহরে লোক ছিল কম, তাই জলের তোড়ও ছিল বেশি। এখন লোক বেশি, তাই তোড়ও অন্তর্হিত। কিন্তু সেকাল ও একাল দুইকালেই টালার ট্যাংক এক আশ্চর্য সামগ্রী হয়ে আছে। কালের সঙ্গে তাল রেখে টিকে রয়েচে দিব্যি। পাঠকপাঠিকাগণ ইচ্ছা করলে, এই লাইন ক'ট নাও পড়তে পারো।)

শাবকগুলি যে যেমন জল পেলে, কেউ করলে কাক-স্নান, কেউ ঢাললে মাথায় হড়্ হড়্ করে বালতি কয়েক জল। তারপর এক রকম ভিজে মাথা ও গায়েই বস্‌লো খেতে। খাদ্যের সঙ্গে খানিকটা করে ভর্ৎসনা ও গঞ্জনাও গিলে ফেল্‌লে।

এদিকে রোদ ঝাঁঝাঁ করচে। চড়ুইগুলো গিয়ে বসেছে আল্‌সে ও ছেঁচের ছায়ায়, কাকগুলোকেও দেখা যায় না, চিল-শকুনগুলো এত ওপরে উঠে গেছে যে মনে হচ্ছে আকাশের নীল গায়ে ক্ষুদে ক্ষুদে পোকা চলে-ফিরে বেড়াচ্চে। রাস্তায় লোক নেই, যেন নিশুতি রাত। কচিৎ-কদাচিৎ একখানি মোটর বা লরি হর্ণ বাজিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌চে, যেন পালাতে পারলে বাঁচে। দূর থেকে বাসনওয়ালার কাঁসির ঘণ্টা যেন হাঁফাতে হাঁফাতে ভেসে আস্‌চে।

এমন সময়ে ছোকরা চীনে-বাদাম-ওলাটির হাঁক শোনা গেল, "গরম চীনা বাদাম। চী—না বাদা—ম।"

ছোকরা রোজ এই সময়ে বাদাম বেচ্‌তে বেরোয়। বেলা দেড়টা। গৃহিণীরা তন্দ্রাচ্ছন্ন। ঘুমোবার আগে কেউ কেউ বললেন, "পড়াশুনো কর। রোদে বেরিও না।..." ছোট-গুলোকে কোলের কাছে শুইয়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে নিজেরাই ঘুমিয়ে পড়েচেন।

হঠাৎ গলির একদিকে কতকগুলো মিহিকণ্ঠ কলকোলাহল করে উঠ্‌লো। চিল লঙ্গর কাটাকাটি খেলা শুরু হয়েছে। একটা বাড়ির ছাদ থেকে ভেসে এল, "ভু—ম্মো। ভোঁ—মা—রা—অ্যা—"

"ভূতো, ছেড়ে দে বল্‌চি। নাহলে ইট মারবো—"

পাশের খাঁচায় ক্যারমের খটাৎ খটাৎ শব্দ।

এক জায়গা থেকে আসচে হামান-দিস্তের শব্দ। কাচ গুঁড়ো করার। প্যাকিং বাক্সের একটিতে হচ্চে হট্টরোল ও খট্ খট্ শব্দ। তৈরী হচ্চে লাটাই।

গলিতে শোনা যাচ্চে, "জড়িয়ে দে—জড়িয়ে দে। কি—রে, ক্যাব্‌লা!"

সুতোয় দেওয়া হচ্চে মাঞ্জা। হঠাৎ একটি শাবক গেয়ে উঠ্‌লো, "নাই বা হ'ল মিলন মোদের—" (তাদের পাশের বাড়িতে রেডিও আছে।) বয়স তার হবে বছর বারো।

এমনই সময়ে শোনা গেল, "আ—ইস্—ক্রীম্।"

একখানি হল্‌দে বাক্‌সো-গাড়ি এসে থামলো মোড়ে।...সে বেচ্‌লো চৌদ্দোটি!

হঠাৎ উঠলো, "ইঁহি—ইঁহি—ইঁহি—" কান্নার শব্দ।

সেই সকালের শাবকটির কান্না। সে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এল বাড়ি। এবার তার ঘুড়ি কেড়ে নিয়ে পালিয়েচে ঝণ্টু। তার মার চোখে সবে তন্দ্রা এসেছিল। চট্ করে উঠে বসে, "কিঁ—হঁলো—?"

পরের কথাবার্তা ও মন্তব্য উহ্য রইলো। তার পরের ঘটনা, ঝণ্টু ও "ইঁহি"র দাদায় হাতাহাতি। কে জিতলো বোঝা গেল না। সম্ভবতঃ ঝণ্টু। কারণ সে চুপচাপ; "ইঁহির" দাদা ও মা'র গলা অনেকক্ষণ শোনা গেল।

জানা গেল ঝণ্টুর এমন আচরণের কারণ কয়েকদিন আগের একটি ঘটনা। "ইঁহি" নিয়েছিল ঝণ্টুর চার বছরের ভাইয়ের হাত থেকে "ইঁহি"র মায়ের সামনেই একটি কাগজের ফুল কেড়ে। সেদিন প্রতিকার হয় নি বলে ঝণ্টু আজ প্রতিশোধ নিলে। সে অবশ্য পারাবত-শাবক।

কলে জল এল, রাস্তায় ফট্ ফট্ শব্দে জল দিতে লাগলো, যান-বাহন ও পথিকের, ফেরিওলার চলা-ফেরা বাড়তে লাগলো। কাকগুলো এল উড়ে, চড়ুইগুলো এল বেরিয়ে, চিল, শকুনগুলো পড়লো নেমে, গরম বাতাসের দমকা গেল বয়ে। শাবকগুলি আবার এল বাড়ি। গায়ে ধূলো-বালি, ঘাম, কাচের গুঁড়ো, হাতে ভাত বা চিঁড়ের কাই, গালে মাঞ্জার রঙ, পেটে ক্ষুধা।......

একটু পরে সকলেই জামা গায়ে বেরিয়ে পড়লো মাঠে; শুরু হ'ল খেলা। ছাদে ছাদে উড়লো ঘুড়ি। পাগলা-ভদ্রলোকের বাড়ির দরজা বন্ধ। ভাঙা পাঁচীলের ওপর বসেচে গুটি কয়েক শাবক; তার গায়ের গর্ত দিয়ে ওপারে যাওয়া-আসা করচে কয়েকটি, ধূলো-বালি নিয়ে খেলচে কয়েকজন, সাদা লজেঞ্চুস্ সিগারেটের মতো টান্‌চে কেউ কেউ; পাঁচ-ছয়টি পরস্পরের কোমর ধরে ছুটচে,—রেলগাড়ি!

এরই মাঝে খাঁচা ও বাক্স থেকে ডাক যাচ্চে, মুদীর দোকানে যাবার, কয়লা আনবার, অতিথির জন্য খাবার কিনবার। তার ফলে বিরক্তির আর সীমা নেই।

যাকেই ডাকা হয় সেই বিরক্ত মুখে বলে, "বাবাঃ! সারাদিন কেবল ফরমাজ। একটু খেলতেও পাবো না!..."

ক্রমে বেলা শেষ হয়ে এই দৃশ্যের ওপর যবনিকা পড়লো।

সবাই এল ঘরে। কেউ মা সরস্বতীকে একটু ছুঁলো, কেউ ছুঁলোই না, ঠিক করে রেখে দিল, পরীক্ষার সময় তাঁর পায়ে কলম ঠেকিয়ে নিয়ে যাবে...।

হিরোশিমার শেষ পর্য্যায়

অধ্যাপক ডাঃ দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ডি. এস্-সি

জাপানের হিরোশিমা সহর আমেরিকার একটি মাত্র পরমাণবিক বোমায় কেমন করিয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল সে গল্প তোমাদের ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি (রামধনু, ১৩৫৫)। বোমা পড়িবার কিছুদিন পরে বৈজ্ঞানিকেরা যন্ত্রপাতি লইয়া পরীক্ষার জন্য হিরোশিমায় আসিলেন।

বোমা কোথায় ফাটিয়াছে প্রথমে তাহাই হইল অনুসন্ধানের বিষয়। নানা পরীক্ষার পর তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন সহরের গোকোকু মন্দিরের প্রধান তোরণের কাছে বোমা ফাটিয়াছে। পরীক্ষায় আরও নানা তথ্য জানা গেল। দেখা গেল বোমার আগুনে কংক্রীটের রং বিকৃত হইয়া ঈষৎ লালচে হইয়াছে ও পাথরের উপর হইতে স্থানে স্থানে ছালের মত উঠিয়া গিয়াছে। ফলে বোমার আলোয় যে সব ছায়া পড়িয়াছিল তাহা কোথাও কোথাও স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। গোকোকু মন্দির হইতে ২২০ গজ দূরে চেম্বার অব্ কর্মাসের বাড়ীর ছাদে ছাদের চৌকা গম্বুজের একটি ছায়া পড়িয়াছিল। ৮০০ গজ দূরের চোগোকু ইলেকট্রিক কোম্পানীর বাড়ীতে, ২০৫০ গজ দূরের হাইপোথেক ব্যাঙ্কে, ও গোকোকু মন্দিরের কতকগুলি কবরের পাথরেও এইরূপ ছায়া পড়িয়াছিল। বোমা বিদারণের কেন্দ্র হইতে ২৬৩০ গজ (দেড় মাইল) দূরে গ্যাস-পাম্পের হাতলের একটা ছায়া ছিল। এই ছায়াগুলি, ও যাহাদের ছায়া তাহাদের অবস্থান দেখিয়া জানা গেল যে গোকোকু মন্দিরের প্রধান তোরণের ১৫০ গজ দক্ষিণে এবং শিমা হাসপাতালের কয়েক গজ দক্ষিণ-পূর্ব্বে বোমা বিদীর্ণ হইয়াছিল। শিমা হাসপাতালের অবশ্য কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। মানুষের কতকগুলি আবছা ছায়াও স্থানে স্থানে দেখা গিয়াছিল। ইহার ফলে নানারূপ কাহিনীর সৃষ্টি হয়। এই কাহিনীগুলিতে বাস্তব এবং কল্পনা উভয়েরই সংমিশ্রণ ছিল। কোন ব্যাঙ্কের দেওয়ালে একটি ছায়া দেখিয়া মনে হয় রংয়ের মিস্ত্রী মইয়ে উঠিয়া রংয়ের পাত্রে তূলি ডুবাইয়াছে। সায়েন্স্ মিউজিয়ামের কাছে একটি পুলের উপরে একটা ছায়া দেখিয়া মনে হয় গাড়োয়ান ঘোড়াকে চাবুক মারিতে উদ্যত হইয়াছে। হয়ত বোমা বিদারণের সময়ে ঐ সব ঘটনা ঘটিয়াছিল। হয়ত বা ছায়ার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

জাপানের আত্মসমর্পণের কিছুদিনের মধ্যেই মিত্রপক্ষের অধীনে হিরোশিমায়

শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। রশ্মিজনিত রোগ হইতে মুক্ত হইয়া হাজারে হাজারে লোক সহরে ফিরিয়া আসে। ১লা নভেম্বরের মধ্যে লোকসংখ্যা হয় ১ লক্ষ ৩৭ হাজার। তাহারা প্রধানতঃ সহরের বহিরাঞ্চলে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। শাসন-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের সহর নির্ম্মাণের কাজে লাগাইয়া দেন। রাস্তা পরিষ্কার হয়, ভাঙ্গা লোহালক্কর জড় হইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ হয়। কেহ কেহ নিজেই বাড়ীঘর বাঁধিয়া জায়গা-জমি পরিষ্কার করিয়া ক্ষেতে গম বুনিয়া দেয়। কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে ৪০০ ব্যারাক তৈয়ারী হয়, বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে, ট্রাম চলে। সাত হাজার জায়গা মেরামত হইয়া সহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের কর্ম্মীরা হাতাহতের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে বসেন। তাঁহাদের রিপোর্টে সাব্যস্ত হয়—বিস্ফোরণের ফলে মোট ৭৮১৫০ জন নিহত, ১৩৯৮৩ জন নিখোঁজ ও ৩৭৪২৫ জন আহত হইয়াছে। তাহার পরেও মাসের পর মাস শত শত মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। সহরের নব্বই হাজার বাড়ীর বাষট্টি হাজার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়; ছয় হাজারের এমন ক্ষতি হয় যে সংস্কার করার উপায় থাকে না। সহরের মধ্যস্থলে মাত্র পাঁচখানি আধুনিক বাড়ী একপ্রকার ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় থাকে।

দলে দলে বিজ্ঞানী সহরে আসিয়া জমায়েত হ'ন। কেহ মাপেন কবরখানায় কবরচাপা পাথর সরাইতে কত জোর লাগে, কেহ বা বাহির করেন হিরোশিমা রেল-ষ্টেশনের লাইনে দাঁড়ানো ৪৭ খানা গাড়ীর ২২ খানা উল্টাইতে কত জোর লাগে। নদীর সাঁকোর উপরের কংক্রীটের রাস্তা প্রভৃতি তুলিয়া সরাইয়া ফেলিতে কতখানি শক্তির প্রয়োজন তাহা নির্ধারিত হয়। এই সকল মাপজোঁক করিয়া সিদ্ধান্ত করা হয় যে বোমা বিদীর্ণ হইয়া যে চাপ সৃষ্টি করে তাহা প্রতি বর্গ গজে ৫·৩ হইতে ৮ টনের মধ্যে (১ টন্—২৮ মণ)। যে তাপের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারও মাপ পাওয়া যায়। বোমার কেন্দ্র হইতে ৩৮০ গজ দূরে কবরখানার গ্রানাইট পাথরের উপরে অভ্র গলিয়া গিয়াছে। আড়াই মাইল দূরে টেলিফোনের খুঁটি অংশতঃ অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে; ৬০০ গজ দূরে টালি গলিয়া গিয়াছে। এই সব ও অন্যান্য প্রমাণের সাহায্যে স্থির হইল যে কেন্দ্রের কাছে ভূমিতে উত্তাপ হইয়াছিল ৬০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, অর্থাৎ সূর্য্যের বহিরাবরণের উত্তাপের সমান। বোমার ভগ্নাংশ নানা স্থান হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল। দু'-একটি টুকরা কেন্দ্র হইতে প্রায় দুই মাইল দূরেও পাওয়া গিয়াছে। এই সব হইতে বোমা সম্বন্ধে নানা প্রকার তথ্য আবিষ্কৃত হয়। আমেরিকার কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে

জাপানের বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলিতে বোমার কোন প্রকার উল্লেখ করিতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু জাপানী বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের ফল অল্পদিনের মধ্যেই জাপানের শিক্ষিত সমাজে প্রচারিত হয়। কি ধরণের বোমা হিরোশিমায় ফেলা হইয়াছিল তাহা আমেরিকার জনসাধারণ জানিবার আগেই জাপানের বহু লোকে জানিতে পারে। হিরোশিমায় ইউরেনিয়াম্ বোমা ও নাগাসাকিতে তাহা অপেক্ষা শক্তিশালী প্লুটোনিয়াম্ বোমা ফেলা হইয়াছিল। তাহারা আরও জানিতে পারে যে ইহা অপেক্ষা দশ বা বিশ গুণ শক্তিশালী বোমাও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। জাপানের বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস মাটি হইতে কত উপরে বোমা বিদীর্ণ হইয়াছিল এবং কতটা ইউরেনিয়াম্ ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহাও তাঁহারা জানেন। হিরোশিমায় ব্যবহৃত বোমা তত উন্নত ধরণের নহে। তবু তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, তাঁহাদের মতে, অন্ততঃ পঞ্চাশ ইঞ্চি পুরু কংক্রীটের আশ্রয় দরকার।

এই ধরণের বোমা ব্যবহার করা উচিত কি অনুচিত সে সম্বন্ধে হিরোশিমার বহু লোকেরই কোন নির্দ্দিষ্ট ধারণা ছিল না। সম্ভবতঃ যে ভয়ঙ্করতা তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহা লইয়া চিন্তা বা আলোচনা কেহ করিতে চায় না। বোমাটি কি রকম ইহা জানিবার চেষ্টাও অনেকে করে নাই। অনেকের ধারণা—"ওটা আয়তনে দিয়াশলাইয়ের বাক্সের সমান, উত্তাপ সূর্য্যের তুলনায় ছয় হাজার গুণ। ভিতরে 'রেডিয়াম্' আছে। কি ভাবে কাজ করে? জানি না। তবে রেডিয়াম এক সঙ্গে জড়ো হ'লে বিস্ফোরণ হয়।" ব্যবহার করা উচিত কিনা সে সম্বন্ধে অনেকের ধারণা "যুদ্ধ যখন, তখন এ রকম হ'তেই পারে।" 'সিকাটা গা নাই' —অর্থাৎ 'কি আর করা যাবে?'

আত্মোন্নতি সমিতির গল্প

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
এম্. এ., বি. এস্-সি

ইন্দ্রনাথ, প্রভাস ও বিপিনের আবির্ভাব

এই তিনজনের কে কখন আত্মোন্নতি সমিতিতে যোগ দেয় তাহা আমার ঠিক মনে নাই। বোধ হয় ইন্দ্রনাথ নন্দী প্রভাসদের কিছু আগেই যোগ দেয়। বিপিন গাঙ্গুলী খেলৎচন্দ্র স্কুলেরই ছাত্র ছিল। রুক্মিনী মুখোপাধ্যায়, সুরেশ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (বর্ত্তমান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কালিপদ মুখোপাধ্যায়ের বড় ভাই), ধীরানন্দ ও নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায় দুই ভাই, নন্দ ও হৃষীকেশ দে দু'ভাই, রাধিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুজঙ্গ ধর, খেলতচন্দ্র স্কুলের এই সব ছাত্রও শীঘ্রই আত্মোন্নতিতে যোগ দেয়।

আত্মোন্নতির প্রথম দলের মধ্যে ইন্দ্রনাথ, প্রভাস, বিপিন ও হরিশ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিপিন তখন অত্যন্ত লাজুক ছাত্র ছিল; সে আত্মোন্নতির সাপ্তাহিক আলোচনা-সভায় নিয়মিত যোগ দিত।

ইন্দ্রনাথ ভূপতি গোস্বামীর কোনও বন্ধুর কাছে সংবাদ পাইয়া আত্মোন্নতিতে যোগ দেয়। ইন্দ্রের সহিত তাহার দুই বন্ধু রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও যতীন হালদার আমাদের সভায় আসিত। রাখাল আলিপুরের একজন ভাল উকীল। যতীন ছিল গোবরডাঙ্গার প্রসিদ্ধ ব্যায়ামী জমিদার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের শ্যালক। ইন্দ্রনাথের আর এক বন্ধু প্রবোধ দাশের সহিত সংযোগ সংস্থাপিত হয়। প্রবোধ আত্মোন্নতির ঠিক নিয়মিত সভ্য ছিল না।

ইন্দ্রনাথ ও প্রভাসের উৎসাহে আত্মোন্নতির দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল। আত্মোন্নতি সম্পূর্ণ রূপে সাধারণতন্ত্র মতে পরিচালিত হইত। কাহাকেও অতিরিক্ত সম্মান

দেখান হইত না। আলোচনা-সভায় সকলেই যোগ দিত। সতীশ, ইন্দ্রনাথ, প্রভাস ও আমি কখনও সভাপতি এবং কখনও কার্য্যাধ্যক্ষের কাজ করিতাম। ভুবনেশ্বর ও রাধারমণ প্রায় কোষাধ্যক্ষের কাজ করিত।

প্রভাস বেশ ভাল ছাত্র ছিল। বি. এ, ও এম্. এ উভয় পরীক্ষাতেই ভাল ফল করে। পরবর্ত্তীকালে সে কুচবিহার কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হয়। দেশের জন্য পরে তাহাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। কারাবাস ও অন্যান্য দুর্গতিপ্রাপ্তি ঘটে। দেশের কাজে নিজেকে নিযুক্ত না করিয়া পূর্ণভাবে অধ্যাপনা কাজে লিপ্ত থাকিলে কালে হয়ত প্রভাস কুচবিহার কলেজের ব্রজেন শীল বা জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত খ্যাতনামা অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হইয়া শান্ত জীবন যাপন করিতে পারিত, বৃদ্ধ বয়সে অর্থকষ্টে পড়িতে হইত না। আমরা একবার প্রভাসের জন্য "রাজনৈতিক গ্লানি প্রাপ্তের" (পোলিটিকাল্ সাফারার্) পেন্‌সন্ পাওয়াইবার উদ্যোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম আত্মমর্য্যাদাশীল প্রভাসের আপত্তিতে ঐ চেষ্টা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

এখন আমি, সতীশ ও প্রভাস আত্মোন্নতির মানসিক বিভাগের অধ্যক্ষ হইলাম। ইন্দ্র, হরিশ, রঘুনাথ প্রভৃতি কার্য্যকর বিভাগসমূহের কর্ত্তা হইল।

ইন্দ্রের কার্য্য বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। দেশমধ্যে অস্ত্র সংগ্রহ ও সঞ্চালন আত্মোন্নতির প্রধান কার্য্য হইল। ভিন্ন ভিন্ন জেলায় উপযুক্ত লোক সংগ্রহ হইল। "ছাত্র ভাণ্ডার" এই কার্য্যের প্রধান সহায়ক হইল। বন্দুক ও রিভল্‌ভার দেশমধ্যে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। পরবর্ত্তীকালে দেশব্যাপী বিপ্লবী দলের ভিত্তি স্থাপিত হইল। ইন্দ্রনাথ এই কার্য্য বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত সম্পাদন করিতে লাগিল। অনেক সভ্যই রিভল্‌ভার অস্ত্রে অস্ত্রিত হইল।

আত্মোন্নতির নিয়মানুসারে অলস কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কাহারও অন্যের কার্য্যবিবরণ জানার প্রয়াস নিষিদ্ধ ছিল। এ জন্য এই অস্ত্র সঞ্চালন ব্যাপারের (গান্ রানিং) বিশদ বিবরণ আমার জানা নাই। তবে সম্প্রতি কিছুকাল হইল ইন্দ্রের কাছ হইতে একটি ঘটনার বিবরণ পাইলাম। ইন্দ্র বলিল, "একবার একটী ভাল রাইফেল বন্দুক জোগাড় করিয়া উহা বাহিরে পাঠাইবার জন্য ষ্টেশনে গিয়াছি। পুলিশ সন্দেহ করিয়া মাল শুদ্ধ গ্রেফ্‌তার করিয়া হাজতে লইয়া গেল। একজন সঙ্গী দূরে ছিল। সে ছুটিয়া গিয়া বাবাকে খবর দিল। ব্যাপারটাতে ঘাবড়াইয়া গিয়া পিতা ঠাকুর দেশবন্ধু দাশের শরণাপন্ন হইলেন। দেশবন্ধু পরামর্শ

দিলেন—আপনি ভীত ভাব দেখাইলে সমূহ বিপদ্। আপনি মিলিটারী অফিসার, খুব মুখ সাপট দেখাইয়া পুলিসে গিয়া বলুন—এ আমার বন্দুক, আপনাদের ইহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই। কর্ণেল নন্দী (আই. এম্. এস্) যোদ্ধার পরিচ্ছদে থানায় গিয়া কথা মত কার্য্য করিয়া বন্দুক লইয়া ফিরিলেন। ইন্দ্রেরা অব্যাহতি পাইল।

ডাক্তার অরূপ করের ডায়েরী

—একুশ—

ঘরে ঢুকলেন সনাতন বাবু আর তরুণ।

সনাতন বাবু বললেন—"টালিগঞ্জে গিয়েছিলাম। বারোটা বাক্সই ছিল, তা নষ্ট করে দিয়ে এসেছি।"

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে একটা শব্দে আমরা ভীষণ ভাবে চমকে উঠলাম। কে যেন বাইরে থেকে চাবি দিয়ে হল্-ঘরের দরজা খুলছে। ডক্টর চক্রবর্ত্তী ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—'তৈরী।'

বুদ্ধি বল্‌ব সনাতন বাবুর। এক মুহূর্ত্তে তিনি আমাদের আক্রমণের জন্য সাজিয়ে দিলেন। ডক্টর চক্রবর্ত্তী, অশোক বাবু আর আমি দাঁড়ালাম দরজার দু'পাশে, যাতে ঘরে ঢোকা মাত্র ডক্টর চক্রবর্ত্তী দরজা বন্ধ করতে পারেন এবং আমি ও অশোক বাবু কৃতান্তবর্ম্মা ও দরজার মাঝে দাঁড়িয়ে যেতে পারি। সনাতন বাবু তরুণকে নিয়ে জানলার পাশে লুকিয়ে রইলেন।

প্রতিটি সেকেণ্ড যেন শামুকের মত মন্থর। সিঁড়ি দিয়ে কৃতান্তবর্ম্মার দোতলায় ওঠার ধীর শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম—হয়ত সে কোনও আশ্চর্য্য ঘটনার জন্য মনে মনে তৈরী হয়েই আছে।

আমাদের ঘরেই এল। হ্যাঁ, এক লাফে সে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ল; আমরা কিছুই করতে পারলাম না। তার এই নেকড়ের মত এগিয়ে আসার, বিস্ময় ও ভয়ের ধাক্কা প্রথমেই সামলে নিলেন অশোক বাবু; তিনি চট্ করে দরজা বন্ধ করেই তার সামনে দাঁড়ালেন। আমাদের দেখামাত্র কৃতান্তবর্ম্মার মুখের উপর দিয়ে এক পৈশাচিক ক্রুর হাসি খেলে গেল, তার সূচালো মুখ আর দাঁতে খেলে গেল এক বীভৎসতা। আমরা সকলে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম; কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত আমরা ঠিক করতে পারি নি কি ভাবে আক্রমণ করব। আশাক বাবু যেন তৈরী হয়েই ছিলেন, তাঁর ধারালো কুকরি নিয়ে তিনি কৃতান্তবর্ম্মার গায়ে তার এক ঘা বসিয়ে দিলেন। আঘাতটা খুব জোরেই হয়েছিল, কিন্তু কৃতান্তবর্ম্মার হঠাৎ লাফে তেমন জোর লাগল না। আর এক সেকেণ্ড আগে হ'লে কৃতান্ত-বর্ম্মা কেটে দু'টুকরো হয়ে যেত। সেই আঘাতে শুধু তার জামা কেটে হাঁ হয়ে গেল, আর সেই জামা দিয়ে ঝন্‌ঝন্ ক'রে কতগুলো মোহর মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল। কৃতান্তবর্ম্মার মুখের আকার এত বীভৎস হয়ে উঠল যে এক সময়ে অশোক বাবুর জন্য আমার ভয়ঙ্কর ভয় করছিল; কিন্তু তিনি সমানে ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ আমিও যেন এক অসীম শক্তি অনুভব করলাম। এক হাতে মাদুলি আর সেই ফুল নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। চারি পাশ দিয়ে ঠিক এই একভাবে আক্রমণ—এক হাতে মাদুলি আর ফুল, আর এক হাতে ছোরা। সেই দানব ভয়ে এক কোণে সিঁধিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল। তার মুখে ঘৃণা আর ভয়ের রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, তার সাদা মোমের মত রঙ কেমন হলদে-নীল হয়ে এসেছে, মুখের উপর লাল কাটা দাগ কেটে যেন সমস্ত রক্ত বেরিয়ে আসছে! অশোক বাবুর হাতের নীচে ঝপ্ ক'রে বসে পড়ে কিছু মোহর তুলে নিয়েই সে লাফিয়ে পড়ল কাঁচের জানলার উপর; তার পর কাচের ঝন্‌ঝনানির ভিতর তাকে দেখলাম নীচের উঠোনে পড়ে যেতে।

ছুটে গিয়ে দেখলাম অনাহত শরীরে সে উঠে দাঁড়াল। তার পর আমাদের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠল—"ওরে শয়তান, কুকুরের দল! তোরা আমাকে ঠকাতে চাস্? তোরা ভেড়া, নয়তো তোদের এত সাহস যে আমার পিছনে লাগতে আসিস্! তোরা ভেবেছিস্ যে তোরা আমার সমস্ত থাকবার জায়গা নষ্ট করে ফেলেছিস্; কিন্তু মনে রাখিস, আমার আরও থাকবার জায়গা আছে। তবু তোদের আমি ছাড়ব না। আমার প্রতিহিংসা সবে সুরু হ'ল। তোদের আত্মীয়েরা আমার হয়ে গেছে,—এবার তোদের পালা। আমার যত অনুচর আছে—কুকুর, শিয়াল, নেকড়ে—তাদের দিয়ে তোদের খাওয়াব।"

এক লাফে সে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ডক্টর চক্রবর্ত্তী প্রথমে কথা বলতে পারলেন। বললেন— "একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ? ও যতই বড় বড় কথা বলুক না কেন, আমাদেরকে ও ভয় করে, অভাবকেও ও ভয় করে। নয়তো কেন এত তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল, কেন যাবার আগে মোহরগুলি কুড়িয়ে নিল? আর এখানে থেকে কিছু হবে না, চল, বাড়ি যাওয়া যাক্। ওখানে অলক একলা আছে।"

—বাইশ—

ডক্টর চক্রবর্ত্তীর সমস্ত ব্যাপারই যেন আলাদা। হঠাৎ আমাকে বললেন—"অলকের মুখের দিকে তাকিয়েছ?"

"হ্যাঁ, কেন বলুন তো?" একটু অবাক্ হয়েই বললাম।

বললেন—"ওর মুখটাও যেন শিবুর মুখের মত সূচালো হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ ওর কাঁধে এখন কৃতান্তবর্ম্মা ভর করেছে। আর দু'-এক দিন যদি কৃতান্তবর্ম্মা ওর রক্ত শুষে নিতে পারে তবে আর ওর বাঁচোয়া নেই, শিবুর মতই রাতের প্রেতাত্মা হয়ে তার অতৃপ্ত রক্ত-পিপাসা নিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু এখনও হয়তো সময় আছে; অলককে এখনও হয়তো বাঁচানো যায়।"

একটু থেমে বললেন, "আচ্ছা, অলককে একবার এখানে ডেকে এনে কৃতান্তবর্ম্মার কথা জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়? সে-ই হয়ত কৃতান্তবর্ম্মার সমস্ত খবর দিতে পারবে।"

"বলেন কি?" বিস্ময়ে মুখ হাঁ হয়ে গেল। "এ-ও কি কখনও সম্ভব?"

"এইটাই সবচেয়ে বেশী সম্ভব। শোন অরূপ, কৃতান্তবর্ম্মা আর কিছুই নয়—তারই প্রেতাত্মা, বিদেহী আত্মাও বলতে পার। সে আর যাই হোক্ না কেন, মানুষ নয়। সে অলকের রক্ত শুষে খেয়েছে, অলকের কাঁধে সে ভর করেছে, এখনই আমাদের উচিত অলককে 'হিপনোটাইজ্' করে কৃতান্তবর্ম্মার সমস্ত কথা জেনে নেওয়া। তুমি হিপনোটিজ্‌মের কতটুকু জান জান না, এইটুকু জেনে রাখ—যদি কোনও দানব কোনও মানুষের কাঁধে ভর করে, তবে সেই মানুষটিকে 'হিপনোটাইজ্' করে ফেললে তার নিজের সমস্ত শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, সেই দানবের আত্মা শুধু থাকে। তখন তাকে প্রশ্ন করে যা জানা যাবে—তা হবে সেই দানবেরই কথা।"

ডক্টর চক্রবর্ত্তী আর সকলকে ডেকে তাঁর সমস্ত কথা বুঝিয়ে বললেন। অশোক বাবু একটু ইতস্ততঃ করছিলেন, কিন্তু শেষে তিনিও রাজি হ'লেন। ডক্টর চক্রবর্ত্তী অলককে হিপনোটাইজ্ করতে সুরু করলেন, অলকের দৃষ্টি আকাশের এক কোণে গিয়ে আটকে রইল। কিছুক্ষণ চুপচাপ, ডক্টর চক্রবর্ত্তীর ধীর গলা শোনা গেল—"তুমি এখন কোথায়?"

উত্তর এল—"আমি জানি না। কিছুই বুঝতে পারছি না।"

আমরা নিথর, নিস্পন্দ বুকে বসে রইলাম। সকলেরই চোখে-মুখে এক অব্যক্ত ঔৎসুক্য। আবার ডক্টর চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করলেন—"বল, এখন তুমি কোথায়?"

"জানি না, জানি না। সমস্তই অচেনা, অজানা বলে মনে হচ্ছে।"

"কি দেখতে পাচ্ছ?"

"কিছুই না। চারিদিক্ অন্ধকার, ভীষণ অন্ধকার।"

"কি শুনতে পাচ্ছ?"

"ঝক্‌ঝক্ শব্দ। পায়ের তলায় যেন হাজার হাজার লোহার করতাল।"

"তবে তুমি কি রেলগাড়িতে?"

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

"তুমি এখন কি করছ?"

"আমি,—ওঃ, আমি এখন নিথর, আমি একেবারে মৃত—একেবারেই যেন নড়তে পারছি না।"

অলকের চোখে জলের ঝাপটা দেওয়ায় কিছুক্ষণ পর সে চোখ মেলে তাকাল। সনাতন বাবু বললেন—"যা শোনা গেল তাতে মনে হয় যে কৃতান্তবর্ম্মা ট্রেনে করে পালাচ্ছে। তার ভয় হয়েছে, প্রাণের ভয়ে সে আর একটা আশ্রয়ের খোঁজে পালাচ্ছে। আমাদেরও আর দেরী করা উচিত নয়। ওই ট্রেন ধরতেই হবে। কিন্তু কি করে সম্ভব?"

অশোক বাবু বললেন—"কি করে সম্ভব নয়, আমি ভীষণগড়ে থেকে যতটুকু জানি, তার আর থাকবার জায়গা নেই। আর সে-ও এইটুকু বুঝতে পেরেছে যে ভীষণগড়ে যেতে না পারলে আর তার বাঁচবার আশা নেই। সেই বাড়িতে ঢুকতে পারলে সে অজেয়; তাই সে সেখানেই যাবার চেষ্টা করবে। আমাদের ভীষণগড়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। সেখানে তাকে কিছুতেই ঢুকতে দেওয়া হবে না।"

আমি বললাম—"তরুণের মোটরে করেই বোধ হয় আমাদের যাওয়া উচিত। কারণ কৃতান্তবর্ম্মা ট্রেনে করে বেরিয়ে পড়েছে, আমরা ট্রেন ধরতে গেলে সে আমাদের একদিন আগে গিয়ে পৌঁছুবে। আমরা যদি মোটরে করে যাই, তবে আমরা হয়তো তার আগেই পৌঁছুব।"

তরুণ বল্‌ল—"হয়ত কেন, পৌঁছুবই। আমার হাতে মোটর এরোপ্লেনের মত চলবে।"

এই ব্যবস্থাই সকলের মনোমত হ'ল। (ক্রমশঃ)

বর্ষা

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

নদীভরা ঘোলা জল,
সরোবরে শতদল,
কাঁচা ধান-পাটে মাঠ ভরা,
আজি এই বরষায়
ঘাটে-পথে চলা দায়,
লোকে ভাবে ভাল ছিল খরা।

বাজ পড়ে ঘোর নাদে,—
ভয়ে শিশু ঘরে কাঁদে,—
পিতামহী কাঁদে তার সাথে;
বৃষ্টি পড়ে ঝুমঝাম,
ছাতার বেজায় দাম,
টাকা যায় ডাল আর ভাতে।

কোকিল কুলায়ে গত,
ময়ূর নাচিছে কত,—
দেখ তার লেজের বাহার;
ইলিশ মাছের সেরা
বড় বড় জালে ঘেরা,
কমে গেছে পদ্মার এপার।

ভিজিয়া চেঁচায় কাক,
পুকুরে ভেকের ডাক,
সাপ ঢোকে ঘরের ভিতর;
কেতকী কাননে হাসে,
মাতে চারিদিক্ বাসে,
বকুলের বাস মনোহর।

মালতীর মৃদু হাসি,
রম্য কদম্বের রাশি
অতীতের স্মৃতি আনে মনে,—
যবে বসুদেব-সুত
মধুর আনন্দে প্লুত
চরাতেন ধেনু বৃন্দাবনে।

তোমরাও নও যে সে,
পাঠ-অন্তে দিবাশেষে
দৃঢ় করে ধর ফুটবল;
কবে কি করিতে হবে
যোগ্য তার হও সবে,
দেহ, মন কর রে সবল।

জন্মদিন

ক্যাপ্‌টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এস্‌-সি, এম্‌. বি

ভুঁতু ওরফে অমিতাভ অনুযোগের সুরে মামাকে বল্‌লে, "দিদির ছবির বইটা আমাকে দেখতে দিচ্ছে না। আমাকেও একটা খুব সুন্দর ছবির বই দিতে হবে কিন্তু।"

মামা বল্‌লেন, "নিশ্চয়ই; তোমার জন্মদিনে পাবে।" এই বলে তিনি দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের পাতা উল্টে দেখতে দেখতে বললেন, "মে মাসের ১২ তারিখে তোমার জন্মদিনে বই পাবে।"

সীমা চট্‌ করে বলে উঠলো "হয় নি। মে মাসের ১৯ তারিখে।"

মামা বল্‌লেন "আমারও ঠিক, তোমারও ঠিক। এ কেমন করে হ'লো? বুঝলে না? ভুঁতুর নাম অমিতাভ, অর্থাৎ বুদ্ধ। যেদিন ভুঁতু জন্মেছিল সেইদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা, বুদ্ধদেবের জন্মদিন—১৯শে মে। এ বছর ১২ই মে সেই বৈশাখী পূর্ণিমা,—ভুঁতুর জন্মদিন। কিন্তু বুদ্ধদেবের জন্মদিনের সঙ্গে জড়িত বলেই মনে ক'রো না যে ভুঁতুর জন্মদিন বল্‌তে পারলাম। আমি তোমাদের সকলেরই জন্মদিন কবে বলে দিতে পারি। কাগজ, পেন্সিল নিয়ে বস সকলে। আচ্ছা, তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের আপন আপন জন্মমাসের সংখ্যাকে—অবশ্য ইংরিজী মাস হিসাবে—দুই দিয়ে গুণ কর। গুণফলের সঙ্গে পাঁচ যোগ কর। তাকে ৫০ দিয়ে গুণ কর। তার সঙ্গে তোমাদের আপন আপন জন্ম-তারিখ যোগ কর। তাই থেকে ৩৬৫ বাদ দাও। এবার এর সঙ্গে ১১৫ যোগ কর। কত হ'লো? একে একে বল, আমি লিখে নি। বেশ, শীলা—৮১৬, সেবা—১২৩১, সীমা—৬২৮, গোপাল ১২৪, আর রমেশ ১১১৭। তা হ'লে তোমাদের জন্মদিন হ'লো শীলার—১৬ই আগষ্ট; একটা নির্ঘাৎ দিনে। সেবার—৩১শে ডিসেম্বর, বছরের শেষ দিনে। সীমার—২৮শে জুন। গোপালের ২৪শে জানুয়ারী—নেতাজীর জন্মদিনে প্রায়। আর রমেশের ১৭ই নভেম্বর।"

রমেশ চেঁচিয়ে বলে উঠলো "হয় নি—হয় নি!" আর সকলে বল্লে, "ঠিক হয়েছে আমাদের।"

"রমেশ, তা হ'লে তোমারটা মিল্‌লো না কেন? নিশ্চয় অঙ্ক কষতে ভুল করেছো?"—মামা বল্‌লেন। রমেশ প্রতিবাদ করে জানাল, "আমি কত বড় বড় গুণ-ভাগ করেছি আর এই সামান্য যোগ-বিয়োগ করতে ভুল করবো?"

"দাও দেখি তোমার কাগজটা, আমি দেখছি ঠিক হয়েছি কিনা।"—বলে গোপাল তার হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে নিজে দেখতে সুরু করে দিল। "এই তোমার অঙ্ক কষা হয়েছে? ১৩৭৭ থেকে ৩৬৫ বাদ দিলে ১০০২ থাকে?" গোপাল বলে উঠলো।

"রমেশ, দেখলে, বড় বড় অঙ্ক কষতে পার কিন্তু এই সামান্য ভুলটা করে বসলে! নাও, এবার কত হ'লো? ১১২৭ কিনা? তা হ'লে তোমার জন্মদিন ২৭শে নভেম্বর।"—মামা বল্‌লেন। "সোজা কথা, তোমরা যে সংখ্যাটি পেয়েছো তার ডান দিকের দু'টি সংখ্যা তারিখ, আর বাঁ দিকের দু'টি সংখ্যা মাস বলে দিচ্ছে। শীলার বেলায় বাঁ দিকে ৮, তাই আগষ্ট, সেবার বেলায় ১২, তাই ডিসেম্বর।

"আর রমেশ, এই ভুল করায় তোমার দুঃখ করবার কিছু নেই। তুমি একলা এ অপরাধে অপরাধী নও, তোমার মত বহু আছে। পরীক্ষার সময়ে বড় বড় বুদ্ধির অঙ্ক ঠিক করে গেছে কিন্তু এমন কতকগুলো সামান্য বিষয়ে অসাবধান হওয়ায় হয়ত সব ভুল করে নম্বর খুব কম পেয়েছে। ঐ সব ছেলে-মেয়েদের ত' বোকা বলা যায় না! কেননা অন্যান্য বিষয়ে তারা বেশ ভাল নম্বর রাখে। এই অসাবধানতা তাদের ইচ্ছাকৃত নয়, মনের অগোচরেই হয়ে থাকে। এর মূলে আছে ঐ বিষয়ের সঙ্গে তার মনের আড়ি। তাই মন প্রাণ দিয়ে মিলতে পারে নি; যেমন তোমরা পার না মিলতে যখন বন্ধুদের সঙ্গে আড়ি দাও। ছেলে বেলায় কোন বিষয়ে যদি ভুল করে থাকো, আর তার জন্য বড়দের কাছ থেকে গালমন্দ বা শাস্তি পেয়ে থাকো তবে ঐ বিষয়ের প্রতি একটা আতঙ্ক তোমাদের অজানতে মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে থাকবে। এবং তারই পরিণতি হবে এই রকম ভুল। যেমন ধর, তোমার অঙ্কে ভয়—তুমি বাজার করে এসে হিসেব করলে কত খরচ হয়েছে। কিন্তু একবার করে মনঃপূত হলো না—আবার যোগ করতে গিয়ে দেখলে আগের চেয়ে হয় বেশী না হয় কম হয়েছে। আবার করলে। এই রকমে দু'-তিন বার করেও মন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলো হিসেব ঠিক হয়েছে কিনা। তুমি ইতিহাস ভাল বাস না—যতই মুখস্থ করতে চেষ্টা করছো ততই যেন সন, তারিখ সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সময়ে সময়ে এর ঘটনা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছ। ভূগোলের বেলা ত' কথাই নেই, সহরকে নদী, নদীকে পাহাড়ের দলে ফেলতে একটুও কষ্ট করতে হয় না।

"তবেই দেখ, তোমরা যখন বইএতে ঐ সব পড় তখন কেবল চোখে দেখেই গেছ, মনেতে তার দাগ ভাল করে লাগাতে পারো নি। আমরা চোখ দিয়ে দেখার চেয়ে মন দিয়েই দেখি বেশী। তাই মনকে যদি চঞ্চল করে রাখো—যে বিষয় নিয়ে পড়ছো বা যা নিয়ে চিন্তু করছো সেদিকে পূরো মনটা দিতে না পার তবে ঐ রকম ভুল করে বসবে। রমেশের মাথায় নিশ্চয়ই তখন অন্য কিছু খেলছিল তাই বিয়োগ করতে ঐ রকম ভুল করেছে। তোমাদের মন ভাবপ্রবণ। সারাদিনের মধ্যে কত রকম ভাব তোমাদের মনে আসে তার ঠিক নেই। ম্যাচ্ খেলা, কা'কে জব্দ করতে হবে, পাড়ায় প্রতিযোগিতা, বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা যাবার চিন্তা, আরও কত কি! যখন ঐ সব কোন চিন্তায় মন ব্যস্ত থাকে তখন জরুরী চিঠিখানা ডাক-বাক্সে ফেলার বদলে হয়ত পকেটেই রয়ে গেল দু'দিন!

"তোমরা হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করেছো কোন কষ্টদায়ক চিন্তা যদি মনকে অধিকার করে থাকে সারাদিন তা হ'লে রাতে ঘুমিয়ে ভয়ের স্বপ্ন দেখে হয়ত চেঁচিয়েই ওঠ। ঘুমিয়েও নিস্তার নাই। রোজ রোজ মনকে ঐ রকম কষ্টের মধ্যে রাখলে মনের স্বাস্থ্য একদিন ভেঙ্গে যাবেই। তখন সামান্য কারণেই মাথা ব্যথা, খিট্‌খিটে মেজাজ, খাবার জিনিষে অরুচি, অবাধ্যতা, উদ্ধত প্রকৃতি, পড়াশুনায় অমনোযোগিতা, দৃষ্টিক্লান্তি, কম দেখা প্রভৃতি নানা উপসর্গ এসে জড়ো হবে। ফলে লেখাপড়ায় সুনাম, চরিত্রে, ব্যবহারে সুনাম—সব যেতে বসবে। এর উপর যদি আগে থেকেই চোখ খারাপ থাকে তা হ'লে সেটা ক্রমে বেড়েই যাবে। চশমার 'পাওয়ার' ঘন ঘন বেড়েই চলবে; যেন চোখেরই যত দোষ! অথচ এই ক্রমবর্দ্ধমান দৃষ্টিশক্তির অবনতির মূলে রইল তোমাদের দুষ্টু মন।

"এদিকে যে দিন মন প্রফুল্ল থাকে সে দিন সব কাজে তোমাদের বেশ স্ফূর্ত্তি। মুখের কথা খসাতে না খসাতে কাজ শেষ করে ফেললে। পড়তে গিয়ে যে সব পড়া আগে বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল সে সব যেন জলের মত সোজা হয়ে গেল। খেতে বসে দেখলে সে দিনের রান্না যেন সব চমৎকার। আর রাতেও বেশ আরামে ঘুমিয়ে নিলে। এমন কি চোখ খারাপ থাকার দরুণ পড়তে গেলে বা সেলাই করতে গেলে মাথা ধরা সেদিন যে কোথায় গেল তার হিসাবই পাবে না।

"এ সব যে শুধু তোমাদের ছোটদের মনের বিশেষত্ব, তা নয়। সকল মনেরই এই স্বভাব—তা বড়দেরই হোক বা ছোটদের হোক। তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে, তোমাদের বাবা, মা বা মাষ্টার মশাই কারণে অকারণে মেজাজ যদি রুক্ষ করে বসেন তবে তার পেছনে আছে তাঁদের কোন মানসিক অশান্তি। আর এইটে যদি বুঝতে চেষ্টা কর তা হ'লে তোমরা নিজেরাও কষ্ট পাও না তাঁদের হঠাৎ এই আচরণের পরিবর্ত্তন দেখে। যদিও চোট্‌টা হয়ত তোমাদের ঘাড়ের উপর দিয়েই যায় বেশী। তেমনি তোমাদের আচরণে তাঁরা যদি হঠাৎ কোন পরিবর্ত্তন দেখেন যা তাঁরা তোমাদের কাছ থেকে আশা করতে পারেন না, তখন তাঁদেরও বোঝা উচিত হবে যে কোন কারণে তোমাদের মানসিক স্থৈর্য্যের কিছু অবনতি হয়েছে। তখন অযথা শাস্তির ব্যবস্থা না করে যদি তাঁরা কারণ অনুসন্ধান করে তোমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন,—পরিবর্ত্তে নিশ্চয়ই তাঁরা তোমাদের কাছ থেকে পাবেন আরও ভক্তি—আরও ভালবাসা।"

ব্যাগ-রহস্য

শ্রীতপনকুমার চক্রবর্ত্তী

হুঁ, ঢের ঢের মোটা লোক দেখেছি, কিন্তু রামহরি হোড়ের মত মোটা এ পর্য্যন্ত দু'টি চোখে পড়ল না।

কোন্ রামহরি? সেই যে সারাদিন অভূতপূর্ব্ব ক্লাবে চেয়ার যুড়ে বসে থাকে! ওখানে গেলে, অত লোকের মধ্যে সব চেয়ে আগে যে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তারই নাম রামহরি। শুধু ওর হাতীর মত চেহারাই নয়, দৃষ্টি আকর্ষন করার আর একটি কারণ আছে; সেটা হচ্ছে ওর পিঠের সুবৃহৎ ব্যাগটি। সময় নেই, অসময় নেই, সর্ব্বদা ঐ ব্যাগটি ঘাড়ে করে ও বসে আছে। মুহূর্ত্তের জন্যও ও ব্যাগটি কাছ-ছাড়া করতে রাজী নয়। শোনা যায়, রাত্রে ঘুমুবার সময়টুকুও নাকি ব্যাগটি তার কাছে কাছে থাকে। কি আছে ওর মধ্যে কেউ জানে না, এক আমি ছাড়া।

তোমরা জানতে চাও? শুধু তোমাদের খাতিরে বলতে পারি, খুব চুপি চুপি,—অবশ্য যদি বিশ্বাস কর।

আমার একটা দোষ আছে আমি সহজে কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারি না। সত্যি বলতে গেলে আমি এক রকম বন্ধুহীন। কিন্তু রামহরির বেলায় হ'ল উল্টো।

প্রথম যখন অভূতপূর্ব্ব ক্লাবে ভর্ত্তি হই, তখন প্রায়ই চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে থাকতাম। একদিন এই রকম বসে আছি। শীতের সকাল; বড় ঠাণ্ডা। চারিদিকের কুয়াসার আবরণ তখনও অপসৃত হয় নি।

একলা একলা বসে থাকতে ভাল লাগে না; এ সময়ে মানুষের মন সঙ্গ চায়। এমন সময়ে রামহরি হোড় এসে ধুপ্ করে আমার পাশের জায়গাটি দখল করে বসে পড়ল। রামহরির সঙ্গে তখনও আমার পরিচয় হয় নি। তবে দূর থেকে তাকিয়ে দেখেছি আর নামও শুনেছি।

রামহরিই প্রথম আরম্ভ করল, "আজ বড় ঠাণ্ডা পড়েছে।"

আমি বললাম—"হ্যাঁ, এ সময়ে চা খেতে বেশ লাগে।"

রামহরি তৎক্ষণাৎ চায়ের ফরমাস্ দিল। চায়ের পেয়ালা হাতে আলাপ বেশ জমে উঠল, এবং একটু পরেই 'আপনি' এসে দাঁড়াল 'তুমি'তে।

"কি বিপদেই পড়েছি ভাই, এই বিরাট শরীরটাকে নিয়ে!" চায়ের পেয়ালায় শব্দ করে চুমুক দিতে দিতে সে বললে।

তারপর নিজের সুবিশাল ভুঁড়ির ওপর হাত বুলিয়ে বললে, "কিন্তু কি করব কিছুতেই খাওয়া কমাতে পারি না। দেখ না, সকালে উঠে ডজন খানেক কমলালেবুর আর এক গেলাস আঙুরের রস, গোটা ছয়েক কলা, আর এই ধর গোটা চারেক ডিম আর ১০।১২ টুকরো রুটী—এ না খেলে আমার খিদেই মেটে না। তারপর দুপুরে খালি মাংসের ঝোল আর ভাত। তা ভাই, আধখানা পাঁঠা আমার একারই লাগে। বিকেলের আহার সকালেরই মতন সামান্য। রাত্তিরেও বেশী না, খান কুড়ি লুচি, কিছু সন্দেশ আর ক্ষীর। ভাই, এর কম খেলে কি কেউ বাঁচতে পারে? অথচ সবাই বলে—খাওয়া কমাও, খাওয়া কমাও। তুমি একটা ওষুধ বাৎলাতে পার?"

বললাম, "উপোসটাই ছিল সব চেয়ে ভাল। দেখি, ভেবে দেখি।"

আমার ঠাকুমা বড় গুণী ছিলেন। 'জরি বুটি' করে অনেকের রোগ সারিয়েছেন। সেদিন ঠাকুমার পুরোনো ট্রাঙ্ক ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ একটা হাতে-তৈরী, পুরোনো ধূলি-মলিন কাগজ পেলাম। কৌতূহল হ'ল। ভাঁজ খুলে দেখলাম লেখা রয়েছে—

ওজন কমাবার উপায়। নিম্নলিখিত ঔষধগুলির নিয়মিত সেবনে ওজন অবশ্য কমিয়া যাইবে...।

নীচে ওষুধের ফর্দ্দ। তা নাই বা লিখলাম। আর লেখার উপায়ও নেই।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল রামহরির কথা। এটা তো বেশ ওকে দেওয়া যায়! যত্ন করে রেখে দিলাম; ক্লাবে গিয়ে ওকে দেওয়া যাবে।

সেই দিনই ক্লাবে রামহরির সঙ্গে দেখা। বললাম, "একটা সুখবর আছে হে!"

"কি সুখবর?"

আমি কাগজটা তার হাতে দিলাম। পড়েই সে আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরে আর কি!

রামহরির সঙ্গে তার পরের দু' দিনও দেখা হ'ল। কিন্তু তারপর থেকে সে ক্লাবে অনুপস্থিত হ'তে লাগল। ব্যাপার কি?

প্রায় দিন পনেরো পরে হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। টেলিগ্রাম কাছাকাছি থেকেই এসেছে; করেছে রামহরি হোড়। তার পেয়েই যেন তার সঙ্গে দেখা করি। সেদিনই গেলাম তার বাড়ীতে। হাঁক-ডাক করতে মেয়েলি কণ্ঠে জবাব এল, "ভিতরে আসুন।"

গেলাম ভিতরে। রামহরির স্ত্রী ক্রন্দন-উদ্বেল স্বরে জড়িয়ে জড়িয়ে যা বল্‌ল তা থেকে বুঝলাম রামহরি একটা ঘর' বন্ধ করে তার মধ্যে আছে; বাইরে একেবারেই বেরুচ্ছে না। খালি বউকে খাবার দিতে বল্‌ছে। সে জানলা দিয়ে ধামা ধামা খাবার টেবিলের উপর রেখে দিচ্ছে। তা'তেও হ'চ্ছে না। রামহরি শুধু বকাবকি করছে আর আরো খাবার চাইছে। সে জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে তাকিয়েও রামহরিকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু তার অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। অতএব তার মতে রামহরিকে নিশ্চয় ভূতে পেয়েছে।

রামহরির ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়লাম আর প্রবলভাবে রামহরিকে ডাকতে লাগলাম। আওয়াজ শোনা গেল, "কে? সুপ্রকাশ?"

"হুঁ।"

ঘটাং ক'রে দরজা ভিতর থেকে খুলে গেল। অদৃশ্য কণ্ঠ বল্‌ল, "ভিতরে এস।"

ভেতরে ঢুকতেই আদেশ হ'ল, "দরজা বন্ধ করে দাও।"

দরজা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় তুমি?"

"ছাদের পূব কোণে।"

তাকিয়ে দেখি রামহরির মাথাটা ছাদের কোণে প্রবলভাবে লেগে আছে আর তার ধড়টা ঝুলছে শূন্যে। আমি এত বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে গেলাম যে গলা দিয়ে স্বর বেরুল না।

"পা ধরে টান।"—রামহরি কাঁদ কাঁদ স্বরে বল্‌ল।

আমার আর তখন কোন কথা জিজ্ঞেস করার মত অবস্থা ছিল না। রামহরির দু' পা দু' হাতে ধরে টান দিলাম। এক আঁটি খড়ের মতই সে ভুস্ করে নেমে এল।

"এবার আমায় ঐ মেহগনি কাঠের টেবিলটার তলায় ঢুকিয়ে দাও। ওটা বেশ ভারী।"

আদেশ পালন করতেই আবার হুকুম হ'ল, "এবারে টেবিলের ওপর থেকে খাবারের প্লেটগুলি নামিয়ে দাও।" দিতেই, আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম, সে রাক্ষসের মত গিলছে।

সমস্ত শেষ করে রুমাল চাইল।

টেবিলের ওপর থেকে রুমালটা দিলাম।

সে মুখ মুছল।

বল্‌লাম, "কি হয়েছে এবারে বল?"

হাঁপাতে হাঁপাতে সে বল্‌ল, "বল্‌ছি!

"তোমার ঐ ফর্দ্দ অনুযায়ী চলেই আজ আমার এই অবস্থা। প্রথম ক'দিন ফর্দ্দ অনুযায়ী চলতেই অনুভব করতে লাগলাম যেন ক্রমশঃ হাল্কা হয়ে পড়ছি। ১৫ দিনের দিন আমি বাতাসের 'চেয়েও হাল্কা হয়ে পড়লাম আর ভুস্ করে ওপরে উঠে গেলাম। শেষে ছাদে গিয়ে ঠেকলাম। সেদিন থেকে আমার এই অবস্থা। মনে করলাম খুব খেলে বোধ হয় ভারী হব; কিন্তু না, কিচ্ছু হ'ল না। এখন কি উপায় করা যায় তাই জানতে তোমাকে একজনের সাহায্যে টেলিগ্রাম ক'রে ডেকে পাঠিয়েছি।"

সমস্ত শুনে আমি থ' বনে গেলাম। ঠিকই তো; ওজন কমা আর মোটা রোগ সারা তো এক কথা নয়! এখন উপায়?

রামহরি কাঁদ কাঁদ স্বরে বল্‌ল, "ভাই, আমাকে কি শেষে এই ভাবেই এই ঘরেই বন্ধ হয়ে চিরকালটা কাটাতে হ'বে?"

হঠাৎ মাথায় একটা প্ল্যান এসে গেল। বল্‌লাম, "আছে, আছে, একটা উপায় আছে।"

রামহরি আশান্বিত ভাবে বলল, "কি উপায়?"

"তোমার বাড়ীতে কি কোন ব্যাগ আছে?"

"আছে, ঐ তো ওখানে ঝোলানো রয়েছে।"

তাকিয়ে দেখলাম ঘরের কোণে পেরেকের সঙ্গে একটা ব্যাগ ঝোলানো রয়েছে। আমি গিয়ে ব্যাগ্‌টা পেড়ে নিয়ে এলাম, বল্‌লাম, "আচ্ছা ভাই, লোহার ভারী কোন জিনিষ দিতে পার?"

রামহরি বল্‌ল, "ব্যায়াম করার জন্যে একটা লোহার একমণী আর একটা দু'মণী বাটখারা কিনেছিলাম। ব্যায়াম আর হ'ল কই? তবে সে দু'টো পাশের ঘরে আছে।"

পাশের ঘর থেকে সে দু'টোকে নিয়ে এসে ব্যাগে পুরলাম। তার পর ব্যাগটা রামহরির পিঠে ঝুলিয়ে দিলাম। বল্‌লাম, "টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এস।"

রামহরি এবার আর আকাশে উঠল না। দেখলাম,—নিজের বুদ্ধিতে নিজেই চমৎকৃত হয়ে দেখলাম, রামহরি দিব্যি মাটীর ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

রামহরি আনন্দে গদগদ হয়ে কেঁদে ফেলে আর কি! বার বার মেঝের ওপর হেঁটে "আঃ, আঃ, বাঁচলুম" বলতে থাকে আর আমাকে সহস্র ধন্যবাদ দেয়।

টেবিলের ওপর ফর্দ্দটা পড়ে ছিল, রামহরি হঠাৎ সেটা তুলে নিয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেল্‌ল।

আমি হাঁ-হাঁ করে উঠলাম।

রামহরি বল্‌ল, "না ভাই, ও ফর্দ্দ থাকলে আমার মত আরো দশজনের অনিষ্ট হ'তে পারে।"

আমি বল্‌লাম, "অনিষ্টটা কি? ধর, তুমি জাহাজে চড়ে যাচ্ছ, জাহাজ ডুবি হ'ল, তখন ব্যাগটি খুলে ফেলে দিলেই আকাশে উড়ে যেতে পারতে। আবার হয়ত একটা প্লেন দেখতে পেলে; তাতে চড়ে প্রাণে বেঁচে গেলে। সে ঐ ফর্দ্দের জন্যেই তো!"

তারপর থেকে রামহরিকে যথারীতি ক্লাবে দেখা যেতে লাগ্‌ল; তফাৎ খালি তার পিঠে একটি ব্যাগ ঝোলান। কেউ যদি জানতে চায় ব্যাগের মধ্যে কি আছে, তা হ'লে রামহরি তাকে খেঁকিয়ে মারতে যায়। তোমাদের কাছে সমস্ত কথা বল্‌লাম, দেখো, দুষ্টুমি করে আবার রামহরির পিঠ থেকে ব্যাগটা খুলে নিও না। তা হ'লে হয়তো হুশ করে কোথায় উড়ে যাবে, পৃথিবীতে আর তাকে পাওয়া যাবে না! *

* একটি বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে

আয়ার্লণ্ড

শ্রীঅনিলকুমার দাশগুপ্ত

তোমরা, যারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়, তারা নিশ্চয়ই জান যে সম্প্রতি আয়ার্লণ্ড স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হ'য়েছে। রামধনুতেও এ খবর তোমরা পড়েছ। গত ১৮ই এপ্রিল ডাবলিনের পথে পথে স্বাধীনতা-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। মধ্য রাত্রিতে সেই নরনারীদের কোলাহল ভেদ ক'রে ও'কোনেল সেতু থেকে ২১ বার তোপধ্বনি ক'রে জানিয়ে দেওয়া হ'ল 'আজ ঈষ্টার অভ্যুত্থানের তেত্রিশ বছর, এবং আজ থেকে আয়ালণ্ডের প্রজাতন্ত্র আইন বলবৎ হ'ল।' (১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্টার মন্‌ডেতে এক জাগরণ হয়, যার ফলে সমস্ত আয়ার্লণ্ডে গণতন্ত্র ঘোষিত হ'য়েছিল। একেই বলে্ ঈষ্টার অভ্যুত্থান)। আবার সৈন্যদলের বন্দুক থেকে ঘন ঘন শব্দ শোনা যাচ্ছে এবং গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় বাজছে তার ঘণ্টা, আর লোকের মনে জেগে উঠছে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা।

আয়ালণ্ডের এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূলে আছে তাদের সুদীর্ঘ সংগ্রামময় ইতিহাস। ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-নর্ম্মানরা আয়ালণ্ড আক্রমণ করে 'পেল্' নামে একটি জায়গা দখল করে। হেরে গিয়েও কিন্তু আয়ালণ্ড সহজে সে পরাজয় মেনে নিলে না। তারা ক্রমাগত বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ সৃষ্টি ক'রে ইংরাজকে জর্জ্জরিত করে তুলল। আয়ার্লণ্ডের এই শত্রুতার প্রতিশোধ নেবার জন্য ইংলণ্ডও এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করল। ইংরাজরা আয়ার্লণ্ডীয় জমিদারদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে বিদেশী জমিদারদের হাতে দিয়ে দিল। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সের সময়ে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড থেকে প্রটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়ের লোক দলে

দলে এসে আলষ্টারের ছ'টি জেলায় উপনিবেশ স্থাপন করল। একে ইংরিজীতে বলা হয় 'প্ল্যান্টেশন্ অব্ আল্ষ্টার' অর্থাৎ "আলষ্টার রোপণ"। এই 'রোপণ' বীজ রোপণ নয়, এ হ'ল বিদেশী জমিদার রোপণ। এই বিদেশী প্রটেষ্ট্যাণ্ট জমিদারেরা আয়ার্লণ্ডীয় রোমান্ ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়ভুক্ত প্রজাদের চিরদিনই ঘৃণার চক্ষে দেখেছেন এবং আয়ার্লণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের ফলে আয়ার্লণ্ডের ক্যাথলিক ও আলষ্টারের 'প্রটেষ্ট্যাণ্ট— এরা একত্রে একটি সঙ্ঘ গঠন ক'রে নাম দিল ''ইউনাইটেড আইরিশ-মেন্' বা মিলিত আয়ার্লণ্ডবাসী। এই দলকে বিভক্ত করার জন্য ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে 'মিলন আইন' পাশ করে আয়ার্লণ্ডে অবস্থিত স্বাধীন পার্লিয়ামেণ্ট ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল। ফলে ইংলণ্ড ও আয়ার্লণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের মিলন হ'ল বটে, কিন্তু আলষ্টার ও আয়ার্লণ্ডের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হ'ল।

এদিকে আয়ার্লণ্ডে জমি নিয়ে বিবাদ থামাবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট জমিদারদের কাছ থেকে জমি কিনে নিয়ে প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিল। ঠিক হ'ল এই টাকাটা গভর্ণমেণ্ট তাদের কাছ থেকে বছর বছর কিস্তীতে শোধ করে নেবে।

আয়ার্লণ্ড এ সময়ে 'হোম রুল্' বা স্বায়ত্তশাসন চাইল। এর উদ্দেশ্য হ'ল আয়ার্লণ্ডে স্থানীয় ব্যাপারে কাজ করার জন্য একটি নিম্ন পার্লিয়ামেণ্ট পুনঃপ্রবর্ত্তন করা। হোম রুলের নেতা চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট পারনেলের ব্রীটিশ কমন্স্ সভায় দীর্ঘ বক্তৃতায় অস্থির হয়ে প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন হোম রুল বিল আনলেন। এর ফলে তাঁর মন্ত্রিসভার পতন হ'ল। সাত বছর পরে আবার মন্ত্রী হয়ে তিনি আবার হোম রুল বিল উত্থাপন করলেন। কমন্স্ সভায় এটা পাশ হ'লেও লর্ড সভায় পাশ হ'ল না। পরে সিন ফেন দলের আন্দোলনের ফলে তৃতীয় বার হোম রুল্ বিল উত্থাপিত হয়ে পাশ হয়ে গেল।

আয়ার্লণ্ড হোম রুল পেল; কিন্তু প্রটেষ্ট্যাণ্ট আলষ্টারের তা' সহ্য হ'ল না। তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। একদল স্বেচ্ছাসেবক গঠন করে তাদের কুচকাওয়াজ শেখান হ'তে লাগলো এবং বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি হ'তে লাগল। প্রটেষ্ট্যাণ্ট ইংলণ্ড এদের সাহায্য করতে লাগল। আয়ার্লণ্ড পাণ্টা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করল। ক্রমে আলষ্টার ও আয়র্লণ্ডের স্বেচ্ছাসেবক

দলের মধ্যে গৃহবিবাদ লাগবার উপক্রম হ'ল; কিন্তু ১৯১৪ সনের মহাসমর লাগার জন্য গৃহযুদ্ধ চাপা পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে হোম রুলও চাপা পড়ল। ব্রীটিশরা জানাল হোম রুল্ কার্য্যকরী হ'বে যুদ্ধের পরে।

এই সময়ে আয়ার্লণ্ড-বাসীরা যুদ্ধে বাধ্যতামূলক যোগদানের নিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়াল।

মহাযুদ্ধের পর নির্ব্বাচনে আয়ার্লণ্ডে সিন ফেন দলই জয়লাভ করল। এই দল ১৯১৯ সনে 'আবার ডাবলিনে গণতন্ত্র ঘোষণা করল এবং তা'র নাম দিল 'ডেইল ঈরীন'। এর সভাপতি হ'লেন ডি ভ্যালেরা ও সহকারী সভাপতি হ'লেন গ্রীফিথ্ স্। এরা একদিকে বয়কট আন্দোলন ও অনশন চালাতে লাগল। অপর দিকে হিংসাত্মক গেরিলা যুদ্ধ ক'রে ইংরাজদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলল। এর দমন-কল্পে ইংরাজরা যুদ্ধ-ফেরৎ হিংসাপ্রবণ সৈন্যদের দ্বারা গঠিত ব্ল্যাক্ য়্যাণ্ড্ ট্যান্ (কৃষ্ণ ও পিঙ্গল) বাহিনীকে নিযুক্ত করল। তারা গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েও আয়ার্লণ্ডকে দমন করতে পারল না।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রীটিশ পার্লিয়ামেণ্টে অতি দ্রুত হোম রুল্ পাশ করিয়ে আয়ার্লণ্ডকে উত্তর আয়ার্লণ্ড বা "আলষ্টার" ও দক্ষিণ আয়ার্লণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হ'ল (ভারতবর্ষকে যেমন ভারত ও পাকিস্থানে বিভক্ত করা হয়েছে)। এই দু'ভাগে আবার দু'টি পার্লিয়ামেণ্ট হ'বার ব্যবস্থা হ'ল। আলষ্টারে পার্লিয়ামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'ল; কিন্তু আয়ার্লণ্ড একে সমর্থন না করে সিন ফেন পরিচালিত বিদ্রোহে মত্ত হ'ল।

১৯২১ সনে ব্রীটিশের সঙ্গে সন্ধির ফলে আয়ার্লণ্ড ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস্ পেল। এর স্বপক্ষে হ'ল গ্রীফিথ্সের দল আর বিপক্ষে হ'ল ডি-ভ্যালেরার দল। গ্রীফিথ্ স্-এর দল আইরিশ ফ্রী ষ্টেট স্থাপন করল। এ নিয়ে দুই দলে লাগল ঘরোয়া যুদ্ধ। পরস্পর পরস্পরের লোককে হত্যা করল, আর ব্রীটিশ দেখতে লাগ্ল মজা।

১৯৩২ সনের নির্ব্বাচনে ডি ভ্যালেরার দল জয়লাভ কর্ল। তখন আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ ক'রে তারা ঘোষণা করল যে, এখন থেকে আর তারা রাজার আনুগত্য স্বীকার করবে না এবং ভবিষ্যতে জমির মূল্য বাবদ কিস্তীর টাকা দেবে না। ফলে দুই দেশের মধ্যে আরম্ভ হ'ল এক অর্থনৈতিক যুদ্ধ। ইংলণ্ড আয়ার্লণ্ডের আমদানী মালের উপর অনেক শুল্ক

চাপিয়ে দিলে। আয়ার্লণ্ডও পাল্টা ইংলণ্ডের মালের উপর অত্যধিক আমদানী শুল্ক চাপিয়ে দিলে। কিছু কাল পরে একটি চুক্তির ফলে এই যুদ্ধের অবসান হ'ল। আয়ার্লণ্ডের তা'তে কিছু সুবিধে হয়ে গেল।

এবার আয়ার্লণ্ডের নামাকরণ হ'ল "আয়ার"। ১৯৩৭ সনে আয়ার্লণ্ডের নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হ'ল। তা'তে আয়ার্লণ্ডকে স্বাধীন সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হ'ল। এর প্রধান কর্ত্তা হ'লেন একজন সভাপতি। ৭ বছর অন্তর তিনি নির্ব্বাচিত হবেন। আয়ার্লণ্ড কমনওয়েলথ্ ছেড়ে দিল এবং গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রইল নিরপেক্ষ।

১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ডি ভ্যালেরা নির্ব্বাচনে হেরে গেলেন এবং জন কষ্টেলো প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হ'লেন। তার কারণ অধিকাংশের মতে পুরোনো মন্ত্রী ডি ভ্যালেরা আয়ার্লণ্ডের দাবী যথেষ্ট জোরের সঙ্গে করতে পারছেন না। সে কাজে তাদের একজন নতুন শক্তিশালী লোকের প্রয়োজন।

এই নতুন নির্ব্বাচনের ফল ফলেছে বলা যেতে পারে। সম্প্রতি ব্রীটিশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা ব্রীটিশ পার্লিয়ামেণ্টে আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পন্ন হয়ে গেছে।

কালিদাসের বাবা

(কুড়ানো গল্প)

শ্রীগৌরী দেবী

মহাকবি কালিদাস। রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার সব চেয়ে উজ্জ্বল রত্ন। কালিদাসের নাম করতে রাজা একেবারে গলে যান, দেশশুদ্ধ লোক কালিদাসের গুণে মুগ্ধ, সারা উজ্জয়িনীর গৌরব তিনি। মহাকবি কালিদাস!

কিন্তু এ হেন লোকেরও শত্রুর অভাব নেই। এরা রাজসভারই কয়েকটি লোক,—কালিদাসের এত যশ তারা সহ্য করতে পারে না, হিংসেয় জ্বলে যায়। শেষে সবাই মিলে ফন্দী আঁটতে লাগল কি ক'রে কালিদাসকে জব্দ করবে।

এখন, কালিদাস অত বড় পণ্ডিত, কিন্তু তাঁর বাবা ছিলেন একেবারে মূর্খ। লেখাপড়ার কোনও ধারই ধারতেন না তিনি। এ কথা প্রায় কেউই জানত না, স্বয়ং রাজাও না। জানত শুধু ঐ হিংসুটে লোকগুলির কয়েকজন। তারা ঠিক করল, কালিদাসের বাবাকে একদিন সভায় এনে হাস্যাস্পদ করবে, আর তা হ'লে কালিদাসেরও হবে চরম অপমান। তারা গিয়ে রাজাকে বলল, 'মহারাজ, কবি কালিদাস আমাদের রাজ্যের গৌরব কিন্তু তাঁর বাবা শুনেছি আরও বড় পণ্ডিত। তাঁকে একদিন রাজসভায় আনবার ব্যবস্থা করুন না! তাঁকে দেখে—তাঁর কথা শুনে আমরা ধন্য হই!'

রাজা বললেন, 'তাই তো, এ কথাটা তো আমার একদিনও মনে আসে নি! কবির বাবা না জানি আরও কত বড় গুণী লোক! আজই আমি কবিকে বলব।'

বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে বললেন, 'কবি, তোমার বাবাকে তো একদিন এখানে না আনলে চলছে না। শুনেছি তিনি মস্ত পণ্ডিত। তাঁকে দেখে,—তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আমরা ধন্য হব।'

কালিদাস বুঝলেন, এ নিশ্চয়ই তাঁর শত্রুদের কারসাজি। কিন্তু মুখে সে ভাব না দেখিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই। মহারাজের যখন আলাপ করার ইচ্ছে হয়েছে তখন তাঁকে একদিন অবশ্যই নিয়ে আসব বৈকি!'

দিন যায়; মুখে বললেন বটে কিন্তু কাজের বেলায় কালিদাসের আর কোন গা দেখা যায় না। এদিকে হিংসুকের দলও নাছোড়বান্দা, কালিদাসকে তারা জব্দ করবেই। রাজাকে তারা ক্রমাগত তাগাদা দিতে লাগল—'কালিদাসের বাবাকে, কই, ডাকলেন না?' অবশেষে কালিদাস বুঝলেন এবারে একটা ব্যবস্থা না করলে আর চলবে না।

বাড়ী গিয়ে কালিদাস তাঁর বাপকে সব কথা বললেন। রাজসভায় যেতে হবে শুনে বাপ তো ভয়েই অস্থির। কালিদাস বললেন, 'তোমাকে কিছু করতে হবে না, তুমি শুধু চোখ বুঁজে তন্ময় হয়ে আওড়ে যাবে "ভগবান্ ভগবান্ ভগবান্"। আমি বলব, "ইনি আজকাল ভগবানের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই করেন না; ভগবদ্ভক্তিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে গেছেন।" তা হ'লেই আর তোমাকে কেউ বিরক্ত করতেও সাহস পাবে না, কারও কথার জবাবও দিতে হবে না তোমায়। সব ফাঁড়া কেটে যাবে।'

নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজসভায় লোকে লোকারণ্য। কালিদাসের বাবা আসছেন,—না জানি তিনি কত বড় পণ্ডিত! যে যেখানে ছিল সবাই এসে জুটেছে তাঁকে দেখতে। হিংসুকের দল ভারী খুসী। আজ কালিদাসের বরাতে আছে চূড়ান্ত অপমান।

এখন, কালিদাসের বাবা তো সভায় এসে, ঐ অত লোকজন দেখে, একেবারে গেছেন ঘাবড়ে। সারা গা গেছে ঘেমে, এত ভয় পেয়েছেন যে 'ভগবান্' কথাটি পর্য্যন্ত গেছেন ভুলে। তিনি চোখ বুঁজে ভগবান্ বলতে গিয়ে আওড়াতে সুরু করলেন 'ভকর ভকর ভকর'!

সভা শুদ্ধ লোক তো অবাক্! লোকটি ভকর ভকর করছে কেন! কি মানে ওর! শুধু হিংসুকের দল ব্যাপারটা একটু আঁচ করে মুচকি মুচকি হাসছে। কালিদাসের বাবার কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—তিনি তেমনি চোখ বুঁজে বলে চলেছেন—'ভকর—ভকর—ভকর—ভকর—ভকর।'

অবশেষে রাজা আর থাকতে না পেরে কালিদাসকে ডেকে বললেন, 'কবি, তোমার বাবা কি বলছেন আমরা কেউ বুঝতে পারছি না, তুমি বুঝিয়ে দাও।'

কালিদাসও প্রথমটা খুব মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলেন বাপের কাণ্ড দেখে। কিন্তু একটু পরেই তিনি তা সামলে নিয়ে মনে মনে এর উত্তর ঠিক করে ফেলেছিলেন। রাজার প্রশ্ন শুনেই তিনি উঠে বললেন—

'ভ-কারেতে ভগবান্ অখিলের পতি,
ক-কারেতে কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলে বসতি।
র-কারেতে রামচন্দ্র হাতে ধনুঃশর,
তাই পিতা করে মোর ভকর ভকর।'

সভায় ধন্য ধন্য পড়ে গেল। এমন একজন ভগবদ্ভক্ত লোককে রাজসভায় টেনে এনে বিরক্ত করা হয়েছে ব'লে বিক্রমাদিত্য বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন। সভাশুদ্ধ লোক কালিদাস আর তাঁর বাবার জয়ধ্বনি করতে করতে বেরিয়ে গেল। হিংসুটেদের থোঁতা মুখ একেবারে ভোঁতা হয়ে গেল।

জানোয়ার কি বলে

প্রত্যেক জানোয়ারেরই একটা না একটা বুলি আছে। বিড়াল মিউ মিউ করে, কুকুর কখনও ঘেৌ ঘেৌ করে, কখনও বা করে কেঁউ কেঁউ আওয়াজ। ঘোড়া, গরু, বাঘ, সিংহ, হাতী, কাক, কোকিল—সকলেরই এই রকম একটা না একটা বিশেষ রকমের ডাক আছে। আমরা সে ডাকের অর্থ বুঝি না, কিন্তু নিজেদের মধ্যে মনের ভাব প্রকাশের জন্য ঐ শব্দগুলোই ওদের কাছে যথেষ্ট।

রূপকথায়, তোমরা পড়েছ, রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র পশুপাখীর সঙ্গে, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর সঙ্গে দিব্যি কথাবার্ত্তা বলছে। সত্যি যদি তা সম্ভব হ'ত তা হ'লে কি মজাই না হ'ত! কিন্তু শুনলে অবাক্ হবে, এমন একজন লোকের কথা জানা গেছে যিনি পশুপাখীর কথাবার্ত্তা কিছু কিছু বুঝতে পারতেন, এবং সময় সময় তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও চালাতে পারতেন। এঁর নাম রিউবেন ক্যাষ্টাং।

ক্যাষ্টাং সাহেব একজন বড় প্রাণিতত্ত্ববিদ্। সারা জীবন তিনি পশুপাখীর সঙ্গে কাটিয়ে তাদের চালচলন, ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে অসাধারণ অধ্যবসায় নিয়ে তিনি জানোয়ারদের ভাষা শিক্ষার চেষ্টা করেছেন, কিছু কিছু সফলও হয়েছেন। ক্যাষ্টাং সাহেবের নিজের দেওয়া বিবরণ থেকে তোমাদের একটুখানি উপহার দিচ্ছি।

পশুপাখীর গলার অবিকল নকল করতে পারলে শুধু যে তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করাই সম্ভব তা নয়, তাদের সঙ্গে দস্তুর মত বন্ধুত্বও পাতান যেতে পারে। অবশ্যি মনে রাখতে হবে, পশুপাখীরা সব কথাই শব্দ দিয়ে বলে না, আকারে-ইঙ্গিতে অনেক কথা জানায়। যেমন কান নাড়া, লেজ নাড়া, গা চাটা ইত্যাদি।

ক্যাষ্টাং সাহেবের মতে জানোয়ারদের ভাষায় শব্দ-সংখ্যা অত্যন্ত কম। সব চেয়ে বেশী শব্দ আছে বানরের ভাষায়—শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং প্রভৃতি সভ্য জাতের, অর্থাৎ মানুষের কাছাকাছি জীবের, ভাষায়। একই মনের ভাব প্রকাশ করতে বিভিন্ন জানোয়ার কি ভাষা ব্যবহার করে তার একটু নমুনাও তিনি দিয়েছেন।

কারো প্রতি বন্ধুত্ব-ভাব জানাতে হ'লে পশুরাজ বলবেন—'ব্‌বুটি-ম্‌মুটি'; বাঘ বলবে,

'মা-আ-র্—মা-আ-র্'; হাতী বলবে 'আঘ্—উঃ উঃ উঃ'। ক্ষিদে জানাতে হ'লে সিংহ বলবে, 'কর্র্ কর্র্,' হাতী বলবে, 'উঃ—উঁ-উঃ'।

সেকালকার চিঠি

গত বারে পুরোনো চিঠি সম্বন্ধে সামান্য যেটুকু লেখা হয়েছিল তা'তে অনেকে কৌতূহল প্রকাশ করেছ। এবারে আমাদের দেশে সেকালে চিঠিপত্রে কি রকম ভাষা ব্যবহার করা হ'ত তার একটু নমুনা দিচ্ছি। নীচের চিঠিখানা প্রাচীন বাংলা গদ্যে লেখা; ১৪৭৭ শকাব্দে (১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে) এটি লেখা হয়েছিল। লিখেছিলেন, কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণ অহোম (আসাম) রাজ স্বর্গদেবের কাছে।

"স্বস্তি সকল-দিগদন্তি-কর্ণতালাস্ফাল-সমীরণ-প্রচলিত-হিমকর-হার-হাস-কাশ-কৈলাস-প্রান্তর-যশোরাশি-বিরাজিত-ত্রিপিষ্টপ ত্রিদশতরঙ্গিনী-সলিল-নির্ম্মল-পবিত্র-কলেবর ভীষণ-প্রচণ্ড-ধীর-ধৈর্য্য-মর্য্যাদা-পারাবার সকল-দিক্-কামিনী-গীয়মান-গুণসন্তান শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ মহারাজ-প্রতাপেষু।

লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বর্দ্ধতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমারো এ গোট কর্ত্তব্য উচিত হয়। না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার উদ্ভাও চাউলিয়া শ্যামরাই ইমারাক পাঠাইতেছি। তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।"

তুমি কি জান

নীচের কথাগুলি আমরা প্রায়ই নানা জায়গায় ব্যবহার হ'তে দেখি, কিন্তু ওগুলি বলতে সত্যি কি বোঝায় তা হয়তো সকলের জানা নেই।

ফুল্‌স্ক্যাপ্—এটি একটি কাগজের মাপ। কাগজ নানা মাপের আকারে বাজারে বিক্রী হয়। লম্বায় সতেরো ইঞ্চি আর চওড়ায় ১৩½ ইঞ্চি মাপের যে কাগজ তাকেই বলা হয় ফুল্‌স্ক্যাপ্ কাগজ। ঐ নাম কি ক'রে হ'ল শোন। প্রথম যখন ঐ কাগজ বেরোল তখন ওর মোড়কের ওপরে মার্কা দেওয়ার জন্য একটা ছবি ব্যবহার করা হ'ত—ছবিটা হচ্ছে মাথায় গাধার টুপি দেওয়া এক "ফুল" অর্থাৎ বিদূষক বা ভাঁড়ের মূর্ত্তি। 'ফুলের' মাথায় টুপি বা 'ক্যাপ্'—তাই বলা হ'ত ফুল্‌স্ ক্যাপ্। সেই থেকে ঐ মাপের কাগজেরই ঐ নাম হয়ে যায়।

কড়চা—ইংরেজীতে আমরা যাকে 'ডায়েরী' বলি এটি তাই। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তরা যখন তাঁর জীবনচরিত লিখতে আরম্ভ করল তখন তার মধ্যে কতকগুলি এই ডায়েরীর মত ক'রে লেখা হ'ত। তাকেই বলত কড়চা। সংস্কৃত ভাষায় লেখা মুরারিগুপ্তের কড়চা আর বাংলায় লেখা গোবিন্দদাসের কড়চা খুব নাম-করা বই।

রায় বেঁশে—এক রকম যুদ্ধনৃত্য। সেকালে বাঙ্গালীদের মধ্যে লাঠি খেলার খুব চল ছিল। লাঠিয়াল বাঙ্গালী সৈন্যেরা লাঠি নিয়ে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করত। রায় বাঁশ নামে এক রকম বাঁশের তৈরী লাঠি এই কাজে খুব ব্যবহৃত হ'ত। রায় বাঁশ লাঠি নিয়ে যুদ্ধ-ভঙ্গীর অনুকরণ ক'রে যে নাচ তারই নাম রায়বেঁশে নাচ। এই বীরত্বসূচক নৃত্য-কলা আমাদের দেশ থেকে হয়তো ক্রমে লোপ পেয়ে যেত যদি না ব্রতচারীর প্রবর্ত্তক গুরুসদয় দত্ত মশাই বীরভূমে গিয়ে সেখানকার গ্রামবাসীদের মধ্যে এই নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে তার পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন সুরু করতেন।

হোয়াইট্ হাউস্—ওয়াশিংটনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি যে সরকারী বাসভবনে বাস করেন তাকেই বলা হয় হোয়াইট্ হাউস্। এই বাড়ীটির সাদা রংএর জন্যই ঐ নাম হয়েছে। সভাপতির বাসভবন এবং ঐ বাড়ী থেকেই সভাপতির সব নির্দেশ আসে বলে সময় সময় সভাপতির সম-অর্থেও কেউ কেউ 'হোয়াইট্ হাউস্' কথাটি ব্যবহার ক'রে থাকেন।

চিনতে পার?

নীচে একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং একটি বিখ্যাত ধর্ম্মস্থানের ছবি দেওয়া হ'ল। এদেরকে তোমাদের চেনা উচিত। বল দেখি কার এবং কিসের ছবি? না পারলে শেষ পৃষ্ঠায় উত্তর পাবে।

১নং ছবি

২নং ছবি

ম্যাজিকের কথা

যাদুকর মিঃ গসেন

[এই প্রবন্ধের লেখক মিঃ গসেন বিখ্যাত যাদুকর। ইহাদের বংশই যাদুকরের বংশ। অতি অল্প বয়স হইতেই ইনি পিতার নিকট যাদুবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করেন এবং ছাত্রাবস্থায়ই নানা স্থানে যাদুবিদ্যা দেখাইয়া খ্যাতিলাভ করেন। ইনি ভারতের বহু জায়গায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমক্ষে ম্যাজিক দেখাইয়া পুরস্কার ও প্রশংসা-পত্র লাভ করিয়াছেন; দেশ-বিদেশ ভ্রমণের সময় চীন ও ব্রহ্মদেশীয় মায়াবিদ্ ফুঙ্গীদের নিকট তাঁহাদের দেশের অনেক যাদুকৌশল শিখিয়াছেন।

যাদুকর মিঃ গসেন ও তাঁর সঙ্গী

মিঃ গসেন কলিকাতা উইজার্ড ক্লাবের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং বর্ত্তমানে ভারতীয় যাদুকর সম্মিলনীর সহ-সভাপতি। আমেরিকার "ইণ্টারন্যাশনাল ব্রাদারহুড অব্ ম্যাজিসিয়ান্স্"এরও ইনি নির্ব্বাচিত সদস্য। যাদুবিদ্যার লেখক হিসাবেও ইনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ছোটদের জন্য লেখা ইঁহার ঐরূপ একখানি বই শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমানে ইনি ৬।১, মারাঠা ডিচ লেন, কলিকাতা-৩ এ বাস করেন।]

রামধনুর প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ! এই সংখ্যায় আমি তোমাদের একটি ম্যাজিকের কৌশলের কথা বলিব। এটি ঠিক মত অভ্যাস করিয়া দেখাইতে পারিলে খুব চালাক লোককেও অবাক্ করিয়া দেওয়া যায়। ম্যাজিক শিক্ষার প্রথম অবস্থায় আমি নিজে বহু লোককে এই খেলা দেখাইয়া অবাক্ করিয়া দিয়াছি।

খেলাটি দেখাইতে হইলে দু'টি জিনিষ চাই; প্রথম— একটি কাচের বোতল, এবং দ্বিতীয়—একটি কাঁচা টাকা (নোট নয়)। প্রথমে যাদুকর একহাতে বোতল,

এবং অপর হাতে টাকাটি লইয়া দর্শকদের বলিলেন, "মশাইরা, আমার কাছে একটি সাধারণ বোতল ও একটি টাকা আছে। আপনারা একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন যে টাকাটিকে কোন রকমে বোতলের ভিতর প্রবেশ করানো যায় কিনা।" এই কথা বলিয়া যাদুকর বোতলটি এবং টাকাটি দর্শকদের হাতে দিলেন। দর্শকেরাও টাকাটিকে বোতলের ভিতর ঢুকাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যে হেতু টাকাটি বোতলের মুখের ফাঁদের চেয়ে বড়, সে কারণ হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও উহাকে বোতলের ভিতর ঢুকানো গেল না। তার পর যখন তাঁহারা অসমর্থ হইয়া বোতল ও টাকা যাদুকরের হাতে ফিরাইয়া দিলেন তখন যাদুকর দুই হাতে বোতলটি চাপিয়া ধরিয়া টাকাটিকে বোতলের ভিতর অনায়াসে ঢুকাইয়া দিলেন এবং বোতলটি নাড়াইতে লাগিলেন। টাকাটি বোতলের ভিতর গিয়া টুং টুং করিয়া বাজিতে লাগিল। সকলে অবাক্।

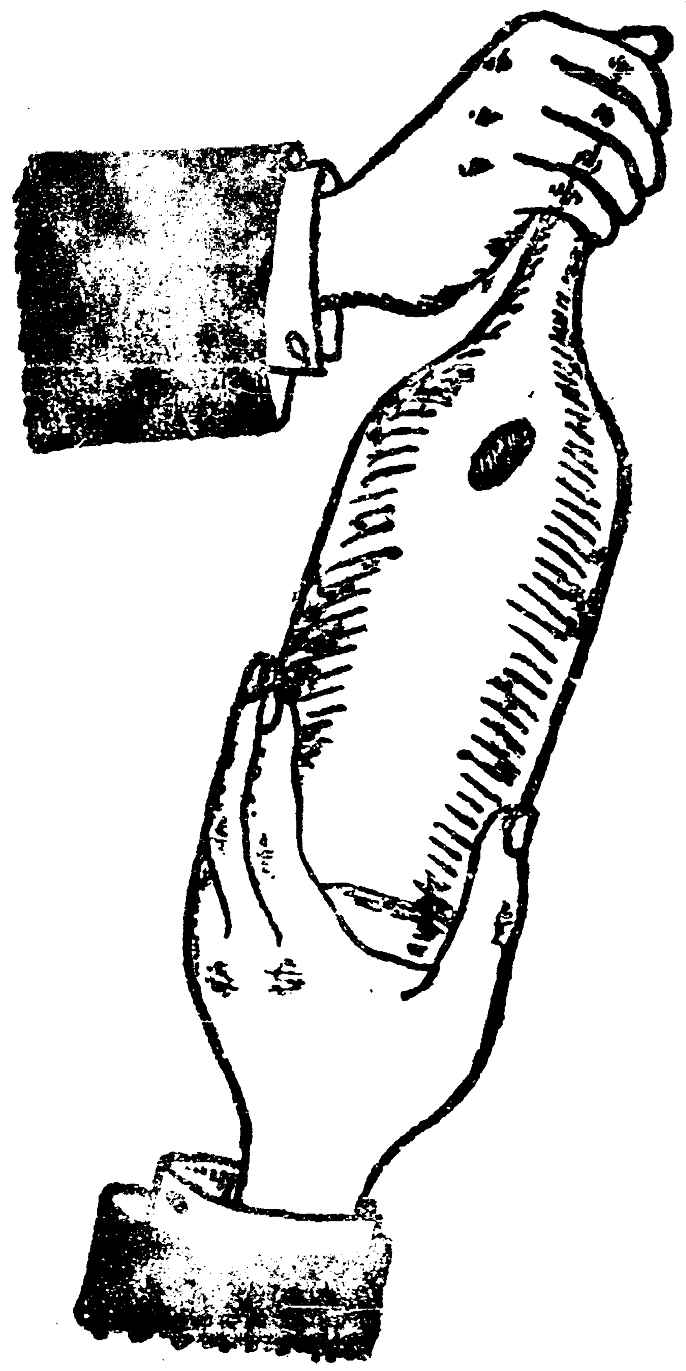

আচ্ছা, এবার খেলার মূল কৌশলটি বলি। যে টাকাটিকে বোতলের ভিতর প্রবেশ করানো হইয়াছে,—যদিও উহা দেখিতে আসল টাকার মত, কিন্তু উহা আসল টাকা নহে—একটি ফেক্ স্প্রিংএর টাকা। টাকাটির নির্ম্মাণ-প্রণালী একটু বিশেষ রকমের। ইহার মাঝখানে স্প্রিং-এর কব্জা আছে, যাহাতে টাকাটি টিপিয়া ধরিলেই উহা ভাঁজ হইয়া যায় এবং ঐ অবস্থায় উহাকে অতি সহজেই বোতলের ভিতর ঢুকানো যায়। এবং ভিতরে গিয়াই উহার ভাঁজ খুলিয়া গিয়া পুনরায় টাকার আকার ধারণ করে। বাহির হইতে দেখিলে কোন কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। এই খেলা দেখাইতে হইলে কিছু হস্তকৌশলের দরকার—যাহার দ্বারা আসল টাকাকে বদ্‌লাইয়া ফেলিয়া তাহার পরিবর্ত্তে নকল টাকাটি ব্যবহার করিতে হইবে। আমি নিজে কালো রংয়ের বোতল ব্যবহার করিতাম,

কারণ ইহাতে বোতলের ভিতরকার স্প্রিংএর টাকার কোন ত্রুটী (অবশ্য যদি কিছু হয়) বাহির হইতে নজরে পড়ে না। পরে দর্শকদের অগোচরে বোতলটি ভাঙ্গিয়া নকল টাকাটি বাহির করিয়া লইতাম।

সব শেষে একটা কথা। ম্যাজিক সাধনার জিনিষ; খেলা দেখাইবার আগে বেশ অভ্যাস করিয়া তবেই খেলা দেখাইবে। এ কথাটি কখনও ভুলিও না।

ভবিষ্যতে আরও ম্যাজিকের কৌশল তোমাদের শিখাইবার ইচ্ছা রহিল।

বাদ্‌লা দিনের গান

শ্রীসুস্নাত গংগোপাধ্যায়

কাজল-কালো সজল মেঘে বাজিয়ে মাদল বাদল এলো
নীলিম নভে ধূসর তরী বেয়ে,
মেদুর ধূমল নিটোল গগন নিতল সুখের পরশ পেলো
দিগ্বধূদের অশ্রুধারায় নেয়ে।
সুদূর নভের বিধুর বুকের মধুর সুখের কল্পনা
বিফল হ'য়ে ধরায় আঁকে অশ্রুজলের আল্পনা;
সাগর-মথন সলিল দিয়ে চল্‌ছে মেঘের জাল্ বোনা,
সজল মেঘে আকাশ গেল ছেয়ে।
বাদল এলো মেঘের তরী বেয়ে।

প্রাবৃট্-বধূ মেঘাঞ্জনের প্রলেপ মাখে নয়ন-নীলায়,
অশ্রুতে তার উষর সরস হয়,
বায়স-নয়ন-সমান-অমল জলের অঝোর নিঝর ঝরায়,
সে জল শিখীর হরষ-সুধা বয়।
গগন-পরে তড়িৎ-শিখার ত্বরিত্ লিখা অংকিত,
প্রলয়-বাজের হুহুংকারে বসুন্ধরা শংকিত;
মাতাল অলখ বেতাল-সম অনিল তাদের সংগী ত',
উদাম পদে নাচে ভুবনময়।
প্রাবৃট্-নীরে উষর সরস হয়!

কলকাতায় পণ্ডিত জওহরলাল

কিছুদিন থেকে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস দলের সদস্যদের মধ্যে নানা ব্যাপারে মনোমালিন্য চলছে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পক্ষে এটি শুভ নয়। সম্প্রতি দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনেও কংগ্রেস পক্ষের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। কংগ্রেসের প্রতি লোকের মনোভাবের কেমন যেন পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে! এরই কারণ অনুসন্ধান এবং প্রতিকারের উপায় ঠিক করবার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। প্রত্যক্ষ ভাবে সব দেখে-শুনে গিয়ে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করবেন। পণ্ডিতজী কলকাতায় এসে একটি বিরাট জনসভা আহ্বান করেন। সাংবাদিকদের মতে প্রায় ৫—১০ লক্ষ লোক এই সভায় উপস্থিত হয়ে ধীর ভাবে পণ্ডিতজীর বক্তব্য শোনে। পণ্ডিতজী প্রায় ২ ঘণ্টা বক্তৃতা দেন। সভায় সামান্য কয়েক জন উচ্ছৃঙ্খল লোক বোমা ছুঁড়ে বিশৃঙ্খলা ঘটাবার চেষ্টা করে, ফলে এক হতভাগ্য পুলিশ নিহত হয়। অবশ্যি জনসাধারণেরই চেষ্টায় আর কোন গুরুতর ঘটনা ঘটতে পারে নি।

চন্দননগর ভারত রাষ্ট্রে ফিরে এল

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের পর, এর জায়গায় জায়গায় বিদেশীদের যে সব ছোট ছোট আড্ডা আছে স্বভাবতঃই লোকের দৃষ্টি সেদিকে পড়েছে। কলকাতার অনতিদূরে চন্দননগর এই রকম একটি সহর। এটি এতদিন ফরাসী সরকারের অধীন ছিল। সম্প্রতি চন্দননগরের অধিবাসীদের মধ্যে গণভোট নেওয়া হয়েছিল তারা কোন্ রাষ্ট্রে থাকতে চায় জানবার জন্যে। শত করা ৯৯ জন লোকই ভারত রাষ্ট্রে ফিরে আসবার অনুকূলে ভোট দিয়েছে। তাই শীঘ্রই সরকারী ভাবে চন্দননগরের রাষ্ট্র পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হবে।

ছোটদের জন্য চলচ্চিত্র

ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে ছোটদের উপযোগী সিনেমার অভাব নেই, কিন্তু আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত এদিক্ দিয়ে কোন আয়োজনই ছিল না। ফলে ছোটদেরকে, সিনেমা দেখতে হ'লে, বড়দের ছবি দেখা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিছু দিন থেকে এ নিয়ে একটু-আধটু আন্দোলন হচ্ছিল বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেউ এগিয়ে আসতে সাহস পান নি। তোমরা শুনে সুখী হবে সম্প্রতি 'সোনালী স্বপন' নামে এই রকম একটি পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের ছোটদের চলচ্চিত্র তৈরী হচ্ছে। এর প্রযোজক হচ্ছেন শ্রীজীবানীতোষ ঘটক, আর পরিচালক এবং রচয়িতা হচ্ছেন শ্রীঅখিল নিয়োগী। আর একটা বড় কথা, এতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই অভিনয় করছে। সম্প্রতি অরোরা ফিল্ম ষ্টুডিওতে এই ছবিখানির মহরৎ-উৎসব সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে গেছে।

শিশুসাহিত্য সম্মেলন

বড়দের জন্য সাহিত্য সম্মেলন এ দেশে নতুন না হ'লেও পূর্ণাঙ্গ শিশুসাহিত্য সম্মেলন এদেশে নতুন। সম্প্রতি শিশুসাহিত্য পরিষদ্ কলকাতায় এই রকম একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু-সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করছেন; যথা সময়ে তার বিস্তৃত বিবরণ বেরুবে। এই উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিকরা এক জোটে মিলে রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন" নাটকখানি অভিনয় করবেন ঠিক করেছেন। ব্যাপারটি যে তোমাদের কাছে খুবই লোভনীয় এবং কৌতুকোদ্দীপক হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শীঘ্রই এ বিষয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেখতে পাবে।

উইম্‌ব্‌লড্‌ন্ টেনিস প্রতিযোগিতা

প্রবল উত্তেজনার মধ্যে উইম্‌ব্‌লড্‌ন টেনিস্ প্রতিযোগিতা শেষ হ'ল। টেনিস খেলায় ব্যক্তিগতভাবে এইটিই পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় প্রতিযোগিতা। এবারে এই খেলায় পুরুষদের সিঙ্গ্‌ল্‌স্‌এ বিজয়ী হয়েছেন টেড্ শ্রোডের। এঁর বয়স ২৭ বছর, বাড়ী ক্যালিফোর্নিয়া। মহিলাদের মধ্যে সিঙ্গ্‌ল্‌স্ এ বিজয়ী হয়েছেন কুমারী লুই ব্রও। এঁরও বাড়ী ক্যালিফোর্নিয়া, বয়স ২৫ বছর। কুমারী ব্রও গত বারেও এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছিলেন।

কলকাতার ফুটবল

কলকাতার ফুটবল লীগ্ প্রতিযোগিতা এখনও চলছে। যত দূর বোঝা যাচ্ছে, যদি

তেমন কোন অঘটন না ঘটে, তবে ১ম বিভাগে ইষ্ট বেঙ্গল দলই এবারে বিজয়ী হবে। তারা বরাবরই প্রথম যাচ্ছে এবং আজ পর্য্যন্ত, মহমেডান স্পোর্টিং ও মোহনবাগানের চাইতে যথাক্রমে ৫ ও ৭ পয়েণ্ট এগিয়ে আছে।

কলকাতার মাঠে দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খলতা দিন দিনই বাড়ছে। ইষ্ট বেঙ্গল ও এরিয়ান্‌স্-এর খেলায় রেফারী ইষ্ট বেঙ্গল দলের সমর্থকদের হাতে এমন ভাবে মার খেয়েছেন যে তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তুলে নিয়ে যেতে হয় এবং ৬ মিনিট আগেই খেলাটি পরিত্যক্ত হয়। বলা বাহুল্য এই খেলায় এরিয়ান্‌স্ দলই বিজয়ী হয়। এর প্রতিবাদে আই. এফ. এ. এক সপ্তাহের জন্য সমস্ত খেলা বন্ধ রাখেন। খেলার মাঠে এই রকম উচ্ছৃঙ্খলতা নতুন না হ'লেও কঠোরভাবে এ জিনিষ বন্ধ করার সময় এসেছে। এই উপলক্ষ্যে আর একটি কথা মনে পড়ে। কলকাতার মত বিরাট্ সহরে এত দিনেও একটি ষ্টেডিয়াম্ তৈরী না হওয়া বিশেষ লজ্জার কথা।

চতুর্থ
রুণু আর টুনু

পরের দিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই টুনু কাঁদতে কাঁদতে বায়না ধরলে, তাকে এখনি মায়ের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

পার্ব্বতী তাকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খাবার-দাবার দিয়ে কোন রকমে তার মুখ বন্ধ করলে। টুনু খাবার খেতে লাগল ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতেই।

ছোট্ট গাঁ, টুনুর কথা রাষ্ট্র হতে দেরী লাগে নি। সকালে গাঁয়ের যে যেখানে ছিল, সবাই ছুটে এল টুনুকে দেখতে।

বেশ একটি ছোটখাট জনতা। তার মধ্যে খোকাখুকী থেকে বুড়োবুড়ী পর্য্যন্ত সবাই এসে চারিদিক্ থেকে টুনুকে ঘিরে দাঁড়াল। সকলে মিলে সবিস্ময়ে টুনু সম্বন্ধে যখন মতামত প্রকাশ করছে, তখন বনের ওদিক্ থেকে কারা যেন চেঁচিয়ে বললে, "পালাও—পালাও—পাগলা হাতী, পাগলা হাতী!"

সবাই সভয়ে ফিরে দেখে, বনের ভিতর থেকে বিরাট দেহ নিয়ে হেলতে হেলতে ও দুলতে দুলতে বেরিয়ে আসছে কালকের সেই হস্তিনী! তৎক্ষণাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল জনতা। এমন কি, পার্ব্বতী ও দুখীরাম পর্য্যন্ত ভয়ে প্রায় বেহুঁস হয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দিলে দরজায়।

সেখানে একলাটি দাঁড়িয়ে রইল কেবল টুনু।

ঘরের ভিতরে ঢুকে পার্ব্বতীর হুঁস হ'ল। সে বলে উঠল,—"ঐ যাঃ, টুনু যে বাইরে!"

দুখীরাম বললে, "কি করব বল্ পার্ব্বতী? পাগলা হাতীর সামনে বেরুব কেমন ক'রে?"

পার্ব্বতী তাড়াতাড়ি আবার দরজার খিল খুলতে গেল, কিন্তু দুখীরাম তার হাত দু'টো চেপে ধরে বললে, "করিস্ কি, শেষটা কি অপঘাতে মারা পড়বি! আচ্ছা দাঁড়া, জানলা একটু ফাঁক করে দেখি, বাইরে কী ব্যাপার হচ্ছে।"

দুখীরাম জানলার কাছে গেল। একখানা পাল্লা একটু খুলে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারলে, কিন্তু বাইরে কারুকেই দেখতে পেলে না। না টুনু, না হাতী! সে সবিস্ময়ে বললে, "ওরে পার্ব্বতী, সর্ব্বনাশ হয়েছে রে, পাগলা হাতীটা টুনুকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে!"

পার্ব্বতী দরজা খুলে বেগে বাইরে ছুটে গেল। কিন্তু সে-ও টুনু বা হাতী কারুকেই দেখতে পেলে না। "টুনু, টুনু" বলে চেঁচিয়ে অনেক ডাকাডাকি করলে, কিন্তু টুনুর কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। সে তখন কাঁদ কাঁদ মুখে ধুপ করে মাটির পরে বসে পড়ল। দুখীরাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, "ভগবান্ দিয়েছিল, ভগবান্‌ই কেড়ে নিলে। আমাদের ঘরে কি ও মেয়ে মানায়? কী আর করবি পার্ব্বতী, দুঃখু ক'রে আর কোন লাভ নেই। নে, এখন ওঠ, দু'টো পান্ত ভাত দে, আমাকে অবার কাজে যেতে হবে।"

পার্ব্বতী চোখের জল মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে উঠে স্বামীর আদেশ পালন করতে গেল।

খেয়েদেয়ে কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে গেল দুখীরাম। পার্ব্বতীও কলসী নিয়ে নদীতে জল আনতে গেল।

তার পর ঘণ্টা দুই কেটে গেছে। পার্ব্বতী যন্ত্রে-চলা পুতুলের মতন ঘরকন্নার কাজ করছে বটে, কিন্তু মুখ তার ম্রিয়মাণ। মনে মনে খালি সে ভাবছে, একদিন টুনুকে পেয়ে মায়ার টানে তার জন্যে মন কাঁদছে, আর যারা টুনুর বাপ-মা, এমন মেয়ে হারিয়ে না জানি তাদের কী হালই হয়েছে!

হঠাৎ বাইরে শোনা গেল কচি শিশুকণ্ঠের কৌতুক-হাস্য। পার্ব্বতী চমকে উঠল। এক ছুটে সে দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াল। দেখলে, সেই হাতীটা আবার দুলতে দুলতে তাদের ঘরের দিকেই আসছে, আর—আর মাথার উপরে দুই হাতে হাতীর দুই কান চেপে ধরে সকৌতুকে হেসে হেসে উঠছে টুনু।

পার্ব্বতী ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে আবার ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। হাতী দাওয়ার সামনে এসে শুঁড় তুলে টুনুকে ধ'রে আবার তা'কে মাটির উপরে নামিয়ে দিলে। তারপর সে ফিরে চলল বনের দিকে।

টুনু চেঁচিয়ে বললে, "রুণু, রুণু!"

হাতী দাঁড়িয়ে প'ড়ে তার দিকে তাকালে। টুনু বললে, "রুণু! কাল আবার এসো, আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে।" হাতী চলে গেল।

পার্ব্বতী তখন ছুটে এসে টুনুকে কোলে তুলে নিয়ে বললে, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে টুনু?"

টুনু গম্ভীরভাবে বললে "বেড়াতে।"

—"ঐ হাতীটার নাম কি রুণু?"

—"হ্যাঁ।"

—"তুমি কেমন ক'রে জানলে?"

টুনু বললে,—"বা-রে, আমি আবার জানব না? আমি তো আজকেই ওর নাম রেখেছি 'রুণু'!"

—"ও! তাই নাকি? কিন্তু টুনু, অত বড় একটা পাগলা হাতীর সঙ্গে যেতে তোমার ভয় করল না?"

—"কে বললে আমার রুণু পাগলা? রুণু ভারী লক্ষ্মী। ওর সঙ্গে যেতে আমার ভয় করবে কেন? ও যে আমাকে ভালোবাসে! আমি এখন রোজ ওর সঙ্গে বেড়াতে যাব।"

পার্ব্বতী বললে, "ওর সঙ্গে রোজ বেড়াতে যাবে? বাপ-মার কাছে যাবে না?"

টুনু ভুরু কুঁচকে বললে, "হ্যাট্, তুমি ভারী বোকা, কিচ্ছু বোঝো না। আমি মায়ের কাছে গেলে, রুণুও তো আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। আমার মা তাকে কত আদর করবেন, কত খাবার খেতে দেবেন! রুণুকে আমি সে-সব কথা বলেছি।"

—"সে তোমার কথা বুঝতে পারলে?"

—"কেন পারবে না? তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ, আর আমার রুণু পারবে না?"

পার্ব্বতী হাসতে হাসতে টুনুর গালে একটি চুমু খেলে।

টুনু বললে, "খিদে পেয়েছে, খাবার দাও।"

পার্ব্বতী হাঁড়ীর ভিতর থেকে দু'মুঠো মুড়কী বার ক'রে টুনুকে খেতে দিয়ে বললে, "এখন এই খাও, একটু পরে ভাত খেতে দেব।"

—

টুনুর দেখাদেখি হস্তিনীকে আমরাও এবার থেকে রুণু ব'লেই ডাকব। অমন মস্ত জীবের এমন ছোট্ট নাম যদিও মানায় না, তবু কী আর করি বল, ওকে অন্য নামে ডাকলে হয়তো খুব রাগ করবে টুনু।

তার পর থেকে দিনে অন্ততঃ একবার করেও টুনুকে না দেখলে রুণুর চলত না। টুনুকে পেয়ে সে বোধ হয় নিজের হারিয়ে-যাওয়া বাচ্চার দুঃখ কতকটা ভুলতে পারলে।

টুনু এখন হাতীর মাথায় চড়তে খুব ওস্তাদ হয়ে প'ড়েছে। রুণু যখন শুঁড় দিয়ে তাকে টেনে তোলে, তা'র মনে ভয় হয় না একটুও। ঘোড়সওয়ার লাগাম ধরে ঘোড়াকে যেমন চালনা করে, টুনুও যেন তেমনি ভাবেই হাতীর কান ধ'রে রুণুকে এদিকে ওদিকে নিয়ে চালিয়ে বেড়াত। রুণু যেদিকে যাচ্ছে টুনুর সেদিকে যাবার ইচ্ছে না হ'লে সে দুই কানে জোরে টান মেরে চেঁচিয়ে উঠত, "এই দুষ্টু রুণু, কে তোমাকে ওদিকে যেতে ব'লেছে? এই দিকে চল।" রুণুও অমনি পরম শান্তভাবেই অন্য দিকে ফিরে টুনুর মন রাখবার চেষ্টা করত।

যাঁরা হাতী পুষেছেন, তাঁরাই জানেন, হাতীদের মত বুদ্ধিমান্ জীব

জানোয়ারদের ভিতরে আর নেই। এমন কি, মানুষের অনেক কথাই তারা বেশ বুঝতে পারে! যাঁরা কুকুর ভালবাসেন, তাঁরা জানেন যে মানুষের ভাষা কুকুরের পক্ষে খুব দুর্বোধ নয়। মানুষের ছোট ছোট অনেক কথার মানে তারা অনায়াসেই বুঝতে পারে। হাতী আবার কুকুরের চেয়েও বুদ্ধিমান্ জীব। আগেই বলেছি, রুণু কিছুকাল মনুষ্যসমাজে বন্দীজীবন যাপন করেছিল। সেই সময়েই মানুষের ভাষা ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে হয়েছিল তার অল্প-স্বল্প অভিজ্ঞতা।

বনের স্থানে স্থানে নানা ফলের গাছে ফ'লে থাকত রকমারি ফল। টুনু যখন কোন পছন্দসই ফল খাবার আব্দার ধরত রুণুর তা' বুঝতে বিলম্ব হ'ত না। সে তখনি শুঁড় দিয়ে ফল পেড়ে এগিয়ে দিত টুনুর কাছে।

একদিন একটা বেল গাছের তলা দিয়ে যেতে যেতে টুনুর বেল খাবার সাধ হ'ল। কিন্তু রুণু জানত, বেলের উপরে থাকে শক্ত আবরণ, বেল পেড়ে দিলেই টুনু খেতে পারবে না। তাই সে বেলটা পেড়ে শুঁড় দিয়েই মাটির উপরে আছড়ে মেরে আগে ভেঙে ফেললে, তার পর তুলে দিলে টুনুর হাতে।

কেবল ফল নয়, টনুর জন্যে তাকে রোজ নিয়মিতভাবেই ফুল পর্য্যন্ত সংগ্রহ করতে হ'ত। এই সব ফরমাস যে সে খুব খুশি মনেই খাটত, তা'র শান্ত ও উজ্জ্বল চোখ দু'টো দেখলেই সেটা অনায়াসে উপলব্ধি করা যেত। সবাই জানে, জানোয়ারেরা হাসতে পারে না। কিন্তু জানোয়ারেরা যে খুসি হ'লে মনে মনে হাসে না, জোর ক'রে বলা যায় না এমন কথাও। হয়ত তারা হাসে অন্য রকম উপায়ে। ঐ যে খুসি হলে কুকুরেরা ল্যাজ নাড়ে, হয়ত ঐটেই তাদের হাসবার ধরণ। হাতীদের হাসবার ধরণটা কী রকম, আমরা তা' জানি না। কিন্তু টুনুর নানান্ রকম ছেলেমানুষি দেখে রুণু যে খুব হাসতো, এটুকু আমরা অনুমান করে নিতে পারি।

রুণুর সঙ্গে বেড়াতে যেতে টুনুর ভারী ভাল লাগত। ভাল লাগবারই কথা। এখানকার দৃশ্য যে চমৎকার! পাহাড়, উপত্যকা, ঝর্ণা, নদী, সরোবর, তেপান্তর মাঠ ও ফুল-ফোটা সবুজ বন, এখানে কিছুর-ই অভাব নেই।

একদিন পাহাড়ের কাছ দিয়ে যেতে যেতে টনুর সখ হ'ল, সে পাহাড়ে চড়বে। বললে, "রুণু, আমি পাহাড়ের ওপরে উঠব।"

প্রথমটা রুণু তার কথা বুঝতে পারলে না; যেমন চলছিল, মাঠ দিয়ে তেমনি ভাবেই চলতে লাগল।

টুনু তখন রাগ করে তা'র ছোট্ট ডান হাতখানি দিয়ে রুণুর মাথায় একটি চড় মেরে বল্লে, "রুণু, তুমি হচ্ছ ভারী হাঁদারাম! বুঝতে পাচ্ছ না,

আমি ঐ পাহাড়টীর ওপরে উঠব ?" ব'লেই সে সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে আঙ্গুল দিয়ে পাহাড়টাকে দেখিয়ে দিলে।

তখন রুণু তার মনের ভাবটা ধরতে পারলে। কিন্তু বুঝেও সে এমন ভাব দেখালে যেন কিছুই বুঝতে পারে নি। কারণ, সে জানে, টুনকে নিয়ে ঐ পাহাড়ে ওঠা নিরাপদ নয়। অতএব টুনুর রাগ আর অভিমানের কোনই ফল হ'ল না, রুণু চলতে লাগল মাঠের উপর দিয়ে। (ক্রমশঃ)

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

গত বারের চিঠিতে তোমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম রামধনুতে চিঠিপত্র বিভাগ যে ভাবে চলছে সেই ভাবেই চলবে, না অন্যান্য সহযোগী শিশুপত্রিকার মত ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের চিঠির জবাব দেওয়া হবে— কোন্‌টা তোমাদের পছন্দ সে বিষয়ে মতামত জানাতে। এর উত্তরে তোমাদের কাছ থেকে বহু চিঠি পেয়েছি এবং, পেয়ে, আরও ফাঁপরে পড়েছি। কারণ কেউ কেউ পূর্ব্ব ব্যবস্থা বহাল রাখবার জন্য যেমন জোর দিয়েছ তেমনি অনেকে আবার নতুন নিয়ম প্রবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করেছ। যুক্তিতর্ক দু'পক্ষেরই আছে। কাজেই এ এক নতুন সমস্যায় পড়লাম। যাই হোক, আপাততঃ আমরা দু'দলেরই আংশিক মনস্তুষ্টি করবার ব্যবস্থা করলাম। অর্থাৎ যে সব চিঠি বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হবে সে সব ক্ষেত্রে আমরা মূল চিঠির সারাংশ দিয়ে তার ওপর মন্তব্য করব। বাকিগুলির শুধু জবাব (ব্যক্তিগত ভাবে) দেওয়া হবে। বলা বাহুল্য এর জন্য 'চিঠিপত্র' বিভাগটিকে হয়তো আরও বড় করতে হবে। তা হোক্।

শ্রীসুস্নাত গংগোপাধ্যায় লিখেছেন—'সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা, হিন্দীশিক্ষা, যে বই তোমরা পড়তে পার—এ সব আর দেওয়া হয় না কেন ?' উঃ—সব বারেই সবগুলি দিতে গেলে জায়গায় কুলোয় না। সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা বৈশাখে দেওয়া হয়েছিল, আবার সুবিধামত দেওয়া যাবে। হিন্দী শেখার প্রাথমিক অংশ—অর্থাৎ ব্যাকরণ অংশ গত বছর শেষ করে দেওয়া হয়েছে। এবারে হিন্দী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হবার পালা। বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সে ব্যবস্থা

মাঝে মাঝে করানো হবে। শ্রীপ্রমোদচন্দ্র মুস্তাফী সন্দেহ করেছেন আমাদের প্রেসেও নতুন (এবং আনাড়ি ?) কম্পোজিটরের আমদানী হয়েছে কিনা—গত বারের ধাঁধায় 'ঘীহণ' কথাটি দেওয়ায়। উঃ—কিন্তু ওটা ঠিকই আছে। ধাঁধার আনাড়ি কম্পোজিটরটি 'কতক'গুলো টাইপ নিয়ে গোলমাল করেছে, 'সব'গুলি নয়। 'ভ' কে ফেলেছে 'ঘ' এর ঘরে, 'ষ' কে 'হ'এর ঘরে, কিন্তু 'ী' বা 'ণ' ঠিক ঘরেই ফেলেছে। 'া' কেও অবশ্যি 'ী'এর ঘরে ফেলেছে কিন্তু তাই বলে 'ী' কে উল্‌টে 'া' এর ঘরে ফেলে নি। সুতরাং ধাঁধাটি ঠিকই ছাপা হয়েছিল। শ্রীঅজিত দাশগুপ্ত গত বারের "সব চেয়ে ছোট চিঠি" সম্বন্ধে জানিয়েছেন যে চিঠিখানার লেখক ভিক্টর হিউগো, বইখানা 'লা মিজারেবল্' এবং বইখানা সমালোচনার জন্য পাঠিয়ে প্রকাশককে ঐ প্রশ্ন করা হয়েছিল। উঃ—লেখক ও বইএর নাম আমাদেরও জানা ছিল কিন্তু বাহুল্য ভেবে দেওয়া হয় নি।

এবারে কয়েকখানি চিঠির ব্যক্তিগত ভাবে জবাব দিয়ে চিঠি শেষ করব।

মঞ্জুশ্রী বসু (ছাপরা)—রামধনু প্রতি মাসেই কিছু কিছু গোলমাল হয়। আমরা প্রত্যেকটি ঠিকানা ভালো ক'রে দেখে দেই, তা সত্ত্বেও কারো কারোটা খুব দেরীতে যায় বা একেবারেই যায় না। এ বিষয়ে স্থানীয় ডাকঘরে জানিও এবং তা'তেও কিছু না হ'লে ডাক-কর্ত্তৃপক্ষের কাছে প্রতিকার চেয়ে অভিযোগ ক'র। নইলে ভবিষ্যতেও ঐ রকম গোলমাল হবার ভয় আছে। আষাঢ়ের রামধনু অবশ্য একটু দেরীতে বেরিয়েছিল, শ্রাবণও তাই। আসছে মাস থেকে এ ত্রুটী সম্ভবতঃ শুধরে নেওয়া যাবে। তোমাদের ১লা আষাঢ়ের বর্ষা-উৎসবের কথা শুনে খুব ভাল লাগল। কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় (মুঙ্গের)—তোমার কবিতা পেয়েছি। কবিতাটা একটু সেকেলে ধরণের হয়েছে। এ সব ছন্দ আজকাল আর কেউ তেমন পছন্দ করে না। সুতরাং, বুঝতেই পাচ্ছ, তোমাকে আরও কিছু দিন চর্চ্চা করতে হবে। ইতিমধ্যে কিছু ভাল কবিতার বই পড়ে নিও। বিমলভূষণ রায় (কলিকাতা)—কবিতা পেয়েছি। মন্দ হয় নি, তবে আরও কিছু দিন অভ্যাস করতে হবে ছাপতে গেলে। 'চিত্রশালা' ভাল কাগজের ব্যবস্থা হলেই আবার খোলা হবে। নন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায় (দিল্লী)—লেখকদের সঙ্গে আলাপ করতে চাও ? তাঁরা করবেন কিনা ? বলা কঠিন। কেউ কেউ খুসী হবেন, কেউ কেউ হয়তো আমল দেবেন না। চিঠি লিখে দেখতে পার। আমাদের ঠিকানায় পাঠালে আমরা 'রিডাইরেক্‌ট্‌' ক'রে দেব। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (কাশী)—না, আমরা এক লোক নই। ভাল করে লক্ষ্য ক'রে দেখ নামে অনেক তফাৎ। 'ঈশচন্দ্রের' সঙ্গে 'ইন্দ্রনারায়ণ' গোলমাল করে ফেললে চলবে কেন ? সুনীল ও সুনীতি বড়ুয়া (শিলং)—রাগ করব কেন, বরঞ্চ খুব খুসী হয়েছি। মাতৃভাষাকে তো সকলেই ভালবাসে। তার প্রতি অবিচার বা অন্যায় দেখলে মনে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক এবং প্রত্যেক আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন লোকেরই তার প্রতিবাদ করা উচিত। তোমরা বুঝি ভাইবোন ? কে বড় ? শিশির দাশগুপ্ত (এলাহাবাদ)—তুমি কি ধরণের বন্ধু চাও এবং কি কি বিষয়ে আলাপ করতে চাও জানিও, চেষ্টা ক'রে দেখব। মুক্তি সর্ব্বাধিকারী (ঢাকা)—আমাকে কি বলে সম্বোধন করবে ? যার যা খুসী করে। তবে "সম্পাদক মশাই" সম্বোধনটাই তো ভাল।

আজ এই পর্য্যন্ত থাক। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। জয় হিন্দ।—রাঃ সঃ

নতুন বই

বাংলা বর্ষলিপি, ১৩৫৬ঃ সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী। সংস্কৃতি বৈঠক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। দাম ২৲

ইংরাজী ইয়ার বুকের ধরণে রচিত এই বইখানি কয়েক বছর ধরে দেশের একটা বড় অভাব দূর করেছে। এবারে এটি ষষ্ঠ বর্ষে পড়ল। নানা রকম জ্ঞাতব্য খবরে বইখানি ভরা। হাতের কাছে এ রকম একখানি তথ্যবহুল বই সর্ব্বদা থাকলে অনেক সময়েই অনেক ঝঞ্ঝাট থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। শুধু বয়স্কদের জন্যই নয়, ছোটদের কাছেও বইখানি কম প্রয়োজনীয় নয়। বাংলার ঘরে ঘরে এর প্রচলন দেখলে খুসী হব।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

চিঠিখানা এই রকম হবে :—

গত কাল বৈকালে কলিকাতায় ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। বহু গৃহের ক্ষতি হইয়াছে, বহু বড় বড় গাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। লোকও কয়েকজন আহত হইয়াছে। ঝড়ের সঙ্গে প্রচুর বারিপাত হইয়াছিল। পথে প্রায় কোমর জল দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

উত্তরদাতাদের নামঃ—নীতীশচন্দ্র বসু (ভন্) (টাকী—সৈদপুর) ; রত্না, জয়ন্ত, স্বপ্না ও ছন্দা রায় (বাঁকিপুর) ; সুস্নাত গংগোপাধ্যায় (কলিকাতা ২৬) ; কর্ম্মমন্দির মণিমেলা (মধুতটী) : প্রমোদচন্দ্র মুস্তাফী, টাটা, টুটু, টিটি (জামশেদপুর) ; উদ্ধারণকুমার দত্ত, (বেলফুলিয়া—খুলনা) ; বৈদ্যনাথ সিংহ (বেলফুলিয়া—খুলনা) ; ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান) ; বিভাসবিহারী বসু (পাটনা) ; ফুল্লরা চক্রবর্ত্তী (বালীগঞ্জ) ; আয়েষা ও ফজলুর রহমান (ঢাকা) ; চন্দ্রকুমার দে (খুলনা) ; সীতা ও গঙ্গোত্রী (নিউ দিল্লী)।

নূতন ধাঁধা

এক বাগানে ছিল ২টি আম গাছ ; আর সেখানে বাস করত এক ঝাঁক বাদুড়। বাদুড়েরা রাতদিন ভাবত কবে গাছে আম ধরবে, পাকবে, আর তারা মজা করে খাবে। অবশেষে সেই শুভদিন এল, ২টি গাছই আমে ভরে গেল—প্রত্যেকটি গাছে ১৪০টি করে আম। একটি গাছের আম পর দিনই পাকবে ; বাদুড়েরা ঠিক করল সে রাত্রেই সেগুলো সাবাড় করবে। কিন্তু ও হরি, সেদিনই দিনের বেলায় কোথা থেকে এক পাল কাক এসে বহু পাকা আম খেয়ে চলে গেল। যতগুলি কাক ততগুলি আম গেল তাদের পেটে। রাত্রে বাদুড়েরা এসে তো ব্যাপার দেখে হতভম্ব। যাই হোক্, শেষ পর্য্যন্ত বাকি পাকা আমগুলো নিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল। দেখা গেল তা'তে প্রত্যেক বাদুড়ের ভাগে একটি করে আম জুটেছে।

পর দিন পাকল অন্য গাছটির আম। কিন্তু সেই দিনই আবার এসে হাজির আর এক দল কাক। এরা সংখ্যায় প্রথম দিনের দেড় গুণ। এরাও প্রত্যেকে একটি করে আম খেয়ে চলে গেল। রাত্রে বাদুড়েরা আম খেতে এসে দেখে, যে আম পড়ে আছে তা'তে, প্রত্যেকে একটি করে নিলে, দলের তিন ভাগের এক ভাগ বাদুড় মাত্র আম পাবে। বল দেখি সেই বাগানে কতগুলি বাদুড়—ছিল ?

চিনতে পার (২০৯ পৃঃ)র উত্তর—১নং—৺সুকুমার রায়, ২নং—অনুরাধপুরের ডাগোবা।

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

ছেলেমেয়েদের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পূজা-বার্ষিকী

পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে

✻ গল্প কবিতা নাটক ✻

✻ আনন্দের খনি ✻

✻ অসংখ্য চিত্রের অ্যাল্‌বাম্‌ ✻

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ও চিত্র-শিল্পীদের সমবায়ে গড়িয়া উঠিতেছে

✻ দেব সাহিত্য-কুটীর, ঝামাপুকুর, কলিকাতা—৯ ✻

এবারও পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হবে

দেশবিদেশের লেখা

(৪র্থ খণ্ড)

অন্যান্য বারের মতই নানা বিভাগে সমৃদ্ধ—সাহিত্য, কল্পনা, উপন্যাস, বিপ্লব, পর্যটনা, কাহিনী, আলেখ্য, আরও কত কি !

সারা বিশ্বের বিপ্লবী সংগ্রামের টুকরো টুকরো শ্রেষ্ঠ ছবি। সঙ্গে রাজনীতি, সমাজনীতিরও গোড়ার কথা সহজ করে বলা। দেশবিদেশের রূপকথার ভাণ্ডার জড়ো করা হয়েছে এর এ ক'টি পৃষ্ঠায়।

পৃথিবীর এই সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথীর নাম শোন নি—
ম্যাক্সিম গর্কী, আনাতোল ফ্রান্স, এইচ. জি. ওয়েলস্‌, হ্যান্স এণ্ডার্সন, কার্লো কলদি, হাওয়ার্ড ফাষ্ট, জ্যাক লণ্ডন, জুলিয়াস ফুচিক, প্যাট্রিক হেনরী, কিকেরো—?

পরিচয় জানো—ভিয়েৎনাম—আর সগুমুক্ত চীনের? বিজ্ঞানের সামাজিক দায়িত্ব কতটুকু বলতে পারো? জে. ডি. বার্ণাল দিচ্ছেন তার উত্তর।

আর পাবে ছোটদের শিল্পসৃষ্টির পরিচয়। তোমাদেরই আঁকা ছবির চয়ন।

সম্পূর্ণ নূতন—বলিষ্ঠ—সঞ্চয়ন

কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়েই আজই তাগাদা করো।

Regd.No. C—1641

রামধনু-সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

নতুন সংস্করণ

দাম একটাকা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

রামধনু

২২শ বর্ষ
দ্র, ১৩৫৬
ষান্মাসিক ২৷৹
তি সংখ্যা ।৶৹

তীন্দ্রনারায়ন ভট্টাচার্য্য, এম. এস. সি

INTENTIONAL
EXPOSURE

শীগ্‌গিরই বেরোবে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
ছোটদের বিশ্বকোষ
বিস্তৃত বিবরণের জন্য অপেক্ষা কর।

কবি প্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু)
সম্পাদিত কৈশোর মাসিক
"ভাই-বোন"
১৩৫৬ সালে বৈশাখে ৬ষ্ঠ বর্ষ সুরু

অন্য মাসিক নিলেও 'ভাই-বোন' নেওয়া যায়, কারণ এ পত্রিকাখানি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের ভাই-বোন পছন্দ করে আট থেকে আশী বছর বয়সের পাঠক-পাঠিকা। এ ধরণের কা তোমরা দেখো নি। বাংলা দেশের প্রথম চিঠি—"কাকাবাবুর চিঠি"র আকর্ষণ অসাধারণ— দিলেই বুঝতে পারবে। নমুনার জন্য ।৵০ আনার ডাকটিকিট পাঠাও। বার্ষিক ৪৲, ষা সিক ২।০, প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা। বিবরণের জন্য লেখো :—কার্য্যাধ্যক্ষ ভাই-বোন, ঈশ্বর মিল লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা ৬।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তাতা থৈথৈ—তাতা থৈথৈ—তাতা থৈথৈ

সুইডেনে কো-অপারেটিভ সোসাইটি পরিচালিত 'জিম্' অর্থাৎ নৃত্য-ব্যায়াম-কেন্দ্রে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নাচ শিখছে (পৃঃ ২৫২)

রামধনু

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরক্ষিত

২২শ বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৫৬ | ৫ম সংখ্যা

রূপকথার রাজ্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

মাঠেতে ফুটিছে ঝিঙ্গাফুলগুলি,
শিউলি ফুটিছে আঙিনায়,
আঁধারে জাগিছে রূপের রাজ্য—
আয়রে দেখিতে যাবি আয়।
তেপান্তরের মাঠ দিয়ে হায়,
পক্ষিরাজ যে ছারতকে যায়,—
তালপত্রের খোলা তলোয়ার
ঝকমক করে আলোছায়।

২

বিহঙ্গমা ও বিহঙ্গমীরা
বাস করে গাছে পাকুড়ের,
রাক্ষস, নর, পরীর সঙ্গে
দেখা পাওয়া যায় ঠাকুরের।
সেখানেতে রয় চলুন্তি গাছ,
মণির কৌটা গিলে ফেলে মাছ,
সত্যাই হয় তের হাত বীচি
সেথা বার হাত কাঁকুরের।

৩

কথা যাহা বলে—কল্পনা তারে
ঢাকে অপরূপ সুষমায়,
শিল্পী পারে না ধরিতে রঙেতে,
কবির ছন্দে, উপমায়।
সে মাধুরী খর আলোকে শুকায়,
মোহিনী সে মায়া বুকেতে লুকায়,
সে আকাশ ঘেরা কল্পলতিকা
ভুবনকে করে শোভাময়।

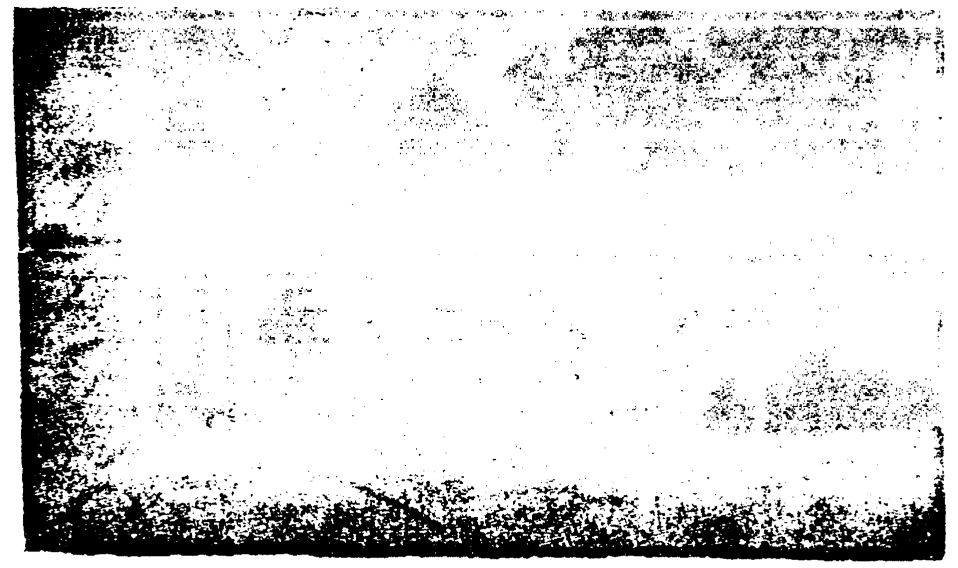

হে বীর, প্রণাম করি

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—উনচল্লিশ—

বন্দী গ্রীক-সম্রাট্‌কে পুষ্পমিত্রের সামনে উপস্থিত করা হ'ল।

নাগসেন সেখানে ছিলেন, পুষ্পমিত্র কিছু বলার আগেই নাগসেন কথা বললেন।—সম্রাট্, আপনি নিজেকে বন্দী বলে মনে করবেন না, সম্রাট্ সেকেন্দার পুরুরাজের প্রতি যে ব্যবহার করেছিলেন আমরা আজ সেই ঋণ শুধতে চাই। আপনি আজ আমাদের বন্ধু হ'লেন। তবে আমি একদিন আপনার কাছে যে ভিক্ষা চেয়েছিলাম, আজ আবার তার পুনরাবৃত্তি করছি,—আপনার জিঘাংসা, আপনার হঠকারিতা, আপনার আত্মাভিমান আপনি আমাকে দান করুন, আমি ভিক্ষা চাইছি!

মিনান্দার নিজের অবস্থা ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারলেন না, সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললেন,—এ কি আপনার আদেশ, না অনুরোধ?

নাগসেন বললেন—আপনাকে আদেশ করার মত অহংকার আমার নেই সম্রাট্, ভগবান্ তথাগতের নামে আপনার চরিত্রের দোষগুলি আপনি আমাকে ভিক্ষা দিন!

—আপনি কি আমাকে আপনার সঙ্ঘভুক্ত করতে চান?

—আপনার যদি সেই ধারণাই হয় সম্রাট্, আপনি স্বচ্ছন্দে অস্বীকার করতে পারেন। উত্তরাপথের ধর্মচক্রের নামে আমি আপনাকে মুক্তি দিলাম। তবে একটা কথা, চলে যাবার আগে আপনাকে শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে যেতে হবে যে আপনি আর নররক্তে ধরণী কলুষিত করবেন না। রাজার কাজ প্রজা পালন করা, প্রজা নাশ করা নয়। এবং আজ থেকে আপনি আপনার রাজ্য মধ্যে প্রজাদের সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করবেন।

—তা হ'লেই আপনি আমাকে মুক্তি দেবেন, রাজ্যও ফিরিয়ে দেবেন?

—নিশ্চয়ই।

—মগধ-সম্রাট আপনার এই নির্দেশ মান্য করবেন তো?

—উত্তরাপথের ধর্মচক্রের নির্দেশ অমান্য করবেন হিন্দুস্থানে এমন কেউ নেই সম্রাট্!

—কিন্তু পরে আমি যদি আমার প্রতিজ্ঞা না রাখি?

—আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, সম্রাট্!

—বেশ, আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।

—উত্তম, উত্তরাপথের ধর্মচক্রের নামে আমি আপনাকে মুক্তি দিলাম। পুষ্যমিত্র, তুমি সম্রাটের তলোয়ার ফিরিয়ে দাও!

পুষ্যমিত্র মিনান্দারকে তলোয়ার ফিরিয়ে দিলেন।

নাগসেন বললেন,—চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি সম্রাট্!

নাগসেন সম্রাটের হাত ধরে অগ্রসর হ'লেন। সামনেই শূন্য প্রান্তর। রণক্ষেত্র। অসংখ্য মৃত ও মুমূর্ষু পড়ে আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আহতের সেবা করছে। নাগসেন বললেন—এদের পানে একবার দৃষ্টিপাত করুন সম্রাট্! এতগুলি মানুষের দুঃসহ দুঃখের কারণ হয়েছেন আপনি। আপনার সামান্য ইচ্ছা পূরণের জন্য এরা জীবন দিল। যারা কোন রকমে প্রাণে বাঁচবে তারা কেউ বা অঙ্গ হারাবে, কেউ বা হবে সারা জীবনের মত পঙ্গু। অথচ আপনি এদের জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করলেন সম্রাট্?

—প্রজারা চিরদিনই রাজার জন্য প্রাণ দেয়, এতে এমন বিচিত্র কি আছে?

—এই সব জনগণের দুঃখ যদি আপনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতেন সম্রাট, তা হ'লে নিজেকে এদের চেয়ে মূল্যবান্ বলে মনে করতেন না, এদের জন্য আপনিও প্রাণ দিতে প্রস্তুত হ'তেন। রাজা যখন প্রজার জন্য প্রাণ দেয় তখন তারা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে, যেমন শাক্যমুনি, যেমন মহারাজ ধর্মাশোক। আপনিও সেই সব মহাপুরুষের মত নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারেন সম্রাট্! সে ইতিহাস নরহত্যার রক্তে রাঙানো হবে না, তা হবে শ্রদ্ধা ও সম্মানে আপ্লুত। আপনি কি চান না প্রজাসাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মান পেতে?

—অর্থাৎ আপনি বলতে চান্ আমি সন্ন্যাসী না হ'লেও আপনার শিষ্য হ'তে পারি!

—আপনি যদি আমার কথার সেইরূপ অর্থ করেন তা হ'লে বলার আর কিছু নেই সম্রাট্, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

সহসা সম্রাট্ এক আহতের সামনে এসে দাঁড়ালেন, লোকটি তাঁর একান্ত অনুগত পার্শ্বচর। এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাকে ধীরে ধীরে জল পান করাচ্ছিল। সম্রাট্ জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি কোথায় আঘাত পেয়েছ মিলো?

মিলোর মুখে ঘৃণা ফুটে উঠলো, সে ধীরে ধীরে বললো,—তুমি হ'লে দিগ্বিজয়ী, তোমার জন্য আমি প্রাণ দিচ্ছি! আর তুমি আমার জন্য কি করলে? তোমার জন্য প্রাণ দিয়ে আমরা কি পেলাম? স্বার্থপর! শয়তান! নরঘাতক!

গালাগালি শুনে মিনান্দার তলোয়ারে হাত দিলেন, নাগসেন হাত চেপে ধরলেন, বললেন,—মুমূর্ষুকে আঘাত করা রাজধর্ম নয়, সম্রাট্!

মিনান্দার চিন্তিত মুখে অগ্রগামী হ'লেন। নগরীর উপকণ্ঠে প্রান্তর। দিগ্বলয়ে গাছের

সারি আকাশের কোলে সবুজের কাজল-রেখা এঁকে দিয়েছে। ধূসর প্রান্তরে এলোমেলো জেগেছে সবুজ ঘাসের শ্যামলিমা। দূরে এক ঝাঁক বকের মত গ্রীক সেনাদের শিবির। সম্রাট সেই দিকেই অগ্রসর হ'লেন। পদব্রজে চলার অভ্যাস ছিল না, বন্ধুর প্রান্তর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মিনান্দারের গতি শ্লথ হয়ে এলো।

একটি লতাকুঞ্জ পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সহসা কোথা থেকে একটি তীর এসে সম্রাটের বাহুতে লাগলো। দেহে বর্ম ছিল না, তীরটি বাহু ভেদ করলো। নাগসেন তখনই ক্ষিপ্রহস্তে তীরটি বার করে দিলেন, রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য নিজের উত্তরীয়ের প্রান্ত ছিঁড়ে ক্ষতস্থানে পটি বাঁধতে বসলেন।

ইতিমধ্যে সামনের বৃক্ষকুঞ্জ থেকে একটি লোক বাহির হয়ে এলো। সশস্ত্র গ্রীক সৈনিক। কাছে এসে বললো,—মরে নি এখনও! পাপীর মৃত্যু সহজে হয় না, আরও আঘাত করতে হবে!

মিনান্দার চিনলেন, বললেন,—তুমি! থিওডোকাস? তুমি আমাকে আঘাত করলে? কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই?

—কৃতজ্ঞতা! কিসের কৃতজ্ঞতা! শত শত সেনা রাজার জন্য প্রাণ দেয়, শত সংসার অনাথ হয়। রাজা রাজ্য জয় করে ফেরেন কিন্তু সেই সব সৈনিকেরা কি পায়? আমার ভাই যখন মাধ্যমিকার যুদ্ধে নিহত হ'ল, মাধ্যমিকা জয় করার পরে আপনি তার ছেলেমেয়েদের জন্য কি করেছেন? তার প্রাণদানের জন্য কি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন? আর আমি আপনার কাছে মাইনে নিয়েছি বলেই আমাকে কৃতজ্ঞ হ'তে হবে? কেন? বেতনের বদলে আমি আপনার কাজ করি নি?

—কৃতজ্ঞ না হ'তে পার, কিন্তু গুপ্ত ঘাতক হবার কারণ কি?

—অর্থ। যে জন্য আপনার কাছে দাসত্ব করেছিলাম—সামান্য বেতনের বিনিময়ে এই দূর দেশে মানুষ খুন করতে এসেছিলাম, ঠিক সেই জন্য। তবে তখন খুন করতাম অজ্ঞাত, অখ্যাত লোকদের, এখন খুন করতে চাই একজন সম্রাট্কে। সেইজন্যই আপনি নরহত্যার জন্য যে দাম দিতেন, আপনার সেনাপতি তার চেয়ে অনেক বেশী দাম দিচ্ছে আপনাকে হত্যা করার জন্য। আপনি পাইকারী হত্যার জন্য দাম দিতেন মাসিক দশ সুবর্ণ, আর এখন শুধু আপনাকে খুন করার জন্য আমি পাব সহস্র সুবর্ণ। আমার সারা জীবনের অন্নসমস্যা মিটে যাবে।

—আমার সেনাপতি তোমাকে নিযুক্ত করেছেন? আমাকে খুন ক'রে তাঁর লাভ?

—লাভ? আপনার সাম্রাজ্য। আপনি নিহত হ'লে সেনাবাহিনী যার হাতে তিনিই রাজ্য ভোগ করবেন।

—আমি যদি তোমাকে দ্বি-সহস্র সুবর্ণ দিই তুমি সেই সেনাপতিকে হত্যা করতে পারবে?

—আমি বড়লোকের কথায় আর বিশ্বাস করি না সম্রাট্! সুবিধা পেলে আপনিই হয়তো আমাকে গুপ্ত ঘাতকের হাতে সমর্পণ করবেন। আপনি যদি এখনই আমাকে সহস্র মুদ্রা দেন, তা'হলে আমি আপনার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারি।

—এখনই চাই?

—হ্যাঁ, এখনই।

—কিন্তু আমার কাছে তো এখন কিছুই নেই! তুমি আমার সঙ্গে আমার শিবিরে চল।

—না, আপনার সঙ্গে আমি কোথাও যাব না।

নাগসেন এবার বললেন,—প্রয়োজন হ'লে আমি আপনাকে অর্থ দিতে পারি সম্রাট্! কিন্তু অর্থ দিয়ে আপনি ক'জনের চিত্ত জয় করবেন? থিওডোকাস্‌কে হয়তো আপনি টাকা দিয়ে কিনলেন, কিন্তু আপনার সেনাপতি অর্থ দিয়ে আরো অনেক থিওডোকাস্ সংগ্রহ করতে পারবেন। আপনি এখন এই অসুস্থ দেহ নিয়ে শিবিরে যাবেন না, আমার সঙ্গে বিহারে চলুন। কয়েকদিন পরে সুস্থ হ'লে আমরা আপনাকে সকোলায় পৌঁছে দেব।

থিওডোকাস্ বললো,—কিন্তু আমার অর্থ না পেলে তো আমি যেতে দেব না!

—তুমি আমার সঙ্গে এস থিওডোকাস্।

—থিওডোকাস্ সন্দিগ্ধভাবে নাগসেনের মুখের পানে তাকালো।

নাগসেন হেসে বললেন,—আমি সম্রাট্ নই, আমি সন্ন্যাসী। আমার কথায় তুমি বিশ্বাস করতে পার।

পটি বাঁধা শেষ করে নাগসেন মিনান্দারকে নিয়ে বনপথ ধরলেন। থিওডোকাস্ সঙ্গে চললো।

(ক্রমশঃ)

খোকাবাবু

শ্রীনগেন্দ্রকিশোর নান্‌সী, বি. এ

খোকাবাবু দোল খায় দোলনায়,
নিদ-বুড়ী নিদ আনে আঙিনায়;
অপরূপ স্বপনের পিঁজরায়
নবনীর ডেলাটুকু ঝলকায়।

নয়নের ফুলঝরি- ঝর্ণায়
লাবণির বিদ্যুৎ চমকায়;
আধ বুলি অধরের কিনারায়—
কাকলীর কলতান মূরছায়।

স্বরগের পারিজাত এ ধরায়—
সাহারায় কে আনিল মলয়ায়?
মরি মরি সুরভিত জ্যোছনায়
অফুরান প্রাণরস উছলায়।

ডাক্তার অরূপ কল্পের ডায়েরী

—তেইশ—

তরুণের মোটর হাওয়ার মত উড়ে চলল। সকলের মুখই আসন্ন যুদ্ধের জন্য কঠিন হয়ে উঠেছে। দু'-একবার শুধু নদী পার হওয়া ছাড়া আমাদের আর বিশ্রাম করার সময় ছিল না। নৌকোয় ক'রে মোটর পার করা কি বিরক্তিকর! সব সময় মনে হচ্ছিল হয়ত কৃতান্তবর্ম্মার সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় আমরা হেরে যাব।

আমরা পার্ব্বত্য-আসামের মধ্যে এসে পড়েছি। চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়, আর ঘন বন। তার মধ্যে দিয়ে মোটর ছুটে চলেছে। চাকার ঘায়ে কত পাথর ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে, কত শুকনো পাতা মচ্ মচ্ করে উঠছে! চারিপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে কারও নজর নেই।

হঠাৎ অলক বলল—"আমি সবই বুঝতে পারছি। আপনারা আমার জন্য যে এত করছেন—তা'ও বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনাদের আমার একটা কথা রাখতে হবে।"

অশোক বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কি কথা, অলক?"

অলক বল্‌ল—"আমি এখন বুঝতে পারছি শিবুর কি হয়েছিল। আমি নিজের শরীর ও মন দিয়েই বুঝতে পারছি—শিবুর কি হয়েছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত শিবু কি পেয়েছে।

আমি বুঝতে পারছি,—আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে আমারও হয়ত তা'ই হবে। তাই আমার অনুরোধ, যখনই আপনাদের বিশ্বাস হবে যে এই ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে আমার মরা-ই ভাল, তখনই আপনারা আমাকে মেরে ফেলবেন।"

গভীর নিস্তব্ধতা।

অলকের ব্যগ্র গলা শোনা গেল—"বাবা!"

অশোক বাবু নিরুত্তর। সনাতন বাবুর কথা শোনা গেল—"আমি কথা দিচ্ছি অলক, আর কেউ কিছু করুক আর না করুক—আমি তখন তোমাকে মেরে ফেলব। তোমার জন্য আমার কষ্ট কারও চেয়ে কম হবে না, কিন্তু আমার হাতও কাঁপবে না।"

"আমিও তাই বলছি," ডক্টর চক্রবর্ত্তী ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠলেন।

"আমারও ওই এক কথা,"—মোটর চালাতে চালাতে তরুণ উত্তর দিল।

আমি আর অশোক বাবু অলকের কাঁধে দৃঢ় অথচ আস্তে হাত দিয়ে চাপ দিলাম।

আবার সব চুপচাপ। অশোক বাবুকে একটু উত্তেজিত দেখা যাচ্ছে, চারিপাশে তিনি তাকাচ্ছেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—"আমরা এসে গেছি। হ্যাঁ, ওই যে রেল-লাইন দেখা যাচ্ছে। লাইন ধরে এগোলেই ষ্টেশন।"

কিছুক্ষণ পরে আমরা ষ্টেশনে এসে থামলাম। সেই ষ্টেশন মাষ্টার হঠাৎ অশোক বাবুকে দেখে থমকে গেলেন, বললেন—"আপনি! আপনি বেঁচে আছেন? কিছু হয় নি ত'?"

অশোক বাবু উত্তর দিলেন—"সে কথা পরে বলব। ট্রেন এসে গেছে কি?"

তিনি উত্তর দিলেন—"না। তবে আর বেশী দেরী নেই। আগের ষ্টেশন থেকে গাড়ি ছেড়েছে সে খবর পেয়ে গেছি। আপনারা বসুন।"

ট্রেন এল। কেউ নামল না। সমস্ত কামরা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কোথাও সেই প্রকাণ্ড কাঠের বাক্স নেই। তবে?

ডক্টর চক্রবর্ত্তী ষ্টেশন মাষ্টারকে বললেন—"মাষ্টার মশাই, বড় বিপদে পড়েছি। আপনি একবার একটা খবর নিন যে আগের ষ্টেশনে একটা মস্ত কাঠের বাক্স নেমেছে কিনা।"

মাষ্টার মশাই ফোন্‌টা ধরলেন। কিছুক্ষণ পরে এসে বললেন—"হ্যাঁ, একটা মস্ত কাঠের বাক্স কয়েকজন লোক এসে নামিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু কি ব্যাপার?"

তাঁকে যত দূর সংক্ষেপে সব কথা বলা সম্ভব বলা হ'ল। তিনি সব শুনে বললেন—"আমি এতদূর না জানলেও কিছু কিছু জনশ্রুতি শুনেছিলাম। তাই এর আগের বার আমি অশোক বাবুকে ভীষণগড়ে যেতে মানা করেছিলাম। কিন্তু এবার আর মানা করব না, বরং আপনাদের দু'-চারটে কথা বলি। আগের ষ্টেশন থেকে ভীষণগড়ে যাবার দু'টো পথ আছে। একটা হচ্ছে সোজা রাস্তা দিয়ে, আর একটা হচ্ছে নদী দিয়ে কিছুদূর গিয়ে তারপর ডাঙায় উঠে রাস্তা ধরে আসা। যদি কৃতান্তবর্ম্মাকে ধরতেই চান, তবে দু'টো পথেই তাকে ধাওয়া করতে হবে। কিন্তু পথ বড় দুর্গম। কৃতান্তবর্ম্মা যদি নদী দিয়ে গিয়ে থাকে, তবে আপনাদেরও এখান থেকে নদী ধরেই এগোতে হবে। ছোট নৌকো অথচ বেশী ক'জন মাঝি নিলেই হয়ত ধরতে পারবেন। আর রাস্তা দিয়ে যদি গিয়ে থাকে তো আপনাদের ঘোড়া ভাড়া করতে হবে। এখানে ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়। তবে ভাল ঘোড়ায় চড়া জানা চাই।"

তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। আমি, অশোক বাবু, তরুণ, সনাতন বাবু সকলেই বললাম—"আমরা তা পারব।"

ডক্টর চক্রবর্ত্তী বললেন—"ওটা আমার দ্বারা হবে না। তাই আমার মনে হয় তোমাদের মধ্যে দু'জন নৌকো নিয়ে ওর পিছনে তাড়া কর, আর দু'জন ঘোড়া নিয়ে ছোট। আমি আর অলক এখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে জঙলা গ্রাম হয়ে ভীষণগড়ে যাবার চেষ্টা করি। তোমাদের হাতে বন্দুক যখন আছে, তখন বুনো পাহাড়ী আর নেকড়ে দেখে ভয় পাবে না বলে মনে হয়।"

আমি বললাম—"আমি আর সনাতন বাবু যাব ঘোড়ায় চড়ে; তরুণ আর অশোক বাবু নৌকোয় করে যাবেন। মনে হয় নৌকোয় করেই কৃতান্তবর্ম্মা পালাচ্ছে।"

ডক্টর চক্রবর্ত্তী বললেন—"হ্যাঁ, আমারও মনে হয় তাই। কারণ, পথ ধরে সে যেতে চাইবে না এই জন্য যে আমরা হয়ত ওর নাগাল ধরতে পারব। আর কৃতান্তবর্ম্মা হয়ত আন্দাজ করতে পেরেছিল যে আমরা ওর পিছু নেব। তাই সে এই ষ্টেশনে না নেমে আগের ষ্টেশনে নেমে গেছে। এখন নৌকোয় করে গেলে আমরা হয়ত সহজে ওর খোঁজ পাব না—এই তার ধারণা। কিন্তু আর দেরী নয়, সকলে বেরিয়ে পড়।"

তার পর পাঁচ দিন কেটে গেল। শুধু নদীর তীর আর পথের দিকে তাকিয়ে ঘোড়ায় ক'রে ছুটে যাওয়া। পথশ্রমে শরীর ভেঙে আসছে, কিন্তু তা হ'লে চলবে না। সনাতন বাবু একটিও কথা না বলে শুধু ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছেন, তাঁকে দেখে মনে হয় পাথরে তৈরী এক মূর্ত্তি। শ্রান্তি, ক্লান্তির এতটুকু ছাপ নেই তাঁর মুখে।

শোনা গেল তরুণদের নৌকোর সঙ্গে নাকি আর একটা নৌকোর ধাক্কা লেগেছে। ওরা কেউ আহত হয় নি, নৌকোরও তেমন ক্ষতি হয় নি। তারা দূরে একটা নৌকো দেখতে পেয়েছে, তাতে প্রকাণ্ড একটা কাঠের বাক্সও দেখা গেছে।

আমরা এখন চারপাশে শুধু নেকড়ের গগনভেদী গর্জ্জন শুনছি, তারা যেন আমাদের দিকে এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে আসছে। আমরা আশা ছাড়ছি না। এ আমাদের মৃত্যু-যজ্ঞ। কার মৃত্যু? আমাদের না কৃতান্তবর্ম্মার, ভগবান্ জানেন!

(ক্রমশ:)

ধরা-ছোঁয়ার বাইরে

শ্রীহিরণকুমার গুপ্ত, বি. এস্-সি

তুমি চোখেও বেশ দেখতে পাও, কানেও কিছু কম শুনতে পাও না, অথচ কেউ যদি তোমায় বলে, তোমার চোখ, কান এ দু'টি ইন্দ্রিয়ই একেবারে অকেজো, তা' হ'লে তোমার রেগে যাওয়াটাই নেহাৎ স্বাভাবিক, নয় কি? অথচ কথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা'ও বলা চলে না। আমরা আমাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির যতই বড়াই করি না কেন, বৈজ্ঞানিকদের কাছে এ সব ক্ষমতা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর।

ধর, তোমায় যদি প্রশ্ন করা যায়—"আকাশে রামধনুর গায়ে ক'টা রং বল দেখি?" তুমি হয়ত চট্ ক'রে জবাব দেবে—"কেন? সাতটা!" অথচ তুমি জান না যে রামধনুর ঐ সাতরঙা আলোর পাশেই রয়েছে চোখে-না-দেখা অতি-বেগুনি আর অতি-লাল আলো (আল্ট্রা-ভায়োলেট্ আর ইন্ফ্রা-রেড রশ্মি)।

আবার দেখার বেলায় যেমন, শোনার বেলায়ও তেমনি। একটা সামান্য পিঁপড়ে বা ওরই মত অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণী দিনরাত আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, অথচ তাদের চলা-ফেরার আওয়াজ ত' দূরের কথা, সামান্য অস্তিত্বও আমরা সহজে টের পাই না। এ সব ক্ষেত্রে তাই আমাদের চোখ-কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয় থেকেও নেই বলা চলে।

শুধু চোখ আর কানেরই বা দোষ কি, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির অবস্থাও কি তাই নয়? একটা ছোট্ট প্রদীপ ঘরের ভেতর জ্বালালে ঘরের আবহাওয়ায় যে সামান্য তাপের তারতম্য হয়, তা অনুভব করার মত শক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়ের নেই। খুব মৃদু গন্ধ বা ক্ষীণ স্পর্শ আমাদের সহজে চেতনা সঞ্চার করতে পারে না।

তোমরা হয়ত ভাবছ,—"এমন সূক্ষ্ম অনুভূতি কারই বা আছে? কেই বা এমন অদেখা, অজানা ভূতুড়ে ব্যাপারের খোঁজখবর রাখতে পারে?" কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়কে ফাঁকি দিলেও বৈজ্ঞানিকদের যন্ত্র ত' রয়েছে; আর সে সব যন্ত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ের চেয়ে ঢের বেশি ক্ষমতাশালী! মানুষেরও তাই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এই অদ্ভুত জগতের অনেক খুঁটিনাটি খবর আজ আর জানতে বাকি নেই।

প্রথমেই ধর চোখের কথা! খুব দূরের জিনিষ আমরা যেমন দেখতে পাই

না, খুব ছোট জিনিষ দেখতেও আমাদের ঠিক তেমনি অসুবিধা হয়। কিন্তু এ কাজের জন্য বৈজ্ঞানিকদের কাছে রয়েছে 'টেলিস্কোপ' আর 'মাইক্রস্‌কোপ' যন্ত্র। টেলিস্কোপ দিয়ে অনেক দূরের জিনিষ দেখা যায়,—যে সে দূর নয়, ঐ চাঁদের দেশের পাহাড় বা লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের গ্রহ-উপগ্রহের ছবি। মাইক্রস্‌কোপ দিয়ে তেমনি দেখা যায় ক্ষুদে পোকা-মাকড়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কীট ও জীবাণুদের। কিন্তু এ সব ত' গেল সহজ কথা! দূর বা ছোট হ'লেও এরা সব দৃশ্যমান জগতের বস্তু। এ ছাড়াও আমাদের চারিপাশে এক অদৃশ্য জগৎ রয়েছে। আমাদের দৃষ্টিশক্তির আওতায় থেকেও সে জগতের কোন কিছুই আমাদের চোখে ধরা দেয় না—এটাই হ'ল সবচেয়ে আশ্চর্য্য।

কেন দেখা যায় না, সে কথা যদি শুনতে চাও তবে আরও গোড়ার খবর বলতে হবে। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, আলো হ'ল ঠিক ঢেউয়ের মত। জলের ভেতর ঢিল ছুঁড়লে যেমন ঢেউ ওঠে, মহাশূন্যে তেমনি ঈথার নামে এক অদৃশ্য পদার্থের গায়ে ঢেউ উঠলে আলোর সৃষ্টি হয়। একটা আলোর সাথে আর একটা আলোর পার্থক্য শুধু দু'টোর ঢেউয়ের ছোট-বড়র পার্থক্য। রামধনুর লাল আলো খুব লম্বা ঢেউ দিয়ে তৈরী আর ছোট ঢেউ থেকে তৈরী হয় বেগুনি রঙের আলো। এই লাল আলো আর বেগুনি আলোর মাঝামাঝি দৈর্ঘ্যের সমস্ত আলোর ঢেউই আমাদের চোখে ধরা দেয়। কিন্তু এই গণ্ডী বা সীমানার বাইরে যে কোন আলোই থাক না কেন, তাদের আমরা কখনও চোখে দেখতে পাই না। বেগুনি আলোর বাইরে রয়েছে অতি-বেগুনি (আল্ট্রা-ভায়োলেট্) আলো, আর লাল আলোর বাইরে অতি-লাল (ইন্ফ্রা-রেড) আলো; কিন্তু থাকলে কি হবে, এদের একটি আলোর ঢেউএর দৈর্ঘ্য বেগুনি আলোর চেয়ে ছোট, আর একটির হ'ল লাল আলোর চেয়ে বড়; তাই আমাদের চোখও আর এদের দেখতে পায় না। শুধু এ দু'টো আলোই নয়, এই ধরণের অসংখ্য অদৃশ্য আলোর ঢেউ মহাশূন্যে অনবরত ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে—কে তাদের হিসেব রাখে? কিন্তু তাই বলে বৈজ্ঞানিকেরা এ সব ব্যাপারে একেবারে পেছ-পা ন'ন। বিশেষ ধরণের ফটোগ্রাফিক্ প্লেট, সূক্ষ্ম তাপ ও তড়িৎমাপক যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা এই সব অদৃশ্য আলোর খবরাখবর নেন।

চোখের পরই আসে কানের কথা। চোখের ক্ষমতা যেমন বড় ও ছোট আলোর ঢেউয়ের গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ, কানের বেলাও ঠিক তেমনি। খুব মৃদু

আওয়াজ কান যেমন শুনতে পায় না, খুব তীব্র আওয়াজ শোনার বেলায়ও সে তেমনি অক্ষম। তোমরা হয়ত ভাবছ—সে কী! খুব মৃদু আওয়াজ আমরা না হয় শুনতে পাই না, কিন্তু তাই বলে খুব জোর শব্দও কি শুনতে পাব না! কিন্তু আসল ব্যাপার ত' তা নয়। রেলগাড়ীর হুইসেলের তীব্র আওয়াজ আমরা হয়ত শুনতে পাই; কিন্তু এ আর কতটুকুন্ জোর আওয়াজ, বল ত'? এ শব্দ যদি ক্রমেই তীব্র হ'তে তীব্রতর হয়ে ওঠে, তবে এমন একটা সময় আসবে যখন আর কোন শব্দই আমাদের কানে ধরা দেবে না। ছোট-বড় নানা ধরণের এই সমস্ত শব্দই যদি আমাদের কানে সাড়া তুলত তবে মুস্কিলও বড় কম হ'ত না। যে অগুন্‌তি শব্দের ঢেউ আমাদের অগোচরে প্রতিদিন বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে, তাদের হাত থেকে রেহাই পেতে হ'লে আমাদেরও হয়ত কানে ঠুলি পরে পৃথিবীতে বাস করতে হ'ত।

ছোটখাট শব্দ কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের কান সহজে এড়িয়ে যেতে পারে না। 'মাইক্রোফোন' যন্ত্র দিয়ে খুব মৃদু আওয়াজও বড় করে শোনা যায়। লাউড্-স্পিকার বা এই মাইক্রোফোন যন্ত্রও আজকাল হামেশাই ব্যবহৃত হচ্ছে।

চোখ, কানের মত অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতাও যে খুব বেশী নয়, তা' ত' সহজেই বুঝতে পার। আমাদের ঘ্রাণশক্তির কথাই ধরা যাক্। খুব কাছে না গেলে কোন গন্ধই আমরা অনুভব করতে পারি না। আবার গন্ধ যদি খুব সামান্য হয় তবে ত' কাছে গিয়েও লাভ নেই। মানুষের সাথে কুকুরের ঘ্রাণশক্তির তুলনা করলে এ ব্যাপারটা বেশ সহজে বোঝা যায়। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। চোরের পায়ের গন্ধ অনুসরণ করে বহুদূর গিয়েও সে চোরকে পাকড়াও করতে পারে। বাতাসে ভেসে-আসা গন্ধ থেকে গভীর জঙ্গলের ভেতরও শিকার খুঁজে নিয়ে আসে।

ঘ্রাণশক্তির মত অনুভব-শক্তিও আমাদের খুবই কম। সামান্য গরম বা ঠাণ্ডার তারতম্য আমরা সহজে বুঝতে পারি না। অল্প জ্বরে একটা 'থারমোমিটার' যন্ত্র লাগিয়ে তবে টের পাই শরীরের উত্তাপ কত হ'ল। খুব কম তাপের পরিবর্ত্তন কিন্তু ধরা পড়ে 'বোলোমিটার' যন্ত্রে। অতি সামান্য তাপ—যা আমাদের কাছে তাপ বলেই মনে হয় না—তারও অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় এই সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে।

এতক্ষণে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছ আমাদের ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা কত সামান্য! এ নিয়ে তাই যখন তখন আমাদের আর বড়াই করা সাজে কি?

ঘুম যেদিন ভাঙলো

শ্রীশামুক

গোপাল বাবুর জীবনের ইতিহাস সত্যি বড় বিস্ময়কর।

বাঙালী আরামপ্রিয় জাতি, কষ্ট করে ব্যবসা করতে পারে না, তাই কোন উন্নতিও হয় না—এই কথা শুনে শুনে ছোট বয়সেই স্থির করে ফেলেছিলেন যে নিশ্চয় ব্যবসা করবেন তিনি। আর যেমন তেমন ছোটখাটো কাজ-কারবার নয়—করলে একেবারে মারি তো গণ্ডার, নয় লুটি তো ভাণ্ডার—এমনি ধারা কিছু।

মাত্র আঠারো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে সোজা গেলেন বোম্বাই। সেখানে দু'-এক বছর ভারি অসুবিধায় ও কষ্টে দিন কাটলো পেটের দায়ে টুকরো-টাকরা কাজ করে। পরে হঠাৎ এক সুযোগ পেয়ে আরব সাগর পেরিয়ে পৌঁছে গেলেন আফ্রিকায়।

জংলী মানুষ ও হিংস্র পশুর দেশ বলে আফ্রিকার অনেক বদ্‌নাম আছে, কিন্তু গোপাল বাবুর কাছে প্রথম থেকেই প্রমাণ হতে থাকলো যে সত্যি সোনার তৈরী দেশ।

সোনার তৈরী দেশ মানে এ নয় যে বইতে পড়া গল্পের মত তিনি ঐ দেশের মাটিতে নেমে দু'পা চলতেই সামনে দেখলেন তাল তাল সোনা ছড়ানো চারিদিকে। বাস্, মুঠো মুঠো পকেটে পোরা আর এক নিমেষে বড় লোক হয়ে যাওয়া! মোটেই তা নয়।

দেখলেন, দুঃখ-কষ্ট তুচ্ছ করে কিছু দিন কঠোর পরিশ্রম করতে পারলে প্রচুর অর্থ উপার্জন বেশী শক্ত কথা নয়।

হ'লও তাই। হাতীর দাঁতের একজন ব্যবসায়ীর সংগে গভীর জংগলে কিছু দিন ঘুরে দেখলেন আফ্রিকার অরণ্য-সম্পদ্ অফুরন্ত। কত জাতের দামী বাহাদুরী কাঠ মানুষের হাতের ছোঁয়াটুকু পর্যন্ত পায় নি! তিনি গাছ কেটে কেটে কাঠ চালানের ব্যবসা করলেন সুরু।

কয়েক বছর পরে কলকাতার বাড়িতে প্রথম চিঠি এল এবং একলা চিঠি নয়, সংগে এল অনেক টাকা। এর পর থেকে ক্রমাগত টাকা আসতেই থাকে। কলকাতার ছোট জরাজীর্ণ বাড়ি ভেঙে চক-মিলানো চারতলা উঠলো। আশেপাশে আরো অনেক বাড়ি, জমিজমা হ'তে থাকলো কেনা। কলকাতায় বড় আপিস বসলো এবং অন্য নানা রকম আনুষংগিক ব্যবসাও আরম্ভ হয়ে গেল।

আগে প্রতিবেশীরা বলতো,—সেই বোসেদের ছোঁড়াটা, গোপাল হে, তার কোন পাত্তাই নেই, হতভাগা আর কি!

পরে বলতে লাগলো,—আমাদের গোয়ালটুলির গোপাল বাবু, বুঝলেন কিনা, আফ্রিকার জংগলের রাজা বললেই হয়! সৌভাগ্যবান্ মহাপুরুষ।

যাই হোক, এই গত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হ'তে তিনি হঠাৎ বাড়ি এলেন ফিরে। ভাবলেন

এমন হট্টগোলের সময় নিজের দেশে থাকাই মংগল। পরে সব থেমে গেলে দেখা যাবে আর একবার।

জাহাজ-ঘাট থেকে সকালে বাড়ি পৌঁছেই বলেন,—দাঁড়াও, বাজার থেকে আগে দু'টো জিনিস কিনে নিয়ে আসি তাজা দেখে। কত কাল যে খাবার ইচ্ছে হয়েছে তা কি বলবো!

ফিরে এসে বলেন, এই নাও, ভাল করে রান্না করা চাই। এই টাটকা এঁচোড়ের ডালনা আর এই পুদিনার চাটনি!

বাড়ির সকলে অবাক হয়ে যায় যে দুনিয়ায় অসংখ্য খাবার থাকতে এই সামান্য জিনিসে লোভ কেন! আফ্রিকার সম্বন্ধেও নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে তাদের দারুণ কৌতূহল হয়। কিন্তু সকলকে থামিয়ে গোপাল বাবু বলেন—দাঁড়াও, আগে ভাল করে খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমিয়ে নি, তারপর রাজ্যের কথা হবে'খন। আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি নে।

দুপুরে শুলেন, কিন্তু সন্ধ্যা উতরে গেল তবু ওঠার নাম নেই। রাত্রে খাবার জন্যে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি, কিন্তু ঘুম ভাঙে না কিছুতেই। সকলে ভাবে, আহা, অনেক দিনের অনেক পরিশ্রমের ক্লান্তি, এ কি আর দু'-চার ঘণ্টায় যায়? ঘুমোক রাত্রিটাও, সকাল বেলা চাংগা হয়ে উঠবে।

সকাল হ'ল, রোদ উঠলো, আরো বেলা হ'তে ইস্কুল আপিসে যাওয়া হ'ল সুরু—তখনো গোপাল বাবু অঘোরে ঘুমাচ্ছেন, নিশ্চিন্তভাবে—নির্বিবাদে। এমন ঘুম বড় অস্বাভাবিক লাগে। সুতরাং ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসতে হ'ল। ডাক্তার বাবু পকেটে টাকাগুলি আওয়াজ করে ফেলে মিষ্টি হেসে বলেন,—কাল সকালে নির্ঘাত উঠে পড়বেন।

পরের দিনও ভাঙলো না সেই কুম্ভকর্ণী ঘুম। কারুর এমন একটানা ঘুম দেখলে জেগে-থাকা মানুষদের বড় অস্বস্তিকর লাগে। তা ছাড়া ভয়ও হয় মনে। যদি এ ঘুম আর না ভাঙে, যদি নিশ্বাসে ওঠা-নামা বুকের স্পন্দন ঘুমের মধ্যেই থেমে যায় আচমকা!

এবারে শহরের সমস্ত বড় বড় ডাক্তারদের ডেকে আনা হয়। তাঁরা পরীক্ষা করে অনেক ভেবে-চিন্তে বলেন,—আফ্রিকা বলছেন. কেমন? জংগলে ছিলেন বহুদিন? তা হ'লে সেখানকার সেই মড়ার মতন ঘুমিয়ে-পড়া অসুখটাই হয়েছে মনে হচ্ছে। এক রকম বিচ্ছু মশার কামড় থেকে এমন ধারা হয়। যাই হোক, একবার কোন রকমে জাগিয়ে তুলে সজাগ রাখার ব্যবস্থা করা চাই।

জাগাবার প্রাণপণ প্রয়াস সুরু হ'ল। ডাকাডাকি, ধাক্কাধাক্কি। ধরে বসিয়ে দেওয়া। জোর করে তুলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। টেনে হিঁচড়ে চলাবারও চেষ্টা হ'ল। কিন্তু গোপাল বাবু সকল অবস্থায়, এবং দেহের যে কোন ভংগীতে, চমৎকার ঘুমোতে থাকলেন।

প্রচেষ্টার দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হ'ল উগ্র ধরণের। ঢাক পিটিয়ে, পটকা ছুঁড়ে—যত রাজ্যের প্রচণ্ড শব্দ করা হ'ল ঘরের ভেতরে। ঘুমন্ত মানুষটির গায়ে গরম জল ঢেলে দেওয়া হ'ল, চেপে ধরা হ'ল ঠাণ্ডা কন্‌কনে বরফ। ভয় দেখাবার জন্যে বিছানার নীচে মাটিতে পেট্রোল ঢেলে লাগিয়ে দেওয়া হ'ল আগুন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না।

গোপাল বাবু অঘোরে যান ঘুমিয়ে। এপাশ ওপাশ ফেরেন, কুঁকড়ে শোন, কখনও বা সটান লম্বা হয়ে পড়ে থাকেন। শরীরের ওপর যখন ঐ সব অত্যাচার চলে তখন উঃ আঃ—বাস্, ঐ পর্যন্ত—ওর বেশী কোন কথাবার্তা নয়। মাঝে মাঝে বেশ বোঝা যায় ঘুমটা খানিক পাতলা ফিকে হয়ে এসেছে, কখনও চোখ খুলে এক-আধবার ফ্যালফ্যাল করে চেয়েও দেখেছেন, কিন্তু পুরোপুরি হুঁশ আর ফিরে আসে না।

এমন এক অভিনব ব্যাপারে পাড়ার লোকেরা ও হুজুগে আত্মীয়েরা কত দিন হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে থাকতে পারে? তাদের মাথায় এক বুদ্ধি এসে যায়। লাল সালুতে তুলো দিয়ে বড় বড় হরফে লিখে টাঙিয়ে ফেলে—"গোয়ালটুলির ঘুমন্ত গোপাল।" বাড়ির দরজায়—কলসীতে ডাব ও কলাগাছ আর দেবদারু পাতার মালা ঝুলিয়ে দিল। আর কি! কলকাতার মতন বেদম হুজুকে শহরে এর চেয়ে বেশী আর চাই কি?

ভেঙে পড়ে শহরে লোক দর্শনের প্রত্যাশায়। আশপাশের গ্রামগুলিও বাদ গেল না। ফল-ফুলুরির মেলা বসে গেল, বাড়ির চারিপাশে ফুল ও পাতার আবর্জনার স্তূপ জমে উঠতে লাগলো। এমন কি গরমে ভক্তদের মাথা ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে মিউনিসিপ্যালিটির জলের গাড়ি এসে জল ছিটোতে সুরু করে দিল। পাড়ার বড় বড় ছেলেরা কিন্তু কিছুদিন আশ মিটিয়ে খুব সর্দারী করে নিলে। এমন এলাহী কাণ্ড-কারখানা, স্বেচ্ছাসেবকদের খবরদারী ছাড়া চলে কি করে?

ওদিকে মানুষটি কিন্তু অবাক্ ঘুমিয়ে চলেছে দিনের পর দিন। অত বড় বিশ্বমহাযুদ্ধ ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে এল, শহরের মাথায় পড়লো বোমা। 'ফ্যান দাও মা, ফ্যান দাও মা গো'—হেঁকে ক্ষুধার্ত লোকেরা দুর্ভিক্ষের ভীষণ বিভীষিকা দিল দেখিয়ে। অমন নিষ্ঠুর রক্তারক্তি দাংগা-হাংগামার তাণ্ডবলীলাও একদিন শেষ হয়ে ফিরে এল শহরের বুকে আবার শান্তি। আর ঐ মানুষটি আজব ঘুমের মধ্যে দিয়ে নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিল এ সমস্ত যত কিছু বিপর্যয়!

ভক্তের ভিড় অবশ্য ধীরে ধীরে আপনি কমে যেতে লাগলো। এমন নির্জীব ঘুমন্ত মানুষ নিয়ে রোজ রোজ তারা করে কি? দাঁতের পোকা বার করার মন্তর বলে না, পেটের ব্যথার জন্যে 'জল পড়া' দেয় না, হঠাৎ বড়লোক হবার কবচ-মাদুলীর সন্ধানও জানে না; সুতরাং শুকনো হৈচৈ করে লাভটা কোথায়? যদি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিড় বিড় করে পাগলের মতনও কিছু বকতো, তার নানা রকম মানে তৈরী করে মনে সান্ত্বনা পাওয়া যেত; ধ্যেৎ, তাও না!

গোপাল বাবু স্বচ্ছন্দে ঘুমিয়ে যান। ঐ অবাধ নিরবচ্ছিন্ন ঘুমের নেশা কিছুতেই কাটতে চায় না। আত্মীয়পরিজন ও ডাক্তারেরা হাল ছেড়ে বসে। আর কোন উপায় নেই, কোন আশা পর্য্যন্ত নেই। ঐ সর্বনেশে শয়তানী ঘুম একদিন দেবে শেষ করে, বুকের ধুকধুকুনি যে থামিয়ে দেবে আচমকা—এ একেবারে সুনিশ্চিত। এমনি সময়ে এক ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার গেল ঘটে।

মধ্য আফ্রিকায় বাড়ি এমন একজন কাফ্রী, লোকেদের পাল্লায় পড়ে, দেখতে এল

ঘুমন্ত গোপালকে। ঐ সময় বহু কাফ্রী সৈন্য কলকাতার পথেঘাটে হামেশা নজরে পড়তো।

কাফ্রী লোকটি সমস্ত দেখে ও শুনে বলে যে এ রকম অসুখ তাদের দেশে হয় বটে কিন্তু অনেক সময় এক জাতের গাছের পাতার রস খাইয়ে দিলে আবার সুস্থ হয়ে ওঠে।

ডাক্তারদের কানে গেল কথাটি। বলে—যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। বিশেষ করে যখন পয়সা-কড়ির ভাবনা নেই তখন চেষ্টার ত্রুটি কেন হবে? সন্ধান নিয়ে বিমান যোগে লোক পাঠানো হ'ল আফ্রিকায়। সে গন্ধমাদনের মত এক ঝাড় গাছ-পাতা নিয়ে এসে হাজির। সেদিন আবার ভেঙে পড়লো দুনিয়ার লোক ঘরের ভেতরে।

পাতার রস একটু একটু করে কয়েক বার খাওয়াতেই গোপাল বাবু আড়মোড়া ভেঙে হাতে ভর দিয়ে উঠে পড়েন খানিকটা। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখেন চারিদিকে গিজ্ গিজ্ করছে মানুষ। বলেন,—কি, হয়েছে কি! এত লোক কেন?

বাস্. ঐ দু'টি মাত্র কথা। হঠাৎ শরীরটি শক্ত হয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো। স্থির হয়ে গেল দেহ। শেষ নিশ্বাস গেল ফুরিয়ে।

ডাক্তারেরা বললেন,—অতদিন একটানা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শরীরে আর ছিল না কিছু। হঠাৎ জেগে ওঠার ধাক্কা তাই সামলাতে পারলেন না।

আত্মীয়-বন্ধুরা বললেন,—আহা, নাই বা জাগতেন! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আরো কয়েকটা বছর বাঁচতেন নিশ্চয়ই। এ ঘুম না ভাঙালেই ছিল ভাল।

শরৎ

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

শরৎ এসেছে সাজি,
হংসশোভিত আজি সরোবর,
কুমুদে কমলে কিবা মনোহর,
সাথী কহ্লাররাজি।

শরৎ এসেছে সাজি,
জলদের ধারা বিরল এখন,
সুধাংশু দেয় বিমল কিরণ
মেঘের কবল ত্যজি।

শরৎ এসেছে সাজি,
শেফালিকা আজি রূপে ঢলঢল
রজনীগন্ধা স্নিগ্ধ, বিমল,
ভরিয়া তোল রে সাজি।

শরৎ এসেছে সাজি,
ইলিশ মৎস্য পরশে মরম
মূল্য তাহার রাখিতে গরম
কতই না কারসাজি!

শরৎ এসেছে সাজি,
আসিবেন দেবী সিংহবাহিনী,
কহ তাঁর ঠাঁই প্রাণের কাহিনী,
অন্তর লহ মাজি।

শরৎ এসেছে সাজি,
সারদা কমলা সঙ্গী তাঁহার,
তাঁদেরি কৃপায় তর সংসার,
অর্চ্চ তাঁদের আজি।

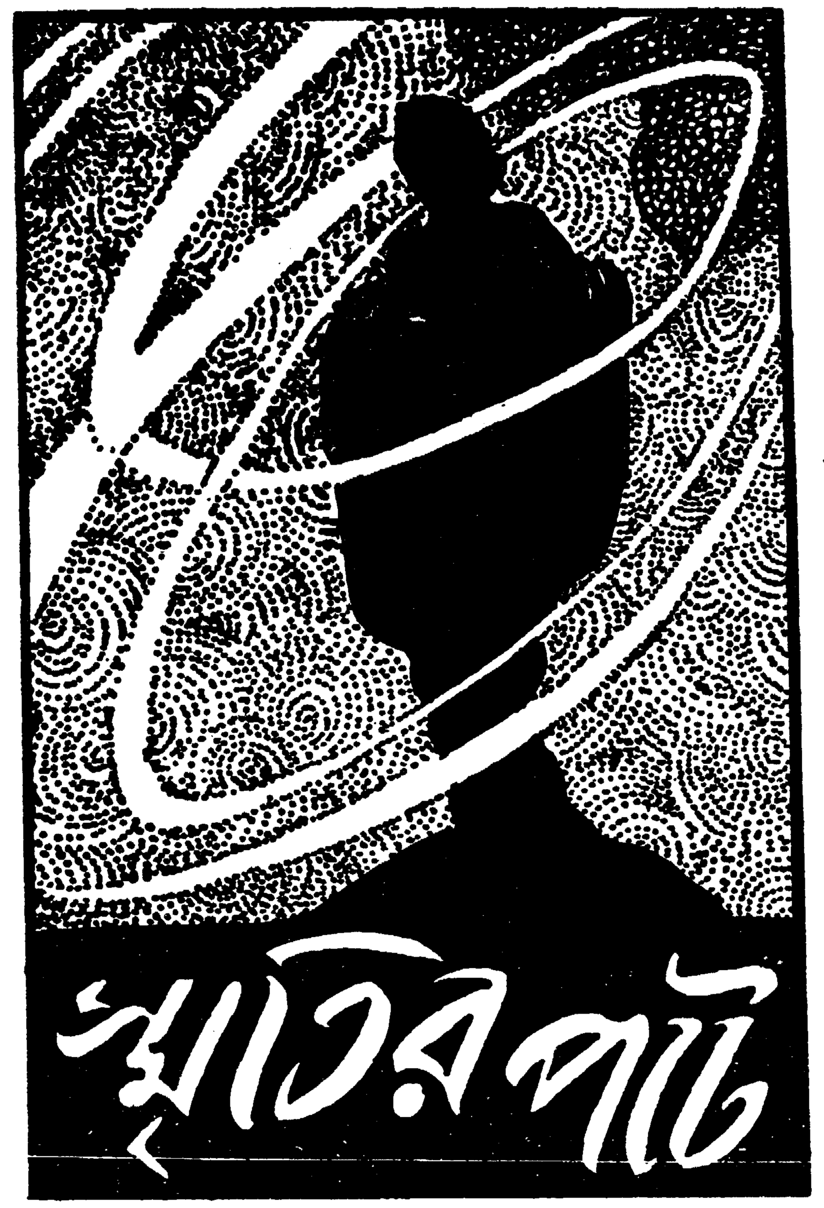

আত্মোন্নতি সমিতির গল্প

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি

যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় পর্ব্ব

আত্মোন্নতি সমিতি তখন দেশের ভিন্ন ভিন্ন বৈপ্লবিক বা বৈপ্লবিক সমিতির সহিত সংযোগ স্থাপনে ব্যস্ত। এমন সময়ে আমাদের যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সম্মিলন। ঠিক সময়টা মনে পড়িতেছে না। কেহ কেহ অনুযোগ করিয়াছেন, এই সময়গুলি একটু পরিশ্রম করিয়া নির্ণয় করিয়া দিলে এ কাহিনীটি আরও ভাল হইত। তাদের বলিয়াছি, সত্তরের কাছে যে সকল লোক পৌছিতেছে তাদের আর কতদিন এ সংসারে থাকিবার ব্যবস্থা বিধাতাপুরুষ করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। অতএব স্মৃতিশক্তি বা প্রাণশক্তি বিকল হইবার পূর্ব্বেই যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি যে সকল কথা স্মৃতিপটে উদিত হইতেছে তাহা লিপিবদ্ধ করা উচিত। ভবিষ্যতের কোনও ঐতিহাসিক বা 'ব্রজেন বাঁড়ুয্যে' প্রাচীন সংবাদপত্রের সাহায্যে গবেষণা করিয়া আমার এ কাহিনীকে সম্পূর্ণ করিতে পারিবেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা কাজ করিয়াছেন তাঁহাদের যথা সম্ভব বিবরণ আমার যতটুকু জানা আছে দিয়া যাইতেছি। এ কাহিনীর পাত্রদের

অনেকেরই দোষের কথা উল্লেখ নাই ভাবিয়া কেহ যেন মনে না করেন তাঁহারা নির্দ্দোষ পুরুষ। আমি শুধু তাঁহাদের দেশের জন্য কাজের দোষ-গুণ লিখিয়াছি, অন্য দোষ-গুণের কথা লিখি নাই। কতকটা আমার কাহিনীর পক্ষে প্রয়োজন নয় বলিয়া, কতকটা আমার জানা নাই বলিয়া।

গ্রীষ্মের ছুটিতে কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাম, সেই সময়ে বন্ধুগণ যতীন বাবুকে আবিষ্কার করে। রঘুনাথ বলে, সে-ই প্রথম। আমি আসিয়া যতীন্দ্রের সহিত আলাপ করিয়া মোহিত হইলাম। এই ত' নায়ক, যাহার জন্য আমরা এত কাল অপেক্ষা করিতেছিলাম। প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ চেহারা; দীর্ঘাকার, গৌরপ্রায় বর্ণ: ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চক্ষু; কি সুন্দর তেজোব্যঞ্জক কথাবার্ত্তা! কোনও আচরণে ভয়ের লেশ মাত্র নাই। বড় বড় কথা,—রণজিৎসিংহের কথা, বিস্‌মার্কের কথা, তিলক ও অরবিন্দের কথা, পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক ও দেশীয় রাজ্যের বৈপ্লবিকদিগের কথা! নিজে কি করিয়া নাম ভাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী সাজিয়া বরোদা সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন তাহার কথা। সমস্ত ভারত স্বাধীনতা-সমরের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, শুধু বাঙ্গালা দেশই অপ্রস্তুত। তাই বাঙ্গালা দেশে বৈপ্লবিক দল গঠনের জন্য তিনি অরবিন্দ ও তিলক কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন—এইরূপ কথা। যতীন্দ্র তখন আপার সার্কুলার রোড়ে বেঙ্গল কেমিক্যালের তৎকালীন কারখানার কাছে, বড় রাস্তা হইতে ঈষৎ দূরে এক বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন এবং সেই সঙ্গে বৈপ্লবিক সংগ্রহ করিতেছিলেন। বাড়ীর সামনে একটু জমি ছিল ও পাশে ছিল একটা পুকুর। সেই জমিটাতে ব্যায়ামের সাজ-সজ্জা ও ড্রিলের ব্যবস্থা হইয়াছে। গোটা দুই ছোট ঘোড়াও সংগৃহীত হইয়াছে। অশ্বারোহী সৈন্যের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

আমরা মোহিত হইলাম ও যতীনদা'র প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলাম। খুব জোরে ব্যায়াম আরম্ভ হইল এবং প্রচার-কার্য্য চলিতে লাগিল।

যতীন দা' খুব বড় বড় কথা বলিতেন। যেমন প্রিন্স ওকাকুরা নামক জনৈক জাপানী 'নোবল্‌ম্যান্‌' কিছুদিন কলিকাতায় আসিয়া ছিলেন। উদ্দেশ্য, এশিয়ার ঐক্য ও জাগরণ বিধান। ভারতকে তৈয়ারী হইতে হইবে। জাপান সাহায্য করিবে। ওকাকুরা ঠাকুর-বাড়ীতে ছিলেন। অনেক জমিদার, রাজা প্রভৃতি দেশহিতার্থে প্রভূত অর্থব্যয় ও স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত। গুপ্ত সমিতি গঠিত হইয়াছে। যতীন দা' এই গুপ্ত সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট অনেকের নাম করিয়াছিলেন। রবি ঠাকুর, সুরেন ঠাকুর প্রভৃতির নামও তার মধ্যে ছিল।

যতীন দা'র লোক বশ করার শক্তি ছিল অদ্ভুত। গোলদীঘিতে বেঞ্চে আমরা কয়েকজন বসিয়া আছি। সামনে দিয়া একজন মধ্যবয়সী লোক—মুখের ভাব দেখিলে মনে হয় বুঝি নিমপাতা চিবাইতেছে—চলিয়া গেল। যতীন দা'কে বলিলাম, 'আপনি যদি এই লোকটার সঙ্গে আলাপ করতে পারেন তা হ'লে আপনার বাহাদুরী বুঝব।' যতীন দা' উঠিলেন। খানিক দূর গিয়া লোকটির পাশাপাশি চলিলেন। আর একটু পরেই দেখি আলাপ আরম্ভ হইয়াছে। ফিরিয়া দু'জনেই তন্ময় ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে চলিলেন, আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। আর একবার ঘুরিয়া লোকটিকে আমাদের দলে বসাইলেন। তাহার মুখভাব তখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ক্রমে ক্রমে আমরা যতীন দা'কে চিনিতে লাগিলাম। মনোরম কথা মাত্রেই সত্য নহে। মনে হইতে লাগিল তাঁহার কথার অনেকাংশই সত্য নহে, হয়ত বা বার আনা চৌদ্দ আনাই মিথ্যা। কিন্তু এই মিথ্যা-সত্যের ভিতর দিয়া তিনি দেশের যুবকগণের মধ্যে একটা স্বাধীনতা-প্রয়াসের আকাঙ্ক্ষার ঝড় বহাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে পরবর্ত্তী কর্ম্মীদের কার্য্যক্ষেত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আমার বহুকাল হইতে, কেন জানি না, মনে হয় যতীন্দ্রকে দেখিয়াই রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে বাইরের' সন্দীপের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। অবশ্য নাটকীয় রহস্য সৃষ্টি করিবার জন্য অনেকটা অতি-অঙ্কিত চিত্র।

যতীন্দ্রের কথাবার্ত্তা সন্দীপের মতই লোকমুগ্ধকর, সতেজ ও ভয়ঙ্কর ছিল। আমার যতদূর মনে আছে আমাদের সঙ্গে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইত: রাজনীতি-ক্ষেত্রে দয়া নাই, মায়া নাই, ধর্ম্ম নাই, অধর্ম্ম নাই। যে কোনও প্রকারে কার্য্য-সিদ্ধি করিতে হইবে। চরকে ত' বিনাশ করিতে হইবেই, নিজের বন্ধুও যদি সন্দেহজনক পথে চলে, তাহাকেও বিনাশ করিতে হইবে। মদ খাওয়া বড় রাজনীতিকের লক্ষণ। রণজিৎসিং মাতাল ছিলেন; বিস্‌মার্ক মাতাল ছিলেন। (আমরা কিন্তু যতীন্দ্রকে কোনও দিন মদ খাইতে দেখি নাই) বড়লোকদিগকে ভয় করিবে না। চাবকাইয়া তাহাদের কাছ হইতে দেশের কাজে টাকা আদায় করিতে হইবে। ইত্যাদি।

যতীন্দ্র তাসের বাড়ী গড়িয়াছিলেন, উহা সামান্য আঘাতেই চূরমার হইয়া গেল।

জীবনের প্রান্তে আসিয়া আমি ভাগবত মতাবলম্বী হইয়াছি। সংক্ষেপে সে মত এই: এই বিশ্ব ভগবানের লীলাক্ষেত্র। আমরা সকলেই—সাধু, অসাধু,

পণ্ডিত, মূর্খ, দেশভক্ত ও চর, সকলেই পরমাত্মার হাতের খেলনা মাত্র। তাঁহার উদ্দেশ্য কি আমরা বুঝি না। মহাভারত সৃষ্টির জন্য শকুনির প্রয়োজন ছিল, যুধিষ্ঠিরেরও প্রয়োজন ছিল। ভারত-স্বাধীনতা মহাকাব্যের জন্য যতীন্দ্রের, সুরেন্দ্রের প্রয়োজন ছিল, আবার নরেন গোঁসাই ও কানাই দত্তেরও প্রয়োজন ছিল।

যতীন্দ্রের পতন ঠিক কিরূপে হইয়াছিল তাহা আমি অবগত নহি। আত্মোন্নতির কতিপয় সভ্য তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা রটাইল। সমিতির নবীন সভ্যেরা অতি নীতিবাদী ছিল,—যদিও ইহাদের সকলেই যে পরবর্ত্তী জীবনে খুব আদর্শ চরিত্র দেখাইয়াছে তাহা নহে। আমরা যতীন্দ্রকে পরিত্যাগ করিলাম। অর্থসাহায্যকারীরা বোধ হয় আগেই করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রের গৃহবিন্যাস উঠিয়া গেল।

এই সময়ে যতীন্দ্র আবার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এই দুর্যোগে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন দুই মহাপ্রাণ ব্যক্তি—পণ্ডিত যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও অবিনাশ চক্রবর্ত্তী। তাঁহাদের কথা আর একদিন বলিব।

যে রসে রস নেই

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্‌-সি

আমি কমলা লেবুর রসের কথা বলছি। যুদ্ধের সময় তোমরা অনেক রকম অদ্ভুত ঘটনার সাথে পরিচিত হ'য়েছ তাতে সন্দেহ নেই। তার মধ্যে অদ্ভুত সব খাবার-দাবারও আছে। যেমন ধর, ডিমের গুঁড়ো। জমাট দুধটা যদিও অনেক দিন থেকে প্রচলিত ছিল কিন্তু দুধের গুঁড়োটা তোমরা অনেকেই বেশী করে দেখতে পেয়েছ যুদ্ধের মধ্যেই। তার পর ধর ভাইটামিনের বড়ি। নানা রকম তরি-তরকারী, দুধ, মাছ, ডিম প্রভৃতি খেয়েই তো আমাদের শরীরে ভাইটামিনের সংস্থান হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের কৃপায় তারও বুঝি দরকার নেই! যখন দেখা গেল শরীরে ভাইটামিনের অভাব পড়েছে তখনই দোকান থেকে খানিকটা ভাইটামিনের বড়ি কিনে খেয়ে নিলেই হ'ল। যাক গে এ সব কথা। বলছিলাম, কমলা লেবুর রসের কথা। সম্প্রতি কমলালেবুর রসও গুড়োর আকারে বাজারে বেরিয়েছে, তবে আমাদের দেশের বাজারে নয়, বিলাত-আমেরিকার বাজারে।

বলতে পার, কমলা লেবুর রসের আবার এ পরিণতি করবার কি প্রয়োজন ছিল?

প্রয়োজন ছিল বৈকি! আমেরিকার ফ্লোরিডা অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কমলা লেবু উৎপন্ন হয়। স্থানীয় লোকেরা তো আর অত কমলা লেবু খেয়ে কুলোতে পারে না, তাই তা চালান দিতে হয় দেশবিদেশে। এখন, কাছাকাছি অঞ্চলে কমলা লেবু পাঠান সম্ভব হ'লেও খুব দূর দেশে পাঠান যায় না ফলগুলো। কারণ জাহাজে করে ফল পাঠাতে যে সময় লাগবে তার মধ্যে সেগুলো পচে 'ভূত' হ'য়ে যাবে যে! তবে হ্যাঁ, উড়োজাহাজে পাঠান যেতে পারে মাল, কিন্তু খরচে পোষালে তো! তা ছাড়া অকালে, অর্থাৎ যখন কমলা লেবুর সময় নয়, তখনকার জন্যেও তো জমা করে রাখা চাই কিছু কিছু! এই সব অসুবিধা দূর করবার জন্যেই হ'য়েছে রস থেকে জলীয় অংশটা তাড়িয়ে দিয়ে গুঁড়োর আকারে রাখবার ব্যবস্থা। কত সুবিধা হচ্ছে এ ব্যবস্থায় আজকাল,—দূর দেশে পাঠান বা জমা করে রাখা—যেটাই ধর না কেন! প্রয়োজন মত এক চামচ গুঁড়ো জলে গুলে খেয়ে নিলেই হ'ল। একদম যেন খাঁটি এবং টাটকা কমলা লেবুর রস খাচ্ছ এমনি মনে হবে।

প্রশ্ন উঠবে, এ ভাবে গুঁড়ো তৈরী করলে তার মধ্যে হয়তো কমলা লেবুর খাদ্যমূল্য কমে যাবে। না, তারও কোন ভয় নেই। কারণ যে কোন খাদ্য থেকে জলীয় অংশ তাড়িয়ে দিতে হ'লে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য থাকে যাতে করে এ সব জিনিসের খাদ্যমূল্য কোনক্রমেই কমে না যায়। কমলা লেবুর বেলাও এ কথা প্রযোজ্য। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, সদ্য ভাঙ্গা কমলা লেবুর রস এবং গুঁড়ো গুলে যে রস পাওয়া যায় তা অবিকল একই রকম—স্বাদে, গন্ধে এবং খাদ্যমূল্যে।

এবারে শোন কি করে কমলা লেবুর রস গুঁড়োয় রূপান্তরিত করা হয়।

প্রথমে লেবুগুলো ভাল করে ধুয়ে নিয়ে যন্ত্র-সাহায্যে কেটে দু'ভাগ করা হ'ল। এবারে তা থেকে রস বার করে নিয়ে ছেঁকে ফেলতে হবে। যে রস পাওয়া গেল তার মধ্যে শতকরা বারো ভাগ কঠিন পদার্থ থাকে। তার পর বিশেষ ভাবে তৈরী যন্ত্রে খুব কম চাপে ৪০ থেকে ৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপে রস শুকিয়ে ফেলতে হ'বে। পাওয়া গেল জলীয় অংশহীন কমলা লেবুর রস। গুঁড়োর ভিতরে যাতে শতকরা দেড় ভাগের বেশী জলীয় বাষ্প না থাকে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। এবার গুঁড়োগুলো বায়ুহীন টিনের কৌটোয় প্যাক্ করে নিলেই হ'ল। অবশ্যি যত সহজে ব্যাপারটা বলা হ'ল তত সহজ কিন্তু তা নয় মোটেই। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এ জাতীয় গুঁড়ো এক বছর কাল বেশ চমৎকার ভাবেই রাখা যায় জমা করে; কোন রকম খারাপ হয়ে যাবার ভয় থাকে না। তবে রস থেকে জলীয় অংশ তাড়াবার সময়ে যদি উত্তাপ ৫০ ডিগ্রীর উপরে ওঠে তবে যে গুঁড়ো পাওয়া যাবে তা তিন-চার মাসের মধ্যেই খারাপ হ'য়ে যায়।

আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌ ইনষ্টিটিউট্‌ অব্‌ টেক্‌নোলজির নাম তোমরা কেউ কেউ হয়তো শুনে থাকবে। কমলা লেবুর রস গুঁড়োয় রূপান্তরিত করতে এরাই অগ্রণী। তা ছাড়া ফ্লা নামক স্থানে অবস্থিত সাইট্রাস রিসার্চ ল্যাবরেটরিও এ বিষয়ে অনেক কাজ করেছে।

বার্নার্ড্ শ'র জন্মদিনে

শ্রীঅমলকুমার মিত্র

তোমরা গত বছর ভাদ্র মাসের রামধনুতে সম্পাদক মহাশয়ের লেখা "বার্নার্ড্ শ'র বিরানব্বই বছর" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়েছিলে, এবং, নিশ্চয়ই, ভালও লেগেছিল খুব। তার পর দেখতে দেখতে আর এক বছর কেটে গেল। গত ২৬শে জুলাই তারিখে বার্নার্ড্ শ' পড়েছেন ৯৩ বছরে। জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই রসিক সাহিত্যিকের জীবনের আরও কয়েকটি মজার মজার ঘটনার কথা বললে তোমাদের ভালই লাগবে বোধ হয়।

বার্নার্ড্ শ'

শ'র ছবি তোমরা সকলেই দেখেছ। লম্বা দাড়িওয়ালা, হাসিখুসি চেহারার ভদ্রলোক, দেখলে মনে হয় যেন বড্ড সরল, কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই। ভদ্রলোক বেশী মোটাসোটা ন'ন,—রোগা, পাৎলা চেহারা। কিন্তু তিনি কি একদিন স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলেন যে তাঁর ঐ রোগা লিকলিকে চেহারার জন্যই তিনি একদিন তাঁর বন্ধুদের ঠাট্টার পাত্র হবেন?

ঘটনাটি ঘটল এই রকম। বার্নার্ড্ শ'কে সংক্ষেপে বলা হয় জি. বি. এস্। আর ঠিক ঐ ভাবে জি. কে. সি. বলা হয় জি. কে. চেষ্টারটন্‌কে। জি. কে. চেষ্টারটন্‌ও ইংল্যাণ্ডের একজন নামকরা লেখক। ইনি কিন্তু দেখতে খুব বলিষ্ঠ এবং বেশ হৃষ্টপুষ্ট। একদিন বাগে পেয়ে জি. কে. সি হাসতে হাসতে বললেন জি. বি. এস্‌কে,—"আপনাকে দেখে মনে হয় ইংল্যাণ্ডে বুঝি খাদ্যাভাব ঘটেছে!" শ' তাঁর বন্ধুর বলিষ্ঠ মাংসবহুল চেহারার দিকে একবার তাকিয়ে

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "আর আপনাকে দেখলে মনে হয় আপনার জন্যেই ইংল্যাণ্ডে এই খাদ্যাভাব।"

শ' একদিন পুরোনো বইএর দোকানে বই ঘাঁটতে গিয়ে তাঁর নিজের লেখা একখানা বই দেখে কিছুটা আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। আরও আশ্চর্য্য হ'লেন যখন দেখলেন, বইটির ভিতরের পাতায় তাঁর নিজের হাতে তাঁর একটি বন্ধুকে লিখেছেন—'উইথ্ কম্‌প্লিমেণ্ট্‌স্—জর্জ বার্নার্ড্ শ'। অর্থাৎ 'বার্নার্ড্ শ'র কাছ থেকে উপহার'! তিনি কালবিলম্ব না ক'রে বইটি সস্তা দরে কিনে নিলেন, তারপর বইটি আবার সেই বন্ধুটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন, ভিতরে লিখে দিলেন,—'উইথ্ রিনিউড কম্‌প্লিমেণ্ট্‌স্—জি. বি. এস্।' অর্থাৎ 'আবার নতুন ক'রে উপহার—জি. বি. এস্।'

শ'র "পিগ্‌মেলিয়ন্" নাটকটির অভিনয় সবে মাত্র শেষ হয়েছে। মুগ্ধ দর্শকেরা ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছেন আর সমস্বরে লেখককে ষ্টেজের ওপর উঠে তাঁদের শ্রদ্ধাভিবাদন ও অভিনন্দন গ্রহণ করবার জন্য আবেদন জানাচ্ছেন। শ' বেচারী বুড়ো মানুষ, কি করেন? অগত্যা ষ্টেজের ওপর এসে দাঁড়ালেন। হঠাৎ কথা নেই বার্ত্তা নেই, কোথা থেকে শেয়ালের ডাকের মতন একটি একক গলার অপ্রীতিকর শব্দ ভেসে এল......"ব্—উ—উ"। দর্শকেরা ভয় পেয়ে গেলেন, না জানি শ' এবার সকলকে কি বলে তিরস্কার করেন! কিন্তু শ'র কোন দিকে খেয়াল নেই; হাসতে হাসতে, শব্দটি যেদিক্ থেকে এসেছিল সে দিক্ লক্ষ্য ক'রে, বললেন, "বন্ধু, তুমি ঠিক কাজ করেছ। আমার বইটি যে খারাপ সে সম্বন্ধে আমিও তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত। কিন্তু অনেকের যখন বইটি ভাল লেগেছে তখন আমরা দু'জনে এতগুলি লোকের বিরুদ্ধে কি করতে পারি, বল?"

জি. বি. এস্-এর তিরানব্বই বছর বয়সে, এসো, আমরা সকলে মিলে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

"তোমার দুঃখের কথা পারত পক্ষে কাউকে ব'ল না। বেশীর ভাগ লোকই ও নিয়ে মাথা ঘামাবে না, আর বাকি যারা তারা হবে খুশী।"

*

"বোকা লোকের সঙ্গে কখনও মাথামাথি করবে না। বুদ্ধিমান্ শত্রুর চাইতেও বোকা বন্ধু বেশী বিপজ্জনক।"

পথের ডাক

শ্রীকমলা দত্ত

"...এই মৌসুমী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হ'লো আমাদের ভারতবর্ষ। বল তো, তাই যদি হয় তবে ভারতের অরণ্য ও কৃষিসম্পদ্ কোন্ ধরণের হবে?—তুমি?—তুমি?—বুঝেছি, কেউ পারবে না! পারবেই বা কেমন করে? চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা তো কেউ কর না। শুধু বই মুখস্থ বিদ্যে সব! অথচ এই সহরের সীমা ছাড়িয়ে দু'পা গেলেই দেখতে পার। কিন্তু সে ইচ্ছাই তোমাদের হয় না। অথচ কত দুঃসাহসিক পর্যটক পদব্রজে গিয়েছেন কত গভীর অরণ্যে—দুর্গম গিরিদেশে......।" বিপিন বাবু ভূগোল পড়াচ্ছেন দশম শ্রেণীতে।

অশোক বসেছিল জানালার পাশে,—যেখানে বিশাল ঘনশ্যাম বাদাম গাছটি প্রাণ-প্রাচুর্যে যেন উচ্ছ্বসিত, পাতায় পাতায় তার টুকরো আলোর ঝিলিমিলি।

আসামের গৌহাটি সহর, ব্রহ্মপুত্রের বাম তীরে তার অবস্থিতি। এই হ'লো সেই দূর অতীতের মহাভারতের যুগের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এরই রাজা ভগদত্ত। গৌহাটি সহরটা আসামে হ'লেও বাঙালীতে ভরা। আর সহর ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তে অরণ্য-পর্বতে বাস করে আসামের আদিবাসীরা; তাদের মধ্যে কোচ আছে, খাসিয়া আছে, আছে নানা রকম উপজাতি; আর আছে পূর্ব্ব বঙ্গের ময়মনসিংহ অঞ্চলের বাঙালী। বহুদিন ধরেই তারা ক্রমে ক্রমে আসামের সর্বত্র ছড়িয়ে যাচ্ছে; আচারে আচরণে আসামীদের থেকে প্রভেদ কোথাও দেখা যায় না; এক কথায় চেনাই যায় না বাঙালী ব'লে।

অশোকরা এখানকার বহু দিনের বাসিন্দা। বৃহৎ পরিবার তাদের; পূর্ণ থাকে বহু ব্যস্ততায়। কিন্তু এরই মধ্যে অশোক যেন একটু দলছাড়া—গোত্রছাড়া গোছের, কেমন যেন ভাবুক একটু।

বিপিন বাবুর কথা বারে বারেই তার মনে পড়ছে।

দিন দুই পরে বিকেল বেলা অশোক নদীর ধারে যায় বেড়াতে। খেয়া পারাপার করছে ষ্টীমার। অশোক ষ্টীমারে চড়ে নদীর ওপারে পৌঁছে গেল। পৌঁছে বেড়াতে বেড়াতে দেখে রেলপথ চলে গেছে—কত দূর তার অন্ত নেই। এ যেন দূরের ইসারা। যদি চলেই যাওয়া যায় নিরুদ্দেশ যাত্রায়—অনেক দূরে গভীর অরণ্যে, দুর্গম গিরিদেশে?

পকেটে ছ'টি পয়সা সম্বল ক'রে অশোক চলতে সুরু ক'রে দেয় রেলপথ ধরে। রেলপথ চলে গেছে পাহাড়ের গায়ে এঁকেবেঁকে, বৃত্ত রচনা ক'রে। একটা পাহাড় পেরোতেই সূর্য প্রায় ডুবে এল। অশোক পড়ল ভাবনায়। সামনের গাঁয়ে না পৌঁছান পর্যন্ত আশ্রয় নেই। কিন্তু সে গ্রাম হয়তো দশ মাইল দূরে। কিন্তু উপায় কি? যেতেই হবে সেখানে।

বেপরোয়া হয়ে অশোক সামনে এগিয়ে চলে। একটু যেতেই অনেক লোকের খুব জোরে কথা শুনতে পায় সে,—থেমে পড়ে। দেখে, খানিকটা নীচু দিয়ে একদল লোক চলছে। চীৎকার ক'রে তাদের থামতে ব'লে নেমে যায় সে। বলে—"যাচ্ছ কোথায় তোমরা?"

"যাচ্ছি, বাবু, ঐ সামনেকার গাঁয়ে; কাজ ক'রে বাড়ী ফিরছি সব।"

"তোমরা এমন চীৎকার ক'রে কথা বলছ কেন?"

"বলব না?—এখানে যে বড্ড বাঘের ভয়! আগে থেকে সোরগোল করলে বাঘ আসবে না। কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়?"

"ঐ তোমাদের গাঁয়েই।"

আবার সোরগোল করতে করতে চল্‌ল সব। সামনে আলো হাতে যাচ্ছিল যে তাকে ডেকে এক বুড়ো বল্‌ল—"দেখে যেয়ো, আবার ময়াল সাপটাপ মাড়িও না।"

দেখে-শুনে ভাবছে অশোক—পর্বত, অরণ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কত বিপদের বাসা!

মাইল দুই-তিন হেঁটে তারা গ্রামের কাছাকাছি এলো। এবার একটি দু'টি লোক এদিক্ সেদিক ছিটকে পড়তে লাগলো। বাংলা দেশের গ্রামের সঙ্গে আসামের গ্রামের তফাৎ অনেক। আসামে লোকবসতিই কম, সুতরাং হয়তো বা এ পাহাড়ে একটি বাড়ী, আবার দূরে পাহাড়ের বাঁকের আড়ালে হয়তো বা দু'টো বাড়ী। এমনি ক'রে পাঁচ-ছয় মাইল যুড়ে একটি গ্রাম। কুড়ি-পঁচিশ ঘরের বেশী বাসিন্দা নেই তা'তে।

খানিক বাদে বাকি রইল শুধু সেই বৃদ্ধ ও অশোক। বৃদ্ধ প্রশ্ন করে, "তুমি যাবে কোন্ বাড়ী?"

অগত্যা অশোক সব কথা খুলে বল্‌ল। আজ রাতের মত একটা আশ্রয় চাই।

"বড় মুশকিলে ফেললে তো! আমার বাড়ীতে যে সব শুদ্ধ একখানাই ঘর! আচ্ছা, চল দেখি ঐ ...নের বাড়ীতে, ওরা বড়লোক, হয়তো জায়গা দিতে পারবে।"

হাতের আলো তুলে ধরলো বৃদ্ধ। অশোক ডাকাডাকি করাতে বেরিয়ে এলো একটি লোক। অশোকের বক্তব্য শুনে সেও ভারী চিন্তায় পড়ে—"শোবার ঘর তো মোটে একখানাই আমাদের, আর একখানা গোয়াল-ঘর।"

শ্রান্ত অশোক বলে—"না হয় আমি দাওয়াতেই শুয়ে থাকছি। খেতে-টেতেও আমার হবে না—শুধু একটু শোবার জায়গা।"

—"তা তো হয় না, হয়তো বাঘেই টেনে নেবে। কী যে করা যায়! আচ্ছা, গোয়ালের একপাশেই দিচ্ছি একটা ব্যবস্থা করে। কিন্তু খাবেন কি? আপনারা?—"

অশোকরা জাতে বামুন শুনে লোকটি বল্‌ল, "ওরে বাবা,—তা হ'লে তো একেবারেই হয় না! রান্না জানেন আপনি?"

অশোকের বলতে ইচ্ছে হ'ল খাবে সে তাদের হাতেই, ওসব জাতটাত সে মানে না, কিন্তু তা হ'লে এই শোবার স্থানটুকুও হয়তো হারাতে হবে। তাই বাধ্য হয়েই বলতে হয় ওকে, "না, জানি না—তবে দরকারও নেই, আমি শুধু একটু শোবো।"

আসামী মেয়েদের মধ্যে পর্দাপ্রথার প্রচলন নেই মোটে, তাই সহজ ভাবেই গৃহিণী এসে ছোট্ট খুপসি গোয়াল-ঘরের এক প্রান্তে একটু ঝাঁট দিয়ে একখানা কম্বল পেতে দেয়। ক্লান্ত, অভুক্ত অশোক আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে গভীর নিদ্রায়। খানিক বাদে ডাকাডাকিতে ঘুম

ভেঙে যায়; বৌটি বলে, "একটু উঠে আসুন; বোকা চাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম, ভাত হয়ে আছে। এখন তো আর ছুতে পারব না. উঠে তুলে নিতে হবে আপনাকে।"

বোকা চাল আসাম দেশের এক রকম চাল, ঘণ্টাখানেক জলে ভিজিয়ে রাখলে আপনি ভাত হয়ে যায়। ঘুম-জড়ানো চোখে উঠে অশোক ভাত তুলে নিয়ে খেতে বসে। উপকরণ অতি সামান্য—একটু তেঁতুল আর গুড়। আসল কথা, ঐ সব আদিবাসীদের ধারণায় গৃহকর্তা যদিও বড়লোক কিন্তু অশোক জানে, তার অর্থ হয়তো তার নিজস্ব বিঘে দুই চাষের উপযুক্ত জমি আছে—ঐ পর্যন্তই।

রাত কোন রকমে ঘুমে-জাগরণে কাটিয়ে সকালবেলায় অশোক বিদায় নিতে যায়। স্বামীস্ত্রী বার বার অনুনয় করে বাড়ী ফিরে যেতে। বৌটি বলে, "ছিঃ, এমন করে মাকে কাঁদাতে হয়? বাড়ী ফিরে কিন্তু নিশ্চয় যাবে।"

পথে পা বাড়াতেই আবার অশোক মায়ের কথা ভুলে যায়,—তার পথ শেষ হয় নি এখনও। পথের দু'ধারে নিশ্চল নিষেধের মত দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের সারি। বিরাট বিরাট কালো পাথর দিয়ে গড়া সেই পাহাড়, আর সেই পাহাড় ঢাকা পড়ে গেছে শ্যাম সমারোহে। আসামে বৃষ্টির আধিক্য হওয়াতে বৃক্ষ-তৃণ-লতার অত্যন্ত প্রাচুর্য; ফুলের পরিমাণ কিন্তু নিতান্ত কম। পাহাড়ের শিলাস্তূপ বেয়ে এখানে সেখানে ঝরছে ঝরণার স্ফটিক জলের ধারা,—শোনা যায় জলের একটানা কুলু কুলু শব্দ। তারপর কোথাও বা খাদ, কোথাও সঙ্কীর্ণ বঙ্কিম গিরিপথ, কোথাও বা উপত্যকার স্বল্প সমতল ক্ষেত্র; পাহাড়ের ঢালু অংশে কোথাও শস্যক্ষেত্র। সব কিছু মিলিয়ে অশোকের কাছে ভারী অপূর্ব্ব মনে হয়, মনে হয় এ সব কিছুই যেন প্রাণবন্ত।

আবারও দু'-তিনটে পাহাড় পেরিয়ে মাইল বারো-চৌদ্দ হেঁটে অশোক পড়ন্ত বেলায় অতিথি হ'লো এক বাড়ী। সে রাত্রের মত আহার ও আশ্রয় জুটলো অশোকের।

আবার তার পর দিন। সেদিনও বেলাশেষে এলো এক লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে। দুটি ছেলে খেলছে। জল চাইতে একজন তাকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গেল। ওরা কলিতা—আসামের কায়স্থ শ্রেণী।

বাড়ী ঢুকতেই অশোক আঙিনায় এক বর্ষীয়সীকে দেখতে পেলো—তাঁত বুনছেন তিনি। তাঁতে নিজেদের পরিবারের কাপড় তৈরী করে নেয় আসামের বহু পরিবারের মেয়েরা। বিশেষতঃ ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে মেয়েদের তাঁত বোনা শেখা এক অবশ্য শিক্ষণীয় কাজ।

মহিলা এগিয়ে এসে বসতে দিলেন। আদর-যত্ন করে খেতে বসিয়ে সব পরিচয় নিলেন। অবশ্য অশোক রাগ করে পালিয়ে আসে নি এ কথা বিশ্বাস করতে রাজি হলেন না কিছুতে। তারপর তাকে ছাড়তে চাইলেন না, বললেন ওকে সেখানে থাকতে হবে কয়েক দিন। অশোক যেন বেঁচে গেল। পথের ডাকে বেরিয়ে এসেছিল সে, এখন তাকে ঘিরে ধরেছে পথের ক্লান্তি; মাটির ডাক ছাপিয়ে শোনা যায় মায়ের গলার স্বর। তবু অশোক চলার নেশা যেন কাটাতে পারে না, বাড়ী ফিরে যাবার তেমন গরজ নেই তার।

কয়েক দিন কেটে যায়। ঐ বাড়ীকেই কেন্দ্র করে অশোক চলে যায় বহু দূরে, আবার বেলাশেষে ফিরে আসে।

একদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, শুধু দূরের কুটীরের দু'-একটা আলোর চিহ্ন ছাড়া আর সব চিহ্ন গেছে অন্ধকারে হারিয়ে। একদল লোকের সঙ্গে ফিরছে অশোক। দূরের একটি ঘর হ'তে মেয়েলি কণ্ঠে প্রশ্ন এলো—'ওদের ঘরের লোকের খবর কি?' কথা আসামী ভাষায়, স্পষ্টও বোঝা গেল না, প্রশ্নকারিণীকে দেখা তো গেলই না; তবু সহসা অশোকের মনে হ'লো বাঙালী মেয়ের মিষ্টি গলার টানটুকু যেন এতে মিশে আছে। অশোকের বুকের ভেতরটা যেন তোলপাড় করে উঠল। মেয়েটি হয়তো বা পূর্ববঙ্গের ঔপনিবেশিক, এত দিনে আচারে-ব্যবহারে বাঙালীর রঙ তার হয়তো একেবারেই গেছে ধুয়ে-মুছে, অথচ কেমন করে বাঙালী স্বরের বিশেষ ভঙ্গীটুকু রয়ে গেল তার কণ্ঠে, কে জানে!

সে রাতে অশোকের কাছে এই গৃহ-পরিজন সকলকে মনে হ'লো যেন নিতান্ত অপরিচিত; তার ভালো লাগছে না। তার মায়ের আহ্বান পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূর হ'তে এসে পৌছাল—সুদুর্গম গিরিদেশ, নিবিড় অরণ্যানী অতিক্রম করে। অপরিচিতা মেয়েটির কণ্ঠের স্বর আর তার মায়ের স্বর তার কানে মিশে এক হয়ে গেল। সে রাতে অশোকের ভালো ঘুম হ'লো না।

সকাল বেলাই সে বাড়ী ফিরে যেতে চাইলো। সেই মহিলা বার বার মাথার দিব্যি দিয়ে বললেন অশোক যেন বাড়ীই ফিরে যায়—আর কোথাও নয়। গৃহকর্তা নিজে তাকে পাঁচ মাইল দূরের ষ্টেশনে পৌছে দিয়ে গৌহাটির টিকিট করে দিয়ে এলেন।

তার পর? বাড়ী পৌছে অশোক দেখে বাবা গম্ভীর, মা জলভরা চোখে বলেন, "হতভাগা, তোর এই ছিষ্টিছাড়া খেয়ালের জ্বালায় গলায় দড়ি দেব আমি।"

স্কুলের ছেলেমেহলে কিন্তু অশোকের ভারী মান বেড়ে গেছে। তার চার ধার ঘিরে ছেলেরা গল্প শোনে আর চোখগুলি তাদের হয়ে ওঠে চকচকে। কিন্তু বিমল মন্তব্য করে—"দূর, এত ঘুরে এলি, একটা বাঘের সামনেও পড়তে পারলি না?"

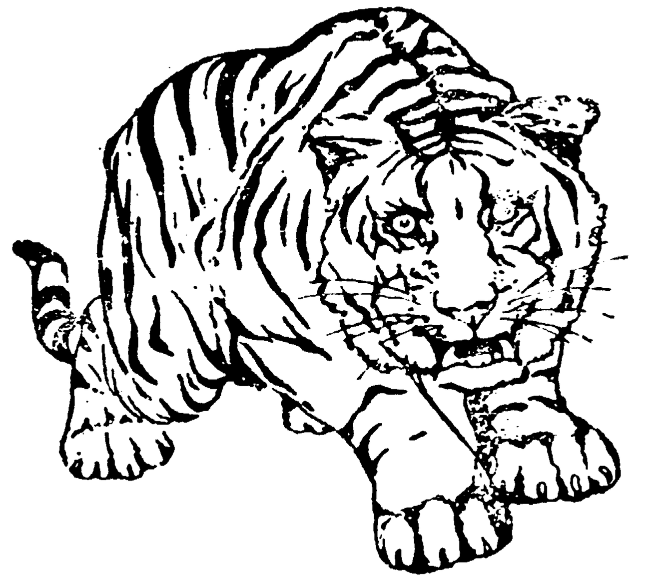

সুইডেনে কয়েকদিন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী, এম্. এ, বি. এল

৫

ব্লুম কাইস্তের মেয়ে ইন্‌গ্‌গেয়ার্ডের নাম আগেই বলেছি। মাঝারি গড়ন তার, মেয়েলি লালিত্যে ভরা। স্বভাবও তার কোমল। সে এক রবিবারে আমাদের নিয়ে গেলো তাদের রাজধানী ষ্টকহোল্ম দেখাতে। নৌকোতে ঘুরে দেখলাম সহর,—সুন্দর সহরের শোভা। তারপর গেলাম ষ্টকহোল্মের প্রসিদ্ধ স্থান স্কানসেনে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে সুসামঞ্জস্যে সাজানো এই বেড়াবার জায়গাটি। এখানে দেখার আছে অনেক কিছু। আছে চিড়িয়াখানা, যেখানে বেশীর ভাগ জন্তুই 'স্কান্‌ডিনেভিয়ান্'। আর এক পাশে আছে ছোট ছোট দু'টো ফ্যাক্‌টরী—শুধু লোকেদের দেখাবার জন্য কি ক'রে তৈরী হয় কাঁচ এবং চীনা-মাটির জিনিষ। আর আছে খোলা মাঠে নাচ, থিয়েটারের ব্যবস্থা. পুরোনো ধরণের বাড়ী, পুরোনো গৃহশিল্পের কল, সরঞ্জাম, খাওয়ার জায়গা ইত্যাদি। স্কানসেন দেখে ফিরলাম রাত প্রায় সাড়ে ন'টায়। ষ্টকহোল্মের অন্য চেহারা 'নিওন' আলোতে। ফেরার পথে 'ইন্‌গ্‌গেয়ার্ড' জানালো 'নর্ডডিস্ক' মিউজিয়াম্ যেন আমি এর মধ্যে দেখে আসি। ষ্টকহোল্ম ছাড়ার আগের দিন আমি দেখতে গিয়েছিলাম নর্ডডিস্ক মিউজিয়াম্। এই মিউজিয়ামের বিশেষত্ব হ'লো এখানে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি পোষাকপরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্র, আসবাবপত্র, ছবি, মডেল ইত্যাদির দ্বারা বেশ সুন্দর ভাবে বোঝান হয়েছে। জিনিষপত্র সাজানোর কৌশলে বিভিন্ন প্রদেশের সংস্কৃতির ক্রমবিবর্ত্তন খুব ভালো ভাবে ধরা যায়।

এখানে একটা জিনিষ বিশেষ নজরে এলো—১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ১৯শ শতাব্দীর প্রথমে এ দেশে এসেছিলো চীন দেশের প্রভাব—ছবিতে, চীনা মাটির পাত্রে, খাট-পালং-আলমারীতে, এমন কি বাড়ীর স্থাপত্যশিল্পে পর্য্যন্ত। যাত্রীদের মত দেখলাম এই মিউজিয়াম্। সুইডেনের বিষয় জান্‌তে হ'লে—সুইডেনের সংস্কৃতির ধারা জান্‌তে হ'লে প্রত্যেক বিদেশীরই ভালো করে দেখা উচিত এই মিউজিয়াম্।

ষ্টকহোল্ম্ কো-অপারেটিভ সোসাইটির একটি ষ্টোরের দৃশ্য (স্ন্যাবকপ্)

১৩ই মঙ্গলবার। ষ্টকহোল্ম কো-অপারেটিভ অর্থাৎ সমবায় সমিতি নিমন্ত্রণ করেছিলো আমাকে তাদের কাজ দেখার। মিস্ এ্যন্-মেরী ইস্‌বেলসন্ 'রিসেপ্‌-শন্ রুমে' আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর কাছ থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করলাম। তিনি সমিতির 'সেল্‌ফ্‌ হেল্প' ক্যান্‌টিনে দুপুরের খাওয়া খাইয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁদের বিভিন্ন ফ্যাক্‌টরী ও ষ্টোর্‌স্ দেখাতে। নতুন ধরণের ষ্টোর্‌স্ হ'লো 'স্ন্যাবকপ্'। এখানে জিনিষ রাখার প্রত্যেক থাকই খোলা এবং খরিদ্‌দারেরা নিজের ইচ্ছেমত প্রয়োজনীয় জিনিষ তুলে নিয়ে দোকানদারকে দাম দিয়ে চলে যায়। দেখলাম এরা প্রত্যেককেই বিশ্বাস করে আর প্রত্যেকেই সেই বিশ্বাসের সম্মান রাখে। বিকালে আমার গাইড্ হ'লেন এই সোসাইটির কর্ম্মিদ্বয়—শ্রীউইগস্ট্রাম এবং একজন আমেরিকান্ ভদ্রলোক শ্রীহেইট্। তাঁদের সঙ্গে আরও কতকগুলি ফ্যাক্‌টরী, মোটারের সমবায় সমিতি ইত্যাদি দেখলাম। পরে উইগ্‌ষ্ট্রাম নিয়ে গেলেন কো-অপারেটিভ সোসাইটির

শিক্ষাকেন্দ্রে। 'সল্‌ট্‌স্জোবাদেন' নামে একটা জায়গায় এই স্কুল। 'ভোর্ গোর্ড'-এ অর্থাৎ এই স্কুলে ঢোকার সময়ে উইগ ষ্ট্রাম্ আমায় দেখালেন তাঁদের বাড়ীর ওপর লেখা ল্যাটিন ভাষার 'মটো', আর তার ভাবার্থ বল্‌লেন—'এখানে নতুন অতিথিকে সাদরে অভ্যর্থনা করা হয়।'

খাবার সময় তখন। উইগ ষ্ট্রাম্ আমায় নিয়ে গেলেন তাঁদের 'ডিনার-হলে'। লক্ষ্য করলাম টেবিলে টেবিলে রাখা নানা দেশের জাতীয় পতাকা। কো-অপারেটিভ আন্দোলনের উদ্দেশ্য পৃথিবীতে সমাজের স্তরবিভেদ তুলে দিয়ে প্রত্যেককেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সামগ্রীর অধিকারী হবার সুযোগ দান এবং তার দ্বারা শান্তিময় জীবন আনা। এই আন্তর্জাতিক মনোভাবের প্রথম শিক্ষা—বিভিন্ন জাতি—তথা তাদের জাতীয় পতাকাকে যথাযোগ্য সম্মান দান। দেখে বেশ ভালো লাগ্‌ল।

সমবেত স্বদেশ-সঙ্গীত করে খাওয়া আরম্ভ হ'লো। সত্যি, এদের মধ্যে রয়েছে জীবনীশক্তি, আর সুচারু শৃঙ্খলা রয়েছে এদের সমস্ত কাজের মধ্যে।

দু'জন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁরা আলাপ-আলোচনায় আমাকে বোঝালেন তাঁদের শিক্ষা-প্রণালী। তার পর তাঁরা নিয়ে গেলেন তাঁদের এক্‌জিবিশন্ রুমে—যেখানে অনেক সামাজিক ও অর্থ নৈতিক তথ্য বোঝানো হয়েছে ছবি ও চার্টের সাহায্যে। এর সঙ্গে দেখালেন তাঁদের মডেল দোকান। এই শিক্ষাকেন্দ্রের আর একটা অঙ্গ হচ্ছে সাধারণ লোকেদের কো-অপারেটিভ আন্দোলন সংক্রান্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা। এই শিক্ষাকেন্দ্রের নতুন আর একটি দিক্ হ'লো 'হাউস-ওয়াইভ্‌স্ জিমনেসিয়াম্' অর্থাৎ 'গৃহিণীদের ব্যায়ামশালা'। সুইডিশ কো-অপারেটিভ মুভমেন্টের অনেক কিছু আমাদের শেখার আছে। এ বিষয়ে পৃথক্ প্রবন্ধে আর একদিন আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

১৪ই জুলাই হ'লো ফরাসী দেশের জাতীয় দিবস। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দিনে ব্যাস্‌টাইল কারাগার পতনের দিন থেকে এই দিন স্মরণীয় দিন। ১৪ই অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় ১৫ই তারিখে ফরাসী ছেলেমেয়েরা জাতীয় সঙ্গীত, নৃত্য, প্যানটোমাইম ও নানা রঙ্গ করে আমাদের আনন্দ দিলো।

মধ্যে একদিন আমরা সকলে হ্রদের ধারের এক পাহাড়ে গেলাম। শান্ত জলের ছায়ায় ছবি পড়েছে অপূর্ব্ব সূর্য্যাস্তের আকাশের। মন উদাসী-করা শান্ত

এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য। পাশের এক সুইডিস্ মহিলাকে বল্‌লাম—'আপনাদের দেশ এত সুন্দর, প্রকৃতি এত মনোরম, আপনাদের দেশ নিশ্চয়ই কবিতে ভরা, আর তাঁদের কবিতা নিশ্চয়ই প্রকৃতির উপাসনা।' তিনি উত্তর দিলেন—'সুইডেন কবির দেশ বটে কিন্তু কবি রূঢ় বস্তুতান্ত্রিক—তাঁদের কবিতায় থাকে কবির ভঙ্গীতে দেখা মানুষের কদর্য্যতা।'

সূর্য্য পাটে যাবার পর তারাহীন আকাশে রূপালী আভা, আকাশের এক কোণে সোনালী চাঁদ, আর হ্রদের জলে তার ঝিলমিলে আলোছায়া। এর সঙ্গে আমরা যোগ করলাম সমবেত নৃত্য, সঙ্গীত, 'ফোক্ ডান্স' আর হাল্কা খেলাধুলা। এই হ'লো সেদিনের সুইডেনের স্মরণীয় সন্ধ্যার রূপ।

রাজার সাজা

(এণ্ডারসনের গল্প থেকে)

শ্রীগৌরী দেবী

এক দেশে ছিলেন এক মস্ত রাজা, আর তাঁর এক-মাত্র নেশা ছিল যুদ্ধ। রাজ্যের পর রাজ্য জয় করেও তাঁর আশ মিটত না। ক্রমাগত সৈন্য সংগ্রহ করে তিনি আরও নতুন নতুন দেশ জয়ের স্বপ্ন দেখতেন। শুধু দেশ জয় নয়, তাঁর সৈন্যেরা যেখানে যেত ধনরত্ন যা পেত লুঠপাট করে আনত। ফসল নষ্ট করে দিত, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে তচনচ করে দিত। শেষে এমন দাঁড়াল, রাজার ভয়ে ভিন্ দেশের রাজারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগলেন।

এদিকে অত্যাচারী রাজার রাজ্যে সমৃদ্ধি আর ধরে না! হবে না কেন, সমস্ত দেশ থেকে ধনরত্ন কেড়েকুড়ে এনে যদি এক জায়গায় সব জড় করা যায় তো সে কি কম কথা! রাজা দেখেন, হাসেন, আর মনে মনে ভাবেন, আমার মত বড় আর কেউ নেই। অবশেষে রাজার মাথায় খেয়াল হ'ল রাজ্যের সমস্ত মন্দিরে তাঁর মূর্ত্তি বসিয়ে তার পূজো করবার ব্যবস্থা করবেন।

রাজার হুকুমে ভাস্করেরা এসে তাঁর হাজার হাজার মূর্ত্তি তৈরী করে ফেল্‌ল।

শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি—ঠিক যেমন মন্দিরে দেবতার মূর্ত্তি গড়া হয় তেমনি। রাজা ভারী খুসী, স্বয়ং গাড়ীতে করে মূর্ত্তিগুলি নিয়ে হাজির হ'লেন মন্দিরের পূজারীদের কাছে। বললেন, "মন্দিরে এর প্রতিষ্ঠা করে পূজোর ব্যবস্থা করুন। আমার প্রজারা আমার মূর্ত্তি পূজো করবে, এই তো উচিত।"

পূজারীরা কিন্তু ভয় পেয়ে গেলেন, বললেন, "মহারাজ, আমাদের কি অসাধ? কিন্তু দেবতার মন্দির—সে রাজ্য তাঁদের। সেখানে মানুষের মূর্ত্তি বসিয়ে পূজো সুরু করলে তাঁরা যদি চটে যান—"

রাজা বললেন, "ঠিক কথা মনে ক'রে দিয়েছেন। আমার খেয়ালই ছিল না। দেবতাদের রাজ্যটা তো জয় করা হয় নি! আচ্ছা, আগে স্বর্গটা জয় করে নি, তার পর দেখা যাবে দেবতাদের জারিজুরি।"

রাজার হুকুমে তখনই তোড়জোড় সুরু হ'ল। তৈরী হ'ল এক বিরাট জাহাজ। তা'তে যুড়ে দেওয়া হ'ল হাজার হাজার ঈগল পাখী। তীর, ধনুক, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে হাজার হাজার সৈন্যসহ রাজা গিয়ে ঢুকলেন সেই জাহাজে—স্বর্গ জয়ের উদ্দেশ্যে। ঝড়ের গতিতে ঈগল-টানা জাহাজ মহাশূন্যে উড়ে চল্ল।

জাহাজ চলেছে তো চলেছেই, পথ আর শেষ হয় না। রাজা অস্থির হয়ে উঠলেন। দেবতারা গেলেন কোথায়? তাঁরা কি একটু বাধাও দেবেন না?

ক্রমে একটি দু'টি দেবদূতের সাক্ষাৎ মিল্‌ল,—পায়ে পালক বাঁধা, স্বচ্ছন্দ গতিতে আকাশের পথে তাঁরা চলে বেড়াচ্ছেন। রাজার হুকুমে সৈন্যেরা তাঁদের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু একটা তীরও তাঁদের গায়ে বিঁধল না। তখন রাজা রেগেমেগে নিজেই এক দেবদূতকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগলেন, এবং অবশেষে একটি তীর গিয়ে সেই দেবদূতের গায়ে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য্য, তীর লেগেও তাঁর বিশেষ কিছুই হ'ল না, শুধু দু' ফোঁটা রক্ত এসে পড়ল জাহাজটার গায়ে।

মাত্র দু' ফোঁটা রক্ত, কিন্তু কী অসম্ভব ভারী! মনে হ'ল জাহাজের গায়ে কে যেন দু'টি লক্ষমণী পাথর চাপিয়ে দিয়েছে। ঈগলেরা সে ভার সইতে পারল না, ঘুরতে ঘুরতে ভীমবেগে জাহাজ শূন্যপথে নীচে নামতে লাগল। সৈন্যেরা কে কোথায় ছিটকে পড়ল তার ঠিক নেই।

সৌভাগ্যক্রমে জাহাজটা ডাঙ্গায় না পড়ে পড়ল গিয়ে জলে। ফলে রাজা সে যাত্রা বেঁচে গেলেন। যদিও অক্ষত শরীরে নয়।

রাজার কিন্তু রোখ কমল না, বরঞ্চ একবার জব্দ হয়ে যেন তা আরও বেড়ে গেল। তিনি আবার আয়োজন সুরু করলেন। এবারে তৈরী হ'ল কয়েক শ' জাহাজ, আর তা'তে যোতা হ'ল লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি শিক্ষিত ঈগল। আবার রাজা প্রস্তুত হলেন স্বর্গজয়ের অভিযানে।

কিন্তু দেবতারা এবার আর ছেড়ে কথা কইলেন না, তাঁরা সুরুতেই পাঠিয়ে দিলেন একপাল ভয়ঙ্কর মশা। সে কি ভয়ঙ্কর মশা! পিন্ পিন্ পিন্ পিন্ শব্দে কানে তালা লাগার যোগাড় হ'ল; তাদের পাখার আড়ালে চারদিক্ অন্ধকার হয়ে এল। ফলে রাজার সৈন্যেরা যে যেখানে পারল ছুটে পালাল। মশারা কিন্তু রাজাকে সহজে রেহাই দিল না—জোট বেঁধে ছেঁকে ধরল। রাজা একটা বিরাট মশারির মধ্যে ঢুকে চেঁচাতে লাগলেন, "শীগগির তীর ছুঁড়ে এগুলোকে বধ কর।"

কিন্তু তীর দিয়ে কি আর মশা তাড়ান যায়? রাজা শুধু লোকের কাছে উপহাসাস্পদই হ'লেন। শুধু তাই নয়, তিনি দেখলেন, সৈন্যেরা যেন তাঁকে আর আমল দিচ্ছে না। তাঁর অদ্ভুত খেয়ালে তারা শুধু বিরক্তই হয় নি, তাঁর বিরুদ্ধে ঘোট পাকাতেও সুরু করেছে।

সে যাত্রা অবশ্যি রাজা মশার হাত থেকে রক্ষা পেলেন—রাজার অবস্থা দেখে মশারাই শেষে তাঁকে ছেড়ে দিল। সেই থেকে রাজা মশাই, স্বর্গ জয় তো দূরের কথা, অপরের রাজ্যও আর কখনও আক্রমণ করতে সাহস পান নি।

নতুন বই

শিক্ষা—স্বামী বিবেকানন্দ। রায় চৌধুরী এণ্ড কোং, কলিকাতা-২৫। দাম ১৲

স্বামী বিবেকানন্দের রচিত গ্রন্থগুলি থেকে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর উক্তিগুলি সংকলন করে 'এডুকেশন' নামে একখানি ইংরেজী বই বার করেছিলেন মান্দ্রাজের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। এ বইখানি তারই বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ও শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়। মহামানবের এই সুচিন্তিত নিবন্ধগুলি আমাদের সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ,—গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে এ যেন আলোর রেখা। এমন একখানি প্রয়োজনীয় সংকলন-গ্রন্থ বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়ে প্রকাশক বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। অনুবাদ বেশ প্রাঞ্জল। বইখানি ছোট-বড় সকলেরই ভাল করে পড়ে দেখা উচিত।

দু' চোখ যেদিকে যায়—শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী। বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিঃ। ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১৷৹

গ্রন্থকার শিশুসাহিত্যের শক্তিশালী লেখক। সরস প্রবন্ধ রচনায় তাঁর যেমন সুন্দর হাত তেমনি সুন্দর তাঁর হাসির গল্পগুলি। এটি অবশ্যি ছোটগল্প নয়, একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস—দু'টি পর্ব্বে বিভক্ত। নায়ক মণ্টু দুই পর্ব্বে দুই মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছে। ঘটনার পর ঘটনা পাঠকের মনে কৌতূহল জাগায়, সুরু করলে শেষ না করে থাকা যায় না। ছেলেমহলে এ বইএর আদর হবেই। ছাপা-কাগজ ভাল, মালাটটিও নতুন ধরণের।

ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব—শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস্ লিঃ, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ২৲

ক্ষুদে শয়তান হচ্ছে বীজাণুর দল। আমাদের চারদিকে যে অজস্র অদৃশ্য বীজাণু ভেসে বেড়াচ্ছে আর নানা রকম অঘটন ঘটিয়ে বেড়াচ্ছে তাদেরই বৈচিত্র্যময় কাহিনী,—কিন্তু এমন সুন্দর ভাবে লেখা যে পড়লে একবারও মনে হয় না যে দুরূহ বিজ্ঞানের কাহিনী পড়ছি। এ যেন উপন্যাসের মতই সরস, তেমনি রোমাঞ্চকর কোন কাহিনী! রচনাভঙ্গীর দিক্ দিয়ে গ্রন্থকার আশ্চর্য্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে সমানে তাল রেখে চলেছে এর মজাদার ছবিগুলি। ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদিও প্রথম শ্রেণীর। তা সত্ত্বেও দামটা আর একটু কম রাখতে পারলে বইখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'ত।

মরণজয়ী বীর—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স্ লিঃ, ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ২৲

বাংলার ও ভারতের কয়েকজন প্রাচীন বীরের অপরূপ বীরত্বের গল্প। গ্রন্থকার প্রবীণ ঐতিহাসিক। ইতিহাসের নানা রোমাঞ্চকর ও বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী সংগ্রহ করে এমন সুন্দর সুন্দর গল্প লিখতে তাঁর সমকক্ষ বেশী নেই। এ দিক্ দিয়ে বইখানি ছোটদের কাছে খুবই মূল্যবান্ হয়েছে। মন-গড়া আজগুবি কাহিনীর চেয়ে এই সব সত্যিকার গৌরবপূর্ণ কাহিনী তাদের মন বেশী আকর্ষণ করবে বলে আমরা মনে করি। এর ঘটনাগুলি যেমন বৈচিত্র্যময়, রচনাভঙ্গীও তেমনি সরস। বহু রেখাচিত্র এবং সুদৃশ্য রঙ্গিন মলাটটি বইখানিকে আরো লোভনীয় করেছে।

কলিকাতার পথের নিশানা ও তথ্যপঞ্জী, ১৩৫৬। ...-কথা। ৬৮।২, মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম।৵০

কলকাতা সহরের লোকসংখ্যা যেমন বেড়েছে এবং বিভিন্ন অঞ্চল,—বিশেষ করে পূর্ব্ব বঙ্গ থেকে এত লোক এসেছে যে পথঘাট খুঁজে বার করা নতুন লোকের পক্ষে সময় সময় বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তা ছাড়া সহরটিও বাড়তে থাকায় এবং নতুন নতুন নামে বহু রাস্তা হওয়ায় পুরোনো অধিবাসীদেরও অনেক সময় মুশ্কিলে পড়তে হয়। এমন একখানি তথ্যপঞ্জী সঙ্গে থাকলে তাঁদের অনেক দুর্গতি কমবে। বইখানিতে রাস্তার পরিচয় ছাড়াও কলকাতা সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া আছে।

বড়দের জীবনের ছোটখাট ঘটনা

বিদ্যাসাগর মশাইএর সহৃদয়তার অনেক গল্প তোমরা শুনেছ। আজ আর একটা শোন।

কালীচরণ ঘোষ ছিলেন সে আমলের একজন নাম-করা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। শুধু চাকরীর জন্য নয়, তাঁর স্বভাবের নানা গুণের জন্য তিনি সকলের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠেন। এঁর স্ত্রীর নাম ছিল কুন্তীবালা। বিদ্যাসাগর মশাইএর সঙ্গে কুন্তীবালার বাপের বাড়ীর ছিল যথেষ্ট হৃদ্যতা। এমন কি কুন্তীবালার বিয়ের সময়ে বিদ্যাসাগরের ওপরই ভার দেওয়া হয়েছিল ছেলে দেখে আশীর্ব্বাদ করার।

কুন্তীবালা বেশ লেখাপড়া জানতেন; কিন্তু হ'লে কি হয়, অল্প বয়সেই একটি ছেলে হারিয়ে তিনি পাগল হয়ে গেলেন। পাগলের কখন কি খেয়াল হয় কে জানে, কুন্তীবালা একদিন গোঁ ধরলেন, বিদ্যাসাগর মশাই না খাইয়ে দিলে তিনি আর খাবেন না। বহু চেষ্টা করা হ'ল,—মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে, অনুনয়-বিনয় ক'রে এবং শেষে জোর-জবরদস্তি করেও তাঁকে এক গ্রাস ভাত খাওয়ানো গেল না। এই ভাবে চল্‌ল কয়েকদিন। শেষে কথাটা বিদ্যাসাগরের কানে পৌছল। তিনি হেসে বললেন, "তা আর কি হবে, মেয়েটা কি না খেয়ে মারা যাবে? বেশ, আমি দু'বেলা গিয়ে তাকে খাইয়ে আসব।" যেমন কথা তেমনি কাজ। সেই থেকে বিদ্যাসাগরের নতুন কাজ হ'ল সকালে বিকেলে কালীচরণ বাবুর বাড়ী গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে আসা। এক-আধ দিন নয়, কয়েক মাস ধরে নিত্য চল্‌ল এই কাজ। অবশেষে কুন্তীবালার সুমতি হ'ল, তিনি বিদ্যাসাগরকে রেহাই দিয়ে আবার নিজের হাতেই খেতে সুরু করলেন।

*

তারাকান্ত রায় ছিলেন কৃষ্ণনগরের একজন শ্রদ্ধেয় পুরুষ—কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ঠাকুরদা'র বড় ভাই। তাঁর সম্বন্ধে একটি গল্প শোন।

তারাকান্ত কৃষ্ণনগরের রাজ-সরকারে একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য কোমল ছিল তাঁর স্বভাব। একদিন। তখন শীতকাল। রাজবাড়ী থেকে ফিরতে তাঁর দেরী হয়ে গেল। বাড়ী এসে দেখেন তাঁর রাঁধুনে বামুন তাঁরই বিছানার ওপর আরামে

শুয়ে তোফা ঘুম লাগিয়েছে। অন্যান্য দিন সে মনিবের বাড়ী না আসা পর্য্যন্ত জেগে বসে থাকে, তাঁকে না খাইয়ে শোয় না। তারাকান্ত ভাবলেন, বামুন ঠাকুর যখন অন্য দিনের মত না জেগে থেকে তাঁরই বিছানায় শুয়ে পড়েছে তখন নিশ্চয়ই তার শরীর সুস্থ নয়। অসুস্থ মানুষকে জাগানো উচিত নয়—এই ভেবে তারাকান্ত খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করলেন, তার পর খান দুই কুশাসন এনে সেই ঘরের মেঝেতে পেতে তার ওপর শুয়ে পড়লেন। শীতের রাত, তাঁর লেপ বামুন ঠাকুরের গায়ে; তারাকান্তর, গায়ে রইল শুধু পাৎলা একখানা চাদর!

ভোর বেলা কে একজন ব্যাপার দেখে মহারাজকে খবর দিয়ে এল। রাজা মশাই ছিলেন খুব আমুদে। খবর শুনে তিনি স্বয়ং চলে এলেন স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখতে। দেখলেন সত্যিই তাই। তারাকান্ত তখনও সেই কুশাসনের ওপরেই আরামে ঘুমোচ্ছেন, আর তাঁর রাঁধুনে বামুন লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে তাঁরই বিছানায়।

মহারাজ আসতেই একটু হৈচৈ হ'ল, তারাকান্তের ঘুমও ভেঙ্গে গেল। রাজা বললেন, "এ কি কাণ্ড! নিজের বিছানা চাকরকে ছেড়ে দিয়ে মেঝেতে পড়ে আছ, ব্যাপার কি?"

তারাকান্ত সহজ কণ্ঠে বললেন, "এতে আমার কোনই কষ্ট হয় নি। কিন্তু ও বেচারার শরীর যদি সত্যই অসুস্থ হয়ে থাকে তবে ওকে তুললে ওর যে বাস্তবিকই কষ্ট হ'ত!"

*

বিদ্যাসাগর মশাইএর মা ভগবতী দেবী সম্বন্ধেও এই রকম একটি গল্প আছে। একদিন একটি গরীব স্ত্রীলোক ছোট একটি ছেলের হাত ধরে ভগবতী দেবীর কাছে হাজির— "ছেলেটা শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছে, যদি গায়ে দেবার জন্য একটা ছেঁড়া কাপড়-চোপড় দেন তো বড় উপকার হয়।"

ভগবতী দেবী বললেন, "কিন্তু এখন শীতকাল, ছেঁড়া কাপড়ে কি ওর শীত মানবে? লেপ চাই যে! আচ্ছা রোস, দেখছি।" তিনি ঘরের ভিতর চলে গেলেন এবং একটু পরেই নিজের লেপটি নিয়ে এসে স্ত্রীলোকটির হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও, তোমার ছেলের গায়ে জড়িয়ে দিও।"

কাউকে কিছু না বলে ভগবতী দেবী আঁচলের খুঁট গায়ে দিয়ে উনুনের পাশে বসে সে রাত কাটিয়ে দিলেন। ঘরে আর লেপ ছিল না, শীতও পড়েছিল দুর্জ্জয়।

এমন মা না হ'লে বিদ্যাসাগরের মত ছেলে হয়?

কি ও কেন

খুব উঁচু জায়গায় উঠে নীচে তাকালে মাথা ঘোরে কেন?

এর উত্তর আর কিছুই নয়, অনভ্যাসের ফল। আমরা সাধারণতঃ সামনা সামনি তাকাই। রাস্তাঘাট, গাছপালা বা আকাশের দিকেই তাকাতেই আমাদের চোখ অভ্যস্ত। পায়ের নীচে মাটীর চেয়ে দূরে কোন কিছুর দিকে আমাদের বড় একটা তাকাতে হয় না। কাজেই কোন উঁচু জায়গা—ধর কোন উঁচু বাড়ী বা মিনারের ওপর থেকে নীচে তাকালে বা উঁচু

পাহাড়ের ওপর থেকে নীচেকার গভীর খাদের দিকে দৃষ্টি দিলে স্বভাবতঃই আমাদের অনভ্যস্ত চোখ অস্বস্তি বোধ করে। মনে হয় ভয়, এবং তারই ফলে মাথাও মনে হয় যেন ঘুরছে। যারা এ ভাবে দেখতে অভ্যস্ত তাদের কিন্তু এ রকম হয় না। রাজমিস্ত্রীরা উঁচু বাড়ীর গায়ে বাঁশের ভারা বেঁধে অবলীলাক্রমে কাজ করে যায়। অভ্যাসের দরুণ এতে তাদের কোন অস্বস্তিই পোহাতে হয় না।

চোখের পাতা না ফেলে বেশীক্ষণ থাকা যায় না কেন?

চোখ হচ্ছে আমাদের শরীরের একটা খুব কোমল অঙ্গ। শুধু কোমল নয়, অত্যন্ত স্পর্শপ্রবণ। সামান্য এক কণা বালি ঢুকলেই চোখের যন্ত্রণায় আমরা অস্থির হয়ে উঠি। এই জন্য প্রাকৃতিক নিয়মেই আমরা ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলে চোখকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। এ ছাড়া চোখের দু'ধারে যে গ্রন্থি আছে,—যা থেকে চোখের জল বেরোয় —তা চোখের পক্ষে খুব দরকারী জিনিষ। ক্রমাগত চোখের পাতা ফেললে ঐ জলটাকে সমস্ত চোখের ওপর ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে বাতাস লেগে চোখ যাতে চট্‌পট্ শুকিয়ে না যায় সে ব্যবস্থাও করা হয়।

সাত বারের নাম কি করে হ'ল?

বাংলা সাত বারের নাম হয়েছে সূর্য্য, ৫টি গ্রহ ও একটি উপগ্রহ থেকে। রবি হচ্ছে সূর্য্য। একেও অবশ্যি এককালে গ্রহ বলেই অভিহিত করা হ'ত। তার পর সোম অর্থাৎ চন্দ্র হচ্ছে একটি উপগ্রহ। বাদ বাকি মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এরা সবই এক-একটি গ্রহের নাম। ইংরেজী সাত বারের মধ্যে ৪টির নাম হয়েছে প্রাচীন স্যাক্‌শন্ জাতির মধ্যে প্রচলিত গ্রহের বা দেবতার নাম থেকে।—টিউখ থেকে টিউস্‌ডে, ওডেন থেকে ওয়েডনেস্‌ডে, থর থেকে থার্স্‌ডে এবং ফ্রিগা থেকে ফ্রাইডে। বাকি ৩টি আমাদেরই মত সূর্য্য, চন্দ্র এবং শনি গ্রহের নাম থেকে নামকরণ পেয়েছে—সান্ থেকে সান্‌ডে, মুন্ থেকে মন্‌ডে এবং স্যাটার্ন থেকে স্যাটার্ডে।

তোমার সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা কর

নীচে ২০টি প্রশ্ন দেওয়া হ'ল, এর অন্ততঃ ১৫টির উত্তর তোমাদের জানা উচিত। শেষ পৃষ্ঠায় উত্তর দেওয়া হ'ল, মিলিয়ে দেখ।

(ক) নীচের লাইনগুলি কার লেখা:—

(১) "ভা'য়ের মায়ের এত স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ,
ও মা, তোমার চরণ দু'টি বক্ষে আমার ধরি।"

(২) "রাবণ শ্বশুর মোর, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখী, ভিখারী রাঘবে?"

(৩) "কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশে নি যারে!"

(৪) "মূর্খ তুমি, মাটি কাটি' লভি' কোহিনূর
ফেলিয়া সে রত্ন হায়, কে ঘরে ফিরিয়া যায়
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর!"

(৫) "কে এমন পাইয়াছিল, কে এমন হারাইয়াছে?"

(খ) নীচের চরিত্রগুলি কোন্ বইএ আছে—

(৬) হিজ্‌বিজ্‌বিজ্, (৭) নক্ষত্র রায়, (৮) ফ্রায়ার টাক্, (৯) ফ্রাইডে, (১০) কালকেতু।

(গ) এঁদের কার বাড়ী কোন্ জেলায়?—

(১১) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, (১২) চিত্তরঞ্জন দাশ (১৩) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৪) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৫) প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

(১৬) ডলার কা'কে বলে—আমাদের হিসাবে এর আনুমানিক দাম কত?

(১৭) ইস্পাত তৈরী হয় কি দিয়ে?

(১৮) পেনিসিলিন জিনিসটা কি?

(১৯) পবিত্র জল বলতে হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীরা কে কোন্‌টাকে মনে করে?

(২০) ১০ পাউণ্ড ফুল্‌স্ক্যাপ্ বলতে কি বোঝায়?

যে বই তোমরা পড়তে পার

এমন অনেক ভাল ভাল বই আছে যার নাম আমরা সবাই জানি না [illegible] যার কথা চট্ করে আমাদের মনে আসে না। এ রকম কয়েকখানি বইএর নাম নীচে দিচ্ছি, তোমাদের সুবিধার জন্য—

(১) রবিন হুড (বিখ্যাত দস্যুর গল্প)—কুলদারঞ্জন রায় (এ. মুখার্জি এণ্ড কোং); আইল্যাণ্ড অব ডক্টর মোরো (এইচ. জি. ওয়েল্‌স্-এর বৈজ্ঞানিক উপন্যাস)—অমিয় চক্রবর্ত্তী ও নীলাদ্রিশিখর বসু (অভ্যুদয়প্রকাশ মন্দির); এক যে ছিল যাদুকর (জে. বি, এস, হ্যালডেনএর)—অশোক গুহ (পূরবী পাবলিশার্স); ড্রাগনের নিঃশ্বাস (উপন্যাস)—প্রেমেন্দ্র মিত্র (সিগনেট প্রেস); ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন (উপন্যাস)—হেমেন্দ্রকুমার রায় (ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ); দিনে দুপুরে (হাসির গল্প)—লীলা মজুমদার (সিগনেট প্রেস); জীবজগতের আজব কথা (প্রাণিবিজ্ঞান)—সুবিনয় রায় (দেব সাহিত্যকুটীর); যে জার্ম্মানী হেরে গেছে (২য় মহাযুদ্ধের কাহিনী)—অমলশঙ্কর রায় (ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ); আকাশ গঙ্গা (ভারত ভ্রমণ-কাহিনী)—ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী (দেব সাহিত্যকুটীর); গোর্কীর ছেলেবেলা (জীবনী) খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

সাধ

শ্রীসুনীতি চৌধুরী

চাই নে আমি বড় হ'তে—
চাই নে বড়র মান,
ছোট বলে করব না খেদ,
গাইব বড়র গান।

কুটীরবাসী কৃষক সম
গড়ব তুলে জীবন মম,
দেশের তরে রাখব ধরে
পণের সাথে প্রাণ।

ক্ষুদ্র হ'য়ে দেশের সেবায়
থাকব চিরদিন,
অবহেলায় ঠেলব নাকো
অতিথ-ফকির দীন।

বুকের মাঝে রাখব খুঁজে
পরের ব্যথা কোথায় বাজে,
তাদের বোঝা আপন শিরে
বইব দিয়ে স্থান।

ঝাঁটা ও ফুলের সাজি

শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী

আঁস্তাকুড়ের ঝাঁটা কহে ডাকি, "ওগো কুসুমের সাজি,
একই কুলে মোরা লভেছি জনম, ভেদ তবে কেন আজি?
কোন্ গুণে তুমি পেয়ে গেলে ঠাঁই বিশ্বের দেবালয়ে?
হেরি আজি তব হেন গৌরব ভেবে মরি বিস্ময়ে।
বিশ্বের যত জঞ্জাল মাঝে প'ড়ে থাকি শুধু আমি,
মোর প্রতি হেন অবিচার কেন, ওগো ত্রিভুবন-স্বামী!"
বিনয়-নম্র বচনে তাহারে সাজি কহে অবশেষে,
"তোমাতে আমাতে ভেদ এতখানি কেবল সঙ্গদোষে।

সে কথা এখন চাপা প'ড়ে গেছে কোন্ সে স্মৃতির তলে,
ঈর্ষ্যা-অনল অন্তরে মোর ধিকিধিকি আজি জ্বলে।
নিখিল বিশ্বসেবায় নিজেরে বিলাইছ তিলে তিলে,
সফল হইল জীবন তোমার এ ব্রত যেদিন নিলে।
অশুচির মাঝে সদাই বিরাজি' বিশ্বেরে কর শুচি,
জগতে কাহার প্রয়োজন বেশী, আজিকে সবাই বুঝি।"

সবুজ নদী—দিনে

শ্রীঅর্চ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

সবুজ মাঠের পথের শেষে বুনো ঘাসের গদী,
ঝিল্‌মিলে রং সবুজ ধুয়ে বইছে সবুজ নদী।
ঘুমিয়ে আছে সুনীল আকাশ, ঘুমায় বসুন্ধরা,
নাই চোখে ঘুম সবুজ নদীর—খুসীতে মন ভরা।

হঠাৎ আকাশ মেল্‌ল আঁখি, জাগে পাখীর কেলি,
পূর্ব্বদিকে অরুণ জাগে রাঙা দু' চোখ মেলি।
একটু পরেই মাঠের ধারে শুনি চাষার গান,
রাখাল ছেলে বাজায় বেণু, মরাল করে স্নান;
বাতাস করে বইতে সুরু ভিজা শিশির-ঘাসে,
নাম-না-জানা কোন্ সে ফুলের গন্ধ ভেসে আসে।

বেলা যতই বাড়তে থাকে রোদটা যে হয় খর,
গরম হাওয়ায় ঝলসে ওঠে দূরের বালুচর।
জলের কোলে রোদের কুচি করে যে চিক্ চিক্,
ফড়িং ওড়ে—কোথায় যাবে পায় না ভেবে ঠিক।
নৌকা বেয়ে খেয়ার মাঝি যায় যে অনেক দূরে,
একটুখানি সামনে গেলেই পথটা গেছে ঘুরে।

দুপুর বেলা সবুজ বনে মাতাল হাওয়া এলো,
কড়া রোদের আবছায়াতে বয় সে এলোমেলো।
বক বসে ঐ পুকুর-পাড়ে নামিয়ে মাথা হেলি',
মাছরাঙা ধায় মাছের আশে শূন্যে দু' পা মেলি'।
সবুজ আলোয় ভীড় করে সব সবুজ নদীর জলে,
রঙিন ঢেউএ রঙিন হাসি রঙিন নাচন চলে।

পঞ্চম

হস্তী-কাহিনী

টুনুকে নিয়ে রুণু একদিন হাজির হ'ল আবার সেই সরোবরের ধারে। সেদিনও সরোবরের হাতীরা প্রথমটা অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে রইল, তারপর কয়েকটি হাতী ডাঙার উপরে উঠে আসল রহস্যটা কি, বোধ হয় সেই তদারকই করতে এল।

তাদের দেখে আজ কিন্তু টুনুর একটুও ভয় হ'ল না। বোধ হয় তা'র ধারণা হয়েছে, সব হাতীই রুণুর মতই শান্ত।

দু-তিনটে ফচ্‌কে বাচ্ছা-হাতী ছুটে এসে রুণুর চারিদিক বেড়ে দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল। তাদের ভাব দেখলে মনে হয়, তারাও যেন টুনুর সঙ্গে খেলা করতে চায়।

টুনুও সকৌতুকে ব'লে উঠল, 'ও রুণু, আমাকে একটু নামিয়ে দাও না!"

রুণু কিন্তু তার কথা শুনলে না। উল্টে এমন চীৎকার ক'রে উঠল যে, বাচ্ছা হাতীগুলো ভয় পেয়ে আবার নিজের নিজের মায়ের গা ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়াল। বোধ হয় সে তাদের ধমক দিলে।

বড় বড় যে হাতীগুলো তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল তারাও বুঝতে পারলে, রুণুর ইচ্ছে নয় আর কেউ তাদের কাছে যায়। তখন তারাও ফিরে গিয়ে আস্তে আস্তে আবার জলের ভিতরে নামতে লাগল।

কাফ্রিদের গ্রামে এখন আর সকলেও রুণুকে দেখে একটুও ভয় পায় না। সে যেন তাদেরও পোষ-মানা জীব হ'য়ে পড়েছে। রোজই কেউ না কেউ তাকে এটা-ওটা-সেটা খেতে দেয়। বিশেষ ক'রে পার্ব্বতী। রুণুর জন্যে প্রতি-

দিনই রেখে দিত কিছু-না-কিছু খাবার। টুনুর হুকুমে রুণুও প্রায়ই তাদের সংসারের জন্যে নানান্ রকম ফলমূল সংগ্রহ ক'রে আনত।

আর রুণুর দেখা পেলে গাঁয়ের শিশু-মহলে উঠত আনন্দের কলকোলাহল। তারাও সবাই কাছে ছুটে এসে আনন্দে খুব লাফালাফি আর চেঁচামেচি সুরু ক'রে দিত। এবং টুনুর মন রাখবার জন্যে তাদের অনেককে মাথায় নিয়ে, রুণুকে খানিকটা ঘোরাঘুরি ক'রে আসতে হ'ত।

এইভাবে কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন। পার্ব্বতীর মনে সর্ব্বদাই দুশ্চিন্তা, কখন্ টুনুর বাপ-মা খবর পেয়ে এসে তাদের কাছ থেকে পাছে তাকে কেড়ে নিয়ে যায়। টুনুকে দেখতে পাবে না, এ কথা মনে হ'তেও পার্ব্বতীর বুকটা ধড়াস্ ক'রে ওঠে। সে যেন একেবারে তাদেরই মেয়ে হ'য়ে পড়েছে।

কিন্তু পার্ব্বতীর সৌভাগ্যক্রমে টুনুর বাপ-মায়ের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। পার্ব্বতীর সকল দুশ্চিন্তা অমূলক, কারণ টুনুর বাপ-মা কেউ এল না তাকে নিজের মেয়ে ব'লে দাবী করতে। তাদের ঘরেই টুনু বেড়ে উঠতে লাগল দিনে দিনে। সেও দেখতে লাগল দুখীরাম ও পার্ব্বতীকে বাপ-মায়ের মতই। নিজের বাপ-মায়ের কথাও মাঝে মাঝে তার স্মরণ হয়, কিন্তু সে যেন ঠিক অনেকদিন-আগে-দেখা স্বপ্নের মত।

রুণুরও নিয়মিত আনাগোনা বন্ধ হ'ল না।

রুণু আর টুনু, দুখীরাম আর পার্ব্বতী, নিজেদের সুখ-দুঃখ নিয়ে বাস ক'রতে থাকুক এই বনগ্রামে, ইতিমধ্যে আমি তোমাদের কাছে হাতীদের কয়েকটি গল্প ব'লে নিই। কিন্তু মনে রেখো, এগুলি বানানো গল্প নয়, এর প্রত্যেকটি হচ্ছে একেবারে সত্য কাহিনী। এগুলি শুনলে হাতীদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্বন্ধে তোমরা একটা ধারণা করতে পারবে।

সিংহকে সবাই আমরা 'পশুরাজ' ব'লে ডাকি বটে, কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, ঐ উপাধিটি হাতীরই প্রাপ্য হওয়া উচিত। বনের আর সব পশুর চেয়ে হাতীরা আকারে ঢের বেশী বড় ব'লেই আমি এ কথা বলছি না; তার চাল-চলন সবই রাজকীয়। এবং এইজন্যেই বোধ হয় স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতীয় রাজা-রাজড়ারা হাতীর সঙ্গে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রেখে এসেছেন। হাতী কেবল হিন্দুদের স্বর্গেই দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন হয় নি, মর্ত্ত্যেও আজ পর্য্যন্ত প্রত্যেক

রাজাই হাতীকে রাজৈশ্বর্য্যের একটি প্রধান সম্পদ্ ব'লেই মনে করেন। হাতী বুদ্ধিমান্ জীব ব'লেই গণেশ-ঠাকুরের মুখের আকার হয়েছে হাতীর মত। হাতীরা মানুষের ভাষা (অর্থাৎ মানুষ তাদের জন্যে যে ভাষা সৃষ্টি করেছে) বেশ বুঝতে পারে। অবশ্য সেই ভাষার শব্দসংখ্যা বেশী নয়—আঠারো-উনিশটি মাত্র।

ভারতে, ব্রহ্মদেশে ও সিংহলে বড় বড় কাঠের গুড়ি তোলবার জন্যে হাতীদের নিযুক্ত করা হয়। সে-সব জায়গায় হাতীদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় তাদের বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ। মাহুত না থাকলেও খুব ভারি ভারি কাঠের গুড়ি তোলবার সময় তারা নিজেদের স্বাধীন বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিতে পারে। কোন গাছের গুড়ি যদি খুব বেশী ভারি হয়, তাহ'লে একসঙ্গে তিন-চারটে হাতী মিলে সেই গুড়ি তুলে বহন ক'রে যথাস্থানে গিয়ে রেখে আসে।

গভীর অরণ্যে দেখা গিয়েছে, দরকার হ'লে অশিক্ষিত বন্য হস্তীরাও এই রকম মিলে মিশে কাজ করতে পারে। হয়তো একটা গাছের কচি ডালপালা দেখে তাদের লোভ হ'ল। কিন্তু সে গাছটা এত বড় আর উঁচু যে, তাকে উপড়ে ফেলা একটা হাতীর কর্ম্ম নয়। তখন সেই গাছ উৎপাটন করবার জন্যে এক সঙ্গে কাজ করে কয়েকটা হাতী। তাদের কেউ কেউ শুঁড় দিয়ে গুড়ির ডাল জড়িয়ে ধ'রে টানাটানি করতে থাকে এবং কেউ কেউ বড় বড় দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়ে গাছের মূলদেশে আঘাত করতে থাকে।

দক্ষিণ-ভারতের মাদুরার বিখ্যাত মন্দির দেখবার জন্যে গিয়েছিলেন এক সাহেব। সেখানে মন্দিরের নিজস্ব কতকগুলি হাতী আছে, তাদের শেখানো হয়েছে ভিক্ষা করতে। সাহেবকে দেখেই একসঙ্গে হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে ব'সে প'ড়ে শুঁড় তুলে সেলাম করলে।

সাহেব কারণ বুঝতে না পেরে অবাক্ হয়ে গেলেন।

মাহুত কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে "হুজুর, হাতীরা আপনাকে সেলাম করছে। ওরা কিছু বকসিস চায়।"

সাহেব হাসতে হাসতে হাতীদের সামনে একটা দু-আনি ফেলে দিলেন।

কী! এতগুলো হাতীর জন্যে এই তুচ্ছ একটা দু-আনি? হাতীরা গেল ক্ষেপে। তারা তখনি সাহেবের মাথার উপরে শুণ্ড আস্ফালন করতে করতে একসঙ্গে চীৎকার ক'রতে লাগল।

বিপদ্ দেখে সাহেব তাড়াতাড়ি সেখানে আরও কয়েকটা দু-আনি ছড়িয়ে দিয়ে তবেই মুক্তি লাভ করেন।

রেঙ্গুনে খুব প্রকাণ্ড একটি কাঠের গোলায় আর একটি হাতীর অদ্ভুত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। সেখানেও একটি মাহুতের অধীনে হাতীরা বড় বড় গাছের গুড়ি গোলার ভিতরে এনে রাখছিল। সব গুড়ি তোলা হয়ে গিয়েছে, বাকি আছে কেবল একটি। একটি হাতী সেই গুড়িটা তোলবার জন্যে এগিয়ে গেল। ঠিক সেই সময় ঘণ্টা বেজে উঠল, এটা হচ্ছে ছুটির ঘণ্টা। এই ঘণ্টাধ্বনি হবার পরেই গোলার কাজ শেষ হয়ে যায়। মাহুত শেষ যে গাছের গুড়িটা প'ড়ে ছিল, সেটা তাড়াতাড়ি তুলে আনবার জন্যে হাতীকে ইঙ্গিত করলে। কিন্তু হাতীর ভাব দেখে মনে হ'ল, গুড়িটা অত্যন্ত ভারি ব'লে সে অনেক চেষ্টা ক'রেও সেটা তুলতে পারছে না। মাহুত তখন বাধ্য হ'য়ে তাকে নিয়ে গোলার বাইরে চ'লে গেল।

পরদিন যথাসময়ে আবার গোলার কাজ আরম্ভ হ'ল। মাহুত সেই হাতীটাকে ভিতরে নিয়ে এসে আবার কালকের-ফেলে-যাওয়া গুড়িটা তুলে নিয়ে যেতে বললে। হাতী এগিয়ে গিয়ে খুব সহজেই দুই দন্তের সাহায্যে গাছের গুড়িটা মাটি থেকে তুলে অনায়াসেই যথাস্থানে গিয়ে রেখে এল।

এখন ব্যাপার হচ্ছে এই। হাতী কালকে ইচ্ছা ক'রেই গুড়িটা তোলেনি, কারণ তখন বেজে গিয়েছে ছুটির ঘণ্টা। তবু সে যে বার বার গুড়িটা তোলবার চেষ্টা ক'রেও অক্ষম হয়েছিল, আসলে তা হচ্ছে লোক-দেখানো অভিনয় মাত্র।

চার্লিস্ মেয়ার সাহেব একটি হাতীর গল্প ব'লেছেন ঃ

মালয় দেশে সাহেবের একটি পশুশালা ছিল। সেই পশুশালার একটা হাতী একদিন গেল ক্ষেপে। হাতীরা মাঝে মাঝে এই রকম ক্ষ্যাপামি অসুখে ভোগে। সাত-আটদিন বাদে আবার তাদের মাথা ঠাণ্ডা হয়।

মেয়ার সাহেব তাকে শায়েস্তা করবার জন্যে তখনি একটা লম্বা হুক নিয়ে তার কাছে ছুটে গেলেন। তার পর হুক দিয়ে বার বার তার পেটের এক জায়গায় মারতে লাগলেন খোঁচা। বেগতিক দেখে হাতীটা তার ক্ষতস্থানটা ঢেকে ফেলবার জন্যে তাড়াতাড়ি মাটির উপরে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। সে আর কোন গোলমাল করলে না। তারই কিছুদিন পরে অষ্ট্রেলিয়ার এক পশু-শালার অধ্যক্ষ সেই হাতীটাকে কিনে নিয়ে গেলেন।

কয়েক বৎসর পরে মেয়ার সাহেবও অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে হাজির হ'ন। তাঁর সেই হাতীটা সিড্‌নি সহরের পশুশালায় আছে শুনে একদিন কৌতূহলী হ'য়ে তিনি তাকে দেখতে গেলেন।

হাতীর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হ'ল না, সে তাঁকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু তার পেটের উপরে সেই পুরাতন ক্ষতের শুষ্ক চিহ্নটা তখনো বর্ত্তমান ছিল। মেয়ার সাহেব আস্তে আস্তে সেই চিহ্নটার উপরে হাত দিলেন। হাতীটা অমনি একটা গম্ভীর শব্দ ক'রে সেই জায়গাটা তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলবার জন্যে ধপাস্ ক'রে মাটির উপরে শুয়ে পড়ল। সাহেবকে সে চিনতে পেরেছিল। তিনি তার পেটে হাত দিতেই তার ভয় হয়েছিল, আবার বুঝি সেখানে হুকের নতুন খোঁচা খেতে হয়!

মেয়ার সাহেব তারপর তাকে মিষ্টি খাইয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে অনেক আদর করলেন। তখন সে আশ্বস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়াল।

সার্কাসে হাতীরা কত রকম মজার খেলা দেখায়, সেটা তোমরা সকলেই জানো। কিন্তু বিলাতে হাতীর দ্বারা গৃহস্থালীর অনেক কাজও করিয়ে নেওয়া হয়। একটা হাতী শুঁড় দিয়ে ঝাঁটা ধ'রে বাড়ীর নানান্ জায়গা প্রতিদিন সাফ্ ক'রে দিত। আফ্রিকার এক জায়গায় একরকম বামন হাতী পাওয়া যায়। সেখানে কেউ কেউ ঘোড়ার বদলে ঘোড়ার গাড়ীতে বামন হাতীদের ব্যবহার ক'রে থাকে।

লণ্ডনের পশুশালার একটা হাতীর গল্প শোনো।

একদিন সে নিজের রেলিং-ঘেরা জায়গাটির ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় এল দুইজন সৈনিক। পশুশালার অনেক দর্শক জীবদের খাবার খেতে দেয়, এই সৈনিক দু'টিরও হাতে ছিল খাবার। তারা রেলিঙের ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে খাবার ধরলে হাতীর সামনে। কিন্তু হাতী যেই মুখ বাড়িয়ে খাবার খেতে গেল, অমনি তারা চট্ ক'রে হাত সরিয়ে নিলে। এই ব্যাপার চলল কয়েক মিনিট ধ'রে।

হাতী তখন বুঝলে, তাকে বোকা বানাবার চেষ্টা হচ্ছে। সে তখন সৈনিকদের দিকে পিছন ফিরে চ'লে গেল, যেখানে তা'র পানীয় জল থাকে সেইখানে। তারপর শুঁড় দিয়ে অনেকটা জল শোষণ ক'রে আবার সে ফিরে রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। সৈনিকরা তখনও অপেক্ষা করছিল, হাতী কাছে আসতেই আবার তাকে খাবারের লোভ দেখালে। হঠাৎ হাতীর শুঁড়টা উঠল উপর দিকে, এবং পরমুহূর্ত্তেই শুঁড়ের ভিতর থেকে হুড় হুড় ক'রে জল বেরিয়ে এসে সৈনিকদের মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত একেবারে ভিজিয়ে দিলে।

সেখানে আরও যে সব দর্শক দাঁড়িয়ে ছিল, তারা সকলেই বিদ্রুপের হাসি হেসে উঠল এবং সৈনিকরাও চম্পট দিতে দেরি করলে না। সেই সময় হাতীটার ভাব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, প্রতিশোধ নিয়ে সে হয়েছে বেজায় খুসি। (ক্রমশঃ)

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

কয়েক মাস রামধনু বেরোতে একটু দেরী হওয়ায় তোমাদের অনুযোগ শুনতে হয়েছে, ভাদ্রের রামধনুতে সে ত্রুটী সামলে নেওয়া গেল। আশা করি এবার থেকে মাসের ঠিক গোড়াতেই তোমাদের হাতে রামধনু তুলে দিতে পারব। 'চিঠিপত্র' বিভাগের নতুন পরিকল্পনার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে এখনও অনেক চিঠি পাচ্ছি, তবে স্বপক্ষেই যেন বেশী। যাই হোক, আগেই বলেছি, আপাততঃ এটি পরীক্ষামূলক ভাবেই প্রবর্ত্তন করা হয়েছে।

এবারে তোমাদের চিঠির ঝাঁপি খুলে বসি। শ্রীঅজিত দত্ত (এলাহাবাদ) জানতে চেয়েছেন বয়স্ক অবাঙ্গালীর বাংলা শেখার জন্য কোন ভাল বই আছে কিনা। উত্তর—আছে। (১) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বেঙ্গলী সেল্‌ফ্‌ টট্‌" নামে ইংরেজীতে লেখা বই। এতে সবই রোমান্‌ অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। (২) শ্রীগোপালচন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত "সরল বংলা শিক্ষা"। এটি হিন্দীভাষীদের জন্য—হিন্দীর সাহায্যে লেখা। এতে বাংলা অক্ষরও ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরণের আরও বই বেরোনো উচিত ছিল কিন্তু আমাদের চোখে পড়ে নি। বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি বা ঐ জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। শ্রীকণিকা দেবী—"পণ্ডিত জহরলাল এ বছর বিশ্বভারতীর সভাপতি হয়েছেন। তিনি কি বাংলা জানেন?" উত্তর—আমরা যতটা শুনেছি—বোধ হয় জানেন না। তাঁর হিন্দীও খুব উর্দ্দুঘেঁষা। শ্রীচন্দ্রনাথ রায়—"সাদা তুলট কাগজ বেশী পরিমাণে কোথায় পাওয়া যায় জানেন কি? কোথায় তৈরী হয়?" উত্তর—ঢাকার আড়িয়ল এবং পশ্চিম বঙ্গে হুগলী জেলায় হয়। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকার থেকেও এই রকম কাগজ তৈরীর ব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতার বড়বাজারে 'খাতাপট্টি' অঞ্চলে খোঁজ করতে পার।

এবারে ব্যক্তিগত চিঠি: রুণু বসু (কাঁচড়াপাড়া)—লেখক-পরিচয় শীঘ্রই সুরু করা হবে। লেখকদের ছবি, তাঁদের মত হ'লে, মাঝে মাঝে দেওয়া যাবে। শিবরাম বাবু কিন্তু রাজী ন'ন মোটেই। বিজ্ঞান খুব পছন্দ হয় বুঝি? এবারে গেল। নজরুলের ভাল জীবনীর সন্ধান পেলে জানাব। স্মরণশক্তির জন্য ক্যাপটেন ব্যানার্জীর লেখাগুলো (রামধনুতে যা বেরিয়েছে এবং বেরোবে) পড়ে দেখ। খুব ভোরে উঠে পড়তে বসলে পড়ায় মন বসবে। আর শরীর খারাপ

হওয়ার দরুণ ঐ রকম হ'লে ডাক্তারের পরামর্শ নিও। সুস্নাত গংগোপাধ্যায় (কলিকাতা-২৬) নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ উঠে গেলেও কাগজ-নিয়ন্ত্রণ আদেশ ওঠে নি। প্রতিযোগিতা আগামী সংখ্যায় থাকবে। বিমলভূষণ রায় (কলিকাতা-৯)—ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক তো তোমাদেরই জন্য। লিখতে লিখতেই হাত আসবে। ধাঁধা বাইরে থেকে বড় একটা নেওয়া হয় না—কেননা পুরোনো বা অন্যত্র প্রকাশিত ধাঁধা বেরুলে সেটা কাগজের সুনাম হানি করে। চিত্রশালার জন্য ফটো পাঠাতে পার। রামধনুর গ্রাহক ও পাঠক সারা ভারত যুড়ে ছড়িয়ে আছে, শুধু কলকাতায় একটা সংঘ করলে অনেককেই যে বঞ্চিত করা হবে! কনককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পানিহাটী)—চৈত্র সংখ্যায় মনোনীত লেখার যে তালিকা দেওয়া হয়েছিল তার কিছু কিছু বেরিয়ে গেছে, এ মাসেও বেরোল। ওগুলো বেরিয়ে গেলেই নতুন তালিকা দেওয়া হবে। সংবাদপত্র বিভাগটা যে সকলেই পছন্দ করছে, ওটা তুলে দেই কি করে? ওর সবগুলিই কি খবরের কাগজে থাকে আর থাকলেও সকলেই কি তা পড়ে? নিমাইলাল শেঠ (পাতিহাল)—তোমার চিঠির ভাবার্থ ভালো বুঝলাম না। ধমক আমরা কাউকেই দেই নি—সাক্ষাতে তো নয়ই, পরোক্ষ ভাবেও নয়। ওটা তোমার ভুল ধারণা। তোমার পরামর্শ বিবেচনা করা হবে। লক্ষ্মীপদ নন্দী (বিবিগঞ্জ—মেদিনীপুর)—তোমার চিঠি এবং লেখা দুই-ই যথা সময়ে আমার হাতে এসেছে। লেখার অভ্যাস তোমাকে আরও কিছুদিন করতে হবে; তোমার গল্পের কাহিনীটি তেমন উল্লেখযোগ্য মনে হ'ল না। সতীশ মুখোপাধ্যায়ের "মেদিনীপুরের ইতিহাস—কোন বড় লাইব্রেরীতে খোঁজ করলেই হয়তো পাবে। ম্যাজিকের টাকা, বুঝিয়ে দিলে, যে কোন ভালো কামার বা যে সব কারখানায় নাট্‌, বোল্ট, স্প্রিং ইত্যাদি তৈরী হয় সেখানে তৈরী করে দেবে। শিবরাম বাবুর লেখা আগামী সংখ্যায় পাবে। তাঁর শরীর সুস্থ না থাকায় অনেক দিন লেখেন নি। মঞ্জুশ্রী বসু (ছাপরা)—শিবরাম বাবুর লেখা সম্বন্ধে ওপরের জবাব দেখ। বৈজ্ঞানিক উপন্যাস আর একখানা লিখবার চেষ্টা করব—তবে সময় লাগবে। তোমাদের সমিতি ও উৎসবের বিবরণ পড়ে খুব খুসী হলাম। সংকল্পে দৃঢ় থাকলে সাফল্য আসবেই। এখন যারা বাধা দিচ্ছে, তখন, দেখো, তারাই দেবে উৎসাহ। 'জীবনস্মৃতি' নিশ্চয়ই পড়বে। বাংলা সাহিত্যে অমন সুন্দর আত্মজীবনী খুব কমই আছে। শর্মিলা সরকার (কলিকাতা)—তুমি এত মন দিয়ে রামধনু পড় জেনে খুব ভাল লাগল। শুধু পড়া নয়, এ নিয়ে চিন্তাও কর দেখছি! তোমার চিঠি খগেন বাবুকেও দেখিয়েছি। অহিভূষণ চৌধুরী (রাজসাহী)—ওপরে কনক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে জবাব দিয়েছি সেটা তোমার বেলায়ও খাটে। অধৈর্য্য হ'তে নেই। পরে মনোনীত রচনা আগে বেরিয়ে গেল এ ধারণা কি ক'রে হ'ল? আগের তালিকায় নাম ছিল না ব'লে? কিন্তু তা নয়। তোমার একটি কবিতা এ মাসে গেল। তুমি যে ত্রুটীর উল্লেখ করেছ তা ভাসা ভাসা ভাবে হয়েছে, আরও স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করবে। ত্রুটী বুঝতে পারলে আমরা অবশ্যই শোধরাবার চেষ্টা করব। ভুলের কথা লিখেছ, কিন্তু কোথায় ভুল উল্লেখ কর নি। ধারাবাহিক লেখাগুলো কয়েকটা বাদে এমন ভাবে লেখা হয় যে সেটাকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা চলে—আগের বা পরেরটা না পড়লেও

বুঝতে অসুবিধা হয় না। ও ছাড়া ছোট কাগজে বড় লেখা দেবার উপায় নেই যে! কিন্তু ঐ লেখাগুলিই তো সবাই বেশী পছন্দ করছে। অবশ্যি সকলের রুচি এক রকম হয় না আমরা জানি। কাজেই তোমার পরামর্শ ভেবে দেখব। কবিতা খুব ভাল লাগে বুঝি?

আজ এই পর্য্যন্ত থাক। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। জয় হিন্দ। —ইতি রাঃ সঃ

১৫ই আগষ্ট

ভারতে ডোমিনিয়ন্ শাসন প্রবর্ত্তিত হবার পর দেখতে দেখতে দু' বছর কেটে গেল। সেই স্মরণীয় তারিখ ১৫ই আগষ্ট আবার ফিরে এল। ঠিক হয়েছে এবারে ঐ তারিখটি অনাড়ম্বর ভাবে পালন করা হবে। শীঘ্রই, কয়েক মাসের মধ্যেই, নতুন শাসনতন্ত্র রচনা শেষ হয়ে গেলে ভারতে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করা হবে—বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সমস্ত সংযোগ ছিন্ন করে (অবশ্য তখনও ভারত কমন্ওয়েল্থ-এর সদস্য থাকবে)। সেই শুভদিনের জন্য সবাই প্রতীক্ষা করছে।

এবারে ১৫ই আগষ্টের কার্য্যসূচীর মধ্যে একটা প্রধান অঙ্গ হচ্ছে 'বৃক্ষরোপণ উৎসব'। এই উৎসব এ দেশে নতুন নয়, বৈদিক যুগ থেকে ওর প্রচলন ছিল। কৃষিপ্রধান দেশে এই উৎসব হচ্ছে সমৃদ্ধির প্রতীক্। মাঝে অবশ্যি বহুদিন লোকে এর কথা ভুলে গিয়েছিল, কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনে এই উৎসবের পুনঃপ্রবর্ত্তন ক'রে সবাইকে এর কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

শ্রীঅরবিন্দ

১৫ই আগষ্ট তারিখটি আর একদিক্ দিয়ে আমাদের কাছে স্মরণীয়। ওটি শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন। প্রথম জীবনে রাজনীতিক্ষেত্রে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রে বর্ত্তমানে এই মহামানব পণ্ডিচেরীর নিভৃত আশ্রম-কোণে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করছেন। এবারে তাঁর বয়স হ'ল ৭৮। তাই দেশবাসীরা ঐ দিন তাঁর জয়ন্তী-উৎসব পালন করবে বলে ঠিক করেছে। ১৫ই থেকে ২১শে—এক সপ্তাহ এই জয়ন্তী-

উৎসব চলবে। কলকাতার জয়ন্তী-সমিতি এর জন্য নানা আয়োজন করেছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রায় চল্লিশ বছর আগে আলিপুরের আদালতে যে ঘরে বোমার মামলায় অরবিন্দের বিচার হয়েছিল সম্প্রতি সেই ঘরেই তাঁর একখানি চিত্র

শ্রীঅরবিন্দ

প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই উৎসবে তাঁর কয়েকজন সহকর্ম্মী, যাঁদেরও ঐ সঙ্গে বিচার হয়েছিল, উপস্থিত ছিলেন।

সাহিত্য-জগতেও অরবিন্দের দান অসামান্য। অবশ্যি সেগুলি এত উচ্চাঙ্গের যে বড় না হ'লে তোমরা তা বুঝতে পারবে না। সেদিন কাগজে দেখলাম, ১৯৫০ সনে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য যে সব সাহিত্যিকের নাম প্রস্তাবিত হয়েছে অরবিন্দও তাঁদের একজন।

২২শে শ্রাবণ

২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের তিরোধান-দিবস। রবীন্দ্রনাথ অমর, তাঁর মৃত্যু হ'তে পারে না। আমরা তাই তাঁর মৃত্যুতিথি পালন না ক'রে জন্মতিথি পালন করারই পক্ষপাতী। সম্প্রতি বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকরাও এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কথা প্রচার করেছেন।

খেলাধূলা

কলকাতার ফুটবল্ লীগ শেষ হয়েছে। ১ম বিভাগে চ্যাম্পিয়ন্ হ'ল ইষ্টবেঙ্গল দল—রানার্স আপ্ মহমেডান্ স্পোর্টিংএর সঙ্গে অনেক পয়েণ্ট ব্যবধান রেখে। ৩য় হয়েছে মোহনবাগান দল। ক্যাল্কাটা গ্যারিসন্ দল প্রথম দিকে যে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল, শেষের দিকে নতুন খেলোয়াড় আমদানী ক'রে তা অনেকটা শুধরে নিয়েছে। ২য় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছে বি. এন্. আর দল। এরা আগামী বছর প্রথম বিভাগে খেলবে।

লীগের পর আই. এফ্. এ শীল্ড প্রতি-যোগিতা সুরু হয়েছে এবং খেলা চলছে। বাইরে থেকে অনেক শক্তিশালী দল এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল্ প্রতিযোগিতা—সন্তোষ মেমোরিয়াল্ কাপ্এর খেলা এ বছর কলকাতায় হয়ে গেল। ফাইনালে পশ্চিম বাংলা দল হায়দ্রাবাদ দলকে শোচনীয় ভাবে ৫ গোলে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করেছে। বাংলা দল প্রায় প্রত্যেক রাউণ্ডেই অনেক গোলের ব্যবধানে বিজয়ী হয়।

আফগানিস্থানের স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষে একটি শক্তিশালী ভারতীয় ফুটবল দল আফগানিস্থান যাচ্ছে খেলতে। এই দলে কয়েকজন ছাত্রও নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

ভাদ্র

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

কেটে গেছে ঘন মেঘ, কুজ্ঝটিকা—
দিগন্তে সোনা-মাখা আলোর শিখা।
ক্ষণে হাসে নীলাকাশ, ক্ষণে বর্ষণ,
ক্ষণে ছায়া, ক্ষণে লাগে আলোর মাতন।
জলে ভরা নদী হের, ফলে ভরা মাঠ,
কচি কচি ঘাসে ভরা পল্লীর বাট।
ডাঙ্গাতে ডোবাতে করে থই থই জল,
সরোবরে শোভা পায় কুমুদ, কমল।
ভাদ্রের গলে দোলে সাতনরী হার
কুন্দ, কৃষ্ণকলি, অপরাজিতার।
পল্লীর বুকে চলে ভাদু উৎসব,
তাল-বড়া হাতে নাচে ছেলেমেয়ে সব।
চাঁদের কিরণে গলা-রূপা ঝরে যায়,
ভরা ভাদরের রূপ দেখবি কে আয়!

———

ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময়ে যীশু খৃষ্টের গায়ে যে জামা ছিল সে জামা নাকি আজও আছে, ট্রেভেস্ সহরের এক গীর্জ্জায়। খৃষ্টানদের কাছে এটি অত্যন্ত পবিত্র। একবার এক প্রদর্শনীতে এই জামা দেখান হয়। তখন নাকি, ইয়োরোপের নানা জায়গা থেকে প্রায় ২০ লক্ষ লোক তা দেখতে এসেছিল।

* * * * *

'অ্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড' ইংরেজী শিশুসাহিত্যের একখানা অতিপ্রিয় গ্রন্থ। বইখানি

ও দেশের লোকের কাছে এত প্রিয় যে গ্রন্থকারের হাতে লেখা ওর প্রথম পাণ্ডুলিপিখানি বছর কয়েক আগে প্রায় সাড়ে ঊনেরো হাজার পাউণ্ডে (প্রায় ২৩২৫০০ টাকা) বিক্রী হয়েছিল।

* * * * *

জ্যৈষ্ঠ মাসে পাঁচ মিশেলীর পাতায় আমাদের দেশে ৭০।৭৫ বছর আগের চা খাওয়ার গল্প পড়েছ। এবার শোন তিব্বতের চা-উৎসবের কথা। তিব্বতের রাজধানী লাসা সহরে পর্ব্ব উপলক্ষ্যে এই উৎসব হয়। হাজার হাজার লোক এতে যোগদান করে এবং সকলে এক সঙ্গে বসে চা খায়। সে চা অবশ্যি আমাদের মত ক'রে তৈরী করা হয় না। প্রকাণ্ড একটা তামার পাত্রে প্রথমে এক পেয়ালা আন্দাজ চা ক'রে দেবতাকে নিবেদন করা হয়। তার পর সেই চায়ের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে মাখন, সোডা, নুন, ভেড়ার চর্ব্বি এবং মন্দিরের দেয়াল থেকে ভাঙ্গা কিছু ইটের গুঁড়ো মিশিয়ে জাল দেওয়া হয়। এই হ'ল গিয়ে চা। সহর শুদ্ধ লোক পরম ভক্তিভরে এই অদ্ভুত চা পাত্র পূর্ণ ক'রে নিয়ে খায়। সারা দিন ধরে চলে এই উৎসব।

———

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

৬০টি বাদুড়

উত্তরদাতাদের নামঃ—সুস্নাত গংগোপাধ্যায় (কলিকাতা-২৬); রত্নাবলী রায় (ভাগলপুর); হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী (চক্রধরপুর); রত্না, জয়ন্ত, স্বপ্না ও ছন্দা রায় (বাঁকীপুর); দিলু, নীলু, বেণু, তুণ্ডু (কলিকাতা-৭); বাণী সাধুখাঁ (কলিকাতা-১৩); রুণু, রঞ্জন, অমল, রুণু (কাঁচড়াপাড়া); নীতীশচন্দ্র বসু (ভন্) (টাকী—সৈদপুর); ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান); কনককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পানিহাটী); বৈদ্যনাথ সিংহ, সুনীল দাস (বেলফুলিয়া); পান্নালাল দাস ও উদ্ধারণ দত্ত (বেলফুলিয়া—খুলনা); বিভাসবিহারী বসু (পাটনা); অশ্বিনী মল্লিক, সুনীল সাউ, রাধাবিনোদ সুরাল, গৌরী ভট্টাচার্য্য (শিলদা); কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত (কলিকাতা-২৯); শর্মিলা সরকার (কলিকাতা); অহীন্দ্রশেখর নায়েক (বোলপুর); কর্ম্মমন্দির মণিমেলা (মধুতটি); বাবলু, খোকন, ছোট্টু মহারাজ (ঘাটশিলা); বিমলভূষণ রায় (কলিকাতা-৯); নবেন্দু সেন (কলিকাতা-২৯); মণি ভাইবোন, বাণীমন্দির শাখা (এলাহাবাদ); স্বপন, তপন, টুটুন কাকু ও মঞ্জু (কাশীপুর—নৈনিতাল), দিলীপকুমার সমাদ্দার (ভাঙ্গা); দ্বিজেন, সমর, তপন (কলিকাতা); সবিতা, এম্. এ. সালেহিন, আলা ও ভোলা (রাজশাহী); হীরেন্দ্র রায় (বরিশাল); টাটা, টুটু, টিটি (জামসেদপুর); প্রদীপকুমার চক্রবর্ত্তী (ডিব্রুগড়); জয়নারায়ণ মিত্র (খড়গপুর); রঞ্জু, মঞ্জু, গৌরী (দিল্লী); এষা সেনগুপ্তা (নিউ দিল্লী), সুব্রত সানাতনি (কাশী); অপু, বাচ্চু, রেখা, মমতা, বেবী, মিণ্টু, মিনু, দিলীপ, স্বপন (জামসেদপুর); আয়েষা ও ফজলুর রহমান (ঢাকা); সীতা ও গঙ্গোত্রী (নিউ দিল্লী); মানস বসু (দেওঘর)।

নূতন ধাঁধা

হরি বাবু লোকটি খুব রসিক। তাঁর চিঠির মধ্যেও রস। বন্ধু রাম বাবুকে লেখা তাঁর এক খানা চিঠির খানিকটা অংশ নীচে তুলে দিলাম। কি করে পড়বে? এর বন্ধনীর ভিতরকার কথাগুলি বদলে তার প্রতিশব্দ বা ভাবার্থ বসাও, তা হ'লেই লেখাটি সহজে পড়তে পারবে।

ও (একটি জানোয়ার) (একটি পদবীর অর্থ), (বৃহৎ) যে চু (যা নষ্ট হয়ে গেছে) প! (আপনার নয়) (আগে নয়) (সুস্বাদু পানীয়) (তৈরী করা) র (খাবার) (যা ডালে থাকে) (মন+মিষ্টি ফল), আ (যাতে ঝুম্ ঝুম্ আওয়াজ হয়) ই (ধারাল অস্ত্র) ও (যে সুরে ভূতেরাই কথা কয়) (গুঁড়ি)! ক' (মাংস) (আকাশ) (চুলের) (ওজন দাঁড়ি) র (পাঠ ক'রে) (হাড়) র হয়ে (প্রাচীন অস্ত্রের অংশ) ম। স (প্রত্যহ) তো (ইংরেজী অক্ষর) (একটি পাখী) (খোকার মাথা) ই (চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ) (নৌকো)! (পক্ষী-মাতা যা দেয়) বে (বৃক্ষশিশু) (হাত) (ইংরেজী উপসাগর) ই (অবশিষ্ট)? এই (লুচি দেখতে যেমন) (যা মুটের মাথায় চাপাও) এ (বড়র পরে+কালের আগে) (নির্ভুল) রা (রোজই যা করি) যে (প্রথম সংখ্যা) (যা কারো কারো মাথায় খুঁজলে পাবে) (খাঁটী দুধে যা পাবে) ৎ।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর (২৫৯ পৃঃ দেখ)

(ক) (১) দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (২) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (৩) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (৪) নবীনচন্দ্র সেন (৫) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (খ) (৬) হযবরল, (৭) রাজর্ষি, (৮) রবিন হুড, (৯) রবিন্‌সন্ ক্রুসো. (১০) কবিকঙ্কণ চণ্ডী। (গ) (১১) হুগলী (১২) ঢাকা (১৩) মেদিনীপুর (১৪) নদীয়া (১৫) খুলনা। (১৬) আমেরিকান্ মুদ্রা—প্রায় ৩৷৷৹ টাকা (অন্য দেশেও ডলার আছে) (১৭) লোহার সঙ্গে সামান্য কার্বন মিশিয়ে। কোন কোন ইস্পাতে ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম্ প্রভৃতি ধাতুও মেশান হয়। (১৮) জীবাণুর সাহায্যে তৈরী এক রকম ওষুধ—নানা রোগে অব্যর্থ। (১৯) হিন্দুর গঙ্গাজল, মুসলমানের জম্ জম্ কুয়োর জল, খৃষ্টানের জর্ডন নদীর জল। (২০) ১৭″ × ১৩½″ মাপের কাগজ, যার এক রিম্ অর্থাৎ ২০ দিস্তার ওজন ১০ পাউণ্ড।

এবারও পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ
আকর্ষণ হবে

দেশবিদেশের লেখা

(৪র্থ খণ্ড)

অন্যান্য বারের মতই নানা বিভাগে সমৃদ্ধ—সাহিত্য, কল্পনা, উপন্যাস, বিপ্লব, পর্যটনা, কাহিনী, আলেখ্য, আরও কত কি।

সারা বিশ্বের বিপ্লবী সংগ্রামের টুকরো টুকরো শ্রেষ্ঠ ছবি। সঙ্গে রাজনীতি, সমাজনীতিরও গোড়ার কথা সহজ করে বলা। দেশবিদেশের রূপকথার ভাণ্ডার জড়ো করা হয়েছে এর এ ক'টি পৃষ্ঠায়।

পৃথিবীর এই সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথীর নাম শোন নি—
ম্যাক্সিম গর্কী, আনাতোল ফ্রান্স, এইচ. জি. ওয়েলস্, হ্যান্স এণ্ডার্সন, কার্লো কলদি, হাওয়ার্ড ফাষ্ট, জ্যাক লণ্ডন, জুলিয়াস ফুচিক, প্যাট্রিক হেনরী, কিকেরো—?

পরিচয় জানো—ভিয়েৎনাম—আর সদ্যমুক্ত চীনের? বিজ্ঞানের সামাজিক দায়িত্ব কতটুকু বলতে পারো? জে. ডি. বার্ণাল দিচ্ছেন তার উত্তর।

আর পাবে ছোটদের শিল্পসৃষ্টির পরিচয়। তোমাদেরই আঁকা ছবির চয়ন।

সম্পূর্ণ নূতন—বলিষ্ঠ—সঞ্চয়ন

**কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়েই
আজই তাগাদা করো।**

শরৎ-সাহিত্য-ভবনের' (১৩৫৬) পূজাবার্ষিকী—'মনোরথ'

শিশুসাহিত্য-সম্রাট
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত

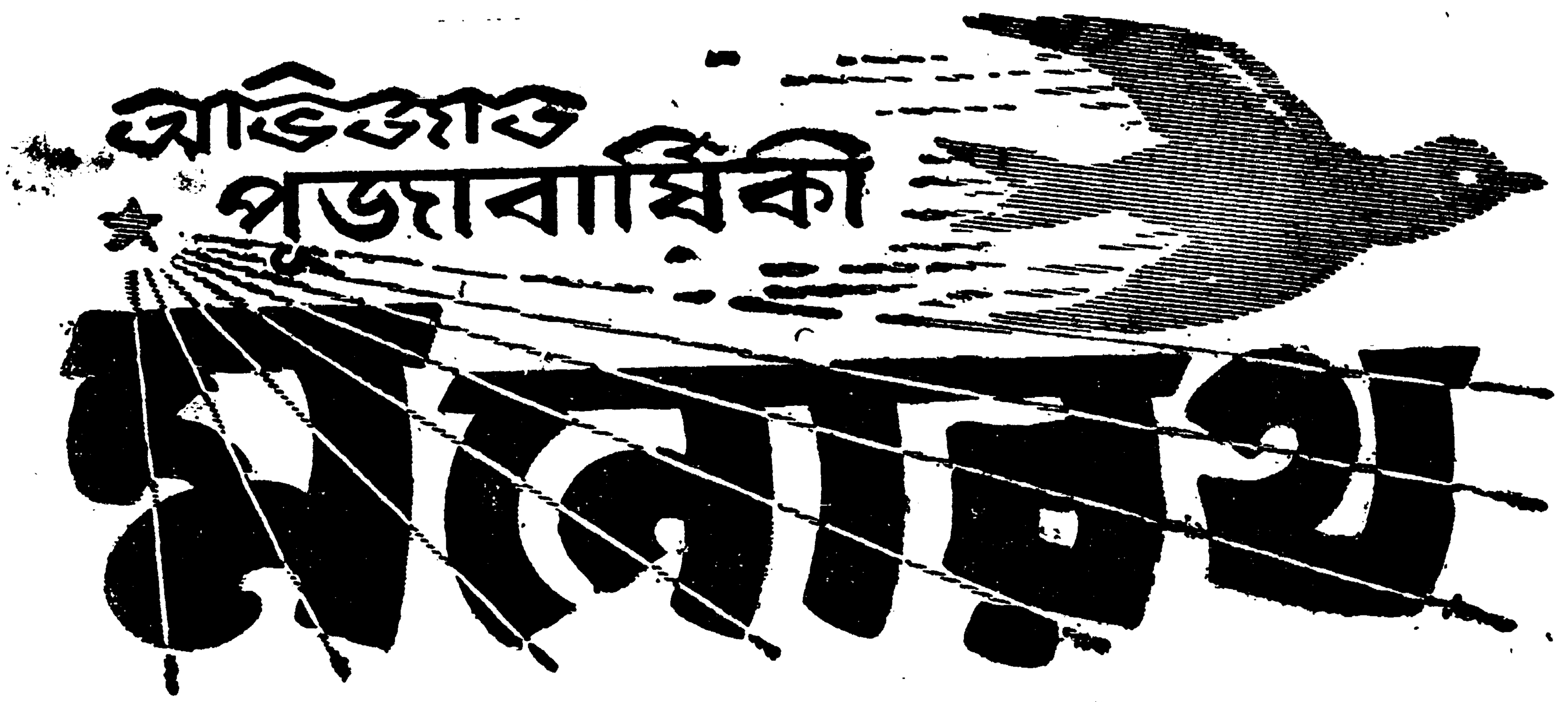

**স্বাধীন দেশের বরেণ্য মনীষীবৃন্দের সুচিন্তিত
রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ—**

বঙ্গবাণীর মানসপুত্র
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

অমৃতক্ষরা পাদপূরণ-প্রতিভায় মধুময়—
তোমাদের অতিপ্রিয় বর্ণবিলাসী শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের চলমান-তূলির স্পর্শে প্রত্যেক চিত্র
ছায়াচিত্রের মত জীবন্ত—নিপুণ প্রয়োগশিল্পী
শ্রীশরৎচন্দ্র পালের

নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনায় 'মনোরথ' যেন স্মৃতির গতি স্মরণমাত্রেই ত্রিলোক-ভ্রাম্যমাণ কল্পলোকের মায়ারথ আর-কি!

আকাশ মাটি আর অতল ঘুরে তোমাদের মনোমন্দিরে বিরাজ করবার জন্য এসেছে, বাণী-পূজার শুচিশুদ্ধ অর্ঘ্য এই "মনোরথ"। বাংলার ছেলেমেয়েদের সীমাবদ্ধ কল্পনাকে সুদূর-প্রসারী করবার জন্যই তো এই "মনোরথের" পরিকল্পনা।

পৃথিবীর এক-প্রান্ত থেকে অপর-প্রান্তে নিত্য যা ঘটে, তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাবে এই 'মনোরথে'র পাতায়-পাতায় কাব্যে-কথায়, চিত্রে-গাথায়। জেনে রেখো, ১৩৫৬ সালের অভিজাত-পূজাবার্ষিকী এই 'মনোরথ' তোমাদের বিশ্রামের অবসরটুকু মধুময় ক'রে তুলবেই।

শরৎ-সাহিত্য ভবন—২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলিকাতা—৪

ছেলেমেয়েদের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পূজা-বার্ষিকী

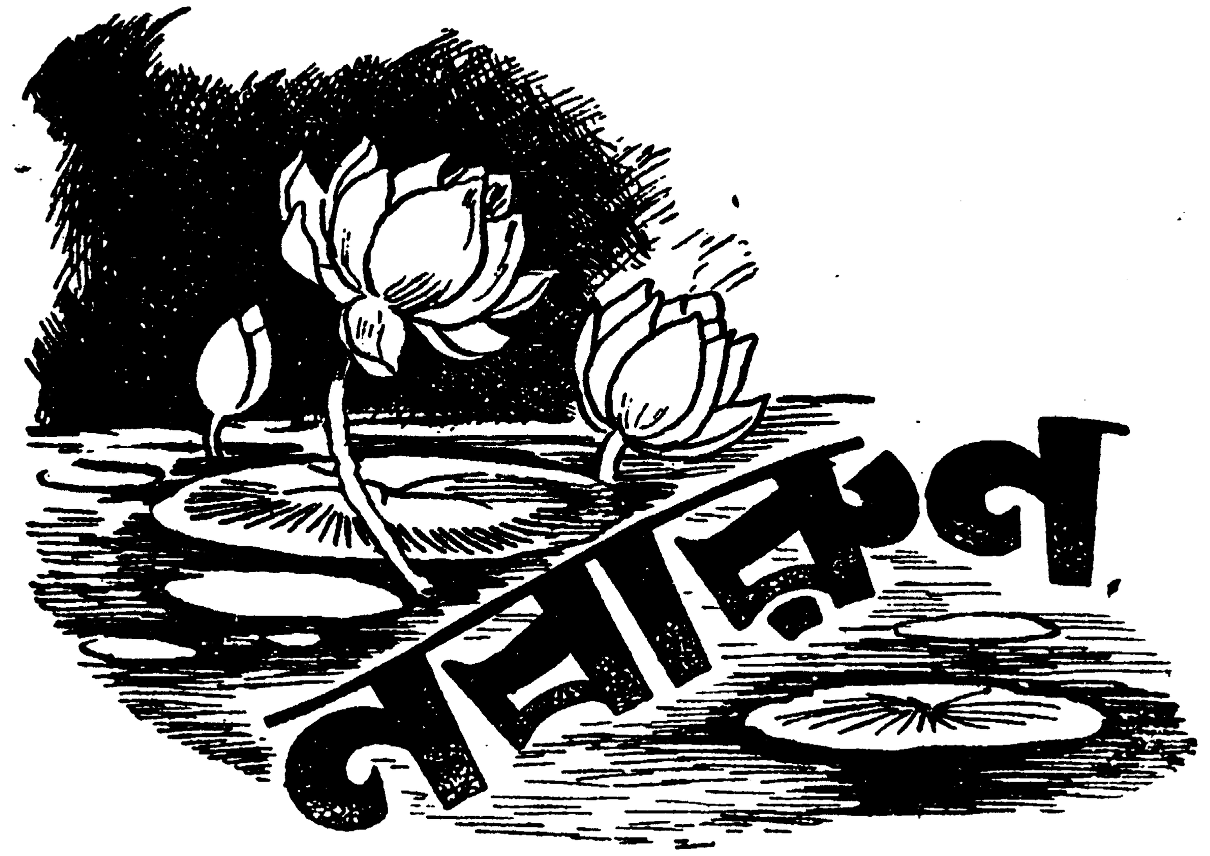

পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে

* গল্প কবিতা নাটক *

* আনন্দের খনি *

* অসংখ্য চিত্রের অ্যাল্‌বাম্ *

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ও চিত্র-শিল্পীদের সমবায়ে গড়িয়া উঠিতেছে

* দেব সাহিত্য-কুটীর, ঝামাপুকুর, কলিকাতা—৯ *

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি	১৷০
পদ্মরাগ	১॥০
সোনার হরিণ	১॥০
নূতন পুরাণ	৸৵০
হাস্য ও রহস্য	৸৵০
চায়ের ধোঁয়া	৸০
হুকাকাশির গল্প	৸০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের

মহাভারতের গল্পগুচ্ছ (১ম)	৸০
ঐ (২য়)	৸০
দিগ্বিজয়ী বীর	৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲

শিবরাম ও মনোরঞ্জনের

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে	৸৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	১৲
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲
আকাশের গল্প	১৷০
আবিষ্কারের গল্প	৸০
ধূমকেতু	৸০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা	১॥০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি	৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

দি লাষ্ট্ অফ্ দি মোহিকান্‌স্	॥৵০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের

অলিভার টুইষ্ট	॥৵০

শ্রীলীলা মজুমদারের

বদ্যিনাথের বড়ি	৸০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়ের

যে জার্মানী হেরে গেছে

(২য় মহাযুদ্ধের কাহিনী—ছোটদের জন্য লেখা)

অনেকগুলি পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি আছে, রঙ্গিন বাঁধান মলাট

দাম দু' টাকা

প্রাপ্তিস্থান—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা

Regd. No. C—1641

রামধনু-সম্পাদক
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

নতুন সংস্করণ
দাম একটাকা

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

২২শ বর্ষ
শ্বিন, ১৩৫৬
ষাণ্মাসিক ২৷০
তি সংখ্যা ৷৵০

এতদিনের অভাব এইবারে পূর্ণ হ'ল

এখন থেকে এক জায়গায় বসেই পাবে—

শারদীয়া ও বিজয়া কার্ড, নববর্ষ ও স্বাধীনতা কার্ড, পূজা, বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবে ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন ডিজাইনের রকমারি চিঠির কাগজ, কার্ড ও খাম, ফটো এ্যাল্‌বাম্‌, অটো-নোট্‌বুক্‌, ফ্ল্যাট্‌ ও নানান্‌ ধরণের ফাইল, হাতে লেখা পত্রিকার জন্য সুদৃশ্য খাতা—ম্যাগাজিন বই, গানের খাতা, শিল্পী, এঞ্জিনীয়ার ও ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের উপযোগী যাবতীয় সরঞ্জাম এবং ঐ ধরণের আরও হরেক রকম জিনিষ। সেই সঙ্গে ডাই ও ডাই প্রিন্টিং।

আমাদের দোকানে এসে বেছে নাও বা অর্ডার পাঠাও।

—আমরা নিজেরাই এ সব তৈরী করছি—

শতাব্দীর শিল্প

১৪৪, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছড়ার ছবি

রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও নন্দলালের ছবি, উভয়ের মণিকাঞ্চনযোগ। কবিতা ছবিকে ও ছবি কবিতাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। শিল্পী ও কবি উভয়ের পরিণত প্রতিভার দান। কাগজের মলাট মূল্য দুই টাকা, সুদৃশ্য বাঁধাই তিন টাকা।

গল্পসল্প

ছেলেমেয়েদের হাতে কবির শেষ উপহার। গল্প ও কবিতা। শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অঙ্কিত মলাট, কবির আঁকা মুখপাতের ছবি। কবির শেষ বয়সের একখানি ফটোগ্রাফও আছে।
মূল্য দেড় টাকা। বোর্ড বাঁধাই, মোটা কাগজে ছাপা, আড়াই টাকা।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলোর ফুলকি

গল্পের বই। শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত মলাট ও প্রচ্ছদপট। বোর্ড বাঁধাই মূল্য দুই টাকা।

বিশ্বভারতী

৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭।

ছেলেমেয়েদের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
পূজা-বার্ষিকী

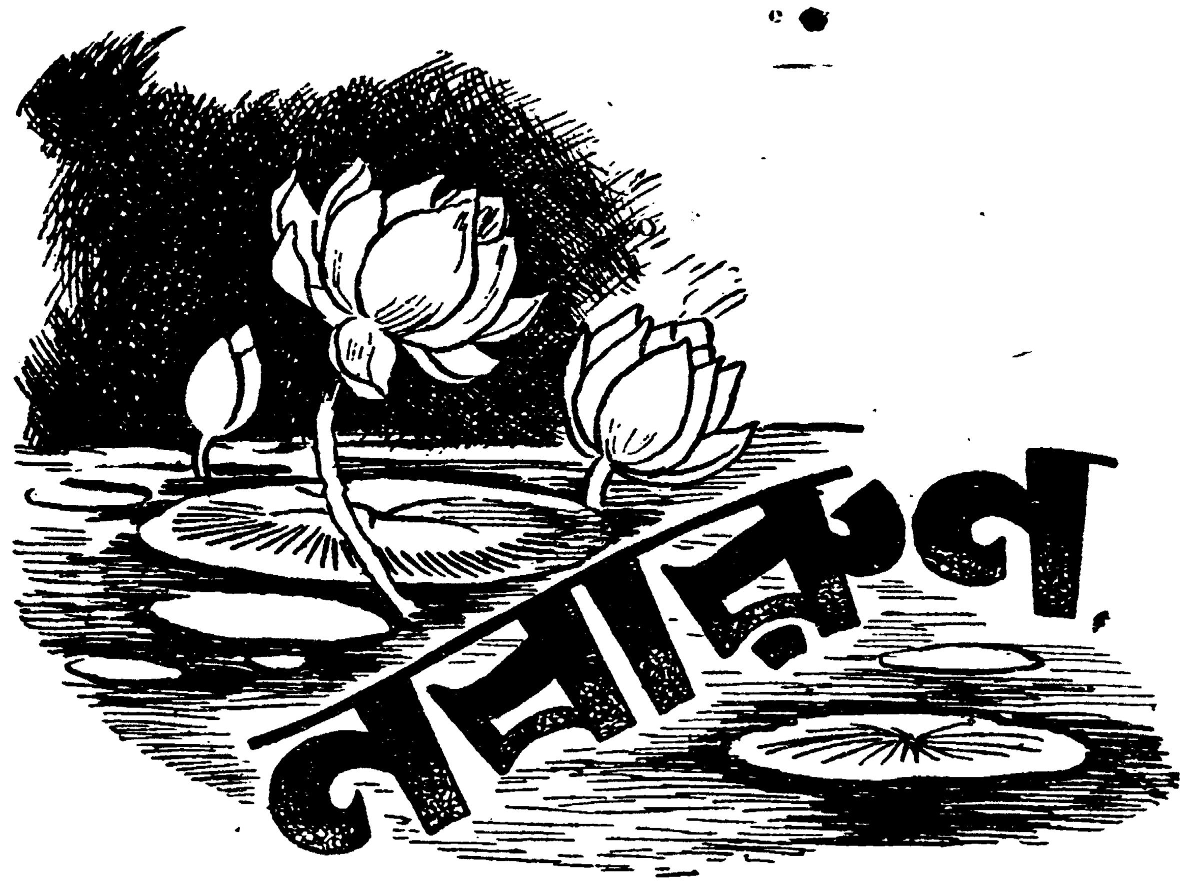

পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে

* গল্প কবিতা নাটক *

* আনন্দের খনি *

* অসংখ্য চিত্রের অ্যালবাম্ *

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ও চিত্র-শিল্পীদের সমন্বায়ে গড়িয়া উঠিতেছে

* দেব সাহিত্য-কুটীর, ঝামাপুকুর, কলিকাতা—৯ *

পূজায় ছেলেমেয়েদের হাতে দেবার মত বই

সুধীরকুমার মিত্র প্রণীত

...রী কানাই ২৲ বাঘা যতীন ১||০

...রী প্রফুল্ল ১||০ তীর্থসপ্তক ২৲

আমাদের বাপুজী ২৲

উমেশ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

...দধীচি মহাত্মা গাঁধী ১৲

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত

...ী ভারতের কথা ২||০

...ত্য-সাধক চিত্তরঞ্জন ২৲

রবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত

...দের তুরস্কের কথা ১||০

...নতায় মহাজীবন ১||০

সুমথ ঘোষ প্রণীত

...াস্কেটীয়ার্স ১||০ কিড্‌ন্যাপড্‌ ১||০

ট্রেজার আইল্যাণ্ড ১।০

শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত

পুতুলপুরী (যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত) ১...

জাঁভালজাঁ (লে-মিজারেবল-এর অনুবাদ)

হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

জেরিনার কণ্ঠহার ১||০ অমৃতদ্বীপ ...

ভয় দেখানো ভয়ানক ১||০

শিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত

হাওড়া আমতা রেলের দুর্ঘটনা ||৵

শঙ্কর আমাদের সব পারে ৷৶...

কৃতান্তের দন্তবিকাশ ১||...

মামার জন্মদিন ৷৶...

ফুটবলের দৌড় ||৵

সুধাংশু হালদার প্রণীত ডিটেকটিভ গল্প

যখের মুক্তি ||৵০ লামার কাণ্ড ||৵

লামার কবলে ||৵০

ডাইনীর পাহাড় ৷৶০

...বীরেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত

...নের জয়গান ২৲

...ণীন্দ্র বসু প্রণীত

...র্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ১।০

...জেন্দ্রকুমার মিত্র প্রণীত

...লের গল্প ১।০

...মিকা বর্জ্জিত মেয়েদের নাটক

গজেন্দ্র মিত্র

||০ সাবিত্রী ||০

জ্যোতীশ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

বহুরূপীর বিপদ ||৵০

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

অজানা দেশে ৷৶০

সুধাংশু দাসগুপ্ত প্রণীত

মায়াদ্বীপ ৷৶০

হেমচন্দ্র বাগচী প্রণীত

মায়া প্রদীপ ৷৶০

স্ত্রীভূমিকা বর্জ্জিত ছেলেদের নাটক

কেশবচন্দ্র সেনগুপ্ত

রাখাল রাজা ।৵০ জয় পতাকা ।৵০

মহারাষ্ট্র গৌরব ||০ অভিমন্যু ।৵০

দেশের ছেলে ।৵০

সোনার বাংলা ।৵০

গজেন্দ্রকুমার মিত্র—বীর বালক ।৵০

দক্ষিণারঞ্জন সেনগুপ্ত প্রণীত

ভরত ।৵০ ভক্তের ভগবান ।৵০

শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

মার্গো সোপ

ছোটদের গাত্রচর্ম্মের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ছোট ছেলেমেয়েরা প্রায়ই অনাবৃত দেহে থাকে এবং বাইরের ধূলা বাতাস থেকে শরীরে রোগের বীজাণু সংক্রামিত হয়। বিশুদ্ধ নিম তৈলের সাহায্যে প্রস্তুত এই সাবান শুধু যে ছোটদের গাত্রচর্ম্মকে এই সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে তাই নয়, মার্গো সোপ ব্যবহারে চর্ম্ম মসৃণ ও কোমল থাকে, ত্বকের লালিত্য ও বর্ণের সুষমা বৃদ্ধি পায়।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কলিকাতা

পূজোয় অভিনয়ের জন্য
দু'খানি অফুরন্ত হাসির ছোটদের নাটক

৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের **দমাদম্ দামোদর ৷৵০**

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের **অয়েল পেন্টিং ।০**

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের
মাধুর্য্য, ভাষা ও মৌলিক ভাবধারা অক্ষুণ্ণ
রাখিয়া কিশোর-কিশোরীদের
পাঠোপযোগী করিয়া
ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের
চিত্র-সমৃদ্ধ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

* কপালকুণ্ডলা * আনন্দমঠ
* চন্দ্রশেখর * দেবী চৌধুরাণী
* মৃণালিনী * সীতারাম
* কৃষ্ণকান্তের উইল * বিষবৃক্ষ
* রাজসিংহ * দুর্গেশনন্দিনী * রজনী
* ইন্দিরা—রাধারাণী—যুগলাঙ্গুরীয়
* কমলাকান্তের দপ্তর

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প-সঙ্কলন
মানিক-মেলা ৩৷৷০
ছোটদের গর্কির মা ১৷৷০

স্যাড্ ভেঞ্চারের সেরা বই :—
গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের
বিজন নদীর তীরে ১৷৷০
রামেন্দ্র দেশমুখ্যের—পাহাড় দুর্গে ১৲
রহস্য-রোমাঞ্চের সেরা বই :—
হিমাংশু গুপ্তের
সীমান্তের রহস্য ১৷৷০ জাপানী ফিফ্থকলম ১৷৷০
ভবানীপ্রসাদ গুপ্তের
মরণের হাতছানি ১৲ মৃত্যুবান ১৲
বাংলা মায়ের দুরন্ত ছেলেদের সচিত্র
জীবনী রত্নমালা :—
ঝকঝকে তকতকে বড় বড় অক্ষরে ছাপা।
প্রত্যেকখানি—৷৷০
ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, যতীন্দ্রনাথ, সূর্য্য সেন, সুভাষচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ
কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ অনূদিত
গীতারত্নামৃত (পদ্য) ১৲

...নী: (পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ) টীকা, সমালোচনা ও ভূমিকা সহ। সম্পাদক ডা: হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ডি. লিট্

পরিবেশক—এম, এল, দে অ্যাণ্ড কোং ১৩/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

এইচ্ জি ওয়েল্সের
গল্প ২৸০
সম্পাদক—
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
দি আইল্যাণ্ড অব
ডক্টর মোরো ২৸০
এইচ্ জি ওয়েল্স্

অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তীর
দি কোর‍্যাল আইল্যাণ্ড ১।০
অপূর্ব্ব সুন্দর অনুবাদ
ব্ল্যাকমেল ১৲
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
অদৃশ্য কালো হাত ৸০
মণিলাল অধিকারীর
রক্তাক্ত-বৃদ্ধ ১।০
মৃত্যু-বিভীষিকা ৸৵০

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
বিশালগড়ের দুঃশাসন ২৲
বিদেহী আত্মা ড্রাকুলার ভয়াবহ কাহিনী
হত্যা এবং তারপর ১৲
সুলুসাগরের ভূতুড়ে দেশ ১৷৷০
সুকুমার দে সরকারের
নিশাচর ১৲
চব্বিশে এপ্রিল, চুপ ১৲
নূতন ধরণের রহস্য-উপন্যাস

V. P. P.র জন্য লেখো—অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, ১০৯-এ লেক রোড, কলিকাতা ২৯

সব রকম বইএর জন্য ঃ ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ,
১ বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

'শিবরাম মানেই হাসি'

শিবরাম চক্রবর্তীর

ভুত ও অদ্ভুত

"...এ হাসি ওজন করা বা দেঁতো হাসি নয়, অথবা কাতুকুতু দেওয়া হাসিও নয়। প্রাণখোলা সরল হাসি। ১॥০

বন্ধু চেনা বিষম দায়

বন্ধু চেনা সহজ নয়! সত্যি বলতে বন্ধুর পথ সর্বদাই বন্ধুর—যেমন মজার তেমনি মজানোর। দাম ১॥০

কুমারেশ ঘোষের

ম্যানিয়া

শ্রীহীন হরিহরপদরজঃ ঘটধ্যালের "শরীর খারাপ" ম্যানিয়া নিয়ে স্ত্রীভূমিকা ও দৃশ্যপট বর্জিত ছোটদের রসনাটিকা। দাম ১৲

পদ্মনাভের

বিপ্লবের সপ্তশিখা

বিপ্লবী ইতিহাসের পটভূমিকায় বাঙলার শহীদদের আত্মোৎসর্গের কাহিনী। দাম ১॥০

দাস ও বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের আদিবাসী

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে অবজ্ঞাত এই আদিবাসীদের স্থান। দাম ১।০

রীডার্স কর্ণার

–৫ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬

পড়িবার মতন কয়েকখানি

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত

বাংলার বিপ্লবী

বাংলার বীর

বাংলার বীরাঙ্গনা

মেবার কাহিনী

অমরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

বাংলার নবরত্ন

মহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত

যান্ত্রিক আবিষ্কার

শিশিরকুমার রাহা প্রণীত

আচার্য্য শঙ্কর

রাধারাণী রায় প্রণীত

রাণী দুর্গাবতী ও চাঁদ সুলতানা

কবি প্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু)

সম্পাদিত

ভাই-বোন

বার্ষিক ৪৲ ষান্মাসিক ২।০, যে কোনো মা[illegible] থেকে যে কোনো মাস পর্য্যন্ত গ্রাহক হওয়া যায়। এমন দিন আসছে যে দিন প্রতি [illegible] ভাইবোনের জন্যে 'ভাই-বোন' না হলেই চলবে না। যারা দেখ নি, বিজ্ঞাপন শুধু তাদের জন্যে, নইলে গ্রাহকরাই এর চলন্ত বিজ্ঞাপন। এজেন্ট কিংবা গ্রাহক হবার জন্যে,—কার্য্যাধ্যক্ষ ভাই-বোন কার্য্যালয়, ৪-এ ঈশ্বর মিল লেন কলকাতা—৬

সিন্ধু বধ

চিত্রপরিচয় দেখ

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরক্ষিত

২২শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৫৬ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শরতের গান

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরা ডাক্‌ল আমার নামটি ধ'রে
এসে আমার পাশে,
যারা আমায় ভালবাসে।
তিনটি রাঙা পাখী—
দোলায় সবুজ শাখী ;
হাওয়ায়-ঝরা শিউলিরা ওই
লুটিয়ে পড়ে ঘাসে ;
ওরা আমায় ভালবাসে।

সাদা কাশের ঝোপে ওদের সাথে
লুকোচুরি খেলা
সোনার শরৎ-ভোরের বেলা।
ফিরছি মরাল সনে
কমল-বনে বনে,
সবুজ মাঠে ছায়ার বাটে
নতুন দিনের মেলা ;
সেথায় নতুন মোদের খেলা।

মাগো, অনেক দিনের পরে এলো
ভালবাসার সাথী,
দিলেম আঁচল আমার পাতি।
এসে তোমার পাশে
বসি দু' ভাই ঘাসে ;
ঘুমিয়ে থেকে কোলে তোমার
কাটবে চাঁদের রাতি ;
শরৎ-ভোরের সাথী।

বাঁশী বাজল শরৎ-আঙিনাতে
নীল গগনের সুর—
মনের বেদন করে দূর।
মিলব বুকে বুকে
কান্না-হাসির সুখে ;
খুলবে দুয়ার নতুন দেশের
অচিন রাজার পুর ;
বাঁশী বাজায় নতুন সুর।

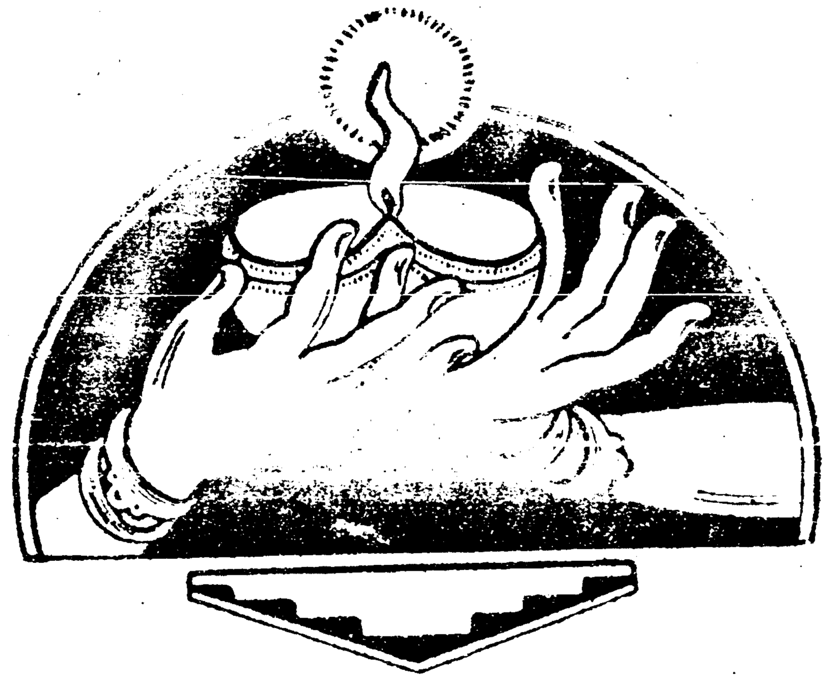

হে বীর, প্রণাম করি

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

—চল্লিশ—

কিছু পথ গিয়ে একটা বাঁকের মুখে মোড় ফিরতেই মুক্ত কৃপাণ হাতে দু'জন গ্রীক সৈনিকের সঙ্গে তাঁরা মুখোমুখি হলেন। দু'জনে পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

একজন বললো—আজ আর তোমার নিষ্কৃতি নেই গ্রীক সম্রাট! তুমি আমাদের পিতা-মাতাকে হত্যা করেছ, আমাদের পথের ভিখারী করেছ। আজ আমাদের প্রতিশোধ নেবার সুযোগ এসেছে, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও, সম্রাট!

—তুমি গ্রীক হয়ে এই কথা বলছ!—মিনান্দার বললো।—আমি গ্রীক জাতিকে মহত্তর করার জন্য সারা জীবন সাধনা করছি, গ্রীক জাতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য আমি হিন্দুস্থানে দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছি। আর তোমরা আমাকে শত্রু বলে মনে করছ?

—আমরা গ্রীক নই সম্রাট! আমি হিন্দু; আমি হনুমানগড়ের রাজকুমারী মালবিকা, আর ইনি কারুষের রাজকুমার অগ্নিমিত্র। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ছদ্মবেশে আমরা সুযোগ অন্বেষণ করেছি। আজ সেই সুযোগ এসেছে, আজ তোমার রক্তে আমরা পিতৃতর্পণ করবো।

মালবিকা শিরস্ত্রাণ খুলে ফেললো, একরাশ চুল ছড়িয়ে পড়লো তার পিঠের উপর।

নাগসেন বললেন—শত্রুকে ক্ষমা করাই মনুষ্যত্ব, রাজকুমারী!

—আপনার ধর্মতত্ত্ব বাস্তব ক্ষেত্রে সব সময়ে কার্য্যকরী হয় না মহাথের! আমার একার শত্রু হ'লে আমি না হয় তাকে ক্ষমা করতাম, কিন্তু যে দেশের শত্রু, সারা হিন্দুস্থানের শত্রু, তাকে ক্ষমা করলে দেশদ্রোহিতা হবে। বহু লোকের হত্যার হেতু যে মানুষটি, সে জীবিত থাকলে আরো বহু লোকের প্রাণহানির কারণ হবে।

—কিন্তু এঁর মনকে যদি আমরা জয় করতে পারি তা হ'লে ইনি বহু লোকের সুখের কারণও তো হতে পারেন?

—তা হয় না মহাথের! সাপ কখনও তার স্বভাব বদলায় না। ওই বিষবৃক্ষ আমরা আর রাখবো না।

—কিন্তু উনি আমার আশ্রিত, আমি ওঁকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

—হিন্দুরা দেশের শত্রুকে এইভাবে প্রশ্রয় দিয়ে জাতির সর্বনাশ করেছে, আমরা আর তার পুনরাবৃত্তি হ'তে দেব না।

—কিন্তু সে জন্য হিন্দুদের মনুষ্যত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নি, মহত্ত্ব বেড়েছে।

—আপনি বিস্মৃত হচ্ছেন, ইনিই আপনার মত মহাত্মাকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। আমরা আপনাকে রক্ষা না করলে আজ আপনি ওঁকে আশ্রয় দিতে পারতেন কি?

অগ্নিমিত্র একটু এগিয়ে এসে মিনান্দারকে আঘাত করার উদ্যোগ করলো। নাগসেন গ্রীক সম্রাট্‌কে আবৃত করে দাঁড়ালেন, বললেন—আমাকে শেষ না করে সম্রাট্‌কে তুমি আঘাত করতে পারবে না।

মালবিকা এগিয়ে এলো, বললো—আপনি আমাদের এই পুণ্যকাজে বাধা দেবেন না মহাথের, এই পিতৃহন্তার রক্তে আমরা আজ পিতামাতার তর্পণ করবো।

নাগসেন তথাপি এতটুকু নড়লেন না।

অগ্নিমিত্র বললো—আপনি গায়ের জোরে আমাদের সঙ্গে পারবেন না মহাথের!

—গায়ের জোরের চেয়ে মনের জোরই বড়, রাজকুমার!

অকস্মাৎ পিছনে কণ্ঠস্বর শুনে দু'জনেই চমকে উঠলো, দেখলো এক বৃক্ষশাখায় আরোহণ করে বজ্রাচার্য্য পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বজ্রাচার্য্য হেসে বললেন—অগ্নিমিত্র, তোমার পিতা তো নিহত হন নি, তুমি মিছামিছি কেন সম্রাট্‌কে দোষারোপ করছ? তোমার পিতা আচার্য্য পুষ্পমিত্র তো আজ মগধ-সম্রাটের মহাবলাধ্যক্ষ হিসাবে সৈন্য পরিচালনা করে গ্রীক সম্রাট্‌কে পরাজিত করেছেন! আর মালবিকা, তোমার দুই ভাই তো আচার্য্য পুষ্পমিত্রের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করছেন, আর তুমি বলছ তোমার ভাইয়েরা নিহত হয়েছেন!

মালবিকা ও অগ্নিমিত্র কয়েক মুহূর্ত্ত কথা বলতে পারলো না, তারা অভিভূত হয়ে পড়লো, তাদের বিদ্বেষ রূপান্তরিত হ'ল ব্যাকুলতায়। বজ্রাচার্য্য হেসে বললেন—এস আমার সঙ্গে।

দু'জনে মন্ত্রমুগ্ধের মত বজ্রাচার্য্যের অনুসরণ করলো।

গ্রীক সম্রাট্ এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার যেন তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তিনি নাগসেনের পায়ের কাছে বসে পড়লেন। পায়ের উপর হাত রেখে বললেন—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন মহাথের, আপনাকে চিনতে আমার ভুল হয়েছিল। আপনি আজ আমার জীবন দান করলেন!

নাগসেন তাঁকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন: বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি!

সেই বাণী ও স্পর্শের মধ্যে কি ছিল কে জানে, গ্রীক সম্রাট্ও ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি!

এক বৃক্ষতলে বসে পুষ্পমিত্র সুমতিসেন ও সুভাগ্যসেনের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন গ্রীক বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করা তাঁদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হবে কি না, এমন সময় সেখানে বজ্রাচার্য্য আবির্ভূত হলেন, বললেন—আপনার গ্রীক জয়ের পুরস্কার এনেছি মহাবলাধ্যক্ষ!

মালবিকা এগিয়ে এসে সুমতিসেন ও সুভাগ্যসেনের পদধূলি গ্রহণ করলো। দু'ভাই সস্নেহে বোনকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁদের চোখ সজল হয়ে উঠলো।

বজ্রাচার্য্য হেসে বললেন—কি আচার্য্য, নিজের পুত্রকে এখনও চিনতে পারলেন না?

—আমার পুত্র!—পুষ্পমিত্র বিস্ময়ে অগ্নিমিত্রের পানে তাকালেন।

বজ্রাচার্য্য অগ্নিমিত্রকে বললেন—কুমার, পিতাকে প্রণাম কর।

অগ্নিমিত্র দু'পা এগিয়ে আসতেই পুষ্পমিত্র দীর্ঘদিনের অ-দেখা ছেলেকে সহসা যেন চিনতে পারলেন, উঠে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। দীর্ঘ বারো বছর বাদে পিতা-পুত্রে মিলন ঘটলো।

পুষ্পমিত্রের আর অগ্রসর হওয়া হ'ল না। উত্তরাপথের ধর্মচক্র তাঁকে অবিলম্বে পাটলিপুত্রে আহ্বান করলো। মগধ-সিংহাসনের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না, ধর্মচক্রের পরামর্শ অনুযায়ী রাণী পুষ্পমিত্রকেই মগধের সম্রাট্ বলে ঘোষণা করলেন। মহাসমারোহে পুষ্পমিত্র রাজপদে অভিষিক্ত হলেন,—মগধে সুঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। মালবিকা অগ্নিমিত্রের জীবন রক্ষা করেছিলেন, পুষ্পমিত্র মালবিকার হস্তেই অগ্নিমিত্রকে সমর্পণ করলেন। মহা ধুমধামে বিবাহ সুসম্পন্ন হ'ল। অগ্নিমিত্র গ্রীকদের পর্য্যুদস্ত করার জন্য বিরাট বাহিনী নিয়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের পথে যাত্রা করলেন। কিন্তু মিনান্দারের সঙ্গে সংগ্রামের আর প্রয়োজন হ'ল না, নাগসেনের প্রভাবে তিনি তখন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন, নতুন নাম গ্রহণ করেছেন—মিলনানন্দ। তাঁর দু'জন অন্তরঙ্গ মন্ত্রী দিমিত্রিয়াস ও আন্তিওকাস্‌ও নবধর্মে দীক্ষিত হয়ে হলেন দেবমন্ত্রীয় ও অনন্তকায়। এইভাবে নাগসেন গ্রীক ও ভারতের নতুন মিলন-সেতু রচনা করলেন। এই মিলনানন্দই পরবর্তী ভারতের ইতিহাসে মিলিন্দ নামে খ্যাত। এঁর ধর্মজিজ্ঞাসা 'মিলিন্দ-পঞহো' (মিলিন্দের প্রশ্ন) নামে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। বৌদ্ধ ধর্মজিজ্ঞাসুরা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই গ্রন্থ পাঠ করেন।

মিনান্দারের অভিযানই ভারতে শেষ গ্রীক অভিযান। এর পর ক্রমশঃ গ্রীকেরা ভারতবাসীর সঙ্গে মিশে ভারতীয় ব'নে যান। গ্রীকদের বৈশিষ্ট্য ভারত তার মহত্ত্ব দিয়ে আত্মসাৎ করে। *

—শেষ—

* অক্ষয়কুমার মজুমদার লিখিত 'হিন্দু হিষ্ট্রি' ও 'ক্যামব্রিজ হিষ্ট্রি অফ্ ইণ্ডিয়া' থেকে ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করেছি। তা হ'লেও এই কাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক বলে মনে করলে ভুল হবে। বঙ্কিমচন্দ্র বলে গেছেন—'উপন্যাস ইতিহাস নয়।'—ইতি লেখক

সাবধানের মার নেই

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ

ছুটির দু'দিন বাইরে কাটিয়ে গোমো প্যাসেঞ্জারে কলকাতায় ফিরছি। গাড়িতে ভিড় নেই। বড় বড় কামরাগুলোর এ কোণে ও কোণে চার-পাঁচজন লোক হাত পা ছড়িয়ে বসে বা শুয়ে রয়েছে। খড়গপুরে গাড়ি থামতেই এক কায়দাদুরস্ত ছোকরা হাতে ছোট্ট স্যুটকেশ নিয়ে আমাদের গাড়িতে উঠ্‌লো। তার পর স্যুটকেশটা একপাশে রেখে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নেমে গেলো। মিনিট কুড়ি দাঁড়িয়ে গাড়ি যখন আবার চলতে সুরু করেছে তখন দেখলুম সে লাফিয়ে গাড়িতে উঠলো। আর, পা ফাঁক ক'রে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ধূমপান করতে লাগলো। গোমো প্যাসেঞ্জারের দোষ হচ্ছে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলা। চার-পাঁচ মিনিট পর পর একটা করে ষ্টেশন আস্‌ছে। গাড়ি থামছে, আবার চলছে; চলতে না চলতেই আবার থাম্‌ছে। খানিকক্ষণ পর যাত্রীদের সত্যিকারের বিরক্তি আসে। তখন কেউ সরবে, কেউ বা নীরবে রেল-কর্ত্তৃপক্ষের মুণ্ডপাত করতে থাকে।

এমনি করে গোটা কতক ষ্টেশন পার হয়ে গেল। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলুম। যতবার গাড়ি থামলো ততবারই ছোকরাটি নীচে নামলো; আর গাড়ি বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলে লাফিয়ে উঠ্‌লো। আরও একটা মজার জিনিষ দেখলুম। বেঞ্চিগুলো খালি থাকা সত্ত্বেও সে একেবারে দরজা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইলো। তোমরা হয়তো বল্‌বে হাওয়া পাওয়ার জন্যে ওই রকম করছিলো। আমার কিন্তু যতদূর মনে পড়ে সেদিন মোটেই রৌদ্র ছিলো না। আকাশ ছিলো মেঘলা, দিনটা ছিলো বেশ ঠাণ্ডা। গাড়ির ভেতরেও আমরা সুন্দর হাওয়া পাচ্ছিলুম। আমার পার্শ্ববর্তী এক প্রবীণ সহযাত্রী যুবকের উদ্দেশে বললেন—"বাবা, গাড়ি ছাড়বার পর ও রকম ক'রে উঠ্‌লে পড়ে যাবার আশঙ্কা আছে।" তার উত্তরে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মুখ কুঞ্চিত করে সে একটি নতুন সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো। তিনিও মানে মানে চুপ করে গেলেন।

আরও কতক্ষণ কেটে গেছে। কলকাতাবাসী আমি,—অনেক দিন পর

দু'-একদিনের জন্যে বাইরে বেরিয়েছি। সবুজ শস্যক্ষেত্র আর গাছপালার শ্যামলিমা চোখে যেন নতুন ঠেকছে। এদিকে এবার বেশ জল হয়েছে। লাইনের পাশের খালবিলগুলো একেবারে থৈ থৈ করছে। মাঝে মাঝে পদ্মবন; পদ্মপাতাগুলো বাতাসে কাঁপছে। রেলপথের পাশে পাশে সাঁওতালদের বস্তি। ওদের নগ্নপ্রায় ছেলেমেয়েরা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে চেষ্টা করছে। একমনে আমি এ সব দেখছি। এর মধ্যে কোন্ সময় গাড়ি একটা ছোট ষ্টেশনে এসে ঠেকেছে লক্ষ্যই করি নি। গাড়ি থেমে আবার চলতে সুরু করতেই হঠাৎ একটা গোল-মালে চমক ভাঙ্গলো। কেউ নিশ্চয় চেন টেনে থাকবে। গরুর গাড়ির মত ক্যাঁ কোঁ আওয়াজ করে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়্‌লো। জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ব্যাপার বুঝলুম। আমার সহযাত্রী যুবক গাড়ি থামতে এবারও নীচে নেমেছিলো। তার পর ট্রেন যখন প্ল্যাটফর্ম প্রায় ছেড়ে এসেছে সে সময় লাফিয়ে উঠ্‌তে গিয়ে হাত ফস্কে ও পা পিছলিয়ে একেবারে নীচে পড়ে গেছে। লোকজন এসে ধরাধরি করে যখন তাকে তুললো তখন তার দু'গাল বেয়ে রক্ত পড়ছে আর সে সম্পূর্ণ অজ্ঞান। বুঝলুম আঘাত গুরুতর। যুবক প্রায় অকারণে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলো। গোলমালে আমরাও ঘণ্টা চারেক দেরীতে হাওড়ায় পৌঁছলুম।

আমার বক্তব্যের কিন্তু এইখানেই শেষ নয়; বরং এখান থেকেই সুরু। আমি বলতে চাইছি এই যে আমাদের জীবনে যে সব আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে তার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশটার মূলে রয়েছে অনর্থক অসাবধানতা। 'সাবধানের মার নেই' বলে যে প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে তার মধ্যে কতখানি সত্যি রয়েছে সে সম্বন্ধেও তোমাদের সঙ্গে একটু আলোচনা করবো।

বড় বড় সহরের পথে-ঘাটে হামেশা যে সব দুর্ঘটনা ঘট্‌ছে খোঁজ নিয়ে দেখলে বোঝা যাবে তাদের মধ্যে অধিকাংশই অসতর্কতার ফল। তুমি কলকাতা কি বোম্বাইএর প্রশস্ত রাজপথ পার হচ্ছো। এদিক্ ওদিক্ থেকে প্রতি সেকেণ্ডে আস্‌ছে ট্রাম, বাস্, লরী ও মোটর গাড়ি। এ সময়ে সামনে ও পেছনে, ডানদিকে আর বাঁদিকে নজর রেখে চলা দরকার। তা না করে নেহাৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তুমি এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে, বা এক লাইন সিনেমার গান ভাঁজতে ভাঁজতে, বা অন্য কোন ভাবনায় তন্ময় হয়ে যদি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বসো, তা হ'লে দোষ দেবে কার? চোখ-কান দু'টোকে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় ভগবানের কাছ থেকে তুমি পেয়েছো। কিন্তু দু'টোর সম্যক্ ব্যবহার করতে শিখতে হবে

তোমাকেই। চোখ খুলেও যদি তুমি না দেখো, কান থেকেও তুমি যদি না শোনো তা হ'লে পদে পদে তোমাকেই ভুগতে হবে।

এ তবু ভালো। আর এক ধরণের লোক আছে যারা অতিরিক্ত চালাকি করতে গিয়ে বিপদে পড়ে। আমার গল্পের যুবক হচ্ছে ঠিক এই রকমের মানুষ। এই সব লোক গাড়ি না চললে নামবে বা উঠ্‌বে না। গাড়ি এসে পড়েছে দেখেও ধাঁ করে রাস্তা পার হ'তে যাবে। ফুটপাথ থাকলেও রাস্তার মধ্যে দিয়ে হাঁটবে। যানবাহন-সমাকীর্ণ পথে অনাবশ্যক দ্রুত সাইকেল বা মোটর চালাবে। এদের ধারণা এরা খুব চালাক, আর এদের কাযকর্ম দেখে জনসাধারণের তাক লেগে যাবে। সাধারণ লোক এদের কতটা বাহাদুরী দেয় জানি না, এরা কিন্তু প্রায়ই বিপদ্ ডেকে এনে নিজেরা মজে এবং অন্যকেও মজায়।

মোটরগাড়ি এবং সাইকেলের চালকদের সতর্কতার অভাবে অনেক হাঙ্গামা ঘট্‌তে দেখা যায়। তুমি যখন নতুন গাড়ি চালাতে শেখো তখন বেশ সাবধান হয়ে রাস্তার নিয়মকানুন মেনে চলো। তার পর যেই পাকা চালক হয়ে ওঠ অমনি নিয়মগুলোকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখতে সুরু করো। এর ফলে কোন না কোন সময় তোমায় দুর্ভোগ ভুগতেই হয়। রাস্তার বাঁদিক্ ঘেঁসে গাড়ি চালানো, আর ডান দিকে এসে সামনের গাড়িকে পেছনে ফেলা—এ দু'টি অতি সাধারণ নিয়ম যা সকলেই জানে। তবু এ দু'টি না মানার ফলে যানবাহনের যত সংঘর্ষ হয় তত বোধ হয় আর কিছুতে নয়।

জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অসাবধানতার ফল কী রকম মারাত্মক হ'তে পারে তা দেখেও আমরা অনেক সময় শিখি না। ভুল ওষুধ বা বেশী ওষুধ খাইয়ে রোগীর সর্বনাশ প্রায়ই করা হয়। শুশ্রূষাকারিণী হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছে, নয় তো অন্য কোন কায করছে। হঠাৎ তার মনে পড়লো রোগীকে ওষুধ খাওয়ানো হয় নি। তাড়াতাড়ি ভালো করে না দেখেই খাবার ওষুধের যায়গায় মালিশের ওষুধ খাইয়ে দিলো; কিম্বা এক দাগের যায়গায় দু' দাগ খাইয়ে দিলো। ফল হ'লো বিষময়। সামান্য একটু সতর্ক হ'লে এটা ঘটে না।

এ রকম দৃষ্টান্ত আরও অনেক দিতে পারি। মোটরগাড়িতে তেল নেওয়া হচ্ছে, আর চালক কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালে। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ হ'লো। ফলে তার হাতটা কি পাটাই উড়ে গেলো। তুমি বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি এলে। মা-বাবা ভিজে কাপড় ছাড়তে বললেন। তুমি গ্রাহ্যই

করলে না। ঠাণ্ডা লাগলো। তুমি ভাবলে ও কিছু না, সেরে যাবে। তারপর নিউমোনিয়ায় তিন মাস ভুগে উঠলে। মোহনবাগান আর ম্যাহামাডান স্পোর্টিংএর খেলা দেখতে যাচ্ছো; চৌরঙ্গীতে বাস থেকে নেমে পড়ি কি মরি করে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলে। যেন সেদিনের ফুটবল খেলা না দেখলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। ফলে হোঁচট খেয়ে পাখানিকে বেশ জখম করলে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছো; ক্ষিদেও পেয়েছে হয় তো। তাই বলে একটু অপেক্ষা যে না করতে পারো তা নয়। কিন্তু মারামারি করে ট্রামের পেছনে ঝুলতে ঝুলতে চললে। হাত ফস্কে পড়ে গিয়ে গায়ে আর মাথায় পেলে বিষম চোট। ইওরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশে ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের চালাক-চতুর হ'তে এবং সাবধান হয়ে চলতে-ফিরতে শেখানো হয়। তার ফলে ও সব দেশে এ রকম দুর্ঘটনার সংখ্যা আমাদের দেশের চেয়ে অনেক কম। ও সব দেশের সাধারণ লোক আমাদের চেয়ে বেশী চটপটে, কিন্তু আমাদের চেয়ে সাবধানও বেশী।

সাবধান না হবার ফলে যে দুর্ঘটনাগুলি সব চেয়ে বেশী ঘটে বিশেষজ্ঞেরা সেগুলির একটা তালিকা প্রস্তুত করেছেন। পড়ে দেখলে বুঝবে সেগুলি সবই আমাদের জানা, তবু সেগুলি থেকেই আমাদের বিপদ্ হয় সব চেয়ে বেশী। তালিকাটি সংক্ষেপে নীচে দেওয়া গেলো ঃ—

১। ছোট ছেলেমেয়েদের দেশলাই নিয়ে খেলতে দেওয়া।

২। জ্বলন্ত অবস্থায় ষ্টোভ ও বাতিতে তেল ভরা।

৩। জ্বলন্ত দেশলাইএর কাঠি বা সিগারেটের টুকরো যেখানে সেখানে ছুঁড়ে ফেলা।

৪। যে ঘরে গ্যাস ছাড়া রয়েছে সেখানে দেশলাই জ্বালা।

৫। ফলের খোসা—বিশেষ করে কলার খোসা—ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলা।

৬। মোটরগাড়ি সামনে এসে পড়লো দেখেও ছুটে রাস্তা পার হবার প্রয়াস।

৭। রেল লাইনের ওপরে বা পাশে খেলা করা।

৮। খেলাচ্ছলে কারুর দিকে সত্যিকারের বন্দুক তাক করে ধরা।

৯। ট্রেন, ট্রাম ও বাস্ চলতে সুরু করলে নামা-ওঠার চেষ্টা।

সাবধানের মার নেই—এ কথা তা হ'লে খুবই সত্যি। তাই বলে মানুষ কি বিপদের সামনে এগুবে না? এগুবে বৈকি। তা না হ'লে সে কি মানুষ? তা না হ'লে কি উন্নতি সম্ভব? বিপদের সামনে না এগুলে সে কি আকাশে উড়তে পারতো? সে কি জলে ভাসতে পারতো? সে কি খনি থেকে কয়লা, সোনা আর

হীরে তুলতে পারতো ? বিপদের সামনে না এগুলে সে কি জীবন দিয়ে তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারতো ? পারতো কি সে বিশ্বমানবের উপকার করতে? তোমার সামনে একজন যদি জলে ডুবে যায়, নিজের প্রাণ দিয়েও কি তুমি তার প্রাণ রক্ষা করতে চেষ্টা করবে না ? জাহাজ যখন ডুবতে বসেছে তখন কাপ্তেন নিজের জীবন দিয়েও কি অন্য যাত্রীদের জীবন রক্ষা করতে চেষ্টা করবেন না ? সর্ব মানবের কল্যাণের জন্যে দধীচি কি যুগে যুগে নিজের অস্থি দান করবেন না ? বিপদের সম্মুখীন তো হ'তেই হবে। তবে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে হ'তে হবে, নিরর্থক বিপদ্‌কে ডেকে আনার মূল্য নেই। বোকার মত অনাবশ্যক বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ায় বাহাদুরী কোথায় ?

সাবধানের মার নেই—এ কথা যেমন সত্যি, অতি সাবধানীর গলায় দড়ি—এ কথাও ঠিক ততখানি সত্যি।

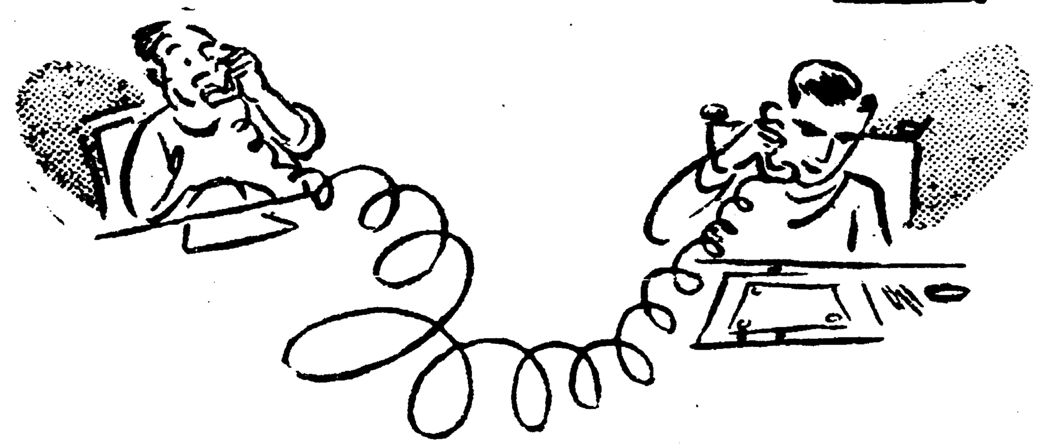

একটা খুনের গল্প

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং! টেলিফোনের ঘণ্টা বাজছে পাশের ঘরে।

গ্রাহ্য করিনে। সবে ফলাও করে গল্পটা ফাঁদছি এমন অসময়ে কিনা ক্রিং? গল্প আবার আমার একটা খুনের গল্প।

'প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডু কৃং করণে',—আচার্য্য শঙ্কর এ কথা বলে গেছেন; কিন্তু বল্‌লে কি হবে, খুনোখুনির মুখোমুখি এসেও অক্ষুণ্ণ থাকা যায় না। আমি অটল থাক্‌লেও ঐ Do-ক্রিং-করণে বিনিকে টলিয়েছে। সে এসে জানায়—"মলয়বাবু ডাকছেন তোমায় ফোনে, খুব জরুরি নাকি।"

মলয়ই দেখছি গল্পটাকে হত্যা করবে। আমার আগেই।

"কাগজময় ইকৃরি মিকৃরি সব কী আঁকা হচ্ছে? শৈলবাবুকে টেক্কা মারার অপচেষ্টা?" বিনি জিজ্ঞেস করে।

"একটা ছক্ কাটছিলাম। গল্পের ম্যাপ আর কি! কি ভাবে সুরু হয়ে কোথায় গিয়ে জিনিসটা কদ্দূর গড়াবে—তারই একটা নক্সা।"

"কী জিনিস?"

"এই—খুন্ খারাপি।"

"খুন!" বিনি যেন স্তম্ভিত হয়।

"কেন, আমি কি খুন্ করতে পারিনে? করলে কী হয়? খুন্ করা কি খারাপ? না, করতে নেই আমার?"

আমি খুন করি

"খুন্ করবে—কা'কে গো?"

"আমার গল্পের নায়ক-নায়িকাদের। আবার কা'কে?"

"ও, তাই বলো। গল্পের খুন্। আমি বলি কী!" ও নিশ্বাস ছাড়ে।

ব'লে, একটু থেমে পুরোনো কথাটাই পুনরায় বলে—"মলয়বাবু ডাকছেন।"

"শুনি গে," ব'লে উঠি। আমার পাত্র-পাত্রীদের মরণের মুখে রেখে অবাঞ্ছিত CALL কোলাহলে যোগ দিতে হয়।

"মলয়, কী খবর?"

"আ মি—আ মি—আ মি—"

খানিক আম্‌তা আম্‌তা করে সে বলে: "আমি খুন্ করতে যাচ্ছি।"

"য়্যা?" নিজের কানকে বিশ্বাস করা যায় না—"ইয়ার্কি করছো নাকি?"

"না, সত্যিই। আমি খুন্ করবো। খুন্ না করলে আমার স্বস্তি নেই—বাঁচবো না আমি।" গলার আওয়াজ শুনে মনে হয় ওর পরিহাস নয়।

"না, খুন করতেই হবে আমায়।" মলয় জানায়।—"আর—আর এ-সুযোগ একবার গেলে—না, এ-সুযোগ হারানো চলবে না।"

সর্বনাশ! আমি ব্যস্ত হয়ে উঠি—"খুন্ করেছো, না, করো নি এখনো?"

"না, এখনো না। এই রওনা হচ্ছি। যাচ্ছি করতে।"

"এক্ষুনি চলে এসো আমার এখানে—চট্ ক'রে।"

"কেন বল তো?"

"আমি বাধা দেব।"

রিসিভার রেখে দিয়ে মলয়ের অপেক্ষা করি। বিনি বলে, "ভালোই হ'লো দাদা, কি করে খুনের গল্প লিখবে ভেবে মরছিলে, কত সোজা হয়ে গেল এখন! মলয়বাবুর সত্যি ঘটনাটা লিখে দিলেই হয়ে যাবে।"

হুম্। খুনের কথায় আমি গুম্ হই।

"এতদিন তোমার গল্প পড়ে হেসে খুন্ হয়েছে' লোকে—বেশির ভাগ বালকেই—"

"যা যা, বকিস্ নে।"

"এখন তোমার খুনের গল্প পড়ে হাসবে। মন্দ কি?"

মলয় আসা মাত্র আমি বাধা দিতে সুরু করি—"ছাখো মলয়, খুন্ করা অতিশয় খারাপ। কদাচ মিথ্যা বলিয়ো না, না বলিয়া পরের দ্রব্য লইয়ো না, কখনো কাহাকেও গালি দিয়ো না—ইত্যাদির মতই খারাপ। এমন কি, ইত্যাদির চেয়েও। বলতে পারো, দ্বিতীয় ভাগে এ কথা লেখা নেই;—কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই এতদিন বেঁচে থাকলে তৃতীয় ভাগের গোড়াতেই এই বয়েৎটি লিখে রাখতেন। নিশ্চয়। ভেবে ছাখো, কেউ যদি তোমার প্রাণ নিতে আসে তা হ'লে কী হয়? কিম্বা প্রাণ নয়, কেবল একটা কান। তা হ'লে কেমন লাগে তোমার? যদি কেউ তোমার কান নিতে আসে—"

"আমি তাকে বলবো, দোহাই, আমাকে একেবারে প্রাণে মারো, কানে মেরো না। কান-হীন হয়ে এ পৃথিবীতে আমি বাঁচতে চাই নে।" মলয় বলে।

"তা হ'লেই বোঝো, কেবল একটা কান গেলেই প্রাণে কত লাগে। আর তুমি একজনের চোখ, কান, নাক, মুখ, পায়ের আঙুল ইত্যাদি সব সমেত আস্ত তাকেই লোপাট করতে চাইছো! তা'তে তার কিরূপ লাগবে, কত দুর্বিষহ যাতনা হতে পারে তার, সেটা ভেবেচো? ভেবেচো একবার?"

"যাতনা? একদম্ না। আমি তাকে এমন কায়দায় মারবো যে দেখতে না দেখতেই খতম্। টেরও পাবে না সে। ভালো কথা, কেউ যদি তোমার কান নিতে আসে—?"

"আমি তার কথায় কান দেব না।" আমি বলি।

"কি করবে?"

"পালাবো।"

"এ-বেচারীর কিন্তু পালাবার পথ নেই। এমন জায়গায় এনে খাড়া করেছি সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালানো যায় না। একেবারে কোণঠাসা। খালি একটিমাত্র পথ খোলা। সে পথে শুধু—পতন ও মৃত্যু।"

"কাকে খুন্ করতে যাচ্ছো শুনি? কাকে?"

"আমার খুড়োকে।"

"খুলে বলো সব।"

মলয় খোলসা করে। তার এক খুড়ো। একমাত্র খুড়ো। অগাধ টাকার মালিক। বাহাত্তুরে বুড়ো তার ওপর। মারা গিয়ে অক্লেশে তাকে বড়লোক করতে পারে, কিন্তু মরবার নামটি নেই। তার ওপরে তার এক বিচ্ছিরি সখ—ফি বছর পূজোর সময়—

কবে এক মহাদশমীর দিন তিনি দার্জিলিংয়ে জন্মেছিলেন। এখন, কয়েক বছর থেকে নিজের জন্মতিথি পালন করার উৎসাহ হয়েছে তাঁর। পূজোর ঠিক মুখেই দার্জিলিঙে তাঁর যাওয়া চাই, আর, একলা নয়, মলয়কে সাথে নিয়ে।

কোথায় মলয় পূজোর সময় কলকাতায় ফূর্তি করবে, না যাও দার্জিলিং! না গেলেও চলে না, মরার আগে যদি বুড়ো ত্যজ্যভ্রাতুষ্পুত্র ক'রে যায়? এই ক'রে পর পর পাঁচটা বছর মলয়ের সে মাটি করেছে, পূজোর মুখ দেখতে দেয় নি, কিন্তু এবার—এবার আর না, এবারেই শেষ।

আমি বলি—"অমন কাজটি কোরো না মলয়! পরের মন্দ করতে গেলে আগে নাকি নিজের হয়। আর, ভেবে দেখলে তুমি নিজেও একদিন বুড়ো হবে, এবং চাই কি, হয়তো খুড়োও হতে পারো। তখন ভাইপোর হাতে মারা পড়ার জন্যও তো তোমার বেঁচে থাকা দরকার। কিন্তু এখন খুনখারাপিতে জড়িয়ে পড়লে আর কিছু যদি নাও হয় তোমার, ফাঁসি তো হবেই নির্ঘাৎ।"

"ফাঁসি? ফাঁস হ'লে তো? খুন করবো কিন্তু চিহ্ন রাখব না। টের পাবে না কেউ। হদিশ থাকবে না কোনো। এমন নিখুঁৎ হত্যাকাণ্ড কোনো গোয়েন্দা-কাহিনীতেও তুমি কখনো পড়ো নি। পুলিসের বাপের সাধ্যি নেই যে এ-খুনের কিনারা করে। কেমন করে ঘটবে, বলি তোমায়।" বলে সে সুরু করে: "বুড়ো বয়সে লোকে বাতে মরে, এ মরবে বাতিকে। বুড়োর এক বদ্খেয়াল আছে। দশমীর দিন বিকেলে উনি বেড়াতে বেরোন। আমাকেও সঙ্গে যেতে হয়। একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গা আছে, সেখানে আমরা যাই। জায়গাটা নির্জ্জন —একটা খাদের ধারে। সেখানে গিয়ে উনি জংলী লতাপাতা কুড়োন। ঘড়ি ধরে—একেবারে কাঁটায় কাঁটায়।"

"ঘড়ি ধরে কেন?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"ঠিক যে-সময়টায় উনি জন্মেছিলেন। জন্মতিথি আর জন্মক্ষণ এক সাথে পালন করেন আর কি! তারপরে, কুড়োনো সেই তৃণগুচ্ছ, লতাপাতা আর ফুলটুল অঞ্জলি ক'রে তাঁর জন্মক্ষণটিতে মাতা ধরিত্রীকে উপহার দেন। অর্থাৎ খাদের মধ্যে ফেলে দেন। একেবারে ঘড়ি ধরে, কাঁটায় কাঁটায়।"

সময়নিষ্ঠার এই দৃষ্টান্তে, ঘড়ির মত, আমার গায়েও কাঁটা দেখা দেয়।

"তারপর?"

"তারপর আমরা ফিরে আসি। অবশ্যি, উনি আমাকেও ডাকেন, ওঁর সঙ্গে উৎসবে যোগ দিতে, ফুলপাতা কুড়িয়ে ধরিত্রী মাতাকে অঞ্জলি দেবার জন্যই; কিন্তু আমার উৎসাহ

হয় না, তাঁর ধারে কাছেও আমি কথনো যাই নে। গত পাঁচ বছর ধরেই ঠিক এই কাণ্ডটি ঘট্‌ছে। বাঁধাধরা অনুষ্ঠানের মতই।”

“ওঁর জন্মোৎসবে যোগ না দিয়ে ভালো করোনি—” না বলে’ আমি পারি নে, “অন্ততঃ ওঁর উইলের দিকে নজর রেখেও এটা তোমার কর্তব্য ছিলো। কথনোই ওঁর জন্মক্ষণটিকে তুমি পুষ্পাঞ্জলি দাও নি?”

“কক্ষনো না। প্রত্যেক বছরই উনি ডেকেছেন—কিন্তু আমি কানে তুলি নি। সাড়া দিই নি মোটেই ওঁর ডাকে। আমার ব্যবহারে উনি হতাশ হয়েছেন, স্পষ্টই দেখেছি। কিন্তু ওঁর কাছে যাই নি আমি—তবে এবার যাবো।”

“বুঝেছি।” আমি ঘাড় নাড়ি। “এবার তোমার শেষযাত্রা?”

“হ্যা, এবার আমি অঞ্জলি দেব। তবে তৃণগুল্ম নয়—ওঁকেই। এবারের দশমীতেই বোধন আর বিসর্জন।”

আমি আবার বাধা দিই, ওকে বোঝাতে চেষ্টা করি, কিন্তু মলয় অবাধ্য—চিরদিনই। ও বলে: “না ভাই, আমাকে বারণ কোরো না। করে লাভ নেই। বছরের পর বছর এ-দুর্ভোগ আর আমার সয় না। বুড়ো হয় তো এখনো বিশ বছর বাঁচবে, বার্নার্ড শ-র মত তিন শ’ বছরও বাঁচতে পারে—কে জানে! আর ততদিন ধরে পূজোর আমোদ খোয়াতে আমি পারব না। আমার জীবনটাই বরবাদ্ করে দেবে ও। নাঃ, আর দেরী করা চলে না। এক্ষুনি আমাকে কাকার বাড়ী যেতে হবে। সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে ইষ্টিশন্। দার্জিলিং মেল্ ধরতে। পাড়ার বারোয়ারী পূজোর পাণ্ডা আমি—পরশু থেকে পূজো সুরু—অথচ আজ আমায় দার্জিলিং যেতে হচ্ছে।”

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাঁদো কাঁদো মুখে সে বিদায় নেয়।

এর পরের ঘটনা, অকুস্থলে উপস্থিত না থাকলেও, আমি বলতে পারি। প্রায় বর্ণে বর্ণেই বর্ণনা করা যায় বোধ হয়।

মহাদশমীর সেই মারাত্মক দিনটি এলো। গড়ালো বিকেলের দিকে। মলয়ের কাকা মলয়কে ডেকে নিয়ে বেরুলেন। ফি বছরের মতন এবারো ঘড়ির কাঁটা ধরে। মলয় গোমড়া মুখে আশান্বিত হৃদয়ে তাঁর পিছু পিছু চলে।

চলতে চলতে তাঁরা দার্জিলিংয়ের এক জনমানবহীন জায়গায় এসে দাঁড়ালেন—সেই খাদের ধারটিতে। মলয়ের কাকা ঝুঁকে পড়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ফুলপাতা কুড়োতে থাকেন। আর ঘড়ির দিকে তাকান্। মলয়ের দিকেও মাঝে মাঝে।

মলয়ও তাকায়। তাকায় আর তাক্ খোঁজে।

অবশেষে সেই মহালগ্ন আসে—কাকার জন্মক্ষণ। মলয় বুক বাঁধে। কাকস্য পরিবেদনা?

এখন, কাকার ডাকার অপেক্ষা কেবল। মলয়ের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে।

কাকার ডাক আসে। মলয় কাকার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বুকের ঢিপঢিপুনির এত জোর আওয়াজ, যেন কান পাতলেই শোনা যায়। খাদের ধারটতে গিয়ে সে খাড়া হয়। তলার দিকে ঝুঁকে তাকাতে গিয়ে সারা দেহ যেন তার মড় মড় করে ওঠে। উঃ, কী গভীর খাদ! এর মধ্যে তলালে কি কেউ বাঁচে?

হঠাৎ তার কাকা ফিরে তাকান। পূর্ণদৃষ্টিতে তাকান তার মুখে। তার চোখের ওপর চোখ রাখেন। চারি চক্ষের মিলন! তার পর—তারপর সব শেষ।

বিচ্ছিরি একটা চীৎকার! দেহটা বাতাসে লাট খেতে খেতে পড়ে—পড়তে থাকে অতলস্পর্শী খাদের নিরুদ্দেশে।

নিখাদ সোনার মতই নিখুঁৎ খুন।

শুধু একটু ভুল করেছিলো মলয় বসু। তার পিতৃব্যের প্রতি দিনের পর দিন যেমন তার বিরাগ জমেছিলো, তার ওপরেও তাঁর যে তেমনি পিত্তি চট্‌তে পারে সেটা সে ভেবে দেখে নি। বছরের পর বছর দশমীর উক্ত দিনক্ষণে খাদের কিনারায় গিয়ে জননী বসুন্ধরার উদ্দেশে অঞ্জলি দেবার জন্য তাকে ডাকার, নিজের জন্মোৎসব ছাড়াও গভীরতর কোনো রহস্য ছিল হয়তো। তার মত তার কাকাও বুঝি চেয়েছিলেন—

জানি, অচিন্ত্যনীয় এই খুন। এ খুনের কিনারা করা কঠিন তাও আমার জানা আছে। এর রহস্য কে খাদের গর্ভে তলিয়ে দেখতে যাবে—বলো?

হ্যা, নিখুঁৎ খুনই বটে; তবে মলয় করে নি। করেছেন ওর কাকা। মা বসুন্ধরাই আরেকটি বসুকে ধারণ করেছেন। মলয় বসুকে।

আমাদের মলয়…… হাওয়া!

জ্যাঠা

শ্রীসুবোধ বসু

ক্লাসে মাষ্টার মশাই আসিতে দেরি করিলে ছেলেরা সর্ব্বত্রই যা করে, এখানেও তারই অনুশীলন চলিতেছিল। বিশুদ্ধ চেঁচামেচির মতো এমন অনাবিল আনন্দ আর কিছুতে নাই, এমন গণতান্ত্রিক উপভোগও আর কিছুতে নাই।

সহসা জিতেন শেষ বেঞ্চের এক প্রান্তের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'ঐ দেখ্!'

সকলেই চাহিয়া দেখিল। এমন সৃষ্টিছাড়া কাজ সারা ক্লাসে মাত্র একজনই করিতে পারে। একাধিক গলায় ধিক্কার-সূচক সম্বোধন শোনা গেল, 'জ্যাঠা!'

ওদিক্ হইতে কিন্তু কোনও রকম সাড়া পাওয়া গেল না। খড়-কাটা কলকে সম্বোধন করিলে তাহা যেমন কোনও জবাব না দিয়া ঘস্ ঘস্ করিয়া খড় কাটিয়াই চলে, শেষ বেঞ্চের ছেলেটিও তেমনি নির্ব্বিকার চিত্তে বাঁ হাতের কনুইয়ে বই চাপিয়া ডান হাতে রাফ্খাতার পাতার উপর খস্খস্ শব্দে পেন্সিল চালাইয়া যাইতে লাগিল।

ক্লাসের পাণ্ডা হীরু তড়াং করিয়া এক লাফে তার কাছে গিয়া হাজির। এমন বে-আদবী সারা ক্লাসের পক্ষেই অপমানজনক। মাষ্টার মশায়ের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া ক্লাসের সবাই যখন নরক গুলজার করিতে বসিয়াছে, এমন কি ফাষ্ট বয়্, সেকেণ্ড বয়ও বাদ যায় নাই, তখন কাহারও এ রকম মনোযোগ কি বরদাস্ত করা চলে? জ্যাঠার জ্যাঠামি ছাড়া এ আর কি?

'কি হচ্ছে, শুনি?' খাতার এক প্রান্ত ধরিয়া হীরু থিয়েটারি গলায় প্রশ্ন করিল।

'ছেড়ে দে। কাজের সময় ফাজলামি ভালো লাগে না। সংস্কৃত কবিতা লিখছি।'

'সংস্কৃত কবিতা!' হারু স্তম্ভিত হইয়া কহিল। 'কেবল জ্যাঠামি!'

'কবিতা লিখতে হ'লে এক এই সংস্কৃত শ্লোকই লেখা চলে। মিনমিনে বাংলা কবিতা আমি কস্মিন্ কালেও লিখতে পারব না, হাসি পায়...'

'কবিতার উপযুক্ত আবহাওয়া বটে!' হারু সব্যঙ্গে কহিল। চেঁচামেচিটা কানে ঢুকছে না! আমরা সব পিক্নিকে যাবার ব্যবস্থা করছি। নে, উঠে আয়...'

'পিক্নিকে যাও বা গোল্লায় যাও, কিছু আপত্তি নেই।' জ্যাঠা গম্ভীরস্বরে কহিল।—'কিন্তু ডিস্টার্ব করা চলবে না। এক চেঁচামেচির মধ্যে ছাড়া কবিতা বা মেকানিক্সের প্রব্লেমে আমি যুৎ করতে পারি না...'

এই জ্যাঠা! সবাই যা করে, সবাই যাতে একমত, সবাই যা উচিত মনে করে, জ্যাঠা তার উল্টো করিবে, উল্টো ভাবিবে, উল্টো মত প্রকাশ করিবে। এ অভ্যাসটা ওর যেন সহজাত।' খুব ভালো ছেলে বলিয়া নাম নাই; বড় লোকের ছেলে নয়, ক্লাসের মোড়ল নয়। কিন্তু আর পাঁচ জনের সঙ্গে তাকে ভুল করিবার উপায় নাই। সে একেবারে স্বতন্ত্র। সে জ্যাঠা।

সেবার ইংরেজি ক্লাসে মাষ্টার মশায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার?'

সকলে সর্ব্বজনগ্রাহ্য জবাব দিবার পর মাষ্টার মশায় শেষ বেঞ্চের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, 'অধীশ চৌধুরী-মশায়, আপনার মতটা কি? কে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, শুনি?'

'অ্যাডল্ফ্ হিট্লার।' অধীশ চৌধুরী স্পষ্ট গলায় কহিল।

মাষ্টার মশায় স্তম্ভিত হইলেন। নিজ কণ্ঠস্বরের উপর দখল ফিরিয়া পাইবার পর কহিলেন, 'আমার প্রশ্নটা ছিল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটক-লেখক কে?'

'আজ্ঞে, আমি ঠিকই শুনেচি।' অধীশ সবিনয়ে জানাইল। 'পৃথিবীর বুকে যে মহা-নাটক সামান্য কর্পোরেল অ্যাডল্ফ্ হিট্লার লিখে গেল, ইতিহাসে তার তুলনা কোথায়? সামান্য আরম্ভ থেকে ধাপে ধাপে উঠে পঞ্চমাঙ্কে বিরাট ক্লাইম্যাক্স্! এত বড় ট্র্যাজিডি আর পৃথিবীতে লেখা হয় নি। বিংশ শতাব্দীতে বাস ক'রে এত বড় নাটক আর এত বড় নাট্যকারকে কি অস্বীকার করতে পারি? আমার মনে হয়...'

'আমার কি মনে হয়, আগে তাই শোন।' মাষ্টার মশায় গম্ভীর ভাবে কহিলেন। 'আমার মনে হয়, তোমার নাম অধীশ চৌধুরী নয়, তোমার নাম জ্যাঠা-মশায়...'

সেই হইতেই অধীশ জ্যাঠা।

কিন্তু জ্যাঠামশায়কে যে মাষ্টার মশায়রাও কিছুটা সমীহ করিয়া চলেন, ইহা তাহার সহপাঠীরা জানে। তার যুক্তির কাছে কাহারও রেহাই নাই।

শাস্তি দিয়া যখন এই তার্কিক ছোক্‌রাকে দমান গেল না, তখন মাষ্টার মশায়েরা তার উদ্ভট যুক্তি ও চাঞ্চল্যকর উক্তিগুলি 'বালভাষিতম্‌' হিসাবে বরদাস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন।

পরবর্ত্তী সাপ্তাহিক পরীক্ষায় "তোমার প্রিয় বই" সম্বন্ধে রচনা আসিল। পরীক্ষা দিতে ছেলেরা পিছ-পা নয়, কিন্তু পরীক্ষার পর এক ক্লাস ছেলের সামনে যখন খাতাগুলির ময়না-তদন্ত শুরু হয়, তখনই যা একটু অসুবিধা।

মাষ্টার মশায় কিন্তু নির্ব্বিকার মুখে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, 'আর একটি খাতা এই রকম: "আমার প্রিয় পুস্তক মহাভারত। ইহা মহর্ষি বাল্মীকি রচনা করিয়াছেন। ইহা সরল বাংলা পয়ার ছন্দে রচিত।"...এই সব মহামূল্য নতুন তথ্য প্রকাশ করেছেন আমাদের বরুণ মহলানবিশ, নম্বর পেয়েচেন এক-শ'তে তিন। নবীন মজুমদার লিখছেন: "আমার সব চেয়ে ভালো লাগে হোমারের রবিনসন্‌ ক্রুশো। জাহাজ ডুবি হয়ে কি ক'রে রবিন্‌সন এক-আঙুল লম্বা মানুষদের দেশে গিয়ে হাজির হয়েছিল, হোমার সুললিত ইংরেজি ভাষায় তা খুব সুন্দর ক'রে বর্ণনা করেছেন। জীবিত লেখকদের মধ্যে হোমারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক।"...এই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পুরস্কার খুব বড় একটা রসগোল্লা! এর পর—অসিত মিত্র—৫৫, হীরেন দাস—৩১।...এই আর একটি বিশেষ খাতা। একটু পড়ে শোনাচ্চি, শোন: "আমার সব চেয়ে প্রিয় বই—সব চেয়ে ভালো বই বলব না,—কিন্তু অবশ্যই প্রিয় বই, রেলের টাইম্‌-টেবল। দামে বোধ হয় সব চেয়ে সস্তা, পাতার সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। কিন্তু আমার পছন্দ এই জন্যই নয়। এই বইকে অবলম্বন ক'রে আমি বিনা পয়সায়, বিনা হাঙ্গামায়, বাড়ির লোকদের গাল না খেয়ে দেশ দেশান্তরে ঘুরে আসতে পারি। এ লাইনে ছুটি, ও লাইনে ছুটি; এ ষ্টেশানে নামি, এ জংশনের রেস্তর াঁতে খাওয়া সেরে অন্য লাইনের গাড়ি গিয়ে চড়ি। পাহাড়ে যাই, সমুদ্রতীরে হাজির হই; দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাইয়ের রাস্তায় রাস্তায় বেড়াবার সুযোগ পাই।"...ওরে বাঁদর, জ্যাঠামির কি আর জায়গা নেই? উঠে দাঁড়া...'

ছেলেরা এর দিকে ওর দিকে চাহিল। অবশেষে সকলের দৃষ্টিই শেষ বেঞ্চের দিকে ধাবিত হইয়া অনিচ্ছা-সত্ত্বে দণ্ডায়মান জ্যাঠাকে আবিষ্কার করিল।

'সেদিন আমার মন একেবারেই ভালো ছিল না।'—জ্যাঠা কৈফিয়ৎ হিসাবে কহিল। 'আমাদের বাড়িওয়ালার বাড়ির সব্বাই চলে গেল দার্জ্জিলিঙে হাওয়া

খেতে। ওরা বড়লোক; তার ওপর ব্ল্যাক্‌ মার্কেটে বিস্তর টাকা জমিয়েছে। টাকা ব্যয় করতে ওদের একটুও ভাবতে হয় না। আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে টাকা ওড়ায়। অথচ বাড়ি-ভাড়া দিতে বাবার ছু'-চার দিন দেরি হ'লে ওদের দরোয়ান এসে দরজায় লাঠি ঠুকে যায়, কড়া কড়া কথা শুনিয়ে যায়। নিজেদের থাকবার বাড়িটা সম্বন্ধে যা তাদের দেমাক! সেটা নাকি রাজপ্রাসাদ! আমিও তেমনি ওদের জব্দ করবার তালে ফিরি। বাড়িওয়ালার ছোট ছেলেটা শুনিয়ে গেল, "আমরা সব রিজার্ভ গাড়ি ক'রে দার্জ্জিলিঙ্‌ যাচ্চি। নাম শুনেছিস দার্জিলিঙ? ম্যাপে দেখিস।"...ভারি তো দার্জিলিঙ! আমি বল্লুম, "আমি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে আসব।" এলুমও তাই। এক টাইম-টেবল হাতে নিয়ে রাজ্যশুদ্ধ ঘুরে এলাম। তার পরদিনই উইক্‌লি পরীক্ষা ছিল...'

বাড়িওয়ালাদের দেমাকের প্রতিশোধ জ্যাঠা সর্ব্বদাই এইরূপ ভাবে লইয়া থাকে।

'একশোর মধ্যে পঞ্চাশ।' মাষ্টার মশায় কহিলেন। 'অথচ জ্যাঠামি না করলে এমন ভাষা, এমন ষ্টাইলের জন্য অনায়াসে নব্বই দেওয়া চলত।...আসচে শনিবারের রচনা "উচ্চাকাঙ্ক্ষা"। সবাই ভালো ক'রে তৈরী হয়ে এসো। হোমারকে যারা ইংরেজ কবি বানাতে পারে, তাদের পক্ষে হেন্‌রি ফোর্ডকে রাশিয়ান জেনারেল বানানো কিছুই অসম্ভব নয়...'

জ্যাঠা বসিয়া পড়িয়াছিল, আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, 'এ পরীক্ষাটা আমি দিতে পারব না, স্যর!'

'কেন?' মাষ্টার মশায় বিরক্তমুখে প্রশ্ন করিলেন।

'আমার কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই।' জ্যাঠা কহিল।

'তাই মনে হচ্চে।' মাষ্টার মশায় কহিলেন। 'নইলে শুধু শুধু জ্যাঠামি ক'রে নিজের ক্ষমতা নষ্ট করতে না, ম্যাট্রিকে ভালো রেজাল্ট করতে পারতে। এ ম্যান্‌ উইদাউট্‌ য়্যান্‌ এইম্‌ ইজ্‌ লাইক্‌ এ শিপ্‌ উইদাউট্‌ এ রাডার। তুমি হাল-ভাঙা জাহাজের মতো উদ্ভট চিন্তার ঘূর্ণিপাকে হাবুডুবু খাচ্চ...'

'গীতা বলেছেন', জ্যাঠা কহিল, 'হৃদয় থেকে আকাঙ্ক্ষা দূর করতে না পারলে...'

'থামো, আর গীতা "কোট্‌" করতে হবে না। এমন না হ'লে আর তুমি জ্যাঠামশায়!'

জ্যাঠা মশায় কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশনে আশ্চর্য্য ভালো ফল করিল। স্কুলের প্রথম দ্বিতীয় মার্কা ছাত্রদের টপ্‌কাইয়া সে প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান লাভ করিল।

হেড্‌মাষ্টার মশায় পুলকিত হইয়া অধীশ চৌধুরীর জন্য সম্বর্দ্ধনা-সভা ডাকিলেন। গত দশ বৎসরে স্কুলের ফল এত ভাল হয় নাই। আধ ঘণ্টা ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া তিনি অধীশ চৌধুরীকে অভিনন্দন জানাইলেন। অন্যান্য মাষ্টার মশায়রাও ঘোষণা করিলেন, অধীশের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন দিনই কোনও সন্দেহ ছিল না, এবং এমন বাধ্য ও বিনীত ছাত্র তাঁরা খুব কমই দেখিয়াছেন।

সভাভঙ্গের পর জ্যাঠাকে কাছে ডাকিয়া হেড্‌মাষ্টার মশায় প্রশ্ন করিলেন, 'কোন্ কলেজে ভর্ত্তি হবে, ঠিক করলে ?'

'কোনও কলেজেই ভর্ত্তি হবো না ঠিক করেছি, স্যর।' জ্যাঠা সবিনয়ে জানাইল।

'তার মানে ?' হেড মাষ্টার মশায় সবিস্ময়ে কহিলেন। 'পড়ার খরচ চালাতে অসুবিধে নেই তো ? তা হ'লে বরঞ্চ...'

'স্কলারশিপের সঙ্গে', জ্যাঠা কহিল, 'বাবার পঁচিশ টাকা ইন্‌ক্রিমেণ্ট্ যোগ দিলে খরচ খুলিয়ে যেত। কিন্তু তা'তে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'তো না...উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে নাকি হাবুডুবু খেতে হয়...'

'কি উচ্চাকঙ্ক্ষা ?'

'রোজ একবার ক'রে এরোপ্লেনে চড়া।' জ্যাঠা কহিল। 'রোজ একবার ক'রে আমাদের বাড়িওয়ালার মস্ত বাড়িটার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া চাই। এরোপ্লেনের কারখানায় শিক্ষানবিশী নিয়ে তার ব্যবস্থা করে ফেলেছি...'

হেড্‌মাষ্টার মশায় আরও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 'তাতে কি হবে ?...'

'ওদের জানেন না তো, তাই অবাক্ হচ্ছেন !' জ্যাঠা কহিল। 'প্রকাণ্ড বাড়ি বলে ওদের ভারি দেমাক। আমরা ভাড়াটে ছোট ফ্ল্যাটে থাকি বলে ওরা নাক বাঁকিয়ে কৃপা জানায়। আমিও তার প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব...'

'কি প্রতিশোধ হে ?' হেড্‌মাষ্টার মশায় সভয়ে তার দিকে চাহিলেন। 'এরোপ্লেনের পাখা দিয়ে ওদের বাড়িটা গুঁড়িয়ে দেবে নাকি ?...'

এইবার জ্যাঠা হাসিয়া ফেলিল। সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'পাগল, তা হ'লে যে নিজেও চূরমার হয়ে যাব। তা নয়। আমি শুধু আকাশ থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব, ওদের এত দেমাকের বাড়িটা উঁচু থেকে দেখলে কত ছোট, কত তুচ্ছ ! উই-ঢিবির সঙ্গে তার বিশেষ তফাৎ নেই...'

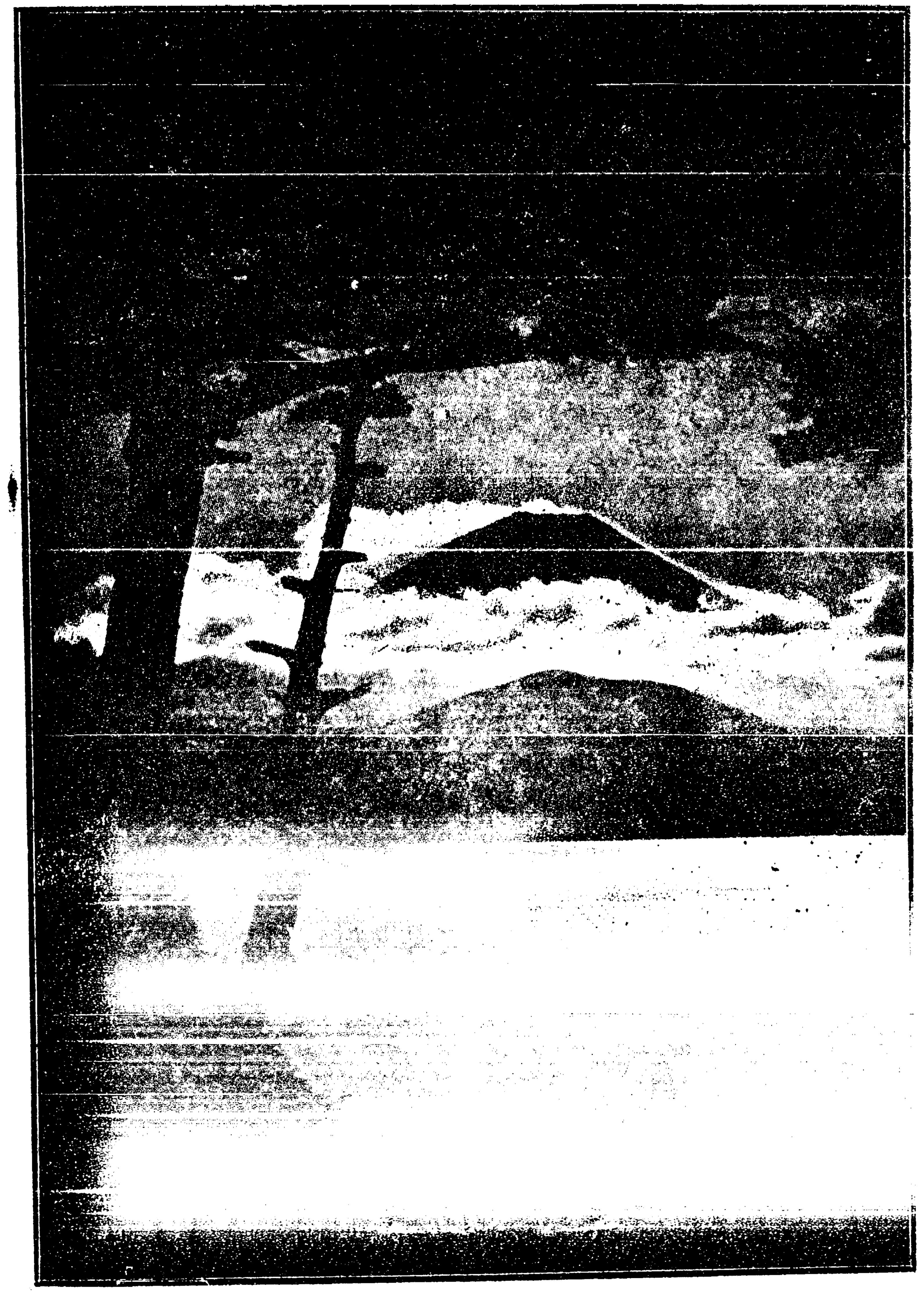

পৃথিবী কত সুন্দর !

জাপানের একটি দৃশ্য

দান-বীর

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্. এ

ট্যাংরাখোলার বাজারে একখানা ছোট-খাটো "বাজে মালের" দোকান। বাপের আমল থেকে ঐটুকুই গণেশ পালের সম্বল। কোন রকমে সংসার চলে; অর্থাৎ চলে না বল্লেই চলে। তখন যুদ্ধের বাজার। কাপড়, চাল, কেরোসিন জোটাতেই প্রাণান্ত। হঠাৎ একদিন শোনা গেল—মিলিটারী আসছে। সত্যিই মিলিটারী এল। নদীর পারের সমস্তটা মাঠ জুড়ে আমেরিকানদের ছাউনী পড়ল। তাদের রাক্ষুসে চাহিদা মেটাবার জন্তে দালাল, ফড়ে আর ঠিকাদারে বাজার ছেয়ে গেল। যত ছিল বেকার লোক, তাস পিটে আর তামাক টেনে দিন যেত, কাজ জুটে গেল সবাকার। সবারই হাতে চক্‌চকে নতুন নোট।

গণেশও গিয়ে ধরল ওদের বড়বাবুকে—একটা কনট্রাকটারি চাই।

"তুমি পারবে? পুঁজি আছে কিছু?"—বড়বাবু হেসে বল্লেন।

"আজ্ঞে, পুঁজি অতি সামান্যই। ছোট-খাটো অর্ডার পেলে দিতে পারব।"

"ছোট-খাটো আর কীই বা আছে? আচ্ছা, ঝ্যাঁটার অর্ডারটা নিয়ে যাও। এক হাজার ঝ্যাঁটা চাই, সাতদিনের মধ্যে; প্রত্যেকটা আড়াই সের।"

ঝাঁটা! গণেশ পালের মনটা দমে গেল। লোকে বলবে 'ঝ্যাঁটাওয়ালা'!

কিন্তু টাকা যখন চাই অত বাছ-বিচার করলে চলে না। অনেক ভেবে গণেশ রাজী হ'ল। নৌকো, গরুর গাড়ী আর লোকের মাথায় চড়ে দুনিয়ার ঝাঁটা এসে জড় হ'ল তার বৈঠকখানায়। ছেলেরা নাক সিঁটকায়; গিন্নী তো রেগেই আগুন—"খেতে না জোটে ভিক্ষে কর। এ সব অলক্ষুণে কাণ্ড কেন বাপু?" দত্ত মশাই মুরুব্বি লোক; বাড়ী বয়ে বলে গেলেন, "কি হে গণেশ, শেষকালে তোমার কপালে জুটলো ঝ্যাঁটা?"

যে যাই বলুক, ঝাটার থেকেই গণেশের কপাল ফিরে গেল। ঝাটার পরে ঝুড়ি, এবং তার পর বছর না যেতেই টাকাও আসতে লাগল ঝুড়ি ঝুড়ি। গণেশ পালের ব্যাঙ্কের জমা লাখ ছাপিয়ে উঠল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ট্যাংরাখোলার বাজারে সবচেয়ে বড় আড়ৎ গণেশ পালের। জেলার সদরে বাড়ী উঠেছে তিনতলা। এখন সেখানেই সে থাকে। বাইরেটা তেমনি আছে। সেই আধ-ময়লা ফতুয়াটা এখন ঝুলে একটু বেড়েছে। গণেশ তার নাম দিয়েছে, হাফ্-পাঞ্জাবী। সাবেকী আমলের বৈঠকখানা। ঘর-জোড়া তক্তপোষ; তার ওপরে শীতল পাটি। ঠিক সামনেটায় একটা কাঁচের আলমারী, তার ভেতরে একখানা মস্ত বড় ঝাটা। সেখানে দাঁড়িয়ে গণেশ নিজ হাতে ধূপ-ধুনো দেয় সকাল-সন্ধ্যা। কেউ যদি প্রশ্ন করে—"আলমারীতে ঝ্যাটা কেন?" গণেশ কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, "আজ্ঞে, ঐ রূপেই মা-লক্ষ্মী আমার ঘরে এসেছেন।" ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে-কলেজে পড়ে। বড় ছেলে ত' কথাই কয় না

বাপের সঙ্গে। মেয়ে মাঝে মাঝে বলে—"বাবা, ঝ্যাটাটা সরিয়ে ফেল। লোকে হাসাহাসি
করে।"
গণেশ জিভ কেটে বলে—"ওঃ সর্বনাশ! বলিস্ কি তোরা?"
টাকা যেমন বাড়ল, তার সঙ্গে বেড়ে চ'লল উমেদার ও দাবীদারের দল। পাড়ায় ঘটা
ক'রে সার্বজনীন দুর্গা পূজো হবে। গণেশের নামে চাঁদা পড়ল পাঁচ-শ' টাকা। পূজো-
কমিটির প্রেসিডেণ্ট নিজেই এলেন আদায় করতে। অনেক আদর-আপ্তি, খাতির-সমাদরের
সঙ্গে গণেশ এগিয়ে দিল একখানা পাঁচ টাকার নোট। প্রেসিডেণ্ট চোখ রাঙিয়ে বল্লেন—
"আমাদের সঙ্গে তামাসা করছেন?"
গণেশ জিভ কেটে মাথা নেড়ে বল্ল—"ছি-ছি-ছি! আপনারা হ'লেন মানী লোক।
তামাসা করা কি আমার সাজে?"
পূজো-কমিটি রেগে শাসিয়ে বেরিয়ে গেল। এমনি ক'রেই আর একদিন ফিরে গেল
কাত্যায়নী থিয়েট্রিকাল্ পার্টির ম্যানেজার। গণেশ তাদের জন্য বরাদ্দ করেছিল পাঁচ সিকে।
মেয়েদের মাইনর স্কুলকে হাই স্কুলে দাঁড় করাতে হবে। হেড্ মিষ্ট্রেস্ সুমিতা দেবী এসে
সাহায্য চাইলেন। পাল ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠল। একবার ব'সে, তিনবার দাঁড়িয়ে, পাঁচ
বার নমস্কার ক'রে, মাথা চুলকে, বের করল দশ টাকার একটা নোট্। সুমিতা চোখ
কপালে তুলে বল্লেন—"এ কি করছেন? আমি যে হাজার খানেক টাকার আশা নিয়ে এসেছিলাম
পাল মশাই!"
গণেশ একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বল্ল—"আমি নগণ্য লোক; আমাকে অমন
ক'রে ঠাট্টা করলে বড্ড লজ্জা পাই।"
এর পর থেকে গণেশের নামের আগে-পিছে পাড়ার ছেলেরা যে সব বিশেষণ বসাতে
লাগল, সেগুলো এখানে বলা চলে না।
গণেশের পিস্তুতো শ্যালক—ভুজঙ্গভূষণ। ভারী ভাব দু'জনের। বয়সের তফাৎ
অনেক—ছাপ্পান্ন আর ছাব্বিশ। কিন্তু মনের কথা চলত তারি সঙ্গে। ভুজঙ্গ ছিল খবরের
কাগজের রিপোর্টার। নানা জায়গায় ঘুরে টাটকা আর মুখরোচক খবর তৈরি করাই ছিল
তার পেশা। রিপোর্টার কথাটা সে পছন্দ করত না, নিজেকে বলত জার্নালিষ্ট। মাঝে
মাঝে গণেশের বাড়ী এলে বেশ কিছুদিন আড্ডা জমত।
সেবার সহরে লাগল ভোট-যুদ্ধ। আইন-সভার সভ্য নির্বাচন হবে। একদিকে
দাঁড়িয়েছেন জেল-ফেরত দেশসেবক জগৎনারায়ণ। আর একদিকে জবরদস্ত জমিদার শিবেশ
চৌধুরী। গালাগালি, লাঠালাঠি আর গরম গরম বক্তৃতায় সহর একেবারে সরগরম। এমন
সময় ভুজঙ্গ এসে হাজির।
"কি খবর? অনেক কাল যে দেখা নেই!"—গণেশ জিজ্ঞেস করল।
—"কত দেশ ঘুরতে হয় দাদা! জার্নালিষ্ট্ মানুষ; এক জায়গায় থাকলে কি চলে?"
—"তার পর হঠাৎ কি মতলবে?"

ভুজঙ্গ অবাক্ হয়ে গেল—"সে কি! ইলেক্‌শান্ হচ্ছে, খবর রাখেন না?"
পরদিন টাউন হলে বিরাট সভা। জগৎনারায়ণ বক্তৃতা করবেন। ভুজঙ্গ এক রকম
জোর করেই গণেশকে ধরে নিয়ে গেল।
মঞ্চের উপর আগাগোড়া খদ্দর মোড়া জগৎনারায়ণ বসে আছেন। চারদিক থেকে
ঘিরে আছে ভক্তের দল। সহরের গণ্যমান্য লোক কেউ বাকি নেই। দর্শকদের মধ্যে গণেশ
আছে সামনের দিকে। ভুজঙ্গের কাছাকাছি। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্লে, "ওহে ভুজঙ্গ,
এ যে দেখছি আমাদের সেই পাগলা জগা! ও আবার জগৎনারায়ণ হ'ল কবে?" অনেকে
কট্‌মট্ ক'রে তাকাল। ভুজঙ্গ ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ফিসফিস্ করে বল্লে—"চুপ্।"
গণেশ গজরাতে লাগল—"আরে রাখো তোমার ইয়ে। ওর কীর্ত্তি আমার ত' আর অজানা নেই!
থার্ড ক্লাসে দু'-দু'-বার ফেল করবার পর হেড্‌মাষ্টার তাড়িয়ে দিলেন। তার পর গাঁজার
দোকানে পিকেটিং ক'রে গেল জেলে। ওই বুঝি এখন তোমাদের নেতা?"
পাশ থেকে একটি ছোকরা ধমকে উঠল—"চুপ করুন মশাই!"
এক বোঝা ফুলের মালা গলা থেকে নামিয়ে জগৎনারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। হাত-
তালিতে, মনে হ'ল, সমস্ত হল্‌টা বুঝি ফেটে পড়বে। ঘণ্টা খানেক, যাকে বলে জ্বালাময়ী
বক্তৃতায় আগুন ছড়িয়ে, শেষের দিকে বল্লেন—
"বন্ধুগণ, আমি একজন নগণ্য দেশ-সেবক। শিবেশ বাবুর মত না আছে অর্থ, না
আছে খেতাব, না আছে সরকারী সার্টিফিকেটের জোর। শুধু একখানা ছোট্ট সার্টিফিকেট
আমার সম্বল। সেটুকু আমি সব সময় সাথে ক'রে নিয়ে বেড়াই। সেইটাই আজ আপনাদের
সামনে খুলে দেখাতে চাই। দেখে যদি আপনারা মনে করেন আমার যোগ্যতা আছে
দেশসেবার, তা হ'লে ভোট দেবেন। আর যদি মনে করেন যোগ্যতা নেই, ভোট চাই না।—"
এই ব'লে জগৎনারায়ণ পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। একজন ভক্ত তাঁর পিঠের কাপড়টা
তুলে ধরল—একটা কাটা দাগ। ভক্ত সংক্ষেপে বল্লে—"পুলিশের বুট, দেশসেবার পুরস্কার।"
গণেশ আঁৎকে উঠল—"অ্যাঁ! বলে কি? পুলিশের বুট! একেবারে রাতকে দিন!
ও ত' সেই লিচুগাছ থেকে—"
তুমুল হাততালিতে গণেশের কথা ডুবে গেল।
ভুজঙ্গ বাড়ী ফিরে দেখল গণেশ অন্ধকার ঘরে বসে তামাক টানছে।
—"কি দাদা, আলোটাও জ্বালতে পারেন নি?"
গণেশ জবাব দিল না। একমনে অনেকক্ষণ তামাক টেনে আস্তে আস্তে বল্লে, "বুঝলে
ভুজঙ্গ, ভেবে দেখলাম জগার রাস্তা ধরলেই ভাল হ'ত। একেই বলে কপাল। টাকাপয়সা
দিয়ে কি হবে? দেখলে একবার মালা আর হাততালির বহরটা?"
ভুজঙ্গ চোখের কোণে তাকিয়ে একটু হেসে বল্ল, "কেন, লোভ হচ্ছে নাকি আপনার?"
—"আরে, লোভ হ'লেই হ'ল? ও সব কপালে থাকা চাই। নইলে ঐ জগা বেটা স্রেফ্
ধাক্কা দিয়ে কী মালা আর হাততালিটাই পেলে।" গণেশের বুকের ভেতর থেকে একটা

মস্ত বড় নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। ভুজঙ্গ একবার চেয়ে দেখল, আড়চোখে। দু'-একবার মাথা নাড়লে, কিন্তু কথা বল্লে না।

দিন চার-পাঁচ পরে, সকালবেলা গণেশ কাজে যাবার আয়োজন করছে, একখানা খবর-কাগজ হাতে ছুটে এল তার মেয়ে সবিতা।

—"বাবা! বাবা!"

—"কী রে?"

—"এত টাকা দিয়েছ তুমি! কই, আমাদের ত' কিছু বল নি!"

—"কোথায়, কিসের টাকা?"

—"এখনও বুঝি লুকোচ্ছ? এই দেখ না, কাগজে বেরিয়েছে।"

—গণেশ ব্যস্ত হয়ে বল্ল, "কি বেরিয়েছে, পড় তো।"

সবিতা পড়ে গেল—"আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীগণেশচন্দ্র পাল নিজ সহরে একটি মেয়েদের হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।"

গণেশ কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকলো একদল ছেলে। একজন হেঁকে বল্ল, "গণেশ পা—লকী"—আর সবাই গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, "জয়।" তার পর সবাই মিলে গণেশকে ঠেলে তুল্ল কাঁধের উপর। গণেশ বেচারী ত' ভয়ে অস্থির—"আহা, কর কি! কর কি! পড়ে মরবো যে—!"

কে শোনে কার কথা?

ছেলেদের পেছনে এলেন বড়দের দল।

—"সাবাস্, সাবাস্!"

—"খুব চালটা চেলেছ ভায়া!"

—"পেটে পেটে এতও তোমার ছিল!"

—"আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন আপনি—সহর আজ ধন্য হ'ল আপনার মতন সন্তানকে বুকে ধরে।"—ইত্যাদি প্রশংসার বান ডেকে গেল। গণেশ কিছু বলবার সুযোগ পেল না, শুধু তাকিয়ে রইল ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে।

এমনি ক'রে চল্ল সারাদিন। বিকেলে এলেন এস্. ডি. ও.। বল্লেন—"আপনার অনারে, মানে সম্মানে, আমরা একটা সভার আয়োজন করেছি। একটু কষ্ট ক'রে যেতে হবে, এই টাউন-হলে।"

গণেশ জানলা দিয়ে দেখল বাইরে লোকে লোকারণ্য।

—"এত লোক কেন?"

—"ও কিছু না, একটুখানি প্রসেশন্।"

গণেশ কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে, "আমাকে মাপ করবেন স্যর্! মিটিংয়ে গেলে আমার নিশ্চয়ই হার্টফেল্ করবে। ও আমি পারব না—"ব'লে এক ছুটে বাড়ীর ভেতরে চলে

গেল। ভুজঙ্গের সঙ্গে দেখা। একেবারে ফেটে পড়্ল গণেশ—"কোথায় ছিলে এতক্ষণ? এ সব কী হচ্ছে?" ভুজঙ্গ শান্তভাবে জবাব দিল, "মাথা গরম করবেন না দাদা, এবার কপাল খুলল আপনার।"

অনেক কষ্টে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গণেশকে মিটিংয়ে যেতে রাজি করান হ'ল।

মেয়ে পরিয়ে দিল গরদের জামা-কাপড়। ভুজঙ্গ দিলে প্রথম মালা; হেসে বলল, "এই ত' কেবল সুরু। আর এই নিন্ আপনার বক্তৃতা। সবার বলা হয়ে গেলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়বেন।"—ব'লে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল্ হাতে।

সে কী মিটিং! টাউন হল্ ভেঙ্গে পড়ে আর কি! জানলার উপর পর্য্যন্ত লোক বোঝাই। মঞ্চের ঠিক মাঝখানে শোভা পাচ্ছেন গণেশ পাল। মালায় মালায় ঘাড়ে গর্দানে একাকার। ঢেকে গেছে নাক পর্য্যন্ত। গণেশ অতি কষ্টে ঘাড় সোজা করে নাক তুলে বসে আছে। আর একটু হ'লে দম আটকে যাবে। জগার উপর আর হিংসে নেই। তবুও কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব।

সুরু হ'ল বক্তৃতা। কেউ বললেন, দানবীর, কেউ বল্লেন দাতা কর্ণ। প্রবীণ উকীল মহীতোষ বাবু বল্লেন—"সব চেয়ে বড় দাতা হচ্ছেন তিনি, যাঁর ডান হাত দান করে কিন্তু বাঁ হাত জানতে পায় না। আমাদের গণেশ আজ সেই আদর্শকে রূপ দিয়েছেন।"

সকলের শেষে গণেশকে জবাব দিতে হ'ল। মালার বোঝা নামিয়ে কোন রকমে পড়ে গেল ভুজঙ্গের সেই কাগজখানা। কান ফাটান হাততালির মধ্যে শেষ হ'ল বিরাট সভা। একগাড়ী ফুলের মালা নিয়ে বাড়ী ফিরল গণেশ।

হপ্তা খানেক কেটে গেছে। লোকজন এবার পাতলা হয়ে এসেছে। এমন সময় একদিন দেখা দিলেন হেড্‌মিষ্ট্রেস্ সুমিতা দেবী আর তাঁর সঙ্গে ইস্কুল-কমিটির আরও দু'-এক জন। আর এক দফা গুণগানের পর সুমিতা বল্লেন, "আমাদের টাকাটা"—

গণেশ আকাশ থেকে পড়ল, "কিসের টাকা?"

—"আজ্ঞে ঐ পঁচিশ হাজার টাকা, যেটা আপনি ইস্কুলের জন্য দান করেছেন!"

ভুজঙ্গ বসে ছিল। তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে গণেশ বল্ল, "এঁরা বলছেন কি, ভুজঙ্গ? আমি নাকি পঁচিশ হাজার টাকা দান করেছি? শোন কথা!"

ভুজঙ্গ চেয়ারটা টেনে একটু এগিয়ে এসে বল্ল, "আপনারা কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।"

সুমিতার গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিল, কথা বেরুল না। ইস্কুল-কমিটির ভবেশ বাবু বল্লেন, "আপনার কথাই বরং আমরা বুঝতে পারছি না। কে না জানে উনি ইস্কুলের জন্যে পঁচিশ হাজার টাকা দান করেছেন। খবর-কাগজে বেরিয়েছে। ঘটা ক'রে মস্ত বড় সভা ডেকে ওঁকে মানপত্র পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে। আর এখন বল্‌ছেন—"

ভুজঙ্গ ধীরভাবে বল্ল, "সবই ঠিক। কিন্তু সে সম্বন্ধে উনি কি বলেছেন সেটা আপনারা শুনেছেন কি?"

—"শুনেছি বই কি! ওঁর বক্তৃতাও শুনেছি।"

ভুজঙ্গ পকেট থেকে একটা খবরের কাগজ বের করে বল্ল, "বেশ। এই দেখুন সেই বক্তৃতার রিপোর্ট। দেখুন ঠিক আছে কিনা?"

সুমিতা দেবী কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে বল্লেন, "হ্যাঁ—এইটেই তো মনে হচ্ছে।"

"—আচ্ছা, তাহ'লে শুনুন, আমি পড়ে যাচ্ছি", ব'লে ভুজঙ্গ রিপোর্টটা পড়ে গেল।

"বন্ধুগণ, আপনারা আজ আমাকে যে সম্মান দেখালেন, আমি তার একেবারেই যোগ্য নই। এমন কিছুই আমি করি নি যার জন্যে আপনাদের কোন প্রশংসা দাবী করতে পারি। এ অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই এবং ছিল না।

"আপনারা আমাকে কেউ বলেছেন, দান-বীর, কেউ বলেছেন, দাতা কর্ণ। শুনে যে লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়ে। আপনারা প্রচার করেছেন আমি মস্ত বড় দান করেছি। ভুল, সব ভুল। আমার সাধ্য কি দান করি? সে সৌভাগ্য কোথায়? সে সঙ্গতিই বা কই? আমার মত ক্ষুদ্র লোকের কি দানের স্পর্দ্ধা সাজে? তবু নিতান্তই বিনা কারণে আপনারা আমাকে যে সম্মান দিলেন তার জন্যে শত কোটী ধন্যবাদ।"

পড়া থামিয়ে ভুজঙ্গ বল্লে, "আশা করি এবার বুঝতে পেরেছেন যে আপনারা যেতে উঠলেও দানের কথা উনি স্রেফ অস্বীকার ক'রে গেছেন। তাই নয় কি?"

সুমিতা ও তার সঙ্গীরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন, জবাব খুঁজে পেলেন না। সত্যিই তো। এ কথাগুলোকে বিনয় মনে ক'রে তাঁরা কত হাততালিই না দিয়েছিলেন! তখন কে জানত এর এ রকম একটা নিদারুণ মানেও হ'তে পারে!

আলনার উপরে মালাগুলো তখনও একেবারে শুকোয় নি। সেই দিকে চেয়ে গণেশ পাল বল্ল, "কিন্তু ওরা যদি মামলা করে?"

"মামলা!"—ভুজঙ্গ হো হো করে হেসে উঠল। "এ আপনার বিজ্‌নেস্ নয় দাদা, এর নাম জার্নালিজ্‌ম্।"

শরৎ-প্রসঙ্গ

শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

বড় হয়ে যাঁরা দেশ-যোড়া নাম করেছেন ছেলেবেলা তাঁদের কেমন ক'রে কাটত সে কাহিনী শুনতে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব আগ্রহ হয়। এর আগে একবার

উপন্যাস-সম্রাট্ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বলেছিলাম কবি দ্বিজেন্দ্রলালের গল্প, আজ শোন উপন্যাস-সম্রাট্ শরৎচন্দ্রের কথা।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় ছেলেবেলায় আমার মামার বাড়ী

ভাগলপুরে। তোমরা বোধ হয় জান, শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান হুগলী জেলার দেবানন্দ-পুর হ'লেও তাঁর কৈশোর ও যৌবন কেটেছিল মামার বাড়ী ভাগলপুরে। সেখান থেকেই তিনি এণ্ট্রান্স পাশ করেন, এবং তার পরেও সেখানকার টি. এন্. জে কলেজেই তিনি পড়তেন।

ভাগলপুরে আমাদের বাড়ী, আমার মামাদের বাড়ী আর শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ী ছিল খুবই কাছাকাছি। সব ক'খানিই গঙ্গার ধারে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার মামাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং সে ঘনিষ্ঠতার কারণও ছিল। শরৎচন্দ্র নিজে ছিলেন অদ্ভুত প্রকৃতির খাপছাড়া লোক, আর আমার মামারাও ছিলেন তাই। আবার মামাদের মধ্যে রাজুমামার (আমার চতুর্থ মামা রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার) সঙ্গেই তাঁর ছিল সব চেয়ে বেশী ভাব। এঁকেই শরৎচন্দ্র তাঁর 'শ্রীকান্ত' বইএ "ইন্দ্রনাথের" চরিত্রে অমর ক'রে রেখে গেছেন।

আমার মা ও রাজুমামা ছিলেন পিঠোপিঠি ভাইবোন। মা কিছু বড়। তাই শরৎচন্দ্রও মাকে ডাকতেন দিদি ব'লে।

আমার মামার বাড়ীর ঠিক পেছনে গঙ্গার ধারে ছিল এক বিরাট প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ। শ্রীকান্তের সেই "অশ্বত্থ গাছ"। জটার মতন তার বড় বড় শিকড় গঙ্গার মধ্যে নেমে গেছে। তলায় কাঁকড়ার গর্ত্ত, সাপের গর্ত্ত। এই সব জায়গায় আমি ঘোরাঘুরি করতাম।

রাজুমামা আর শরৎচন্দ্রের কিন্তু ঐ গাছটিই ছিল পরম প্রিয়; এবং, শুনলে হয়তো হাসবে, এই গাছের উপরেই তাঁদের দিনের বহু সময় কেটে যেত। অবশ্যি একেবারে ডালে ব'সে নয়, ঐ গাছের দু'টো ডালের উপর রাজুমামা একটা সুন্দর কাঠের ঘর বানিয়ে নিয়েছিলেন—দেখতে অনেকটা বড় পাল্কীর মত; মেঝেটা ছিল পাল্কীর মতই খুব মোটা বেত দিয়ে বোনা। কিছু নীচে দু'টো ডালের ফাঁকের মধ্যে মোটা কাঠ বসানো ছিল ঐ ঘরে ঢুকবার জন্য। ঘরটি ঝুলত একেবারে গঙ্গার উপরে। গাছের ডালের উপর উঠে অতি সাবধানে কাঠের সাহায্যে ঐ ঘরে ঢুকতে হ'ত।

আমার বেশ মনে পড়ে, কখনও শরৎচন্দ্র, কখনও বা রাজুমামা আমাকে একরকম কোলে ক'রে অতি সন্তর্পণে ঐ ঘরে নিয়ে আসতেন। আমি তাঁদের নানা ছোটখাট ফরমায়েস খাটতাম কিনা! আমাদের রান্নাঘরটা ঐ অশ্বত্থ গাছের খুব কাছেই ছিল। আমি ওঁদের জন্য মার কাছ থেকে চা, লুচী, গরম বেগুন-

ভাজা, জিলেপী ইত্যাদি নিয়ে আসতাম, আর বায়না ধরতাম—"আমায় ঐ ঘরে নিয়ে চল!"

যতদূর মনে পড়ে, এখানে শরৎচন্দ্রকে মনের আনন্দে বাঁশী বাজাতে দেখেছি। এই ঘরের মধ্যে থাকত বাঁশী, ক্লারিওনেট, হারমোনিয়াম্, বন্দুক আর কিছু বই। ঐ ঘরের নীচে গঙ্গার ওপর সব সময় দু'টি ছোট ডিঙ্গী বাঁধা থাকত। একটা ডিঙ্গীতে শরৎচন্দ্র প্রায়ই "নদীর অবস্থা" দেখতে বেরোতেন। কখনও বা সরকার ঘাটে ডিঙ্গী রেখে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন—যদিও হেঁটে এলেও মিনিট চারেকের বেশী লাগত না। বোধ হয় এইখানে বসেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রাজুমামার মাছ চুরির জল্পনা-কল্পনা চলত। এখানে ব'লে রাখি, রাজুমামা ছিলেন অত্যন্ত দুঃসাহসিক আর অসাধারণ শক্তিশালী। শরৎচন্দ্রও নেহাৎ শান্তশিষ্ট ছিলেন না।

শরৎচন্দ্র—পরিণত বয়সে

গভীর রাত্রে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তের মাছ চুরির অভিযান-কাহিনী বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। কিন্তু ওটা যে অনেকখানিই সত্যি ঘটনার উপর ভিত্তি ক'রে লেখা এ খবর হয়তো অনেকে জান না। কিন্তু সব চেয়ে মজা, এই ব্যাপারে সব চেয়ে বড় সহায় আর উৎসাহদাতা কে ছিলেন জান? আমার দাদামশাই—৺রামরতন মজুমদার। ইনি ছিলেন মস্ত বড় সরকারী চাকুরে—এক্‌জিকিউটিভ্ এঞ্জিনীয়ার, আর মস্ত বড় পণ্ডিত—বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র; বঙ্কিমচন্দ্রের পরের বার বি. এ পাশ ক'রে স্বর্ণপদক পান। এ ছাড়া আরও অনেক পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ছেলেবেলায় পাবনায় থাকতে পদ্মানদীতে জেলে-নৌকো থেকে মাছ চুরি করতে ইনিও ছিলেন এঁর ছেলের

মতই পটু। দাদামশাই-ই রাজুমামা আর শরৎচন্দ্রকে ডিঙ্গী তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন ঐ সব "মজা" করবার জন্য।

দাদামশাই হঠাৎ মারা গেলেন। বড়মামা আর মেজমামা থাকতেন বাইরে। ভাগলপুরে মাথার উপর গুরুজন কেউ না থাকায়, আর টাকারও অভাব না থাকায়, অন্য মামাদের খেয়ালের আর অন্ত ছিল না। কত কাণ্ডই না তাঁরা করতেন!

বড়মামা (সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার) শুধু বড় চাকুরে ছিলেন না, চমৎকার হাসির গল্প লিখতেন তিনি, আর তেমনি ছিল তাঁর গানের গলা। ছবি আঁকতেও তিনি ছিলেন সুপটু। মেজমামা (নগেন্দ্রনাথ মজুমদার) ছিলেন বড় ডাক্তার।

সেজমামা (৺শরৎচন্দ্র মজুমদার ছিলেন অদ্ভুত লোক। বি. এ পাশ করার পর তিনি হ'লেন মহাতান্ত্রিক, পিশাচসিদ্ধ হ'বার জন্য গভীর রাত্রে শবের উপর বসে কালীপূজো করতেন। এই কাজে তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিলেন শরৎচন্দ্র।

মামার বাড়ীতে ছিল বিরাট্ হল্। সেখানে প্রায়ই গান-বাজনা এবং থিয়েটার হ'ত। সেজমামা খুব ভালো অভিনয় করতে পারতেন। রাজুমামা এবং শরৎচন্দ্রও চমৎকার অভিনয় করতেন,—তবে তাঁরা নিতেন মেয়েদের পার্ট। কুমার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন এই দলের একজন পাণ্ডা। তাঁর বাবা রাজা শিবচন্দ্র ভয়ানক কড়া, রাশভারী লোক ছিলেন; তাই মামার বাড়ীতেই ছিল তাঁর আড্ডা। তিনি চমৎকার গাইতেন, বাজাতেনও চমৎকার। সেকালে নাটকের শেষে দোলনায় রাধাকৃষ্ণের মিলন দেখানোর রেওয়াজ ছিল। আমার চেহারাটা ছিল বেশ ফর্সা, দেখতেও ছেলেবেলায় মন্দ ছিলাম না। শরৎচন্দ্র ও রাজুমামা আমাকে তাই প্রায়ই রাধিকা সাজাতেন; নোলক পরিয়ে দিতেন, এবং, পাছে আসল সময়ে গণ্ডগোল করি, সেজন্য আগেই গরম গরম জিলেপী খাইয়ে নিতেন। কৃষ্ণ সাজত কুমার সতীশের ভাগ্নে।

এইভাবে জীবন যাপনের মধ্যে হঠাৎ রাজুমামা হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী। শরৎ-চন্দ্রও হঠাৎ কলেজ ছেড়ে গ্রহণ করলেন ভবঘুরের জীবন। কখনও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে, কখনও সাপুড়ে বা বেদেদের ছাউনীর মধ্যে—এইভাবে প্রায় গোটা ভারতবর্ষই চষে বেড়ালেন তিনি। পরে তাঁর কাছে শুনেছি, এই সময়ে তিনি দেশ-বিদেশে তাঁর প্রিয় বন্ধু 'রাজু'কে কত যে খুঁজেছেন তার ঠিক নেই।

জানি না রাজুমামা আজ বেঁচে আছেন কিনা। কিন্তু যদি শরৎচন্দ্রের অমর সৃষ্টি ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে থাকে, তিনি নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে শরৎচন্দ্রকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

মিথ্যে হবার নয়

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

তারানাথ জ্যোতিষার্ণবের ওপর অগাধ বিশ্বাস আমাদের নীলকণ্ঠ মোক্তারের। কাছারী-ফিরতি পথে সেদিন ভাবলেন, যাই, আর একবার হাতটা দেখিয়ে আসি। বহুদিন যাওয়া হয় না।

বিশ্বম্ভর মিত্তির লেনের ইট-বের-করা সেই বাড়িটা। লোকে বলে একটা হাড়-পাঁজরা সার বুড়ো, দিন নেই রাত নেই দাঁত-মুখ খিঁচোচ্ছে—বাড়িটার চেহারা নাকি অবিকল এমনি। যা হোক, শেষ বিকেলের দিকে নীলকণ্ঠ মোক্তার যখন ঢুকলেন, জ্যোতিষার্ণব একটা তেলচিটে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে একা একা বসে তামাক টানছিলেন। ঠাহর করবার একটু চেষ্টা ক'রে জিজ্ঞেস করলেন—"মোক্তার বাবু মনে হচ্ছে যেন!"

খাটের কোণায় নীলকণ্ঠ মোক্তার গ্যাঁট হয়ে বসলেন। বললেন—"কেন, ঠিক পাচ্ছেন না বুঝি?"

—"না, না, সে কি কথা! আপনাকে ঠিক পাবো না, এ কী কথা বললেন মোক্তার বাবু? জানেন রঘুপ্রিয় মুনি কি ব'লে গেছেন? তবে কি জানেন, মানে বুড়ো হয়ে পড়েছি কিনা একটু, মানে এই চোখে একটু,—না না, দেখতে ঠিকই পাই, যা ভাবছেন তা নয়! তবে মানে এই ইয়ে,—একটু—।"

—"তবে কাল ভোরেই আসবো, কি বলেন? হাতখানা একবার ভালো ক'রে একটু দেখে দেবেন আর কি!"

নীলকণ্ঠ বাবু উঠে দাঁড়ালেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সুখটানের মৌজটা বিলকুল হাওয়া হয়ে গেলো জ্যোতিষার্ণবের।—"কেন, কেন, এখন ক্ষতিটা কি? এখনই তো নিরবিলি আছি বরং। তা ছাড়া সকালে বড্ড ভীড় হয় কিন্তু। তখন—"

তখন সত্যিই ভীড় হয় বড়। তখন অনেক গোণা-গুণ্তির ব্যাপার। রকমারী কাণ্ড-কারবার। যেমন: 'আজ রাত্তিরে বেরোলে ধরা পড়বার ভয় নেই তো? আজকে অমাবস্যে আছে, রাত্তিরে বিষ্টিও হবে বোধ হয় একচোট, সিন্দুকের তালা ভাঙ্গবার একটা যন্ত্রও তৈরী করা গেছে। তা আজকে কী—?'

কিংবা, পরীক্ষার ছেলেরাও হয়তো এসে পড়তে পারে: 'কী কী পেলেন গুণে গেঁথে? আকবর না আলেকজাণ্ডার? কী বললেন? সি. এইচ. রায়ের বাইশের থিয়োরেম? অষ্ট্রেলিয়ার ভেড়া? ফিলাডেলফিয়া কেন বিখ্যাত?'—সকালেই তো যত ঝামেলা।

"আর তা ছাড়া"—কানের কাছে মুখটা এনে, গলাটা একটু নীচু করলেন জ্যোতিষার্ণব—"এখন দু' টাকায় ক'রে দিতে পারি আপনাকে, বুঝলেন মোক্তার বাবু! আপনি বলেই

নেহাৎ,—কিন্তু সকালবেলা অত ভীড়ের মধ্যে"—হতের পাঁচটা আঙুল শূন্যে মেলে ধরলেন একেবারে—"এই পাঁচ টাকার কম হয় না; বুঝলেন কিনা, ক্যাশ ফাইভ্ রুপিজ্……।"

ভালমানুষটির মতো নীলকণ্ঠ মোক্তার প্যাণ্টালুনটাকে হাঁটুতক তুলে খাটের উপর বসলেন। মনটা খুঁৎ-খুঁৎ ক'রতে লাগলো একটু। কি জানি, চোখে কি ঠিক ঠাহর করতে পারবেন এখন?

—"কেন? য়্যাঁ, আমি চোখে কম দেখি? আমি রাত্তকাণা? ঘুণাক্ষরেও যারা এ-কথা মনে ভাবে তাদের চোখে যদি ছানি না পড়ে তবে—।"

নীলকণ্ঠ মোক্তারের মুখখানা বেজার হ'লো!—"আজ্ঞে, আমি কিন্তু আপনাকে রাত্ত-কাণা-টানা ভাবি নি।"

মোরগের মতো ঘাড় কাৎ ক'রে জ্যোতিষার্ণব বললেন—"সে কি আর আমি জানি নে মোক্তার বাবু? বলি, আপনাকে কি আমি চিনি না? একটা কথা ব'লে রাখি মশাই, যা ব'লে দেবো এখন, যদি ঠায়-ঠিকানায় না মেলে তো নিজের হাতে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালবো, বাপের দেওয়া নাম তুড়ি মেরে বদলে ফেলবো, আর আপনাকে ব'লে দিচ্ছি মশাই, আমার নামে কুত্তা পুষবেন, আলবৎ পুষবেন।"

লোকসান, লোকসান! ভয়ানক টাকা-লোকসানের আশঙ্কা। তবে ভরসাও দিয়েছেন জ্যোতিষার্ণব, কিছুদিন একটু বুঝে-সমঝে চললে আর ভগবানের দয়া থাকলে, হয়তো এড়িয়েও যেতে পারেন বা!

অন্ধকার হয়ে এসেছে। পার্কের কোণে একটা নিরিবিলি বেঞ্চিতে ব'সে চীনেবাদাম চিবুতে চিবুতে নীলকণ্ঠ মোক্তার ভাবছিলেন। নাঃ, কিছুদিন একটু কড়াকড়ি ক'রেই চ'লতে হবে। হাতের মুঠো শক্ত ক'রে ধরতে হবে।

কাল থেকে রোজ ছ'-আনা বাজার বরাদ্দ। কুড়ি দিনে একদিন নাপিত। ধোবা বরবাদ, স্রেফ সোডা সেদ্ধ।

কিন্তু যদি চুরি-ডাকাতি হয়! সত্যি? হাতের কাছে একটা অস্ত্র-টস্ত্র তো থাকা দরকার অন্ততঃ। ভেবে-চিন্তে নীলকণ্ঠ মোক্তার ফিরবার পথে চক বাজার থেকে চকচকে ছুরি কিনে ফেললেন একখানা। আসুক না চোর!

কিন্তু, এই দেখো, এতক্ষণে খেয়াল হ'ল নীলকণ্ঠ মোক্তারের। লোকসান শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। জ্যোতিষার্ণবকে হাত-ফিস্ যা দিয়েছেন তা তো দিয়েছেনই, কিন্তু এই চীনে বাদাম আর ছুরিটা! কী দরকার ছিল? খানকয়েক তাগড়াই চেহারার থান ইট হাতের কাছে নিয়ে ঘুমুলেই তো দিব্যি চ'লে যেতো!

বাড়িতে ঢুকেই যা শুনলেন, আক্কেল গুড়ুম। মারে কেষ্ট, রাখে কে? সত্যি তারানাথের কথা কখনো মিথ্যে হয়?

ভবতোষ সরকার, যাকে চিরদিন বন্ধু ব'লে জানতেন, তারই এই কাণ্ড! নগদ দশ টাকা নিয়ে একখানা টিকিট গছিয়ে গেছে! লটারীর টিকিট!

রাগে কাঁপতে কাঁপতে কাছারীর পোষাকেই নীলকণ্ঠ হাজির হলেন ভবতোষ সরকারের বাড়ি। তারিয়ে তারিয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছিলেন ভবতোষ, বিনা ভূমিকায় নীলকণ্ঠ বললেন —"কিহে ভবতোষ, তুমিও আমাকে ডোবাতে চাও! কেন? আমি তোমার কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছি?"

চায়ের পেয়ালায় ভবতোষের আর চুমুক দেওয়া হ'ল না।—"আ—আ—মি?"

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি।"—এত জোর হাঁক্ ছাড়লেন যে, প্যাণ্টালুনের একটা বোতাম সাত হাত ছিটকে গেলো নীলকণ্ঠ মোক্তারের;—লটারীর টিকেটটা মেলে ধ'রে বললেন—"এটা কী? যাই হোক, এ তোমায় ফেরৎ নিতে হবে। কর্‌করে দশ টাকা নষ্ট করতে আমি রাজী নই!"

—"আমি নিয়ে কী করবো? কে একজন এসেছিলো টিকেট বেচতে। আমি তো কোনোদিনই লটারী-ফটারীর টিকেট কিনি না। তুমি রেগুলাররি কিনে আসছো, তোমার ঝোঁক আছে জানি, তা আজকেই আবার ওর লাষ্ট ডেট্ কিনা, তাই আমি নিজেই তোমার বাড়ি গিয়ে……।"

"থাক, থাক, আর ভালোমানুষগিরি ফলাতে হবে না।"

ভবতোষকে শেষে দশটা টাকা দিয়ে টিকেটটা ফেরৎই নিতে হ'ল। রাগে মুখ দিয়ে তাঁর একটি কথাও বেরুল না।

দিনকয়েক বাদে, রকের রোদ্দুরে ব'সে গায়ে তেল মাখছিলেন নীলকণ্ঠ, কোনো কথা-বার্তা নেই, সোজা এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন ভবতোষ সরকার। এ কি, ভবতোষের কি শেষটা মাথাই বিগড়ে গেল!

—"নীলকণ্ঠ মোক্তারের ভুঁড়ি জড়িয়ে ভবতোষ সরকার দস্তুরমতো তাঁকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে গান—"ও আমার পরাণ-বন্ধু—উ—উ রে……!"

নীলকণ্ঠ কি বলবেন, কি করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। এদিকে ভবতোষের নাচও থামে না! গানও চলেছে সমানে—"ও আমার পরাণ বন্ধু রে··!"

কী, কী ব্যাপার?

আসল ব্যাপারটাও গান গেয়েই জানালেন ভবতোষ সরকার—

"এই মাত্তোর দেখতে পেলাম খবর-কাগজ খুলে, শোন ভাই,
লটারীতে ফাষ্টো প্রাইজ্ পেয়ে গেলাম, তাই তো নাচি গাই।
লটারীতে ফাষ্টো প্রাইজ…ও আমার পরাণ বন্ধু রে!"

মাতৃপূজা

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

প্রভাততারকা   হাসিয়া চাহিছে
মঞ্জু শেফালী পানে,
শেফালী কহিছে,   চলিনু এখন
মাতৃ-সন্নিধানে।

রজনীগন্ধা   দেখিয়া সন্ধ্যা
কহিছে-প্রেমের রাগে,
সেবিব মায়ের   রাতুল চরণ,
মোরে তুলে লও আগে।

পদ্মিনী আসে   ত্যজি সরোবর,
ফুল্লা অপরাজিতা,
নব মল্লিকা   আপনা সঁপিয়া
গরবে আজিকে স্ফীতা।

অতসী আসিছে   লভিতে আশিস,
কাঞ্চন মনোহারী,
বিবিধ বরণে   রঞ্জিতা জবা
পুঞ্জিতা সারি সারি।

বিল্বপত্র,   দুর্ব্বা তুলসী
অর্চ্চনা করে মায়ে,
মলয় ত্যজিয়া   চন্দন আসি
বন্দনা করে পায়ে।

জননী মোদের   সিংহবাহিনী—
অস্ত্র দশটী করে,
সদা তাঁর কাজ   দুষ্ট নিপাত,
কম্পে অসুর ডরে।

দিকে দিকে তাঁর   ঘোরে ত্রিনয়ন,
রয়েছে সেনানী সঙ্গে,
দুঃখের নিশা   করিতে বিনাশ
আজি এ বোধন বঙ্গে।

গণেশের, দেবি,   আন কূটনীতি,
ভারতীর আন জ্ঞান,
কমলার আন   ভাণ্ডার খুলি
অতুল্য তাঁর দান।

দুর্নীতি নাশি’,   দারিদ্র্য ত্রাসি’
শাস নিজ সাম্রাজ্য,
শিখাও ভক্তে   দেহের রক্তে
সাধিতে তোমার কার্য্য।

বন্ধুর চিঠি

বন্দে আলী

[অজিত ও রশিদ একই গ্রামে পাশাপাশি বাড়ীতে বাস করিত, একই স্কুলে একই শ্রেণীতে পড়িত। দুই জনে ছিল পরম বন্ধুত্ব। বঙ্গ বিভাগ হওয়ায় অজিতের পিতা পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানে (কলিকাতায়) আসিয়া বাস করিতেছেন। নীচের চিঠিতে উভয়ে উভয়কে আপনাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা বর্ণনা করিতেছে।]

—পাকিস্তান হইতে রশিদের চিঠি—

শোনো গো অজিত, স্বাধীন রাষ্ট্রে পরম সুখেতে আছি,
স্বাধীনতা পেয়ে চলে গেছি মোরা স্বর্গের কাছাকাছি।
অন্ন-বস্ত্র অভাব কেবল—অসুবিধা আর নাই,
যাহা প্রয়োজন, ব্ল্যাক মার্কেটে সকল জিনিস পাই।
ডাক্তারে আর নাই প্রয়োজন, সকল পাকিস্তানে
আধপেটা খেয়ে থাকিব সুস্থ—ঈশ্বর তাহা জানে।
হোটেলে খেলেও লাগিছে ট্যাক্‌সো—সবেতে ট্যাক্‌সো আজ,
বাংলা বদলে শিখ ছি উর্দ্দু—ইহাই প্রধান কাজ।
বিহারীরা এসে দখল করেছে মোদের অফিসগুলি,
এটা কি বাংলা অথবা বিহার সে কথা গিয়েছি ভুলি’।

মোদেরে নিরীহ বাঙালী ভাবিয়া শাসন করিতে দেশ
পাঞ্জাবী আর বিহারীরা এসে হরেছে মোদের ক্লেশ!
আমরা কেবল চাঁদা আর যত ট্যাক্‌সো দিতে গো আছি,
স্বাধীন রাষ্ট্রে বাস করি মোরা স্বর্গের কাছাকাছি।

—হিন্দুস্থান হইতে অজিতের পত্র—

চিঠি পড়ে তব হিংসা হইছে—মহাসুখে আছো ভাই,
হেথায় আসিয়া পড়েছি বিপাকে—বলো আজ কোথা যাই!
মাছ, তরকারী অগ্নিমূল্য—কন্ট্রোলে চাল পাই,
পাথরের কুচি প্রতি গ্রাসে ছাড়া আর অসুবিধা নাই।
দেশেতে ছিলো গো খামারের ধান—বিল বাঁওয়ের মাছ,
বাড়ীর বাগানে কুমড়ো ও লাউ, লঙ্কা, বেগুন গাছ।
দেশেতে ছিলাম জোতদার রূপে—হেথা নগণ্য জন,
ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করি আজ—সদা অপরাধী মন।
তোমরা আছিলে বন্ধু স্বজন—হেথা কেহ চেনা নয়,
করে না দরদ—কয় নাকো কথা—দূরে দূরে সবে রয়।
আজ মনে পড়ে ছোট সে গ্রামেতে কত সুখে ছিনু হায়,
কোন্ পাপে মোরা ঘর-ছাড়া হ'নু—চলে এনু ভিন্ ঠাঁয়!
যাযাবর সম পথে পথে ঘুরি—পথ আজ আপনার,
পুরানো সে দিন—ফেলে-আসা বাড়ী ফিরে কি পাবো না আর?
আসিবার কালে ছাড়িয়া দিয়াছি খাঁচার ময়না, টিয়া,
অত প্রিয় মোর বাঘা কুকুরেরে সবারে এসেছি দিয়া।
তাহাদের লাগি' চোখে আসে জল—কাঁদি বসে নিরালায়,
ঈশ্বর, আজ এ দু'টি জাতিরে দাও প্রীতি পুনরায়।

খেলা

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

আপন মনে খেল্‌ছি আমি সব খেলা-ই—
অলিম্পিকের সব খেলাতেই জিত্‌ছি বসে তিন বেলা-ই।
আসাম থেকে বর্মা আমার আমেরিকার পগার পার;
একটি শুটে ফুট্‌বলটির পেটটি ফেটে ছত্রাকার।
ক্রিকেট্ বলে এয়সা ঠোকন, বল্‌টা যেন উল্কা যায়,
একেবারে ধবলগিরির চূড়ায় ঠেকে ঢোল বাজায়।
হকি-ষ্টিকে মারবো বাড়ি, জ্বলবে আগুন দপ্. ক'রে,
গোল বাধাবে বল্‌টি গিয়ে আরব দেশের ছপ্পরে।
সাঁতরে যাবো সমুদ্দুরে তিন শো মাইল ঢেউ কেটে,
দেখবে চেয়ে নিগ্রো, জুলু,—কেউ বা ঢ্যাঙা, কেউ বেঁটে।
আমার মুঠির এক ঘুঁসিতে সকল ব্যাটাই হুম্‌ড়ি খায়,
কুস্তিগীরের ভাঙছি বড়াই, মুণ্ডু তাদের দুমড়ে যায়।
টেবিল-টেনিস্, ভলি, পোলো,—সব খেলাতেই চ্যাম্পিয়ান্,
আমায় জিতে' আর কি কেহ দিগ্‌বিজয়ীর নামটি পান?
শোবার ঘরে খাটের 'পরে চল্‌ছে খেলা দিগ্‌বিদিক্;
আমার খেলার খবর কি তুই কাগজগুলোয় লিখবি ঠিক?
হেইয়া হো, হেইয়া হো—
নৌকো চালাই পাল্লা দিয়ে, আমার জয়ের গান গাহো।

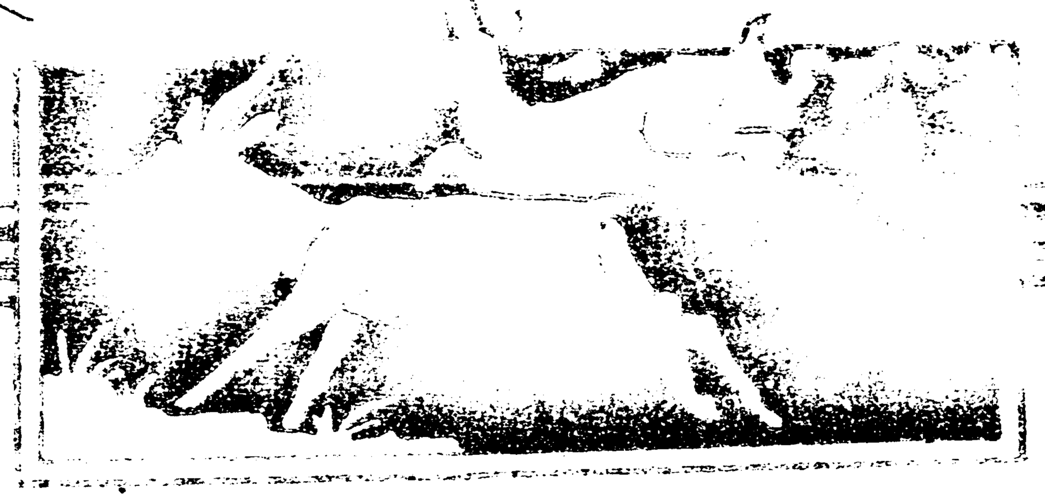

ছবির ভূত

শ্রীকল্যাণী দেবী, বি. এ

ছেলেবেলা থেকেই আমার ভয়ানক ভূতের ভয়। বয়সে যাঁরা বড়, তাঁরা সর্ব্বদাই বকাবকি করেন, এতখানি বয়েস হ'ল, তবু ভূতের ভয় গেল না? কিন্তু আমি বলি, এ কথাটার কোন মানেই নেই। ভূত যদি ভয় দেখাতেই আসে, তবে সে কি আমার বয়েস দেখে বসে পড়বে? তেমন পাত্রই ভূতেরা নয়। তা ছাড়া, এই যে এত ভূতের গল্প শোনা যায়, সবই তো বড়দের মুখে। কবে কোন্ পেল্লয় ভূতের পাল্লায় পড়ে তাঁরা কত নির্য্যাতন সহ্য করেছেন—তাঁদের মামা, কাকা, পিসে, মেসোরা কোন্ ভূতের হাতে শেষ হ'তে হ'তে সাম্‌লে গেছেন—এই সব গল্প তো হামেশাই তাঁদের কাছে শুনতে পাওয়া যায়! কোন্ শিশুকে কে কবে ভূত দেখার গল্প বলতে শুনেছে? তুমি শুনেছ? শোন নি। তবে??

ছবি আঁকা আমার পেশা। ওয়াটার পেন্টিং, অয়েল পেন্টিংএর সঙ্গে সঙ্গে ফোটো এনলার্জমেণ্টও আমি ক'রে থাকি। একবার একটী বন্ধু তার বাবার একখানা ফোটো এনলার্জ করতে দিয়ে গেল। খুব বড় সাইজে, অয়েল কালারে আঁকতে হবে।

কথায় কথায় বন্ধু বল্লে, "বাবার যে কি এক জেদ, কিছুতেই নিজের ফোটো এনলার্জ করাতে দেবেন না। বলেন, 'আমি মরলে করিস্।' কিন্তু তার কি কোন মানে আছে ভাই? জীবিত লোকের ফটো কি এনলার্জ করায় না কেউ? দেখ না, যত সব ইয়ে—"

যা হোক, আমি তো ফোটো আঁকতে সুরু করে দিলাম। কিন্তু সেটা সারা হবার আগেই বন্ধুর বাপটী একদিন রাস্তা পার হ'তে গিয়ে এক মোটর বাস্‌কেই নিজের ওপর দিয়ে পার করে দিলেন। ফলে তিনি একেবারে পরপারে গিয়ে হাজির হ'লেন। ছবিখানা আমি প্রায় শেষ ক'রে এনেছিলাম; এই দুর্ঘটনা ঘট্‌বার পর আমি হাতের কাজ স্থগিত রাখলাম। ছবিখানা ইজেলের ওপর দাঁড় করিয়ে ঘরের এক কোণে রেখে দিলাম। একে আমার প্রবল ভূতের ভয়, তার ওপর ভদ্রলোক পড়েছেন মারা—তায় আবার অপমৃত্যু! এই ত্র্যহস্পর্শের তাড়নায় আমার ষ্টুডিওতে ঢোকাই মুস্কিল হয়ে দাঁড়ালো! ঘরের ভেতর পা বাড়ালেই গা ছম্‌ছম্ ক'রে ওঠে। কিন্তু উপায় কি?

একদিন সন্ধ্যে হয় হয়। আমি সূর্য্যাস্তের একখানা ছবি আঁকছিলাম। আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হ'ল, এই রংএর খেলাটি তুলির আগায় ধরতে হবে। আমি ছবির কথাই ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ভাবে ষ্টুডিওতে ঢুকলাম, ভূতের কথা একবারও মনে হয় নি। কিন্তু ঢুকেই থম্‌কে গেলাম। কি জানি কেন আমার দৃষ্টিটা প্রথমেই সেই এনলার্জমেণ্ট-খানার ওপর গিয়ে পড়ল। দেখলাম, ভদ্রলোকের ঠোঁট দু'টি ফাঁক হয়ে রয়েছে, এবং আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই তিনি ফিক্ ক'রে হেসে ফেল্লেন। আমার তখনকার অবস্থা তোমরা কল্পনা করতে পার? আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি ঠোঁট দু'টি বোঁজা এঁকেছিলাম—

সে দু'টি ফাঁক হ'ল কি করে? আর হ'লই বা যদি, তিনি হাসলেন কেন? তখুনি মনে হ'ল, তাঁর অমতে ছবি আঁকতে নিয়েছিলাম, তাই বোধ হয় ভয় দেখিয়ে শোধ তুলতে এসেছেন। হয়ত ভাবছেন, এই ছবিখানার জন্যই তাঁকে এত শীগ্‌গির, বলতে গেলে এক রকম সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থাতেই, ওপারে যাত্রা করতে হয়েছে! তোমরা বলতে পার, "হাসি দেখে ভয় পাবার কি আছে?" কিন্তু এ যে ভূতের হাসি! অনেকের কাছে শুনেছি এবং অনেক বইএও পড়েছি যে ভূতেরা নাকি অন্ধকারে খিল্‌খিল্, নয়ত খল্‌খল্ ক'রে অট্টহাস্য ক'রে মানুষকে ভয় দেখায়! ইনি হয়ত 'ডোজ'টা একটু কমিয়ে এনে ফিক্ ক'রে হেসেই আমার ফিক্ ব্যথা ধরাবার মৎলবে আছেন। আমি চৌকাঠের কাছেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, না পারি এগোতে, না পারি পিছোতে। বুকের মধ্যে তখন তুফান মেল চলছে। ভাবলাম চেঁচিয়ে কাউকে ডাকি। কিন্তু জিভ একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেছে, তার জড়তা ভাঙ্গতে পারলাম না। শুধু একটা করুণ ভাঙ্গা ভাঙ্গা আওয়াজ গলা গলিয়ে কোন মতে বা'র হয়ে এল।

তোমরা জান, শিশুদের যে কাজটি করতে মানা, সেইটাই তারা বেশী ক'রে করবার চেষ্টা করে। আমার চোখ দু'টোও আজ শিশুসুলভ ব্যবহার ক'রে বসল। যে দৃশ্য একবার দেখেই আমার হয়ে এসেছে, তা' যে দ্বিতীয় বার দেখবার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই, তা'তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু যখন আমি কাঠের মত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আমার জিভ যখন জরাগ্রস্ত হ'তে বসেছে, এবং বুকে যখন আমার বয়লার চলছে, ঠিক সেই সময় এদের সবায়ের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে আমার চোখ দু'টো চকিতে একবার ঐ ছবিখানার ওপর ঘুরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথার প্রত্যেকটি চুল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, বুকের বয়লারের স্পন্দন রুদ্ধ হয়ে এলো, পা দু'টো ঠক্‌ঠক্ ক'রে পরস্পর ঠোকাঠুকি সুরু ক'রে দিল। আমি দেখলাম, স্পষ্ট দেখলাম, দিনের আলোর মত পরিষ্কার দেখলাম, সেই ভদ্রলোক, অর্থাৎ তাঁর ছবিখানা একবার, দু'বার, তিনবার, লাল টুক্‌টুকে একখানা জিভ বার ক'রে আমায় ভ্যাংচালো! ভূতের ভ্যাংচানিতে ভ্যাবাচাকা খেয়ে আমি একটা অস্ফুট চীৎকার ক'রে সেইখানেই বসে পড়লাম। ভূত দেখে

পরদিন সেই বন্ধুটি এলো। বল্লে—"কি রে, শুনলাম কাল ষ্টুডিওতে নাকি ভূত দেখে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলি? ব্যাপার কি, এঁ্যা? ভূতের সঙ্গে একেবারে চাক্ষুষ দেখা? চার চোখের মিলন হয় নি তো?"—বলেই হি হি ক'রে হাসতে লাগল। আমার পিত্তিশুদ্ধ জ্বলে গেল। বল্লাম, "তুমি তো হাসবেই। জান, কাল তোমার বাবা আমায় ভেংচেছিলেন?"

"ভেংচেছিলেন? আমার বাবা!" সে হাসি থামিয়ে অবাক্ হয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল, তারপর বল্ল—"হ্যারে, তোর মাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো?"

"এখন তো আমার মাথা খারাপ বলবেই। তোমার বাবা কিনা! হ'ত যদি আমার বাবা, তবে বলতে বুড়োর ভীমরতি হয়েছে।" (আমার বাবা অবশ্য এখনও জীবিত।)

"না, না, সত্যি কি হয়েছে খুলে বল তো?"

আমি তা'কে সমস্তই খুলে বল্লাম। শুনে সে বল্লে, "তুই ধাঁধা দেখেছিস্।"

"ধাঁধা না হাতী! স্পষ্ট দেখলাম, টুক্‌টুকে একখানা জিভ—"

"আচ্ছা, চল্ তো, তোর ষ্টুডিওটা একবার ঘুরে আসি—"

আমি তৎক্ষণাৎ ধপ্ ক'রে শুয়ে পড়লাম। বল্লাম—"মাপ কর ভাই, আমাকে আর ওতে টেনো না।"

অগত্যা বন্ধুবর আমার ছোট ভাইকে ডেকে নিয়ে ষ্টুডিওতে গেল। কিছুক্ষণ পরেই তারা হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে উপস্থিত। বন্ধু বল্লে,—"চল্, দেখবি চল্—কাল তোর কি রকম রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছিল।"

আমি বল্লাম, "হয়েছিলো, বেশ হয়েছিলো। তবু তো প্রাণে বেঁচে গেছি। এবার যদি সর্পে রজ্জুভ্রম হয়, তবে তো বাঁচাই মুস্কিল হবে!"

বন্ধু ও ছোট ভাই আমার কোন আপত্তি শুনল না, তারা আমাকে জোর ক'রে ষ্টুডিওতে ধরে নিয়ে গেল। আমি কিন্তু সাহস ক'রে সেই ছবিখানার দিকে চাইতে পারলাম না; দু'হাতে দু'জনকে ধরে প্রাণপণে চোখ বুজে রইলাম। বন্ধু ধমকালো, 'এই ইডিয়ট্, চোখ খোল্ না—' তাদের বকাবকিতে চোখ খুললাম। বন্ধু দেখালো, ছবির ঠোঁট দু'খানির ঠিক মাঝামাঝি খানিকটা ক্যান্ভাস্ ইঁদুরে কেটে দিয়েছে, তাইতেই ঠোঁট দু'খানা ফাঁক হয়ে রয়েছে; আর সেই ফাঁক থেকে ছবির পিছন দিকে এক ফালি লাল ছেঁড়া ন্যাকড়া ঝুলছে! নিশ্চয় এটাও ইঁদুরেরই কাজ, কোথা থেকে লাল ন্যাকড়াটা এনে ফেলেছে। বন্ধু বোঝালো, ছবির এই দিক্ দিয়ে কোন রকমে লাল ন্যাকড়ার টুকরোটা বার হয়ে পড়েছিল, হয়ত ইঁদুরটারই লাফালাফিতে! আর হাসিটা নাকি সম্পূর্ণই আমার কল্পনা!

আমি কিন্তু আর সেই ভূতুড়ে ছবিখানাতে হাত দিলাম না। এমন কি এর পর অনেকদিন পর্য্যন্ত কোন এনলার্জমেণ্টই আমি হাতে নিতে পারি নি। সেবার তো ইঁদুরের ইঁদ্রামি ভয় দেখিয়েছিলো, কিন্তু প্রতিবারই ইঁদুরের কারসাজি তো না-ও হ'তে পারে!

তোমরা কি বল?

ছোট্ট কবিতা

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

পূজো এলো, সকলেই চারিধারে হাসে খেলে;
কেউ পথে ঠেলে যায়, কেউ ট্রামে বাসে ঠেলে!
ছোট ছুটি নয় এটা, ছুটোছুটি তাই এত,
কেউ ঘরে ফিরে আসে, কেউ যায় বাইরে ত'!
দুঃখ চতুর্দ্দিকে, তবুও পত্ত ক'রে—
'আনন্দ করো' ব'লে চেঁচাব সমস্বরে।
ঐ ত' পথে ও ঘাটে অনেকেই হাসে দেখি!
সারা বছরের খুসি আশ্বিন মাসেতে কি?

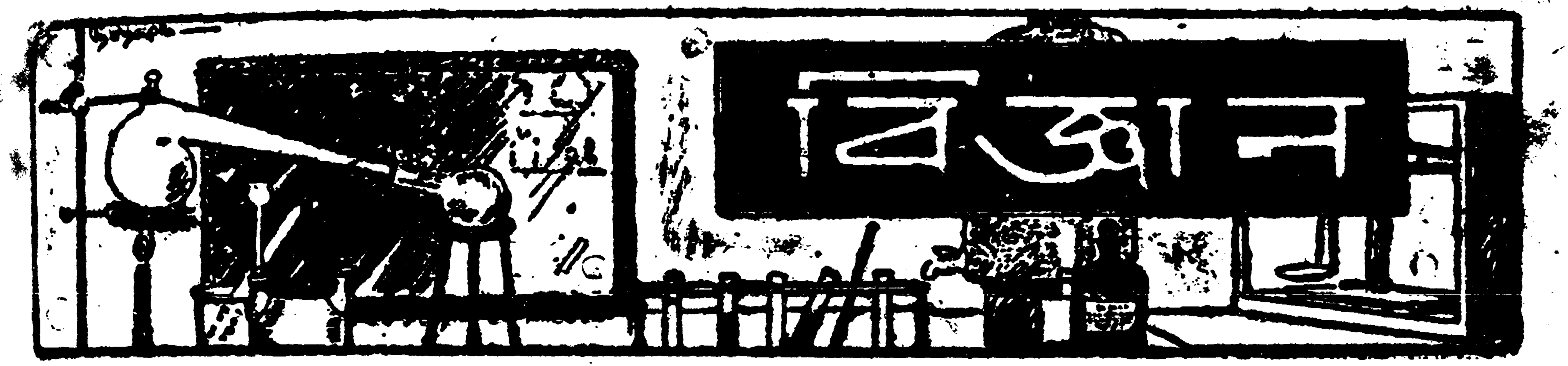

টেলিভিশন

শ্রীপুষ্পেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ত্তমান যুগে টেলিভিশন একটি বিস্ময়। যে ক'টা আবিষ্কার মানুষকে চমকে দিয়েছে তার মধ্যে টেলিভিশন একটি। টেলিভিশন মানে হচ্ছে দূরেক্ষণ—অর্থাৎ এক দেশের ছবি অন্য দেশে কোনো তরঙ্গ বা ঢেউয়ের সাহায্যে পাঠানো। টেলিভিশনের ভিতরের রহস্য খুবই কঠিন, তবুও এর কাঠামোটা বোঝানোর পক্ষে এটুকু যথেষ্ট।

এ সম্বন্ধে জানতে হ'লে কতকগুলো বিষয়ে একটু পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। তোমরা জানো আলোর জন্যে আমরা দেখতে পাই। অন্ধকার ঘরে যদি খুব ছোট একটি ছিদ্র দিয়ে আলো পড়ে কোনো একটি জিনিষের ওপর, তখন দেখবে যে শুধু সেই জিনিষটিকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ আলো এসে সেই জিনিষটির ওপর প'ড়ে সেই জিনিষটি থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে দেয় দেখার অনুভূতি; এই জন্যেই আমরা দেখ্তে পাই। আমরা জানি, সূর্য্য আলোর একটি প্রকাণ্ড আধার। কোনো সময়ে বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন করলেন যে অত দূর থেকে সূর্য্য-রশ্মি আসে কি করে? এ প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে তাঁরা 'ইথার' কে কল্পনা ক'রে নিলেন। আমরা যাকে আকাশ বা শূন্য বলি তা এই ইথারে ভর্ত্তি। ইথার মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বা দেখার বাইরে, অথচ সব জায়গায় এর গতিবিধি।

তার পর কারেণ্ট বা বিদ্যুৎ সম্বন্ধে জানতে হবে। কারেণ্ট বলতে কি বুঝি অনেকেই তা জানি না। তোমরা জানো, কোনো কোনো মৌলিক পদার্থকে—যেমন সোনা, সীসা ইত্যাদিকে যদি ক্রমাগত ভাঙতে থাকি তবে একটা সময় আসবে যখন আর ভাঙা যাবে না, ভাঙলে সে পদার্থের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যাবে। এই অতি ক্ষুদ্র

পদার্থটির নাম পরমাণু। তারপরও যদি ভাঙো তবে দেখবে এরা কতকগুলি তড়িৎযুক্ত বা তড়িৎহীন পদার্থে ভেঙে পড়েছে। যেগুলি হাঁ-ধর্মী বা পজিটিভ তড়িৎযুক্ত সেগুলিকে বলে 'প্রোটন', আর যেগুলি না-ধর্মী বা নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত সেগুলিকে বলে 'ইলেকট্রন'। এই ইলেকট্রন যখন ছোটাছুটি আরম্ভ করে তখনই বলা হয় যে বিদ্যুৎ বা কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে। এখন, যদি তুমি পুকুরে একটি ঢিল ফেল তা হ'লে দেখবে ছোট বড় ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে পুকুরে। সেই রকম এখানে ইথারকে পুকুরের স্থির জলের মত মনে করেন বিজ্ঞানীরা, আর এই ইথারে শুধুমাত্র ঢেউ তুলতে পারে ঐ ছোট ছোট ইলেকট্রন। আগেই বলেছি বিদ্যুৎপ্রবাহ

সামনে টেলিভিশন যন্ত্র। নিউইয়র্কের মেয়েরা টেলিভিশনে সবাক্ ছবি পাঠাবার জন্য অপেক্ষা করছে।

বলতে আমরা বুঝি ইলেকট্রনের গতি আর এই ইলেকট্রন ইথারে ধাক্কা মারে বলেই ইথারে ঢেউএর সৃষ্টি হয়। সুতরাং বিদ্যুতের বা কারেন্টের ঢেউ যে রকম হবে কারেন্টের ধাক্কায় ইথারের ঢেউও ঠিক সেই রকম হবে। তাই না?

এবার 'ফটো ইলেকট্রিক সেল' নামে একটি যন্ত্রের কথা আলোচনা করবো। তোমরা অনেকেই রেডিওর ভেতরে ভাল্‌ব্‌গুলি দেখেছ। এটিকেও অনেকটা ঐ রকম দেখতে তবে এর ভেতরের যন্ত্রপাতি আলাদা। দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করলে যেমন দেখতে

হয় সেই রকম দু'টো তামার বা রূপোর পাত আছে ওর ভেতর। তার ওপর আছে পটাসিয়াম্ নামে একটি মৌলিক পদার্থের আবরণ। এখন, দেখা গেছে যে আলো যখন এর ওপর এসে পড়ে তখন এর ভেতর থেকে একটা বিদ্যুতের স্রোত বের হয়। এও দেখা গেছে যে বেশী আলো পড়লে বেশী এবং কম আলো পড়লে কম বিদ্যুতের স্রোত প্রবাহিত হয়।

এখন, আমরা জানি যে যখন কোনো জিনিষ থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে তখনই আমরা সেই জিনিষটি দেখতে পাই। এইবার দেখ একটি মানুষের ছবি অন্য জায়গায় কেমন ক'রে পাঠানো হয় টেলিভিশনের সাহায্যে।

লক্ষ্য ক'রে দেখো, একটি লোকের শরীরের যে জায়গাটা কালো সেই জায়গা থেকে অল্প ও যে জায়গাটা বেশী আলোকিত সে জায়গা থেকে বেশী আলো আমাদের চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে। এখন, এই আলো যদি আমাদের চোখে না প'ড়ে ফটো সেলের ওপর পড়ে তা হ'লে কম আলোর জন্যে কম ও বেশী আলোর জন্যে বেশী বিদ্যুতের স্রোত প্রবাহিত হবে। এইভাবে মানুষটির সমস্ত দেহের প্রতিফলিত আলোকে ফটো সেলের সাহায্যে বিদ্যুতের স্রোতে পরিবর্ত্তিত করতে পারি। কেমন? আবার জানি, জগতে সব জায়গায় ইথার আছে। অতএব এই বিদ্যুতের স্রোত অর্থাৎ ইলেকট্রনের স্রোত আশেপাশের ইথারকে ধাক্কা মেরে ইথারের মধ্যে ঢেউ সৃষ্টি করবে। কম বেশী আলো ফটো সেলে পড়ে কম বেশী কারেন্ট বা বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে,—অর্থাৎ ছোট বড় ঢেউ সৃষ্টি করে। আবার এই ছোট বড় বিদ্যুতের ঢেউ ইথারের মধ্যেও ছোট বড় ঢেউ সৃষ্টি করে। এখন, সারা জগতে ইথার আছে; অতএব সারা জগতে এই ঢেউ ছড়িয়ে পড়বে। রেডিওর বেলায় কি হয় এবার বলবো। বিজ্ঞানীরা এমন সব যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছেন যা এই চারিদিকে-ছড়িয়ে-পড়া ইথারের ঢেউকে ফের বিদ্যুতের ঢেউয়ে পরিবর্ত্তিত করে। রেডিওর ভেতর থাকে এই ধরণের একটি যন্ত্র। শুধু তাই নয়, রেডিওর ভেতর আরও একটি যন্ত্র থাকে যা এই বিদ্যুতের ঢেউকে শব্দের ঢেউয়ে পরিবর্ত্তিত করে আর এই শব্দের ঢেউ আমাদের কানের পর্দায় আঘাত করে ব'লে আমরা শুনতে পাই। এবার, টেলিভিশনের বেলায় কি হয় বলতে পারো? যেখান থেকে ছবি পাঠানো হয় তাকে বলা হয় ব্রড্‌কাষ্টিং ষ্টেশন। এখান থেকে বাতাসের মধ্যে ইথারের ঢেউ ছাড়া হয়, আর এই ঢেউ এসে লাগে টেলিভিশন যন্ত্রে। এই টেলিভিশন যন্ত্রে প্রথমে

ইথারের ঢেউকে বিদ্যুতের ঢেউয়ে পরিবর্ত্তিত করা হয় যন্ত্রের সাহায্যে। এবার আর বিদ্যুতের ঢেউকে শব্দের ঢেউ না ক'রে, চালিয়ে দেওয়া হয় নিয়ন্ বাতির ভেতর। এই নিয়ন্ বাতির গুণ হচ্ছে যে, যদি এর ভেতর বিদ্যুতের স্রোত চালানো যায় তা হ'লে সেই বিদ্যুতের স্রোত বা বিদ্যুতের ঢেউ আলোর ঢেউয়ে পরিবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ ফটো সেল যা করে এটি ঠিক তার উলটো কাজ করে। সুতরাং নিয়ন্ বাতির ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চালানোর ফলে যে আলোর ঢেউএর সৃষ্টি হয় তা আমাদের চোখে ফুটিয়ে তোলে দেখার অনুভূতি আর সেই জন্যে আমরা দেখতে পাই। মোটের ওপর এই হচ্ছে টেলিভিশনের ভিতরের রহস্য।

আর একটু বললেই শেষ হবে। রেডিওতে তিন রকম ঢেউয়ে বা ওয়েভে শব্দ আসে। তাদের বলে লং ওয়েভ বা বড় ঢেউ, মিডিয়াম্ ওয়েভ বা মাঝারি ঢেউ আর শর্ট ওয়েভ বা ছোট ঢেউ। খুব দূরের খবর আসে শর্ট ওয়েভে। দেখা গেছে কতকগুলো ঢেউ মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে আর কতকগুলো যায় আকাশে উড়ে। যেগুলি মাটি ছুঁয়ে যায় সেগুলি হচ্ছে লং ওয়েভ, আর যেগুলি উড়ে যায় সেগুলি হচ্ছে শর্ট ওয়েভ। এই লং ওয়েভ বেশী দূরে যেতে পারে না, কারণ মাটি ছুঁয়ে যাবার ফলে এ খুব বেশী আঘাত পায় মাটিতে, আর সেইজন্যে খুব ক্ষীণ হয়ে আসে। কিন্তু শর্ট ওয়েভ আকাশে উড়ে যায়, আবার আকাশে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে পৃথিবীতে। ফের পৃথিবীতে ধাক্কা খেয়ে উড়ে যায় আকাশে, আবার আকাশে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে পৃথিবীতে। এমনি ক'রে অনেক দূরে চলে যায় শর্ট ওয়েভ। সেইজন্যে শর্ট ওয়েভে হাজার হাজার মাইল দূরের শব্দও বেশ ভালো শোনা যায়। টেলিভিশনের জন্যে যে সব ঢেউ পাঠানো হয় তারা আরো ছোট। তাদের বলে আলট্রা শর্ট ওয়েভ। এরা শর্ট ওয়েভের মত উড়ে যায় বটে কিন্তু আকাশে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে না। সেইজন্যে টেলিভিশনে দূরের জিনিষ দেখা যায় না।—বড় জোর চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল। বেশী দূরের জিনিষ দেখতে হ'লে খুব বড় এরিয়াল করতে হবে, কারণ যে সব ঢেউ সোজা এসে এরিয়ালের তারে লাগবে সেইগুলো দিয়েই পাঠানো ছবি দেখবো। টেলিভিশনে এই একটি মাত্র দোষ। তা না হ'লে জিনিষটি বেশ ভালো। কি বলো?

ভ্যাম্পায়ার

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

ভ্যাম্পায়ার কথাটা শুনলেই মনের মধ্যে কেমন একটা অহেতুক আতঙ্ক এসে পড়ে। আমাদের দেশে শব্দটির তেমন প্রচলন না থাকলেও ইয়োরোপে—বিশেষ ক'রে পূর্ব্ব ইয়োরোপে এখনও এমন বহু লোক আছে যারা ঐ কথাটি শোনা মাত্র সভয়ে চমকে উঠবে। কারণ, ভ্যাম্পায়ার হচ্ছে, তাদের মতে, এক রকম অশরীরী আত্মা—যারা গভীর রাত্রে কবরের ভিতর থেকে উঠে আসে, তার পর নানা পশুপাখীর ছদ্মবেশ ধরে ঘুমন্ত মানুষের তাজা রক্ত নিঃশেষে পান ক'রে আবার কবরে ফিরে যায়। এমন কি, ঐ সব কবর খুঁড়লে নাকি দেখা যাবে মৃতদেহ সম্পূর্ণ তাজা রয়েছে, জীবন্ত মানুষের রক্ত পান করার ফলে তার মধ্যে একটুও বিকৃতি ঘটে নি।

বলা বাহুল্য, এ সব কথা যারা বলে, কবর খুঁড়ে কথাটার সত্যতা পরীক্ষা ক'রে দেখার মত সাহস তাদের কারোই নেই। তবে কথাটা এল কি ক'রে? এসেছে কুসংস্কার থেকে, সন্দেহ নেই। প্রাচীন যুগের লোকেদের মধ্যে এ রকম বহু অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণার কথাই শোনা যায়। এমন কি সে যুগের সাহিত্যও এ থেকে মুক্ত নয়। অশরীরী ভ্যাম্পায়ারের বিভীষিকাময় কাহিনী তোমরাও হয়তো কিছু কিছু পড়েছ।

মানুষ মরে গেলে তার আত্মা যে সত্যি আর কবর থেকে উঠে আসতে পারে না, ছদ্মবেশে রক্ত পান করা তো দূরের কথা,—এ কথা আজ সবাই জানে। কেউ ও সব সত্যি ব'লে চালাতে গেলে সবাই তাকে পাগল বলবে, চাই কি, ধরে চাঁটিয়ে দেওয়াও কিছু বিচিত্র নয়! কিন্তু ভ্যাম্পায়ার ব'লে আর এক রকম রক্ত-চোষা জীবের সন্ধান মানুষ পেয়েছে অনেক দিন আগেই। হয়তো সেকালের সেই সব অশরীরী আত্মার সঙ্গে চালচলনে এদের সাদৃশ্য দেখেই এদেরও নাম দেওয়া হয়েছে ভ্যাম্পায়ার। এই ভ্যাম্পায়ার হচ্ছে এক জাতের বাদুড়।

তোমরা সবাই জান, বাদুড় হচ্ছে নিশাচর প্রাণী। দিনের বেলা তাদের বড় একটা দেখা যায় না, রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তবেই তারা বেরোয়। বাদুড়ের চোখের গড়নের জন্যই অবশ্যি তাদের ঐ রকম স্বভাব হয়েছে। সূর্য্যের আলোয় তারা ভালো দেখতে

পায় না—কিন্তু অন্ধকারে সে চোখ বেশ কাজ করে। সাধারণতঃ নির্জ্জন পোড়ো বাড়ীতে বা জনশূন্য গোরস্থান বা শ্মশানের কাছে থাকে ব'লে এদেরকে অশরীরী প্রাণীর সঙ্গে এক দলে ফেলা খুব আশ্চর্য্য নয়। তার ওপর গলার স্বরটিও এদের খুব মোলায়েম নয়। গভীর রাত্রে দূরে নির্জ্জন, জনপরিত্যক্ত জায়গা থেকে যখন এদের কর্কশ কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে আসে, স্বভাবতঃই তখন বুকের ভিতরটা কেমন ছাঁৎ ক'রে ওঠে। যারা জানে না,—বিশেষ ক'রে ভূত-প্রেতে বিশ্বাসী অশিক্ষিত লোকেদের কাছে, এ একটা রহস্যময় বিভীষিকার বস্তু হয়ে উঠবে এতে আর আশ্চর্য্য কি?

ভ্যাম্পায়ার
মাথা নীচু ক'রে ঝুলছে!

ভ্যাম্পায়ারের নিবাস হচ্ছে আমেরিকা—দক্ষিণ এবং মধ্য আমেরিকা। বেশ দুষ্প্রাপ্য জীবই বলা যেতে পারে এদের। এমন কি, সভ্য সমাজ—বিশেষ ক'রে প্রাণিবিজ্ঞানীরা বহুদিন পর্য্যন্ত এদের সম্বন্ধে কোন সঠিক খবর জানতেন না। স্থানীয় লোকেদের কাছে মাঝে মাঝে এদের গল্প শোনা যেত। বেশীর ভাগই অতিরঞ্জিত গল্প। দুপুর রাত্রে এরা নাকি বিরাট পাখা ছড়িয়ে গ্রামে এসে হাজির হয়, তার পর ডানার হাওয়ায় মানুষ বা গৃহপালিত পশুদের ঘুম পাড়িয়ে ফেলে নিঃশব্দে তাদের শরীর থেকে সমস্ত রক্ত চুষে নেয়। ভ্যাম্পায়ারকে স্বচক্ষে রক্তপান করতে দেখেছে এমন লোক বড় একটা পাওয়া যেত না।

অবশেষে বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করলেন, যে ভাবেই হোক, এই রহস্যময় প্রাণী সম্বন্ধে তাঁরা সমস্ত খবর সংগ্রহ করবেনই। মানুষ এত বড় বড় হিংস্র, দুষ্প্রাপ্য জীবজন্তু সংগ্রহ করেছে, আর কয়েকটা বাদুড়কে জীবন্ত ধরে আনতে পারবে না?

কিন্তু ভাবা যত সহজ আসল কাজ তত সহজ নয়। ভ্যাম্পায়ার বাদুড় যে অঞ্চলে বাস করে ব'লে গল্প শোনা যায় সে অতি দুর্গম স্থান। শুধু দুর্গম নয়,—এক কথায় কদর্য্য বললেও বোধ হয় ভুল বলা হয় না। তা ছাড়া দিনের বেলা তাদের দেখা পাওয়া খুবই কষ্টকর। যাই হোক, বৈজ্ঞানিকেরা তা'তে পিছ-পা ন'ন। ছোট্ট একটি অভিযান-বাহিনী তৈরী হ'ল। এদের মধ্যে রইলেন দু'জন অসমসাহসিক বৈজ্ঞানিক—ডিট্‌মার্স ও গ্রীন্‌হল্।

আজ থেকে প্রায় সতেরো বছর আগেকার কথা, নানা সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি সঙ্গে ক'রে সন্ধান করতে করতে এই দল এসে হাজির হ'লেন পানামায়। তাঁরা শুনেছিলেন পানামায় ডাঃ ক্লার্ক্ নামে এক ভদ্রলোক ইতিপূর্ব্বেই কয়েকটি ভ্যাম্পায়ার সংগ্রহ করেছেন। এই ভ্যাম্পায়ারগুলো ঘোড়ার শরীরে এক রকম দূষিত রোগ ছড়ায়. ডাঃ ক্লার্ক সেই রোগ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। ভ্যাম্পায়ার যখন ঘোড়ার দেহ থেকে রক্ত চুষে নিত তখন ঐ রোগের বীজাণু তাদের শরীরে সংক্রমিত হ'ত। ফলে ঘোড়াগুলি অবসন্ন হয়ে পড়ত, কখনও বা প্রাণেও মারা যেত। গাধা, খচ্চর প্রভৃতি ঘোড়ার অন্যান্য জাতভাইদের মধ্যেও এই রোগের প্রকোপ দেখা যেত। ক্লার্ক্ তাই বহুকষ্টে কয়েকটি ভ্যাম্পায়ার সংগ্রহ ক'রে এই রোগ সম্বন্ধে পরীক্ষা করছিলেন।

ডিটমার্স্ এবং গ্রীন্‌হল্ ডাঃ ক্লার্কের কাছে ভ্যাম্পায়ার সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করলেন। ভ্যাম্পায়ার ২।৩ জাতের আছে। আগে লোকের ধারণা ছিল, এই জানোয়ারগুলি আকারে বুঝি খুব বিরাট। কিন্তু আসলে তা নয়; বাদুড়ের মধ্যে অনেক বড় জাতের বাদুড় আছে বটে, কিন্তু ভ্যাম্পায়ার বাদুড় আকারে ইঞ্চি তিনেকের বেশী হবে না। সারা গা লালচে বাদামী লোমে ঢাকা, আর বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করবার জিনিষ হচ্ছে এদের দাঁত। কোথায় গেলে ভ্যাম্পায়ারের সাক্ষাৎ মিলতে পারে, কোন্ পথ দিয়ে সেখানে যেতে হবে, কি ক'রে তাদের চিনতে পারা যাবে ইত্যাদি নানা রকম প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ ক'রে আবার তাঁরা রওনা হলেন। ডাঃ ক্লার্ক্ সঙ্গে কয়েকজন পথপ্রদর্শকও দিয়ে দিলেন।

চ্যাগ্রেস উপত্যকার ওপর চিলিব্রিলো গুহা, খুঁজতে খুঁজতে বৈজ্ঞানিক দল অবশেষে সেইখানে গিয়ে হাজির হলেন। চূণা পাথরের তৈরী বিরাট গুহা, সুড়ঙ্গের মত কত দূর চলে গেছে কে জানে! তারই মধ্যে তাঁদেরকে ঢুকতে হবে। গুহার মুখের কাছে জল-কাদা জমে তাকে আরও দুর্গম ক'রে রেখেছে। প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা। শুধু জল-কাদাই নয়, জঙ্গল—আগাছা, কাঁটা ঝোপে জায়গাটা ভর্ত্তি; গুহার মুখটাও অত্যন্ত খাড়া। যাই হোক্, বহু কষ্টে, নানা কসরৎ ক'রে তাঁরা গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ভিতরে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ, কিন্তু অত্যন্ত সরু। এত সরু যে দু'জন লোকও পাশাপাশি হেঁটে যেতে পারে না। তার ওপর মিশমিশে কালো অন্ধকার। বৈজ্ঞানিক দল মাথার টুপির সঙ্গে বৈদ্যুতিক টর্চ্চ্ বেঁধে, কোমরের বেল্‌টের সঙ্গে ব্যাটারী লাগিয়ে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলেন। খানিকটা যাবার পর মনে হ'ল সুড়ঙ্গটা যেন চওড়া হয়ে আসছে। আর একটু যেতেই একটা বড় হল্ ঘরের মত গুহায় গিয়ে তাঁরা হাজির হ'লেন। দেয়ালের জায়গায় জায়গায় ফাটল, সেখান দিয়ে ভীম বেগে জলস্রোত বেরিয়ে আসছে। গুহার ভিতরেও জায়গায় জায়গায় বেশ জল জমে আছে। একটা ভাপসা গরমে সমস্ত গুহা ভরে আছে। আর তারই মধ্যে ভেসে আসছে একটা বিশ্রী বোটকা দুর্গন্ধ।

বৈদ্যুতিক আলো ফেলতেই দেখা গেল গুহার ছাদে অসংখ্য বাদুড় ঝুলছে। দেয়ালও নানা রকম পোকামাকড়ে ঠাসা। আলো ফেলতেই, এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সাড়া পেতেই

বাদুড়গুলো ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে হুটোপাটি যুড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বীভৎস চীৎকার। বেশীর ভাগই বড় জাতের বাদুড়, তার মধ্যে ভ্যাম্পায়ার নেই একটাও।

তাঁরা তখন আবার পাশের একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে এগোতে লাগলেন। খানিকটা যেতে আবার আগেকার মত একটা বড় গুহা পাওয়া গেল। এটির ছাদ খুব উঁচু—পঞ্চাশ ফুটের কম হবে না। এখানেও দেয়ালে, ছাদে অসংখ্য বাদুড় ঝুলছে দেখা গেল। সংখ্যায় তারা এত বেশী যে মনে হচ্ছিল, সমস্ত দেয়াল আর ছাদ যেন কালো মখমলে মোড়া। এখানেও কিন্তু কোন ভ্যাম্পায়ারের সাক্ষাৎ মিল্‌ল না। বৈজ্ঞানিকরা জাল দিয়ে বড় জাতের কয়েকটা বাদুড়কে ধরে ফেললেন। প্রায় গোটা আঠারো।

সেই গুহা থেকে বেরিয়ে আবার সুড়ঙ্গ-পথ। সেটা গিয়ে পড়েছে আর একটা নীচু গোল গুহায়। এখানেও ঠিক আগেকার মতই বড় জাতের বাদুড় অনেক দেখা গেল, কিন্তু ভ্যাম্পায়ার নেই একটিও! তবে কি তাঁদের অভিযান ব্যর্থ হবে?

হতাশ হয়ে বৈজ্ঞানিকেরা কি করবেন ভাবছেন, এমন সময় দেখলেন সামনে আর একটি সুড়ঙ্গ, ঢালুভাবে নীচে নেমে গেছে। সুড়ঙ্গের মুখটা ঠিক যেন একটা কুয়োর মুখ। অসম-সাহসিক বৈজ্ঞানিক দল তখন নিঃশঙ্কচিত্তে তারই মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

টর্চের আলোয় দেয়াল পাঁতি পাঁতি ক'রে খুঁজতে খুঁজতে তাঁরা চলেছেন। হঠাৎ মনে হ'ল, সামনের কয়েকটা বাদুড়, আকারে নেহাৎ ছোট, তাঁদেরকে দেখে টিকটিকির মত দেয়াল বেয়ে ছুটে গিয়ে লুকোল একটা ফাটলে। ডাঃ ক্লার্ক বলে দিয়েছিলেন, ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের স্বভাবই এই, লোক দেখলে বা ভয় পেলে তারা না উড়ে টিকটিকির মত দেয়াল বেয়ে ছুটতে থাকে। তা হ'লে এগুলিই ভ্যাম্পায়ার!

বৈজ্ঞানিকের দল আলো নিভিয়ে ঠায় সেখানে বসে রইলেন—কতক্ষণে ভ্যাম্পায়ারগুলো ফিরে আসে সেই প্রতীক্ষায়। কিন্তু বহুক্ষণ কেটে গেল, তাদের ফিরবার আর কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। অগত্যা তাঁরা সেদিনকার মত ফিরে এলেন, পরদিন আরও ভালো ক'রে তৈরী হয়ে আসবেন এই মতলব নিয়ে। আসবার সময় সমস্ত গুহাপথটার একটা ম্যাপ্ তৈরী ক'রে নিতে ভুললেন না।

পর দিন এসে দেখেন, আগের দিন যেখানে ভ্যাম্পায়ার দেখে গিয়েছিলেন, আজ সেখানে তাদের কোন চিহ্নই নেই। কোথায় গেল সব? তবে কি গুহার ফাটল দিয়ে পাশের কামরায় চলে গেল! গ্রীন্‌হল্ বললেন, "কুছ পরোয়া নেই, আমি ঐ ফাটলে ঢুকেই ওদের টেনে বার করব।" বহু কসরৎ ক'রে, অজানা বিপদ তুচ্ছ ক'রে সত্যি সত্যিই তিনি সেই ফাটলের ফাঁক দিয়ে গলে পাশের অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ঘরে ঢুকে গেলেন। এবারে দেখা গেল, সত্যি সত্যিই এটা ভ্যাম্পায়ারের আড্ডা। বহু ভ্যাম্পায়ার সেখানে দেয়ালের গায়ে ঝুলে রয়েছে। আলো দেখেই তারা টিকটিকির মত বিদ্যুৎ-বেগে দেয়াল বেয়ে ছুট লাগাল ফাটলের দিকে। বেশীর ভাগই পালিয়ে গেল, জালে ধরা পড়ল মাত্র দু'টি। তাদের

মধ্যেও একটা বোধ হয় বেশ জখম হয়েছিল, কারণ একটু পরেই সেটা মারা পড়ল। রইল শুধু একটা মেয়ে-বাদুড়।

সেই মেয়ে ভ্যাম্পায়ারটাকে নিয়ে অভিযাত্রীর দল ফিরে এলেন। তার পর ঠিক হ'ল এটিকে তাঁরা নিয়ে যাবেন নিউ ইয়র্কে।

সেখান থেকে নিউ ইয়র্ক দশ দিনের রাস্তা। এই সময়টুকুর মধ্যে ভ্যাম্পায়ারটার জীবনের যাতে কোন ক্ষতি না হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার সকলের আগে। ডাঃ ক্লার্ক পরামর্শ দিলেন —সঙ্গে দু' বোতল রক্ত নিয়ে যাও। রক্তের ফাইব্রিন আলাদা ক'রে নিলে তা আর জমাট বাঁধবে না। সেই ব্যবস্থাই হ'ল। ভ্যাম্পায়ারটাকে একটা খাঁচার মধ্যে পূরে কালো কাপড় দিয়ে খাঁচা মুড়ে দেওয়া হ'ল আলো থেকে ঢাকবার জন্য। রোজ আধ বোতল ক'রে তাজা রক্ত সেই খাঁচার ভিতর রেখে দেওয়া হ'ত। ভ্যাম্পায়ার রক্ত ছাড়া আর কিছু খেত না, তাও আবার কারো সামনে খেত না। প্রায় সর্ব্বক্ষণই সে খাঁচার গায়ে পা ওপর দিকে দিয়ে ঝুলে থাকত। সকলে আড়ালে গেলে এক ফাঁকে চুপি চুপি নেমে এসে রক্তটুকু খেয়ে যেত।

যাই হোক, নিউ ইয়র্ক পৌঁছে তাকে নিয়ে রাখা হ'ল চিড়িয়াখানার একটি বিশেষ ঘরে। এখানে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে আলো আর তাপ নিয়ন্ত্রণ ক'রে রাখা হ'ত—যাতে বাদুড়টা কোন রকম অস্বস্তি বোধ না করে। রোজ সন্ধ্যার দিকে তাকে খেতে দেওয়া হ'ত এক গ্লাস করে তাজা রক্ত, আর সেই সময় বৈজ্ঞানিকেরা বিজলী বাতি ফেলে তার চালচলন লক্ষ্য করবার চেষ্টা করতেন। প্রথম প্রথম তাঁরা একেবারেই বিফল হ'লেন, বাদুড় কারো সামনেই খাদ্য গ্রহণ করত না। অবশেষে একদিন, সেদিন বোধ হয় ক্ষিদেটা তার প্রচণ্ডই হয়েছিল, দেখা গেল ভ্যাম্পায়ার আস্তে আস্তে খাঁচার গা বেয়ে নেমে আসছে। ঠিক মাকড়ষার মত পা ফেলে ফেলে সে রক্তের পাত্রের কাছে এসে দাঁড়াল, তার পর মাথা নীচু ক'রে ঠিক যেমন ক'রে কুকুরেরা দুধ খায়, তেমনি ভাবে জিভ দিয়ে চক্ চক্ ক'রে রক্ত পান করতে লাগল। খাওয়া শেষ হ'লে পেটটি হ'ল ফুলে ঢাক। যেন হাঁটতেই পারে না! ব্যাঙের মত থপ্ থপ্ ক'রে লাফাতে লাফাতে সে গিয়ে আবার খাঁচার গায়ে উঁচু দিকে পা আটকে ঝুলে রইল।

ক্রমে অবশ্যি তার লজ্জা দূর হ'ল। তখন সে আর কাউকে ভয়ও করত না। তখন আর গেলাসে ক'রে রক্ত না দিয়ে তার কাছে আস্ত ছাগল, ভেড়া ছেড়ে দেওয়া হ'ত। সে গিয়ে তাদের কাঁধে বসত, তার পর মুখ দিয়ে ঘাড়ের কাছে ফুটো ক'রে সেখানকার রক্ত পান করত। ছাগল বা ভেড়াটা যে খুব কষ্ট পাচ্ছে তাদের মুখ দেখে এমন মনে হ'ত না; তবে তাদের ঘাড় বেয়ে এত রক্ত পড়ত যে ঘর প্রায় ভেসে যেত। অনেক সময় দেখা যেত ভ্যাম্পায়ার দিনের পর দিন ছাগলের ঘাড়ের ঠিক একই জায়গায় মুখ লাগিয়ে রক্ত খাচ্ছে, নতুন ক'রে আর ফুটো করে নি।

মানুষের রক্ত খাওয়ার কথাও অনেক শোনা গেছে। সব ক্ষেত্রেই ভ্যাম্পায়ার পান করেছে ঘুমন্ত মানুষের রক্ত, এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই এজন্য বেছে নিয়েছে পায়ের বুড়ো আঙুলটি। যাদের রক্ত খেয়েছে তারা সকলেই বলেছে, রক্ত চোখে না দেখা পর্য্যন্ত তাদের কেউই ব্যাপারটা টের পায় নি।

বাংলা মায়ের পাগল ছেলে

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

মাত্র কয়েক দিন আগে খবরের কাগজে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে এমন একটি খবর বেরিয়েছিল—যার জন্য অনেকেই প্রস্তুত ছিল না। এবং, আমি জানি, কত লোক যে এই সংবাদে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করেছিল তার ঠিক নেই। এই শোকার্ত্তদের মধ্যে বড় বড় জ্ঞানীগুণীর সংখ্যাও যেমন ছিল, তেমনি, বোধ হয় তার চেয়েও বেশী, ছিল গরীব-দুঃখীর দল—যাদের আমরা বলি 'ছোটলোক'। খবরটি আর কিছু নয়, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্রের মহাপ্রয়াণের খবর।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নাম, নতুন যুগের মানুষ তোমরা, সবাই হয়তো ততটা শোন নি; কিন্তু তোমাদের বাবা, কাকা, দাদুরা তাঁকে জানতেন এবং ভালবাসতেন। তাঁর খ্যাতি ছিল দেশযোড়া। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে একজন বীর যোদ্ধা হিসাবে তাঁর নাম চিরকাল লেখা থাকবে।

১৯০৫ সনের কথা। ঐ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমন একদল ছাত্র বেরিয়েছিল যারা প্রত্যেকেই ছিল এক একটি হীরের টুকরো। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিনয়কুমার সরকার, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রভাসচন্দ্র দে, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি। নৃপেন্দ্রচন্দ্রও ছিলেন এই দলেরই একজন।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের বাড়ী ছিল বিক্রমপুরে (ঢাকা); কৃতী ছাত্র হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। যে বার এম্. এ পরীক্ষা দেবেন, দেশে এল প্রবল আলোড়ন। সুরেন বাঁড়ুয্যের নেতৃত্বে সুরু হয়েছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। বিপিন পালের "গোলামখানা ছাড়ো" ডাকে বেরিয়ে এলেন সেরা ছেলেরা ইংরেজ-চালিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। স্বদেশী স্কুল বসিয়ে নিজেরাই তাঁরা পড়াতে সুরু করলেন।

দলের পাণ্ডা হলেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র। অবশ্যি শেষ পর্য্যন্ত স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাল্লায় পড়ে তাঁদেরকে এম্. এ পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। অত অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষা দেওয়ায় নৃপেন্দ্রচন্দ্র ভালভাবে তৈরী হ'তে পারলেন না, কিন্তু তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় স্থান অধিকার করলেন তিনি।

এর পর আমরা দেখি অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্রকে। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র কিন্তু সাধারণ অধ্যাপকদের মত নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তিনি খেলার মাঠে, কলেজের ক্লাসে একসাথে চলতেন, ফিরতেন, গল্প করতেন, আবার পড়াতেনও। ফলে ছাত্রেরা তাঁকে ভালবাসত বন্ধুর মত, আর শ্রদ্ধা করত পিতার মত।

৺অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২১ সাল। গান্ধীজী দেশে আনলেন নতুন জোয়ার। সুরু হ'ল ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিরাট্ অসহযোগ আন্দোলন। নৃপেন্দ্রচন্দ্র তখন চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের অস্থায়ী ভাইস্-প্রিন্সিপাল্। বিরাট সংসারের দায়িত্ব তাঁর একার ঘাড়ে। কিন্তু দেশের জন্য নৃপেন্দ্রচন্দ্র সে সব ভুলে গেলেন। মোটা মাইনের সুখের সরকারী চাকরী, সারা জীবনের আরামের আশ্বাস তাঁকে বিচলিত করতে পারল না। এক রাতের মধ্যে মন স্থির করে ফেললেন তিনি। চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দেশের কাজে। তাঁর দেখাদেখি ছাত্রমহলেও সুরু হ'ল মহাচাঞ্চল্য। দলে দলে ছাত্র তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এল দেশের কাজে। এঁদের মধ্যেও পরে অনেকে যশস্বী হয়ে গেছেন। উদাহরণ স্বরূপ

সুবিখ্যাত বিপ্লবী বীর—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক সূর্য্য সেনের নাম করা যেতে পারে।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের কর্ম্মময় জীবনের বিস্তৃত বিবরণ দেবার মত জায়গা এখানে নেই। বিচিত্র ঘটনাবহুল তাঁর জীবন। শুধু সংক্ষেপে এইটুকু বলা যেতে পারে, ভারতের স্বাধীনতার যজ্ঞে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এজন্য বারে বারে রাজরোষের কবলে পড়ে কারাগারে যেতে হয়েছিল তাঁকে, পদে পদে দুঃখ-কষ্ট, বাধা-বিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল।' কিন্তু সে জন্য একদিনের জন্যও তাঁকে হতাশ হ'তে দেখি নি। মুখে মিষ্টি হাসি, অন্তরে অগ্নির তেজ নিয়ে তিনি নিজের কাজ ক'রে গেছেন।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবনের ছোটখাট ২।৪টি ঘটনার উল্লেখ করলেই তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র তখন রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক। তাঁরই এক ছোট ভাই সেখানে ছাত্র। একদিন নৃপেন্দ্রচন্দ্র ক্লাসে পড়াচ্ছেন। ভাইটির ক্লাসে আসতে হয়ে গেছে বেশ একটু দেরী। কিন্তু বড় ভাইএর ক্লাস্, ভাবনা কি? তবু মুখখানা একটু কাঁচুমাচু ক'রে ভাই বললেন অধ্যাপক দাদাকে, "মে আই কাম্ ইন্ স্যর্?"—আমি কি ভিতরে আসতে পারি? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, "নো স্যর্, সার্টেন্লি নট্।"—না মহাশয়, নিশ্চয়ই নয়।

প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াবার সময়ে একদিন কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপাল্ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন বড়বাবুকে, ক্লাসের কথা মনে করিয়ে দিতে। সহকর্ম্মীর প্রতি এই অশিষ্ট আচরণ নৃপেন্দ্রচন্দ্র মানতে রাজী হলেন না—সাহেবকে জানিয়ে দিলেন, এ রকম অভদ্রতা করবার কোন অধিকার নেই তাঁর। কারণ তাঁদের দু'জনের মধ্যে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে—কোন কিছুতেই তফাৎ নেই. তফাৎ শুধু গায়ের রংএ। কৃষ্ণনগর কলেজে থাকতেও ঠিক এই ধরণের একটি ব্যাপার হয়েছিল। তবে সেখানে অপমান করা হয়েছিল শুধু তাঁকে নয়, সমস্ত অধ্যাপককে। ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকম: কলেজের মাঠে খেলা হচ্ছে! ইংরেজ অধ্যক্ষ সস্ত্রীক এসেছেন খেলা দেখতে, অধ্যাপকরাও সকলে এসেছেন। কিন্তু মাঠে গিয়ে দেখা গেল, মাত্র দু'খানি বসবার চেয়ার আনা হয়েছে—একখানি অধ্যক্ষ সাহেবের জন্য, অপরখানি তাঁর পত্নীর জন্য। অধ্যাপকদের আসন নির্দ্দিষ্ট হয়েছে মাটীতে, ঘাসের ওপর। সাহেব ও তাঁর পত্নী নিতান্ত নির্লজ্জের মত

নিজেরা চেয়ারে বসে আছেন। কিন্তু আর যেই সহ্য করুক, এই নির্লজ্জ অশিষ্টতা সহ্য করার লোক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ন'ন। তাঁর বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হয়ে অধ্যক্ষ তাড়াতাড়ি সকলকার জন্য চেয়ার আনাবার ব্যবস্থা করিয়ে তবে সে যাত্রা রেহাই পান।

ছাত্রেরা তাঁকে ভালবাসত—ভক্তি করত দেবতার মত। একবার, নৃপেন্দ্রচন্দ্র

আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে নৃপেন্দ্রচন্দ্র

ওপরে: ছোট ছেলে অমলেন্দু, জামাতা ফণিভূষণ, পুত্র প্রবোধ, অজিত ও বিনয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতুলচন্দ্র, পুত্র কল্যাণ ও ভ্রাতুষ্পুত্র অরুণ। মাঝখানে: কন্যা রেণু, পুত্রবধূ মণিকা, পত্নী সুরমা দেবী, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র, জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ সুমিত্রা, কন্যা চিনু। নীচে: নাতি-নাতনী, ভাইপো-ভাইঝি ও কনিষ্ঠা কন্যা চিচি।

তখন রাজবন্দী। তাঁকে পাঠানো হয়েছে ঢাকা থেকে আলিপুর জেলে। শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়ী আসতেই লোকে লোকারণ্য। সবাই তাঁকে দেখবার—শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ব্যাকুল। এদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা বড় কম নয়। হঠাৎ দেখা গেল, যে সব পুলিশ কর্ম্মচারী (সার্জেণ্ট) নৃপেন্দ্রকে পাহারা দেবার জন্য ঘিরে দাঁড়িয়েছে, তাদের কারো মাথায় টুপি নেই। উৎসাহী ছেলের দল টুক্ টুক্ ক'রে কখন সব টুপি তুলে নিয়েছে! সার্জেণ্টদের অবস্থা তো বুঝতেই পার! কিন্তু এতগুলি ছাত্রের সঙ্গে এঁটে ওঠাও সহজ কথা নয়—তা হোক না পুলিশের লোক। আর তা ছাড়া লোকে শুনলেই বা বলবে কি! অগত্যা তারা বন্দীরই শরণাপন্ন হ'ল।—"প্রফেসার, আপনি আপনার

ভক্তদের কাছ থেকে বুঝিয়ে আমাদের টুপিগুলো উদ্ধার ক'রে না দিলে আমরা যাই কোথায় ?" নৃপেন্দ্র হাসতে হাসতে ছাত্রদের ব'লে টুপিগুলো ফেরৎ দেওয়ালেন।

লোকের সঙ্গে ব্যবহার তাঁর এত সুন্দর ছিল যে শত্রুমিত্র যে একবার তাঁর সংস্পর্শে এসেছে সে-ই মুগ্ধ না হয়ে পারে নি। জেলে থাকতে জেলের কর্ম্মচারীরা শুদ্ধু তাঁকে খাতির ক'রে চলত। একবার, তাঁর হয়েছে 'সশ্রম' কারাদণ্ড। দড়ির জট ছাড়ানো, খামে আঠা লাগানো এই সব 'শ্রম'-সূচক কাজের ভার পড়েছে তাঁর ওপর। জেলের ভৃত্যেরা কিন্তু তাঁকে কিছুতেই ও সব করতে দিতে নারাজ, তারা বলত, "আপনি ওগুলো এক কোণে রেখে দেবেন, আমরা আপনার হয়ে লাগিয়ে দেব।" সবাইকে নিজের ক'রে নিতে পারতেন তিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে। আমাদের সঙ্গে তাঁর ছিল পারিবারিক আত্মীয়তা। যখন উত্তর কলকাতায় থাকতেন, কত রবিবার হঠাৎ এসে হাজির হ'তেন ভবানীপুরে আমাদের বাড়ীতে। আমার মাকে বলতেন, "আজ কিন্তু আপনার বাড়ীতে আমাদের সবাইকার নিমন্ত্রণ,—আমার এই দলবল শুদ্ধু সকলের।"

একবার, যখন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বিচারাধীন কয়েদী তখন প্রত্যহ তাঁর কাছে খাবার পাঠানো হ'ত আমাদের বাড়ী থেকে, কাছাকাছি ব'লে। খাবার যেত টিফিন ক্যারিয়ারে, সঙ্গে থাকত থার্মো ফ্লাস্ক। একদিন ফেরৎ এল শুধু টিফিন ক্যারিয়ারটি। খুলতেই ভিতরে ছোট্ট একটি চিঠি। "থার্মোফ্লাস্কটি ভেঙ্গে ফেলেছি; কিন্তু কিছু মশলা চাই।" তাঁর কাছে শুনেছি, জেলে বন্দীরা পরস্পরকে খাবার চালান দিতেন।

কথাবার্ত্তায় তাঁর সরল মন কি ভাবে বেরিয়ে পড়ত, সে গল্প শোন। ইংরেজদের সঙ্গে তিনি সর্ব্বদাই সমান মাথা উঁচিয়ে কথা বলতেন। একবার, তিনি তখন বন্দী, এক অল্পবয়সী ইংরেজ আই. সি. এস্-এর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে তাঁর খুব ভাল লাগল। তিনি তখনই সাহেবটিকে জানিয়ে দিলেন, "দেখুন, দেশ স্বাধীন হ'লে আমরা আপনাদের মত ভালো ভালো অফিসারদেরই নিয়োগ করব।" এই অফিসারটির সঙ্গে কিন্তু তাঁর পরিচয় বন্দী রূপে।

আর একবার, জব্বলপুর থেকে তাঁর ছোট ছেলেকে নিয়ে তিনি কাছাকাছি কোথায় গিয়েছিলেন ট্রেনে; ফেরবার সময় ছোট ষ্টেশনে বহু চেষ্টা ক'রেও টিকেট পাওয়া গেল না। অগত্যা এমনিই উঠে পড়লেন গাড়ীতে। একটু পরেই চেকার এসে তাঁকে পাকড়াও করল—জানাল টিকেটের দামের সঙ্গে অতিরিক্ত জরিমানাও দিতে হবে। নৃপেন্দ্রচন্দ্র জরিমানা দেবেন না কিছুতেই, কারণ দোষ তাঁর নয়।

বললেন, "তা হ'লে আমাদের হাজতেই নিয়ে চলুন। আমার এর আগেই বার তিনেক জেল খাটা হয়ে গেছে।" ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিরে, পারবি তো ? একটু কষ্ট হবে কিন্তু।" কিছুক্ষণ পরে ষ্টেশন মাষ্টার স্বয়ং এসে তাঁকে উদ্ধার করলেন অভিবাদন সহ। রেলের আইন হয়তো একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল। ক'দিন পরে কলকাতা ফিরবেন, জব্বলপুর ষ্টেশনে আবার সেই চেকারটির সঙ্গে দেখা। হাতের টিকেট দেখিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "এবারে কিন্তু আমার কাছে টিকেট আছে। এই দেখুন!"

বন্ধুবান্ধব, কংগ্রেসের চাঁইরা তাঁকে অনেক সময় ঠাট্টা ক'রে বলত 'পাগল'। একবার গান্ধীজীর সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মহাত্মাজী বললেন, "প্রফেসার, তুমি এখনও ঠিক তেমনি পাগলা আছ!" একবার আমার এক ভাগ্নে অরুণ (নৃপেন্দ্রচন্দ্রের দ্বিতীয় ভ্রাতার পুত্র) ট্রেনে চলেছে বরোদা। সেখানকার কলেজে অধ্যাপনার জন্য আবেদন জানিয়েছিল সে, তারই ডাক পড়েছিল টেলিগ্রামে। সামনের বেঞ্চিতে এক রাজপুত ভদ্রলোক বসে, আলাপে বোঝা গেল বেশ গোঁড়া কংগ্রেসসেবী। কথায় কথায় অরুণের পরিচয় পেয়ে বললেন, "আরে, তুমি সেই পাগলা প্রফেসারের ভাইপো! আলিপুর জেলে আমরা এক সঙ্গে ছিলাম যে! উপোস (অনশন) ক'রে আমাদেরও করেছিলেন প্রাণান্ত। ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে, কিন্তু ওঁর পাল্লায় পড়ে উপোস না ক'রেও উপায় নেই। অদ্ভুত লোক!"

মনে পড়ে তাঁর বড় মেয়ের বিয়ের দিনটির কথা। আমরা খেটে খুন। ঘরের ব্যাপারে উনি বড় একটা মাথা গলাতেন না। কিন্তু রাত দশটায় যেই শুনলেন খাবার এখনও যথেষ্ট রয়েছে তখন তাঁর মুখে-চোখে কি আনন্দ! খাটো খদ্দরের ধুতি-পরা আত্মভোলা নৃপেন্দ্রচন্দ্র তখনই ছুটলেন গেট খুলে তাঁর হরিজন ভাইদের ডেকে আনতে। সে কি এক-আধটি ? রাত তিনটে পর্য্যন্ত চল্‌ল পরিবেশন, তবু নিমন্ত্রিতের স্রোত যেন আর ফুরোয়ই না! তাই তাঁর মৃত্যুর পর ভদ্রলোক যত এসেছিলেন তার বেশী এসেছিল তারা—যাদের নাক উঁচু ক'রে আমরা বলি "ছোটলোক।" আর শ্রাদ্ধ-বাসরে এসেছিল সারা হুগলী জেলার (নৃপেন্দ্র শেষ বয়সে হুগলী জেলার বৈদ্যবাটীতে বাড়ী তৈরী ক'বে সেখানেই থাকতেন) সব ক'টি আপন-ভোলা লোক, যাদের সবাই বলে পাগল। দেখলাম তাঁর প্রতি তাদের কীঅসীম শ্রদ্ধা! দেশের জন্যে পাগল ছিলেন তিনি—তাই এরাই তো আসবে সবার আগে! অতি বুদ্ধিমানরা তো থাকবেই দূরে দূরে!

বৌঠাকুরাণীর হাট

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামে একখানি উপন্যাস লিখে গেছেন। উপন্যাসখানি বাংলা সাহিত্যের একখানি অক্ষয় সম্পদ্। বৌঠাকুরাণীর হাট নামে কিন্তু সত্যিই একটা জায়গা আছে, এবং কবির এই উপন্যাসখানি কতকটা তারই ওপর ভিত্তি ক'রে লেখা।

বরিশাল শহর থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে মাধবপাশা নামে একটি গ্রাম আছে। এখন এটি একটি নগণ্য গ্রাম, কিন্তু এক কালে এর প্রসিদ্ধি বড় কম ছিল না। সুবিখ্যাত চন্দ্রদ্বীপ-রাজাদের রাজধানী ছিল এই মাধবপাশা। এখনও তাঁদের কীর্ত্তির কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ এখানে দেখতে পাওয়া যায়। মোগল যুগের বিখ্যাত বারভুঞাদের কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। সেই বারভুঞার একজন—রাজা কন্দর্পনারায়ণ এই মাধবপাশায় দীর্ঘ দিন রাজত্ব ক'রে গেছেন। এই মাধবপাশারই এক অংশের নাম বৌঠাকুরাণীর হাট। কি ক'রে ঐ নাম হ'ল সে গল্প শোন।

কন্দর্পনারায়ণের ছেলের নাম ছিল রামচন্দ্র। রামচন্দ্র ছিলেন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জামাই। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল বিমলা। বিয়ের সময়ে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে রামচন্দ্রের কি নিয়ে মনোমালিন্য হয়, ফলে প্রতাপাদিত্য বিয়ের পর আর মেয়েকে শ্বশুর-ঘর করতে দেন নি। বহুদিন বাপের বাড়ী কাটিয়ে বিমলা যখন বড় হ'লেন তখন তাঁর সাধ হ'ল শ্বশুরবাড়ী যাবার। শ্বশুরবাড়ী মানে স্বামীর বাড়ী, কেন না কন্দর্পনারায়ণ অনেক আগেই মারা গেছেন। প্রতাপের রাগ তখন অনেকটা পড়ে গেছে। তাঁর অনুমতি নিয়ে বিমলা কয়েকখানি নৌকো সাজিয়ে প্রচুর যৌতুকাদি নিয়ে শ্বশুরবাড়ী রওনা হলেন এবং মাধবপাশায় এসে নৌকো লাগালেন, রামচন্দ্র খবর পেয়ে তাঁকে নিতে আসবেন এই আশায়। কিন্তু রামচন্দ্রের আসবার আর কোন লক্ষণই নেই। রাণী অপেক্ষা করতে লাগলেন। এদিকে, রাণীর আসবার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রজারা—গরীব-দুঃখীরা দল বেঁধে সেখানে ভীড় করতে লাগল—তাদের বৌঠাকুরাণীকে তারা দেখবে। বিমলা সঙ্গে যে সব ধনরত্ন নিয়ে এসেছিলেন প্রজাদের মধ্যে তা দু' হাতে বিলোতে লাগলেন। ফলে সেখানে এত ভীড় হ'তে লাগল

যে রীতিমত হাট বসে গেল। খবর পেয়ে অবশেষে রামচন্দ্র এসে স্ত্রীকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। হাট কিন্তু বন্ধ হ'ল না—প্রতি সপ্তাহেই অন্ততঃ দু'দিন ক'রে বসতে লাগল সে হাট। আর তাই থেকে ঐ জায়গাটিরই নাম হয়ে গেল বৌঠাকুরাণীর হাট।

তুমি কি জান

নীচের কথাগুলি আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি কিন্তু ওর সঠিক অর্থ হয়তো আমাদের অনেকেরই জানা নেই।

লাট—লাট বলতে গভর্ণর বা প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে বোঝায়। কথাটা এসেছে ইংরেজী লর্ড শব্দটি থেকে—যার মানে হচ্ছে প্রভু। এই ভাবে গভর্ণর জেনারেলের নাম বড়লাট, প্রধান সেনাপতির নাম জঙ্গীলাট ইত্যাদি শব্দেরও সৃষ্টি হয়; সম্মানসূচক সম্বোধনেও মাঝে মাঝে লাট শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। আজকাল অবশ্যি লাট সাহেবের প্রতিশব্দ হিসেবে রাষ্ট্রপাল, প্রদেশপাল প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে কিন্তু লাট কথাটির প্রচলন কমে নি। লাট কিন্তু অন্য অর্থেও ব্যবহার করা হয়—ইংরেজী 'লট্' শব্দটিকেও বাংলায় লাট বলা হয়। নীলামের সময়ে উঁচু দামে বিক্রী করার জন্য বিভিন্ন দ্রব্যের যে ভাগ থাকে তাকে ইংরেজীতে বলে 'লট্'। এই থেকেই বোধ হয় জমিদারী নীলামে উঠলে বলা হয়—'জমিদারী লাটে উঠেছে'।

লাল ফৌজ—কথাটা ইংরেজী 'রেড্ আর্মি'-র অনুবাদ। সোভিয়েট সরকারের সৈন্যবাহিনীর এই নাম। ১৯১৭ সনে রুশ বিপ্লবের সময়ে বিপ্লবী সৈন্যের দল লাল রংএর পতাকা নিয়ে অগ্রসর হ'ত—কারণ লাল হচ্ছে বিপ্লবের প্রতীক্। সেই থেকে ঐ বিপ্লবী সৈন্যদের বলা হ'ত 'রেড্ আর্মি'। তার পর দেশের কর্ত্তৃত্ব যখন বিপ্লবীদেরই হাতে এল তখন সরকারী সৈন্যবাহিনীরই ঐ নাম হয়ে গেল।

কি ও কেন?

ঘুম পায় কেন?

ঘুম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা—বিশেষত: মনোবিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন, কিন্তু ঠিক ঠিক সিদ্ধান্ত তাঁরা আজও ক'রে উঠতে পারেন নি। তবে স্বাভাবিক বুদ্ধি থেকে এটুকু বোঝা যায় ঘুম আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। অনেকক্ষণ পরিশ্রমের পর মস্তিষ্ক যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তার বিশ্রাম দরকার—সম্পূর্ণ না হ'লেও কতকটা। ঘুম হচ্ছে এই বিশ্রাম, যদিও ঘুমের সময়ে শরীরের ভিতরকার অন্যান্য ক্রিয়া সমানে চলতে থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, অনেকক্ষণ পরিশ্রম করার পর আমাদের স্নায়ুগুলির ক্রিয়া দ্রুততর হয়ে পড়ে এবং তার জন্য শরীরে কতকগুলি বিষাক্ত জিনিষ তৈরী হয়—যাকে ডাক্তারী ভাষায় বলে 'টক্সিন্'। এই টক্সিন্ বাড়তে বাড়তে যখন স্নায়ুকেন্দ্রকে অবশ ক'রে ফেলে তখনই নাকি ঘুম পায়। খানিকক্ষণ ঘুমোলেই এই টক্সিন্গুলি আপনি নষ্ট হয়ে যায়। পরিশ্রান্ত—ঘুমে কাতর জন্তুর শরীর থেকে রক্ত নিয়ে স্বাভাবিক জন্তুর শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে দেখা গেছে—সেও তাতে বিনা কারণে ঘুমিয়ে পড়ে। আবার এও দেখা গেছে, ঘুমের ঠিক আগে মস্তিষ্কের

মধ্যে যে পরিমাণ রক্তচলাচল করে ঘুমন্ত অবস্থায় তা অনেক বেড়ে যায়। অর্থাৎ ঘুম মগজে রক্তসঞ্চালন বাড়িয়ে দিয়ে তাকে সুস্থ রাখিতে সাহায্য করে।

অসুস্থ অবস্থায় ঘুমের মত ওষুধ নেই। তবে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ঘুম জিনিষটা বরাদ্দ হয়েছে বুদ্ধিমান্ প্রাণীদের জন্য, অনেক ইতর প্রাণী নাকি একেবারেই ঘুমোয় না!

নিষিদ্ধ দেশ বলতে কোন্ দেশকে বোঝায়?

নিষিদ্ধ দেশ নাম দেওয়া হয়েছে তিব্বতকে। বলা বাহুল্য ও নাম দিয়েছে বিদেশী ইয়োরোপীয়রা। ভারতবর্ষের সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগ অবশ্যি অনেক দিনের। তিব্বতীরা বিদেশীদের সহজে তাদের দেশে ঢুকতে দিত না, কেউ গেলে তাকে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়েই যেতে হ'ত। এই জন্যই ইয়োরোপের লোকেরা ওর ঐ নামকরণ করে। ইয়োরোপীয়দের মধ্যে বোধ হয় সব চেয়ে প্রথম তিব্বত অভিযান করেন টমাস্ ম্যানিং। তিনি তিব্বতের রাজধানী লাসায়ও গিয়েছিলেন, ১৮১১ সনে।

পঞ্চবটী কি?

পঞ্চবটী কথাটা এসেছে ৫টি গাছের নাম থেকে। বট, অশ্বথ, নিম, বেল এবং আমলকী—এই পাঁচটি গাছ যেখানে একত্র গজায় তাকেই বলা হয় পঞ্চবটী। হিন্দুদের কাছে পঞ্চবটী খুব পবিত্র; তপস্বীরা সাধনার স্থান হিসাবে এই পঞ্চবটীকে খুবই প্রাধান্য দেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কাছে এই রকম একটি পঞ্চবটী অনেকে হয়তো দেখে থাকবে—যেটি ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধন-স্থল।

বিশ্বাস কর আর নাই কর

শ্রীঅমলকুমার মিত্র

একটি এঁচড়ে পাকা ছেলের গল্প শোন। এর নাম হেনিম্যান্, বাড়ী জার্মানীতে—লিউবেক সহরে। শ্রীমান্ কথা বলতে শেখে ২ মাস বয়সে, আর বাইবেল পড়তে শুরু করে ১৩ মাস বয়সে। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল ৩ বছর বয়সে বই পড়তে শিখেছিলেন। হেনিম্যানের কাছে তিনিও হেরে গেছেন।

* * *

যে কোনও একটা সংখ্যা মনে কর। তাকে ২ দিয়ে গুণ কর। ১০ যোগ দাও। ২ দিয়ে ভাগ কর। তার পর তুমি যে সংখ্যাটি আগে মনে করেছিলে সেটা বিয়োগ দাও। উত্তর বলে দেব? পাঁচ। পাঁচ হ'তেই হবে।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

শরৎ-দিনের গান

শ্রীসুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়

বাড়ীর মায়ার বাঁধন টুটি' আমরা সবাই চল্‌ছি ছুটি',
পূব গগনে উদয়রবি কর্‌ছে তখন উঠি উঠি।
আমরা ছুটি—আমরা ছুটি!

পড়াশুনোর নেইকো তাড়া, আজ আমাদের অগাধ ছুটী;
কাশের বনে, বাঁশের বনে তাই ত' মোরা অবাধ ছুটি।
নদীর নীরে সোনার কমল মিষ্টি হেসে উঠ্‌লে ফুটি',
আমরা ছুটি, আমরা ছুটি!

ধানের শীষে শিষ্ দিয়ে যায় কার সে হাসি শিশির-নাওয়া,
ওড়না নেড়ে দোল দিয়ে যায় খোস্‌বু-মাখা দখিন হাওয়া।
নদীর জলে ঢেউয়ের দলে হচ্ছে ভেঙ্গে কুটিকুটি,
পাল-তোলা ঐ নৌকোখানা চল্‌ছে বেয়ে গুটিগুটি।
শ্যামল মাঠে নদীর ঘাটে আমরা তখন চল্‌ছি ছুটি'!

আকাশ-মাঝে সপ্তরঙা ইন্দ্রধনু মধুর হাসে,
শুভ্র বেশে অভ্র হেসে দাঁড়ায় এসে তাহার পাশে।
তরুণ রবির অরুণ আভা ছড়ায় সোনা মুঠি মুঠি,
ছুটছি কোথা, ছুটছি কেন, নেইকো মনে প্রশ্ন দু'টি।
আমরা শুধুই চল্‌ছি ছুটি'!

সবুজ নদী—বিকেলে ও রাতে

শ্রীঅর্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

সবুজ আলোয় মাতাল হয়ে এল বিকেল বেলা,
নদীর বুকে সাঙ্গ হ'ল মরাল দলের খেলা।
বুনো ফুলের পাপড়ি তা'তে থরথরিয়ে কাঁপে,
গাছের ফাঁকে বাতাস ছোটে,—আওয়াজ ঝোপেঝাপে।
রাঙা রংএর চেলী পরে সূয্যি মামা হাসে,
ছুটী এবার—পশ্চিমে তার ডোবার পালা আসে।

সূর্য্য ডুবে গেছে এখন, এল সাঁঝের বেলা,
চন্দ্রমা—তার উজল আলোয় জাগাল নূতন খেলা।
সবুজ জলে আলোর খেলা করছে ঝিকিমিকি,
আকাশ মাঝে লক্ষ তারা দেয় যেন তা লিখি।
উজল ক'রে দিল যে চাঁদ, তারই আবার হাসি
নৈশ ফুলে হাতছানিতে ডাকছে কাছে আসি।

গভীর রাতি—আলোর ধারায় সারা মাঠ আজ আলো,
সবুজ নদীর এই খেলাটি লাগছে যেন ভালো।
একদিকেতে স্বপন-মাখা মন্দাকিনীর মায়া,
আর এক দিকে গাছের নীচে দুলছে ঘন ছায়া।
আলোছায়ার লুকোচুরি দেখছি ফাঁকে ফাঁকে,
কোন্ মায়াবী যাদুর টানে এমন ছবি আঁকে!

ফরসা হ'য়ে আসছে আকাশ—শুকতারা ঐ কোলে,
রঙীন গগন একটু পরেই ডাকবে নূতন বোলে।
বইবে বাতাস নূতন বেগে, জাগবে বসুন্ধরা,
সবুজ নদী হাসবে আবার, সে হাসি মন-হরা।
পশ্চিমে চাঁদ কখন গেছে, হয়েছে তার ছুটি,
আর পূবেতে উষার আলো উঠছে ক্রমে ফুটি'।

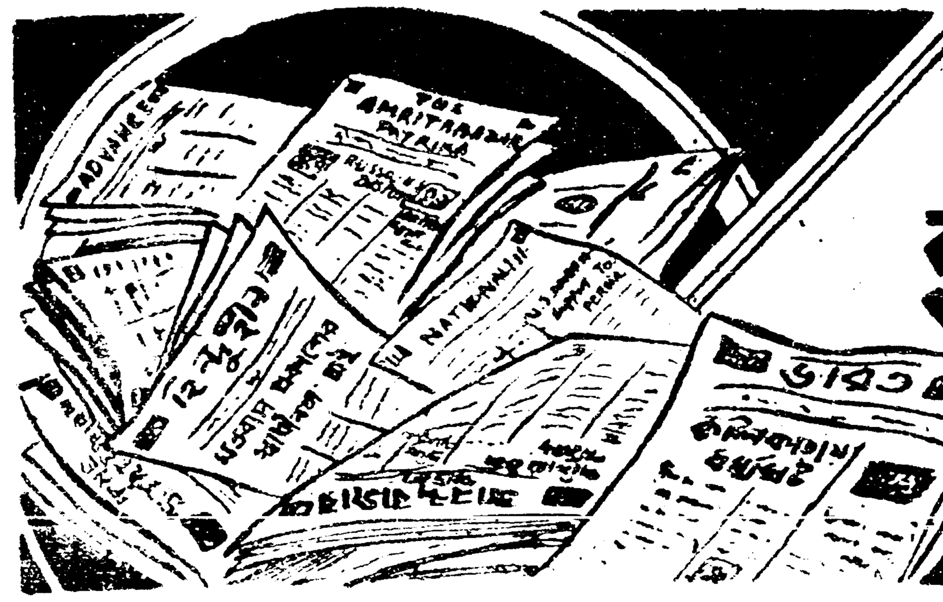

আমাদের সংবাদ পত্র বিভাগ

বাংলা মায়ের দু'টি হারানো ছেলে

সম্প্রতি বাংলা মা পর পর দু'টি উপযুক্ত সন্তানকে হারিয়েছেন। এঁদের একজন হচ্ছেন পুলিনবিহারী দাস—বিখ্যাত অনুশীলন সমিতির প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা। ফরিদপুর জেলার লোনসিং ছিল তাঁর বাড়ী, মেধাবী ছাত্র—বিশেষ ক'রে অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব'লে তাঁর যথেষ্ট নামও ছিল; কিন্তু সে সব ছেড়ে তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্বদেশী যুগের সুবিখ্যাত 'অনুশীলন সমিতি' তাঁরই হাতে গড়ে ওঠে। 'মানুষের সকল শক্তির যথাযোগ্য অনুশীলন ক'রে দেশ জননীর বাঁধন মুক্ত করব'—এই ছিল এই সমিতির আদর্শ। পুলিনবিহারী এই মন্ত্রে দেশের যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেন। দেশের জন্য তিনি বহু দুঃখ-কষ্ট বরণ করেছেন, দীর্ঘ দিন জেলে কাটিয়েছেন, আন্দামানে দ্বীপান্তর দণ্ডভোগ করেছেন।

পুলিনবিহারীর নাম সব চেয়ে বেশী শরীর-চর্চ্চায় এবং তার শিক্ষক হিসাবে। বাংলার জাতীয় বৈশিষ্ট্য লাঠি খেলা, ছোরা ও তরোয়াল খেলা—এ সবে তিনি এত দক্ষ ছিলেন যে তা প্রায় প্রবাদ বাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্ত্তী জীবনে দেশের যুবকদের এই সব বিদ্যায় পারদর্শী ক'রে 'মানুষ' গড়ে তুলবার কাজে তিনি আত্ম-নিয়োগ করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঐ ব্রত পালন করেন। মৃত্যুও হয় তাঁর সেই ব্যায়ামাগারেরই দ্বারে।

অপর জন অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পুণ্য জীবন কথা এ সংখ্যায় পৃথক্ ভাবে দেওয়া হ'ল। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি। দেশের জন্য নৃপেন্দ্র-চন্দ্র যে ত্যাগ বরণ করেছিলেন, যে প্রতিভা, জ্ঞান ও আত্মবলের অধিকারী ছিলেন তিনি, তার উপযুক্ত প্রতিদান তিনি পান নি,—না সাধারণের কাছে, না নেতাদের কাছে। আত্ম-প্রচার করতে জানতেন না তিনি, জানতেন না দল পাকাতে। সে সবের অনেক উর্দ্ধে ছিল তাঁর আসন। নইলে, তাঁর তুলনায় অনেক কম যোগ্য লোকও শুধু মাত্র প্রচারের সাহায্যে অনেক বেশী সম্মান ও প্রসিদ্ধি লাভ ক'রে গেছেন। নৃপেন্দ্রচন্দ্রের যে বিদ্যা ও প্রতিভা ছিল তা'তে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্মানসূচক ডি. লিট্ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। কিছুদিন আগে প্রমথনাথ কানাডায় আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে যোগদান করেন; তখন সেখানেও তাঁকে এই উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল।

নেকড়েপালিত শিশু

ভালুক, শেয়াল, নেকড়ে বাঘ অনেক সময় ছোট ছেলেপুলে ধরে নিয়ে যায় কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদের না মেরে সন্তানের মত পালন করে; এ রকম গল্প আমরা অনেকবার শুনেছি। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌ মেডিক্যাল্ কলেজে ঠিক এই রকম একটি ছেলেকে নিয়ে আসা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। ছেলেটিকে অতি শৈশবে নেকড়ে বাঘে ধরে নিয়ে যায়, তার পর তাদের মধ্যেই সে 'মানুষ' হয়। ছেলেটির বয়স এখন ১২ বছর। এখনও সে খাড়া হয়ে হাঁটতে পারে না, নেকড়ের মত চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে। সারা গায়ে তার আঁচড়-কামড়ের দাগ। আর বেচারা না পারে কথা বলতে, না পারে কানে শুনতে। মানব-শিশু হ'লেও তার চাল-চলনে পশু-ভাবই খুব বেশী। লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে ছেলেটিকে খুব যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ইন্দিরা

ইন্দিরা জাপান রওনা হয়ে গেছে। যাবার পথে সে কলকাতা হয়ে গিয়েছিল। ওজনটা বেশ একটু ভারী হওয়ায় তাকে জাহাজে তুলতে হয়েছিল ক্রেনে ক'রে। ইন্দিরাকে চিনতে পারলে কি? সে হচ্ছে একটি পনেরো বছর বয়সের হস্তিনী,—জাপানী ছেলেমেয়েদের জন্য পণ্ডিত জওহরলালজীর উপহার। জাপানে একটিও হাতী নেই; ছোট ছোট জাপানী ছেলেমেয়েরা এ পর্যান্ত কোন জ্যান্ত হাতী দেখে নি, তাই তারা পণ্ডিতজীর কাছে একটি হাতীর ফরমাস পাঠিয়েছিল। পণ্ডিতজী তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। হাতী রওনা হয়ে গেছে। জাপানী ছেলেমেয়েরাও আগেভাগেই ধন্যবাদ পাঠিয়ে দিয়েছে।

আই. এফ্. এ শীল্ড

কলকাতায় আই. এফ্. এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে কিন্তু শেষ হয় নি। ফাইনাল খেলাটুকু বাকি আছে। ফাইনালে যারা উঠেছে তারা দু'টিই স্থানীয় দল—ইষ্ট বেঙ্গল ও মোহনবাগান। ইষ্ট বেঙ্গল এবার লীগ্ চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছে, জিততে পারলে তারা একই বছর লীগ্ ও শীল্ড বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করবে। আবার মোহনবাগান গত দু'বছর পর পর শীল্ড বিজয়ী হয়েছে, এবারে জিততে পারলে পাবে পর পর তিন বার,—সেও বড় কম গৌরবের কথা নয়! কাজেই ক্রীড়ামোদীরা খেলার ফলাফলের জন্য উৎসুক হয়ে আছেন। বাইরে থেকে যে সব দল খেলতে এসেছিল তাদের মধ্যে ২টি দল সেমি-ফাইনাল পর্য্যন্ত উঠেছিল। গৌহাটীর 'মহারাণা ক্লাব' আর দিল্লীর 'দিল্লী হিরোজ্'। কিন্তু দু' দলই সেমি-ফাইনালে শোচনীয় ভাবে হেরে গেছে—১মটি ইষ্ট বেঙ্গলের কাছে, ২য়টি মোহনবাগানের কাছে।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

এই সঙ্গে পূজা-সংখ্যা রামধনু তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। পূজা-সংখ্যা ব'লে এই সংখ্যায় গল্প কিছু বেশী দেওয়া হ'ল এবং ধারাবাহিক লেখাগুলি দেওয়া হ'ল না, কেবলমাত্র 'হে বীর, প্রণাম করি' ছাড়া—যা এই সংখ্যাতেই শেষ হয়ে গেল।

পূজোর ছুটীতে অনেকেই হয়তো বাইরে যাবে—কেউ দেশ ভ্রমণে, কেউ বা নিজের পল্লীতে। যারা কোথাও যাবে না তারাও হয়তো অনেক কিছু করবে ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছ। তা ছাড়া, এবারে একটু আগেই পূজো হচ্ছে, অন্যান্য বারের মত ঠিক পূজোর ছুটীর পরেই পরীক্ষা নয়। কাজেই পূজোটা হয়তো কাটবে ভালোই,—যদিও দেশের অবস্থা তেমন নয়। পূজোয় কে কোথায় গেলে, কি করলে জানালে খুসী হব।

গত বারের ধাঁধাটা একটু কঠিন হয়েছে ব'লে কেউ কেউ অনুযোগ করেছ, উত্তরও খুব কম এসেছে। কঠিন ধাঁধা বার করাতেই তো আনন্দ! সহজ ধাঁধা দিলে তো সকলেই বার ক'রে ফেলবে, আর পাতার পর পাতা উত্তরদাতাদের নাম ছাপাতে গিয়ে আমরাও হব বিব্রত! অত নামের মধ্যে নিজের নাম খুঁজে পাওয়াও তো মুশ্কিল! আর, ধাঁধা নিয়ে যদি মাথাই না ঘামাতে হয় তবে আর সে ধাঁধা হ'ল কি?

এবারে চিঠির উত্তর দেই। শ্রীইন্দিরা রায়চৌধুরী (কলকাতা) বাংলা ভাষায় মনোবিজ্ঞানের বই কি আছে জানতে চেয়েছেন। কয়েকখানা বেরিয়েছে—যেমন শ্রীসুহৃদ্চন্দ্র মিত্রের 'মনঃসমীক্ষণ', শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসুর 'স্বপ্ন' ইত্যাদি। তবে ছোটদের উপযোগী ক'রে কোন বই লেখা হয়েছে ব'লে শুনি নি। শিশু-মনস্তত্ত্ব নিয়ে চারজন মনোবিজ্ঞানীরা লেখা "সুস্থ শিশুর মনের গঠন" বইখানি উল্লেখযোগ্য। শ্রীরঞ্জিৎ রায় (এলাহাবাদ) জানতে চেয়েছেন খেলাধূলা বা ব্যায়াম সম্বন্ধে কোন বাংলা সাময়িক পত্র আছে কিনা। আছে। জাতীয় ক্রীড়া সংঘের উদ্যোগে প্রকাশিত 'খেলাধূলা' নামে একখানা পত্রিকা আমরা দেখেছি। শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ সম্পাদিত "ব্যায়াম" কাগজখানিও উল্লেখযোগ্য।

এবারে ব্যক্তিগত চিঠির জবাব দেব। শ্রীবুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় (বলুটি)—সব

জন্তুর চোখে পাতা থাকে না। সাপও এই রকম একটি জীব। সাপের চোখে ধুলো ছিটিয়ে আত্মরক্ষার গল্প শোন নি? ঐ সব জীবের ঐখানেই দুর্ব্বলতা। হ্যারিকেন্ কথাটি ইংরেজী কথা, ওর অর্থ ঝড়। ঝড়ের সময়ে যে আলো ব্যবহার করা হয় (অর্থাৎ যা বাতাসে নেভে না) তাকে বলে 'হ্যারিকেন ল্যাণ্টান্'। সেই থেকে সংক্ষেপে বলা হয় হ্যারিকেন। শ্রীজয়ন্তকুমার দাশ (বি. ই. কলেজ)—তুমি এঞ্জিনীয়ার হচ্ছ শুনে খুব খুসী হলাম। লেখা অনেক জমে গেছে, ধীরে ধীরে বেরোবে। অনুবাদ ভাল হ'লে যে কেউ পাঠাতে পারে। তবে কার লেখা, কোন্ বই থেকে নেওয়া এ সব লেখা থাকা চাই, কারণ কপিরাইটের প্রশ্ন আছে। শ্রীশেখরচাঁদ মল্লিক (হাওড়া)—চিঠিপত্র ব্যাপারে অত অধৈর্য্য হ'তে নেই। ডাকে উত্তর পেতে হ'লে সঙ্গে টিকেট দিতে হয়। ফটো দেখেছি, ভালই হয়েছে। বার করবার ইচ্ছা রইল, তবে সবগুলি নয়। কিন্তু 'বল্ক' জিনিষটা কি! ব্লক্? ভুলের জন্য কিছু মনে করতে মানা করেছ, কিন্তু ভুল করা কি ভাল? শ্রীনিমাইলাল শেঠ (পাঁতিহাল)—তুমি এত বেশী প্রশ্ন করেছ যে সবগুলির উত্তর দিতে গেলে আর কারো চিঠিরই জবাব দেওয়া যায় না। এর অনেকগুলির উত্তর তুমি নিজে একটু কষ্ট করলেই বিভিন্ন বইএ পাবে। যদি তাতেও না পাও লিখ, সাধ্যমত পুনঃ পত্রে জবাব দেবার চেষ্টা করব। তোমার ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলির জবাব ১ম :—ঐ লেখকের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। ২য়—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই শুনেছ। ৩য়—সম্ভব নয় বা উচিত নয়। পাঠ্য পুস্তকের বাইরের যে জগৎ, তারই সঙ্গে পরিচয়ের ভার যারা নিয়েছে তাদের আবার স্কুলের বইএর গণ্ডীর মধ্যে টানতে চাও কেন? শ্রীবিষ্ণুপদ রায় (বালিঘাই) ডাইকের বাংলা প্রতিশব্দ জল-প্রাচীর বলতে পার? বইখানির প্রকাশক শ্রীগুরু লাইব্রেরী। শ্রীশমিত সরকার (কলকাতা)—তোমার চিঠিগুলি বেশ সুন্দর লাগে। ছাত্রসমাজ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমরাও অনেকটা একমত। শ্রীবিমলভূষণ রায় (কলিকাতা) আমি কি সত্যি খুব গম্ভীর প্রকৃতির? লেখা পড়ে তাই মনে হয় বুঝি? কিন্তু ভয় নেই, মন খুলে লিখতে পার, অভয় দিচ্ছি। তোমার ফটো বেশ ভাল লাগল। সুবিধা মত ২।১টি বেরুবে। ধাঁধা সম্বন্ধে ওপরের মন্তব্য দেখ।

আজ এইখানেই শেষ। পূজোর পরে আবার দেখা হবে। ভাল কথা, পূজোয় আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকবে। তাই কার্ত্তিকের রামধনু বেরোবে কার্ত্তিকের ১ম সপ্তাহের শেষে। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। জয় হিন্দ।—ইতি রাঃ সঃ

চিত্র পরিচয়

রাজা দশরথ শব্দভেদী বাণে দক্ষ ছিলেন, চোখে না দেখে কেবল শব্দ শুনে তিনি তীর দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করতে পারতেন। একবার মৃগয়ায় গিয়ে তিনি দূরে জলাশয়ে বক্ বক্ শব্দ শুনে হরিণ জল খাচ্ছে মনে ক'রে শব্দভেদী বাণ ছাড়েন। কিন্তু হরিণ নয়, অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু কলসীতে ক'রে জল নিচ্ছিলেন, শব্দ তারই। দশরথের বাণে সিন্ধু প্রাণ হারালেন।

এ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন

কবি ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় শিশুসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। থাকেন গিরিডিতে—সেখানকার শ্যামল প্রকৃতির ছাপ পাওয়া যায় তাঁর কবিতার মধ্যে। শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর শিশুসাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল। ভাষার মাধুর্য্য এবং বৈচিত্র্য তাঁর রচনার প্রাণ। ছোটদের জন্য নানা ধরণের—বিশেষ ক'রে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র সুলেখক। প্রবন্ধ রচনায় তাঁর হাত চমৎকার। নীরস, দুরূহ বিষয়গুলিও তাঁর হাতে পড়ে গল্পের মত প্রাণময় হয়ে ওঠে। শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীকে বলা হয় হাসির গল্পের রাজা। হাসির গল্পে তাঁর যুড়ি নেই। তাঁর পরিচয় তাঁর লেখার মধ্যেই পাবে। শ্রীসুবোধ বসু সাধারণতঃ বড়দের জন্যই লেখেন এবং সেখানে তিনি সুপরিচিত। আমরাই তাঁকে মাঝে মাঝে ছোটদের আসরে নামাই। অন্যায় করি না যে তা তাঁর লেখা পড়লেই বুঝবে। শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শিশুসাহিত্যের একজন শক্তিশালী লেখক। এক সময়ে তিনি প্রচুর লিখতেন, কিন্তু এখন লেখেন কালেভদ্রে। তাঁর গল্প পড়লেই বুঝবে তিনি এত কম লিখে তোমাদের ওপর কেমন অবিচার করছেন। শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায় প্রবীণ সাহিত্যিক। তাঁর লেখার মধ্যে এমন সব কৌতুহলকর বিষয় পাবে যা অপর কারো কাছে সহজে পাওয়া যায় না। ইনি কবি দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতুষ্পুত্র। শ্রীঅরবিন্দ গুহ তরুণ সাহিত্যিক, কিন্তু এরই মধ্যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁর মিষ্টি হাতের জন্য। শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য রামধনুর প্রতিষ্ঠাতা—প্রথম সম্পাদক। বয়স আশীর কাছে গেলেও এঁর কলমের স্রোত চলেছে তেমনি কুলুকুলু রবে। বন্দে আলী (মিয়া) লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। তাঁর লেখা তোমরা বহু পড়েছ। দেশ বিভাগের যে সত্যিকার করুণ ছবিটি তিনি এঁকেছেন তা মনে ছাপ রেখে যাবে। শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক কবি হিসাবে সুপরিচিত। তিনি লেখেন কম, কিন্তু যা লেখেন তাই হয় চিত্তাকর্ষক। শ্রীকল্যাণী দেবীর লেখা তোমরা রামধনুতে আগেও অনেক পড়েছ এবং হেসেছ। গল্প বলার ধরণটি এঁর চমৎকার। শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু 'ভাইবোনের' সম্পাদক, আর দেশশুদ্ধ ছেলেমেয়ের কাকাবাবু। তাঁর ছোট্ট কবিতাটি তোমাদের ভাল লাগবে। শ্রীপুষ্পেন্দু মুখোপাধ্যায় তরুণ লেখক কিন্তু বিজ্ঞানের জটিল বিষয় চমৎকার ভাবে—সহজ ও সরস ক'রে বলবার ক্ষমতা তাঁর আছে। শ্রীঅমলকুমার মিত্র, শ্রীসুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীঅর্চ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য—তোমাদেরই তিনজন বন্ধু।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

চিঠিখানা এই রকম হবে :—

ওগো বন্ধু, বড় যে চুপচাপ! পর পর চার চারখানা পত্র দিলাম (দিল+আম) আমলই দাও না কি কাণ্ড! ক'মাস ব্যোমকেশের পাল্লায় পড়ে অস্থির হয়ে ছিলাম। সরোজ তো আর এ মুখোই হয় না! তা বেচারা করবেই বা কি? এই গোলমালএ মেজাজ (মেজ+আজ) ঠিক রাখাই যে একটা কসরৎ!

উত্তরদাতাদের নাম: নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন—বিভাসবিহারী বসু (পাটনা); কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত (কলিকাতা-২৯) টাটা, টুটু, টিটি (জামসেদপুর)। যাদের উত্তর

আংশিক শুদ্ধ হয়েছে—রত্না, জয়ন্ত, স্বপ্না ও ছন্দা রায় (বাঁকীপুর) ; স্বর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান) ; আয়েষা ও মজিবর (ঢাকা) ; নন্দলাল সেন (গয়া) ; চিত্রা দেবী (কলিকাতা) ; নন্দু, রমা, শ্যামা (বালীগঞ্জ) ; কেতকী মৈত্র (রাজসাহী) ; চঞ্চল বসু (পাটনা) ; কমলা চট্টোপাধ্যায় (নিউ দিল্লী)।

নূতন ধাঁধা

"হুশিয়ার খাঁর জন্মের তারিখটা ভাল ক'রে মনে রেখ, পরীক্ষায় আসতে পারে।" —বললেন ইতিহাসের মাষ্টার মশাই। "আর সেই সঙ্গে মনে রেখ কত বছর বয়সে তিনি মারা যান আর কত বছর রাজত্ব করেন।"

"কিন্তু অত কি ক'রে মনে রাখব স্যর্ ?"—বললে গোবর্দ্ধন।

"কেন, সহজ উপায় আছে, বলে দিচ্ছি।"—বললেন মাষ্টার মশাই। "যে বছর হুশিয়ার খাঁর জন্ম হয় তার শেষ দু'টো সংখ্যা হচ্ছে গিয়ে তাঁর রাজত্ব-কাল, আর বাকি প্রথম ২টি সংখ্যাকে ৩ দিয়ে গুণ করলে পাবে তাঁর মৃত্যু-কালের বয়স। আবার, মৃত্যু-কালের বয়সকে রাজত্ব-কাল দিয়ে গুণ করলে পাবে তাঁর জন্মের সন।"

বল দেখি কোন্ সনে জন্মেছিলেন হুশিয়ার খাঁ ?

নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

২টি পুরস্কার দেওয়া হবে

(১) বিজ্ঞান :—আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের যে সব আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে তোমার মতে সব চেয়ে বড় দশটি আবিষ্কারের নাম লিখে পাঠাও। সকলের তালিকা নিয়ে ভোট নেওয়া হবে এবং যার তালিকা ঐ ভোটের তালিকার সঙ্গে মিলবে সে-ই পাবে পুরস্কার।

(২) সাহিত্য :—তোমার মতে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দশ জন শিশুসাহিত্যিকের নাম লিখে পাঠাও। সকলের তালিকার ভোটে যে তালিকা প্রস্তুত হবে তার সঙ্গে যার তালিকা মিলবে সে-ই পাবে পুরস্কার।

লেখা ১লা কার্ত্তিকের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌছান চাই। প্রত্যেক তালিকার সঙ্গে নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট ক'রে লিখতে হবে। একজনের পক্ষে দু'টি প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে কোন বাধা নেই। প্রতিযোগিতায় যে কেউ যোগ দিতে পার কিন্তু প্রত্যেক লেখার সঙ্গে বাঁ দিকের কুপনটুকু কেটে পাঠাতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। এক কুপনে একাধিক ব্যক্তি যোগ দিতে পারবে না। আমাদের মতামতই হবে চূড়ান্ত।

রামধনু

পু-প্র-আ-৫৬

সিপ্রা

জান্তব চর্বি বিবর্জ্জিত সাবান

কোমল অঙ্গের বিশেষ উপযোগী

* প্রচুর ফেন
* স্নেহময় স্পর্শ
* মনোরম গন্ধ

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

অভিনয়ের জন্য
সুবোধ বসুর
প্রসিদ্ধ কৌতুক-নাটিকা
বুদ্ধির্যস্য
স্ত্রী-ভূমিকা নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত হাসি। "রামধনু"তে প্রকাশিত হইয়াছিল।
দাম ছয় আনা মাত্র
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
ও সকল বড় দোকানে প্রাপ্তব্য
গ্রন্থাগার ঃ পুস্তক প্রকাশক
পি ৫৮ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা-২৯

নতুন বই ঃ প্রস্তুতির পথে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
ছোটদের বিশ্বকোষ
পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'লে
এ বই এক সেট ঘরে রাখতেই হবে।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য অপেক্ষা কর।
ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালার পরবর্ত্তী গ্রন্থ
ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড ॥৵০
শীগ গিরই বেরোবে।
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত ঃ ১ বি, রসা রোড, কলিকাতা

এজেণ্ট চাই

রামধনু খুচরা বিক্রয়ের জন্য নিম্নলিখিত সহরগুলিতে এজেণ্ট চাই :—

ঢাকা	জলপাইগুড়ী	দিল্লী	রাঁচি	বোম্বাই
চট্টগ্রাম	বহরমপুর	নিউদিল্লী	পুরুলিয়া	পুনা
ময়মনসিংহ	বর্দ্ধমান	এলাহাবাদ	কটক	সিমলা
ফরিদপুর	মেদিনীপুর	লক্ষৌ	পুরী	মীরাট
খুলনা	সিউড়ী	কানপুর	রায়পুর	গৌহাটী
যশোহর	বাঁকুড়া	বেনারস	বিলাসপুর	শিলং
পাবনা	খড়গপুর	পাটনা	নাগপুর	ধুবড়ী
রাজসাহী	আসানসোল	ভাগলপুর	জব্বলপুর	তেজপুর
বগুড়া	রানাঘাট	মজঃফরপুর	পুর্ণিয়া	করিমগঞ্জ
রংপুর	কৃষ্ণনগর	দ্বারভাঙ্গা	কুচবিহার	ডিগবয়
পার্ব্বতীপুর	চুঁচুড়া	জামসেদপুর	আগরতলা	শ্রীহট্ট

উচ্চ হারে কমিশন দেওয়া হইবে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুনঃ—

কার্য্যাধ্যক্ষ, রামধনু, ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫

সুলভে, বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ মতে প্রস্তুত সকল প্রকার কবিরাজী ঔষধের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ ভবন

১২৭ এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি	১।০
পদ্মরাগ	১॥০
সোনার হরিণ	১॥০
নূতন পুরাণ	৸৵০
হাস্য ও রহস্য	৸৵০
চায়ের ধোঁয়া	৸০
হুকাকাশির গল্প	৸০
দমাদম্ দামোদর (নাটক)	।৵০

শ্রীবি[illegible]র ভট্টাচার্য্যের

মহাভারতের গল্পগুচ্ছ (১ম)	৸০
ঐ (২য়)	৸০
দিগ্বিজয়ী বীর	৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲

শিবরাম ও মনোরঞ্জনের

এপ্রিলের প্রথম দিবসে	৸৵০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং চং	৸০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু	৸৵০

শ্রীমাধব ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার

আজব গল্প	।৵০
অনেক গল্প	।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	১৲
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲
আকাশের গল্প	১।০
আবিষ্কারের গল্প	৸০
ধূমকেতু	৸০
অয়েল পেন্টিং (নাটক)	।০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা	১॥০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি	৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

দি লাষ্ট অফ দি মোহিকান্স্	॥৵০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের

অলিভার টুইষ্ট	॥৵০

শ্রীলীলা মজুমদারের

বদ্যিনাথের বড়ি	৸০

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

গল্পসল্প	।০
ছুটীর গল্প	।০

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়ের

যে জার্ম্মানী হেরে গেছে	২৲
ইউরোপের আলো	১।০

শ্রীসুনীল ঘোষ সম্পাদিত

রাতের ছায়া	॥৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রমা রোড, কলিকাতা ২৫

Regd.No. C—1641

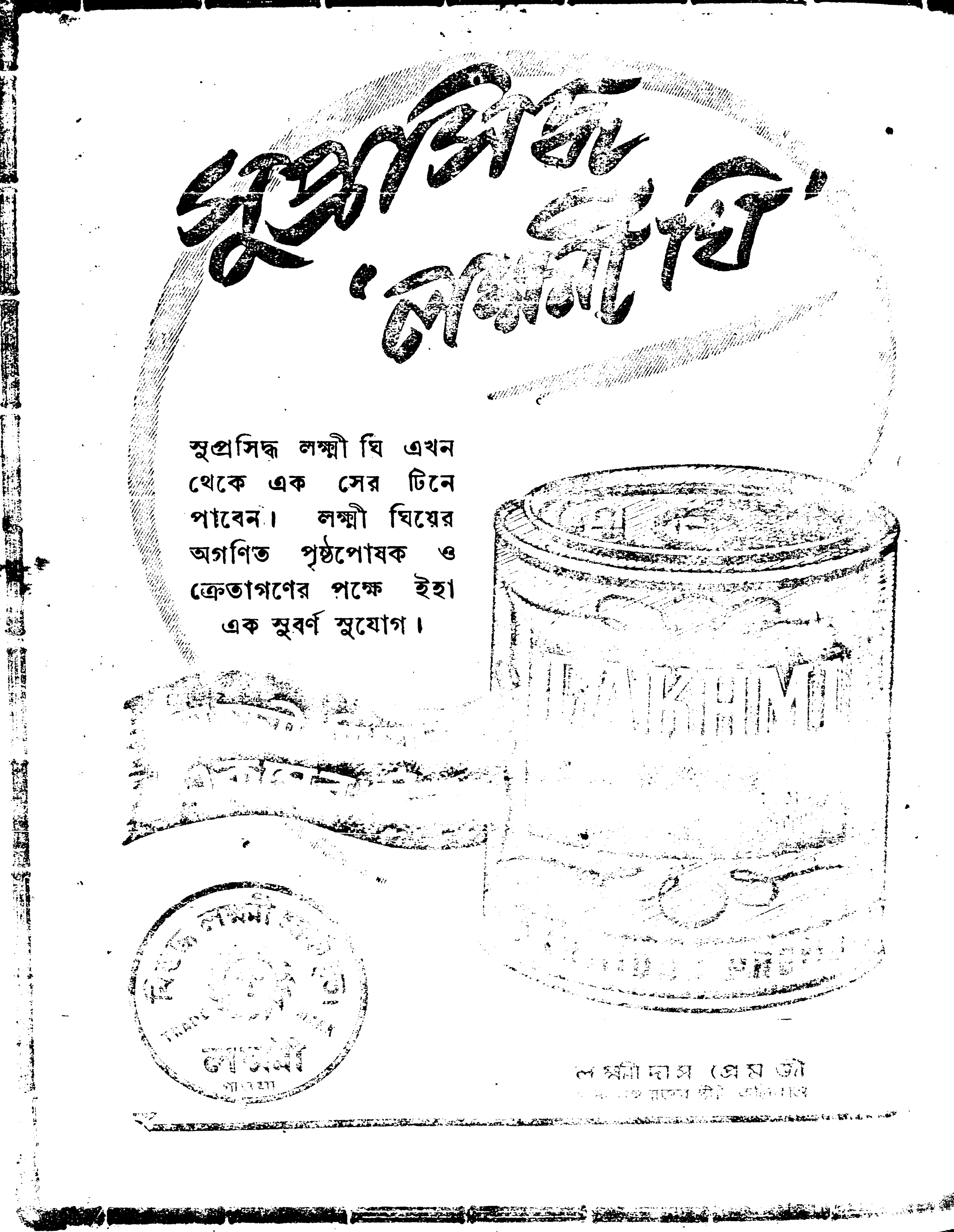

রামধনু

২২শ বর্ষ
কার্ত্তিক, ১৩৫৬
১৲ ষান্মাসিক ২।০
প্রতি সংখ্যা ।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ন ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্. সি

[অ]ভিনয়ের জ[ন্য]
[সু]বোধ বসুর
প্রসিদ্ধ কৌতুক-নাটিকা

বুদ্ধির্যস্য

স্ত্রী-ভূমিকা নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত হাসি। "রামধনু"তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

দাম ছয় আনা মাত্র

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
ও সকল বড় দোকানে প্রাপ্তব্য

গ্রন্থাগার ঃ পুস্তক প্রকাশক
পি ৫৮ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা-২৯

ক[বি] [জ্যো]তি[রিন্দ্র] ব[সু] ([কা]কাবাবু)
[সম্পা]দিত

ভাই-বোন

বার্ষিক ৪৲ ষান্মাসিক ২।০, যে কোনো মাস থেকে যে কোনো মাস পর্য্যন্ত গ্রাহক হওয়া যায়। এমন দিন আসছে যে দিন প্রতি ঘরে ভাইবোনের জন্যে 'ভাই-বোন' না হলেই চলবে না। যারা দেখ নি, বিজ্ঞাপন শুধু তাদের জন্যে, নইলে গ্রাহকরাই এর চলন্ত বিজ্ঞাপন। এজেন্ট কিংবা গ্রহক হবার জন্যে.—কার্য্যাধ্যক্ষ, ভাই-বোন কার্য্যালয়, ৪-এ ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা—৬

ভারত অয়েল মিলের

ঘানির তেল ব্যবহার করুন
২৪৩, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জেলের ছেলে

আলোকচিত্র—
শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরক্ষিত

২২শ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৫৬ { ৭ম সংখ্যা

রামধনু

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বয়স তোমার বাইশ বছর
তাতে কিবা আসে যায়,
যুগের যুগের সাক্ষী যে তুমি,
রাজো নিজ মহিমায়।
বৈদিক যুগে বালক-বালিকা দল
কচি হাত যুড়ি আনন্দে উচ্ছল,
অভিনন্দিত করিত তোমারে
নবীন মেঘচ্ছায়।

শৌর্য্যগর্ভ গৌরবময়
ভারত দেখেছ তুমি;
পুণ্যক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র
নর-দেবতার ভূমি।

দেখেছ পতন অধঃপতন তার,
পুনরুত্থান হের তার এইবার,
স্বাধীন সবল শুভ্রোজ্জ্বল
মণ্ডিত গরিমায়।
দাও শাশ্বত সজীব মন্ত্র
কিশোর-কিশোরীগণে,
পার্থ পার্থ-সারথির ছবি
আঁকো তাহাদের মনে।
দাও তিনরঙা জাতীয় পতাকা 'পর
ময়ূরকণ্ঠী শুভ দ্যুতি সুন্দর,
দেশ কাল জাতি ব্যাপি যেন তব
সুধাধারা বহে যায়।

—চব্বিশ—

ডাক্তার শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ডায়েরী

সারা দিন ধরে আমাদের পথ দেখে দেখে চলতে হচ্ছে। পথঘাট তেমন খারাপ নয়, তাই মনে হচ্ছে যাত্রায় বিশেষ গণ্ডগোল হবে না। মাঝে মাঝে থেমে দু'-একটা বুনো

চাষীর ঘরে গিয়ে সামান্য দুধ বা কিছু ফল খেয়ে নিচ্ছি; তাদের কিছু বেশী টাকা দেওয়াতে তারা খুব খুশি হয়ে যাচ্ছে। এ দেশ ভারী সুন্দর, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। এখানকার মানুষেরা সাহসী, শক্ত অথচ সরল। গুণেরও এদের সীমা নেই। কিন্তু এদের কুসংস্কার একেবারে অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে গেছে।

কয়েকবার অলককে 'হিপনোটাইজ্' করলাম, কিন্তু প্রতিবারই সেই এক উত্তর—"অন্ধকার, জলের কলকলানি, কাঠের শব্দ"।

আবার আর একটা একঘেয়ে দিন কেটে গেল। যতই এগিয়ে যাচ্ছি, ততই দেশের বন্য ভাব আমাদের সামনে এসে দেখা দিচ্ছে। চারদিকে আসামের রুক্ষ পাহাড়, দিক্‌চক্রবালে শত শত পাহাড় মাথা তুলে বিস্ময়ে মূক হয়ে আছে। এইভাবে গেলে কাল হয়ত জঙলা গ্রামে গিয়ে পৌছুতে পারব।

আরও দু'দিন কেটে গেল। আমার হঠাৎ মনে হচ্ছে, হয়ত এই যাত্রাই আমার শেষ, আর হয়ত আমি ফিরতে পারব না। কৃতান্তবর্ম্মার সঙ্গে যুদ্ধে এবার আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই কতগুলো কথা আমি আমার ছাত্রবন্ধু ডাক্তার অরূপ করকে লিখে যাচ্ছি—

এখন সকাল, কাল রাতে ভয়ঙ্কর শীত গেছে। এখনও অত্যন্ত ঠাণ্ডা, যেন সারা পাহাড়ে বরফ জমে আছে—আকাশ কুয়াশায় ভারি হয়ে আসছে। এতে অলকের বোধ হয় একটু কষ্ট হচ্ছে। তার সব সময় মাথা ভার ভার লাগছে, তাই তাকে বেশী কথাবার্ত্তা বলতে শুনছি না। সব সময় সে শুধু ঘুমোচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে। তার মত এত ছটফটে ছেলেও আজ সারা দিন কিছু করে নি। তার খাবার ইচ্ছাও কমে গেছে। আমার মন বলছে, কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল হয়েছে। আজ সন্ধ্যার সময় তাকে একবার 'হিপনোটাইজ্' করার চেষ্টা করে পারলাম না। দিন দিন তাকে 'হিপনোটাইজ্' করার শক্তি কমে যাচ্ছে—আজ তাকে একেবারেই পারা গেল না। শেষ পর্য্যন্ত কি হয় দেখাই যাক্।

কাল সকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জঙলা গ্রামে এসে পৌছুলাম। সকাল হওয়ার আগে তাকে একবার 'হিপনোটাইজ্' করলাম। অলক শুধু উত্তর দিল—"অন্ধকার আর জল", তার পরেই সে উঠে পড়ল। জঙলা গ্রামে পৌছনো মাত্র তার যেন সমস্ত উৎসাহ এক সঙ্গে দেখা দিল। একটা পথ দেখিয়ে বল্‌ল—"এই পথে এবার যেতে হবে।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"কি ক'রে বুঝলে?"

"কি করে? কে জানে, এই পথই হয়তো হবে!"

একটা কথা ভেবে আমার সমস্ত শরীর প্রথমে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল; তবে কি কৃতান্তবর্ম্মার বাড়ির কাছে এসে তার কাঁধে আবার ওই দানবের আত্মা ভর করেছে? কিন্তু তারপর দেখলাম ওখানে শুধু একটা পথ-ই বেঁকে গেছে। তাই আমরা সেই পথই ধরলাম। অশোক তার ডায়েরীতে যা যা লিখেছে পথের দু'ধারে ঠিক সেই সবই দেখা যাচ্ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। আমি অলককে ঘুমোতে বলা মাত্র সে ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর তাকে জাগাবার অনেকবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে উঠল না। কেমন যেন একটা ভয়

করতে লাগল। সন্ধ্যা হয়ে এল; আসামের বুনো পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় আর উঁচু বনের মাথার উপর সূর্য্যের রাঙা আলো ছড়িয়ে পড়ল, যেন আকাশের বাঁধ ভেঙে আলোর বন্যা পাহাড়ে নেমে এসেছে!

এবার অলককে অতি সহজেই জাগাতে পারলাম। অলককে অনেকবারই হিপনোটাইজ করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। রাত হয়ে গেল, আমি অলককে কিছু খেয়ে নিতে বললাম। কিন্তু অলক খেল না, বললো—সে আগে এক সময়ে খেয়ে নিয়েছে, এখন আর তার খিদে নেই। কেমন যেন একটা সন্দেহ মনে জেগে রইল, কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না।

অলক শুয়ে রইল; যতবারই তার দিকে তাকালাম, দেখি সে আমারই দিকে তাকিয়ে আছে। আমার এটা মোটেই ভাল লাগল না। আমার কেমন যেন ভয় করছে! হ্যাঁ, ভয়,—ভয়···ভীষণ ভয় করছে। সমস্ত ব্যাপারকেই এখন আমি ভয় করছি,—এই কথা ভাবতেও; তবু আমায় এগিয়ে যেতে হবে। এই খেলায় বাজি ধরেছি—জীবন কিংবা মৃত্যু, তাই পিছিয়ে এলে চলবে না।

পরদিন। আমি এমন কতগুলো ভূতুড়ে ব্যাপার দেখছি, যাতে হয়ত সকলে মনে করতে পারে ডক্টর শঙ্কর চক্রবর্ত্তী অতি পরিশ্রমে পাগল হয়ে গেছে। কাল সারাদিন আমরা চলেছি, সমস্ত সময় আমাদের গাড়ি আস্তে আস্তে আরও পাহাড়ী-মরুভূমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। অলক সব সময় শুধু ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, আমি নিজে খেয়ে নিলেও তাকে খাওয়ানোর জন্য ঘুম থেকে তুলতে পারি নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে কৃতান্তবর্ম্মার প্রভাবে সে নিজেকে আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলছে। তাই আমি মনে মনে স্থির করেছি—যদি অলক সারাদিন ঘুমিয়ে কাটায়, আমিও সারা রাত জেগে কাটাব।

রাত হয়ে এল। এক জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে আমরা বিশ্রাম করতে বসলাম। এবারও অলক খেতে চাইল না, আমিও তাকে মিথ্যা পীড়াপীড়ি করলাম না। অলকের চারপাশে একটা গোল দাগ দিয়ে সেই ফুল ছড়িয়ে দিলাম। সে একটা কথা বলল না, শুধু তার মুখ যেন হঠাৎ সমস্ত রক্ত হারিয়ে ফেলল। তার কাছে যাওয়া মাত্র সে আমাকে জড়িয়ে ধরল। তার সমস্ত শরীর তখন এক অজানা ভয়ে কাঁপছে।

আমি বললাম—"এই আগুনের ধারে এসে বস।"

সে কি করে তাই দেখাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সে একটিও কথা না বলে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু দাগের কাছে এসে আর একটি পা-ও বাড়াতে পারল না। বললাম—"এস, এস এখানে।"

"আমি যেতে পারছি না," বলে সে তার আগের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল।

হঠাৎ ঘোড়াগুলো ভয়ে চীৎকার করে উঠে লাফালাফি করতে সুরু করল। আমি তাদের কাছে গিয়ে কোনও রকমে শান্ত করলাম। রাত্রে অনেকবারই তাদের কাছে আমায় যেতে হয়েছিল। শেষ রাতের দিকে আগুন প্রায় নিভে এসেছিল, হঠাৎ দেখলাম দূরের

কুয়াশায় একটি অস্পষ্ট নারীমূর্ত্তি। চারদিক্ মড়ার মত নিথর, শুধু ঘোড়াগুলো ভয়ে দিশে-হারা হয়ে মাটিতে পা ঠুকছে আর চীৎকার করছে। আমারও ভয় করতে লাগল—কি রকম যেন রক্ত-জমিয়ে-দেওয়া ভয়! হঠাৎ মনে হ'ল আমি যে দাগের ভিতরে আছি সেখানে কোনও বিপদ্ আসতে পারে না। মনে হ'ল, এ ভয় আর কিছুই না, গভীর অন্ধকার রাতে একা একা জেগে থাকার জন্য মনে এক অস্পষ্ট ভয় এসে উঁকি মারছে। দূরের অন্ধকার, কুয়াশা, বন ও পাহাড় সেই ভয় আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

কিন্তু তাই বা কি ক'রে হবে? স্পষ্ট দেখলাম, কয়েকটি মেয়ে কুয়াশায় গা ঢাকা দিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ঘোড়াগুলিও পাগলের মত লাফালাফি করতে সুরু করেছে। সেই মেয়ে ক'টি গোল দাগের বাইরে দাঁড়িয়ে বলতে সুরু করল—"এস, ভাই আমার, এস আমাদের কাছে। তোমার শরীরে কি তাজা রক্ত! কচি, তাজা, গরম···"

আর থাকতে পারলাম না। এক হাতে মাদুলি চেপে আর এক হাতে একটা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। (ক্রমশঃ)

সুইডেনের স্মৃতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী, এম্. এ, বি. এল্

আন্তর্জ্জাতিক তরুণ-তরুণী সমিতির শান্তি-শিবির বসেছে সুইডেনে। জায়গাটার নাম হাসেলবি ভিলাষ্টাড। ম্যালার্ণ হ্রদের ধারে আমাদের শিবির-জীবনের গল্প তোমাদের আগেই বলেছি। এবারে শোন শেষ কয়দিনের স্মৃতি।

১৮ই রবিবার—আমরা নতুন ও পুরোনো উপসালা সহরে বেড়াতে গেলাম।

নতুন 'উপসালা'য় বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে সুইডেনে শিক্ষাব্যবস্থার একটু বিবরণ শোন।

'পাবলিক স্কুল' আইনে সুইডেনে প্রত্যেককেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে হয়। শিক্ষার দ্বিতীয় ধাপ হ'ল সেকেণ্ডারী অর্থাৎ মাধ্যমিক স্কুল,—যাকে বলা হয় 'জিমনাসিয়া'। এই সমস্ত স্কুল আগে চার্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং ওখানে পড়ানো হ'ত ল্যাটিন, গ্রীক্, 'ডিভিনিটি' অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ব। নতুন আইন সংস্কারে ছাত্রেরা এখন এই মাধ্যমিক স্কুলে চার থেকে পাঁচ বছর পড়ে। আর এখন তাদের শিক্ষা শুধু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষাতেই আবদ্ধ নয়। এখানকার শেষ পরীক্ষার নাম 'ষ্টুডেণ্ট একজাম্'। এ পরীক্ষা পাশের 'সার্টিফিকেট' পেলে ছাত্রেরা 'সিভিল সার্ভিস', টেকনিকাল স্কুল অথবা যে কোনো 'প্রফেশানে' প্রবেশ করতে পারে, অথবা ছাত্রেরা এই পরীক্ষার পর যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রের জীবনে 'ষ্টুডেণ্ট একজাম' পাশ খুব এক স্মরণীয় ব্যাপার। এই পরীক্ষা পাশ করলে তারা পায় সাদা টুপি এবং যেদিন এরা পায় সেই টুপি সেদিন এদের মহা উৎসবের দিন—নাচে, গানে, খাওয়াদাওয়ায়, হৈচৈতে মেতে থাকে সারা দিনরাত।

সুইডেনে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়—প্রাচীনতমটি 'উপসালা' বিশ্ববিদ্যালয় (১৪৭৭ খৃঃ অব্দে স্থাপিত), দ্বিতীয়টি 'লুণ্ড'। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, পড়ানো হয় ঈশ্বর-তত্ত্ব, আইন, চিকিৎসা-শাস্ত্র এবং দর্শন। দর্শন আবার দুইভাগে বিভক্ত—'হিউমানিটিস্' এবং বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে সুইডেন বেশ উন্নত—বিশেষতঃ উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান এবং পদার্থ-বিজ্ঞানে। এখানকার সাইক্লোট্রোন এবং পরমাণবিক গবেষণায় নিযুক্ত অধ্যাপক মান্নে সিগ্‌বাহন্ তাঁর গবেষণার জন্য কিছুদিন আগে 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের 'সেমি-অফিসিয়াল্ ক্লাব' অথবা 'ফ্রেটা-রনিটি হাউস'—যাকে এখানে বলা হয় 'নেশান্স্',—তার সভ্য হ'তে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ পরীক্ষার নিয়ম নেই। পড়াশোনা ব্যাপারে ছাত্রদের প্রচুর স্বাধীনতা। অধ্যাপক ক্লাসে বক্তৃতা দেন। ছাত্রেরা ক্লাস ক'রে এবং মৌলিক গবেষণা ক'রে প্রবন্ধ লেখে। সেই প্রবন্ধ নিয়ে তাদের করতে হয় অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি 'ডক্টর'। এই উপাধি লাভ করতে হ'লে ছাত্রকে জনসাধারণের সামনেও তার প্রবন্ধের আলোচনা করতে হয়।

রবিবারে উপসালা যাওয়ায় সহর আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ী, লাইব্রেরী, চার্চ, পুরোনো কেল্লা আর বটানিকাল গার্ডেন বাইরে থেকে দেখতে হ'ল। সেখান থেকে আমরা গেলাম পুরোনো উপসালায়। সুইডেনের প্রাচীনতম গীর্জা

এখানে। সুইডিস্‌রা আগে ছিল 'হিদেন'—অর্থাৎ মূর্ত্তি-উপাসক। এই চার্চের জায়গায় ছিল 'হিদেন' দেবতাদের মন্দির। চার্চের কাছে আছে তিনটি বড় স্তূপ—সেগুলি হিদেন রাজাদের সমাধি।

সহর মনোরম—কিন্তু দুঃখ থেকে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরকার ঐশ্বর্য্য দেখতে না পাওয়ায়।

উপসালা থেকে ফিরে এসে দেখি আমাদের তাঁবুর পাশে হাসেলবীর লোকেরা নাচ-গানের জলসা জমিয়ে তুলেছে। কয়েকজন মধ্যবয়সী আমাকে অনুরোধ জানালেন আমাদের ভাষায় কিছু যেন আবৃত্তি করি। রবীন্দ্রনাথের 'দিন আগত ওই' গানটির আবৃত্তি ক'রে তার ইংরেজি অনুবাদ পড়লাম। যাঁরা ইংরেজি জানেন আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে গেলেন।

রাতে হ'ল ক্যাম্প ফ্যায়ার। এটি আমার শেষ ক্যাম্প ফ্যায়ার—ঝিমিয়ে-পড়া ক্যাম্প ফ্যায়ার, মনে রাখার কিছুই নেই।

আমার সুইডেন ছাড়ার দিন যতই এগোতে লাগ্‌ল শিবিরের ছেলেমেয়েদের খাতায় বাংলা ভাষায় কিছু লিখে এবং তার অনুবাদ ইংরেজিতে দিয়ে নাম সই করার কাজ ক্রমশঃ তত গেল বেড়ে। ১৯শে রাতে এমনি কাজের মধ্যে যখন বিব্রত, কুটসন আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন ম্যালার্ণ হ্রদের ধারে। রাত তখন অনেক—সেই আকাশের চাঁদ, সেই ম্যালার্ণের জলের কুলু কুলু শব্দ, অথচ প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য আমাদের কোন্ এক বিভিন্ন লোকে নিয়ে এল। চাঁদ গেল ডুবে, আকাশে প্রভাতের আলো। নিস্তব্ধতা ভেঙে কুটসন বল্‌লেন, 'রাত অনেক হয়েছে, সকালে আপনার গাড়ী।' বিদায়ের শেষ রাত অপূর্ব্ব তৃপ্তির আনন্দে মন দিল ভরে। স্মিত মুখে অভিবাদন সেরে তাঁবুতে চলে এলাম।

২০শে জুলাই, মঙ্গলবার। আমায় সকালের ট্রেনে যেতে হবে ব'লে শিবিরের ছেলেমেয়েরা আমায় তাদের আন্তরিক অভিবাদন জানিয়ে কাজে চলে গেল। কুটসন আমার কাছ থেকে শিবির সম্বন্ধে আমার মতামত জান্‌তে চেয়েছিলেন। তাঁকে শিবির ছাড়ার সময়ে প্রশংসাই করলাম খুব। আমার বলার ছিল—শিবিরের উদ্দেশ্য সুন্দর, আদর্শ সুন্দর। কিন্তু এই উদ্দেশ্যকে আরও সুন্দর এবং সার্থক করতে হ'লে দৈহিক পরিশ্রমের কাজের সময়টাকে আরও সংক্ষেপ করা দরকার এবং আরও একটু পাকা বন্দোবস্তেরও প্রয়োজন। শিবিরে একটি স্থায়ী পাঠাগারের বিশেষ আবশ্যক,—বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীরা যাতে তাদের দেশ এবং দেশের কৃষ্টি সম্বন্ধে বক্তৃতা অথবা সিনেমটোগ্রাফ ইত্যাদির দ্বারা আলোচনা করতে

পারে। আর সুইডেনের (যেহেতু শিবির হয়েছে সুইডেনে) সাধারণ লোক এবং স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে যাতে তারা আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা-মেশা করতে পারে তার সুযোগের ব্যবস্থা করতে পারলে এই শান্তি-শিবিরের উদ্দেশ্য আরও সাফল্যমণ্ডিত হবে। অবশ্য এই ব্যবস্থার জন্যে, শান্তির উদ্দেশ্যকে স্থায়ী করার জন্যে, চাই সব দেশেরই সহযোগিতা। অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ নিশ্চয় এই মহা কাজে অগ্রণী হবে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শিবিরের কর্ম্মীদের ছবি তুলে নিয়ে ক্যাম্প ছাড়লাম। লণ্ডনে এলাম ট্রেনে,—ডেনমার্ক, জার্মানি, হল্যাণ্ড হয়ে। আবার ব্যস্ত-লণ্ডনে নিজের কাজে ব্যস্ত।

সুইডেনের জাতীয় সঙ্গীতটি দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করি—

"ড্যু গামলা, ড্যু ফ্রিয়া, ড্যু ফিয়েল হোগা ন্যুর্ড
ড্যু টিসটা, ড্যু গ্লেডজরিকা, শ্র্যানা –
জাগ্ হেলসার জাগ, ভেনাষ্ট লাণ্ড উপ ফ্ য়র্ড,
ডিন্ সূল, ডিন্ হিম্মল, ডীনা এঙ্গ-দর গ্রনা,
ডিন্ সূল, ডিন্ হিম্মল, ডীনা এঙ্গ-দর গ্রনা,
ড্যু ট্রুনার পো মিল্ন্যন ফ্রেন ফোরন্ষ্টোরা ডার্ব
ড্যো এ্যারাট ডিট্ট নাম্ন ফ্ল্যাগ্ এ্যাভর জ্যুর ডন,
জাগ্ ভেট্ট আট্ট ড্যু এ্যার্, অক্ ড্যু ব্লীর ভাড্ ড্যু ডার্ব
জা, জাগ্ ভিল্ল লেভা, জাগ্ ভিল্ল্ ড্যে ঈ নুরডেন।"

অনুবাদ—

তুমি পুরাতন, তুমি মুক্ত, পর্ব্বতোচ্চ তুমি; তুমি মৌন, তুমি আনন্দে শ্রীমণ্ডিত হে 'উত্তর'. তোমাকে আমি বরণ করি। তুমি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে আশ্চর্য্য ভূমি। তোমারি সূর্য্য, তোমারি স্বর্গ. তোমারি সবুজ মাঠ, কত স্মৃতিতে পূর্ণ তোমারি মহা অতীত—যে কালে তোমারি নাম আকাশে বাতাসে প্রবাহিত ছিল। আমি জানি তুমি আছ, এবং ভবিষ্যতে তুমি এখন যা তাই থাকবে। নিশ্চয়ই আমি এই উত্তরেই বাস করব আর এই উত্তরেই ম'রব।

বনান্তরাল

শ্রীসুকুমার দে সরকার

বনের পশুপাখী—বনের কেন বলি, পশুপাখীরা কি কথা বলে? আমরা জানি না, সঠিক জানি না। কোন একটা শব্দ ক'রে তারা ভাবের বিনিময় করে নিশ্চয়, কিন্তু এটা ঠিক যে মানুষের ভাষায় তারা কথা বলে না। কিন্তু গল্পে প্রায়ই দেখা যায় যে পশু-পাখীকে দিয়ে বেশ মানুষের ভাষায় কথা বলিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অনেক আছে নিছক রূপকথা, অনেক উপদেশের গল্প—যেমন বিষ্ণুশর্ম্মার গল্প, অনেক জ্ঞানের কথা—যেমন ঈশপের গল্প। আবার কিপলিংএর গল্পে বা ধনগোপাল মুখুজ্জে ম'শায়ের গল্পে, এমন কি আমার মনে হয় আমার নিজের গল্পেও পশুপাখীরা যে কথা বলে তাতে মনে হয় যে যদি পশুপাখীরা কথা বলত হয়ত এই রকমই বলত। তোমরা কেউ কেউ কোন দিন হয়ত পাখী বা খরগোস বা কুকুর পুষেছ। সেই তোমাদের প্রিয় পোষা জীবগুলির চোখের দিকে তাকিয়ে তোমাদের কোনদিন কি মনে হয় নি যে ওরা কি যেন বলছে আর সেই বলা কি মানুষের ভাষায় তোমার কানে গম গম ক'রে ওঠে নি?

আর আমরা, যারা জন্ম থেকে ইট-কাঠের সহরে মানুষ হয়েছি, ফুটবল বগলে ক'রে যেতে যেতে হঠাৎ বাড়ীর পাশের রোজ দেখা নেড়া কৃষ্ণচূড়া গাছটার লাল ফুলে বোঝাই মাথাটা দেখে এক মুহূর্ত্ত কি থমকে দাঁড়াই নি? ছাদের মাথায় ঘুড়ি কেটে যাওয়ার পর খানিকক্ষণ কি শুধু শুধুই পশ্চিম আকাশের মেঘেদের রং বদলের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকি নি? আর আমরা, যারা গাঁয়ের ছেলে সহরে পড়তে এলাম, প্রচণ্ড গরমের পর গুড় গুড় ক'রে প্রথম যখন মেঘ ঘনিয়ে এল, বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে দেশী ও বিদেশী সাহেব বাবুরা যখন ট্রামে, বাসে বাদুড়-ঝোলা ঝুলতে ঝুলতে ছুটে চলেছে তখন আমাদের মনে গাঁয়ের তাল-[illegible] বন ছাড়িয়ে, উঁচুনীচু মেঠো আকাশের মাথায় হুমকি দেওয়া প্রথম বর্ষার সজল মেঘের ছবি কি ভেসে ওঠে না? বাদলার ঝাপসা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আকাশের দুকুল ছড়ানো মাঠের মাঝে, লাঠি হাতে টোকা মাথায় চাষার মন্থর ছবিটা ভেসে উঠে একবারটি কি মনটা হু হু করিয়ে তোলে না?

আমাদের এই দেশটার কি বিচিত্র রূপ! কোথাও আদিম, কোথাও আমাদের পুরুষ পরম্পরায় গড়া সভ্য জীবনের সমষ্টি। কোথাও পাহাড় উত্তুঙ্গ বিশাল, কোথাও সমুদ্র উর্ম্মিময় উত্তাল। কোথাও সহর গ্রাম, কোথাও বন। এই সবের ভেতর দিয়ে চলেছে জীবনের একটা আশ্চর্য্য বয়ে চলা। এখানে আছি আমরা আর কত বোবা জীব। আমি গল্প লিখি আমাদের এই দেশের বিচিত্র রূপ নিয়ে আর ওই বোবা জীবেদের নিয়ে। ওরা আমার কানে কানে কথা বলে আর বনের পথে পথে আমার দেশ খুলে দেয় তার আদিম

রূপ। আমার গল্পে অনেক কল্পনা, কিন্তু সেই কল্পনা গড়ে উঠেছে অনেক ছোট ছোট জীবন-নাট্যের ওপর, একটু চোখ খুলে রাখলে যা যে কেউ দেখতে পাবে। এমনি কয়েকটা গল্প আজ তোমাদের বলব।

* * * *

বহুদিনের একটা পুরোনো গল্প বলি। আমি শুনেছিলাম আমার ছেলেবেলায়, তোমরাও শুনে থাকবে, কারণ গল্পটার মাথা এতদিনে পাকা চুলে ভরে গেছে।

মথুরা কি বৃন্দাবনে হবে, তখন বড়ই বানরের উপদ্রব। ঘরে বাইরে গৃহস্থের কোন কিছু রাখার জো নেই। দল বেঁধে বানর এসে সে সব নষ্ট করে দেয়। শুধু তাই না, আবার গাছের ডালে ডালে ব'সে মানুষকে ভেংচি কাটে আর মানুষের স্বভাবের নকল করে। অনেক সময় হাসিও পায়, আবার রাগও ধরে। বানরের স্বভাব নকল করা।

এক ভদ্রলোক সেদিন সকালে আয়নার সামনে বসে ক্ষুর দিয়ে দাড়ী কামাচ্ছিলেন। বাড়ির পাশেই গাছের ডালে একদল বানর বসে ছিল, তিনি দেখেন নি। দাড়ী কামিয়ে টেবিলের ওপর ক্ষুরটা আর বুরুসটা রেখে তিনি গেছেন মুখ ধুতে, ফিরে এসে দেখেন একটা বানর তাঁর টেবিলে বসে মুখে সাবান মেখে আয়নার সামনে মুখ নাড়ছে আর [illegible] ক্ষুরটা মুখে ঘষছে ঠিক যেমন ক'রে তিনি দাড়ী কামাচ্ছিলেন। ভদ্রলোক হাসবেন না কাঁদবেন? এদিকে তাঁর সাড়া পেয়ে বানরটা তাঁর ক্ষুরটি নিয়ে হাওয়া। এমনি ঘটে চলে দিনের পর দিন। ভদ্রলোক তিতিবিরক্ত হয়ে উঠলেন। শেষে একদিন তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি এল।

সেদিন তিনি ক্ষুরটা খুলে ক্ষুরের পেছন দিক্ দিয়ে মুখে জোরে জোরে কয়েক ঘা মেরে খোলা ক্ষুরটা টেবিলে রেখে একটু আড়ালে গা ঢাকা দিলেন। ঠিক বানরটা হাজির। এখন বান্দরে বুদ্ধি, উল্টো সোজা জানবে কোথা থেকে? বানরটা ক্ষুরের সোজা দিক দিয়েই ভদ্রলোকের দেখাদেখি মুখে এক ঘা লাগাল। ব্যস্, ধারাল ক্ষুর, ফিনকি দিয়ে রক্ত—কিচ্ কিচ্ ক'রে চেঁচাতে চেঁচাতে বানরটা পালাল। আর আসে নি।

* * * *

গল্পটা কতদূর সত্যি জানি না, মনে হয় যে সত্যি নয়। মানুষের বুদ্ধিকে বড় করার জন্যেই বানরের বুদ্ধিকে ছোট করা হয়েছে। কিন্তু বানরদের এই খেয়াল খোলা রসিকতা করার প্রবৃত্তি বার বার আমি দেখেছি।

বুদ্ধিতে জানোয়ার তাদের প্রয়োজনে খুব ছোট নয়, বনে বনে এর বহু প্রমাণ আমি পেয়েছি।

তখন গ্রীষ্মকাল। আকাশ পোড়া তামাটে। সারাদিন বনে বনে ঘুরে তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। ক্যাম্প বহু দূরে, আর সে দিকটা ফাঁকা বালি-ভরা মরুভূমির মত। তবু খুঁজতে খুঁজতে একটু জলের সন্ধান পেয়েছিলাম।

দূরে একটুখানি স্বচ্ছ জল চিক চিক করছে, আর তার চারপাশে ধূ ধূ নরম সাদা ঈষৎ ভিজে বালি। আমিও ব্যগ্র হয়ে জলের দিকে এগিয়ে চলেছি। ও মা, যত এগোই বুট শুদ্ধ পা বালির ভেতর বসে যেতে থাকে। সামনেই জল কিন্তু জলের চারপাশে নরম চোরা বালি। শেষে কি প্রাণ হারাব? ফিরে এসে একটা ঢিপির ছায়ায় বসে হাঁফাচ্ছি, হঠাৎ দূরে খস্ খস্ শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। দেখি, বালির ওপর দিয়ে একটা বুনো ঘোড়া জলের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ঘোড়াটা কি জানে না যে এটা চোরা বালির জায়গা! বেশ সাবধানে এগিয়ে চলেছে ঘোড়াটা, আর প্রতি পদক্ষেপেই তার পা আরও একটু বেশী বসে যাচ্ছে। তেষ্টার জন্য কি প্রাণ দেবে ঘোড়াটা? হাঁটু অবধি পা যেখানে বসে গেল ঘোড়াটার সেইখান অবধি গিয়ে দেখলাম ঘোড়াটা ফিরে আসছে। নিশ্চিন্ত হ'লাম, যাক, জানোয়ার হ'লেও একেবারে বোকা নয়। ঘোড়াটা কিন্তু একেবারে ফিরে গেল না, খানিকটা এসে রোদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে বুনো মাছি তাড়াতে লাগল। একটু পরে দেখি ঘোড়াটা আবার এগিয়ে চলেছে ঠিক তার আগের বারের পায়ের গর্ত্তগুলোর পাশ দিয়ে। তারপরে দেখলাম, ঘোড়াটা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তার আগের বারের পায়ের গর্ত্তগুলো থেকে নিশ্চিন্ত আরামে জল খাচ্ছে। জলের কাছাকাছি বালিতে, যেখানে তার পা হাঁটু অবধি বসে গিয়েছিল, সেই গর্ত্তগুলো কিছুক্ষণ পরেই নীচে থেকে ছাঁকা জলে ভরে উঠেছিল।

একটা বুনো ঘোড়ার বুদ্ধি অনুসরণ ক'রে আমিও সেদিন জল খেতে পেরেছিলাম।

* * * *

শম্ভুনাথের কথা মামার বাড়ীতে ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। দাদা মশাই তখন বেঁচেছিলেন। তিনিই নাকি তাঁর কম বয়সে শম্ভুনাথকে দীঘিতে ছেড়েছিলেন। শম্ভুনাথ একটা [illegible] মাছ। মামার বাড়ীর দীঘিটা ছিল যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি তার স্বচ্ছ টলটলে জল। সত্যিই দীঘিটা এত বড় ছিল যে কালবৈশাখীর দিনে পাগলা ঝোড়ো হাওয়ার সময় দুরন্ত আমরা যখন আম কুড়োতে কুড়োতে দীঘির ধারে গিয়ে পড়তাম, আমাদের ছেলে-মনে পাগলা হাওয়ায় আছড়ান ক্যাপা দীঘির ঢেউগুলোকে মনে হ'ত সেই দিদিমার গল্পের সাত সমুদ্রের উত্তাল বিশাল ঢেউ।

শম্ভুনাথের বয়স যখন কম ছিল তখন দাদামশাই নাকি তাকে দু'বার ছিপে ধরেছিলেন। প্রথম বার দু' ঘণ্টা ধরে খেলিয়ে তাকে ডাঙ্গায় তুলেছিলেন দাদামশাই। দাদামশাই ছিলেন পাকা মাছ-ধরিয়ে। ছিপই ছিল তাঁর কত! কত রকমের হুইল, বঁড়শী আর রং বেরঙের ফাৎনা! প্রথম বার শম্ভুনাথকে ধরে, একবার তার দিকে তাকিয়ে আবার জলে ছেড়ে দিয়েছিলেন তাকে। দ্বিতীয় বারেও তাকে তুলেছিলেন দাদামশাই, কিন্তু সেবারে শম্ভুনাথ এক হেঁচকায় ছিপশুদ্ধ দাদামশায়কে জলে ফেলে নাকানি-চোবানি খাইয়ে ছেড়েছিল। জলে পড়েও কিন্তু দাদামশাই ছিপ বা সুতোর টান ছাড়েন নি এবং কোমর জলে দাঁড়িয়ে খেলিয়ে তুলেছিলেন তাকে। সেবারে শম্ভুনাথকে আবার জলে ছেড়ে দিতে দিতে দাদামশায়কে বলতে শোনা

গিয়েছিল—"এইবার থেকে আসল মাছ ধরা সুরু।" তারপর আর একবারও ছিপে ধরা যায় নি শম্ভুনাথকে। কয়েকবার সে বঁড়শীতে গাঁথা পড়েছে, কিন্তু প্রতিবারই সুতো ছিঁড়ে পালিয়েছে সে। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় সে ছিপে পড়তই না। সে তখন বিরাট, তীব্রগতি সবল জলচর।

বহুদিন শঙ্খচিল-ডাকা, নীল দুপুরে নিস্তব্ধ দীঘির কালচে সবুজ গভীর নীচে থেকে এক একটা হাওয়ার বুদ্বুদ্ ভেসে উঠে কাঁপতে কাঁপতে দীঘির জলে ফেটে ঢেউ হয়ে ছড়িয়ে গেছে। দাদামশাই বলে উঠেছেন, "ঐ শম্ভুনাথ ফুট কাটছে"! আর আমরা অবাক হয়ে চেয়ে থেকেছি। দাদামশায়ের মাথার চুল সাদা হয়ে এসেছে, বর্ষার জলে, রোদের তাতে, দীঘির পাড়ে বসে বসে। দীঘির জল আরও কালো—আরও সবুজ হয়ে উঠেছে, আর জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে ছায়াঘন, শীতলতর করে তুলেছে বেড়ে-ওঠা আম, কাঁঠাল, জাম আর জামরুল গাছের দল। কয়েকটা ঝাউ গাছ তাদের ঝিরঝিরে পাতাবহুল ডালপালা মেলে নীল আকাশের দিকে আরও একটু উঁকি মেরেছে। আর শ্যামা, দোয়েল, ছাতারের দল আর মাছরাঙারা, রঙে গানে মাতিয়ে তুলেছে দীঘির পাড়।

কত দিন শেষ রাতে দাদা মশায়ের সঙ্গে দীঘির পাড়ে এসে বসেছি। শেষ রাতেই নাকি শম্ভুনাথ জলের ওপরে ওঠে আসে। দীঘির পাড়ে দাদামশাই নিথর। মাছের চারের তীব্র মধুর গন্ধের সঙ্গে ভেসে আসছে মালতী ফুলের ঝিমঝিমে সৌরভ। ঝাউ গাছগুলোর মাথায় মরা সোনার জলে নাওয়া চাঁদ ডুবতে বসেছে, ঝাউএর পাতায় বাতাসের হঠাৎ-জাগা দীর্ঘশ্বাস আর দীঘির জলে ঢেউয়ে মৃদু নাচের তালে তালে চিকচিকে চাঁদের আলোয় ফাৎনাটা কাঁপছে। এ যেন কোন রহস্যময় ভিন্ন গ্রহ! এই কি আমার দেশ? শম্ভুনাথকে ধরা যায় নি।

সেবার পূজোর সময় দাদামশাই বললেন, "এবার দীঘিতে বড় জাল দে! শম্ভুনাথকে এবার ওঠাতে হবে। আর পূজো দেখতে পাব কিনা কে জানে? এই পূজোতেই ওকে মারতে হবে। এর পর আর খাওয়া যাবে না।"

দাদামশায়ের বয়স হয়েছে, আর ছিপ ধরতে পারেন না।

দীঘিতে বড় জাল পড়া একটা ধূমধাম ব্যাপার। এ পাড় থেকে ও পাড় এমনি প্রকাণ্ড জাল, দলে দলে জেলে জালের দু'মাথা জলে ডুবিয়ে দিয়ে আর দু' মাথা ধরে টানতে টানতে দীঘি ছেঁকে এগিয়ে চলেছে। কত মাছ কিলবিল করে ভেসে উঠেছে। জালের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে তারা, ওপাড়ে জাল পৌছুলেই বন্দী তারা। ওদিকে ভোরের বোধনের শানাই ইনিয়ে বিনিয়ে প্রভাতী গেয়ে চলেছে আর ঢাকে উঠছে মেঘের ঘন বোল।

জাল দীঘির মাঝ বরাবর পৌছুতেই হু-উ-স করে জলে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন।

"শম্ভুনাথ! শম্ভুনাথ!" পাড়ে একটা হৈ হৈ গোলমাল।

সেই দেখলাম শম্ভুনাথকে। প্রকাণ্ড মাছটা, কালো বিরাট। মাছের দলের আগে আগে, জালের সাথে মন্থর অথচ ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে আসছে দীঘির ওপাড়। এইবার বন্দী শম্ভুনাথ।

দাদামশাই হাঁক দিলেন, "সাবধানে তুলবি মাছটাকে, যেন জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে না যায়। ভারী জোর মাছটার!"

"না কর্ত্তা," জেলেরা হেঁকে বলে, "এ জাল ছেঁড়ার নয়।" তখন তারা দীঘির ওপাড়ে পৌছে গেছে। জালের মাথা তখন আস্তে আস্তে গুটিয়ে আনা হচ্ছে। হঠাৎ দেখলাম শম্ভুনাথ তীব্র গতিতে পাড়ের দিকে এগিয়ে গিয়েই বাঁক নিল। সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড লাফ।

একটা হৈ হৈ চীৎকার। শম্ভুনাথ তখন জাল ডিঙ্গিয়ে গভীর জলে ডুব মেরেছে। জলসিক্ত বিরাট দেহটা তার আকাশের শূন্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যে সূর্য্যালোকে ঝলসে উঠেছিল। জাল গুটিয়ে আনার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও মাছটা একবারও জানতে দেয় নি যে সে তার বিপদের কথা জানে।

* * * *

খরগোসরা বনের নিরীহ জীব। শত্রুর শেষ নেই তাদের। তাই তাদের মাটির ভেতর বাসাগুলোয় সব সময়ে দু'টো করে গর্ত্ত থাকে। একটা গর্ত্ত দিয়ে ঢুকে আর একটা গর্ত্ত দিয়ে তারা বেরিয়ে যেতে পারে। একবার দেখেছিলাম একটা বড় সাপ দু'টো পাঁশুটে খরগোসকে তাড়া করেছে। সাপটা দু'টো খরগোসকেই তাড়া করেছিল কিনা জানি না, কিন্তু দেখেছিলাম দু'টো খরগোসই একসঙ্গে একদিকে ছুটছে আর কিলবিলে সাপটাও তীব্র গতিতে তাদের পেছু নিয়েছে।

খরগোস দু'টো তাদের আড্ডায় এসে ধাঁ করে একটা গর্ত্তের ভেতর ঢুকে পড়ল আর এক নিমেষের মধ্যে সাপটাও ঢুকে গেল সেই গর্ত্তে। পরমুহূর্ত্তেই দেখি, একটু দূরের একটা গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এল খরগোস দু'টো। তারপরে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম, পালাল না তারা। একটা খরগোস প্রাণপণে মাটি খুঁড়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে গর্ত্তের মুখটা বোজাতে লাগল আর দ্বিতীয় খরগোসটাও দেখি ঘুরে এসে যে মুখে তারা ঢুকেছিল সেই মুখটাও বোজাতে লেগে গেছে! কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্ত্তের দু'টো মুখই বন্ধ হয়ে গেল এবং গর্ত্তের মুখে মাটি ঢিপি হয়ে উঠল। খরগোস দু'টো সেই ঢিপিগুলোর ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে চেপে জমাট করে দিল, তারপরে পাশাপাশি লাফাতে লাফাতে ঘাসের ভেতর মিলিয়ে গেল।

এখন, তোমরাই বল, তারা কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে, গোঁফ চুমরে বলতে বলতে গেল কিনা—"কেমন যাদু, আর আসবে খরগোসদের পেছনে তেড়ে?"

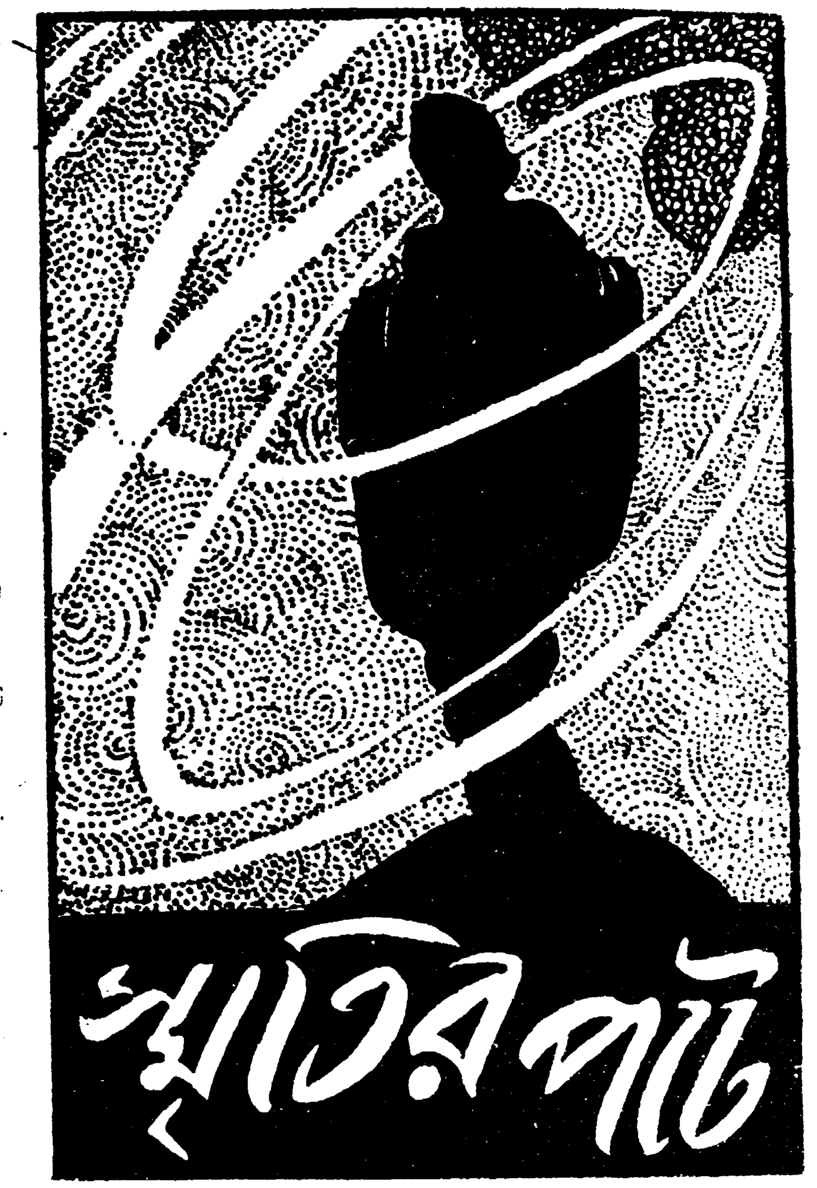

আত্মোন্নতি সমিতির গল্প

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
এম্. এ, বি. এস্-সি

যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ

আমরা তখন দেশভক্ত সংগ্রহ করিবার জন্য চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই প্রচেষ্টায় আমাদের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত সংযোগ লাভ ঘটে। সরলা দেবী, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, অবিনাশ চক্রবর্ত্তী, শিবনাথ শাস্ত্রী. বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি।

যোগেন বিদ্যাভূষণ ও অবিনাশ চক্রবর্ত্তীর কাহিনী আসল স্বাধীনতার ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকিবে। শ্যামবাজারের কাছে (বোধ হয় শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে) একটি বাসায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাস করিতেছিলেন। আলাপ হইল। তাঁহার আকর্ষণে পুনঃপুনঃ তাঁহার নিকটে গিয়াছি। প্রথম কয় দিনের পরিচয়েই তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা-ভক্তির ভাব মনে জাগিয়াছিল আজ পঞ্চাশ বৎসর পরেও মনের যে ভাব অটুট রহিয়াছে।

'ম্যাট্‌সিনি', 'গ্যারিবল্ডির' লেখক, আর্য্যদর্শনের তেজস্বী সম্পাদক, তৎকালীন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের যে রুদ্র মূর্ত্তি দেখিবার আশা করিয়াছিলাম তাহা বিফল হইল। দেখিলাম তপোরত, ধ্যানব্রত সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মূর্ত্তি। দেশের স্বাধীনতার কথায় কিন্তু তাঁহার উৎসাহব্যঞ্জক তেজোময় মূর্ত্তি যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তখন তিনি তাঁহার জীবনের শেষ ধাপে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বয়স তখন ৫২।৫৩র কাছে, আমার বর্ত্তমান বয়সের চেয়ে দশ-বারো বৎসর কম। বলিলেন, "ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি লেখার ফলে বেটারা (ইংরাজ) আমাকে নাস্তানাবুদ করিতেছে।

সাত ঘাটের জল খাওয়াইয়া খারাপ জায়গায় বদলী করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দিয়াছে। অসুখের চিকিৎসার জন্য এখন কলিকাতায় বাস করিতেছি। বেটারা আমাকে কসাইগিরি করিতে বলে। তা পারি না, তাই প্রমোশন বন্ধ। লাট সাহেবের (বোধ হয় চার্ল্‌স্ ইলিয়ট্) হুকুম—'নো কন্‌ভিক্‌শন্, নো প্রমোশন্'—অপরাধীকে জেলে না দিলে পদোন্নতি হইবে না। আমি দেখি, বেশীর ভাগ লোক অভাবে পড়িয়া চুরি করে। আমি আমার যোগশক্তির প্রভাবে তাদের জেলে দেওয়া উচিত কিনা বিচার করি। বেশীর ভাগ অপরাধীকেই খালাস দিই। সাহেবরা বলে আমি আদালতে ঘুমাই! এ যে আমার ধ্যাননেত্র—শিবচক্ষু তা তাহারা বুঝে না। মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আমি জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া হরিসংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াই। ইহাতে, তাহাদের মতে, নাকি পদের 'প্রেষ্টিজ' থাকে না!"

বিদ্যাভূষণ, শিবনাথ শাস্ত্রী ও প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সংস্কৃত কলেজে সহপাঠী ছিলেন। তিন জনেই দেশের ধর্ম্মজীবনের উপর বিশিষ্ট প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন। পরমহংসদেবের ছবিতে যে তন্ময় ভাব দেখিতে পাই মাঝে মাঝে যেন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সে ভাব আসিয়া পড়িত মনে হইত। তাঁহার যোগ সম্বন্ধীয় উপলব্ধির কিছু কিছু আভাস দিতেন। কিন্তু তখন আমরা বিজ্ঞানের ছাত্র, তত বুঝিতাম না বা মানিতাম না।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ ও অবিনাশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যোগাযোগের কারণ আমরাই হইয়াছিলাম। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বৈপ্লবিক সমিতির বিবরণ শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজ জীবনের বৈপ্লবিক সমিতি গঠনের ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনী বলিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জামাতা ললিত চাটুয্যে ও ছেলে সুরেন্দ্রনাথ এবং শচীন্দ্রনাথ ও আর একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারাও সকলে যথা সম্ভব বিপ্লব কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু যতীন্দ্রের পতন হওয়ায় এদিকে আর কাজ বেশী অগ্রসর হয় নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বহুদর্শী লোক ছিলেন। তিনি যতীন্দ্রকে আমাদের মত সহজেই পরিত্যাগ করিলেন না, পরে তিনিই আমাদের সহিত যতীন্দ্রের পুনর্ম্মিলন করাইয়া দিলেন। কিন্তু যতীন্দ্র আর ইহার পর পুনরায় দল গঠন করিতে পারিলেন না। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ সোহহং স্বামীর শিষ্য হ'ন। সোহহং স্বামী আর কেহ ন'ন, গার্হস্থ্য জীবনে যিনি ছিলেন

প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। সার্কাসে তাঁহার দুর্দ্দান্ত বাঘ লইয়া খেলা দেখানো বিখ্যাত হইয়া আছে।

যতীন্দ্র পরে আলিপুরে বোমা মামলায় ধরা পড়িয়া বহুদিন হাজতে ছিলেন। কিন্তু প্রমাণাভাবে অব্যাহতি পান। পরে এক আশ্রম করিয়া সেখানে বাস করিতেন।

অবিনাশ চক্রবর্ত্তী

অবিনাশ চক্রবর্ত্তী এই সময়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ীর কাছেই বাস করিতেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও অবিনাশ বাবু মাঝে মাঝে সংস্কৃত কাব্য চর্চ্চা করিতেন, তাহাতে আমরা বেশ আগ্রহের সহিত যোগ দিতাম। দল ভাঙ্গার পর যতীন্দ্র পীড়িত হইয়া অবিনাশ বাবুর বাড়ীতে কিছু দিন আশ্রয় পাইয়াছিলেন। অবিনাশ বাবু ছিলেন মুন্‌সেফ। তাঁহার পিতাও ছিলেন সাব জজ্। অবিনাশ বাবুকে আমরা তখন ধনী বলিয়াই ভাবিতাম। এই মহাপ্রাণ দেশভক্ত দেশের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তাহা ভবিষ্যৎ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

অবিনাশ বাবু সমস্ত বিপদ্ উপেক্ষা করিয়া দেশের কাজে ঝাঁপ দিলেন। বৈপ্লবিক সংবাদপত্র যুগান্তর যখন সরকারী আক্রমণে নেতৃহীন হইয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল তখন অবিনাশ বাবুই কিছুকাল যুগান্তর চালাইয়াছিলেন। অবিনাশ ভট্টাচার্য্য বোধ হয় এই সময়ে তাঁহার সহযোগী ছিল। আমিও মাঝে মাঝে যুগান্তরে লিখিতাম। কিছুকাল হইল ভূপেন দত্ত বলিলেন, আমার একটি প্রবন্ধ—যাহাতে গ্রীক চরিত-লেখক প্লুতার্ক হইতে কিছু উদ্ধৃত ছিল—তাহা তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে উহা এখনও (৪০।৪৫ বৎসর পরে) তাঁহার মনে আছে। ক্রমশঃ অবিনাশ বাবুর পশ্চাতে পুলিস লাগিল। তাঁহার চাকরী গেল ও তিনি অবরুদ্ধ হইলেন।

প্রভাসও অবরুদ্ধ হইয়াছিল। অবিনাশ বাবু ও প্রভাস অবরোধ-মুক্ত হইবার পর প্রভাস একদিন আমাদের গোপন সভায় বলিল, 'পুলিসের উৎপাতে আমাদের কোনও স্থানে আর চাকরী করিয়া খাইবার উপায় নাই। তোমাদের সাহায্য করিতে হইবে। অবিনাশ বাবু ও আমি মিলিয়া একটি ব্যাঙ্ক করিতেছি। উহাতে তোমাদের শেয়ার কিনিতে হইবে।' প্রভাস অত্যন্ত স্পষ্টবাদী লোক ছিল। বলিল, 'এ টাকাটা তোমাদের এক রকম জলে ফেলিয়া দেওয়া গোছের

দিতে হইবে। কারণ আমাদের ব্যাঙ্ক পুলিসের কৃপায় সফল হইবে কিনা সন্দেহ।' আমি, সতীশ, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি বন্ধুরা প্রত্যেকে পাঁচ শত টাকার শেয়ার লইলাম। প্রভাসের এক আত্মীয় বি. দে. আই. সি. এস্‌ও এই ব্যাঙ্কের ডিরেক্‌টার হইলেন। ঐ ভদ্রলোক এই সাহস না দেখাইলে বোধ হয় ব্যাঙ্কটা আদৌ হইতেই পারিত না। অবিনাশ বাবুর দেশে বেশ প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক বেশী দিন চলিল না, উঠিয়া গেল। অবিনাশ বাবু বিশেষ কষ্টে পড়িলেন।

এই সময়ে নেতাজী সুভাষ তাঁহাকে বিপদে সাহায্য করিল। সুভাষ তখন কর্পোরেশনে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাহার চেষ্টায় অবিনাশ বাবু কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের য়্যাসেসর নিযুক্ত হইলেন। সুভাষ বিপিন গাঙ্গুলীকেও কর্পোরেশনের অ্যালডারম্যান্ করে। এই সময় দিন কতক অবিনাশ বাবুর অপেক্ষাকৃত সচ্ছন্দ ভাবে দিন কাটে। কিন্তু সুভাষের দেশত্যাগের পরেই আবার তাঁহার চাকরী শেষ হইল।

রামধনু

ক্যাপ্‌টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এস্-সি, এম্. বি

"দেখ দেখ, কেমন সুন্দর একটা রামধনুর ছবি!" এই ব'লে ছোট্ট অঞ্জু মাকে তার দাদা অমিয়র টেবিলের উপর পাওয়া "রামধনু" মাসিক পত্রিকাখানা দেখতে দিলো। মা বললেন, "ও তো ছবিতে ছাপা দেখছো, আমি তোমাকে ঘরের দেয়ালে সত্যিকার রামধনু দেখাতে পারি। দেখবে?" এই বলে তিনি ঘরের মধ্যে অঞ্জুকে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন, আর জানলার ছোট্ট একটা ফুটো দিয়ে যে এক টুকরো রোদ্দুর আসছিলো তার মধ্যে ধরলেন একটা তিশিরে কাঁচ। সেই কাঁচের মধ্যে দিয়ে রোদ্দুরটা গিয়ে পড়লো দেয়ালে! সত্যি সেখানে ফুটে উঠলো রামধনুর রং।

অঞ্জু উল্লাসে বাড়ী মাথায় করে তুললো। সবাই ছুটে এলো, অঞ্জুর বাবাও এলেন। বাবা বললেন, "আমিও তোমাদের আর এক রকমের রামধনু দেখাতে পারি। দেখবে? তবে সকলে স্থির হয়ে বসো। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে ইলেকট্রিক আলোটা জ্বালিয়ে দাও। চোখ বন্ধ করে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে দাও। কি দেখছো?" সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, "কিচ্ছু না।" "বেশ, এবার চোখ চাও। যখন আমি ব'লবো ঘরের ঐ ইলেকট্রিক আলোটার দিকে চাইতে তখন সকলে ঐ দিকে চেয়ে থাকবে আর আমি ১, ২, ৩ করে গুণে যাবো ৩০ পর্য্যন্ত। তার পর যেই আমি আলোটা নিভিয়ে দেবো অমনি তোমরা চোখ বুজে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রাখবে। তখন দেখবে রামধনু।"

"বা-রে! চোখ বুজে আবার দেখবো কি ক'রে? তার উপর অন্ধকারে।" অঞ্জু বললো। বাবা বললেন, "ঐ তো মজা! আচ্ছা, এখন তোমরা প্রস্তুত? তবে আলোর দিকে চাও। ১-২-৩...৩০। ব্যস্ এই আমি আলো নিভালাম। তোমরা চোখ বন্ধ করে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে দাও। আচ্ছা, এবার বল তো কে কি দেখছো?"

সবাই অবাক, বাস্তবিক একেবারে অন্ধকার লাগছে না তো! কালোর মধ্যে বাতিটা এখনও রংএর খেলা দেখাচ্ছে! কেউ বললে সে সবুজ, লাল, নীল দেখছে, কেউ বললে হলদে, বেগুনী। কেউ দেখছে গাঢ় রং, কেউ হাল্কা। সব চেয়ে বেশী দেখছে শিশির আর ভারতী, সব চেয়ে কম দেখছে অমিয়।

বাবা বললেন, "কেন এমনটা হ'ল বুঝিয়ে দিচ্ছি।

"আমরা কেমন ক'রে দেখি জানো ত'? বাইরের দৃশ্যের আলো চোখের মধ্যে গিয়ে চোখের পেছনে এক পর্দ্দায় পড়ে। সেই পর্দ্দা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুর জালে তৈরী। সেই স্নায়ুর জাল আলোটাকে নিয়ে গেলো আমাদের মাথার মধ্যেকার মগজে যেখানে দৃষ্টিকেন্দ্র আছে। তখনই আমরা বাইরের সেই দৃশ্য দেখতে পেলাম। আলোর জোর যত হবে, পর্দ্দাতে ধাক্কাও দেবে তত বেশী। চোখ বন্ধ করলে, আর আলো যেতে পারলো না। কিন্তু যে ধাক্কা আগে দিয়েছে স্নায়ুর জালে সেটার সবটা দৃষ্টিকেন্দ্রে পৌঁছে শেষ হয়ে যেতে বেশ খানিকক্ষণ দেরী হয়। যেমন তোমরা দেখেছো এক গামলা জলে একটা ছোট ঢিল ফেল্‌লে জলে ঢেউ ওঠে। প্রথমে বড় বড়। পরে ক্রমেই ছোট হয়ে একেবারে মিলিয়ে যেতে বেশ খানিকটা সময় নেয়। স্নায়ুর ভেতরে আলোর ধাক্কায় যে ঢেউ উঠেছিল সেটা যতক্ষণ না থেমে গেলো ততক্ষণ ঐ রংএর খেলা দেখলে। বাতির বদলে যদি সকালে কি বিকেলে সূর্য্যের দিকে একটু তাকিয়ে চোখ ঢেকে দেখ, তখন দেখবে আরও কত সুন্দর রংএর খেলা। আলো যতই জোরাল হবে ততই বেশীক্ষণ রংএর খেলা দেখবে।

"এখন, শাদা রংটা রঙিন দেখা গেলো কেন এ প্রশ্ন আসতে পারে। শাদা রং সাতটা রংএর সমষ্টি মাত্র; তা অঞ্জুকে তার মা দেখিয়ে দিয়েছেন তিশিরে কাঁচের ভেতর দিয়ে শাদা আলোকে সাতটা রংএ ভাগ করে। শাদা আলোর ধাক্কার ঢেউগুলো—যা স্নায়ুর পর্দ্দাতে উঠেছিল, সেগুলোর জোর যেই কমতে শুরু হ'লো অমনি আলো আর শাদা রইলো না। তখনই ভাঙ্গতে শুরু হ'লো আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নানান্ রং দেখা দিলো। এবং যেই ঢেউ থেমে গেলো তখন আর কিছুই দেখতে পেলে না। কেবল অন্ধকার।

"আজকে চোখ বুজে রামধনু দেখার যে অভিজ্ঞতা তোমাদের হ'লো তার মূলে রয়েছে তোমাদের চোখের ও মনের স্বাস্থ্য কেমন তার পরীক্ষা। এটা বোধ হয় লক্ষ্য করেছো যে অমিয় আর সকলের আগে রংএর খেলা দেখা শেষ করেছে। তখনও কিন্তু শিশির ও ভারতী খুব উজ্জ্বল ভাবেই রং দেখতে পাচ্ছিলো। এটার কারণ হচ্ছে, যে স্নায়ুগুচ্ছ দিয়ে পর্দ্দার আলো দৃষ্টিকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয় সেগুলো যদি কোন কারণে ক্লান্ত থাকে তা হ'লে আলোর ধাক্কা দিয়ে যে ঢেউ উঠেছে তাও মিলিয়ে যেতে অনেক দেরী লাগবে।

ঐ থেকেই বুঝতে হবে ভারতীদের স্নায়ুগুচ্ছ অতিরিক্ত ক্লান্ত আছে। যেমন একটা সূচ দিয়ে গায়ের একটা জায়গায় ফুটিয়ে দিলে—অমনিই একটা তীব্র যন্ত্রণা বোধ করলে সেই ফোটানো জায়গাটায়। সূচ ত' অনেকক্ষণ তুলে নিয়েছো কিন্তু তার ব্যথা বা ব্যথার মত ভাবটা কেটে যেতে খানিক সময় লাগে। আর যার স্নায়ু দুর্ব্বল বা আড়ষ্ট তার ব্যথায় অনুভূতি থাকেও অনেকক্ষণ। চোখের স্নায়ুর ক্লান্ত ভাব বা দুর্ব্বলতার পরিণতি হয় চোখে ভাল দেখতে না পারা বা দৃষ্টিক্লান্তি—অর্থাৎ খানিকক্ষণ বেশ দেখবার পর সব জিনিষ যেন ঝাপসা হয়ে আসে; আর মাথায়, চোখে, কপালে ব্যথা বা অস্বস্তির ভাব হয়।

সব জিনিষের মত মনটাকেও অতিরিক্ত খাটালে সে ক্লান্ত হয়। তাই তারও বিশ্রাম দরকার। সব রকম কষ্টদায়ক চিন্তা থেকে মনকে অব্যাহতি দিয়ে কিছুক্ষণ তাকে আনন্দের পরিবেশের মধ্যে রাখলে তবেই সে পায় বিশ্রাম।

কারুর কারুর এই মনের ক্লান্তি রোগ বিশেষে এসে দাঁড়িয়েছে। যেমন মাথা ধরা, অল্প কারণেই রেগে যাওয়া, খিটখিটে মেজাজ হওয়া, কিছু মনে রাখতে না পারা, অবাধ্য হওয়া, বিকৃত প্রকৃতি, সৌজন্যের অভাব, নির্জ্জনপ্রিয়তা, সব সময়েই চিন্তান্বিত থাকা ইত্যাদি।

তোমাদের মধ্যে যারা দৃষ্টিক্লান্তিতে ভুগছো, তারা চোখ বুজে ঐ রামধনু দেখার ব্যাপারে মনে করবে। আগেই দেখেছো চোখ বন্ধ করলে অন্ধকার—কেবল কালো দেখা যায়। আসলে কিন্তু সকলে তা দেখো না। কালো দেখ বটে কিন্তু সে খুব ঘন নয়—পাতলা। তার মাঝে মাঝে যেন আলোর ফুলকি এসে পড়ে। আমাদের দেখতে হবে কালো—গাঢ় কালো। যখনই আমরা ঐ রকম গভীর কালো দেখতে পাবো তখনই চোখের স্নায়ুর অবসাদ চলে গিয়ে আবার সতেজ হবে। ফলে দেখবারও যথেষ্ট উন্নতি হবে। মাথা ব্যথা, অস্বস্তি ভাব তখন সব চলে যাবে। এর জন্য তোমরা নিয়মিত অভ্যাস করবে চোখ বন্ধ করে কালো দেখতে—দিনে দুই-তিন বার। শরীরটাকে বেশ ঢিলে করে আরামে বসবে। দুই চোখ বুজে তাকে হাতের চেটো দিয়ে বন্ধ করবে—যেন নাকে ও চোখে অযথা চাপ না পড়ে। তারপর কালো দেখতে চেষ্টা না করে কোন দ্রুত গতিশীল অথচ সুখকর চিন্তায় ৫।৭ মিনিট কাটিয়ে দেবে।—যেমন নৌকোর বাচ্ খেলা, ফুটবল, হকি খেলা, ট্রেনে ভ্রমণ ইত্যাদি। নিয়মিত এই রকম অভ্যাস করলে মন আপনিই প্রফুল্ল হবে, কাজে একাগ্রতা বাড়বে আর সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিশক্তিরও উন্নতি হবে।

দেখবার স্বাভাবিক নিয়ম পালনের উপরেই দৃষ্টিশক্তির উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে বহুলাংশে।

তাজ্জব

রুক্ষ মাঠের মধ্যে বড় বড় গর্ত্তগুলো দেখে নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে ওগুলি বুঝি কোন বুনো জানোয়ারের গর্ত্ত। কিন্তু জানোয়ার নয়, মানুষেরই থাকবার গর্ত্ত ওগুলো। ট্রগ্‌লোডাইট নামে এক জাতের মানুষ এই গর্ত্তে বাস করে। গর্ত্তগুলি তাদের গৃহের প্রবেশপথ।

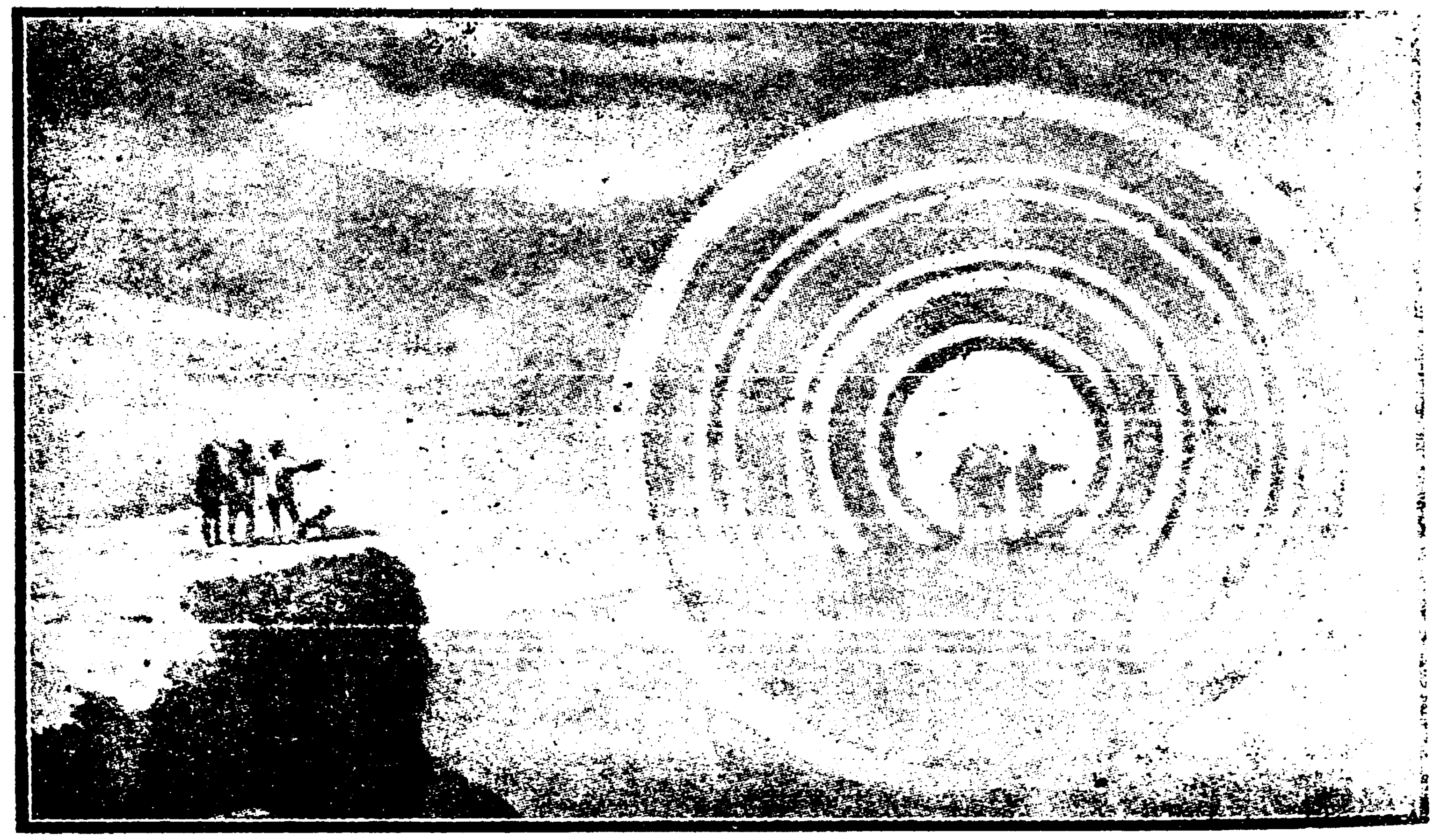

প্রকৃতির রাজ্যে অনেক সময় অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। ওপরে দেখ, পাহাড়ের ওপর একদল লোক দাঁড়িয়ে, আর আকাশে মেঘের গায়ে তাদের ছায়া। ঘটনাটি ঘটেছিল জার্মেনীতে।

সিবাষ্টিয়ান্ গঞ্জালেস্

শ্রীহিরণকুমার গুপ্ত

ইতিহাসের পাতায় বড় বড় রাজা-রাজড়াদের গল্পই তোমরা পড়েছ। কিন্তু তেমন বড় না হ'লেও এমন অনেক লোকের হারানো কাহিনীও কিন্তু সেখানে আছে যা নাকি রূপকথার মতই রোমাঞ্চকর। ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার এমনি একটি কাহিনীই আজ তোমাদের শোনাব।

সে খুব বেশী দিনের কথা নয়, ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা সোনার দেশ ছিল তখন আমাদের এই বাংলা। আর এরই পূর্ব্বপ্রান্তে, বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁসে, ছিল এক স্বাধীন রাজ্য। রাজ্যের নাম 'চন্দ্রদ্বীপ'। চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের ছিল অগাধ প্রতিপত্তি। কিন্তু ক্ষমতা থাকলে কি হবে, রাজা রামচন্দ্রের মনে একটুও শান্তি ছিল না। দূর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আরাকানের মগ দস্যুরা তাঁর রাজ্যে এসে ভারী উৎপাত করত। তাঁর প্রজাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করত; তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেশের ভেতর হত্যা আর অত্যাচারের তাণ্ডব লীলা বইয়ে দিত। কিন্তু কি করা যায়! এরা আসত যেমন ঝড়ের বেগে, তেমনি দুরন্ত হাওয়ার মতই হঠাৎ আবার উড়ে চলে যেত।

সেদিন রাজা রাজসভায় বসে আছেন। খবর এল এক বিদেশী যুবক রাজদর্শনপ্রার্থী। রাজ-আজ্ঞায় যুবককে তখনই দরবারে নিয়ে আসা হ'ল। রাজা দেখলেন, ছিন্ন ও মলিন বস্ত্রপরিহিত এক যুবক তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাজা আশ্চর্য্য হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—'তুমি কে? কী প্রয়োজনে এখানে এসেছ?'

যুবকটি বলল—'মহারাজ, আমার নাম সিবাষ্টিয়ান্ গঞ্জালেস্। সামান্য একজন পর্ত্তুগীজ বণিক্ আমি। পেটের দায়ে সৈনিকের কাজ নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলাম। কিন্তু সৈনিকের বৃত্তিতে আমার পেট ভরল না। শেষে এ কাজ ত্যাগ করে সন্দ্বীপে গিয়ে আমি ব্যবসা সুরু করলাম। কিছুদিন বাদেই দেখলাম আমার অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। ভাবলাম ঈশ্বর বুঝি এবার মুখ তুলে চেয়েছেন। কিন্তু……'

—'কিন্তু কী? বল। তুমি আমার কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য এসেছ?'

—'না, মহারাজ! অর্থের আমার কোন প্রয়োজন নেই। দারিদ্র্যের কষ্টকে আমি ভয় করি না। আমি চাইতে এসেছি 'প্রতিশোধ'।'

—'প্রতিশোধ! সে কি?'

—'হ্যাঁ, মহারাজ! প্রতিশোধ-ই আজ আপনার কাছে আমার কাম্য বস্তু।' তারপর সেই পর্ত্তুগীজ বণিক্ বলে চলল তার অত্যাচারের কাহিনী। বলল, কি করে মগ দস্যুদের হাতে তার সমস্ত কিছু লুণ্ঠিত হয়েছে, তার আত্মীয়-স্বজন একে একে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে, আর সে নিজে কোনক্রমে পালিয়ে এসেছে চন্দ্রদ্বীপের রাজার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে। এ সাহায্য অন্য কোন সাহায্য নয়,—এ সাহায্য শক্তি দিয়ে সাহায্য।

বিদ্যুতের মত মহারাজের মনে একটা মতলব উঁকি মেরে গেল। রামচন্দ্রের তীক্ষ্ণ কুটিল চোখ ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সিবাষ্টিয়ান্‌কে রাজা ডেকে নিলেন তাঁর গোপন মন্ত্রণা-কক্ষে।

তারপর কিছুদিন যেতে না যেতে সবাই দেখলে যে চন্দ্রদ্বীপের এক বিরাট রণতরীর বহর সমুদ্রের বুকে ভেসে পড়েছে কোন্ অজানার উদ্দেশ্যে—আর তার নেতৃত্ব করছে একজন বিদেশী যোদ্ধা। সে হচ্ছে সিবাষ্টিয়ান্ গঞ্জালেস্।

গঞ্জালেস্ এককালে সৈনিক ছিল। আরাকানীদের আক্রমণের রীতিনীতি, যুদ্ধের কলা-কৌশল—অনেক কিছুই সমুদ্রের সেই নির্জ্জন দ্বীপে বসে সে এতদিন লক্ষ্য করেছে। আজ সে অভিজ্ঞতা তার কাজে লাগল। গঞ্জালেস্ আচম্‌কা এসে সন্দ্বীপ আক্রমণ করল। আরাকানীরা এজন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সেই হঠাৎ আক্রমণের ধাক্কায় তারা সহজেই আত্মসমর্পণ করল। তারপর চলল সেই পূর্ব্ব অত্যাচারের নির্ম্মম প্রতিশোধ। আরাকানীদের রক্তে সমুদ্রের জল রাঙ্গা হয়ে গেল। সন্দ্বীপ থেকে তাদের চিহ্ন বিলোপ করে দিল গঞ্জালেস্।

সন্দ্বীপ জয় করে গঞ্জালেস্ এবার তার ক্ষমতা বিস্তার করতে সুরু করল আশেপাশে সমুদ্রের বুকে। তার অপ্রতিহত প্রভাবে মগ দস্যুদের যথেচ্ছ আক্রমণ বন্ধ হয়ে গেল। চন্দ্রদ্বীপের লোকেরা রক্ষা পেল এই জলদস্যুদের পৈশাচিক অত্যাচারের হাত থেকে। রাজা রামচন্দ্রও খুসী হয়ে সন্দ্বীপের অর্দ্ধেক আয় ছেড়ে দিলেন গঞ্জালেসের হাতে - তার এই বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ।

কিন্তু দিন যেতে না যেতেই গঞ্জালেস্ হয়ে উঠল ক্ষমতালোলুপ। বড় বড় জাহাজ চেপে সে প্রায়ই আরাকান রাজ্যে গিয়ে হানা দিতে সুরু করল। সমুদ্রের বুকে তার হ'ল একাধিপত্য। কিন্তু হায়! মানুষের শক্তি যতই বেড়ে ওঠে তার বিবেকও ক্রমশঃ অন্ধ হয়। গঞ্জালেসের বেলাও এর ব্যতিক্রম হ'ল না। শক্তিমদে মত্ত গঞ্জালেস্ ক্রমে নিজেকে সন্দ্বীপের অধীশ্বর বলে ঘোষণা করল। শুধু তাই নয়, চন্দ্রদ্বীপের রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সে হঠাৎ সাহাবাজপুর পরগণা আক্রমণ করে তা দখল করে নিল।

নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার ফল কিন্তু গঞ্জালেস্ হাতে হাতেই পেল। কালের চাকা যে ঘুরে চলে সে কথা গঞ্জালেস্ ভুলে গিয়েছিল। আরাকান-রাজ দেখলেন এই সুযোগ। চন্দ্রদ্বীপের রাজার কাছ থেকে গঞ্জালেস্ এবার আর কোন সাহায্যই পাবে না।

তাই অনেক সৈন্যসামন্ত জোগাড় করে এবার তিনি মরিয়া হয়ে সন্দ্বীপ আক্রমণ করলেন। ফল পেতেও দেরী হ'ল না। গঞ্জালেস্ বিপদ্ বুঝে চন্দ্রদ্বীপের রাজার কাছে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে সাহায্য চাইল। কিন্তু বৃথা। তার কোন কথাই কানে তুললেন না রাজা রামচন্দ্র।

তারপর যে ভীষণ যুদ্ধ হ'ল সে যুদ্ধে পর্ত্তুগীজরা সম্পূর্ণ রূপে হেরে গেল আরাকানীদের হাতে। যুদ্ধশেষে আরাকান-রাজ গঞ্জালেসের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে দেশে চলে গেলেন।

এই যুদ্ধের ফলেই অনেক পর্ত্তুগীজ সন্দ্বীপ থেকে পালিয়ে চন্দ্রদ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তোমাদের একটা কথা বলতে প্রথমেই ভুলে গেছি. যে পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল জেলাতেই ছিল তখনকার এই চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য। বার ভুঁইয়াদের অন্যতম বীর কন্দর্পনারায়ণ ছিলেন এই চন্দ্রদ্বীপের রাজা; রামচন্দ্র তাঁরই বংশধর। আজও তাই বরিশাল জেলার অনেক জায়গায় বহু পুরাতন পর্ত্তুগীজ পরিবারের চিহ্ন পাওয়া যায়।

সিবাষ্টিয়ান্ গঞ্জালেসের কাহিনী ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেছে। কিন্তু যে সন্দ্বীপে এই নিরাশ্রয়, সম্বলহীন বিদেশী যুবকের এক গৌরবময় জীবন কেটেছে সে সন্দ্বীপের মাটিতে হয়ত এখনও তার রক্তের দাগ মুছে যায় নি। তার চরিত্রের দোষ-গুণের সমালোচনার প্রয়োজন নেই। বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত শাস্তিই সে পেয়েছে। কিন্তু মগ দস্যুদের অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে চন্দ্রদ্বীপের অধিবাসীরা যে তার জন্যই অনেকটা রক্ষা পেয়েছিল এ কথা ভুললে চলবে না। কথাটা সে যুগের বাঙ্গালীদের কাছে নেহাৎ সামান্য ছিল না।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

প্রিয়দর্শী অশোক—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। প্রাচী পুস্তক প্রতিষ্ঠান, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৮০

সম্রাট অশোক দু' হাজার বছরেরও আগেকার লোক, কিন্তু তাঁর মত মহান্ সম্রাট্—অত বড় আদর্শ নৃপতি আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর আর কোথাও হয়েছেন কিনা সন্দেহ। অথচ এই অশোক সম্বন্ধে আমাদের অনেকেই, পাঠ্যপুস্তকের ২।৪ কথা ছাড়া, বিশেষ কিছুই জানি না। শক্তিশালী শিশুসাহিত্যিক ধীরেন্দ্রলাল ছোটদেরকে সেই অশোকের গল্প শুনিয়েছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মনোরম ভঙ্গীতে। প্রত্যেক ছেলেমেয়ের বইখানা পড়ে দেখা উচিত।

উগ্র গুম্ফা—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৮০

এটি একটি রহস্যঘন কিশোর-উপন্যাস। ধীরেন্দ্রলালের অপেক্ষাকৃত এ যুগের লেখাগুলির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা এ বইএ তাঁর বৈচিত্র্যের পরিচয় পাবেন। বইখানির গল্পাংশটি সুন্দর, এক নিঃশ্বাসে শেষ না ক'রে ওঠা যায় না।

মহাকাল—কাহিনী—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, নাট্যরূপ—শ্রীপ্রবোধ সরকার। প্রাচী পুস্তক প্রতিষ্ঠান। ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৷৴০

ছোটদের ঐতিহাসিক নাটক। ধীরেন্দ্রলালের "অসি বাজে ঝন্ ঝন্" নামে সুন্দর বইখানির সঙ্গে হয়তো অনেকেই পরিচিত; বইখানা রামধনুতেই ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল। মহাকাল তারই নাট্যরূপ। ভাইবোনে একসঙ্গে অভিনয় করবার উপযোগী এমন একখানি সুন্দর বই পেয়ে ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে।

ভূত ও অদ্ভুত—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী। রীডার্স কর্ণার, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬। দাম ১৷৷০

শিবরাম বাবুর নতুন হাসির গল্পের সংগ্রহ। কলমের টানে, শব্দের কারিকুরিতে গল্পগুলি যেন এক একটি জমানো হাসির টুকরো—বিশেষ ক'রে সেই গল্পগুলো যার গল্পাংশও ভাষার মতই মজাদার। প্রথম গল্পটি—এক ভূতুড়ে কাণ্ড এক কথায় অনবদ্য বলা যেতে পারে। শৈলবাবুর আঁকা ছবিগুলি গল্পের রস আরও বাড়িয়েছে। তবে বইএর কাগজটা বাদামী রংএর হওয়ায় বইএর অঙ্গসজ্জা খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ম্যানিয়া—শ্রীকুমারেশ ঘোষ। রীডার্স কর্ণার, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬। দাম ১৲

একখানি স্ত্রী-ভূমিকা ও দৃশ্যপটবর্জ্জিত হাসির নাটক। নাটকের যা প্রাণ—সাধু ভাষায় যাকে বলে 'সংলাপ'—গ্রন্থকার তা'তে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছেলেরা বইখানি অভিনয় করলে নিজেরা আনন্দ পাবে, অপরকেও হয়তো তার ভাগ দিতে পারবে।

ক'টা বাজলো—মিখাইল ইলিন। অনুবাদক শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী। ঈগল পাবলিশার্স, কলিকাতা। দাম ১৷৷০

একখানি রুশ বইএর অনুবাদ। সেই আদ্যিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত মানুষ সময় মাপবার জন্য কত রকম ঘড়িই না ব্যবহার করেছে! ঘড়ির সেই বিচিত্র কাহিনী মনোরম ভঙ্গীতে এ বইএ লেখা হয়েছে। অনুবাদকের ভাষাতেই বলি—"বিজ্ঞানের কঠিন তথ্যকাহিনি যে কত সহজে—কত সুন্দর ক'রে কিশোর মনের সম্মুখে তুলে ধরা সম্ভবপর তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'ল এ বইটি।" এমন একখানি সুন্দর বই বাংলার ছেলেমেয়েদের হাতে উপহার দেওয়ায় অনুবাদকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। অনুবাদ বেশ স্বচ্ছ, আর তেমনি সুন্দর চিত্রকার মজাদার ছবিগুলি।

ফটিকে—শ্রীঅপর্ণাপ্রসাদ সেন লিখিত, শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় চিত্রিত। গ্রন্থজগৎ, ৫২।৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৷৴০

ফটিকে বাংলা দেশের এক চাষীর ছেলে। তার পরিচয় লেখায় ও ছবিতে খুব ছোট্টদের মত ক'রে এই বইএ দেওয়া হয়েছে। এক পাশে বড় বড় অক্ষরে লেখা, অন্য পাশে সেই ঘটনারই পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি। ছবিগুলি যেমন সুন্দর, বইখানির নূতনত্বও তেমনি সকলকে আকর্ষণ করে। ছোট্ট ছেলেমেয়েরা বইখানি পেলে খুবই খুশী হবে।

ছোটদের সচিত্র কৃত্তিবাস—গ্রন্থজগৎ, ৫২।৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৷৴০

মহাকবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ-কাহিনী সংক্ষেপে লিখে ছোটদের উপযোগী ছবি দিয়ে চিত্রিত করা হয়েছে। আর্ট পেপারে সুদৃশ্য রঙ্গিন কালিতে বড় বড় অক্ষরে ছাপা; ছবিগুলিও নিপুণ ভাবে আঁকা। ছোটদের পক্ষে বইখানি লোভনীয় হবে সন্দেহ নেই।

চলার পথে—সম্পাদিকা শ্রীঅঞ্জলি চক্রবর্ত্তী, লেখা-শ্রী, সাহিত্য-কুশলা। ৯, চক্রবেড়ে রোড সাউথ, কলিকাতা ২৫। এটি "বঙ্গভারতী"র মুখপত্র একটি মাসিক পত্র। কিন্তু পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, ১৩৫৫—এই তিন মাস এক সঙ্গে বেরিয়েছে। প্রধানতঃ নতুন লেখক-লেখিকাদের রচনা এতে স্থান পেয়েছে। পত্রিকাখানি দীর্ঘায়ু হ'লে আনন্দিত হব।

ছেলেধরা

শ্রীশামুক

সেদিন আমার এক বন্ধু কলকাতায় গিয়েছিল বেড়াতে। ফিরে এসে প্রথমে তো কিছুই বলতে চায় না। শেষে অনেক পীড়াপীড়ি করাতে তার অভিজ্ঞতার কথা যা বললে তা সকলকে শোনাবার মত।

বন্ধুটি ছোট ছেলেমেয়ে বড় ভালবাসে। শুধু নিজের নয়, অপরদের ছেলেপিলে নিয়েও খেলা করা, আদর করা একটা বাতিক বিশেষ। ওর সংগে হেঁটে বেড়াতে বেরুলে কতবার যে থমকে দাঁড়িয়ে যেতে হবে তার কোন হিসাব থাকে না। ভারি বিরক্ত হয়েছি কত দিন।

ছোটদের দল সব বন্ধু কিনা, একবার দেখা হয়ে গেলেই, ব্যস্, আর কে পায়? কত আগড়ম বাগড়ম কথা হবে, মজার গল্প হবে, হাসি-তামাসা হবে। বিশেষ আনন্দের কিছু থাকলে দু'-এক ঝলক ধেই ধেই নাচও হয়ে যাবে পথের মাঝখানে, সকলের চোখের সামনেই। বাচ্চাদের সংগ পেলে সময় ওর কেটে যায় হু হু করে, কোন খেয়াল থাকে না একটুও।

এ হেন মানুষ একদিন সকালে কলকাতার পিচ-ঢালা পরিষ্কার পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে খুশি মনে। একটা গলি পেরিয়ে আর একটি গলিতে পৌঁছে দেখে দু'টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হাত ধরাধরি ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথ চলতে সুরু করলো। সম্ভব পিঠোপিঠি ভাই-বোন হবে বা। অনর্গল বকতে বকতে, হেলতে দুলতে দু'জনে চলে, আর আমার বন্ধু ওদের পিছনে যায়।

ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দু'জনার মিষ্টি কথা ভারি ভাল লাগে। সবচেয়ে ভাল লাগে ওদের মজার নানা অংগভংগী। খানিকটা পথ গিয়ে একবার মনে হ'ল বটে যেন পাড়ার

দু'-চারজন ধেড়ে ধেড়ে ছেলে তার পিছু নিয়েছে কিন্তু অবিশ্বাসের হাসি হেসে মন থেকে তা তাড়িয়ে দিল।

চোর নয়, বাটপাড় নয়, যে তার লেজের নিশানা নিয়ে কেউ ঘুরে বেড়াবে, নষ্ট করবে বৃথা সময়। অমন নিষ্কর্মার দল কত আছে। কোন কাজ নেই, কর্ম নেই, তাই বেড়াচ্ছে ঘুরে। বিশেষ ক'রে কলকাতার মতন বড় শহরে এদের মত অনেক থাকা কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়।

আরো খানিকটা গিয়ে বন্ধুর বড় লোভ হ'ল খোকাখুকুর সংগে একটু আলাপ ক'রে নেয়। একটু পা চালিয়ে কাছে গিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে, বললো,—"তোমার নাম কি ভাই খোকন?—কোথায় যাচ্ছ?—তোমার নামটি কিগো খুকুরাণী?"

যেই না এই বলা, ব্যস, শহরের ওপরে এক মহাপ্রলয় ঘটে গেল। ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মিষ্টি কথা বলে যে কেউ অমন বিপদে কোনদিন পড়েছে আমি তো জীবনে শুনি নি!

পিছনের ধাড়ি ছেলের দল কি করলো জানো? হঠাৎ এক সংগে এক দমে চেঁচিয়ে উঠলো,—"এই সেই ছেলেধরা!—ছেলেধরা এসেছে—ছেলেমেয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে!"

কী অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা বল দেখি! একজন ভদ্রলোক পথে চলতে চলতে ফুটফুটে দু'টি ছেলেমেয়ের সংগে একটু কথা কয়েছে আর প্রাণপণে চীৎকার ছেলেধরা—ছেলেধরা!

ভীষণ চমকে বন্ধুর মনে পড়ে যায়, হ্যাঁ, আগের দিন খবরের কাগজে দেখেছে বটে যে ভয়ানক গুজব—শহরে নাকি ছেলেধরার উৎপাত ভারি বেড়েছে! ছেলেমেয়ে সব ঝুলিতে ভরে লোপাট করে দিচ্ছে! সন্দেহ ক'রে কয়েক জনকে ধরে খুব পিটিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু বেশী ভাববার সময় আর পাওয়া গেল না। এদিকে ষণ্ডাদের চীৎকার একটানা চলেছে, আর সটাসট্ দু'পাশের বাড়ি থেকে অনেক লোক বেরিয়ে আসছে একেবারে মার-মূর্তি হয়ে।

ওরা যে খাতির ক'রে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে জামাই-আদর করবে না তা চেহারা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। খুব তাড়াতাড়ি বাংলা ভাষায় শর্ট হ্যাণ্ডেও যদি বোঝাতে চেষ্টা করা হয় যে সে ছেলেধরার 'ধ'ও নয় তো সেই সময়টুকুর মধ্যেই ওদের সমবেত প্রহারের দাপটে অংগ-প্রত্যংগের ছোট বা বিকৃত সংস্করণ হয়ে যাওয়ার প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনা। নিখরচায় চাঁদা ক'রে চড়াবার সুযোগ পেলে কি আর হাত গুটিয়ে বসে থাকে কেউ? বিশেষ ক'রে ঐ কলকাতার মতন শহরে?

সুতরাং এমন সংকটাপন্ন অবস্থায় সকলে যা করে আমার বন্ধুও তাই ক'রে বসলো আর মুহূর্তও দেরি না ক'রে। উপমা দিলে বলতে হয় যেন হঠাৎ ধনুকের জ্যা ছেড়ে তীর ছুটলো বাতাসে। বেচারা কোনদিন বিষম ভয় পেয়ে স্বপ্নেও এত জোরে দৌড়ায় নি।

গলির গলি তস্য গলি দিয়ে এঁকেবেঁকে প্রাণপণে প্রাণভয়ে দৌড়ায় আর পিছনে

দুড় দুড় ক'রে তাড়া ক'রে আসে—ঐ, ধর ধর। দুষমণদের দলটি যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে তা ওদের বেদম কোরাস্ চীৎকারে মালুম হ'তে কষ্ট লাগে না।

গলির এক জায়গায় দু' ফ্যাকড়ার একটির ভেতর দিয়ে কিছুক্ষণ ছুটে মনে হ'ল আওয়াজ ভুল ক'রে অন্য পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই মহা সুযোগ। কিন্তু পা ভীষণ ভারী হয়ে গেছে, তোলা যায় না। বুকের ভেতর ঘা পড়ছে দমাদম্, এখুনি ফেটে চৌচির হয়ে গেল বুঝি!

যা হয় হোক গে। প্রাণ যাক আর থাক, একটু জিরিয়ে না নিলে আর এক পাও এগুনো একেবারেই অসম্ভব। একটি খোলা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে দরজার পাশে লুকিয়ে বন্ধু কুকুরের মতন হাস্ হাস্ ক'রে হাঁফাতে থাকে।

শরীর একটু ধাতস্থ হয়েছে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস আবার প্রায় স্বাভাবিক ভাবে পড়তে সুরু করেছে, ঠিক এমনি সময় এক নতুন বিপদ্ সামনে এসে হাজির।

লাল গামছায় গিঁঠ বেঁধে থলি বানিয়ে বাজার যাবার জন্যে বাড়ির কর্তা বেরুচ্ছিলেন, দরজার আড়ালে মানুষ দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

বন্ধু বেশ কিছু লজ্জা ও অপ্রস্তুতের মধ্যে পড়ে গেল বৈকি। ভাল জামা-কাপড় প'রে দিনের বেলা অপরের বাড়ির ভেতর লুকিয়ে দাঁড়িয়ে। ঘামের স্রোত কমে এসেছিল, আবার প্রবল ধারায় বইতে সুরু করে।

দারুণ ভ্রূকুটি ক'রে কর্তা জিজ্ঞেস করেন,—"কি চান, কাকে চান আপনি?"

—"আজ্ঞে, পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা মিছামিছি আমার পেছনে তাড়া করেছে"—রুমালে কপাল মুছতে মুছতে আমতা আমতা ক'রে কোন রকমে উত্তর দিতে হয়।

গৃহিণী যে কৌতূহল-বশে অন্দরের দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন কর্তা বুঝতে পারেন। তাই সাহসে আরো গলা চড়িয়ে এবারে ধমকে বলেন,—"কোন ভদ্রলোককে ছেলেরা শুধু শুধু তাড়া করবে কেন? ওদের কি করেছেন আপনি?"

—"আজ্ঞে, মিছামিছি আমাকে সন্দেহ করেছে ছে—লে—ধ—রা।"

গৃহিণীকে চোখে দেখা গেল না কিন্তু তাঁর ভীষণ আওয়াজ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ফেটে পড়ে হঠাৎ। শুধু দু'-একটি বাড়ি নয়, সারা মহল্লাকে যে তাঁর জরুরী ঘোষণাটি জানিয়ে দিতে ব[illegible]কর তা স্পষ্টই বোঝা গেল।

—"ওরে বাবারে, ওরে মারে,—আমার কী সর্বনাশ হ'ল রে!—ছেলেধরা—ছেলেধরা এসেছে বাড়িতে! ছেলেপিলে ধরে নিয়ে যাবে সব!—ওরে ও রঞ্জু-মঞ্জু-জটাই-মটাই-দীপু-অপু-ভোম্বল,—তোরা সব কে কোথায় আছিস চলে আয়, চলে আয় চট ক'রে আমার কাছে। ছেলেধরা এসেছে, ধরে নিয়ে যাবে—ওরে বাবারে!—"

অত চড়া সুরে অতগুলি কথা যে কেউ অমন তাড়াতাড়ি-বার বার বলে যেতে পারে—জানি কারুর পক্ষেই এ বিশ্বাস করা অসম্ভব যদি তার আগে থেকে মাদ্রাজী সা—রে—গা—মা শোনা না থাকে। আমার বন্ধু বহুবার দক্ষিণ ভারত বেড়িয়ে এসেছে

তবুও প্রথম ধাক্কায় তার মাথার ভেতরটা ঝনাৎ করে উঠলো—ভেতরের কোন শির-টির ছিঁড়ে গেল যেন!

—আর কর্তা? দুর্বাসার অভিশাপের ছবিটি নিশ্চয় সকলে দেখেছ? যেখানে সেই বদ্‌রাগী মুনি আঙুল তুলে শকুন্তলাকে দারুণ অভিসম্পাত করছেন?

কর্তার এক হাতে গামছার ঝুলি, অন্য হাতে আঙুল দেখাচ্ছেন দরজার বাইরে রাস্তার দিকে, আর নির্বাক্ ভাবে থরথর কাঁপছেন ভয়ানক। ঐ কাঁপুনি রাগের, না ভয়ের, না ঐ দুর্দান্ত আওয়াজের ধাক্কা-লাগা স্পন্দন, অল্প সময়ের মধ্যে সঠিক বোঝা গেল না।

এ অবস্থায় বন্ধু আমার আর করতে পারে কি? সড়াৎ ক'রে চৌকাঠ পেরিয়ে আবার দে ছুট। এক মুহূর্ত পথে দাঁড়িয়ে আন্দাজ ক'রে নেয় কোন্ দিক্ থেকে ডাকাতের দল হা-রে-রে-রে ক'রে এগিয়ে আসছে; তারপর উল্‌টো দিকে প্রাণভয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুট।

নেহাৎ পরমায়ু বাকি ছিল তাই বড় রাস্তায় পৌছে গেল আর সামনে পেল এক গড়িয়ে-চলা খালি ট্যাক্সি। লাফিয়ে উঠে গদির ওপর শুয়ে পড়ে কোন রকমে বলে ফেলে—"সিধা যাও জোরসে।"

আজকাল কলকাতার কথা উঠলে বন্ধু দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে,—"যাচ্ছি না আর সহজে, নেহাৎ ঠেকায় না পড়লে। আর যদি কোনদিন পথের মাঝে ঐ শহরের কুড়ি বছরের কম অচেনা ছেলে বা মেয়ের সংগে কথা বলি তো আমার নাম দিও বদলে।"

লেনিনের ঋণ

অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ

প্যারি সহর ফরাসী দেশের রাজধানী। সেখানে অনেক বিখ্যাত খাবারের দোকান আছে। এদের মধ্যে অনেকগুলো এত ভাল যে দেশ-বিদেশের লোকেরাও তাদের নাম জানে।

একদিন কাফে দ্য রদণ্ডে নামে এমনি একটা প্রসিদ্ধ খাবারের দোকানে একজন লোক এলেন। তাঁর চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে অনেক দিন তিনি পেট ভরে খেতে পান নি। একটা চেয়ারে বসে তিনি দোকানের একজন লোককে ডেকে তাঁকে কিছু ভাল খাবার দিতে বললেন। খাবার এল, বেশ আনন্দ করেই তিনি খাওয়া শেষ করলেন। এদিকে তাঁর কাছে পয়সাকড়ি কিছুই নেই।

তিনি দোকানের লোকটিকে ডেকে মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, "বন্ধু, তুমি ত' আমাকে এত ভাল ভাল সব খাবার দিলে, আমার কিন্তু দাম দেবার পয়সা নেই। রাজনীতির কাজের জন্য আমাকে আমার দেশ থেকে চলে আসতে হয়েছে। আমি এখন তোমাদের দেশের অতিথি। খাবারের দামটা তুমি আমাকে ধার দেবে না? ভবিষ্যতে এই ধার আমি তোমাকে নিশ্চয়ই শোধ দেব।" লোকটি ত' তাঁর কথা শুনে একেবারে অবাক্। কিন্তু তাঁর গলার স্বরে এমন একটা ভাব ও শক্তি ছিল যে খাবারের দামটা সে না দিয়ে পারল না।

এই আগন্তুকের নাম লেনিন। ১৯১৭ সালে রুশ দেশে এক ভীষণ বিপ্লব হয়। তার পর লেনিন রুশ দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'ন। এইবার লেনিন তাঁর পুরোনো ঋণের কথা মনে করে খাবারের দোকানের সেই দুঃসময়ের বন্ধুকে তাঁর আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে ঋণ শোধের অর্থ পাঠিয়ে দিলেন; আর তার সঙ্গে দিলেন একটি উপহার-দ্রব্য। লোকটি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেওয়া অর্থ ফেরৎ পাঠিয়ে দিল; বললে, "আমি এই অর্থ একজন কপর্দ্দকহীন, অনাহারী, রাজনৈতিক কারণে নির্ব্বাসিত লোককেই ঋণ দিয়েছিলাম; একটা বিশাল শক্তিশালী রাষ্ট্রের কর্ণধারকে ত' আমি কোন ঋণ দিই নি।"

টাকার ম্যাজিক

যাদুকর মিঃ গসেন

রামধনুর প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ, এবারে তোমাদের একটি ছোট্ট ম্যাজিকের কথা বলিব। খেলাটি খুবই সোজা, কেবল একটু অভ্যাস করিয়া লইয়া ভাল মত দেখাইলেই হইল। ইংরাজীতে এই খেলাকে বলে 'দি য়্যানিমেটেড্ কয়েন' বা জীবন্ত টাকা।

খেলাটি এইরূপে দেখানো হইয়া থাকে। যাদুকর প্রথমে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া দর্শকগণের নিকট হইতে একটি টাকা চাহিয়া লইয়া উহা তাঁহার এক হাতের

উপর রাখিলেন এবং অপর হাত তাহার উপর বুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ করিবার পর দেখা গেল যে টাকাটি যাদুকরের হাতের উপর দিয়া সর্ সর্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যাদুকর ঐ চলন্ত টাকাকে তাঁহার ইচ্ছামত থামিতে বা চলিতে এবং যে কোন অবস্থায় থাকিতে বলিলে টাকা তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে। সঙ্গের ছবিটি দেখিলেই বুঝা যাইবে কিরূপ বিভিন্ন অবস্থায় টাকাকে হাতের উপর রাখা হয়। টাকাটি লইয়া খানিকক্ষণ খেলা দেখাইবার পর উহা মালিকের নিকট দেওয়া হইলে দেখা যাইবে যে উহার মধ্যে কোনরূপ গোলমাল নাই, উহা একটি সাধারণ বাজার চলতি টাকা মাত্র।

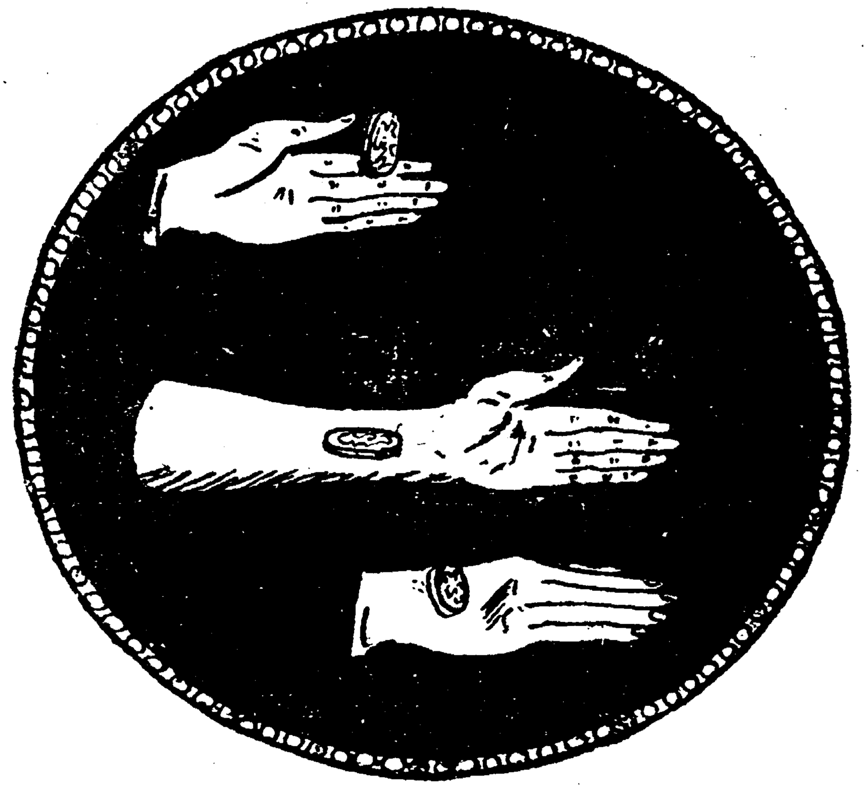

এবারে খেলাটি কি করিয়া দেখানো হয় তাহা বলিতেছি। যাদুকরের নিকট একপ্রান্তে মোম লাগানো একগাছি লম্বা চুল আছে। এই চুলের একদিক জামার বুকের বোতামের সহিত বাঁধা আছে, আর অপর দিক্‌টি (অর্থাৎ চুলের যে দিকে মোম লাগানো) আছে যাদুকরের হাতে। যখন যাদুকর দর্শকদের নিকট হইতে টাকা চাহিয়া লইয়া হাতে লইলেন তখন তিনি মোম লাগানো চুলটি টাকার গায়ে লাগাইয়া দিলেন। ব্যস্, আর কি, যাদুকরের কাজ হাসিল। তারপর সাবধানে একটু হাত নাড়াইয়া টাকাটাকে হাতের উপর চালানো এমন কিছু কঠিন নয়।

খেলা দেখানো শেষ হইলে টাকা ফেরৎ দিবার সময়ে কিন্তু কৌশলে মোম লাগানো চুলটা খুলিয়া লইতে হইবে। আর একটা কথা, ম্যাজিকটি দেখাইবার আগে বেশ ভালো করিয়া অভ্যাস করিয়া লইয়া তবেই দেখাইবে।

হৈমন্তী

শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী

হেমন্তের সকাল বৈকাল!
স্বর্ণবর্ণ ধান্যশীর্ষগুলি কি আনন্দে ওঠে তুলি তুলি,
ও ছন্দ কি আনিল গোধূলি,—স্বপ্নভরা প্রভাতের কাল?
কূলে কূলে ভরা নদী চলে, তীরে তীরে কাশ-বনে হাসি,
নীলে নীলে সুনীল আকাশ, কত যেন ভালবাসাবাসি!
পূর্ব্ব আর পশ্চিম আকাশ— রবি যবে ওঠে, ডুবে যায়,—
বর্ণে বর্ণে সুষম মহিমা, চিত্রলেখা চলে কার তায়!
একখানি নর্ম্ম কবিতায় প্রকৃতির প্রীতির প্রকাশ,
আনন্দের এই মধুক্ষণ— স্নেহস্নিগ্ধ হেমন্তের মাস।
এই হেমন্তের মাসে ওরে, দেখে যারে পল্লীরাণী মাকে,
সন্তানের ক্ষুধা মিটাইতে মার প্রাণে কি অমৃত থাকে!
মধু দিয়ে রচিবি যাহারা এ দেশের দৃপ্ত ভবিষ্যৎ,
আয় তোরা, যদি দেখে যাবি কোথা তার সুবিস্তার পথ!
সোনার ধানেতে ভরা মাঠ, হেমন্তের সকাল বৈকাল,
ছন্দে ধরা পড়েছে অমৃত, রংএ রচা স্বর্ণ স্বপ্নজাল!

আড়ি

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

আড়ি—আড়ি—আড়ি!
তিন বছরের মিন্টুরাণী মুখটি ক'রে হাঁড়ি
দস্যিপনা শিকেয় তুলে ফিরছে ফাঁকে ফাঁকে,
কয় না কথা কারুর সনে—চুপটি করে থাকে।
ডাকলে সাড়া দেয় না—থাকে ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে,
কখনো বা দাঁত খিঁচিয়ে একসা করে মেয়ে।

আড়ি—আড়ি—আড়ি!
গড়াগড়ি যাচ্ছে ধূলোয় সাধের হাওয়া-গাড়ী।
খোকা পুতুল ঘুমোয় কোথা—কেউ দেখে না তারে,
আদর খেতে পুষি বেড়াল মিথ্যে খোঁজে কারে।
টুনটুনিটা শিরীষ-ডালে মিছেই দিয়ে শিষ
মিন্টুরাণীর কান দু'টোতে ঢালছে যেন বিষ।

আড়ি—আড়ি—আড়ি!
তোমরা বলো এটা কি নয় মায়ের বাড়াবাড়ি?
নন্তুটা তো এত্তোটুকুন—কথা বলতে নারে,
মায়ের চুমা একচেটে সে করবে একেবারে!
সবটা সোহাগ একলা পাবে—হোক না আপন ভাই,
মিন্টুরাণী মায়ের সাথে করলো আড়ি তাই।

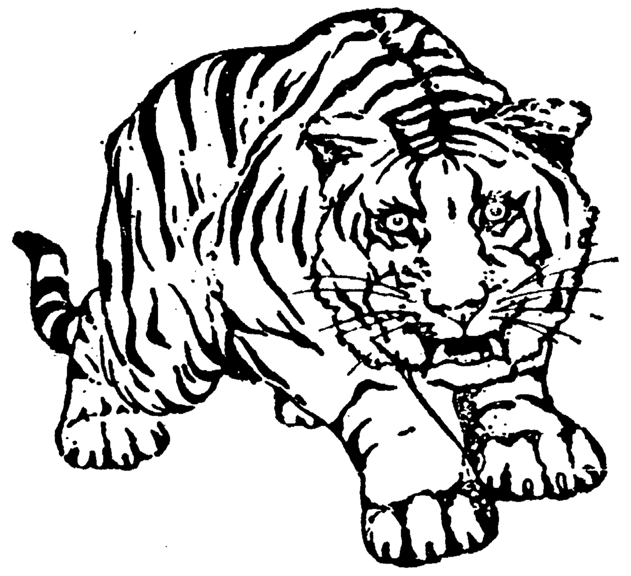

বিক্রমশিলা

প্রাচীন ভারতের অনেক গৌরবময় কীর্ত্তির কথা আমরা ভুলে যেতে বসেছি। এমন কি, অনেক শিক্ষিত লোকও এদের সকলকার খোঁজ রাখেন না। সেদিন আমাদের মধ্যে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমাদের মধ্যে ছিলেন একজন ডাক্তার, একজন মোটা মাইনের সরকারী চাকুরে আর একজন শিক্ষাব্রতী (কলেজে বিজ্ঞান পড়ান)। দেখা গেল, ডাক্তার এবং সরকারী চাকুরেটি বিক্রমশিলার নামও শোনেন নি কোন দিন। অধ্যাপকটি শুধু নামই শুনেছেন কিন্তু তার বেশী আর কিছুই জানেন না। দেখে বড় দুঃখ হ'ল। মনে হ'ল তোমাদের মধ্যেও হয়তো অনেকে এর কথা জান না। তাই ও সম্বন্ধে ২।৪ কথা বললে বোধ হয় মন্দ হবে না।

তোমরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা হয়তো জান। বিক্রমশিলাও ছিল ঐ রকম একটি বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়। অবশ্যি এখন আর তার চিহ্ন মাত্র নেই। এমন কি, এই বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় ছিল তা নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে এখন এক রকম ঠিক হয়েছে যে এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভাগলপুর জেলায়। ভাগলপুর থেকে মাইল পঁচিশেক দূরে পাথরঘাটা ব'লে একটা জায়গা আছে—যার প্রাচীন নাম বিক্রমশিলা সঙ্ঘারাম। পণ্ডিতেরা মনে করেন এইখানেই পাহাড়ের ওপর সেই ভারতবিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র তৈরী হয়েছিল। এ জায়গাটা ছিল প্রাচীন মগধ রাজ্যের মধ্যে, গঙ্গার পশ্চিমে। কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে বিক্রমশিলার অবস্থিতিও ঐ রকম লেখা আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই পাথরঘাটায় কয়েকটি ছোট-বড় গুহা আবিষ্কার করেছেন।

তোমরা শুনে নিশ্চয়ই গর্ব্ব বোধ করবে যে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একজন বাঙ্গালী রাজা। তিনি আর কেউ ন'ন, পাল বংশীয় সুবিখ্যাত ধর্ম্মপাল। অনুমান ৮ম শতাব্দীতে এই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হয়েছিল এবং প্রায় চারশ' বছর বা তারও কিছু বেশী সময় সেটি টিকে ছিল।

প্রাচীন গ্রন্থে এই বৌদ্ধবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা শুনলে অবাক্ হ'তে হয়।

বিস্তৃত জায়গা যুড়ে ছিল এই বিহার। চারদিকে সুদৃঢ় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ৬টি দরজা বা ফটক; ভিতরে অসংখ্য মন্দির, ছাত্রাবাস, অতিথশালা ইত্যাদি। মাঝখানে বিরাট বৌদ্ধ মন্দির। পাহাড়ের ওপর ছিল বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র। এত বড় যে এক সঙ্গে ৮০০০ ছাত্র একত্র বসে সেখানে বক্তৃতা শুনতে পারত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাকরণ, ন্যায়, তন্ত্র, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই ৬টি বিষয় শিক্ষা দেবার জন্য ৬টি বিভাগ ছিল। এক একটি বিভাগ পরিচালনা করতেন এক একজন ভিক্ষু—প্রত্যেকেই মহাপণ্ডিত। অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল মোট ১০৮ জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ বহন করতেন রাজা। তিনি এর জন্য প্রচুর ভূমি দান করেছিলেন। তারই আয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় খরচ চলত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকবার নিয়ম ছিল কিন্তু খুব কড়া। যে কেউ এখানে ছাত্র হিসাবে ঢুকতে পারত না। প্রত্যেক দরজায় একজন ক'রে দ্বারপাল পণ্ডিত থাকতেন। প্রবেশ-প্রার্থী ছাত্রকে তাঁদের কাছে বিদ্যার পরীক্ষা দিতে হ'ত। তাঁরা পরীক্ষা ক'রে উপযুক্ত বিবেচনা করলে তবেই সেই ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হ'ত।

এই সময়ে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল যথেষ্ট। এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তার একটি সংযোগ-সূত্র। এখানে তিব্বতী ভাষার চর্চ্চা হ'ত, বহু তিব্বতী ছাত্রও পড়তে আসত এখানে। বহু বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছে এখানে। সুবিখ্যাত শ্রীজ্ঞান দীপঙ্করও এখানে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের কাহিনী তোমরা নিশ্চয়ই জান। দীপঙ্কর ছাড়া আরও অনেক বিখ্যাত আচার্য্য এখানে অধ্যাপনা ক'রে যশস্বী হয়ে গেছেন। বুদ্ধ জ্ঞানপাদ, বোধভদ্র, রত্নাকর শান্তি, শাক্যশ্রী প্রভৃতি মহাপণ্ডিতেরা এখানকারই আচার্য্য ছিলেন। শাক্যশ্রীই বোধ হয় এখানকার শেষ অধ্যক্ষ।

বরফ-চরিত

গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা সরবতের সঙ্গে এক টুকরো বরফ পেলে অনেকেই বেশ খুশী হয়ে ওঠ। জল ঠাণ্ডায় জমে এই বরফ তৈরী হয় এ কথাও তোমরা জান, কিন্তু বরফ সম্বন্ধে সব রকম মজার মজার খবর হয়তো অনেকে রাখ না।

বরফের আয়তন জলের চাইতে বেশী এ খবর রাখ কি? অর্থাৎ জলকে বরফে পরিণত করলে তার আয়তন বেড়ে যায়। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন এক ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি চওড়া আর এক ইঞ্চি পুরু—অর্থাৎ ১ বর্গ ইঞ্চি জলকে বরফে রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায় ১·১ বর্গ ইঞ্চি। এই কারণেই বরফ জলের চেয়ে হাল্কা। তোমরা ছবিতে দেখেছ, উত্তর মেরুর কাছাকাছি অঞ্চলে প্রচণ্ড শীতে সমুদ্রের জল অনেক জায়গায় জমে বরফ হয়ে যায়; কিন্তু সে বরফের চাঁইগুলো জলে ডোবে না—জলের ওপর ভেসে বেড়ায়। এর কারণ কি এখন বোধ হয় বুঝতে পারলে। সে দেশের জলচর প্রাণীদের পক্ষে এ ব্যাপারটা ভগবানের একটা আশীর্ব্বাদ বলা যেতে পারে। বরফ যদি ঐ রকম জলের ওপর না ভাসত তা হ'লে জল জমবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার জলচর জীবদেরও মারা পড়তে হ'ত।

জলকে ঠাণ্ডা করবার সময়ে কিন্তু আর একটা মজার কাণ্ড দেখা যায়। প্রথমটা জল যত ঠাণ্ডা হয় বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে তা ততই সঙ্কুচিত হ'তে থাকে। এই ভাবে চার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পর্য্যন্ত জলের আয়তন ঠাণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে। কিন্তু যেই উত্তাপ চার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডে নামল তার পর আর জলকে সঙ্কুচিত করা যায় না,—এর পর আরও ঠাণ্ডা করলে সেটা আয়তনে বাড়তে থাকে এবং আর চার ডিগ্রী কমালে, অর্থাৎ শূন্য ডিগ্রীতে আনলে, জমে শক্ত বরফে রূপান্তরিত হয়।

বরফ মানুষের নানা কাজে লাগে। শুধু সরবৎ খাওয়ার জন্য নয়—আরও অনেক বড় বড় ব্যাপারে। অসুখ-বিসুখের সময়ে রোগীর মাথায় বরফ দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করা হয় এ তো দেখেছই। জিনিষপত্র পচার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য প্রচুর বরফ ব্যবহার করা হয়। বরফ দেওয়া মাছ তোমরা বাজারে হামেশাই দেখতে পাও। বাসি মাছ যাতে পচে না যায় তারই জন্য বরফ দেওয়া হয়। যে সব জীবাণুর দরুণ মাছ পচে বেশী ঠাণ্ডায় তারা অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে। কাজেই বরফ দিলে মাছ সহজে পচে না। মাছ ছাড়া আরও বহু জিনিষ এই ভাবে বরফের সাহায্যে টাটকা রাখা হয়। আজকাল বরফের অনুকরণে "ঠাণ্ডা ঘর" তৈরী করার রেওয়াজ হয়েছে। সেখানে মাছ-মাংস, ফল-তরকারী ও অন্যান্য হরেক রকম জিনিষ রেখে ঠাণ্ডার সাহায্যে সেগুলিকে পচার হাত থেকে বাঁচান হয়। এ ছাড়া আরও নানা রকম বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ে বরফ না হ'লে চলে না।

শীতের দেশে ঠাণ্ডার সময়ে নদী-নালা-পুকুর সব জমে বরফ হয়ে যায় সে কথা তোমরা জান। তখন তার ওপর দিয়ে গাড়ী চালান যায়, ছুটোছুটি, খেলাধূলা সবই চলে। যে গাড়ী এখানে চলে তার চাকার দরকার হয় না, চাকা না থাকলেও তা দিব্যি বরফের ওপর পিছলে চলতে পারে। এগুলিকে বলা হয় শ্লেজ্। বরফের ওপর হকি (আইস্ হকি) লোভনীয় খেলা। আর একটি লোভনীয় খেলা হচ্ছে স্কেটিং।

তোমার সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা কর

এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা কর, না পারলে শেষ পৃষ্ঠায় উত্তর দেখ। অন্ততঃ ১০টার সঠিক উত্তর দিতে পারা উচিত।

(১) নীচের লাইন দু'টি দিয়ে একখানি বিখ্যাত বই আরম্ভ হয়েছে; বইটার নাম কি?

"গোলোকে বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর,
লক্ষ্মী সহ তথায় আছেন গদাধর।"

(২) নীচের লাইনগুলি কোন্‌টা কার লেখা?—

(ক) "জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া,"
তোরা ছেলের মুখে থুতু দিয়ে মার মুখে দিস্ ধূপের ধোঁয়া।"

(খ) "ঐ শোন ঐ শোন ভেরীর আওয়াজ হে, ভেরীর আওয়াজ।"

(গ) "বৃটীশের রণবাদ্য বাজিল অমনি,
কাঁপাইয়া রণস্থল, কাঁপাইয়া গঙ্গাজল, কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।"

(ঘ) "যখন যেমন হ'তে পারি তাই হ'তে পাই যদি
আমি তবে এক্ষুণি হই ইচ্ছামতী নদী।"

(ঙ) "বলি তো হাসব না,—হাসি রাখতে চাই তো চেপে,
কিন্তু ব্যাপার দেখে থেকে থেকে যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে।"

(৩) কোনটা ঠিক?—

(ক) করভ বলতে বোঝায়—করিৎকর্ম্মা লোক, সংস্কৃত ছন্দ, হাতীর বাচ্চা, এক রকম অলঙ্কার।

(খ) পোপোক্যাটিপ্যাটেল বললে বোঝায়—এক রকম কাফ্রী জাত, একটি আগ্নেয়গিরি, এক রকম রাসায়নিক ওষুধ।

(গ) ধীমান ছিলেন একজন বড় রাজা, শিল্পী, কবি, যোদ্ধা।

(৪) এগুলো কোন্‌টা কি?—

(ক) গাণ্ডীব (খ) পাঞ্চজন্য (গ) বর্ম্মা (ঘ) ম্যাগ্‌নেসিয়াম্ (ঙ) ডেপ্‌থ চার্জ্।

(৫) পাশের ও নীচের ছবি দু'টি দেখে বল ও দু'টো কার বা কিসের ছবি।

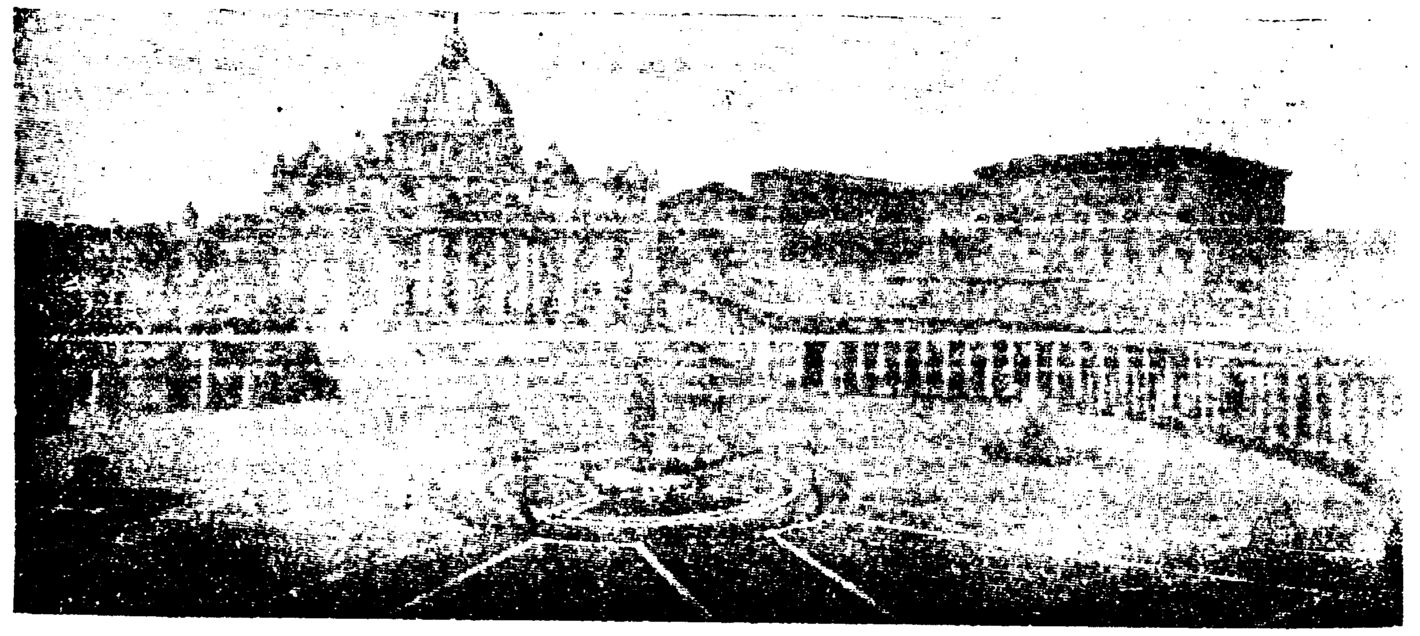

অনর্থের মূল

শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী

বনের পথ ধ'রে চলেছিল তিনজন দস্যু—ডাকাতি করতে। হাতে তাদের মোটা লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, আর ইয়া ষণ্ডামার্কা তাদের চেহারা—দেখলেই মনে হয় ভয় ব'লে তারা যেন কিছু জানে না।

কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই তারা দেখলে একজন সন্ন্যাসী বনপথ ধ'রে ছুটতে ছুটতে তাদের দিকেই আসছেন।

সন্ন্যাসী কাছে আসতেই তাঁকে থামিয়ে তারা জিজ্ঞেস করলে, "কি ঠাকুর, এমন ধারা ছুটছো কেন? কে তোমায় তাড়া করেছে?"

সন্ন্যাসী ঠাকুর সন্ত্রস্ত ভাবে বললেন, "মৃত্যু।"

প্রথমটা দস্যুরা তিনজনেই হতভম্ব হয়ে গেল; পরে একজন জিজ্ঞেস করলে, "মৃত্যু তোমায় তাড়া করেছে? সে কি!......কোথায় মৃত্যু, আমাদের একবার দেখাও দেখি?"

সন্ন্যাসী তাদের সঙ্গে ক'রে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এক জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন,—"ঐ যে!" তারপর, "আমি চললাম" ব'লে, আবার আগের মতই হন্ হন্ ক'রে ছুটতে সুরু করলেন।

দস্যুরা দেখলে সেই জায়গায় একটা গর্ত্তের মধ্যে এক ঘড়া মোহর দিনের আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে!

"এই তোমার মৃত্যু!" দস্যুরা তিনজনেই হেসে উঠলো। একজন বললে, "আজ আমাদের ভাগ্য খুব প্রসন্ন বোঝা যাচ্ছে। এসো, মোহরগুলো চট্‌পট্ ভাগ ক'রে ফেলা যাক।"

"নিশ্চয়ই"—বললে আর একজন,—"আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম... আহা! কিন্তু ভাই, এমন রত্ন যখন পাওয়া গেছে, এগুলি ভাগ ক'রে নেবার আগে একটু ফূর্ত্তি-টুর্ত্তি ক'রে নেওয়া যাক্।"

"যা বলেছো"—বাকী দু'জন সায় দিলে এবং শেষে ঠিক হ'লো একজন যাবে সহরে; একটি মোহর ভাঙ্গিয়ে নানা জিনিস-পত্তর আর ভালো ভালো

সব খাবার আনবে কিনে, আর বাকী দু'জনে থাকবে ঘড়ার কাছে পাহারায়।

এখন, যে লোকটি সহরের পানে চললো তার মনে এক পাপবুদ্ধি উঠলো চাড়া দিয়ে। সে ভাবলে, খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে সঙ্গী দু'টিকে হত্যা ক'রে সে একাই আত্মসাৎ করবে ঘড়ার মোহরগুলি।

এদিকে, যে দু'জন লোক রইলো ঘড়ার কাছে ব'সে তারা পরামর্শ করলে—সহর থেকে ফিরলেই তৃতীয় ব্যক্তিকে খুন ক'রে তারা দু'জনে ভাগ ক'রে নেবে ঘড়ার সমস্ত মোহর।

খানিক পরেই লোকটি খাবার নিয়ে ফিরলো এবং অবিলম্বেই পাহারাদার দু'জন তাকে হত্যা ক'রে ফেললে।

"ব্যস্, আপদ্ চুকে গেল"—ভাবলে তারা।—"এইবার খাবারগুলো সাবাড় ক'রে ঠাণ্ডা হ'য়ে ধীরে-সুস্থে মোহরগুলো ভাগ ক'রে নিয়ে বাড়ি ফেরা যাবে।"

খাবার তারা মহানন্দেই সাবাড় করলে কিন্তু অবিলম্বেই দেখা দিলো বিষের প্রতিক্রিয়া।...

ধীরে ধীরে মৃত্যু এসে তাদের অধিকার করলো এবং একটু পরেই তাদের অসাড় দেহগুলি ঘড়ার পাশে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

অর্থ অনর্থের মূল—এ কথাটি বুঝতে পেরে সন্ন্যাসী তার সংসর্গ থেকে দূরে পালিয়ে গেলেন কিন্তু দস্যুরা তার লোভে মৃত্যু ডেকে আনলে। *

* ইতালীয় উপকথা।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

সন্ধ্যা

শ্রীজয়ন্তকুমার দাশ

সন্ধ্যা ঘনায় নির্জ্জন নদীতীরে—
দূর দিগন্তে বলাকা মেলেছে পাখা;
শুভ্র মেঘের ছায়া-নির্ম্মল নীরে
পূর্ব্ব গগনে বঙ্কিম চাঁদ আঁকা।

রজনীগন্ধা উর্দ্ধে মেলেছে দল,
স্বপ্ন-সুরভি-মদির সন্ধ্যা বায়;
শান্ত হয়েছে বিহগের কোলাহল,
সন্ধ্যা নামিছে বনবীথিকার ছায়।

অতি দূর হ'তে বাঁশীর মদির সুরে
কোন্ সে রাগিনী ক্ষণে ক্ষণে বহি আসে,
শঙ্খের ধ্বনি শুনি দেবালয়ে দূরে—
অগুরু-ধূপের গন্ধ বাতাসে ভাসে।

তোমারে হেরিনু হাতে লয়ে দীপশিখা—
তারার আঁচল ছড়ায়েছ ধীরে ধীরে;
আলস-ক্লান্ত নয়নে স্বপন মাখা—
আসিলে সন্ধ্যা, দিবসের শেষ তীরে।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা

গণপরিষদে হিন্দীকে ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা ব'লে মেনে নেওয়া হয়েছে। এই ভাষা লেখা হবে দেবনাগরী অক্ষরে। ইংরেজী ভাষা যেমন চলছিল, তেমনি, আরও ১৫ বছর রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চলবে। তার পরেও কিছুদিন চলতে পারে যদি পরিষদ্ ইচ্ছুক হয়। হিন্দী ছাড়া হিন্দীর সঙ্গে অন্য কোন ভাষার দাবী, বিশেষতঃ বাংলা ভাষার, বিকল্প হিসাবেও, কেউ উত্থাপন করেন নি; যদিও করা উচিত ছিল। বিভিন্ন প্রদেশে সেখানকার আঞ্চলিক ভাষাই রাষ্ট্রভাষা রূপে ব্যবহৃত হবে ব'লে স্থির হয়েছে।

কয়েকটি প্রদেশের নতুন নাম

এর পর থেকে পশ্চিম বাংলাকে 'বাংলা', পূর্ব্ব পাঞ্জাবকে "পাঞ্জাব" এবং মধ্য প্রদেশকে "কোশল-বিদর্ভ"—এই নামে অভিহিত করা হবে ব'লে গণপরিষদে স্থির হয়েছে। পাকিস্তান সরকার পূর্ব্ব বাংলাকে বলেন "পূর্ব্ব পাকিস্তান"। পশ্চিম বাংলা 'বাংলা' নামটি সম্পূর্ণ দখল ক'রে নেওয়াতে পূর্ব্ব বাংলা ভবিষ্যতে বাংলা ব'লে নিজেকে দাবী করতে পারবে কিনা কে জানে? সেখানকার বাঙ্গালীরাও হবেন "পূর্ব্ব পাকিস্তানী"—বাঙ্গালী ন'ন। কেউ কেউ হয়ত বলবেন, নামে কি এসে যায়? বাংলাও চিরকাল 'বাংলা' ছিল না। অতীতে গৌড়, পুণ্ড্র, সমতট প্রভৃতি কত নামে তার পরিচয় হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্ব্ব-বাংলা-বাসী কি সহজ মনে এ কথা মেনে নিতে পারবেন? তবে আমাদের আশা আছে, বাংলা ভাষাকে কেউ খেয়াল মত বদলাতে পারবে না। (যদিও তারও চেষ্টার ত্রুটী হবে না বা হচ্ছে না এমন নয়!) আর আমাদের এই বাংলা ভাষাই থাকবে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলার মিলন-সেতু।

অখণ্ড ভারত

এত দিন পরে ভারত সত্য সত্যই 'অখণ্ড ভারত' হয়ে পড়ল, যদিও তার একটা বৃহৎ অংশ পাকিস্তান রূপে বেরিয়ে গেছে। ইংরেজ আমলে যে অসংখ্য 'দেশীয় রাজ্য' পৃথক সত্তা নিয়ে সারা দেশের বুকে ছড়িয়ে ছিল তারা সকলেই একে একে ভারত রাষ্ট্রে যোগ দিয়েছে—নিজেদের পৃথক্ সত্তা ত্যাগ ক'রে। সেখানকার লোকেরা এখন সকলেই হ'ল ভারতের প্রজা—দেশীয় রাজ্যের খুসীমত পৃথক্ আইন-কানুন তাদের আর মানতে হবে না। মহারাজাদের সম্বন্ধে ভারত

সরকার যে ব্যবস্থা করেছেন তা সব ক্ষেত্রে হয়তো সাধারণের মনঃপূত হবে না, তবে আপাততঃ তা মন্দের ভালো বলা চলে। প্রত্যেক রাজ্যই ভারতের কোন না কোন প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সামান্য কয়েকটি ছাড়া। অনেকে আবার কয়েকটি একত্র হয়ে নতুন প্রদেশ তৈরী করেছে—যেমন রাজস্থান, বিন্ধ্য প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ ইত্যাদি। বাংলার কুচবিহার, ত্রিপুরা এবং মণিপুর প্রত্যেকে পৃথক্ প্রদেশ হয়েছে, যদিও ভাষা ও সংস্কৃতির দিক্ দিয়ে তাদের পশ্চিম বাংলার সঙ্গেই যুক্ত হওয়া উচিত ছিল। এ বিষয়ে স্থানীয় লোকদের মতামত কি তা গণভোট নিয়ে জেনে নেওয়া হ'ল না কেন তা অনেকের কাছেই দুর্ব্বোধ্য।

প্রধান মন্ত্রীর আমেরিকা সফর

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিমন্ত্রণে লণ্ডন হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার পণ্ডিতজীকে খুব সম্মানের সঙ্গে খাতির-যত্ন ক'রে নিয়ে গেছেন। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান্ এজন্য তাঁর নিজের বিমানখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং আমেরিকায় পৌঁছলে তাঁকে নিজের মান্য অতিথি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সেখানকার সরকারী মহলও ব্যাপারটিকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছেন। পণ্ডিতজীর এই প্রথম আমেরিকা ভ্রমণ। তাঁর এই সফরে তিনি সাধারণ আমেরিকাবাসীদের চিত্ত জয় করবেন,—ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করবেন এই আমরা কামনা করি,—যেমন একদিন করেছিলেন ধর্ম্মের দিক্ দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ।

চীনে কমিউনিষ্টদের দুর্ব্বার গতি

চীনে কমিউনিষ্ট বাহিনী দুর্ব্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং চীনের প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ দখল ক'রে নিয়েছে। কুওমিণ্টাং সরকার ক্যাণ্টন ছেড়ে চলে গেছে চুংকিং। এক রকম বিনা যুদ্ধেই কমিউনিষ্টরা ক্যাণ্টন অধিকার করেছে। কমিউনিষ্ট দল চীনে নতুন সরকার ঘোষণা করেছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিকে এই নতুন সরকার মেনে নেবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। কমিউনিষ্ট নেতা মাও সে তুং হয়েছেন নবগঠিত চীন সরকারের সভাপতি। নতুন চীনের জন্মদাতা সানইয়াৎসেনের পত্নীও এই সরকারে অন্যতম সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

ইষ্ট বেঙ্গল দলের বাহাদুরী

কলকাতায় আই. এফ্. এ শীল্ডের ফাইনাল খেলা শেষ হ'ল। ইষ্ট বেঙ্গল দল মোহন-বাগান দলকে দু' গোলে হারিয়ে শীল্ড বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করেছে। এর আগে তারা এ বছরকার কলকাতার লীগ্ বিজয়ের গৌরবও অর্জ্জন করেছিল। এর পর তারা যায় বোম্বাইএ বিখ্যাত রোভার্স কাপ্ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। সেখানেও তারা ফাইনালে ই. আই. আর দলকে হারিয়ে রোভার্স কাপ বিজয়ী হয়েছে। একই বছর লীগ, আই. এফ. এ শীল্ড এবং রোভার্স কাপ্,—এই তিনটি শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে ইষ্ট বেঙ্গল দল এ দেশের ফুটবল খেলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইল।

পরলোকে নিশিকান্ত সেন

গভীর দুঃখের সঙ্গে তোমাদের একটি শোকসংবাদ জানাচ্ছি। শ্রদ্ধেয় শিশুসাহিত্যিক নিশিকান্ত সেন আর ইহলোকে নেই। গত ৫ই অক্টোবর ৬৫ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেছেন।

নিশিকান্ত বাবু ইদানীং তোমাদের জন্য বেশী লিখে উঠতে পারেন নি, তাই সকলে হয়তো তাঁর লেখার সঙ্গে তেমন পরিচিত নও। কিন্তু এক সময়ে শিশুসাহিত্যের সেবায়ই তাঁর দিন কাটত। অধুনালুপ্ত 'খোকাখুকু' মাসিক পত্রিকাখানির নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। সে যুগে এটি খুবই উঁচুদরের একখানি পত্রিকা ছিল আর নিশিকান্ত বাবুই ছিলেন তার সম্পাদক। তাঁর মৃত্যুতে ছোটরা তাদের একজন প্রিয় বন্ধুকে হারাল।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

প্রথমেই রামধনুর পক্ষ থেকে ৺বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তোমরা, যারা বিজয়া ও ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি দিয়েছ, তাদেরকেও এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবারে বিজয়া ও ঈদ পর্ব্ব প্রায় একই সময়ে পড়েছিল। এটা খুবই সুখের কথা সন্দেহ নেই।

শ্রীরুণু বসুর (লক্ষ্ণৌ) বিজয়ার অভিনন্দন-পত্রে বেশ একটু নূতনত্ব দেখলাম। আরও কেউ কেউ—যেমন শ্রীসৌরীন্দ্র বসু (বরিশাল), শ্রীইন্দিরা মিত্র (কাশী), শ্রীশোভা সোম (বর্দ্ধমান) কবিতায় অভিনন্দন পাঠিয়েছেন। শ্রীকরুণা মুখোপাধ্যায় (হুগলী) অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্রের জীবন-কথা পড়ে জানতে চেয়েছেন তিনি চট্টগ্রাম কলেজ ছাড়ার পর আর কোথাও অধ্যাপনা করেছিলেন কিনা। করেছিলেন। বঙ্গবাসী কলেজে ও সিটি কলেজে। কিছুদিন বাগের-হাট কলেজে অধ্যক্ষও ছিলেন। এ ছাড়া সুবিখ্যাত দৈনিকপত্র 'সার্ভেণ্ট' (অধুনালুপ্ত), 'রেঙ্গুন মেল্', 'বার্ম্মা ক্রনিকল্' প্রভৃতির সম্পাদক হিসাবেও তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রামধনুতেও তাঁর ২।১টি লেখা অনেক দিন আগে বেরিয়েছিল। শ্রীলক্ষ্মীপদ নন্দী (মেদিনীপুর) জানতে চেয়েছেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন জিনিষ হাতে প্রস্তুত করবার প্রণালী সম্বলিত কোন

বই আছে কিনা। আছে। অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা" এ সম্বন্ধে একখানা ভাল বই। শ্রীবিশ্বকর্ম্মা রচিত 'ইঙ্গিত', শ্রীমনোজ সান্যাল প্রণীত 'তোমাদের ল্যাবরেটরী'—এগুলিও পড়ে দেখতে পার। শ্রীনমিতা দাশগুপ্তা কয়েকখানি ভালো ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম জানতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাদ দিলে রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাসগুলি,—যেমন ধর মহারাষ্ট্রীয় জীবন-প্রভাত, রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা, বঙ্গ বিজেতা প্রভৃতি বোধ হয় এদিক্ দিয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ধর্ম্মপাল, ময়ূর প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। অনুরূপা দেবীও কয়েকখানি এই ধরণের বই লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথও বাদ দেন নি। কিন্তু সমস্ত তালিকা দিতে গেলে যে অনেক জায়গা লাগবে! তবে এগুলির কোনটাই ঠিক ছোটদের উপন্যাস নয়। ছোটদের জন্য হেমেন্দ্রকুমার রায় ও ধীরেন্দ্রলাল ধর কিছু কিছু লিখেছেন।

এবারে ব্যক্তিগত চিঠির জবাব দেই। এম্. এ. সালেহিন (রাজসাহী)—তোমার পূজা ও ঈদের শুভেচ্ছা আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করলাম। রামধনু তুমি এত খুঁটিয়ে পড় জেনে ভাল লাগল। 'ছায়াছবি' ছোটদের উপযোগী যখন এ দেশে তৈরী হবে তখন অবশ্যই তা নিয়ে আলোচনা হবে। শ্রীরুণু বসু (কাঁচড়াপাড়া)—পূজা সংখ্যায় কোন ক্রমশঃ রচনা না থাকায় তুমি খুসী হয়েছ কিন্তু কেউ কেউ আবার ঐ জন্যই দুঃখ প্রকাশ করেছে। আমরা কি করি, বল তো? তোমার 'হবি'র কথা শুনে খুসী হ'লাম। আমারও ঐ 'হবি' ছিল, এবং এখনও আছে। বাগানের খোড়ো ঘাস তুলতে গেলে একটি একটি ক'রে বেছে নেওয়াই ভালো, সময় লাগলেও। ওষুধ প্রয়োগে অনেক সময়ে আসল গাছেরও ক্ষতি হ'তে পারে। আগাছা ধ্বংস করবার ওষুধ (স্পে্) আমেরিকায় ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এ দেশে এখনও তার চলন হয় নি। শ্রীতরুণ সান্যাল (বর্দ্ধমান)—'সৈনিক' সম্বন্ধে খবরটা তাড়াতাড়ি জানিও। শ্রীবিজলী সরকার (শ্যামপুর)—পূজো সম্বন্ধে এবারে সর্ব্বত্রই এক কথা শুনছি। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাই এর জন্য দায়ী। কবিতা নিঃসঙ্কোচে পাঠাতে পার। শ্রীমুকুলরাণী মণ্ডল (কশাড়িয়া)—তোমার চিঠিতে অন্তরঙ্গতার যে সুর রয়েছে তা মিষ্টি লাগল। তোমার অনুরোধ মত তোমার একটি ভুল দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার নামটা ভালো ক'রে দেখ,—'শ' নয় 'স্র' হবে। যেমন তুমি নিজে 'মুকুট' নও,—'মুকুল'। শ্রীকৃশাণু বন্দ্যোপাধ্যায় (মুঙ্গের)—ছবি নিশ্চয়ই পাঠাতে পার। সঙ্গে ডাক টিকেট থাকলে ফেরৎ পাঠানো হয়। খুব পরিষ্কার ছবি হওয়া চাই কিন্তু। শ্রীশর্মিলা সরকার (কলিকাতা)— পরীক্ষার জন্য বাইরে যাওয়া হ'ল না ?—পরীক্ষার পরে এর শোধ তুলে নিও, কেমন? নিয়মিত ভাবে পড়লে ফল অবশ্যই ভালো হবে। শ্রীবিমলভূষণ রায় (কলিকাতা ৯)—এবারের ধাঁধা ভালো লেগেছে জেনে খুসী হলাম। ছবি বেছে রেখে ফেরৎ পাঠান হবে, এবং সুবিধামত ছাপা হবে। চিঠি পেলে আমি বিরক্ত হ'ব কেন, বরঞ্চ খুসী হই। তবে জবাব দেওয়া ব্যাপারে আমি একটু কুঁড়ে; সেটা স্বভাবের দোষ। এ. এস্. নূর মোহাম্মদ (বাদলগাছি)—তোমার চিঠিখানা খুবই ভালো লাগল,—বিশেষ ক'রে প্রস্তাবগুলি খুবই মূল্যবান্। ত্রুটীগুলো সংশোধনের চেষ্টা অবশ্যই হবে। ইতিহাসের গল্প এবারে গেল,

সাধারণ জ্ঞানও। "শরীর চর্চ্চা" সম্বন্ধেও ব্যবস্থা করব। রুণু-টুনু সম্বন্ধে তোমার অভিমত আর ২।১ সংখ্যা পরে হয়তো বদলাবে। দেখা যাক্! শ্রীকনককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পানিহাটী)—ধাঁধা সম্বন্ধে যা লিখেছ তা ঠিক নয়। তা ছাড়া নৌকোকে 'নাও' বা 'না' দুই-ই বলে চলতি কথায়। পড় নি—"না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে, তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে?" কিংবা "ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল"? শ্রীঅহীন্দ্রশেখর নায়েক (বোলপুর)—তোমার ছোট্ট চিঠিখানা ভালো লাগল।

আজ এখানেই শেষ করি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। জয় হিন্দ। —ইতি রাঃ সঃ।

ষষ্ঠ

বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ দিয়ে আমি একবার দাঁতন ষ্টেশনে নেমে আমার এক ধনী বন্ধুর অতিথি হয়েছিলুম। তাঁরও একটি হাতী ছিল, সে পুকুরের জলে নেমে অনেকক্ষণ ধরে গা ভাসিয়ে থাকতে ভালবাসত। সে-সময়টায় সে কারুরই তোয়াক্কা রাখতে চাইত না, এমন কি সে থোড়াই কেয়ার করত তার মাহুতকেও। সে হয়ত মাঝ পুকুরে গিয়ে আপন-মনে অবগাহন-সুখ উপভোগ করছে, এমন সময় ঘাটে দাঁড়িয়ে মাহুত ক'রতে লাগল ডাকাডাকি। প্রথমটা সে কিছু বলত না, কিন্তু বারংবার ডেকে তাকে বেশী বিরক্ত করলেই সে হঠাৎ শুঁড় তুলে পিচকিরির মত জল ছুঁড়ে মাহুতকেও একেবারে স্নান করিয়ে দিত! ছোট ছোট ছেলেরা যেমন দুষ্টুমি ক'রে অন্য ছেলের গায়ে কুলকুচো ক'রে জল দেয়, এও ঠিক তেমনি। হাতীটার লক্ষ্যও ছিল অব্যর্থ, মাহুত পালাবার পথ খুঁজে পেত না।

একাধিক শিকারী বন্য হস্তীদের একটি আশ্চর্য্য স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। শিকারীর গুলিতে আহত হ'য়ে যদি কোন হাতী মাটিতে পড়ে গিয়ে আর উঠতে না পারে, তখন আরও তিন-চারটে হাতী নানা দিক্ থেকে তার কাছে ছুটে এসে দাঁড়ায়। তার পরে সকলে মিলে তাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং দু'দিক্ থেকে নিজেদের গা দিয়ে সেই আহত জীবটিকে এমন ভাবে চেপে দাঁড়ায় যে, সে আর অবশ হ'য়ে মাটির উপরে প'ড়ে যেতে পারে না। তার পর সেই অবস্থায় তারা তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়।

মস্ত দেহের তুলনায় হাতীদের চোখ খুব ছোট, এবং তাদের দৃষ্টিশক্তিও বেশ দুর্ব্বল। বেশী দূর পর্য্যন্ত তাদের নজর চলে না। কিন্তু এই অভাবটা তারা পূরণ ক'রে নিয়েছে আপন আপন ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তির দ্বারা। যেদিক্ দিয়ে বাতাস আসছে সেই দিকে অনেক দূরেও যদি কোন মানুষ দাঁড়ায়, হাতীরা তখনি তার গায়ের গন্ধ পায়। পরমুহূর্ত্তেই তারা হয় সেখান থেকে সরে পড়ে, নয় তেড়ে এসে মানুষকে করে আক্রমণ।

বনের ভিতরে জলাশয়ে রাত্রেও তা'রা জলপান ক'রতে যায়। কাছাকাছি কোথাও মানুষ আছে সন্দেহ হ'লে হাতীরাও হ'য়ে ওঠে অত্যন্ত সাবধানী। হাতীর দল তখন জঙ্গলের ভিতরে লুকিয়ে অপেক্ষা ক'রতে থাকে এবং তাদের অগ্রদূতের মত এগিয়ে আসে একটা হাতী। অন্ধকারে নীরবে ঠিক ছায়ার মত সেই হাতীটা খানিকটা এগিয়ে এসে চুপ্ ক'রে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। আস্তে আস্তে এদিকে ওদিকে শুঁড়ের ডগা ফিরিয়ে সে পরীক্ষা করে, বাতাসে কোন মানুষের গন্ধ পাওয়া যায় কিনা। তারপর নিকটে কোথাও মানুষ নেই এটা বুঝতে পারলেই নিজের শুঁড়টাকে সে ভেঁপুতে পরিণত ক'রে আওয়াজ করতে থাকে। সেই আওয়াজ শুনলেই দূর থেকে অন্যান্য হাতীরাও তেমনি আওয়াজ ক'রে উত্তর দেয়। প্রথম হাতীটা আবার আওয়াজ করে, যেন জানিয়ে দেয় যে মা ভৈঃ। তখন দলের অন্যান্য হাতীরা নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে এসে জলপান করে, বা জলের ভিতরে লাফিয়ে প'ড়ে খেলা ক'রতে থাকে। হাতীর এই শুঁড়ের আওয়াজের আরও অনেক অর্থ আছে। দল থেকে বিচ্ছিন্ন কোন হাতী বনের ভিতরে হারিয়ে গেলেও তা'রা বিশেষ এক সুরে এই শুঁড়ের ভেঁপুই বাজায়। হারা হাতীটাও দূর থেকে সেই আহ্বান-ধ্বনি বুঝতে পেরে তেমনি

ক'রেই উত্তর দেয়, এবং ঠিক নির্দ্দিষ্ট স্থানে দলের ভিতরে ফিরে আসতে ভুল করে না।

একবার একটি হাতীর বাচ্চাকে বাল্‌তি ক'রে ইঁদারা থেকে জল তুলে আনতে শেখানো হয়েছিল। ইঁদারাটা অকারে খুব বড়। বাচ্চা হাতীটা শুঁড় দিয়ে বাল্‌তি ধ'রে ইঁদারার ধারে গিয়ে জল তুলে আনত।

একদিন একটা বড় হাতী তার সঙ্গেই ইঁদারার কাছে গিয়ে হাজির হয়। বড় হাতীটা তা'র জল তোলা দেখে বোধ হয় ভাবলে,—বাঃ, জল তোলার এই উপায়টা তো ভারী সহজ! তারপর বাচ্চা হাতীটা যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছে সে অমনি তা'র বাল্‌তিটাকে চুরি ক'রে ইঁদারার ভিতরে নামিয়ে দিলে।

বাচ্চা হাতীটা মনে মনে রীতিমত ক্ষেপে গেল, কিন্তু বাইরে প্রকাশ ক'রলে না মনের ভাব। সে করলে কি জান? বড় হাতীটা যখন ইঁদারার ভিতর হুমড়ি খেয়ে জল তুলছে, সে তখন আস্তে আস্তে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, এবং মারলে তাকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা। বড় হাতীটা নীচের দিকে মুখ ক'রে ঝপাং ক'রে গিয়ে পড়ল ইঁদারার ভিতরে।

চারিদিক্ থেকে হৈ হৈ ক'রে মানুষরা সব ছুটে এল। কিন্তু কী করবে তারা? ইঁদারার ভিতর থেকে একটা প্রকাণ্ড হাতীকে উপরে টেনে তোলা তো বড় যে সে ব্যাপার নয়! অনেক ভেবে-চিন্তে সকলে মিলে ইঁদারার ভিতরে কতগুলো গাছের গুড়ি ফেলে দিলে।

তখন হাতীটা করলে কি, কতকগুলো গাছের গুড়ি নিয়ে শুঁড় দিয়ে নিজের দেহের তলায় পাঠিয়ে দিয়ে তৈরী ক'রে ফেললে একটা পাটাতন এবং আর কতগুলো গুড়ি নিয়ে সাজিয়ে ফেললে নিজের চারিপাশে। তারপর বেশ সহজেই সে আবার পৃথিবীর উপরে উঠে এসে দাঁড়াল।

অবশ্য এটি হচ্ছে মানুষের দ্বারা শিক্ষিত হস্তীর গল্প। কিন্তু একেবারে বুনো হাতীও বুদ্ধিতে বড় কম যায় না। সে-সম্বন্ধেও একটা গল্প শোনো।

সিংহল দ্বীপে স্যর এডওয়ার্ড টেনান্ট্ দলবল নিয়ে বনের ভিতরে শিকার ক'রতে গিয়েছিলেন। সেই সময় একটা ক্ষ্যাপা হাতী তাঁর পিছনে তাড়া করে। স্যর এডওয়ার্ড এবং তাঁর দলের অন্যান্য লোকেরা প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তাড়াতাড়ি একটা বড় গাছের উপরে উঠে পড়ল। শিকার হাত ফস্কায় দেখে হাতীটা তখন

গাছের গুড়িতে শুঁড় জড়িয়ে গোটা গাছটাকেই উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু মস্ত গাছ, কিছুতেই উপড়াতে পারলে না।

সেইখানে মাটির উপরে পড়ে ছিল অনেকগুলো কাটা গাছের গুড়ি। হাতীটা সেইখানে গিয়ে একে একে গাছের গুড়িগুলোকে সেই বড় গাছটার তলায় এনে স্তূপাকারে সাজিয়ে ফেলল। তারপর সে গুড়িগুলোর উপরে উঠে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে শুঁড়ের সাহায্যে স্যর এড্‌ওয়ার্ড ও তাঁর লোকজনকে মাটির উপরে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা ক'রতে লাগল। হয়তো তার চেষ্টা সফলও হ'ত, কিন্তু গাছের উপর থেকে ক্রমাগত গুলি বৃষ্টি হওয়াতে হাতীটা বিরক্ত হয়ে গুড়ির স্তূপ থেকে নেমে বনের ভিতরে চলে গেল।

শুঁড় দিয়ে হাতীর মা বাচ্চাকে আদর করে, শাসন করে, এবং তার জন্যে ভালমন্দ ব্যবস্থাও করে। একবার একটা পোষা হাতীর বাচ্চা কেমন ক'রে অত্যন্ত আহত হয়। তখনি ডাক্তার ডেকে আনা হ'ল। তিনি তার ক্ষতের উপরে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে গেলেন, কিন্তু বাচ্চাটা কিছুতেই রাজী হ'ল না। এমন একটা মূল্যবান্ জন্তু বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে ভেবে ডাক্তার হতাশ ভাবে তার মায়ের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

হাতীর মা বুঝতে একটুও দেরী করলে না। শুঁড় দিয়ে সে তখনি বাচ্চাটিকে জড়িয়ে ফেললে এবং নিজের দুই পা দিয়ে চেপে ধরলে তাকে মাটির উপরে। ডাক্তার তখন ক্ষতস্থান পরিষ্কার ক'রে ওষুধ দিয়ে অনায়াসেই ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে পারলেন। কেবল সেই একদিন নয়, তারপর যতদিন না তার ঘা সারল, ততদিন পর্য্যন্ত হাতীর মা ডাক্তারকে এইভাবে সাহায্য করতে নারাজ হ'ল না।

হাতীদের স্নেহ ও ভালবাসা অত্যন্ত গভীর। মানুষকেও তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের কথা। বিলাতের চিড়িয়াখানায় একটা হাতী ছিল, তার নাম জিঙ্গো। সে তার রক্ষী বা মাহুতকে অত্যন্ত পছন্দ করত। তাকে বিলাত থেকে পরে আমেরিকার চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিলাত থেকে সমুদ্র পার হয়ে আমেরিকায় যেতে তখন বেশ কিছুদিন লাগত। জিঙ্গো কিন্তু আমেরিকা পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছল না। মাহুতকে দেখতে না পেয়ে, মনের দুঃখে সে পানাহার ছেড়ে ছিলে। তার পর ভগ্নপ্রাণে মারা গেল সমুদ্রপথেই।

হাতী হচ্ছে বর্ত্তমান পৃথিবীতে ডাঙ্গার সব চেয়ে প্রকাণ্ড জীব। তোমরা ভারতের হাতী দেখেছ, কিন্তু আফ্রিকার হাতী তার চেয়েও আকারে বড়। আবার

ঐ আফ্রিকাতেই আর এক জাতের বামন হাতী আছে, মাথায় তারা ছ' ফুটের চেয়ে উঁচু হয় না।

পৃথিবীতে মানুষরা যখন একটু একটু ক'রে সবে সভ্য হয়ে উঠছে, সবচেয়ে বড় হাতী পাওয়া যেত সেই সময়ে। তার নাম হচ্ছে ম্যামথ। তারা ছিল রোমশ।

ক্রমশঃ

সরীসৃপদের মধ্যে অনেকে শীতকালে লম্বা ঘুম দেয় এ খবর হয়তো জান। সাপ, টিকটিকি প্রভৃতি এই ধরণের জীব। বাদুড়, ভালুক প্রভৃতি আরও অনেক জানোয়ারের এই রকম ঘুমোবার অভ্যাস আছে। কোন কোন পাখী, পোকামাকড়ও ঘুমোতে ওস্তাদ্। লণ্ডনের এক কীটশালায় একটি শামুককে দু'বছর ঘুমুতে দেখা গিয়েছিল।

* * * *

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ছোট্ট মানুষ কে? খুব সম্ভবতঃ হেনরী বেহ্‌রেন্‌স্। ইনি আমেরিকার লোক। এঁর বয়স এখন ৫৬ বছর কিন্তু এতদিনেও ইনি আড়াই ফুটের বেশী লম্বা হ'তে পারেন নি। এঁর ওজন মাত্র ৩২ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৬ সেরও নয়। বেহ্‌রেন্‌স্ সাহেবের স্ত্রীও প্রায় তাঁরই মত লম্বা। কয়েক বছর আগে মিশর দেশে আর একটি পূর্ণবয়স্ক ভদ্রলোকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। তিনি ছিলেন লম্বায় ২ ফুট, আর ওজনে সাত সের।

* * * *

আমেরিকার লোকদের জীবজন্তু পোষার বাতিক কি ভয়ানক তার একটা হিসাব কিছুদিন আগে বেরিয়েছিল। সেখানে শত করা ৭৫—৮০ পরিবারে কোন না কোন সখের পোষা জন্তু আছে। কয়েক বছর আগে একবার এই সব জন্তুদের সংখ্যা গণা হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল তাদের মোট সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। প্রতি বছর এই সব জন্তুর পেছনে সেখানে মোট সওয়া শ' থেকে দেড়শ' কোটির ওপর টাকা খরচ হয়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১৭৩৪

উত্তরদাতাদের নাম ঃ সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা-২৬); দীপককুমার বসু (কলিকাতা); নবেন্দু সেন (কলিকাতা ২৯); হরিদাস চক্রবর্ত্তী (বহরমপুর); হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী (চক্রধরপুর); রত্না, জয়ন্ত, স্বপ্না ও ছন্দা রায় (বাঁকীপুর); বিজলী সরকার (শ্যামপুর); কর্ম্মমন্দির মণিমেলা (মধুতটী); বিমলভূষণ রায় (কলিকাতা-৯); রুণু, ঝুনু, অমল, রঞ্জন (কাঁচড়াপাড়া); রত্নাবলী রায় (ভাগলপুর); এম্. এ, স্যালেহিন, সবিতা, এ মান্নান, আলা এবং ভোলা (রাজসাহী); প্রদীপকুমার চক্রবর্ত্তী (ডিব্রুগড়); এ. এস. নূর মোহাম্মদ (বাদলগাছি); ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান); বিভাসুবিহারী বসু (পাটনা); হেমজ্যোতিঃ (কলিকাতা ১৯); কনককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পানিহাটী); অনু, ঝরণা, আভা, আরতি ও প্রণতি (বগুড়া); হীরেন্দ্রনাথ রায় (বরিশাল); অমিয়কান্তি পোদ্দার (মালদহ)।

নূতন ধাঁধা

তে-মাথার ওপর বড় বাড়ীটা মেরামত হচ্ছে, মিস্ত্রীরা ভারা বাঁধবার জন্য বড় বড় বাঁশ টাঙ্গিয়েছে। একটা দুষ্ট শামুক-ছানা ভাবল বাঁশ বেয়ে একবার ওপরে উঠে দেখে আসবে ওপর থেকে সহরটাকে কেমন দেখায়। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। সে বাঁশ বেয়ে উঠতে সুরু করল। এখন, বাঁশটা ছিল লম্বায় ৩০ ফুট। শামুক-ছানাটি সারা দিনের চেষ্টায় ৫ ফুট উঠতে পারল, তার পর রাতে বিশ্রাম। ভোর বেলা দেখা গেল বিশ্রামের সময়ে সে ৪ ফুট গড়িয়ে নেমে এসেছে। কিন্তু তার ছিল দারুণ অধ্যবসায়; আবার পর দিন সে নতুন ক'রে উঠতে সুরু করল। সেদিনও সে ৫ ফুট উঠল, কিন্তু সে রাতেও আবার ৪ ফুট গড়িয়ে নেমে গেল। এই রকম ভাবে চলল রোজ। কিন্তু শামুক-ছানা নাছোড়বান্দা, শেষ পর্য্যন্ত বাঁশের ডগায় না উঠে সে ছাড়ল না। বল দেখি ঐ ভাবে ডগায় পৌঁছতে তার ক'দিন লেগেছিল?

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর (৩৭৫ পৃষ্ঠা দেখ)

(১) কৃত্তিবাসী রামায়ণ (২) (ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (গ) নবীনচন্দ্র সেন (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ঙ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। (৩) (ক) হাতীর বাচ্চা (খ) একটি আগ্নেয়গিরি (গ) শিল্পী। (৪) (ক) অর্জ্জুনের ধনুক (খ) শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ (গ) ছাপাখানায় একবারে যতটা ছাপা হয় (ঘ) এক রকম ধাতু (ঙ) জলের বোমা—ডুবো-জাহাজ ধ্বংস করতে ব্যবহার করা হয়। (৫) ৺গুরুসদয় দত্ত ও সেণ্ট পিটার্স গীর্জ্জা—রোম।

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

সিপ্রা

জান্তব চর্বি বিবর্জিত সাবান

কোমল অঙ্গের

বিশেষ উপযোগী

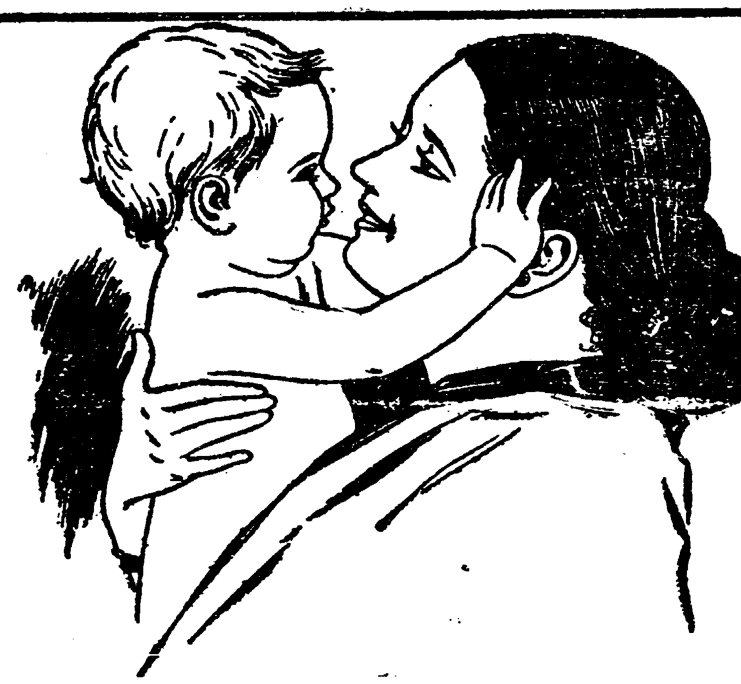

* প্রচুর ফেন

* স্নেহময় স্পর্শ

* মনোরম গন্ধ

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

ছেলেমেয়েদের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
পূজা-বার্ষিকী

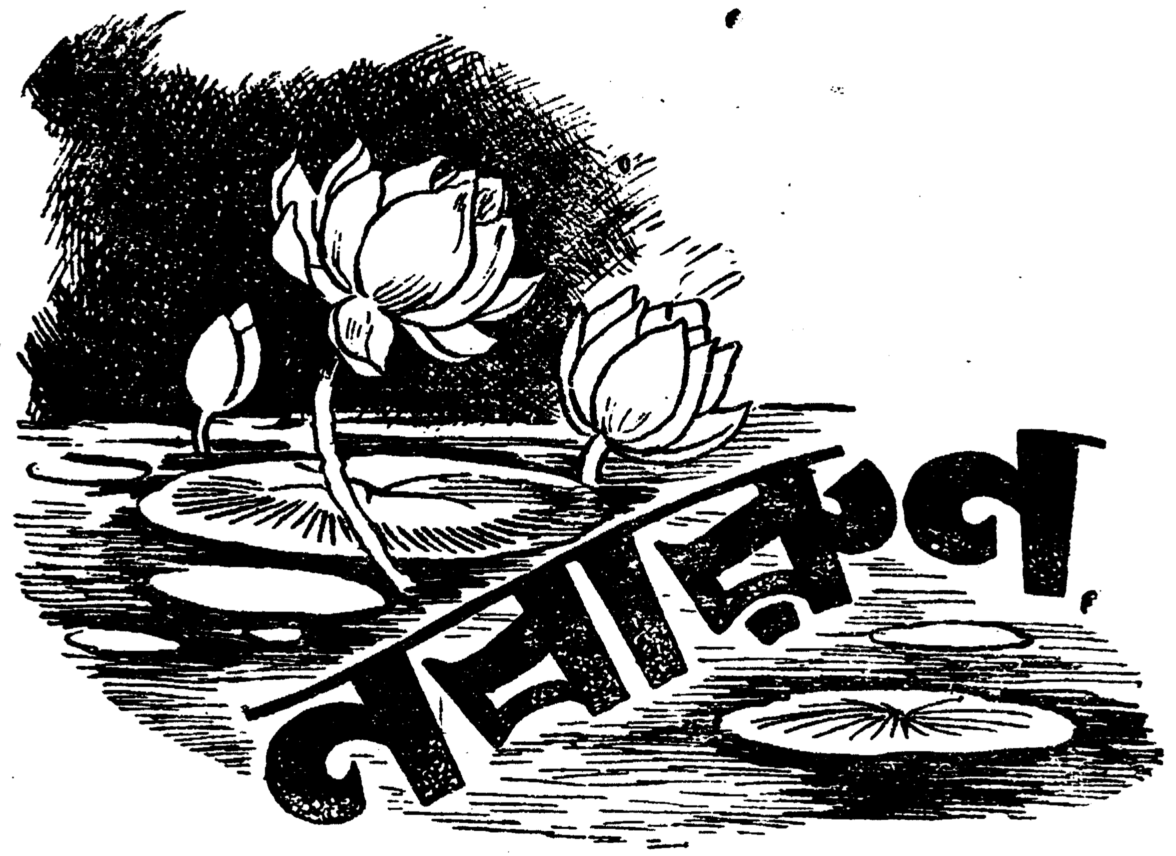

পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে

* গল্প কবিতা নাটক *

* আনন্দের খনি *

* অসংখ্য চিত্রের অ্যাল্‌বাম্ *

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ও চিত্র-শিল্পীদের সমন্বায়ে গড়িয়া উঠিতেছে

* দেব সাহিত্য-কুটীর, ঝামাপুকুর, কলিকাতা—৯ *

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি	১।০
পদ্মরাগ	১॥০
সোনার হরিণ	১॥০
নূতন পুরাণ	৸৵০
হাস্য ও রহস্য	৸৵০
চায়ের ধোঁয়া	৸০
হুকাকাশির গল্প	৸০
দমাদম্ দামোদর (নাটক)	।৵০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের

মহাভারতের গল্পগুচ্ছ (১ম)	৸০
ঐ (২য়)	৸০
দিগ্বিজয়ী বীর	৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲

শিবরাম ও মনোরঞ্জনের

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে	৸৵০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং চং	৸০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু	৸৵০

শ্রীমাধবা ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার

আজব গল্প	।৵০
অনেক গল্প	।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	১৲
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲
আকাশের গল্প	১।০
আবিষ্কারের গল্প	৸০
ধূমকেতু	৸০
অয়েল পেন্টিং (নাটক)	।০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা	১॥০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি	৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

দি লাষ্ট অফ দি মোহিকান্স্	॥৵০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের

অলিভার টুইষ্ট	॥৵০

শ্রীলীলা মজুমদারের

বদ্যিনাথের বড়ি	৸০

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

গল্পসল্প	।০
ছুটীর গল্প	।০

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়ের

যে জার্ম্মানী হেরে গেছে	২৲
ইউরোপের আলো	১।০

শ্রীসুনীল ঘোষ সম্পাদিত

রাতের ছায়া	॥৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

Regd.No. C—1641

রামধনুর পাঠকপাঠিকাদের

আমাদের শুভ বিজয়ার

প্রীতি ও শুভেচ্ছা

জানাচ্ছি।

সবরকম বই এর জন্য আমাদের কাছে আসুন

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লি:

১বি, রসারোড, কলিকাতা

রামধনু

য়েদের চিত্র পত্রিকা

২২শ বর্ষ
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬
ষাণ্মাসিক ২।০
প্রতি সংখ্যা ।৶০

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস-সি

—ছোটদের উপহারের সেরা বই—

ফ ট্ কে ৬০/

বড় বড় অক্ষরে ছাপা, পাতা-যোড়া ছবিতে ভরপুর।

ছোটদের সচিত্র কৃত্তিবাস ৮০

রঙিন কালিতে বড় বড় অক্ষরে ছাপা,
অসংখ্য ছবি।

কলিকাতার
পথের নিশানা ও তথ্যপঞ্জি ।৵০

কলকাতার মানচিত্রসহ। সর্ব্বদা পকেটে
রাখবার মত।

প্রাপ্তিস্থান : গ্রন্থজগৎ—৫২।৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড.
কে. বি. দাশগুপ্ত—৭২।২, হিন্দুস্থান পার্ক,
কলিকাতা

কবি প্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু)

সম্পাদিত

ভাই-বোন

বার্ষিক ৪৲, ষান্মাসিক ২।০, যে কোনো মাস থেকে যে কোনো মাস পর্য্যন্ত গ্রাহক হওয়া যায়। এমন দিন আসছে যে দিন প্রতি ঘরে ভাইবোনের জন্যে 'ভাই-বোন' না হলেই চলবে না। যারা দেখ নি, বিজ্ঞাপন শুধু তাদের জন্যে, নইলে গ্রাহকরাই এর চলন্ত বিজ্ঞাপন। এজেণ্ট কিংবা গ্রহক হবার জন্যে.—কার্য্যাধ্যক্ষ, ভাই-বোন কার্য্যালয়, ৪-এ ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা—৬

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

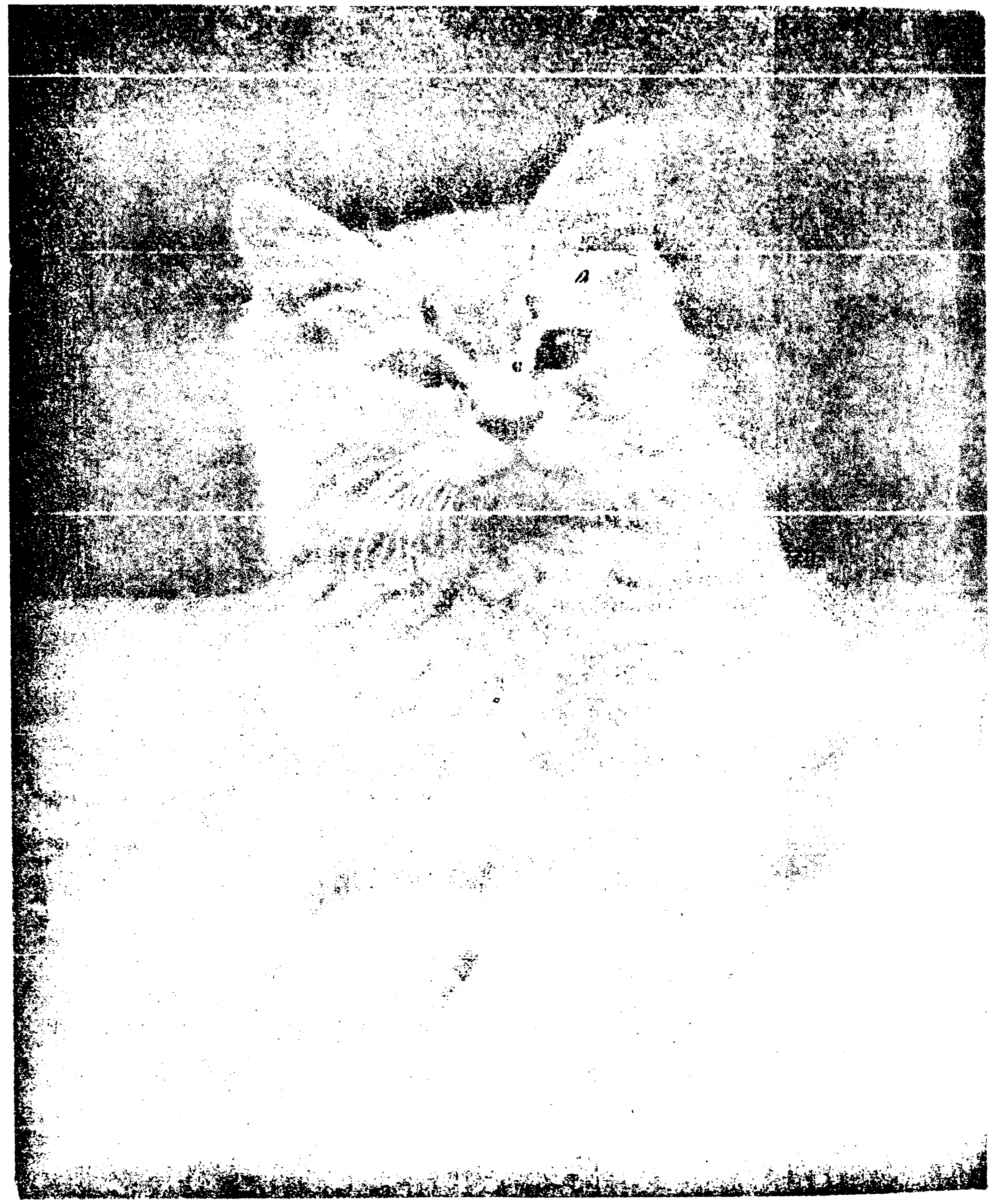

বাঘ মামার চো[illegible] মাসী

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২২শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ { ৮ম সংখ্যা

উজানে

অধ্যাপক শ্রীবিনায়ক সান্যাল, এম্. এ

ঘুম ভেঙে আজ জগৎটাকে নতুন চোখে দেখি—
বয়সটা মোর বছর তিরিশ পেছিয়ে গেছে, এ কি !
বিস্মরণীর উজান বেয়ে জীবন-তরী শেষে
হারিয়ে-যাওয়া দিনের ঘাটে লাগলো যেন এসে !
নেশার মত আবেশখানি জড়িয়ে গেল প্রাণে,
স্মৃতির কোকিল উঠ্‌লো গেয়ে পুরানো সেই তানে !
গাছের পাতায়, কল্‌মী লতায়, দীঘির কালো জলে
বনদেবীর আঁচলখানি সবুজ শোভায় দোলে ।
মায়ের স্নেহের সুধায় মধুর সন্ধ্যা-সকাল বেলা,
নীল আকাশে হাজার রঙের ছায়া-আলোর খেলা ।
জ্যোছনা-বিভল চাঁদনি রাতে নওরোজা-উৎসবে
তারায় তারায় কানাকানি চাঁদের চুমার লোভে !

কভু ঘন মেঘের মায়ায় ছাওয়া গগনতল,
মেঘ রূপসীর কাজল-চোখে ব্যথার অশ্রুজল!
অকারণেই আকুল করে আজকে সকল হিয়া
বাদল-দিনের সজল স্মৃতির স্বপন মোহনিয়া!

গোময়-লেপা আঙনখানি; তাহারি একধারে
বেদীর পরে তুলসীটি সেবায় স্নেহে বাড়ে।
সাঁঝের বাতি দেখায় বধূ আঁচল্-আড়ে ঢেকে,
প্রণাম করে প্রদীপখানি মাটির পরে রেখে।
শাঁখের রবে নিশীথিনীর বোধন করে বধূ—
সেবা-প্রেমের সজীব ছবি, বুকে সুখের মধু।
খুঁটায়-বাঁধা মুংগ্‌লী বুধী জাবর কাটে সবে—
ছবির মত; আজ মনে হয় এই তো সেদিন হবে!
ঘণ্টাখানেক কোনক্রমে পড়ার অভিনয়
সাংগ ক'রে নাত্‌নী-নাতি গুটি পাঁচেক ছয়
ব'স্‌লো ঘিরে ঠাকুরমারে; নুড়ির আঘাত লেগে
উৎস-মুখে ছুট্‌লো ধারা উছল উতল বেগে।
চ'ল্‌লো সুখে সোনার কাঠি রূপার কাঠির কথা,
কচি বুকে বাজ্‌লো বিষম রাজকন্যার ব্যথা!
তেপান্তরের বিজন-পুরে সাত-সাগরের পারে
অকাতরে ঘুমায় মেয়ে কে জাগাবে তা'রে?
কত দেশ ও দেশান্তরের লক্ষ যুগের আশা
গুমরিয়া আমার বুকে খুঁজিছে আছ ভাষা।

শিউলি-ছাওয়া কানন-পথে শিশির-ভেজা প্রাতে
শরৎ-রাণীর বোধন আবার প্রাণের আঙিনাতে।
ছলছল নয়ন কভু—মধুর হাসি কিবা,
দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল স্নিগ্ধ শ্যামল বিভা।

কত রাতের স্বপন-শেষে কতদিনের পরে
মায়ের চারু-চরণ-রেখা প'ড়লো প্রাণের পরে।
সেই অতীতের মায়া-পথের ছায়াছবিখানি
ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমায়; দিচ্ছে প্রাণে আনি'
নানান্ রঙের হাজার ছবি স্বপন-রেখায় আঁকা—
'কোন্ সুদূরের নীড়ের টানে মন মেলিল পাখা।
পিছিয়ে চলে ঘড়ির কাঁটা, উজানে বয় তরী,
হঠাৎ-আলোর ঝলক লেগে আঁধার গেছে মরি'।

ছেলেবেলাকার ভয়

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়

শৈশবে অথবা কৈশোরে মনের ভিতর একবার একটা ভয় ঢুকে গেলে সেটা বয়স বাড়লেও অনেক সময় মন থেকে তাড়ানো যায় না। উদাহরণ স্বরূপ একটী কাহিনীর উল্লেখ করছি।

একটী চব্বিশ পঁচিশ বছরের মেয়ে। ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় অন্যান্য আর পাঁচজন মেয়েরই মত। কিন্তু অন্ধকারের ভীতি ছিল তার অস্বাভাবিক রকম। মেয়েটীর সিনেমা দেখবার সখ ছিল কিন্তু সিনেমা দেখা আর তার কোনদিন ঘটে ওঠে নি। কারণ যেমনি সিনেমা হলে দরজা বন্ধ ক'রে অন্ধকার করা হ'তো, মেয়েটী আর থাকতে পারতো না, ভয়ে সে ভীষণভাবে ঘামতে আরম্ভ করতো। মেয়েটীর একটা মোটর গাড়ী ছিল। সেই গাড়ীতে চড়ে সে ছুটীর দিনে সহরের বাইরে বেড়াতে যেতো। কিন্তু কখনো যদি তাকে কোন পাহাড়ের সুড়ঙ্গ পার হ'তে হ'তো তা হ'লেই হ'তো তার মুস্কিল। আধো-অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে যেতে সে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতো।

এখন বলি মেয়েটীর মনে অন্ধকারের ভীতি জন্মালো কি ভাবে। তার বয়স তখন সাত-আট বছর হবে। একদিন বাগানে মালীর ঘরে বসে একা একা খেলা করছিল। মালী কখন এসে বাইরে থেকে ঘরটা তালা বন্ধ ক'রে চলে গেছে তা সে জানতেই পারে নি। যখন খেলা শেষ হয়েছে তখন উঠে দরজার

কাছে এসে দেখে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। ঘরের ঐ দিক্‌টা তখন বেশ অন্ধকার হয়ে উঠেছিল। তাতে সে হঠাৎ ভীষণ ভয় পেয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে। খানিক্ষণ পরে মালী ফিরে এসে দরজাটা খুলে দেখে মেয়েটী অজ্ঞান অবস্থায় মেজেতে পড়ে রয়েছে। সে তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে মেয়েটীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। মেয়েটী শারীরিক সুস্থতা বোধ করলো বটে কিন্তু মন থেকে তার ঐ অন্ধকারের আতঙ্ক মুছে গেল না।

তোমরা নিশ্চয়ই প্রশ্ন ক'রে বলবে, "এ ধরণের ভীতি তো অনেকেরই মনের ভিতর বাসা বেঁধে বসে থাকে বলে শোনা যায়, কিন্তু তাকে কি মন থেকে তাড়ানো যায় না?" তার উত্তরে বলবো, "নিশ্চয়ই যায়।" কি ভাবে সেটা সম্ভব তা বলি।

মনকে নিয়ে যেতে হবে বাল্যকালের ঐ অপ্রীতিকর স্মৃতির দিনে, যেদিন প্রথম মনের ভিতর ঐ আতঙ্ক জন্ম নিয়েছে। তাকে বলতে হবে, "তোমার জীবনের সব কথা অকপটে প্রকাশ ক'রে যাও। মনের কোন কথা লুকোবে না।" তা থেকে ধরতে পারা যাবে কবে কোন্ তুর্বল মুহূর্তে সে প্রথম ঐ ধরণের ভয় পেয়েছিল। তারপর তাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে তার ঐ ভয় মনের ভিতরকার একটা তুর্বল মুহূর্তের অভিজ্ঞতার ফল মাত্র। যখন সে ঐ কথাটা ভাল ক'রে বুঝতে পারবে তখন তার মন থেকে ঐ ভয়ের রেশ আস্তে আস্তে চলে যাবে।

আর এক ধরণের ভয়ের কথা বলি। একটী স্কুলের ছেলে। চেহারা তার সুশ্রী কিন্তু একটা পা একটু ছোট ও তার ফলে সে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। ছেলেটী ছিলো ভারী তুরন্ত ও মিথ্যাবাদী। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকতো ততক্ষণ বেশ শান্ত থাকতো, স্কুলে গেলেই তার তুরন্তপনা প্রকাশ পেতো। ক্রমশঃ তার ঐ তুরন্তপনা এত বেশী বেড়ে উঠলো যে ছেলেটীর বাবা তাকে এক মনের চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলেন। ছেলেটী সেখানে গিয়েও তার তুরন্তপনার পরিচয় দিতে লাগলো। এ ছাড়া সে চিকিৎসকের কাছে তার সাহসিকতা ও বীরত্বের কাহিনী বলে যেতে লাগলো। কবে সে কোন্ ছেলেকে ভীষণভাবে ঘুষি মেরে ফেলে দিয়েছিল, কবে কোন্ ছেলের সঙ্গে বক্‌সীং লড়ে তাকে ঘায়েল ক'রে দিয়েছিল ইত্যাদি। চিকিৎসক ছেলেটীর প্রতিটী অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য ক'রে যেতে লাগলেন। তারপর তাকে কাছে ডেকে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। এই

ভাবে প্রায়ই ছেলেটীর সঙ্গে চিকিৎসকের আলাপ-সালাপ চলতে লাগলো। তারপর তিনি বুঝতে পারলেন ছেলেটীর ঐ তুরন্তপনা তার স্বভাজজাত নয়, মনের ভিতরকার কোন ভয়ই তুরন্তপনার রূপ নিয়ে দেখা দেয় এবং তার মূলে রয়েছে ছেলেটীর বিকল অঙ্গ। অর্থাৎ ছেলেটীর মনে সব সময়ে ভয় থাকতো এই আশঙ্কা ক'রে—যদি তার সহপাঠীরা খোঁড়া বলে তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে। তাই সেটা ঢাকবার জন্য সে কৃত্রিম দৌরাত্ম্য প্রকাশ করতো। চিকিৎসক কিছুদিন ছেলেটীর সঙ্গে মিশে তাকে বুঝিয়ে দিলেন সহপাঠীদের কাছ থেকে তার এই আশঙ্কা করা নিতান্তই অমূলক। তার সহপাঠীরা তাকে ঘৃণা বা তুচ্ছজ্ঞান করে না, বরং সহানুভূতির চোখে দেখে। চিকিৎসক আরও বললেন, তার মত বুদ্ধিমান্ ছেলের পক্ষে এমন একটী সামান্য বিষয় নিয়ে এত উতলা হওয়া একটুও উচিত নয়। বরং তার পক্ষে উচিত কাজ হবে, মনকে সম্পূর্ণভাবে পড়াশুনার ভিতর নিয়োগ করা। আর তা না করে যদি অনর্থক সে তুরন্তপনা করে তা হ'লে ক্রমশঃ সকলেরই অপ্রিয়ভাজন হয়ে উঠবে। দেখা গেল চিকিৎসকের উপদেশ তার পক্ষে কার্যকরী হয়ে উঠেছে ও ছেলেটী ক্রমশঃ শান্ত হয়ে উঠছে। ক্রমেঁ দেখা গেল ছেলেটী পড়াশুনায় এত ভাল হয়ে উঠেছে যে ক্লাসের অন্যান্য ছেলেরা তাকে সেজন্য রীতিমত হিংসা করতে সুরু করেছে।

তা হ'লে তোমরা বুঝতে পারছ ভয় জিনিষটা মানুষের মনের তুর্বলতার ফল। এই রকম তুর্বলতা মনের ভিতরে একবার বাসা বাঁধলে জীবনে বড় অশান্তির সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, মনের ভিতরে ঐ তুর্বলতা থাকার দরুণ অন্য সকলের প্রতি তার আচরণ এমনই অদ্ভুত হয়ে দাঁড়ায় যে মনে হয় সে যেন ক্রমশঃ সম্পূর্ণ অন্য মানুষটী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তোমাদের মধ্যে কারও যদি মনে এই রকম ভয় থাকে তবে তার কারণ বার করতে চেষ্টা ক'রো। একবার কারণ বার করতে পারলে সে ভয় ভাঙ্গাতে বেশী বেগ পেতে হবে না।

ডাক্তার শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ডায়েরী

—পঁচিশ—

আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে তারা ভয়ে কুঁকড়ে পিছিয়ে গেল। তার পর আর তাদের দেখা গেল না। ঘোড়ারাও শান্ত হয়ে এল। ওদিকে ভোরের আকাশে কে যেন আবির ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আমরা ভীষণগড়ের এলাকায় এসে পৌছেছি। অলক এখন সেই দাগের ভিতর শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আমি তাই একটা মস্ত শাবল নিয়ে কৃতান্তবর্ম্মার ভীষণগড় দুর্গ আক্রমণ করতে গেলাম। প্রত্যেকটি দরজার মরচে-পড়া কব্জা ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে ফেললাম, যাতে ভীষণগড়ের মধ্যে যদি কখনও যাই অশোকের মত যেন বিপদে না পড়তে হয়। অশোকের ডায়েরীর কথা মত এবার নজর দিলাম মন্দিরটিতে। এখানে আমি অন্ততঃ তিনটি অ-মৃতের বিশ্রাম-কেন্দ্র দেখবার আশা করেছিলাম।

হঠাৎ মনে হ'ল অলকের কাছে হয়ত নেকড়ের দল গিয়ে ভয় দেখাতে পারে। কিন্তু তখনই মনে হ'ল, আমার কাজ হচ্ছে এখানে। ভগবানের যদি সত্যি সত্যিই ইচ্ছা হয়ে থাকে অলকের নেকড়ের হাতে মৃত্যু, তবে তাই হোক্। এই মৃত্যুতেও তার ক্ষতি নেই, মৃত্যুর পর স্বাধীনতা। আমার মনে হ'ল শয়তানের মত সারা জীবন অতৃপ্ত হৃদয়ে ঘুরে বেড়ানোর চাইতে নেকড়ের খাবার প্রাণ দেওয়াও ভাল।

মাটি, মাটি, আর মাটি! তার মধ্যে তিনটি স্মৃতিস্তম্ভের ভিতরে তিনটি কাঠের বাক্সে অশোকের ডায়েরীর সেই তিনটি অ-মৃত শয়তানের দেখা পেলাম। মনকে তৈরী করে ফেললাম, এদের আর এক দিনও বাঁচতে দেওয়া উচিত নয়। এদের আজই, এখনই মুক্তি দেওয়া দরকার। হত্যা! তিন তিনটেকে হত্যা করতে হবে! হত্যাও হয়ত নয়, এক নৃশংস অত্যাচার বলা যেতে পারে। তবু শাবলটা তুলে নিলাম। ভয়? হ্যাঁ, এক অজানা ভয় আমাকে ঘিরে ধরছে; তবু এক ঘা বসিয়ে দিলাম একজনের বুকে। দুমড়ে, কুঁকড়ে উঠল সে; মুখ দিয়ে, বুক দিয়ে গল গল ক'রে রক্ত ছড়িয়ে পড়ল চার ধারে। কিন্তু এক প্রশান্ত হাসিতে তার সারা মুখ ভ'রে উঠল। এবার যেন শরীরে শক্তি ফিরে এল। আর দু'জনকেও হত্যা ক'রে তাদের মুক্তি দিতে বেশী সময় লাগল না।

তার পর সমস্ত মন্দির তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে লাগলাম। এক জায়গায় একটা ভাঙা-চোরা স্মৃতিস্তম্ভ দেখে থমকে দাঁড়ালাম। বেশ বড় বড় করে লেখা আছে:

কৃতান্তবর্ম্মা

এই-ই তবে কৃতান্তবর্ম্মার অ-মৃত বাসস্থান? এই স্মৃতি-স্তম্ভ কেন শূন্য তা আমার জানতে তো বাকী নেই! যাতে আর কোনও দিন সে এইখানে আর ফিরে না আসে তাই সেই ফুল কতগুলো সেখানে ছড়িয়ে দিলাম।

আর দেরী করা উচিত নয়। অলক ঘুম থেকে উঠে ভাবতে পারে। তাই ফিরে এলাম।

একটু এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর একটা ভাল জায়গা দেখে অলককে বসিয়ে বললাম—"জায়গাটা বেশ নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে। অন্ততঃ যদি একদল নেকড়ে বাঘও আসে, আমি একাই তাদের সঙ্গে যুঝতে পারব।"

তারপর ছোট দূরবীণ নিয়ে আমি চারদিকে তাকাতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও কিছু নেই। আমার কাছ থেকে অলক দূরবীণটা চেয়ে নিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ তার চীৎকার শুনতে পেলাম—"দেখুন, দেখুন!"

তার হাত থেকে দূরবীণটা নিয়ে দেখতে লাগলাম। অনেক দূরে দেখা গেল একদল বুনো পাহাড়ী একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে যত জোরে সম্ভব ছুটে আসছে। সেই গাড়িতে একটা মস্ত কাঠের বাক্স।

এই দেখে আমি আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম; তবে এই ক্লান্তিকর বীভৎস কাহিনীর শেষ হয়ে এল! সন্ধ্যাও ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। এটুকুও বুঝতে পারছিলাম যে যদি কোনও রকমে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ওই কাঠের বাক্স অনাহত থাকে তো সে সমস্ত কৌশল—সমস্ত শক্তি ব্যর্থ ক'রে দিয়ে বেঁচে যাবে। আমি সেই পাহাড়ের উপর কিছু ফুলের টুকরো ছড়িয়ে দিয়ে বললাম—"অলক, তুমি এখানে অপেক্ষা কর। এখানে তোমার কোনও ভয় নেই।"

আবার তাকিয়ে দেখলাম—তারা ঘোড়াকে চাবুক মেরে অসম্ভব জোরে গাড়ি ছুটিয়ে আসছে। ঘোড়াগুলোর পায়ে যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।"

অলক আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠল—"ওই দেখুন, দেখুন! দু'জন লোক ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের পিছনে পিছনে তাড়া ক'রে আসছে। হ্যাঁ, দক্ষিণ দিক্ দিয়ে আসছে। ওরা নিশ্চয়ই সনাতন বাবু আর অরূপ বাবু!"

হ্যাঁ, তাই বটে। শুধু তাই নয়, উত্তর দিক্ দিয়েও আরও দু'জন দুর্দ্দম বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। হ্যাঁ, ওরা অশোক আর তরুণ। বলে উঠলাম—"আর ভয় নেই। ওরা দু' দিক দিয়ে ঘোড়ার গাড়িটাকে ঘিরে ধরবে।"

দূর থেকে নেকড়ের গর্জ্জন শোনা গেল। তার পর দূরবীণ দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, চারদিকের বন থেকে দলে দলে নেকড়ে বেরিয়ে আসছে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তই এখন এক এক যুগ বলে মনে হ'তে লাগল। এখন ঘোড়ায় চ'ড়ে ছুটে-আসা প্রত্যেকটি লোককে চেনা যাচ্ছে। দু' দলই গাড়িটাকে প্রায় ধরে ফেলার মত করে এনেছে; কিন্তু পাহাড়ীরা প্রাণপণ জোরে গাড়ি ছুটিয়ে চলেছে।

স্থির করে ফেললাম, যে ভাবেই হোক গাড়িটাকে আমার কাছ থেকে এগিয়ে যেতে দেব না। গুলি ছুঁড়ে তাদের থামাতেই হবে। বন্দুক তুলে ধরলাম।

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে অশোক আর সনাতনের বজ্রগম্ভীর গলা শোনা গেল—"থাম।" গাড়িটা এক মুহূর্ত্তে থেমে গেল। দু'পাশ থেকে অশোক ও তরুণ আর সনাতন ও অরূপ তাদের গাড়ি ঘিরে ফেলল। পাহাড়ীদের সর্দ্দার কিন্তু কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই তাদের দলবলকে আবার গাড়ি চালাতে হুকুম দিল। কিন্তু তারা চারজন বন্দুক উঁচিয়ে ধরে আবার থামতে হুকুম করল। সেই মুহূর্ত্তে আমিও বন্দুক নিয়ে তাদের মাঝে লাফিয়ে পড়লাম।

চারদিক্ দিয়ে এ ভাবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের ঘিরে ফেলতে দেখে তাদের সর্দ্দার তাদের ভাষায় কি বলামাত্র সকলে তাদের ছোরা-ছুরি নিয়ে তৈরী হ'ল।

সূর্য্য তখন পাহাড়ের মাথায়। সর্দ্দার ঘোড়ার লাগাম ধরে ঝাঁকানি দেওয়া মাত্র চারজনে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘোড়ার গাড়ির দিকে ছুটে গেল। পাহাড়ীরাও গাড়িটাকে ঘিরে ধরল।

কিন্তু এদের সমস্ত বাধা ঠেলে অশোক আর সনাতন গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। যেমন করেই হোক্, সন্ধ্যার আগেই তাদের কাজ শেষ করে ফেলতেই হবে। কোনও বাধাই তারা মেনে নিতে রাজি ছিল না। সনাতন এগিয়ে যাওয়ামাত্র দু'জন ছোরা দিয়ে তাকে আঘাত করল। বুকের একপাশ রক্তে রাঙা হয়ে উঠল, কিন্তু বন্দুকের এক এক ঘায়ে সনাতন ততক্ষণে চারটে পাহাড়ীকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে। সেই ফাঁকে অশোক এক লাফে গাড়ির উপর উঠে দাঁড়াল।

অশোক কাঠের বাক্সের ঢাকনা খোলামাত্র সনাতন ছোরা বাগিয়ে এগিয়ে গেল, আর সেই মুহূর্ত্তে একটা হাত বাক্স থেকে বেরিয়ে এসে তার গলা টিপে ধরল। পর মুহূর্ত্তেই কৃতান্তবর্ম্মার রক্তলোলুপ মুখ বাক্স থেকে উঠে দাঁড়াল। তরুণ আর অরূপ এগিয়ে যাওয়ার

আগেই সনাতন আর অশোক তাদের ছোরা দু'টো এক সঙ্গে কৃতান্তবর্ম্মার বুকে বসিয়ে দিল। একবার থর থর করে কেঁপে উঠল কৃতান্তবর্ম্মা, তারপর মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল।

কৃতান্তবর্ম্মাকে ওভাবে পড়ে যেতে দেখে পাহাড়ীরা ভয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। আমরা ছুটে গেলাম সনাতনের কাছে। কৃতান্তবর্ম্মার আসুরিক শক্তিতে তার ঘাড় ভেঙে গেছে, পিঠেও দু'টো গভীর ক্ষত।

তার মৃত্যু-নীল মুখে স্বর্গীয় হাসি লেগে আছে।

গোধূলির লাল আকাশে নিশীথের প্রেতাত্মার মত ভীষণগড় একা দাঁড়িয়ে। রাত্রির অন্ধকার আর ঘন কুয়াশা তার উপর নেমে আসছে, এখনই হয়ত ঢাকা পড়ে যাবে।

দূরে—বহুদূরে পলায়িত নেকড়ের বিক্ষুব্ধ গর্জ্জন করুণ আর্ত্তনাদের মত মনে হচ্ছিল।···

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা সনাতনের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম।*

—শেষ—

* বিখ্যাত ইংরাজী উপন্যাস 'ড্রাকুলা'র ছায়া অবলম্বনে।

মলিয়েরের অভিনয়

অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ

মলিয়েরে ছিলেন ফরাসী দেশের একজন বিখ্যাত নাট্যকার। তিনি নিজের লেখা নাটকে অভিনয়ও করতেন। জীবনের শেষ ভাগে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল তবু তিনি অভিনয় ছাড়তে পারেন নি। শেষে এমন অবস্থা হ'ল যে তাঁর চিকিৎসকেরা তাঁকে রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে একেবারে বারণ করে দিলেন। মলিয়েরে তখন এক বুদ্ধি খাটালেন। তিনি "কাল্পনিক অকর্ম্মণ্য" (দি ইম্যাজিনারী ইন্‌ভ্যালিড্) নাম দিয়ে একটি নাটক লিখলেন। নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে তা'তে এমন একটা চরিত্র ছিল যার অভিনয় চেয়ারে বসে বসেই করা যেতে পারে। ১৬৭৩ সালে ২৭শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে এই নাটকের পঞ্চম বার অভিনয় হয়। মলিয়েরের শরীর সেদিন খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। তাঁর চিকিৎসকেরা তাঁকে বিশ্রাম নেবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করলেন; তাতে মলিয়েরে উত্তর দিলেন, "আমার অভিনয় করা বা না করার উপর অপর পঞ্চাশ জন লোকের জীবিকা নির্ভর করছে; আমি অভিনয় না করলে তাদেরও আজ কিছু জুটবে না। আমার না গিয়ে উপায় নেই।"

বিকাল চারটার সময় অভিনয় আরম্ভ হওয়ার কথা। মলিয়েরেকে রঙ্গমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হ'ল। যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে তিনি অভিনয় শেষ করলেন। তাঁর অভিনয় এত সুন্দর হয়েছিল যে দর্শকদের কেউই বুঝতে পারেন নি যে তিনি অসুস্থ। নাটকের অভিনয় শেষ হওয়ার এক ঘণ্টা পরে মলিয়েরে জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকেও চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন।

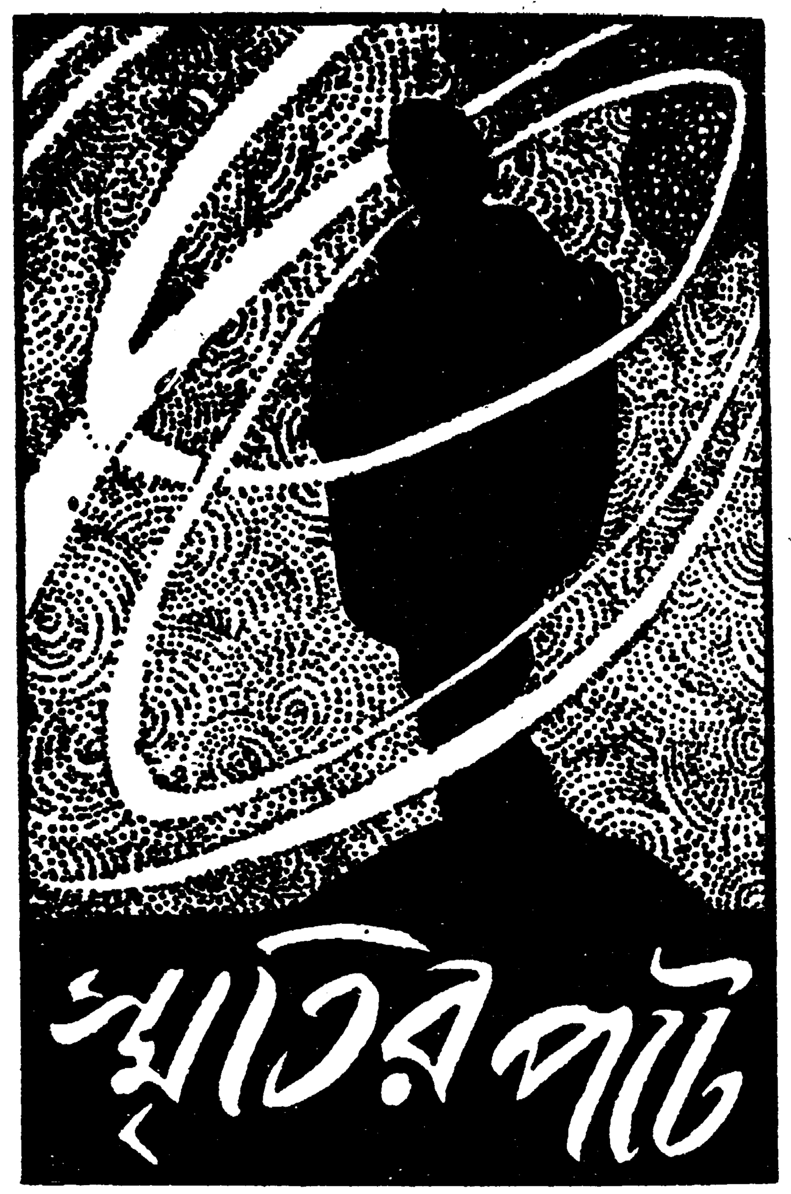

আত্মোন্নতি সমিতির কথা

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
এম্. এ, বি. এস্-সি

"আত্মোন্নতি"র সহিত কয়েকটি ছোট ছোট দলের সংযোগ

আত্মোন্নতি সমিতির সহিত আর যে সকল দল ও দলের লোক বৈপ্লবিক কার্য্যে অল্পবিস্তর যোগ দিয়াছিল এবারে তাহাদের কথা বলি।

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের মুকুন্দ চক্রবর্ত্তীর দল। প্রসিদ্ধ উকিল ও অধ্যাপক ব্রজ শাস্ত্রীর ভাই মুকুন্দ এই দলের নেতা বলা যাইতে পারে। অহীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চানন ঘোষাল, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন চক্রবর্ত্তী ও মুকুন্দের ভাই বিনোদলাল ও তাহার বন্ধু মহাদেব চক্রবর্ত্তী ছিল এই দলের প্রধান। ব্রজ শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের অধ্যাপক ছিলেন, আমরা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম। তিনি আমাদের বৈপ্লবিক কার্য্যের কথা জানিতেন এবং সেই জন্যই যেন আমাদিগকে অত্যন্ত স্নেহের সহিত দেখিতেন। শুনিয়াছিলাম মুকুন্দ পরে বারীন ঘোষের দলে মিশিয়াছিল এবং সেখানকার বোমার এক বাক্স কিছু সময়ের জন্য মুকুন্দের গৃহে স্থানলাভ করিয়াছিল।

মুকুন্দ এম্. এস্-সি পাশ করিয়া কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট কলেজে কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপক হইয়া গিয়াছিল ও কয়েক বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছিল। ধীরেন চক্রবর্ত্তী মুকুন্দদের উৎসাহে জার্ম্মানীতে গিয়া সেখান হইতে ডক্টর উপাধি লইয়া আসে। সে এখন রিপন (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। পঞ্চানন ঘোষাল হাইকোর্টের উকিল।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে একটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অধ্যাপনা-গৃহে রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপনা ছাড়া কয়েকটি প্রচার-কার্য্য করিতেন। আচার্য্য রায় যে খুব বেশী কেমিষ্ট্রি জানিতেন তাহা মনে হয় না। তিনি যে ভাল ইংরাজী বলিতে পারিতেন তাহা নয়,—তাঁহার কথা আটকাইয়া যাইত। তিনি যে সুপুরুষ ছিলেন এমন কথা কেহ বলিত না। পোষাক-পরিচ্ছদে কোন জাঁকজমক তো ছিলই না—বরঞ্চ ছিল ঠিক তার উল্টা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছাত্রদের উপর তাঁহার প্রভাব মন্ত্রশক্তির মত ছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি তাঁহার ছিল একান্ত অনুরাগ। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী, হেমেন সেন, প্রিয়দারঞ্জন রায়, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, নীলরতন ধর প্রভৃতি এই আকর্ষণের ফল।

তিনি দেশে শিল্প-বাণিজ্য ও ব্যবসায় প্রভৃতির উন্নতির জন্য ছাত্রদিগকে উৎসাহিত ও আকর্ষণ করিতেন। রাজশেখর বসু, মুকুন্দ ও বিনোদ চক্রবর্ত্তী, মহাদেব চক্রবর্ত্তী, রমেশ চক্রবর্ত্তী, অহীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জিতেন দত্ত, বীরেন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি তাঁহার এই প্রচার-কার্য্যের ফল।

তিনি অধ্যাপনা-গৃহে সমাজ-সংস্কার প্রচার করিতেন। তাঁহার অনেক ছাত্র এই প্রচার অনুযায়ী কাজ করিয়াছে।

আর তিনি প্রচার করিতেন বিচারসহ মতবাদ—যাকে ইংরাজীতে বলে র‍্যাশনালিজ্ম্। তিনি বলিতেন বিচার না করিয়া গুরুর কথা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবে না; বিজ্ঞান-গবেষণার এই মূল সূত্র। আমাকে ও সতীশকে আচার্য্যের এই প্রচার অধিক আকর্ষণ করিয়াছিল।

মনে আছে একদিন সন্ধ্যার সময় আচার্য্য গিরিশচন্দ্র বসুর এক পরিচয়-পত্র লইয়া আমি ও সতীশ আচার্য্য রায়ের (তখন আমরা বলিতাম ডাক্তার রায়) সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি কি একটা বই পড়িতেছিলেন, বোধ হয় ব্ল্যাকির "হিষ্ট্রী অব সিভিলিজেশন"—সভ্যতার ইতিহাস; আমাদিগকে বেশ ভাল ভাবেই গ্রহণ করিলেন। প্রথমেই বলিলেন, "যখন আসিবে এই সময়েই আসিবে। এইটা আমার গল্প করিবার সময়। সকালে আমার কাজ করিবার সময়, তখন কখনও আসিবে না।—অমুক এক বড়লোকের পত্র লইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি।" অনেক কথা হইল। পরে অনেক দিন গিয়াছে। হিষ্ট্রী অব্ সিভিলিজেশন্ এবং লেকির 'হিষ্ট্রী অব্

র‍্যাশনলিজ ম্ ইন্ ইয়োরোপ' নামক গ্রন্থ পড়িতে উপদেশ দিলেন। এই সময়েই ইংল্যাণ্ডে র‍্যাশনালিষ্টিক্ সোসাইটি নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতি ঐ বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রচার করিয়া মাত্র ছ'আনা মূল্যে বিক্রয় করিত। আমরা এই সিরিজের হাক্সলি, টিণ্ডাল প্রভৃতি বহু লেখকের গ্রন্থ পাঠ করি। পরে আমরা আচার্য্য রায়ের সান্ধ্য সমিতিতে যোগ দিই। এই সমিতি প্রত্যহ সন্ধ্যা বেলা গড়ের মাঠে রবার্ট মূর্ত্তির নিকট বসিত।

আচার্য্যের প্রচারের ফলেই আমাদের মনে সব কিছু বিচার করিয়া তবে গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। বাকল, লেকি, হাক্সলি ও টিণ্ডাল প্রভৃতি মনীষীর লেখা বই পড়িয়া ঐ ভাব আরও বদ্ধমূল হয়। বাকলের ইতিহাস পড়িতে পড়িতে এবং পরে ডারউইন ও গ্যাল্টনের বই পড়িয়া আমার মনে একখানি বই লিখিবার প্রেরণা আসে এবং আমি "ভারতবর্ষের অধঃপতনের একটি বৈজ্ঞানিক কারণ" নামক বইখানি রচনা করি।

আচার্য্যের অনেক শিষ্যই কিন্তু "নির্ব্বিচারে গুরুর কথাও মান্য করিবে না"—এই উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাঁহাকে তাহারা 'নির্ব্বিচারেই' মান্য করিত। আমরা তাহা পারি নাই। প্রবাসীতে প্রকাশিত আমার 'এসিয়ার অদৃষ্টবাদ' নামক প্রবন্ধ আচার্য্যের সহিত মতবিরোধের ফলেই লেখা হয়। তিনি একদিন কথোপকথন কালে বলিয়াছিলেন, কোন্ সাহেব বলিয়াছে—'যে জাতি গীতা ও বেদান্ত দর্শন রচনা ও প্রচার করিয়াছে সে জাতির অভ্যুদয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই।' আমার প্রবন্ধে ঐ মতবাদের বিপক্ষে আলোচনা ছিল। এবং উহাতে আমি যে ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলাম তাহা পরবর্ত্তীকালে সত্য প্রমাণিত হয়। কোনও যুবকের বাক্সে গীতা দেখিতে পাইলে পুলিস তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত।

এই মনোবৃত্তির ফলে আমরা পরবর্ত্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ গ্রহণ করিতে পারি নাই। এই মতবাদ,—ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'মিষ্টিসিজ ম্',—তখন আমাদের কুসংস্কার বলিয়া মনে হইত। আজ পরিণত বয়সে সে সম্বন্ধে মত বদলাইয়াছে। এর কারণ প্রয়োজন হইলে পরে বলিব।

ক্রমশঃ আচার্য্য রায়ের সহিত যখন ঘনিষ্ঠ আলাপ হইল তখন আমরা তাঁহার নিকট আমাদের বৈপ্লবিক সমিতির কথা তুলিলাম। তিনি অত্যন্ত খুসী হইলেন। কিছুটা শুনিয়া বলিলেন, "আমার এখানে (তৎকালীন আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে) এরূপ গুরুতর কথা আলোচনা করিবার ভাল সুযোগ নাই;

আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি সীতারাম ঘোষ (?) লেনে থাকেন; তাঁহার পরিবার এখন সেখানে নাই। সেইখানে তোমাদের সকল কথা শুনিব।"

সত্যানন্দ বসুর সঙ্গে সেই আমাদের প্রথম পরিচয়। তাঁহার এক ত্রিতল গৃহে কথাবার্ত্তা হইল। চারজনে—আমি, সতীশ, আচার্য্য ও সত্যানন্দ বাবু। দু'জনেই সকল কথা জানিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং দু'জনেই আমাদের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। আচার্য্য বৈপ্লবিক কার্য্যের জন্য অর্থ সাহায্য করিতেন—আমার বা সতীশের হাত দিয়া। সত্যানন্দ বাবুও পরামর্শাদি দিয়া বিশেষ সাহায্য করিতেন। তিনি তখন কংগ্রেসের কলিকাতা অঞ্চলের সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমরা অনেক সুপরামর্শ পাইয়াছি।

সত্যানন্দ বাবুর কাছে মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম; সেটি অন্যত্র প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছি। মহাত্মা গান্ধী তখন সবে মাত্র এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার সততা সম্বন্ধে কিছু জানিতে চেষ্টা করায় সত্যানন্দ বাবু বলিলেন, "গান্ধীর সততা অসাধারণ। গোখেল আমাকে একবার বলিয়াছিলেন, 'গান্ধীর মত ঘোরতর সন্নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি আমি আর দেখি নাই। সাউথ্ আফ্রিকায় আমি যখন তাহার গৃহে অতিথি ছিলাম সকালে প্রাতঃকৃত্যের জন্য কমোড ব্যবহার করিতে হইত। গান্ধী নিজে কমোড সাফ করিতে আসিয়াছে দেখিয়া আমি ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম, নিজেই সাফ করিতে গেলাম। কিন্তু গান্ধী তাহা করিতে দিল না। বলিল, মান্য অতিথির কমোড সাফ তাহাকে নিজেকেই করিতে হইবে, বাড়ীর কাহারও উপর ভার দিবে না। তাহাকে এই সঙ্কল্প হইতে বিরত করিতে পারি নাই'।"

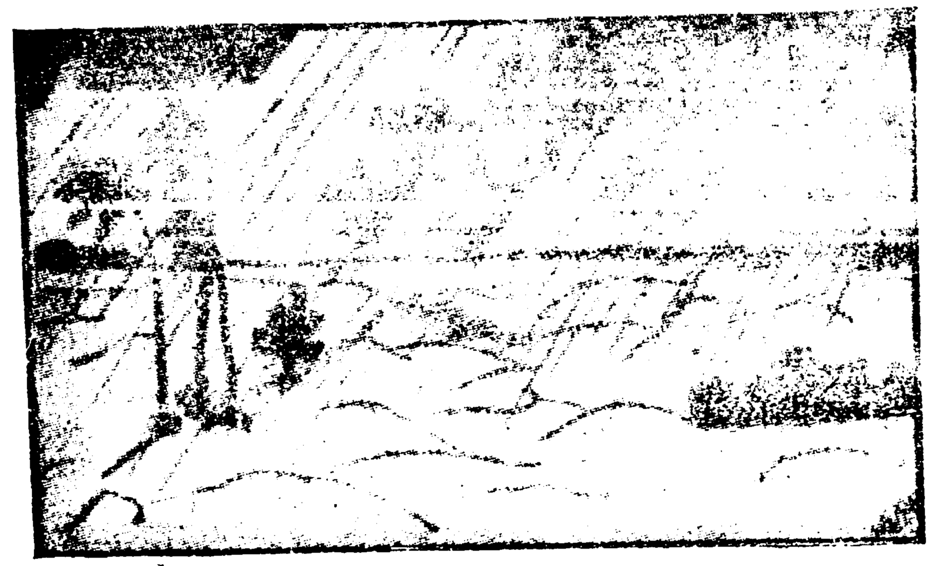

পুতুল

শ্রীবরেন ঘোষাল

ছেলেবেলায় পুতুল নিয়ে ছেলে-খেলা করে নি এমন ছেলে বা মেয়ে নেই বললেই চলে। ছেলেবেলায় পুতুলরাই ছেলেমেয়েদের নিঃসঙ্গ জীবনের সাথী। পুতুলের সঙ্গে তারা কথা বলে—হাসে। পুতুলকে তারা গান শোনায়, পড়ায়, স্নান করিয়ে দেয় ও ঘুম পাড়ায়। পুতুলকে তারা আদর করে, আবার প্রয়োজন হ'লে শাসনও করে। পুতুল নিয়ে খেলাটা ছেলে-খেলা হ'তে পারে কিন্তু ছোটদের জীবনে এদের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বড় কম নয়। এমন কি, বলতে কোন বাধা নেই,—ছোটদের শিক্ষা ব্যাপারেও পুতুলের অবদান অপরিসীম।

এই পুতুল খেলা বর্ত্তমান যুগ বা সভ্যতার দান নয়। আধুনিক যুগ বা সভ্যতা নতুন নতুন আশ্চর্য্যজনক পুতুলের সৃষ্টি করেছে সত্য কিন্তু পুতুল নিয়ে খেলার সৃষ্টি বহুদিন আগেই হয়েছে। হাজার হাজার বছর আগেও ছেলেমেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলা করেছে। প্রাচীন মহেঞ্জদাড়োয় এ রকম পুতুল পাওয়া গেছে। প্রাচীন মিশরে দু'হাজার বছর আগেও যে পুতুল নিয়ে ছেলেমেয়েরা খেলা করত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। দু'হাজার বছর আগেকার এমন একটা পুতুল পাওয়া গেছে যার বোতাম মত একটা জিনিষ টিপে দিলে কাপড় কাচতে গেলে আমরা যে সব ভঙ্গী করি তা সব এ করবে। আজকে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে নতুন নতুন পুতুলের সৃষ্টি হচ্ছে; কিন্তু দু' হাজার বছর আগেও বর্ত্তমান সভ্য যুগের নির্ম্মিত উন্নত ধরণের পুতুলের মত পুতুল ছিল এটাই বিস্ময়ের কথা।

প্রাচীন গ্রীস্ দেশেও ছেলেমেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলা করত। ছোট ছেলেমেয়েদের কবর খুঁড়ে নানা রকমের অনেক পুতুল বার করা হয়েছে। এই সব পুতুলগুলো মাটী, মোম বা ঐ জাতীয় জিনিষ দিয়ে প্রস্তুত। তখনকার দিনে খুব অল্প বয়সে গ্রীস দেশে ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেওয়া হ'ত। বিবাহ হয়ে গেলে মেয়েরা তাদের স্ব স্ব পুতুল দেবতার মন্দিরে দান করে দিত। বিবাহের আগে যে সব মেয়েদের জীবন-প্রদীপ অকালে নিভে যেত তাদের পুতুল ইত্যাদি তাদের স্ব স্ব কবরের সাথে রেখে দেওয়া হ'ত। এই সামান্য ঘটনা থেকে এটা খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে ছেলেমেয়েদের—বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে পুতুলের অচিন্ত্যনীয় প্রভাব ছিল সেখানে। উত্তর আমেরিকার কোন কোন স্থানের নারীরা মৃত বা হারানো পুত্র বা কন্যার বদলে একটা করে পুতুল ব্যবহার করতেন। এই পুতুলটিকে তারা জীবিত পুত্রের মত মনে করতেন এবং যেখানেই তাঁরা যান না কেন পুতুলটিকে সঙ্গে নিতে ভুলতেন না।

ফরাসী দেশে পুতুলকে 'পপি' বলা হয়। এই নামটার পেছনে একটা ছোট্ট ঘটনা আছে। পঞ্চম চার্লসের রাজত্বকালে ফরাসী দেশে একদিন ইটালি দেশের এক অধিবাসী এসে উপস্থিত হ'ল। সঙ্গে তার অসংখ্য নারীমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলো প্রাচীন রোমের প্রস্তর-

মূর্ত্তির বা মুদ্রায় অঙ্কিত ছবির অনুকরণে তৈরী করা হয়েছিল। সেই ইটালীবাসী লোকটি দর্শনীর বিনিময়ে ফরাসীবাসীদের এই সব মূর্ত্তি দেখাত। পুতুলগুলোর কারুকার্য্য ও অন্যান্য নানা বৈশিষ্ট্যের কথা শুনে ফরাসী-রাজ চার্লস তাকে ডেকে পাঠালেন এবং প্রাচীন রোমের সম্রাজ্ঞী পপিয়ার অনুরূপ একটি পুতুল কিনলেন। এই 'পপিয়া' কথাটা থেকেই 'পপি' কথাটা এসেছে।

ভারতবর্ষ, চীন, ব্যাবিলন ইত্যাদি দেশে প্রাচীনকালে যে পুতুল নিয়ে ছেলেমেয়েরা খেলত তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। রাজরাজড়াদের সুন্দর সুন্দর বিরাট প্রাসাদে অসংখ্য অদ্ভুত ও আশ্চর্য্যজনক পুতুল শোভা পেত।

অতীতে যে জিনিষটি ছিল—বর্ত্তমানেও তাই আছে, কেবল রূপটা বদল হয়েছে। পুতুল খেলা যেমন ভাবে যে দেশে ছিল তেমন ভাবে সেই দেশে আজও রয়েছে। কেবল বিজ্ঞান ও সভ্যতার প্রভাবে পুতুল-গুলোর রূপ বদল হচ্ছে। ছোটদের কাছে পুতুলগুলোর আদর আজও আগেকার মত রয়েছে, বরং তা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

পুতুলের বিয়ে

পুতুল যে শুধু খেলার জন্যেই ব্যবহার করে ছেলেমেয়েরা তা নয়। প্রয়োজন হ'লে তারা পুতুলগুলোকে বড় বড় কাজেও লাগায়। ১৯৩৮ সালে যখন ইংরেজ রাজকুমারী ও তার বোন ফরাসী দেশে বেড়াতে যান তখন সেখানকার ছেলেমেয়েরা তাঁদেরকে দু'টি বিরাট পুতুল উপহার দেয়। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী যখন ইউরোপে গিয়েছিলেন তখন সেখানকার ছেলেমেয়েরা তাঁদেরকে তাদের সব চেয়ে প্রিয় যে জিনিষ, পুতুল, তাই উপহার দিয়েছিল। ছোট ছেলেমেয়েরা পুতুল উপহার দেওয়া বড় গৌরবের বিষয় মনে করে। যাঁরা এই উপহার পাবার অধিকারী হ'ন তাঁরাও বিশেষ আনন্দ লাভ করেন—কারণ ছোটরা তাদের সব চেয়ে যা প্রিয় তাই তাঁদের উপহার দিচ্ছে।

আমাদের দেশেও পুতুলের প্রভাব বড় কম নয়। যাঁদের বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়ে আছে তাঁরা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন ছোট ছেলেমেয়েরা,—বিশেষ ক'রে ছোট মেয়েরা, পুতুল খেলার ভেতর দিয়ে অন্যান্য ছোট মেয়েদের সঙ্গে সই পাতায়। আরও মজার কথা হচ্ছে, তারা ছেলে-পুতুলের সঙ্গে সই-এর মেয়ে-পুতুলের বিয়ে দেয়।

আবার পুতুলের এই বিয়েতে অনেক বড়লোকের বাড়ীতে আনন্দ-উৎসবেরও আয়োজন করা হয়—পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয়—ভোজনাদির বন্দোবস্ত থাকে। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের ঘরে বিরাট আকারে কিছু না হ'লেও ছোটখাট উৎসব ও খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত থাকে। সহরে আজকাল পুতুলের বিবাহ ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ কমে গেছে বটে কিন্তু গ্রামে আজও তা অনুষ্ঠিত হয়। এই সামান্য ঘটনাকে বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারা যাবে যে পুতুলগুলো অচেতন জড় পদার্থ বটে কিন্তু তার প্রভাব সচেতন সজীব পদার্থের চেয়ে বিন্দু মাত্র কম নয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে পাঞ্জাব প্রদেশে পুতুল বিশেষভাবে আদৃত হয়। পাঞ্জাবে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে পুতুলের মেলা বসে। এই মেলাগুলি সেখানকার নর-নারী ও বালক-বালিকাদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা ও আনন্দের সঞ্চার করে। বাংলা দেশে কোন জায়গায় পুতুলের মেলা হয় কিনা আমি তা বলতে পারি না—তবে বাংলা দেশে, যে মেলাই হোক না কেন, পুতুলের স্থান সর্ব্বাগ্রে।

কি ছোট কি বড় প্রত্যেক নর-নারীর উপর পুতুলের প্রভাব থাকায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পুতুল-শিল্প খুব ভাল ভাবে গড়ে উঠেছে। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই সব চেয়ে সুন্দর ও কারুকার্য্য-খচিত পুতুল তৈরী হয়। কৃষ্ণনগর ও কুমোরটুলির কুমোরদের অবদান এদিক্ থেকে বড় কম নয়। মাটীর তো বটেই, পাথর কেটেও সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি তৈরী করতে শিল্পীরা পটু। দুঃখের বিষয় আমাদের এই নাম-না-জানা অসাধারণ দক্ষ শিল্পীদের নির্ম্মিত জিনিষ সাধারণের কাছে তেমন সমাদর পায় না। কলের তৈরী সস্তা বিদেশী জিনিষই দেশের লোক অধিক পরিমাণে ক্রয় করে।

ছোট ছেলেমেয়েদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিতে পুতুলরা যথেষ্ট সাহায্য করে। এই জন্যে আমেরিকার নিউইয়র্ক ও ডেট্রয়টে বইএর অনুকরণে খেলনার 'পাঠাগার' (টয় লাইব্রেরী) স্থাপন করা হয়েছে। যে সব গরীব ছেলেমেয়েদের খেলনা নেই—খেলনা কেনবার সামর্থ্য নেই—এই লাইব্রেরী থেকে তারা পুতুল নিয়ে যায় এবং খেলে ফেরৎ দেয়। আমাদের দেশেও জাতীয় সরকার এবং যারা ছোটদের জন্য ভাবেন তাঁরা যদি এ বিষয়ে অগ্রণী হ'ন তা হ'লে তার চেয়ে আনন্দের বিষয় কি থাকতে পারে?

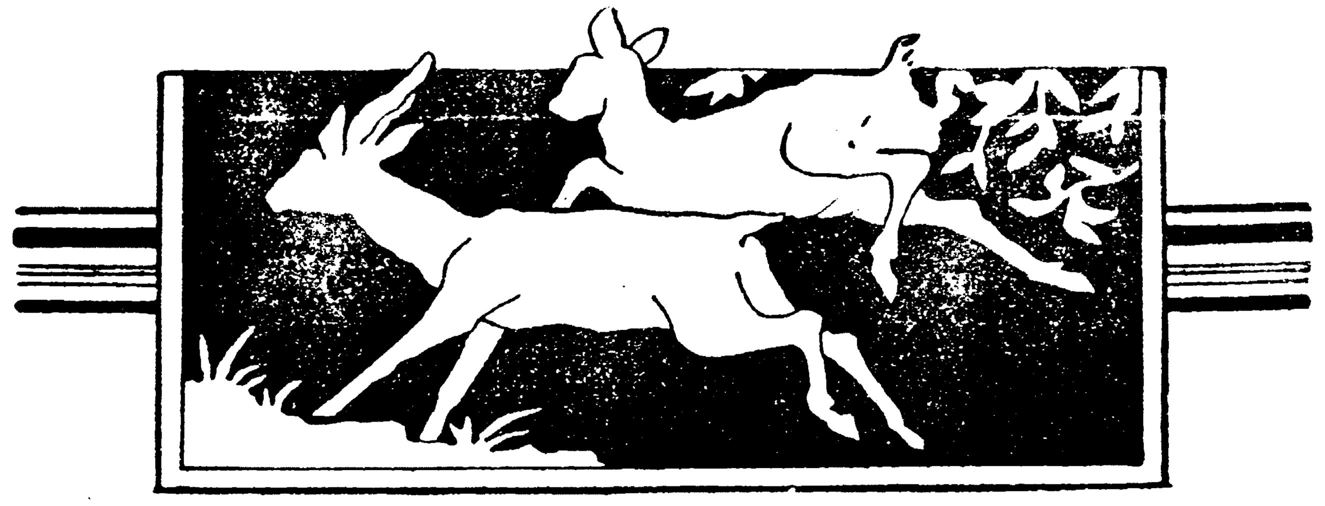

নানা প্রসঙ্গ

মাটি-ছাড়া চাষ

শ্রীঅরুণমোহন চক্রবর্ত্তী

চাষবাসের কাজ চিরকাল মাটিতেই করা হয়ে থাকে ব'লে তোমরা জানো। কিন্তু মাটি ছাড়াও যে বর্তমানে চাষ হচ্ছে—সে খবর রাখো কি? বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ তার কত সমস্যার সমাধান করে নিচ্ছে,—কৃষির কাজেও তাকে লাগাতে ছাড়ে নি। যে দেশে লোকসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ অল্প বা যেখানকার জমি চাষের কাজের অনুপযোগী,—সেখানে মাটি-ছাড়া চাষের প্রণালী আবিষ্কার ক'রে তারা নতুন বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে।

তোমরা হয়তো জানো, গাছ মাটির মধ্যে থেকে রস টেনে নেবার সময় সেই থেকে কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থ গ্রহণ করে,—যেমন কার্বন (অঙ্গার) হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার (গন্ধক), ফস্‌ফরাস, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম্, পটাসিয়াম্, য়্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম্, বোরোন্ ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, এই সমস্ত পদার্থ মাটির সাহায্য ছাড়াও যদি গাছকে পূর্ণমাত্রায় যোগান দেওয়া যায় তবে গাছকে বাঁচানো যেতে পারে। এই সত্যের ওপর ভিত্তি ক'রেই মাটি-ছাড়া চাষ নিয়ে গবেষণা সুরু হয়। এ সম্বন্ধে প্রথম গবেষণা করেন দু' জন জার্মান্ বৈজ্ঞানিক,—স্কাস্ ও নপ্। সে হচ্ছে ১৮৫৯ থেকে ১৮৬৫ সালের কথা।

এঁদের পরে জনৈক আমেরিকান্ বৈজ্ঞানিক,—গ্যারিক, মাটি-ছাড়া চাষের সাহায্যে যে কৃষিকার্যও চলতে পারে তা হাতে-কলমে প্রমাণ করতে সমর্থ হ'ন। তিনি একটা টোম্যাটো গাছ জলে রেখে তাতে গাছের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে দেন। তাঁর সেই গাছটি এত পুষ্ট ও এত বড় হয়েছিল যে দেখে সকলেরই তাক লেগে যায়।

এই ভাবে মাটি-ছাড়া চাষের গবেষণা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে, এবং কিছু দিনের মধ্যেই কৃষিকাজে এর চলন সুরু হয়। বর্ত্তমানে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি নানা স্থানে এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে নানা রকম ফসল উৎপন্ন করা হচ্ছে। ১৯৪৬ সাল থেকে ভারতেও এই নিয়ে গবেষণা চলছে। প্রথম গবেষণা হয় কালিম্পংএ। কাশ্মীরে কিন্তু কৃষকেরা অনেকদিন আগে থেকেই এই ভাবে কৃষিকার্য ক'রে আসছে। মস্ত মস্ত জলাশয়ের ওপর বেড়া দিয়ে তারা তার ওপর নানা রকম শাক-সবজীর চাষ ক'রে থাকে।

কি ভাবে এই চাষ করা হয় এবারে শোনো সেই কথা।

সিমেণ্ট আর ইট দিয়ে গেঁথে আগে মস্ত বড় বড় পাত্র তৈরী করা হয় —প্রায় ক্ষেতেরই মত। তারপর সেই পাত্র জল দিয়ে ভরে গাছের প্রয়োজনীয় যাবতীয় রাসায়নিক পদার্থগুলো কৌশলে জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই সমস্ত পাত্রে বীজের বদলে গাছের চারা লাগানো হ'য়ে থাকে। চারাগাছগুলো যাতে পাত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে সে জন্যে পাত্রের তলায় থাকে ছোট ছোট পাথরের টুকরো। এই সমস্ত পাথরের টুকরোর মধ্যে শিকড় চালিয়ে গাছ সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। গাছ তার খাদ্যের সমস্ত উপাদান এই জলের মধ্যে থেকেই সংগ্রহ করতে পারে বলে খুব তাড়াতাড়ি বড় হ'য়ে ওঠে।

সাধারণ চাষ অর্থাৎ মাটিতে যে ভাবে চাষ করা হয়—তার চাইতে মাটি-ছাড়া চাষে কিন্তু ফসলের পরিমাণও হয় বেশী। কতখানি বেশী হয় তা বুঝতে পারবে নীচের হিসেব থেকে। প্রতি একরে সাধারণ মাটিতে চাষ এবং মাটি-ছাড়া চাষ-প্রণালীর সাহায্যে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যাদির পার্থক্য এতে দেখানো হয়েছে। কালিম্পংয়ের কৃষি-গবেষণাগার গবেষণা ক'রে এই হিসেব দিয়েছেন:

শস্যের নাম	সাধারণ চাষের দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পরিমান	মাটি-ছাড়া চাষের দ্বারা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ
ধান	৭৫০ পাউণ্ড	৪,৮০০ পাউণ্ড
আলু	৮০০ পাউণ্ড	১০, ৫০০ পাউণ্ড
গম	৬০০ পাউণ্ড	৪, ১০০ পাউণ্ড
ভুট্টা	১,৫০০ পাউণ্ড	৫, ৬০০ পাউণ্ড

দু'রকম চাষ-প্রণালীর সাহায্যে উৎপন্ন খাদ্য-শস্যের পরিমাণে দেখ কত পার্থক্য!

এতে মনে হয়, মাটি-ছাড়া চাষ-প্রণালীর সাহায্যে কৃষিকার্য করাই যেন বেশী লাভজনক। তা ছাড়াও এই মাটি-ছাড়া চাষে আরও অনেক সুবিধে আছে। সাধারণ মাটিতে চাষ করতে হ'লে মাটিকে আগে চাষের উপযোগী ক'রে তুলতে হয়। তার পর নানা রকম সার মেশাতে হয় মাটির সঙ্গে। মেহনৎ অনেক, টাকা-পয়সাও কম লাগে না। মাটি-ছাড়া চাষে ঝামেলা অনেক কম, খরচও কম। এ ছাড়া আরও সুবিধে আছে। মাটির দোষের জন্যেই গাছ নানা রোগে আক্রান্ত হ'য়ে পড়ে। মাটি-ছাড়া চাষে মাটির বালাই না থাকায় সে ভয়ও নেই।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হ'লেও আজকে তার খাদ্যসঙ্কট চরমে পৌঁছেছে। লোকসংখ্যার তুলনায় খাদ্য অল্প হওয়ায় বিদেশ থেকে আজ আমাদের খাদ্য-দ্রব্য ধার ক'রে আনতে হচ্ছে। মাটি-ছাড়া চাষের প্রবর্তন করলে আমাদের খাদ্যসঙ্কট হয়তো বহুল পরিমাণে লাঘব হ'তে পারে। অনুর্বর জমি—যেখানকার মাটিতে গাছ বাঁচে না, বাড়ীর বারান্দায়, ছাতে,—এখানে-ওখানে ইতস্ততঃ ছোট ছোট পতিত জমিতে,—নদীর বিশাল বালুময় চরায়,—এমনি নানাস্থানে মাটি-ছাড়া চাষ চলতে পারে। অবশ্যি এখনও পৃথিবীর অনেক দেশেই মাটী-ছাড়া চাষ প্রবর্তিত হয় নি, তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যে এর জনপ্রিয়তা বেড়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

রক্তের কথা

অধ্যাপক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এস্-সি, এম্. বি

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা রামধনুতে তোমাদের রক্ত সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেছি। এবারে ঐ সম্বন্ধে আরও ২।৪ কথা বল্‌ব।

লোহিত রক্ত-কণিকার কথা শুনেছ, এবারে প্রথমে শ্বেত রক্ত-কণিকার কথা শোন।

শ্বেত রক্ত-কণিকারা হচ্ছে এক জাতীয় জীবকোষ এবং ওদের মধ্যে 'নিউক্লাস্' থাকায় ওরা অত্যন্ত সজীব ও সচল। এরা রক্তের সঙ্গে শরীরের সীমান্ত প্রদেশে প্রদেশে এমন ভাবে ঘাঁটী আগলায় যে আমাদের পরম শত্রু রোগজীবাণুরা শরীরে প্রবেশ করতে

পারে না। যদি বা কখনো কোনো জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে তখন আমাদের এই সদা-জাগ্রত প্রহরী সৈনিকেরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাদের ধ্বংস করে। যে সব সীমানায় শত্রু প্রবেশের ভয় বেশী সেখানে সেখানে সৈন্যাবাসে (লিম্‌ফ্‌ গ্ল্যাণ্ডএ) অসংখ্য শ্বেতসৈন্য মজুৎ থাকে—যাতে কোনও ফাঁকে শত্রুরা শরীরে না ছড়িয়ে পড়তে পারে। প্রতি ফোঁটা রক্তে সাড়ে চার লক্ষ এই শ্বেত রক্ত-কণিকা আছে এবং সব শুদ্ধ তারা সংখ্যায় ৫০০০ কোটিরও বেশী। সুতরাং সহজেই বুঝতে পারছ—আমাদের শরীর কেমন সুন্দর ভাবে এই বিশাল শ্বেত সৈন্যবাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত, এবং রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আমাদের কত অল্প! এই সব সচল সৈন্যদল ছাড়াও বিশেষ বিশেষ ঘাঁটীতে সৈন্যাধ্যক্ষদের আড্ডা আছে। তাঁরা যুদ্ধবিদ্যায় ত' সাধারণ সৈনিকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বটেনই, অধিকন্তু প্রত্যহ তাঁরা অসংখ্য শ্বেত রক্ত-কণিকার জন্ম দিচ্ছেন।

সাধারণতঃ রোগজীবাণুদের সঙ্গে দু'রকম যুদ্ধ চালান হয়। এক রকম হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আমাদের রক্ষক সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈনিকেরা শত্রুদের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধে তাদিকে জখম ক'রে গ্রাস করেন ও অনেক সময় বেমালুম হজমও ক'রে ফেলেন। আর এক রকম যুদ্ধ হচ্ছে রাসায়নিক। শত্রু বিশেষে বহুবিধ রাসায়নিক প্রতিষেধক দ্রব্য—যাকে বলা হয় 'র‍্যান্টিবডি', তৈরীর ক্ষমতা আমাদের সৈন্যদের আছে এবং শত্রু আক্রমণ করলে তাঁরা এই রকম বহু দ্রব্য রক্তে ছাড়েন। রোগজীবাণুগুলি এই সব দ্রব্যের সম্পর্কে এলে নিস্তেজ ও নির্জীব হ'য়ে ধ্বংস পায়। অবশ্য সেনাপতি, সেনা ও রাসায়নিক দ্রব্য তৈরীর জন্য প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য,—বিশেষতঃ ভাল প্রোটীন-খাদ্যের দরকার। এই জাতীয় খাদ্যের অভাবে সৈন্যদলের হ্রাসের আশঙ্কা থাকে এবং যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিষেধক রাসায়নিক দ্রব্যেরও অভাব ঘটতে পারে। ফলে রোগক্রান্ত হবার ভয়ও বাড়ে। সাধারণতঃ রোগ নিবারণার্থে ডাক্তারেরা যে সব টীকা ব্যবহার করেন তাদের উদ্দেশ্য সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈনিক দলের সংখ্যা বাড়ান এবং অধিক মাত্রায় প্রতিষেধক রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করানো। কিন্তু খালি টীকা দিলেই ত' হ'ল না, এই সব তৈরীর প্রধান মাল-মশলা ভাল প্রোটীন খাবারও সেই সঙ্গে দেওয়া দরকার। যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ঘটলে টীকা দেওয়া সত্ত্বেও শরীরে সৈন্যদল বা প্রতিষেধক দ্রব্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তৈরী হ'তে পারে না। এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার এবং এই জন্যই আজকাল দেখা যায় যে ভাল খাদ্যের অভাবে ডাক্তারী টীকা আগের মত ভাল ফল দেয় না।

রোগজীবাণুদের বৈচিত্র্য অনুযায়ী এই সব শ্বেত রক্ত-কণিকারা হয় বিভিন্ন আকার-প্রকারের, এবং তাদের কার্য্যাবলীও বিভিন্ন ধারার হ'য়ে থাকে।

লোহিত ও শ্বেত রক্ত-কণিকা ছাড়া রক্তে আর এক রকম ভাসমান বস্তু আছে। তাদের নাম প্লেটলেটস বা অনুচক্রিকা। এদের কাজ বড় মজার। যেখানে রক্তপাত হবার সম্ভাবনা সেখানে এরা জড় হ'য়ে ভেঙ্গে যায়; ফলে এক রকম জিনিষ নিঃসৃত হয় যাতে রক্ত জমাট বেঁধে যায় এবং রক্তপাত বন্ধ হয়।

পরিশেষে রক্তরস বা রক্তের স্বচ্ছ তরল অংশের কথায় আসা যাক্। এই রক্তরসে নিম্নবর্ণিত জিনিষগুলি দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে:—

(১) বিভিন্ন জাতীয় প্রোটীন। তার মধ্যে গ্লোবিউলিন নামে যে প্রোটীন থাকে তা'তে পূর্ব্বোক্ত রোগজীবাণুধ্বংসকারী প্রতিষেধক রাসায়নিক দ্রব্যগুলি থাকে।

(২) অন্ত্র হ'তে সঞ্চিত পুষ্টিদায়ক জীর্ণ খাদ্যসমূহ, এমিনো-এসিড্‌স্‌, চিনি, তৈল জাতীয় দ্রব্য, ভাইটামিন ও লবণ জাতীয় পদার্থসমূহ।

(৩) শরীরে জাত নানা রকমের জঞ্জাল। এরা রক্তের সঙ্গে নিষ্ক্রামক যন্ত্রসমূহে নীত হ'য়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

(৪) গ্রন্থিরসাদি, জারক দ্রব্যাদি।

রক্তের মোটামুটী বিবরণ এই। এখন রক্তের প্রধান প্রধান কাজগুলির একটা ফর্দ্দ দিয়ে আজকের প্রবন্ধ শেষ করা যাক্।

রক্তের লোহিত রক্ত-কণিকারা অক্সিজেন ও অঙ্গারাম্ল বাষ্পের বাহক রূপে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার সহায়তা করে।

শ্বেত রক্ত-কণিকারা আমাদের প্রহরী ও রক্ষাকারী বিশাল সৈন্যবাহিনী। এরা রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে আমাদের সর্ব্বদা রক্ষা করে এবং আক্রান্ত হ'লেও তাদের ধ্বংস সাধন ক'রে আমাদের রোগমুক্ত করে।

অনুচক্রিকারা রক্ত জমাট বাঁধিয়ে রক্তপাত নিবারণ করে। রক্তরস হচ্ছে পুষ্টিবাহক। শরীরের জঞ্জাল বার করে দেওয়াও এর কাজ। তা ছাড়া এ শরীরের সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয় গ্রন্থিরস, ভাইটামিন ইত্যাদি সরবরাহ করে এবং শরীরের তাপের সমতা রক্ষা করে।

আমাদের জীবকোষদের জীবন তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সমতার উপর নির্ভর করে। সে সমতার কিঞ্চিৎ বিকৃতিতে তাদের বিনাশ ঘটবার সম্ভাবনা। সেজন্যই আমাদের জীবকোষগুলি শরীরের ভিতরে বসানো। পরিবর্ত্তনশীল বহির্জগতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রক্তের দ্বারা। আগের প্রবন্ধে ব'লেছি যে রক্তের পরিমাণ, উপাদান ও উত্তাপ সর্ব্বদা সমভাবে থাকে, সুতরাং রক্তের আওতাতে আমাদের ক্ষণভঙ্গুর জীবকোষগুলি ৬০।৭০।৮০ বছর বেঁচে থেকে আমাদের জীবিত ও কর্ম্মঠ রাখে। ফরাসী মনীষী ক্লড বার্ণার্ডের মতে এইটীই রক্তের আসল কাজ।

" 'সত্য কথা বলা'—এর সঙ্গে তুলনা করা যায় সুন্দর হাতের লেখার। নিরন্তর অভ্যাস করলে তবেই এ দু'টী জিনিষ ঠিকমত আয়ত্ত করা যায়।"—রাস্কিন্

ছেলেটা

শ্রীনারায়ণ দত্ত

আনকোরা নতুন জায়গা।

নতুন মাষ্টারী নিয়ে এলাম এখানে। ব্রাঞ্চ লাইনের ছোট্ট ষ্টেশন। জরাজীর্ণ ঘোড়ার মত ঘটঘটে লাইন, ততোধিক জীর্ণ সেই ট্রেনটির কামরাগুলি!

অন্ধকার রাত। ষ্টেশনের টিম্‌টিমে আলোয় বিশেষ বিভুঁই বড় অস্বস্তিকর ঠেকছিলো। হঠাৎ ডাক শুনলাম, 'মাষ্টার মশায় আয়ছেন? পীরগাঁ যাবার নেগে মাষ্টার মশায়—?' বুঝলাম আমার জন্যেই পাঠান হয়েছে লোকটাকে। হাঁকলাম, 'হ্যাহে কত্তা, ইদিকে।'

অন্ধকার নেমেছে দিগন্তে। এঞ্জিনের ছড়ান ধোঁয়ার মত একরাশ অন্ধকার রাতের আকাশে পংগপালের মত ছড়িয়ে পড়েছে।

কয়েক মিনিট পরে একটি প্রাণী ছুটে এসে দাঁড়ালো। ষ্টেশনের মত জনবহুল জায়গা না হ'লে রাতের আঁধারে এমন একটি প্রাণীকে দেখে ভয় পাওয়া আশ্চর্য নয়। এমনি কালো বোধ হচ্ছিল তার গায়ের রং! হঠাৎ মাথা নামিয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে বল্লে সে,—'পেন্নাম হই মাষ্টার মশায়!'

ষ্টেশনের ল্যাম্প-পোষ্টের আলো চুঁয়ে এসে পড়েছে এদিক্ পানে। অনেকটা স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম তাকে। বাচ্ছা। রাতের অন্ধকারে প্রেতমূর্তির মত শীর্ণ ব'লে বোধ হ'লো। মৃদু হেসে বল্লাম, 'থাক্ থাক্। তুমি এসেছ পীরগাঁ থেকে?'

—'আইজ্ঞে। আপনার মোটঘাট?'

কেরোসিনের আলোর কাছে আসতে বেশ বোঝা গেল বয়স চৌদ্দ-পনর'র বেশী নয়। জানুয়ারীর শেয়াল-কাঁদান শীতেও সামান্য একটা পাতলা কাপড় গায়ে দিয়ে রয়েছে। মাথার খোঁচা খোঁচা চুল ফণিমনসার কাঁটার মত উঁচু উঁচু।

টন্ ক'রে গায়ের কাপড়টা খুলে মাথায় বেঁধে ফেলে বল্লে, 'চলেন মাষ্টার মশায়, আপনার জিনিষগুলান দেখায়্যা দেন।'

পশ্চিম বংগের পাড়াগাঁ। মরার মত নেতিয়ে পড়েছে প্রথম প্রহরেই। দূরে থেকে থেকে আগুনের শিখা উঠছে; দূর থেকেও সে অগ্নিশিখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় শীতের রাতে আগুন পোহাচ্ছে কেউ। সেদিক্ পানে লক্ষ্য করতে করতে এগোচ্ছি, হঠাৎ দেখি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ছেলেটা। প্রণাম করলে যোড় হাত মাথায় ঠেকিয়ে। বল্লাম, 'কি হ'লো?'

ঐদিকে তাকিয়ে সে বল্লে, 'পেন্নাম করো মাষ্টার মশায়, ওখানে ইরসাফ মিঞা থাকেন। ওনার দুই ব্যাটা দুই দ্যাবতা—ওখানে নিদ্রা যান।'

'কোথায়?'

'ঐ যে আগুন জলছে—পাটকাটির মশালের আগুন—'

বিস্মিত হ'লাম। বল্লাম, 'নিদ্রা যান তা আগুন এলো কোত্থেকে? আর প্রণাম করবোই বা কেন?'

ছেলেটা, বেশ বুঝতে পারলাম, হেসে ফেললে। বললে, 'আপ্‌নি তো আর সে বিত্তান্ত জানেন না মাষ্টার মশায়! অনেকদিন আগে উখানে না গোরা সৈন্যের সংগে মারামারি ক'রে দু'জন মারা যায়। ইরসাদ মিঞার ব্যাটা দু'জন—'

"স্বদেশী?"

'আজ্ঞে! স্বরাজের লোক। উনাদের বাপ বুড়ো ইরসাদ বেঁচে আছেন—অমবস্যার রাতে পাটকাটির মশাল জ্যেলে দিয়ে যান। অমাবস্যার রাতে উনারা মারা গেইছিল কিনা! দেখতে পাবেন, ইস্কুলেও যায় মাঝে মাঝে বুড়ো।'

'তোমার নামটা তো জানা হ'লো না?'

—'আজ্ঞে সুদর্শন ধারা। আজ্ঞে এ দেশের লোকগুলান ডাকে ম্যাথরা ব'লে আজ্ঞে! আমার এই পোড়া কালো রূপ দ্যাখছেন তো মাষ্টার মশায়,—এরই লিয়ে সবাই ম্যাথরা ব'লে ডাকে। কী করি বলেন কত্তা, কালো অঙ তো আমার হাতে লয় মাষ্টার মশায়! আর চেরক্কাল তো আর আমি এমুনটি ছিলাম না! গত জন্মে যা হয়ে গেছে তার লেগে তো আর আজ্ঞে হাত নেই। ই জন্মে সব আপনাদের সেবা করছি—সোন্দর হবার তুলুক-সন্ধান তত্ত্বতাল্লাস করছি। দ্যাখবেন মাষ্টার মশায়, নিশ্চয়ই দ্যাখবেন, এ জন্মে না হয় আসছে জন্মে আমার দুধ-বরণ রূপ হবে, আমি সোনার ঘরে জন্মাবো। দ্যাখবেন আপুনি, নিশ্চই দ্যাখবেন মাষ্টার মশায়!'

ধরা গলায় বল্লাম, 'তোমার কে কে আছে বাড়ীতে সুদর্শন?' কেন জানি না সুদর্শন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। খানিক পরে বললে, 'তিন কুলে কেউ নাই কত্তা! বাবুদের বাড়ীর গরু-মোষ নাড়ি চাড়ি, চারটি খাইতি পাই। স্কুলের চাকর পঞ্চু না এলে মাঝে মাঝে স্কুলে ঘণ্টা বাজাই আজ্ঞে! ছেলেগুলার খাবার জল তুলে দিই। আর আর মাষ্টার মশায়দের সেবা করি আসছে জনমে যাতে এমন কুচ্ছিৎ না হই।'

'পীরগাঁয়েই তোমার ঘর বুঝি?'

—'আজ্ঞে না কত্তা! হেথায় হবে ক্যানে? মেদিনীপুর কাঁথির নাম শুনেছেন তো কত্তা? এখান থেকে অনেক অনেক দূর কাঁথি যে সহর আছে, তা থেকে আট দশ রশি দূর, গাঁয়ের দিকে—হলুদখালি। জানেন কত্তা, আমার বাবাকে ভালো মনে পড়ে না। এইসা জোয়ান লোক, এইসা বুকের ছাতি! স্বরাজ ক'রে জেলে গ্যাছলো। তাই না আজ গান্ধী মহারাজের রাজত্ব এসে গেলো। আর গোরা সেপাইরা সব যমের কুটুমের মত আমাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিলো কত্তা। আমি ছোট্ট—তাও আমার জ্বর, বাবা তো কদ্দিন থেকে জেলে, মা তখন বাড়ী ছিলো না। খবর পেয়ে এসে আমায় পোড়া ঘর থেকে টেনে বার করে। তবু আমার গা-হাত সব পুড়ে যেইল মাষ্টার মশায়!'

প্রাণ-খোলা সরল ছেলেটির পরিচয়ে ক্রমশঃ যেন শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠছিলাম, বিস্মিত-কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, 'তোমার মা কোথা সুদর্শন?'

'মা? পঞ্চাশ সালের মড়কে চলে গেইছেন তিনি।'

পরদিন সকালে বসে বসে বোধ হয় সুদর্শনের কথাই ভাবছিলাম। শীতের সকাল। কুয়াশা চেপে এসেছিলো বন বনানী গাছপালা ঘিরে রহস্যের এক আবরণের মত। যেন একরাশ রূপোলী মায়াকে গুঁড়িয়ে গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে দিক্‌দিগন্তে পাঁয়গাঁয়ের আনাচে কানাচে।

ঘরটা ছোট্ট হ'লেও বেশ। সামনে জানলা দিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে একটা মাথা-উঁচু ঝালর দেওয়া ঝাউগাছ। তারই ওপারে সম্রান্ত পরিবারের সখ-করে-তৈরী বিশ-ত্রিশটি নারিকেল-বীথি।

সেদিকে চেয়েই নানান্ কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি আস্তে আস্তে দরজাটা ফাঁক ক'রে মাথা গলিয়ে সুদর্শন উঁকি মারছে। আমার চোখ পড়তেই ঝকঝকে ফর্সা কতকগুলো দাঁত বার ক'রে সুদর্শন হেসে ফেল্লে, 'উঠ্‌ছেন মাষ্টার মশায়? বসুন, জল এনে দিই'—বলেই দ্রুতপদে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে এক বালতি জল নিয়ে ঢুকল সে। তার পর কয়েকটা নিম-দাঁতন বার ক'রে ধরলে।

এমন সময় ছোট্ট ফুটফুটে একটি মেয়ে এক কাপ ধোঁয়াটে চা আর বাটিতে কিছু মুড়ি নিয়ে ঢুকলো।

মেয়েটী চা'টা নামিয়ে রেখেই চলে যাচ্ছিল, ডেকে বল্লাম, 'শোন, শোন দেখি খুকী, তোমার নামটি তো জানা হ'লো না? তোমাদের দেশে এলাম—'

মেয়েটি কিন্তু দাঁড়ালো না। সলজ্জ একটু হেসে দ্রুত দরজা দিয়ে সরে গেল।

'উয়ার নাম আর জানেন না মাষ্টার মশায়? উ চাঁপু,—আপনাদিগের সিক্রিটারী বাবুর মেয়ে।'

হাত-মুখ ধুয়ে চায়ে চুমুক দিলাম। এখানে আসবার আগেই শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল। ডাক্তার বাবু একটা ওষুধ বলে দিয়েছিলেন—সকালে চায়ের সংগে এক চামচ ক'রে খেতে। এক চামচ ঢেলে খাচ্ছি, হঠাৎ যেন কৌতূহলে ভেংগে পড়ল সুদর্শন।—'উটা কি খেলেন মাষ্টার মশায়? ঐ চক্‌চকে শিশি থেকে লাল মতন ওষুধ, আজ্ঞে?'

হাসলাম। বল্লাম, 'ওষুধ'।

'ওষুধ?' উত্তেজনায় সুদর্শনের গলা দ্রুত হয়ে গেল, 'হেই মা! আপনি ওষুধ খান ক্যানে কত্তা?'

কি জবাব দেব ভাবছি, হঠাৎ দেখি সুদর্শনই যেন উৎসাহিত হয়ে উঠল। 'আপনি সোন্দর হবার জন্যে খান, না মাষ্টার মশায়? তাই বলি, ক্যানে আপনার এমনি আঙা বরণ অঙ, এমন টুকটুকে পানা গড়ন—'

কি বলব ভেবে পেলাম না, নিঃশব্দে চা খেতে লাগলাম। সুদর্শন বল্লে, 'অনেক দাম ওনার, না মাষ্টার মশায়?'

মুখ তুলে চাইলাম শুধু, জবাব দিলাম না।

রাত। ক'টা হবে বলতে পারি না।

খস্‌খস্ একটা শব্দে জেগে উঠ্‌লাম। কারা যেন নিঃশব্দ পায়ে ঘরের ভেতর হেঁটে বেড়াচ্ছে! কৌতূহল-মেশা আতংকে জেগে উঠলাম আমি—'কে? কে?'

বালিশের তলা থেকে দিয়াশলাইটা বার ক'রে জেলে ফেল্লাম।

লোকটা পালাবার পূর্বেই আমি কিন্তু আলো জেলে ফেলেছিলাম, চিনতে দেরী হ'লো না। বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, 'সুদর্শন! তুই?'

ঝড়ো বাতাসে কাঁপা বাঁশ-ডগার মত থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো সুদর্শন। কাঁধ ধরে তাকে বসিয়ে দিয়ে বল্লাম, 'বস্, আলোটা জ্বালি।'

সম্মোহিতের মত বসে পড়লো সুদর্শন।

আলোয় হেসে উঠ্‌লো ঘরখানা। কিন্তু জড়-করা সব আঁধার যেন সুদর্শনের মুখে জমা হয়ে উঠেছে। বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম—'কি, করছিলি কি এখানে?'

হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো সুদর্শন।—'আমায় মাপ করেন মাষ্টার মশায়, আমি চুরি করছিলাম আজ্ঞে!' বলার সংগে সংগে সুদর্শন তার কাপড়ের ভেতর থেকে আমার সেই সকালে-খাওয়া ওষুধের শিশিটা বার ক'রে দিলে।

ধীরে ধীরে বললাম, 'কিছু খেয়েছিস?' ও জবাব দিলে না, সজোরে আছড়ে আমার পা যোড়া চেপে ধরে আমার পানে তাকিয়ে বল্লে, 'আমায় মাপ করেন মাষ্টার মশায়, লোভ আমি সামলাতে পারি নি। আমায় মাপ করেন'...ঝর ঝর এক অশ্রুর ঝরণা নেমেছে ওর চোখে, তারই ধারায় আমার চোখ দিয়েও টপ্‌টপ্ ক'রে অশ্রু ঝড়ে পড়লো কয়েক ফোঁটা। ধীরে ধীরে তাকে তুলে বিছানায় বসে বল্লাম, 'তোকে আমি মিথ্যা বলেছিলাম রে সুদর্শন! ওটা অন্য ওষুধ, আমার শরীর খারাপ হয়েছিল, তাই। সুন্দর হবার ও কিছু নয় রে!'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটানা বসে থাকার পর হঠাৎ দৌড়ে বেরিয়ে গেল সুদর্শন—যেন জ্যা-মুক্ত তীরের মত। অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলাম কেবল আমি।

বেশ কয়েক দিন সুদর্শনের কোন খোঁজ পাই নি। আর সময়ও ছিল না বিশেষ। কারণ প্রথম দিন স্কুলে গিয়েই শুনলাম দু' দিন পরে মাননীয় মন্ত্রীদের একজন আসছেন স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ উৎসবে। সভার ও মণ্ডপের উদ্যোগ আয়োজনের বিশেষ একটা অংশ আমার কাঁধেই এসে পড়েছিল। আয়োজন পত্তর ক'রে সকল সেরে ক্লান্ত হয়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়েছি, দেখি টুপ্ টুপ করে নিঃশব্দ সন্তর্পণে সুদর্শন এসে ঢুকলো।

ওর কালো মুখটায় কিসের যেন উত্তেজনা চক্‌চক করছে। ডেকে বল্লাম—'সুদর্শন রে, কদ্দিন দেখি নি!'

চক্‌চকে দাঁত বার ক'রে এক গাল হেসে সুদর্শন বল্লে, 'আজ্ঞে?'

'দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বস্ না!'

'মাষ্টার মশায়!'

'কি?'

'ইস্কুলে কে আসবে মাষ্টার মশায়?'

'মন্ত্রী মশায়, শুনিস নি?'

কিছুক্ষণ নীরবতা। আবার প্রশ্ন আসে—'এ স্বরাজের মন্ত্রী তো মাষ্টার মশায়?'

'হ্যাঁ রে, হ্যাঁ।'

'ইনি কি করেন?'

'দেশের লোকের অভাবের কথা শোনেন, তার বন্দোবস্ত করেন।'

'সব লোকের?'

'হ্যাঁ।'

আবার নীরবতা। আবার প্রশ্ন—'গান্ধী মহারাজের মন্ত্রী তো মাষ্টার মশায়?'

'হ্যাঁ রে, হ্যাঁ।'

প্রান্তর ভরা অন্ধকারে দু'টো প্রাণী বসে বসে কত ভাবনার জাল বুনছি। সুদর্শনের মুখখানা আর বোঝা যায় না।

কয়েকটা দিন পর।

দুপুর নেমে এসেছে। বুনো চিল মাঝ আকাশে চিৎকার ক'রে ক'রে বুঝি তাই ঘোষণা করছে।

ষ্টেশনে মোটরের ব্যবস্থা ছিল। আমরা ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করলাম। সরকারী সেপাই-শান্ত্রী, মন্ত্রী মশায়, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, আরও সব সরকারী কর্ত্তাব্যক্তিদের নিয়ে পর পর কয়েকটি মোটর গাড়ী পাঁরগাঁয়ের ধুলো উড়িয়ে চলেছে। সবার আগে পুলিস সুপারের ভ্যান্,—তার পরে মন্ত্রী মশায়ের দামী মোটরখানা—ইন্দ্রপুরীর মত যার ভেতরটি মনোরম—বাইরের কভারে যার মুখ দেখা যায়।

হঠাৎ দেখি সুদর্শন দাঁড়িয়ে রাস্তায়—'থামুন মন্ত্রী মশায়, থামুন মন্ত্রী মশায়!'···

কি ব্যাপার, কি ব্যাপার! আমরা উৎচকিত হয়ে উঠ্‌লাম।

উবু হয়ে গড় হ'লো সুদর্শন, বল্লে, 'আপনি তো আজ্ঞে গান্ধী মহারাজের মন্ত্রী—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ?'—অবাক্ বিস্ময়ে গান্ধী মহারাজের মন্ত্রী ঘাড় নাড়তে থাকেন। সুদর্শনের পরনে ছোট ক'রে বাঁধা কৌপীনের মত কাপড়, তার খোঁচা খোঁচা চুল তামাটে ধুলোয়

ভর্তি হয়ে গেছে একেবারে। তার কালো পোড়া বিদঘুটে মুখখানা সীমাহীন উত্তেজনায় থম্ থম্ করছে।

'গান্ধী মহারাজের রাজ্যে থেকে আমরা খেতে পাই নে ক্যানে, পরতে পাইনে ক্যানে? আমাদের ঘেন্না করে ক্যানে; আমার ভারা······'

কিন্তু তার প্রশ্নে বাধা পড়ল। মন্ত্রী মশাই বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই একজন উৎসাহী শান্ত্রী এগিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে সুদর্শনকে ঠেলে ফেলে দিল, ভ্রুকুটি ক'রে বললে, 'ছোঁড়া আর মনের কথা শোনাবার সময় পেল না! পালাঃ। লাঠির খোঁচা খেয়ে সুদর্শন উল্টে পড়ল। দেখলাম, রাস্তার ইটে তার কপাল কেটে রক্ত গড়াচ্ছে। মোটর বেরিয়ে গেল।

সন্ধ্যা বেলা। চাঁপা চা দিতে এসেছিল। ধীরে ধীরে বল্লে, 'ম্যাথরা চলে গেছে, জানেন মাষ্টার মশায়?'

'কোথায় গেছে? কবে ফিরবে?'

'ফিরবে না। যদি ফেরে, সে সোনার পদ্ম নিয়ে ফিরবে মাষ্টার মশায়! পূজোর সময় সেই সাধু এসেছিল না, সে বলেছিল, হিমালয়ের উপরে কুবেরের মানস সরোবরের সোনার পদ্মর ছোঁয়াচ লাগলে সোনার মত রং হয়, মরা বাপ-মা বেঁচে ওঠে। আমায় সে বলে গেছে মাষ্টার মশায়, সোনার পদ্ম সে নিয়ে আসবে। সেই পদ্মের ছোঁয়াচ লাগলে তার কালো গায়ে সোনার মত বর্ণ হবে, তার মরা বাপ-মা ফিরে আসবে, তাদের সোনার ঘর আবার উজলে উঠবে।'

কিশোর মনের স্বপ্ন-কল্পনা আমার দৃষ্টিও মায়াময় ক'রে তুলেছিল। আমার চোখের সামনে ভাসছিল সেই কালো পোড়া দেহটা, আর তার স্বপ্ন-সংকল্প দুর্গম অভিযান। একটির পর একটি, কালো কালো পাথর মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে একটি কালো, পোড়া, নেংটি-পরা দেহ—হিমগিরির সেই দুর্গম, অভ্রভেদী গগনচুম্বী শির লক্ষ্য ক'রে, সোনার পদ্মের সন্ধানে, যার শুভ ছোঁয়াচে তার মরা পৃথিবী আবার হেসে উঠবে—বেঁচে উঠ্‌বে!

স্বপ্ন-ভরা দৃষ্টি নিয়ে আমিও সামনের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আগামী সংখ্যা থেকে সুরু হবে

সুবিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের

নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস

"প্রিয়ঙ্গু"

শান্তিনিকেতনে কয়েকটা দিন

শ্রীমনীষা দাশগুপ্ত

অনেক দিনের ইচ্ছে—কবিগুরুর শান্তিনিকেতন দেখব। সেদিন হঠাৎ সুযোগ জুটে গেল।

কলকাতা থেকে বেলা দু'টোয় রওনা হয়ে বোলপুর ষ্টেশনে পৌঁছতে সন্ধ্যে উৎরে গেল। শান্তিনিকেতন আশ্রম বোলপুর ষ্টেশন থেকে কিছুটা দূরে—দুই মাইলের উপর হবে। আশ্রমের বাস্ আছে লোক আনা-নেওয়ার জন্য। আমরা সেই-বাসে ক'রে চলে এলাম সোজা গেষ্ট হাউস্ পর্য্যন্ত। ওখান থেকে এক ভদ্রলোকের চেষ্টায় আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাসা খুঁজে বার করা হ'ল।

রাত হয়ে আসছিল। খিদেও পেয়েছিল বেশ। খাওয়া-পর্ব্বটা আগে সেরে নেওয়াই ভালো। তাই আমরা চলে গেলাম খাবার ঘর বা 'কিচেনে'। এই 'কিচেনে' বোর্ডিংএর সব ছেলেমেয়েদের খাবার ব্যবস্থা তো আছেই, তা ছাড়া অতিথি-অভ্যাগত এবং আশ্রমের কর্ম্মী যাঁরা—ইচ্ছে করলেই এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। এদের ব্যবস্থা খুব সুন্দর। দু' বেলা হাজার হাজার লোক খেয়ে যাচ্ছে—কিন্তু এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই।

তখন পৌষ মাস। তোমরা অনেকেই জান এখানে 'পৌষ-উৎসব' সব চেয়ে বড় উৎসব। তিন-চার দিন ধরে আশ্রমে আনন্দোৎসব পড়ে গেল। বিরাট মেলা বসল। কত জায়গা থেকে দলে দলে লোক এল দেখতে। প্রতি বছরই এমনি হয়। দেশ-দেশান্তর থেকে বড় বড় লোক সব আনান হয় তাঁদের বক্তৃতা

শোনবার জন্য। নৃত্যে, গীতে, নাটকাভিনয়ে ভরপুর থাকে ক'টা দিন। এদের এই আনন্দোৎসব সত্যি দেখবার মত।

এবারে তোমাদের আশ্রমের কথা বলি। যেদিকে তাকাই বড় বড় খোলা মাঠ—সরু রাস্তা এঁকেবেঁকে গিয়েছে। দু'ধারে আমলকি গাছের সারি—ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে ডালগুলি। তার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ীগুলি সাজান।

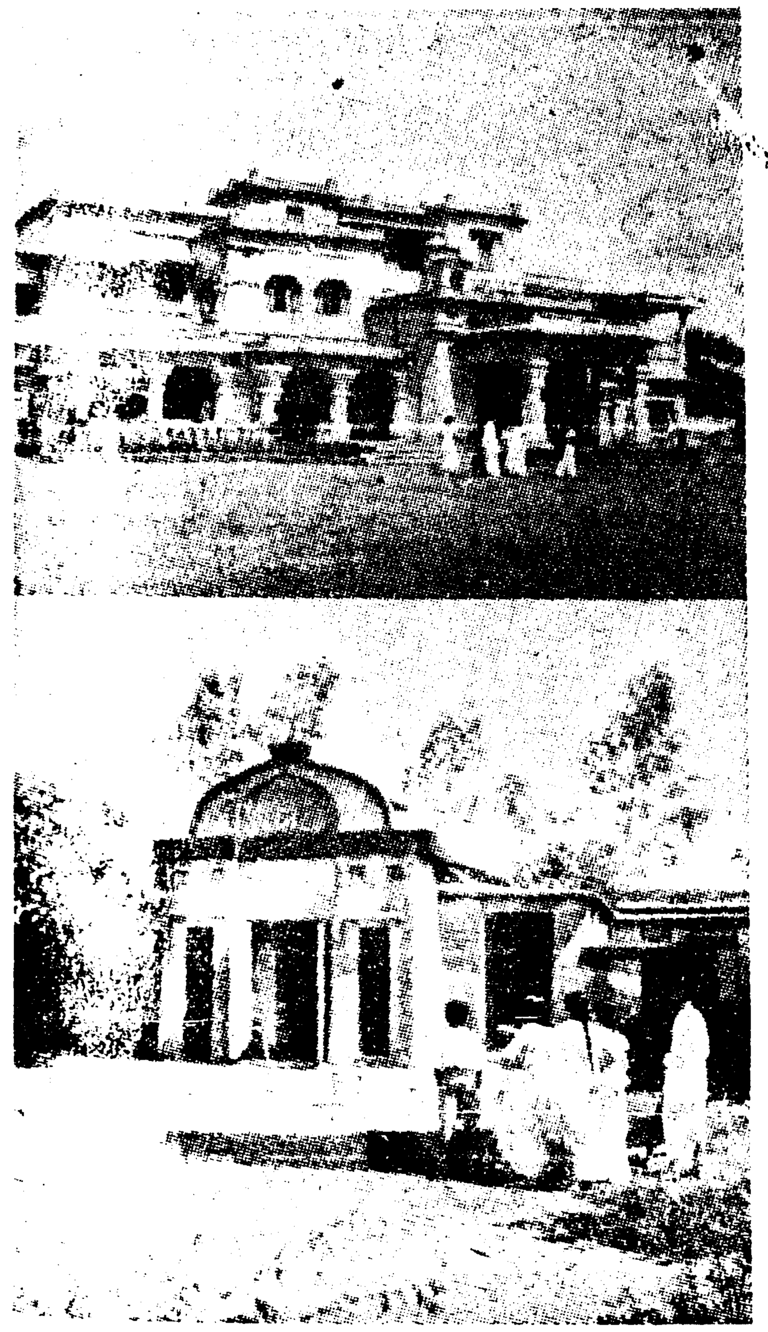

উপরে উত্তরায়ণ, নীচে শ্যামলী

চলতেই নজরে পড়ল কবির আবাস-ভূমি—'উত্তরায়ণ'। বাড়ীর ভেতর আমরা সব ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। তাঁর ব্যবহারের, তাঁর স্মৃতি-জড়িত সব জিনিষ সাজান রয়েছে—তিনিই নেই। উত্তরায়ণ ছাড়া আরও কয়েকটি বাড়ী করিয়েছিলেন কবি—পুনশ্চ, শ্যামলী, (মাটীর তৈরী) ইত্যাদি। এক বাড়ীতে বেশী দিন থাকৃতে তাঁর ভাল লাগত না।

সঙ্গীত-ভবনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম—সুললিত ধ্বনি ভেসে আসছিল। এখানে গান, সেতার, এসরাজ প্রভৃতি বাজনা শিক্ষা দেওয়া হয়। তার পর কলা-ভবন। এখানে চিত্রশিল্প শেখান হয় ছেলে-মেয়েদের। দেয়ালের গায়ে নানা রকম ছবি আঁকা (ফ্রেস্কো)। কলাভবনের ভেতরে প্রকাণ্ড আর্ট গ্যালারী। অবনীন্দ্র-নাথের এবং অন্যান্য বড় বড় শিল্পীর বিশ্ব-বিখ্যাত সব ছবি রয়েছে। ক্লাস ঘরে ছেলে-মেয়েরা সব যার যার ছবি নিয়ে ব্যস্ত।

আর একটু এগিয়ে একটা বড় দোতলা বাড়ী—সেটা হ'ল মেয়েদের বোর্ডিং—'শ্রীভবন'। এর উল্টো দিকে প্রকাণ্ড খোলা মাঠ। বিকেলে ছেলেমেয়েরা নানা রকম খেলায় মেতে ওঠে এখানে।

সকাল বেলায় যেতে যেতে পথে দেখলাম সব ক্লাস বসে গেছে—শীতের

রৌদ্রে খোলা মাঠে অথবা গাছের ছায়াতে। ছোট ছোট ক্লাস—ভীড় নেই, গোলমাল নেই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন এখানে। ছেলেবেলায় তাঁর ভৃত্যদের শাসনে বদ্ধ ঘরে বসে মন চলে যেত কোন্ শূন্যে—আকাশে। স্কুলের শাসন মন তাঁর কোনদিনও মেনে নেয় নি। বড় বেদনা দিত তাঁর মনে। বড় হয়ে তিনি ভাবতেন ছেলেদের কথা—কি ভাবে এদের শিক্ষা দেওয়া যায় খেলার ছলে। সেই বাসনা রূপায়িত ক'রে তুলেছেন তাঁর এই আশ্রমে। শিশুরা যাতে প্রকৃতির শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে বড় হয়ে উঠতে পারে—তাই ভালবাসতেন তিনি। মন সরল থাকলে বইএর শক্ত বিষয়-বস্তুও হয়ে ওঠে ছেলেদের কাছে সরল।

এখানকার লাইব্রেরীটাও দেখবার মত। এত বড় লাইব্রেরী—বিশেষতঃ এত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সংগ্রহ আমাদের দেশে খুব কমই আছে। লাইব্রেরী-ঘরের উপরের তলায় 'বিদ্যাভবন'। বিশ্বভারতীতে গবেষণার কাজে যাঁরা রত আছেন এখানে এসে তাঁরা তাঁদের কাজ করেন।

আশ্রমে ঢুকে একটু দূরেই নজরে পড়ে মস্ত একখানি বাড়ী। এটির নাম "চীনা ভবন"। বহু চীনা পণ্ডিত ব্যক্তি এখানে আছেন,—আবার এখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যও কাউকে কাউকে চীনে পাঠান হয়। একে বলা চলে ভারতীয় ও চৈনিক সংস্কৃতির যোগসূত্র। এই দু'টীই হ'ল এশিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতা। এদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা ক'রে বাংলার—তথা ভারতের সংস্কৃতি প্রসারের সহায়তা করেছেন এরা। শুধু তাই কেন,—সমস্ত আশ্রমটাই সারা ভারতের একটা শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। ভারতের, এবং বাইরে থেকেও, কত মনীষীকে এখানে আমন্ত্রণ ক'রে আনা হয়—ছেলেদেরকে তাঁদের উপদেশ শোনাবার জন্য—দেশ-বিদেশের গল্প শোনাবার জন্য। বিভিন্ন দেশ থেকে বড় বড় লোকেরা আসাতে বাংলার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের এবং ভারতের সঙ্গে বাইরের জগতের যে সংস্কৃতিগত মিলন গড়ে ওঠে তার মূল্য বড় কম নয়!

অতিথিশালার পাশেই উপাসনা-মন্দির। যে ছাতিম গাছটির তলায় বসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একদিন ঈশ্বরের আরাধনা করতেন—তা এখনও আছে। তাকে সুন্দর ক'রে বেদী দিয়ে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। কোন কোন উৎসব উপলক্ষ্যে সবাই সমবেত হ'ন সেখানে। প্রত্যেক বুধবার এদের ছুটী—আমাদের রবিবারের

বদলে। সেদিন শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতি বুধবার সকাল বেলা মন্দিরে উপাসনা হয়। আমরাও গেলাম মন্দিরে। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর স্বাভাবিক চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে উপাসনা করলেন। কবি থাকতে তিনি এসে অলঙ্কৃত করতেন আচার্য্য-পদ।

খুব প্রত্যূষে বৈতালিক সঙ্গীত হয়। স্কুল বসবার আগে সব ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে প্রার্থনা-সঙ্গীত করল, তারপর চলে গেল যে যার ক্লাসে। ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে নজরে পড়ে একটা স্বাচ্ছন্দ্য ও অমায়িক ভাব। এখানকার শান্ত আবহাওয়া, উন্মুক্ত আকাশ, সবুজ গাছপালা, দিগন্তবিস্তৃত মাঠ তাদের মনে প্রভাব বিস্তার করে।

একদিন বিকেলে গেলাম 'শ্রীনিকেতন' দেখ্‌তে। আশ্রম থেকে কিছু দূরে,—বাসে যাওয়া যায়। সেখানেও একটা উপনিবেশের মত গড়ে উঠেছে। সমস্ত রকম হাতের কাজ শেখান হয় ছেলেদের—তাঁত বোনা, চামড়ার কাজ, মাটীর বাসন ও খেলনা তৈরী করা, কাঠের জিনিষ তৈরী—সব কাজ। সে সব কাজ অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর। খুব নতুন ধরণের নমুনা এরা সব বার করে। ছেলেদের এমন ভাবে শিখিয়ে দেওয়া হয় যে ভবিষ্যতে যেন তারা স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারে।

বিশ্বভারতী বাংলার গৌরব—ভারতের গৌরব। বিশ্বকবির স্বপ্ন এখানে রূপ পেয়েছে। এমন একটা জায়গা বাংলা দেশে থেকেও যারা আজ পর্য্যন্ত দেখ নি, তারা সুবিধা পেলেই দেখে আসবার চেষ্টা করবে এই অনুরোধ।

বাংলার শিশু

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্.এ, বিদ্যাবিনোদ

বাংলার শিশু তুই দেব-সন্তান,
ব্রহ্মের সাথে তোর আত্মার মিল ;
অর্পণ করি' ভাই তনু, মন, প্রাণ,
মর্ত্ত্যের বুকে গড় প্রীতি-মঞ্জীল।

চোখে তোর সত্যের আলো চম্‌কায়,
বুকে আশা, ভালবাসা, চির-অক্ষয়।

ভঞ্জন করি' দুখ, হরি' লজ্জায়,
ভগবৎ-প্রেমে হও মৃত্যুঞ্জয়।

কর্ম্মই সব তোর, ধর্ম্মই বল,
সব চেয়ে বড় দেশ আর তার মান ;
মন হোক নির্ম্মল ঝর্ণার জল,
শ্রেয় তোর স্বদেশের গৌরব-গান।

ঢেউ

শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায় চৌধুরী

যথন সবুজ পৃথিবীর বুকে
জ্যোছনার হাসি ফোটে,
ওড়না-জড়ানো সবুজ ধানেরা
থর থর কেঁপে ওঠে,

এ নদী তখন খল খল হেসে,
হাল্কা রূপালী বেশে
বয়ে চলে যায় হয়ত বা সেই
তেপান্তরের দেশে।

যখন আকাশে তারারা উধাও—
আকাশ লুকানো মেঘে,
এ নদী তখন কেঁদে কেঁদে মরে
নিদারুণ উদ্বেগে।

হাজার জোনাকী বাতি জেলে দেয়
আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে,
এ নদীর বুকে ভাষা নেই তবু
ঢেউএর ইসারা জাগে।

আলোকের কুচি ছিটানো আকাশ
ভালবাসে এই নদী,
ভাল লাগে মোর এ নদীর মায়া—
চেয়ে থাকা নিরবধি।

কুলু কুলু রবে রূপালী ঢেউএরা
কথা কয় কানে কানে ;
এ নদীর ভাষা আমার নয়নে
স্বপনের ঘোর আনে।

দ্বিজু ঠাকুরের কথা

মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তিনি লোকটি ছিলেন মহাপণ্ডিত এবং নানা রকম সদ্‌গুণের জন্য তাঁর সমযকার সকলেই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করত। বাড়ীর বড় ছেলে ব'লে অনেকেই তাঁকে বড়দাদা ব'লে ডাকত ; মহাত্মা গান্ধীও ঐ নামে ডাকতেন।

এত বড় জ্ঞানী লোক, কিন্তু এদিকে ছিলেন একেবারে আত্মভোলা। তাঁর দৈনন্দিন জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটত যা শুনতে বেশ মজা লাগে। তারই কয়েকটি গল্প তোমাদের শোনাব।

খুব ভোরে উঠে টবে ব'সে ঠাণ্ডা জলে স্নান করা ছিল তাঁর বরাবরের অভ্যাস। শীত-গ্রীষ্ম, অসুখ-বিসুখ কোন কিছুতেই এর ব্যতিক্রম করতে চাইতেন না। বৃদ্ধ বয়সে— এমন কি মৃত্যুদিনে পর্য্যন্ত এই স্নান বন্ধ হয় নি তাঁর। একবার, তখন তাঁর বেশ বয়স

হয়েছে, নাতি-নাতনী এবং তাদেরও ছেলেপিলেতে ঘর ভর্ত্তি। হঠাৎ একদিন তাঁর হ'ল খুব জ্বর। গায়ের উত্তাপ রাতে ১০৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠল। বাড়ীর সবাই ভীষণ ব্যস্ত। দ্বিজেন্দ্রনাথের কিন্তু কোন চিন্তা নেই—তিনি মনের আবেগে কবিতা আওড়ে চলেছেন। ভোরের দিকে আবার সবাইকার নতুন ভাবনা—স্নানের সময় হ'লে কি ক'রে তাঁকে আটকানো যাবে।

যাই হোক্, শেষ রাত্রে একজন চাকরকে পাহারা বসিয়ে রাখা হ'ল। কর্ত্তা স্নান করতে চাইলেই যেন লুকিয়ে সবাইকে গিয়ে খবর দেয়, সবাই একসঙ্গে এসে বাধা দেবে।

ভোর হ'তে না হ'তেই দ্বিজেন্দ্রনাথকে স্নানের জন্য উঠতে দেখেই চাকর দৌড়ে গেল আর সবাইকে ডাকতে। লোকের সাড়া পেয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ বুঝলেন এরা আসছে তাঁর স্নানে বাধা দিতে। তিনি উঠি-পড়ি হয়ে দৌড়ে গিয়ে ঢুকলেন স্নানের ঘরে, তার পর ঝুপ্ ক'রে গিয়ে বসে পড়লেন জল-ভরা টবের মধ্যে।

অবশ্যি, ভগবানের দয়ায় এর পর তাঁর অসুখ কমা ছাড়া বাড়ে নি।

ভোর বেলা তিনি বাগানে বেড়াতেন। এই সময় পা ফেলতেন গুণে গুণে। কেউ যদি গিয়ে সেই সময়ে ডাকত, চটে গিয়ে বলতেন, "জ্বালালে দেখছি! ফের আবার গোড়া থেকে গুণতে হবে!" আবার তিনি এক থেকে সুরু ক'রে গুণে গুণে পা ফেলতে সুরু করতেন—যতক্ষণ না নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় পৌঁছচ্ছেন।

পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁর নিজের রুচিই ছিল সকলের বড়, কে কি বলবে এ জন্য মাথা ঘামাতেন না। শীতের দিনে হাতে ঠাণ্ডা লাগত। দস্তানা পরা বা খোলা বিরক্তিকর, তিনি অম্লানবদনে মোজার মধ্যে হাত গলিয়ে সেই মোজা বাঁধা হাতে সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াতেন। শান্তিনিকেতনে থাকতে মহামতি এন্ড্রুজ সাহেব একবার তাঁকে একটা দামী ওভারকোট উপহার দিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ওভারকোট গায়ে দিতে রাজী ন'ন, অথচ এন্ড্রুজ সাহেব আদর ক'রে দিয়েছেন, ব্যবহার না করলে তিনি দুঃখিত হবেন। তাই তিনি ওটা ব্যবহার করতেন গদী হিসাবে—যখনই চেয়ারে বসতেন, ওটা পেতে তার ওপর বসতেন।

অত্যন্ত স্বদেশী-ভাবাপন্ন ছিলেন ব'লে সাহেব-সুবোকে তিনি বিশেষ আমল দিতে চাইতেন না। পিয়ার্সন্, এন্ড্রুজ প্রভৃতি যে সব বিদেশী মনীষীরা শান্তিনিকেতনের গৌরব বাড়িয়ে গেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে তাঁরাও সহজে আমল পান নি। একবার তিনি কি একটা ব্যাপারে তাঁদের এমন ধমক দিয়েছিলেন যে তাঁরা গিয়ে তাঁর নাতি দীনেন ঠাকুরকে বলেন, 'দিনু, ইয়োর গ্র্যাণ্ডফাদার ইজ্ টেরিবল্'—'দিনু, তোমার ঠাকুর্দ্দা একটি ভীষণ চীজ!'

আগেই বলেছি, দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন মস্ত পণ্ডিত। সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র—সব বিষয়েই ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। নিজেও তিনি ছিলেন সুলেখক। কবিতা লিখতে পারতেন চমৎকার—এবং অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে। ছবিও আঁকতেন। দিনের মধ্যে অনেকখানি সময়ই তাঁর লেখাপড়ার চর্চ্চায় কাটত। একবার; রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। বই পড়তে পড়তে দ্বিজেন্দ্রনাথের একটা জায়গায় কেমন খটকা বাধল। তখনই তিনি বেরিয়ে পড়লেন আলোচনা ক'রে সংশয় দূর করবেন। তখন তিনি বেশ বৃদ্ধ হয়েছেন, বেশী হাঁটতে পারেন না। চাকরকে ডেকে বল্লেন, রিক্শ' বার করতে। তখনই তাঁকে যেতে হবে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের বাড়ীতে,—সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য্য নেই। চাকর বললে, 'এত রাত্রে যাবেন? ওঁরা তো সব ঘুমিয়ে পড়েছেন!' কিন্তু কে শোনে কার কথা!

তাঁর আসবার সাড়া পেয়ে ক্ষিতি বাবু তাড়াতাড়ি উঠে আলো জেলে বসলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ চাকরকে বললেন, "দেখলি, যারা জ্ঞানের তপস্যা করে তারা কি এত সহজে ঘুমোয়?"

কোন প্রবন্ধ লেখার পর, তা সে যত কঠিন—দুর্ব্বোধ্য বা দার্শনিক বিষয়ের ওপরেই হোক্ না কেন, কাউকে পড়িয়ে না শোনাতে পারলে তাঁর স্বস্তি ছিল না। হাতের কাছে অন্য লোক না থাকলে বাড়ীর ঝি-চাকরকেও প্রায়ই ঘরে বন্দী হয়ে সে সব ধৈর্য্য ধরে শুনতে হ'ত—কিছু বুঝুক আর নাই বুঝুক।

তাঁর আর একটা মজার খেয়ালের কথা ব'লে শেষ করি। দ্বিজেন্দ্রনাথ অঙ্ক শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, জ্যামিতি নিয়েও খুব মাথা ঘামাতেন। এই জ্যামিতির হিসাব মাফিক কাগজের বাক্স তৈরী করা তাঁর ছিল একটা মস্ত সখ। এতে কোন আঠা ব্যবহার করা হ'ত না, হিসাব মত মাপজোঁক ক'রে মুড়ে মুড়েই নানা আকৃতির বাক্স তৈরী হ'ত। এর জন্য দরকার হ'ত গভীর জ্যামিতির জ্ঞান আর একাগ্রতা। এজন্য তাঁর টেবিলের ওপরে সর্ব্বদা দিস্তে দিস্তে শক্ত বাদামী কাগজ মজুত থাকত। বন্ধুবান্ধবদের তিনি ঐ সব বাক্স উপহার দিতেন, শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরাও অনেক সময় চেয়ে নিত। তাঁর কাছ থেকে ঐ রকম বাক্স পাওয়া তারা একটা খুব গৌরবের বিষয় মনে করত। জ্যামিতি বা জিওমেট্রির অনুকরণে তিনি এই বাক্স তৈরী বিদ্যার নাম দিয়েছিলেন 'বক্সোমেট্রি'।

তুমি কি জান

নীচের শব্দগুলির সঠিক অর্থ জান কি? অনেকেই হয়তো জান না। কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে এগুলি হামেশাই। কাজেই অর্থটা জেনে রাখা ভালো।

সংক্রান্তি—বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলে সংক্রান্তি। জ্যোতিষীরা আকাশে সূর্য্যের একটা কাল্পনিক গমন-পথ ধরে নিয়েছেন। এই পথে ছড়িয়ে রয়েছে কতকগুলি তারার ঝাঁক বা তারাপুঞ্জ—যাকে বলা হয় রাশি। সূর্য্যের গমন-পথে সবশুদ্ধ বারোটা রাশি আছে;—এদের নাম হচ্ছে কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু এবং মকর। এক রাশি থেকে আর এক রাশিতে যেতে সূর্য্যের যে সময়টা লাগে তাকেই আমরা বলি 'মাস'। মাসের শেষ তারিখে সূর্য্য এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে পা দেয়—সাধু ভাষায় সংক্রমণ করে। এই 'সংক্রমণ' কথাটি থেকেই ঐ দিনটিকে বলা হয় সংক্রান্তি।

শিখ—প্রধানতঃ পাঞ্জাববাসী একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়। 'শিখ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'শিষ্য'। গুরু নানক এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেছিলেন। নানকের পর শিখদের পর পর আরও ন' জন গুরু হ'ন। দশম এবং শেষ গুরু গোবিন্দ তৎকালীন মুসলমান বাদশাহদের অত্যাচারের

বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য শিখদের এক যোদ্ধৃ দলে পরিণত করেন আর নাম দেন 'খালসা'। খালসা কথাটির অর্থ 'ভগবানের সম্পত্তি'।

শুভঙ্করী—অঙ্কের হিসাব করবার একটা খুব সহজ পদ্ধতি। শুভঙ্কর দাস নামে একজন অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন ব'লে এর নাম হয়েছে শুভঙ্করী। শুভঙ্করীর সূত্রগুলি সহজ কবিতায় লেখা এবং এর সাহায্যে বড় বড় হিসাব মুহূর্ত্তের মধ্যে ক'রে ফেলা যায়। আগেকার দিনে গ্রাম্য পাঠশালায় শুভঙ্করী এক রকম অবশ্যপাঠ্য বিষয় ছিল। ইংরেজীতে শিক্ষাপ্রণালী শুরু হবার পর এর প্রচলন অনেকটা কমে গেছে—বিশেষতঃ সহরে।

উনো বা ইউ. এন্. ও—এটা সংক্ষিপ্ত রূপ—আসল কথাটা হচ্ছে "ইউনাইটেড্ নেশন্স্ অর্গানিজেশন্"। এটি একটি আন্তর্জ্জাতিক সমিতির নাম। ২য় মহাযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সনে এই সমিতি স্থাপিত হয়েছে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই এর সভ্য শ্রেণী-ভুক্ত হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য পৃথিবী থেকে ভবিষ্যতে যুদ্ধ বন্ধ করা। অবশ্য সেই সঙ্গে এর ভিতর দিয়ে আরও নানা আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থার ভারও নেবার চেষ্টা হচ্ছে বা হয়েছে। বর্ত্তমানে ৫৯টি রাষ্ট্র এর সদস্য আছে এবং আমেরিকার লেক্ সাকসেস্ নামক জায়গায় এর কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় বসানো হয়েছে।

তোমার সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা কর

নীচে যে প্রশ্নগুলি দেওয়া হ'ল এগুলির উত্তর বার করার চেষ্টা কর। না পারলে শেষ পৃষ্ঠায় দেখ। অন্ততঃ ১০টি পারা উচিত।

(১) হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার প্রবর্ত্তক কে?

(২) সব চেয়ে দীর্ঘায়ু জীব কোন্‌টি?

(৩) রেশম, পশম এবং আলপাকা—এই তিন রকম কাপড়ের কোন্‌টা কি থেকে তৈরী হয়?

(৪) ব্যাঙ কোন্ শ্রেণীর প্রাণী—সরীসৃপ?—স্তন্যপায়ী?—

(৫) আমাদের দেশে কোন্ বিখ্যাত রাজা জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন? কবে?

(৬) নীচের চরিত্রগুলি কোন্‌টা কোন্ বইএর ভিতর আছে;—(ক) সুতাশঙ্খ (খ) গুটিয়া দেও (গ) মজন্তালী সরকার (ঘ) লিট্‌ল জন্ (ঙ) শাইলক্।

(৭) নীচের লাইনগুলি কোন্‌টি কার লেখা?—

(ক) "দই দম্বল টোকো অম্বল কাঁথা কম্বল ক'রে সম্বল বোকা ভোম্বল……"

(খ) "পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে ফিরে কি সে যায় পুনঃ আপন বিবরে?"

(গ) অট্টালিকা নাহি মোর, নাহি দাসদাসী, ক্ষতি নাই, নহি আমি সে সুখ-প্রয়াসী।"

(ঘ) "শুয়ে শুয়ে মোরা দেখিব আকাশ—আকাশ মস্ত বড়,
পৃথিবীর যত নীল রঙ সব হইয়াছে সেথা জড়।"

(ঙ) "যাইতে মানস সরে কারো না মানস সরে—আছে তারা এমনি আরামে।"

বিচার

শ্রীগৌরী দেবী

কাজী সাহেব বিচারে বসেছেন, সারা আদালত লোকে ভর্ত্তি। কেউ ফরিয়াদী, কেউ আসামী, আবার অনেকে এসেছে শুধু বিচার দেখতে। ন্যায়-বিচারক ব'লে কাজী সাহেবের খুব নাম-ডাক।

প্রথম ফরিয়াদীর ডাক পড়ল। একটি বিধবা স্ত্রীলোক সজল চোখে সামনে এসে দাঁড়াল। কাজী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, তোমার কিসের নালিশ? কার বিরুদ্ধে?"

স্ত্রীলোকটি বল্‌ল, "হুজুর, নালিশ আমার প্রতিবেশী মহাজনের বিরুদ্ধে। সে আমার ছোট্ট ছেলেকে কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। আজ দু' দিন আমার বাছার খোঁজ নেই।"

"ছেলে লুকিয়ে রেখেছে কেন?"

"হুজুর, টাকার জোর আর কি! আমার স্বামীর সঙ্গে খানিকটা জায়গা-জমি নিয়ে ওর অনেক দিন যাবৎ ঝগড়া চলছিল। উনি চলে যেতে ও ভাবল, বিধবার সম্পত্তি এবার ফাঁকি দিয়েই ঠকিয়ে নেবে। আমি রাজী না হওয়ায় সেদিন জোর ক'রে আমার ছেলে কেড়ে নিয়ে চলে গেছে, বলেছে, জমি ছেড়ে না দিলে ছেলেও দেবে না।"

"বল কি?"—কাজী বিস্মিত কণ্ঠে বল্লেন, "জমির জন্য একেবারে ছেলে চুরি! তোমার কোনও সাক্ষী-সাবুদ আছে?"

"আজ্ঞে না হুজুর, সাক্ষীদের ও টাকা দিয়ে হাত ক'রে নিয়েছে।"

কাজী সাহেব একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তার পর বল্লেন, "তাই তো! আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি। আসামীকে ডাক।"

আদালতের পেয়াদা মহাজনকে সামনে নিয়ে এল।

কাজী জিজ্ঞেস করলেন, "ও স্ত্রীলোকটি যা বল্‌ল তুমি শুনেছ? তোমার কি বলবার আছে?"

"আজ্ঞে হুজুর, আর কিছু বলবার নেই, শুধু বলতে চাই আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। এ একেবারে মিথ্যা মামলা। ঐ স্ত্রীলোকটি অনেক দিন আগে আমার কাছে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল, কিছুতেই শোধ দিয়ে চায় না। আমি পীড়াপীড়ি করায় এখন আমার নামে এই মিথ্যা মামলা এনেছে।"

"তোমার কোন সাক্ষী-সাবুদ আছে ?"

"আজ্ঞে, না হুজুর !"

কাজী আরও খানিকক্ষণ কি চিন্তা করলেন, তার পর বল্লেন, "আচ্ছা, তোমরা আজ যাও, কাল এই সময়ে দু'জনেই আবার হাজির হবে।"

পরদিন স্ত্রীলোকটি এবং মহাজন দু'জনেই যথা সময়ে হাজির হ'লে কাজী স্ত্রীলোকটিকে বল্লেন, "তোমার ছেলে আজই ফেরৎ পাবে।" মহাজনকে বল্লেন, "তোমার কৈফিয়ৎ আমি মানতে পারলাম না। তোমাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করলাম। ঐ টাকা এখনই এই স্ত্রীলোকটিকে দিয়ে দাও।"

মহাজনের মুখ মুহূর্ত্তে সাদা হয়ে গেল। কিন্তু কাজীর হুকুম, তামিল না ক'রে উপায় নেই; সে তখনই পঞ্চাশ টাকা গুণে স্ত্রীলোকটির হাতে দিল। স্ত্রীলোকটি খুসী হয়ে কাজীকে সেলাম করতে করতে চলে গেল।

কাজী মহাজনকে বল্লেন, "একটু দাঁড়াও।"

এ-কথা সে-কথা ক'রে খানিকক্ষণ সময় কাটিয়ে কাজী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বল্লেন, "ওহে, আমার মনে হচ্ছে আমার বিচারে ভুল হয়েছে, অত চট্ ক'রে তোমায় জরিমানা করা উচিত হয় নি। আমি আবার ভেবে-চিন্তে বিচার করব। তুমি দৌড়ে যাও, স্ত্রীলোকটির কাছ থেকে টাকাগুলো ফেরৎ নিয়ে এস।"

মহাজন অবাক্ হয়ে বল্ল, "কিন্তু আমি চাইলেই বা সে দেবে কেন?"

"আলবাৎ দেবে। না দিলে জোর ক'রে কেড়ে আনবে। বলবে আমার হুকুম। যাও, তাড়াতাড়ি যাও।" পেয়াদাকে ডেকে বল্লেন, "তুমিও এর সঙ্গে যাও, তবে টাকা ও নিজেই কেড়ে আনবে, তোমার সে বিষয়ে সাহায্য করবার দরকার নেই।"

মহাজন ও পেয়াদা বেরিয়ে গেল।

খানিক পরেই বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল, এবং তার অব্যবহিত পরেই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আদালত-ঘরে ঢুকল সেই স্ত্রীলোকটি এবং তার পেছনে সেই মহাজন।

স্ত্রীলোকটি কেঁদে বল্ল, "ধর্ম্মাবতার, আপনার হুকুমে আমি এর কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি পূরণ পেয়েছি। আপনার সম্মুখে ও টাকা গুণে দিয়েছে। কিন্তু এখন আবার সেই টাকা কেড়ে নেবার জন্য ছুটে এসেছে! বলছে নাকি আপনার হুকুম!"

"সে টাকায় কোথায়? কেড়ে নিয়েছে?"

"আজ্ঞে, এই আমার আঁচলে বাঁধা রয়েছে। কেড়ে নেবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছে—অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছে, কিন্তু পারে নি; আমি ছিনিয়ে রেখেছি।"

কাজী সাহেবের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। সে ভাব সামলে নিয়ে তিনি বল্লেন, "আচ্ছা, আমি এরও বিচার করছি। টাকাটা দেখি? হ্যাঁ, ওটা আপাততঃ মহাজনকেই ফেরৎ দাও। আর—" পেয়াদার দিকে চেয়ে বল্লেন, "এই মিথ্যেবাদী স্ত্রীলোকটাকে এখনই মাথায় ঘোল ঢেলে সহরের বাইরে বার ক'রে দাও।"

সবাই ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইল; কাজী বলতে লাগলেন, "এই মহাজন প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে সামান্য কয়েকটা টাকা তোমার কাছ থেকে কিছুতেই কেড়ে নিতে পারল না, আর ও তোমার কোলের ছেলেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তুমি আটকাতে পার নি—এ কথা আমায় বিশ্বাস করতে হবে? মায়ের কাছে ছেলের চাইতেও বড় হ'ল কিনা ঐ পঞ্চাশটা টাকা! তোমার সব কথা মিথ্যে।"

আদালত শুদ্ধ লোক অবাক্। স্ত্রীলোকটি মাথা হেঁট ক'রে রইল। মহাজন সেলাম করতে করতে বেরিয়ে এল।*

* একটি প্রাচীন গল্প থেকে

আশ্বিন মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

(১) বিজ্ঞান—প্রতিযোগীদের ভোটে সব চেয়ে বড় ১০টি আবিষ্কার:— টেলিভিশন, এটম্ বোমা, রেডিও, পেনিসিলিন, এক্স-রে, এরোপ্লেন, টকি, রেডিয়াম্, স্ট্রেপ্টোমাইসিন্, টেলিফোন। এই তালিকার সঙ্গে প্রেরিত তালিকা মেলায় পুরস্কার পেলেন—শ্রীকমলেন্দুকুমার মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)। আর যাঁদের তালিকা এই তালিকার কাছাকাছি হয়েছে তাঁদের নাম—শ্রীরমলা দাশগুপ্তা (ডিগবয়), শ্রীমুকুলরাণী মণ্ডল (কাশাড়িয়া), শ্রীদিলীপকুমার সমাজদার (ভাঙ্গা)।

(২) সাহিত্য—প্রতিযোগীদের ভোটে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ১০ জন শিশুসাহিত্যিকের নাম—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী, শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, শ্রীসুনির্ম্মল বসু, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, ৺সুকুমার রায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীদাক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি তালিকা পাঠানোয় পুরস্কার পেলেন—শ্রীঅজিতা দাশগুপ্তা (পাটনা)। আর যাঁদের তালিকা এই তালিকার কাছাকাছি হয়েছে তাঁদের নাম—শ্রীশক্তিকুমার চক্রবর্ত্তী (কৃষ্ণনগর), শ্রীভাস্করকুমার সেনগুপ্ত (কালীঘাট), এ. এস্. নূর মোহাম্মদ (বাদলগাছি), শ্রীবিমলভূষণ রায় (কলিকাতা-৯), শ্রীসুস্নাত গংগোপাধ্যায় (কলিকাতা-২৬), শ্রীতরুণকুমার সান্যাল (বর্দ্ধমান)।

এ বছরের নোবেল পুরস্কার

এ বছর চিকিৎসা ও শারীর-বিজ্ঞানের জন্য বিশ্ববিখ্যাত নোবেল পুরস্কার পেলেন অধ্যাপক রুডল্‌ফ্‌ হেস্‌ ও অধ্যাপক মনিজ্‌। অধ্যাপক হেস্‌ হচ্ছেন জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ—চোখ এবং মগজ সংক্রান্ত রোগে বিশেষজ্ঞ। ইনি জাতিতে জার্ম্মান্‌। এঁর বর্ত্তমান বয়স ৬৮ বছর। অধ্যাপক মনিজ্‌ জাতিতে পর্টুগীজ্‌। ইনি লিস্‌বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অস্ত্রোপচারের সাহায্যে মানসিক রোগের চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কার ক'রে ইনি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন! বর্ত্তমানে ইনি বৃদ্ধ,—বয়স ৭৫ বছর।

পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন একজন জাপানী বৈজ্ঞানিক—অধ্যাপক হিদেকি য়ুকাওয়া। এঁর বয়স মাত্র ৪২ বছর। যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত ইনি জাপানের কিওটো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন, সম্প্রতি আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (নিউ ইয়র্ক) পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। পরমাণুর ভিতরকার শক্তি সম্বন্ধে এঁর গবেষণা খুবই মূল্যবান্‌ এবং সেই আবিষ্কারের জন্যই ইনি এই সম্মান লাভ করলেন। জাপানীদের মধ্যে অধ্যাপক য়ুকাওয়াই প্রথম নোবেল পুরস্কার পেলেন এবং এশিয়াবাসীদের মধ্যে এ দিক্‌ দিয়ে তাঁর স্থান হ'ল ৩য়। তাঁর আগে এশিয়াবাসীদের মধ্যে কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও রামন্‌ই এই সম্মান লাভ করেছিলেন।

রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেলেন অধ্যাপক উইলিয়াম্‌ ফ্রান্সিস্‌ কিয়াক্‌। ইনি ক্যালিফোর্ণিয়ার লোক্‌। সাহিত্যের জন্য এ বছর কাউকেই পুরস্কার দেওয়া হ'ল না।

ক্ষুদিরামের প্রতিমূর্ত্তি

মজঃফরপুর আদালত-গৃহের সম্মুখের মাঠে যেখানে ১৯০৫ সনে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বোমা নিক্ষেপ ক'রে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন সেখানে সেই ঘটনাকে স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্য তাঁর একটি ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হবে এ খবর তোমরা শুনেছ। সম্প্রতি সে মূর্ত্তি তৈরী হয়ে এসেছে। আগামী ডিসেম্বর মাসেই বিহারের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ আনুষ্ঠানিক ভাবে তার আবরণ উন্মোচন করবেন।

পণ্ডিত জওহরলাল

পণ্ডিত জওহরলাল আমেরিকা ভ্রমণ সেরে ইংল্যাণ্ড হয়ে ভারতে ফিরে এসেছেন ১৪ই নভেম্বর। ঐ দিনই তাঁর বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হ'ল। বোম্বাইএ এ নিয়ে খুব উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। প্রধান মন্ত্রীর এই শুভ জন্মদিনে পৃথিবীর নানা যায়গা থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। আমরাও জানাচ্ছি।

টেবিল্‌ টেনিস্‌

পৃথিবীবিখ্যাত টেবিল টেনিস্‌ খেলোয়াড় ভিক্টর বার্ণা ও রিচার্ড বাগ্‌ম্যান্‌ সম্প্রতি ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। বার্গম্যান্‌ বর্ত্তমানে এই খেলায় ওয়াল্‌ড্‌ চ্যাম্পিয়ন্‌। পর পর তিনবার তিনি এই সম্মান পেয়েছেন। বার্ণাও ইতিপূর্ব্বে ঐ সম্মানের অধিকারী ছিলেন—পর পর পাঁচ বার। কলকাতায় এঁদের প্রদর্শনী খেলা দেখবার মত হয়েছিল।

কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ ক্রিকেট দল

'কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ ক্রিকেট দল' এই নাম দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের বাছাই করা খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত একটি দল সম্প্রতি ভারতে এসেছে। তারা যে বাস্তবিকই বেশ শক্তিশালী দল পর পর কয়েকটি খেলায় তার পরিচয় দিয়েছে। সম্প্রতি দিল্লীতে তাদের সঙ্গে ভারতীয় দলের প্রথম বে-সরকারী টেষ্ট্‌ ম্যাচ হয়ে গেল। অনেকদিন পরে বিজয় মার্চেণ্ট ভারতীয় দলের নেতৃত্বের ভার নিয়েছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, হাত ভেঙে যাওয়ায় ব্যাট ধরতে পারেন নি। খেলায় কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ দল ৯ উইকেটে বিজয়ী হয়েছে।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

এবারের রামধনু যখন পাবে তখন তোমাদের অনেকেই হয়তো আসন্ন বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকবে। তাই এবারে আর বেশী কিছু লিখব না। আশ্বিনের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফল এবারে বেরোল। যে তালিকা তৈরী হয়েছে তা তোমাদেরই দেওয়া ভোট অনুযায়ী তৈরী হয়েছে, ওটিকে আমাদের ব্যক্তিগত মত ব'লে যেন কেউ ভুল ক'রে ব'স

না। বলতে কি, আমাদের মতে ২য় তালিকাটি থেকে এমন অনেক যোগ্য ব্যক্তি বাদ পড়েছেন বাংলা শিশুসাহিত্যে যাঁদের দান অমূল্য। যেমন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, মনোরঞ্জন প্রভৃতি, এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেরও কেউ কেউ। রবীন্দ্রনাথের নামটা না হয় নাই ধরলাম। মনে হয়, সাময়িক পত্রে সর্ব্বদা যাঁদের লেখা তোমাদের চোখে পড়ে, তাঁদের নামই তোমাদের কলমের ডগায় এসে গেছে। এ বিষয়ে অনেকেই ভেবে-চিন্তে দেখা বা একটু পরিশ্রম করা প্রয়োজন বোধ কর নি। কারো কারো শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে পড়াশোনাও, মনে হ'ল, খুব সীমাবদ্ধ। কেউ কেউ পাঠানো নামগুলোও ঠিকমত লিখতে পার নি—একজনের নামে অপরের পদবী যুড়ে দিয়েছ। এগুলি প্রশংসনীয় নয় নিশ্চয়ই। তবে আর যাই হোক, তোমাদের উৎসাহ দেখে খুসী হয়েছি। এবারে প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা এত বেশী হয়েছিল যে অনেকদিন এ রকমটা দেখি নি। ভোট গুণে, নম্বর দিয়ে তালিকা তৈরী করতে আমরা সত্যিই হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলাম।

গত সংখ্যা রামধনুতে ১টি ভুল ছাপা হয়েছিল, সেটি সংশোধন ক'রে নিও। ৩৭৪ পৃষ্ঠায় নীচে থেকে ৬ষ্ঠ ও ৭ম লাইনে 'বর্গ ইঞ্চি' কথাটা দু'বার আছে। ওটা হবে 'ঘন ইঞ্চি'।

এবারে ব্যক্তিগত কয়েকটি চিঠির জবাব দেই।

শ্রীমালবিকা দত্ত (করিমগঞ্জ)—তোমার পাঠানো ভাইফোঁটার চন্দন ও ধানদূর্ব্বা রামধনু আদরের সঙ্গে গ্রহণ করল এবং প্রত্যুত্তরে তার বোনটিকে স্নেহ-সম্ভাষণ জানাল। তোমার হারানো ভাইটির কথা শুনে আমরাও খুব ব্যথিত হ'লাম। শ্রীশর্মিলা সরকার (কলিকাতা)—নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'প্রিয়ঙ্গু' আগামী মাস থেকে সুরু হবে। আর একখানিও দেবার চেষ্টা করছি, তখন তোমার অনুরোধ ভেবে দেখব। রাধামাধবের রত্নহারের মত বড় বই নাটকাকারে আনতে হ'লে অনেক ছাঁটাই করতে হবে, নয় কি? শ্রীঅমল দত্ত (পাটনা)—তুমি সমবয়সী পূর্ব্ব বঙ্গীয় বা আসামবাসী বন্ধু চেয়েছ (চিঠি মারফৎ)। এও জানিয়েছ যে তুমি পাটনা বিজ্ঞান কলেজের ২য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, ডাকটিকেট ও খবরের কাগজ থেকে মজার খবরের কাটিং সংগ্রহ করার সখ আছে। তোমার অনুরোধ মত খবরটা সবাইকে জানিয়ে দিলাম। এ. এস্. নূর মোহাম্মদ (বাদলগাছি)—কবিতা দু'টোই পেয়েছি। ভালোই লাগল। একটি সুবিধামত প্রকাশের চেষ্টা করব। তোমার চিঠি লেখার ভঙ্গী প্রশংসনীয়, হাতের লেখাটিও। শ্রীদীপালী সেনগুপ্তা—তোমার অনুরোধ মত পত্রিকা অফিসের খুঁটিনাটি নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখবার চেষ্টা করব। অনেক দিন আগে বার্ষিক শিশুসাথীতে অনেকটা এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ দিয়েছিলাম—"শিশুসাথীর জন্মকথা" নামে। সেটাও পেলে প'ড়ে দেখতে পার। 'আমাদের প্রতিবেশী' বিভাগ আবার বেরোবে বই কি! শ্রীসুনীলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীহরিদাস চক্রবর্ত্তী (বহরমপুর)—ছোট্ট হ'লেও ভুলটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। অবশ্যি, ওটা আমাদের চোখেও ইতিমধ্যে পড়েছিল, এবারে সংশোধন ক'রে দেওয়া গেল।

অন্যান্য চিঠির উত্তর (যেগুলি ধাঁধার উত্তরের সঙ্গে এসেছে) পরের বারে দেব। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। জয় হিন্দ। —ইতি রাঃ সঃ।

ষষ্ঠ
শিকার ও শিকারী

ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছে দশ বৎসর।

দশ বৎসর বড় অল্প কাল নয়। এই সময়টুকুর মধ্যে সারা পৃথিবীতে ঘটেছে অনেক বড় বড় ঘটনা। কিন্তু এই দশ বৎসরের মধ্যে বনের ভিতরে কোনই অসাধারণ ঘটনা ঘটেনি। প্রতি বৎসরই এক ঋতুর পর এসেছে আর এক ঋতু এবং ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বনভূমিকেও দেখতে হয়েছে নিয়মিতভাবেই এক এক রকম। কিন্তু এ সব কথা গল্পে উল্লেখ করবার মত বিষয় নয়। কাজেই, ঠিক দশ বৎসর পরেই আমরা আবার অবলম্বন করব আমাদের গল্পের সূত্র।

এই দশ বৎসরে টুনুর চেহারা যে একেবারেই বদলে গিয়েছে, এটুকু তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারবে। সে ছিল পাঁচ বৎসরের শিশু, এখন হয়েছে পনের বৎসরের বালিকা। তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রূপ যেন ফেটে পড়ছে। তাকে দেখলেই মনে হয়, বনবাসিনী রাজকন্যা।

সে বড় হয়েছে বনরাজ্যের অবাধ স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে। এখানে সমাজের কোনই বন্ধন নেই। সমাজে যে আচরণে নিন্দা হয়, এখানে কেউ তা আমলেই আনে না। সহরে পনেরো বৎসরের মেয়ে থাকে গুরুজনদের চোখে চোখে, কিন্তু এখানে টুনু সেই শিশুর মতই চপল আনন্দে বনে বনে ছুটে বেড়ায় চঞ্চল হরিণীর মত, কখনো গাছ-কোমর বেঁধে বালকদের মতই অসঙ্কোচে গাছে গিয়ে ওঠে, ফল পাড়ে, ফুল তোলে, ডাল ধ'রে ঝুলে দোল খায় এবং দুলতে দুলতে হঠাৎ রুণুর পিঠের উপর লাফিয়ে প'ড়ে উচ্ছলিত হ'য়ে ওঠে তরল কৌতুক-হাস্যে।

দূর থেকে দুখীরাম ও পার্ব্বতী তার এমনি সব লীলাখেলা দেখে মুখ টিপে হাসতে থাকে, কিন্তু টুনুকে মানা করবার কথা কোনদিন তাদের মনেও ওঠে না। বনবাসী তারা, সহরের আদপ-কায়দার কী ধার ধারে? আর টুনু তো তাদেরই মেয়ে?

টুনু যে সত্য সত্যই তাদের নিজের মেয়ে নয়, এ কথা তারাও যেন আজ ভুলে গিয়েছে। টুনুর বাপ-মা যে আর মেয়ের খোঁজ নিতে আসবে না, এ বিষয়ে আর তাদের কোনই সন্দেহ নেই। আজকে টুনুকে তাদের সামনে নিয়ে গেলেও তারা নিশ্চয় তাকে চিনতে পারবে না। সুতরাং পার্ব্বতী এখন টুনুকে নিজের মেয়ে ব'লে অনায়াসেই দাবী করতে পারে।

কিন্তু টুনু ভোলে নি। আজও অবোধ শৈশবের আনন্দ-স্বপ্ন তার মনের মধ্যে রঙীন ছবির মত জেগে ওঠে মাঝে মাঝে। আজও কোন কোন দিন রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে সে দেখে বাপের মুখ, মায়ের মুখ। টুনু কেমন ক'রে ভুলবে? রক্তের টান ভোলা যায় না।

বাপ-মায়ের একটি মাত্র স্মৃতিচিহ্ন এখনো সে সযত্নে রক্ষা করে। দশ বৎসর আগে যে-পোষাক প'রে সে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এসেছিল প্রজাপতি ধরতে, আজ আর তা' বর্ত্তমান নেই বটে, কিন্তু তার গলায় ঝুলত যে সোনার পদকখানি, এখনো সেখানিকে গলায় প'রে থাকে সে সর্ব্বদাই। পদকের উপরে লেখা একটি নাম, রেণুকা। টুনু জানে, এইটিই তা'র আসল নাম।

পার্ব্বতী এক একদিন স্বামীকে ডেকে ব'লে, "হ্যাঁগা, একটা কথা ভেবে দেখেছ কি?"

দুখীরাম উবু হ'য়ে মাটির উপরে ব'সে থেলো হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে বলে, "কি?"

—"টুনু বড় হ'য়েছে, সে আর ছোট্টটি নেই।"

হুস্ ক'রে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দুখীরাম বলে, "তুই তো ভারী আশ্চয্যি কথা বললি রে পার্ব্বতী! টুনু যে আর ছোট্টটি নেই, সেটা কি আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না?"

পার্ব্বতী বলে, "দেখতে তো পাচ্ছ, কিন্তু মেয়ের উপায় করছ কি?"

—"উপায় মানে?"

—"এইবারে টুনুর জন্যে একটি বর খুঁজতে হবে তো?"

দাওয়ার কোণে হুঁকোটা রেখে দুখীরাম অবহেলা-ভরে বলে, "যা, যা, বাজে বকিস নি! টুনু এখন এত বড় হয় নি যে এখুনি ওর বর খোঁজবার জন্যে আমাকে ছুটোছুটি ক'রতে হবে।"

ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে পার্ব্বতী বলে, "হ্যাঁগা, তোমার সঙ্গে আমার যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন আমার বয়স ছিল কত? আমি কি টুনুরও চেয়ে ছোট ছিলুম না?"

দুখীরাম চটে গিয়ে বলে ওঠে, "তুই আর টুনু কি এক কথা? তুই হ'লি একটা জংলী কাঠুরের বেটী, আর আমার টুনু হচ্ছে হয়ত কোন রাজার মেয়ে। তোর সঙ্গে টুনুর তুলনা?" বলেই সে থুঃ ক'রে মাটির উপরে থুথু ফেললে।

পার্ব্বতী বলে, "ও আমার বুদ্ধিমান্ কাঠুরে মশাই, তুমি কি ভাবছ টুনুকে এখন বিয়ে ক'রতে আসবে কোন রাজার ছেলে? সবাই তো জানে, ও হচ্ছে আমাদেরই মেয়ে।"

দুখীরাম বলে, "রাজার ছেলে আসুক আর না আসুক, টুনুকে আমি কোন কাঠুরে ছেলের হাতে সঁপে দিতে পারব না। ফুল দিতে হয় দেবতার পায়ে, কেউ কি তা নর্দ্দমায় ফেলে দেয় রে? ছাখ দেখি আমাদের ঐ টুনুর দিকে তাকিয়ে, ও কি ঠিক ফুলের মতই সোন্দর নয়?"

তারা দুজনেই বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রলে।

সবুজ ঘাসে ঢাকা, বনফুল-ফোটা খানিকটা জমি, তারই উপরে কানামাছি খেলছে টুনু আর তার সমবয়সী সাত-আটটি কাঠুরেদের মেয়ে। ওখানকার আকাশ-বাতাস থেকে থেকে ছন্দিত হয়ে উঠছে তাদের কৌতুক-হাস্যরোলে। আরও খানিক তফাতে একটি গাছতলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুণু খুসি মনে দেখছে টুনু আর তার বন্ধুদের লীলা-খেলা।

স্নেহমমতায় বিগলিত প্রাণে সেইদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে পার্ব্বতী ধীরে ধীরে বললে, "টুনু আমার ছোট্ট খুকীটির মতন এখনো খেলা বৈ আর কিচ্ছু জানে না। আহা, খেলাই করুক, যতদিন পারে খেলাই করুক।"

ওদিকে টুনুদের তখন শেষ হ'য়ে গিয়েছে কানামাছি খেলা। তারা সবাই মিলে গোল হয়ে হাত ধরাধরি ক'রে শুরু ক'রে দিয়েছে নাচ আর গান। কাঠুরেদের মেয়েগুলির রঙ কালো হ'লেও গড়ন খুব চমৎকার। খোলা হাওয়ায়, মুক্ত আকাশের তলায়, দিনে দিনে গ'ড়ে উঠেছে তাদের স্বাধীন জীবন। যেন বনদেবীর বরে

তারা পেয়েছে অটুট স্বাস্থ্যের আশীর্ব্বাদ। তাদের প্রত্যেকেরই খোঁপায় গোঁজা বনফুল, তাদের গলাতেও ফুলের মালা, আর দুই হাতেও ফুলের গয়না। তাদের কালো কালো গায়ে রঙীন ফুলগুলিকে দেখাচ্ছিল বড় সুন্দর। এবং তাদের মাঝখানে টুনুকেও দেখাচ্ছিল যেন কোন গোলাপ-কুঞ্জের মূর্ত্তিমতী ফুলকন্যার মত।

তারপর নাচ-গান থামিয়ে টুনু ব'লে উঠল, "চল্ ভাই, আর এখানে নয়। এইবার পাহাড়তলীর সেই পুকুরে গিয়ে সাঁতার কাটি'গে চল্!"

বাতাসে আঁচল উড়িয়ে নাচের ভঙ্গীতে লাফাতে লাফাতে টুনু ছুটল একদিকে, এবং অন্য মেয়েরাও ছুটল তার পিছনে পিছনে। রুণুও চলল তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

... ...

বনের এইখান থেকে মাইল দশেক তফাতে আছে একটি বড় গ্রাম। তাকে ছোট একটি সহর বললেও বলা যায়। সেই গ্রামে বাস করে জমিদার নরেন্দ্র-নারায়ণ, উপাধি তার কুমার।

নরেন্দ্রনারায়ণের পিতা ভূপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়েছে গত বৎসরে। কুমার নরেন্দ্রনারায়ণ এখনো সাবালক হয়নি, বয়স তার বিশ বৎসরের বেশী নয়। জমিদারীর তদারক করেন দেওয়ান, আর নরেন্দ্রনারায়ণ বনে বনে ঘুরে বেড়ায় শিকারের সন্ধানে। এটা হচ্ছে তার একটি বাতিকের মত।

আজকেও নরেন্দ্র শিকার করতে বেরিয়েছে, সঙ্গে আছে তার জনকয়েক বন্ধু।

আজ কিন্তু ভাগ্য তাদের প্রতি বিরূপ। সকাল থেকে তারা এ-বনে ও-বনে তল্লাস ক'রে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন দয়ালু পশুই প্রাণ দিয়ে তাদের কৃতার্থ ক'রতে এল না। সূর্য্য প্রায় মাথার উপরে, রোদের তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠছে, এবং তাদের উৎসাহ ক্রমেই শান্ত হয়ে আসছে।

হঠাৎ নরেন্দ্র দেখলে, ডান পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটা হরিণ, তার পরেই চকিত দৃষ্টিতে শিকারীদের দিকে একবার তাকিয়েই আবার ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল যেন বিদ্যুতের মত।

নরেন্দ্র উত্তেজিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "এতক্ষণ পরে শিকারের যখন দেখা পেয়েছি, তখন আর ওকে ছাড়া নয়। আমি এইদিক্ দিয়ে একলা ওর পিছনে ছুটি, আর তোমরা সকলেও চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে ঐ জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢোকো। দেখো, কোন দিক্ দিয়েই ও যেন পালাতে না পারে।"

নরেন্দ্র নিজের বন্দুকটা একবার পরীক্ষা ক'রে বেগে জঙ্গলের ভিতরে ছুটে গেল। খানিক তফাতে একটা ঝোপ তখনো দুলছিল। বোঝা গেল, হরিণটা ঐ দিকে গিয়েছে। নরেন্দ্র সেই ঝোপ্ ভেদ ক'রে অগ্রসর হ'ল দ্রুতপদে। এইভাবে শিকার খুঁজতে খুঁজতে সে অনেকখানি পথ এগিয়ে গেল কিন্তু হরিণের আর কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

বনের এক জায়গায় খোলা জমির উপরে হতাশভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র ভাবছে, শিকার দেখা দিয়েও ধরা দিলে না, আজকের দিনটা বোধ হয় বৃথাই গেল।

হঠাৎ দূরে একটা বন্দুকের শব্দ শুনে সে আবার চাঙ্গা হ'য়ে উঠল। হরিণটা নিশ্চয়ই তার সঙ্গীদের কারো পাল্লায় গিয়ে পড়েছে! সে খুসিও হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্ষুণ্ণও হ'ল এই ভেবে, আজকের শিকারের বাহাদুরিটা তা হ'লে গ্রহণ করবে অন্য কেউ।

সঙ্গীদের অপেক্ষায় নরেন্দ্র সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় একটু তফাতে একটা ঝোপ দুলে দুলে উঠল। তার পরেই ঝোপের ভিতর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল একটা হরিণ। তার ভাব দেখেই বোঝা গেল, সে আহত হয়েছে এবং আর বেশী দূর অগ্রসর হ'তেও পারবে না।

হরিণটাকে একেবারে শেষ ক'রে দেবার জন্যে নরেন্দ্র বন্দুকটা তুলে ধরল।

কিন্তু বন্দুকের ঘোড়া টিপতে আর হ'ল না। আচম্বিতে কোথা থেকে একটি মেয়ে বেগে ছুটে এসে হরিণটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, "খবর্দ্দার বলছি, আর এখানে বন্দুক ছুঁড়ো না!"

সেইভাবেই আড়ষ্ট হাতে বন্দুক ধ'রে নরেন্দ্র থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। (ক্রমশঃ)

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

২৬ দিন। ঐ দিন রাত হবার আগেই শামুক-ছানা বাঁশের ডগায় পৌঁছে গেল।

উত্তরদাতাদের নাম:—হেমজ্যোতিঃ (কলিকাতা-১৯); সুস্নাত গংগোপাধ্যায় (কলিকাতা-২৬); সুনীলকৃষ্ণ ও হরিদাস চক্রবর্ত্তী (বহরমপুর); পরিমল, প্রশান্ত, পার্থ ও প্রণব (মিহিজাম); অমিয়-স্মৃতি সেনগুপ্ত (ঢাকুরিয়া); শেখরচাঁদ মল্লিক (হাওড়া); সবিতা, দিলীপ, স্বপন ও বন্দনা (যোড়াসাঁকো); প্রভঞ্জন সেন (কলিকাতা-১৯); দেবু-চন্দন-সুভাষ, গৌরী-আভা-স্বপ্না, মিনতি-মিনু-টুটুল, অনিল (জলপাইগুড়ী); শম্ভুনাথ সিংহ (রামগোপালপুর); বুদ্ধদেব ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (বলুটী); জয় (খড়গপুর); রত্না, জয়ন্ত, স্বপ্না, ছন্দা রায় (বাঁকীপুর); হীরেন্দ্রনাথ রায় (বরিশাল); রামেন্দু-বাবলু-তপন, রামু নব-শামু (নাকড়াকোন্দা); রাধাবিনোদ সুরাল, সমরেন্দ্র-সুনীল-অশ্বিনী (শিলদা): মুকুল সান্যাল ও বিষ্ণু ভট্টাচার্য্য (মাদারীপুর); ঝরণা ঘোষ (খুর্দা); দীপংকর সেন (সিঙ্গুর); লক্ষ্মীপদ নন্দী, প্রভাত-শিবশঙ্কর (মেদিনীপুর); বিভাসবিহারী বসু (পাটনা); ঝরণা ও রেণুকা চট্টোপাধ্যায় (জয়পুর); শর্মিলা সরকার (কলিকাতা); নূর মোহাম্মদ (বাদলগাছি); অমলকুমার দত্ত (পাটনা); ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান) দীপককুমার বসু (কলিকাতা-২৯), বেণু ও রাঙ্গাদি (দিনাজপুর); রুণু বসু (কাঁচড়াপাড়া); সবিতা, এম্, এ, সালেহিন, এ. আজিজ, তপন-আলা-ভোলা (রাজশাহী); বিমলভূষণ রায় (কলিকাতা-৯); বাবলু, ছোট্টু খোকন-মহারাজ (ঘাটশীলা); অনু, ঝরণা, আভা, আরতি ও প্রণতি (বগুড়া), বিষ্ণুপদ রায় (বালিঘাই)।

নূতন ধাঁধা

বড় রাস্তার ওপর মস্ত দোকান। সাইন্‌বোর্ডটি এমন ভাবে সযত্নে লেখা যে দরকার হ'লে প্রত্যেকটি অক্ষর আলাদা ক'রে খুলে পরিষ্কার ক'রে আবার যথাস্থানে বসিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ঐতেই বেধেছে গোলমাল। সেদিন সাইন্‌বোর্ড খানা খোলা হয়েছে পরিষ্কার করবার জন্য, কিন্তু পরিষ্কার করার পর সাইন্‌বোর্ডওয়ালা সাইনবোর্ডখানা নিজে না লাগিয়ে ভার দিয়ে গেছে এক আনাড়ি, নিরক্ষর ছোকরার ওপর। ছোকরা বুদ্ধি ক'রে অক্ষরগুলো যা সাজিয়েছে তা নীচে তুলে দিলাম। তোমরা ওগুলো ঠিক মত সাজিয়ে দাও দেখি?

আদ বঙ্গ ভীয়ম পয়ুশ্চি বনর্ব্বে
অত্নামৃ শ্রীভাজাচার্য দোগীহীন্দ্র
কবিনাথ রেবিয়্যলো থারয়ট্ট

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

(৪২৪ পৃষ্ঠা দেখ)

(১) হানিম্যান্ (২) কচ্ছপ (৩) রেশম—গুটি পোকা থেকে, পশম—ভেড়ার লোম থেকে, আলপাকা—আলপাকা নামক প্রাণীর লোম থেকে। (৪) সরীসৃপও নয়, স্তন্যপায়ীও নয়—উভচর। (৫) গোপালদেব—অষ্টম শতাব্দীতে। (৬) (ক) ঠাকুরমার ঝুলি (খ) হিন্দুস্থানী উপকথা (গ) টুনটুনির বই (ঘ) রবিন হুড (ঙ) মার্চেণ্ট অব ভেনিস। ৭ (ক) সুকুমার রায় (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (গ) শিবনাথ শাস্ত্রী (ঘ) বুদ্ধদেব বসু (ঙ) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ।

সিপ্রা

জান্তব চর্বি বিবর্জিত সাবান

কোমল অঙ্গের

বিশেষ উপযোগী

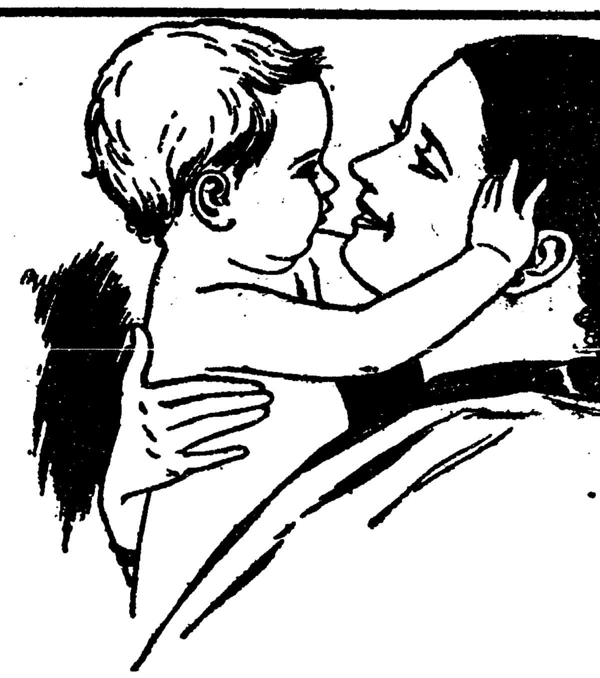

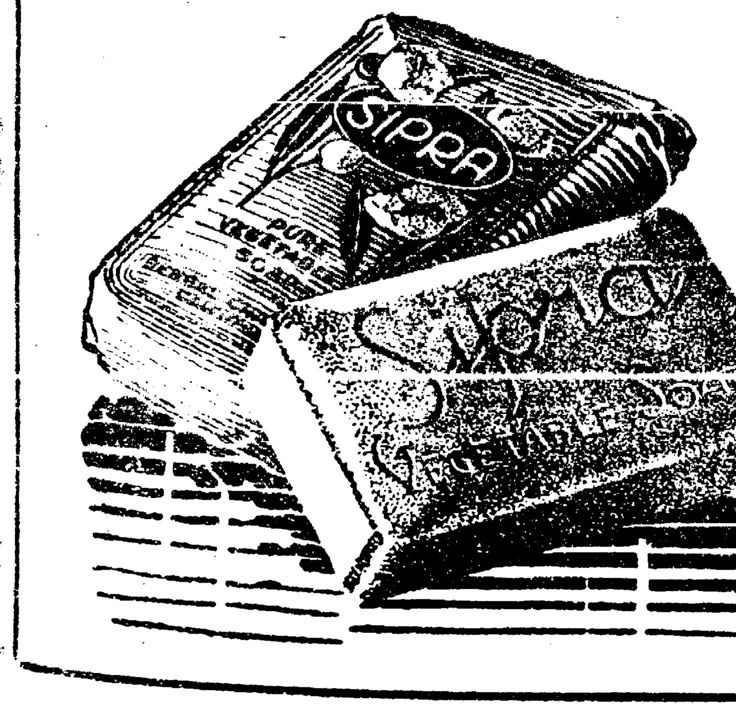

* প্রচুর ফেন
* স্নেহময় স্পর্শ
* মনোরম গন্ধ

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

সকলেই বলেন

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিশু-মাসিক

শুকতারা

- কবিতা
- জীবনী
- নাটক
- বিজ্ঞান
- ভূগোল
- গল্প
- ভ্রমণ
- খেলাধুলা
- বৈচিত্র্য
- বিদেশী সাহিত্য
- উপন্যাস
- শিকার
- ব্যায়াম
- ইতিহাস
- ধাঁধা-রহস্য

প্রত্যেকখানি ছয় আনা

ছেলেমেয়েদের কাগজে এমন নির্ভীক সমালোচনা সম্পূর্ণ নূতন। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, তাদের স্বাস্থ্য ও তাদের দেশ—সব-কিছুর আলোচনা একমাত্র ‘‘শুকতারায়ই’’ সর্ব্বপ্রথম।

বার্ষিক সডাক ৪৲

স্বাধীন দেশে আজ
এরই দরকার সবচেয়ে বেশী

ঝক্‌ঝকে চিত্র-সমুজ্জ্বল! আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যের খনি!

দেব-সাহিত্য-কুটীর ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি	১।০
পদ্মরাগ	১৷৷০
সোনার হরিণ	১৷৷০
নূতন পুরাণ	৮৵০
হাস্য ও রহস্য	৮৵০
চায়ের ধোঁয়া	৮০
হুকাকাশির গল্প	৮০
দমাদম্ দামোদর (নাটক)	।৵০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের

মহাভারতের গল্পগুচ্ছ (১ম)	৮০
ঐ (২য়)	৮০
দিগ্বিজয়ী বীর	৮০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲

শিবরাম ও মনোরঞ্জনের

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে	৮৵০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং চং	৮০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু	৮৵০

শ্রীমাধব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার

আজব গল্প	।৵০
অনেক গল্প	।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	১৲
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲
আকাশের গল্প	১।০
আবিষ্কারের গল্প	৮০
ধূমকেতু	৮০
অয়েল পেন্টিং (নাটক)	।০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা	১৷৷০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি	৮০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

দি লাষ্ট্ অফ্ দি মোহিকান্‌স্	৷৷৵০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের

অলিভার টুইষ্ট	৷৷৵০

শ্রীলীলা মজুমদারের

বদ্যিনাথের বড়ি	৮০

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

গল্পসল্প	।০
ছুটীর গল্প	।০

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়ের

যে জার্ম্মানী হেরে গেছে	২৲
ইউরোপের আলো	১।০

শ্রীসুনীল ঘোষ সম্পাদিত

রাতের ছায়া	৷৷৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

Regd. No. C—1641

বাজে খরচ জিনিষটা কি ভাল ?

নিশ্চয়ই নয়,—বিশেষতঃ এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে।

কিন্তু একটির বেলায় একথা খাটে না—,

সেটি হচ্ছে বই কেনার বাজে খরচ।

বাইরে থেকে খরচ ব'লে মনে হ'লেও
আসলে এটি জমা ;—মনের ভাণ্ডারে
এর সম্পদ্ জমা হয়ে থাকে অক্ষয় হয়ে।

বই মানুষের সুসময়ের সখা, দুঃসময়ের বন্ধু,
সঙ্গীহীনের সাথী,

তোমরা জান কি ?

বাংলা ভাষায় আজকাল কত সুন্দর সুন্দর বই বেরোচ্ছে।
এই সব বই সর্ব্বদা হাতের কাছে রাখতে ইচ্ছা করে না কি ?
সব রকম বইএর—সব রকম ভালো বইএর খবর জানতে
হ'লে আমাদের কাছে লেখ বা নিজে এসে বেছে নাও।

মধনু

য়েদের
চিত্র
পত্রিকা

২শ বর্ষ
ষ, ১৩৫৬
ষান্মাসিক ২৷০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ন ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

—ছোটদের উপহারের সেরা বই—

ফ ট্ কে ৸০

বড় বড় অক্ষরে ছাপা, পাতা-যোড়া ছবিতে ভরপূর

ছোটদের সচিত্র কৃত্তিবাস ৸০

রঙ্গিন কালিতে বড় বড় অক্ষরে ছাপা,
অসংখ্য ছবি।

কলিকাতার

পথের নিশানা ও তথ্যপঞ্জি ।৵০

কলকাতার মানচিত্রসহ। সর্ব্বদা পকেটে
রাখবার মত।

প্রাপ্তিস্থান : গ্রন্থজগৎ—৫২।৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড.
কে. বি. দাশগুপ্ত—৭২।২, হিন্দুস্থান পার্ক,
কলিকাতা

কবি প্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু)

সম্পাদিত

ভাই-বোন

বার্ষিক ৪৲, ষান্মাসিক ২।০, যে কোনো মাস থেকে যে কোনো মাস পর্য্যন্ত গ্রাহক হওয়া যায়। এমন দিন আসছে যে দিন প্রতি ঘরে ভাইবোনের জন্যে **'ভাই-বোন'** না হলেই চলবে না। যারা দেখ নি, বিজ্ঞাপন শুধু তাদের জন্যে, নইলে গ্রাহকরাই এর চলন্ত বিজ্ঞাপন। এজেণ্ট কিংবা গ্রহক হবার জন্যে.—কার্য্যাধ্যক্ষ, ভাই-বোন কার্য্যালয়, ৪-এ ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা—৬

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

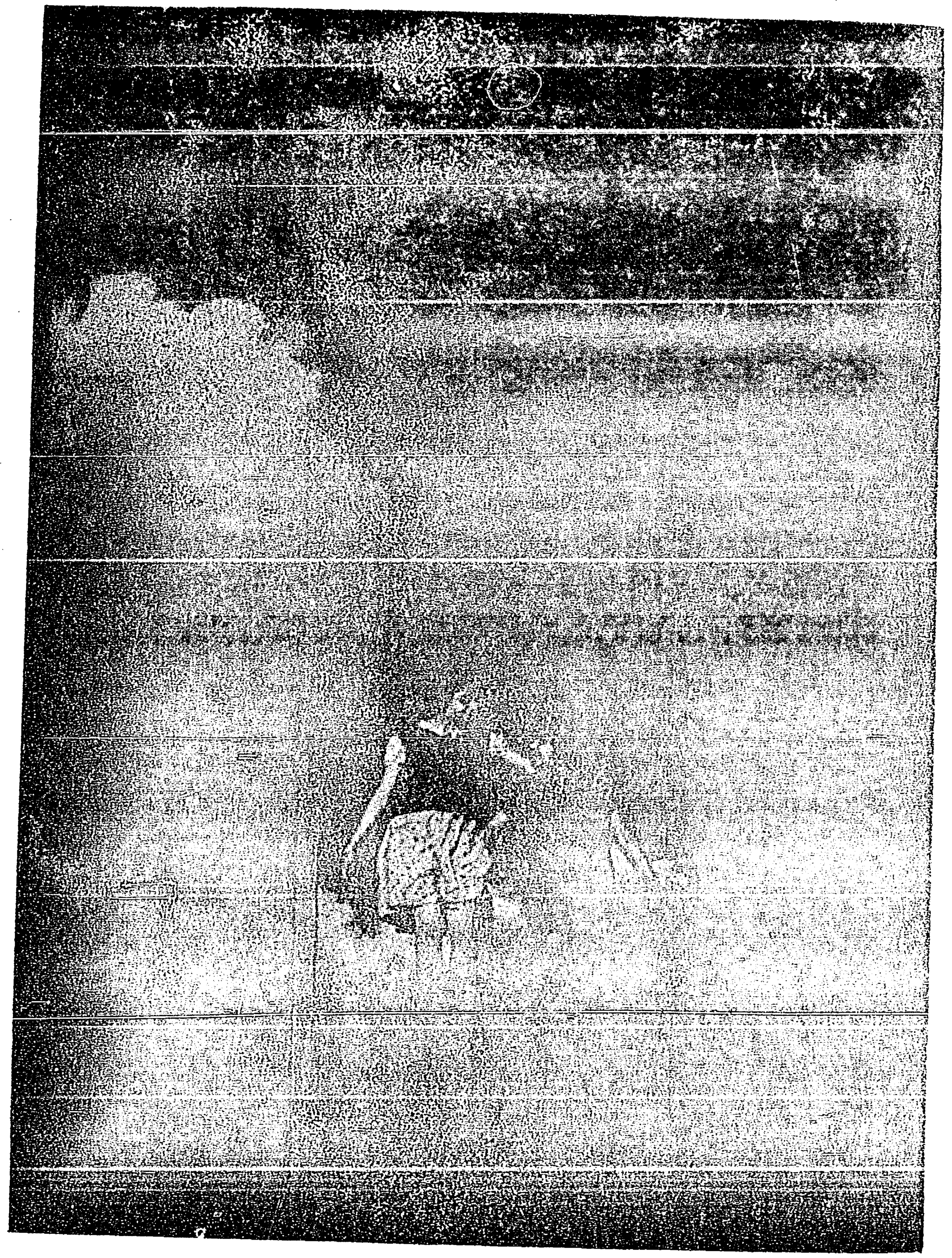

মেঘের দেশে

আলোকচিত্রশিল্পী—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিমণ্ডিত

২২শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৫৬ { ৯ম সংখ্যা

পাখীদের শিক্ষা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বলিতে হয় না নাম্‌তা—করিতে
হয় না পড়া ও লেখা,
প্রাথমিক হ'ল শিক্ষা তাদের
উড়িতে ধরিতে শেখা।
চিনিতে পোকা ও মাকর,
শস্যকণা ও কাঁকর,
ব্যাধ, শ্যেন, সাপ হ'তে নিরাপদে
শ্যাম বনভূমে টেকা।

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

মধ্য শিক্ষা হইল কেমনে
বানাইতে হয় বাসা,
বিচরণভূমে কেমন করিয়া
করা যায় যাওয়া-আসা।
পালন করিতে ছানা,
আহার বহিয়া আনা,
শিক্ষা করাও অপর প্রাণীর
স্ফুট অস্ফুট ভাষা।

উচ্চ শিক্ষা—শ্রেষ্ঠ শিক্ষা
শেখা সঙ্গীত শিষ,
দেওয়া বক্ষের আনন্দ-সুধা
ধরাকে অহর্নিশ।
মগ্ন সতত কাজে—
তবু আহা মাঝে মাঝে
অব্যক্ত ও মধুর কণ্ঠে
ডাকা 'জয় জগদীশ'।

আমি যখন ছোট ছিলাম

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সেকালের কথা আবার অনেক দিন পরে তোমাদের কাছে বলছি। সেকালের গ্রাম্য জীবন ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। বেশভূষার দিক্ দিয়ে কোন পরিপাট্য ছিল না। আমরা খালি পায়ে, খালি গায়ে, গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম, মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে হাডুডু বা ডুগু-ডুগু খেলতাম, গোল্লাছুট খেলতাম, দেঁড়েবান্দা খেলতাম। দৌড়াদৌড়ি-লাফালাফি এ সব ছিল খেলার অঙ্গ। আমাদের দলে গ্রামের ছেলে এমন কেউ ছিল না যে গাছের উঁচু ডালে না উঠতে

পারত। জলের ভিতরও ছিল নানা খেলা। প্রথম বর্ষার প্রারম্ভে যখন নদীর জল কল কল শব্দে খালে, বিলে, পুকুরে এসে পড়ত, তখন ছিল আমাদের মহা-আনন্দ। সে নূতন জলের ভিতর চাঁই পেতে রাখতাম (মাছ ধরবার জন্য)। সকালে উঠে দেখতাম, তা'তে যেমন মাছ পড়েছে তেমনি মাঝে মাঝে ঢোরা সাপও তা'তে ঢুকে বসে আছে।

আমাদের গ্রামে নানা জাতির বাস ছিল। গ্রামের সামাজিক শাসনের কর্ত্তা ছিলেন পঞ্চায়েতি সভা। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, এমন কি জেলে, মালী, চাষী—তারাও ছিল পঞ্চায়েতি সভার বিচারক। এই সব সামাজিক পঞ্চায়েতি বিচারে যে সব সময়ে ন্যায়বিচার হ'ত তা বলা চলে না। আমার একটি ঘটনার কথা বেশ মনে পড়ে। আমাদের গ্রামের বারুজীবী সম্প্রদায়ের একটি কিশোর মেধাবী বালক—পাশের গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন,—আমাদের গ্রামের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ সম্প্রদায়ের ছেলেদের সঙ্গেও তিনি পড়াশুনা করতেন। একবার কোন বাড়ীতে সত্যনারায়ণ পূজো হচ্ছে, অন্যান্য বন্ধুরা তাঁকেও সেই আসরে ডাকলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি সামাজিকগণ যে ফরাসে বসেছিলেন, বন্ধুদের আহ্বানে তিনিও সেই ফরাসে এসে বসেছিলেন। এই অপরাধে তাঁকে অপমানিত করা হয়। সেই অপমানে সেই কিশোর গ্রাম পরিত্যাগ ক'রে চলে যান এবং পশ্চিমে নিজ প্রতিভাবলে শিক্ষা-দীক্ষায় প্রসিদ্ধি লাভ ক'রে ধনী ও সম্মানিত হ'ন। আমার সঙ্গে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিমের সেই সহরে তাঁর পুত্র ও কন্যার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এমনি ক'রে আমাদের সেকালের সমাজ অনেককে জাতি ও বর্ণবিদ্বেষের ফলে সমাজ হ'তে দূরে ঠেলে ফেলেছিল। আমাদের গ্রামের সেই ভদ্রলোক পরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে সমাজের এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। যারা একদিন তাঁকে আপমান করেছিল, পরে তাদের অনেকেই তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার পেয়ে এসেছিলেন। হিন্দু সমাজে মানুষের প্রতি মানুষের এই অত্যাচার দেখে ছেলেবেলা মনকে পীড়িত করেছে।

গ্রামে লোকের অভাব-অভিযোগ তেমন দেখি নি। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান প্রায় সকলেরই ছিল। পুকুরের মাছ, ফল, ফুলের বাগান, শাকশব্জী, লাউ, কুমড়ো, বেগুন বাগানে এত ফলতো যে বাজারে বড় কেউ যেত না। জিনিষপত্র ছিল মহা সুলভ। আমি চালের মণ ১।০-১॥০ টাকা দেখেছি।

যদি ২৲ টাকা মণ হ'ত, তবে লোকে হায় হায় ক'রে উঠত। আমাদের ছেলেবেলার যে জমা-খরচ আমার মা ও দাদার হাতের লেখা রয়েছে তা'তে দেখতে পাই এক পয়সা ছু' পয়সার বেশী মাছ কোন দিন কেনা হয় নি। ইলিশ মাছ আমি নিজে ছেলেবেলা এক পয়সাতে ছু'টো কিনেছি। তেল, ডাল, নুন সবই ছিল শুধু সুলভ নয়—অতি সুলভ। তোমাদের কাছে ভাল লাগবে না ব'লে সেই হিসাবের একটি পাতা তুলে ধরলাম না। হাটে ও নদীর পারে বেপারীদের নৌকো সব এসে ভিড়ত,—ধান, চাল সব বেপারীরা নিজেদের মাথায় বোঝা বয়ে বাড়ী পৌঁছে দিত। দেখতে পেতাম অগ্রহায়ণ মাসে মাঠে মাঠে সোনার ধান উছলে পড়ছে। নদী-পরপারে—দূর মাঠের দিগন্ত সীমা পর্য্যন্ত নানা ঋতুতে নানা ফসলের সমাবেশ দেখেছি। তোমরা মনে কর্‌নো না আমি কিছু বাড়িয়ে বলছি—সেকালের বিক্রমপুরের পল্লীজীবন এমনি ছিল সরল ও অনাড়ম্বর,—তেমনি খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরার মধ্যেও কোন অভাব-অভিযোগ ছিল না।

আমরা দেখেছি প্রভাত হ'লে বিধবা বা সধবা ঠাকরুণরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে কিংবা নিজেদের বাড়ীর বাগান হ'তে ফুল তুলতেন এবং সাজি ভরে গৃহ-দেবতা নারায়ণ শিলার কিংবা পুকুর-পারে বসে বম্ বম্ শব্দে পূজো করতেন শিবের। হাঁসেরা পুকুরে সাঁতরে বেড়াত, আমরাও পুকুরের জল আলোড়িত ক'রে সাঁতার কাটতুম, জল ছিটিয়ে দিতুম, আর পূজার্থিনীর দল গাল-মন্দ দিতেন, আমরা তা উপভোগ করতাম।

গ্রামের পণ্ডিত মহাশয় কয়েক বছর হ'ল নব্বই বৎসর বয়সে মারা গিয়েছেন। ছেলেরা বাড়ীতে কে কি করে তা দেখার জন্য ও অভিভাবকদের দিয়ে লিখিয়ে আনবার জন্য তিনি আমাদের কাছে একখানি খাতা দিয়েছিলেন—তার নাম রেখেছিলেন 'গৃহচরিত্র'। আজকাল যেমন স্কুল হ'তে তোমাদের কাছে প্রগ্রেস্ রিপোর্ট্ পাঠানো হয়, এ ঠিক সে ধরণের ছিল। দিদিমা ছিলেন আমাদের অভিভাবক—গার্ডিয়ান, একদিকে ছিলেন স্নেহময়ী আবার যখন রুদ্রমূর্ত্তিতে যষ্টি হস্তে তাড়া করতেন, তখন তাঁর দয়াময়ী নামের কোন সার্থকতা থাকৃত না। তাঁর হুঙ্কারে আমরা গাছে উঠলে নেমে পড়তাম, জলে বেশীক্ষণ থাকলে ভালো ছেলেটির মত উঠে আসতাম।

সেকালে আমাদের খাবার কথা জান্‌তে তোমাদের কৌতূহল হ'তে পারে। তবে শোন: খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে হ'ত, দিদিমার এ বিষয়ে এতটুকু করুণা ছিল না। মুখ-হাত ধুয়ে শীতের দিনে 'দোলাই' গায়ে দিয়ে বারাণ্ডায়

পাটি বা কম্বল পেতে পড়তে বসতাম। সঙ্গে সঙ্গে দিদিমা এনে দিতেন মুড়ি গুড়, কোনদিন নারকেল, কোন কোন দিন বাতাসা ও নারকেলের নাড়ু। ফেণী, বড় বাতাসা, খেজুরে গুড়, খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে খেতে দিতেন। কি ভালই না লাগত! দিদিমা ছিলেন দানশীলা, তাঁর কাছে কোন ভিখিরী এসে ফিরে যেত না। যদি কেউ ছুপুরে এসে খাবার চাইত তবে তিনি নিজে না খেয়েও খাওয়াতেন। নিজে ছেঁড়া কাপড় পরে ভিখারিনীকে দিতেন নিজের কাপড়খানা। সেই বৃদ্ধার সবল দেহ, সরল প্রকৃতি, সঙ্গীতপ্রিয়তা এবং রামায়ণ মহাভারতের কবিতা বলবার এমন দক্ষতা ছিল যে আমি ছেলেবেলা তাঁর কাছে যে প্রেরণা পেয়েছিলেম তা কখনও ভুলবার নয়। কত গান, কত ছড়া, কত পাঁচালীর গান শুনেছি। কিন্তু লিখবার ও বুঝবার বয়সও তখন হয় নি। আজকাল যেমন চা না হ'লে ভদ্রতা চলে না, সেকালে গ্রামে কোন চায়ের প্রচলনই ছিল না। চায়ের সঙ্গে অতি বড় সৌখীন সম্প্রদায় ব্যতীত কারু পরিচয় ছিল না। দুধ বিক্রী হ'ত টাকায় ষোল সের। আমি বত্রিশ সের পর্য্যন্ত টাকায় দুধ বিক্রী হ'তে দেখেছি। ঘি বারো আনা এক টাকার বেশী সের ছিল না; দই, ক্ষীরও ছিল তেমনি সস্তা।

সেকালে কোন বাড়ী বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উৎসব উপস্থিত হ'লে, কিংবা পূজা-পার্ব্বণ এলে সারা গ্রামখানির উৎসব বলে মনে হ'ত। শিশু, বালক বালিকা, কিশোর, যুবা এবং মহিলাদের সকলেই—যে কোন বাড়ীর উৎসবকে আপনার বাড়ীর উৎসব বলে মনে করতেন, কাজকর্ম্ম করবার জন্য আহ্বান করতেন। সকলে মিলে মহা আনন্দে দিনরাত খেটে সামিয়ানা খাটানো, বাজার করা, নানা দ্রব্য সংগ্রহ করা—সব কাজে গ্রামের লোকেরা এগিয়ে আসতেন। পাছে ভিন্ন গাঁয়ের লোকেরা এসে নিন্দা করে, খুঁত ধরে; সে সব যাতে না হয় সেজন্য সকলের ছিল একান্ত আগ্রহ। গ্রামের যে মহিলা খুব ভাল রাঁধতে পারতেন, তাঁর আদরের সীমা ছিল না। বাড়ীর গৃহিণী তাঁকে ডেকে আনতেন, তিনিও চার-পাঁচ শ' বা হাজার লোকই হ'ক না—প্রসন্ন মনে সারাদিন উপবাসী থেকে সঙ্গিনীগণ সহ রান্না করতেন, নিমন্ত্রিতগণ খেয়েদেয়ে পরিতুষ্ট হ'লে তবে রন্ধনকারিণী প্রসন্ন মনে ভোজনে বসতেন। পাচক ব্রাহ্মণের হাতে কেউ খেতেন না। নিষ্ঠা সহকারে সব ব্যবস্থা হ'ত। বহু লোক হ'লে উঠোনে ব'সে সকলে খেত, চারিদিকে লাঠি হাতে সকলে পাহারা দিত, যেন কুকুর বা নিম্ন শ্রেণীর

কোন জাতি সামিয়ানার নীচে না আসে। দুঃখের বিষয় বাংলা দেশের পল্লী-সমাজ হ'তে এখনও এ রীতি সম্পূর্ণ দূর হয় নি।

গ্রামে ও গ্রামের বাহিরে নানা মেলা বসত। বারুণীর মেলা, অষ্টমী-স্নানের মেলা, গলইয়ার মেলা, কালী পূজোর মেলা। এ সব মেলাতে বহু লোক— পুরুষ ও নারী সমবেত হ'তেন। সে সব মেলা ও উৎসবের কথা আর একদিন বল্‌ব।

পথের সাথী

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্

আলমোড়া যাচ্ছিলাম। সঙ্গী পেলাম সুধীর বাবুকে। শুনলাম যে তাঁর শরীরটা কিছু বেযুৎ হওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শে পাহাড়ে যাচ্ছেন। তখন কি জানতাম যে তাঁর কোন্ অঙ্গটা বিগড়েছে!

ট্রেনে উঠেই তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে ভ্রমণের আদবকায়দা সম্বন্ধে সংক্ষেপে এক উপদেশ দিলেন: দেখুন মশায়, মেলাই বাজে বক্‌বক্ করবেন না যেন। আমার আবার গাড়ীতে চাপলেই মাথা ধরে, বকুনী সইতে পারি নে। আমি একটু গড়িয়ে নিচ্ছি, আপনি মালপত্তরগুলো একটু দেখুন ততক্ষণ, আর বর্দ্ধমানে আমাকে তুলে দিতে ভুলবেন না যেন, চা খাব সেখানে।

এই বলেই তিনি ওপরের বাঙ্কে উঠে চোদ্দ পোয়া হলেন। সেখান থেকে খানিক বাদে তাঁর আওয়াজ ভেসে এল: আমার জুতো যোড়ার ওপর বিশেষ নজর রাখবেন, মশাই! নইলে কোন্ ব্যাটা আবার চক্ষুদান ক'রে ফেলবে।

আর শোনা গেল না। মানে, ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়লেন। ঝানু পর্য্যটক বটে!

বিকেলে একবার বর্দ্ধমানে আর রাত্তিরে একবার ধানবাদে আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি খেতে নেমেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ঘুম যথার্থ ভাঙল বলতে হবে পরদিন বেলা আটটায়। উঠে এক বিপুল হাই তুলে তিনি বললেন, দুগ্‌গা, দুগ্‌গা! সারারাত চোখের দু' পাতা এক করতে পারি নি। ট্রেনে আমার ঘুম আসতে চায় না কিছুতেই। কতদূর এলুম? মোগলসরাই এল ব'লে? ভালই হ'ল।

বড়িয়া মালাই মেলে ওখানে। আচ্ছা, ততক্ষণ এদিককার কাজগুলো মিটিয়ে নেওয়া যাক।

বলেই তিনি ঘটী হাতে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলেন কাজ মেটাতে।

তিনিও ঢুকেছেন আর অমনি, বলা নেই কওয়া নেই, মাঠের মাঝখানে ঘ্যাঁচ ক'রে গাড়ী গেল থেমে। শুনলাম যে খানিক দূর আগে একখানা মালগাড়ী উলটে পড়েছে, লাইন পরিষ্কার হ'তে যার নাম তিন-চার ঘণ্টা!

খানিক বাদে বেরিয়ে এসে এই খবর শুনে সুধীর বাবু তো ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, এইবারেই দফা সারলে দেখছি! মোগলসরাই না আসা পর্য্যন্ত বাসি মুখেই থাকতে হবে তো? পিত্তি পড়ে শেষটায় এই আমরদা মাঠের মাঝখানেই পৈত্রিক প্রাণটা যাবে বুঝতে পারছি।

সঙ্গে কিছু খাবার ছিল। সেইটুকু সাফ করে তিনি আবার ওপরের বাঙ্কের শিকড়ে হাত দিলেন। আমি অবাক্ হয়ে সেইদিকে তাকাতেই তিনি অম্লান-বদনে বললেন, হ্যাঁ, শুয়েই পড়ি একটু। মিছিমিছি বসে থেকে করব কি? ঘুম তো আসবে না, একটু চোখ বুজে থাকা!

জানলা দিয়ে বাইরে দেখতে লাগলাম। ধূ ধূ করছে মাঠ, খুব দূরে দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। রেল লাইনের ধারেই একটী ডোবা। যাত্রীরা অনেকে সেখানে স্নান-আহ্নিক সেরে নিচ্ছে, অনেকে লোটা হাতে আর দাঁতন চিবোতে চিবোতে মাঠের নানা অঞ্চল লক্ষ্য ক'রে রওনা হয়েছে।

ট্রেন ছাড়ল বারোটারও পর। মোগলসরাই এসে পৌঁছতে ফেরিওয়ালাদের সুমধুর হাঁকডাকে সুধীর বাবুর চোখের পাতা ফাঁক হ'ল। আড়ামোড়া ভেঙে তিনি কাপড়-গামছা নিয়ে নেমে প্ল্যাটফর্মের জলের কল থেকে নেয়ে এলেন। তারপর মাথায় খানিকটা মধ্যম নারায়ণ তেল না কি যেন থাবড়ে নিয়ে খাবার-ওলাকে ডাকলেন। ধুঁধুলের তরকারী দিয়ে দেড়পো পুরী, দু'খুরী মালাই আর আধ কুঁজো জল খেলেন।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি আর একবার— ?

অমনি উত্তর পেলাম: খেয়েদেয়ে একটু না জিরুলে শরীর টেঁকবে কেন, ভায়া?

একটু বাদেই তিনি আড় হয়ে পড়লেন শরীর টেঁকাবার চেষ্টায়।

বিকেলের দিকে গাড়ী জৌনপুর ষ্টেশনে থামল। জৌনপুরের মতিচূর

নাকি বেশ ভাল জিনিষ; তারই গুটি চারেক কিনে খাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় দেখি সুধীর বাবু নেমে এলেন। মতিচূরের ভাগ পেয়ে তিনি খুব খুসী হয়েছেন ব'লে মনে হ'ল, কেননা তিনি আর ওপরে না উঠে আমার পাশে বসে গুণ গুণ ক'রে একটা সুর ভাঁজতে সুরু করলেন। জৌনপুরীই হবে বোধ হয়!

আমাদের নামতে হবে বেরিলীতে। রাত ত্'টো আড়াইটের আগে সেখানে পৌঁছবার সম্ভাবনা নেই। তাই শুনে সুধীর বাবু ঘণ্টাখানেক বসে থাকার পর বললেন, কি জানি, বেরিলীতে কি আর শোবার সুবিধে হবে? এই বেলা এক চটকা ঘুমিয়ে নিতে পারলে হ'ত; কি বলেন? আপনি একটু সজাগ থাকবেন, বেরিলী পার হয়ে না যাই। আপনার আবার যা ঘুম! ট্রেনে ঘুম আসে কি ক'রে আপনার?

জেগেই বসে ছিলাম, কিন্তু শেষ দিকটার একটু ঢুল লেগে গেল। হঠাৎ জেগে দেখি যে বেরিলী এসে গেছে। মহা ব্যস্ত হয়ে সুধীর বাবুকে বললাম সে কথা। কোনও সাড়া নেই। নিজেই তাড়াতাড়ি মালপত্র নামিয়ে ফেলে ভাবছি যে মুটে ডাকিয়ে সুধীর বাবুকেও নামিয়ে নেব কি না, এমন সময়ে তিনি নেমে এলেন। মহা বিরক্ত ভাব, কাঁচা ঘুমটী চটে গেছে কিনা!

মালপত্র নিয়ে ত্'জনে গেলাম মুসাফিরখানায়। প্রকাণ্ড একটা টিনের চালাঘর, চারদিকে যাত্রীরা ঘুমে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আমি একটা থামে ঠেস্ দিয়ে আমার বাক্সের ওপর বসে রইলাম। কিন্তু সুধীর বাবু ওরই ভেতর একটু সুবিধে ক'রে নিলেন। একটা বেঞ্চে একজন লোক তার নাগরা জুতো যোড়া মাথার তলায় দিয়ে শুয়ে ছিল। তার পা তোলা ছিল বেঞ্চের পিঠের ওপর। সেই বেঞ্চের সঙ্গে বাক্স-বিছানা যুড়ে আর বেঞ্চের ফাঁকা জায়গাটুকুতে মাথা রেখে সুধীর বাবু নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন। খানিকক্ষণ পরেই লোকটা তার পা নামিয়ে নিয়েছে, আর সেই শ্রীচরণখানা পড়বি তো পড় একেবারে পড়েছে সুধীর বাবুর হাঁ-করা মুখের ওপর। আর যায় কোথা? তিনি ধড়মড় ক'রে উঠে পড়লেন। তার পর তাঁর বিলাপ সুরু হ'ল: এই মেড়োর দেশে যে কোনও ভদ্রলোকের আসা পোষায় না, তা তিনি আগেই জানতেন, কেবল ডাক্তারের পরামর্শে আর আমার স্বার্থপরতার জন্যেই তাঁর এ কর্ম্মভোগ, ইত্যাদি। তারপর বসে বসে ঢুলতে লাগলেন।

ভোরবেলা আমাদের গাড়ী এল। মালপত্রশুদ্ধ সুধীর বাবুকে তা'তে তুলতে আর হাই-টাই তুলে তাঁর ধাতস্থ হ'তে বেশ কিছুক্ষণ লাগল। তারপর তিনি একটী হিন্দুস্থানী যাত্রীর হাত থেকে তার লোটাটী নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেলেন ষ্টেশন পেরিয়ে। কোনও বারণ মানলেন না। গাড়ী যখন ছাড়বার ঘন্টি মেরেছে, তখন দেখি সুধীর বাবু দৌড়ে আসছেন, তাঁর এক হাতে ঘটি, অপর হাতে কাছা। তিনি এসে পড়তেই লোটার মালিক তাঁর থেকে লোটাটী ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে বকতে লাগল। সে যতই বকে, তিনি ততই মাথা ত্লিয়ে বলেন, জী! জী! তার মধ্যেই এক ফাঁকে আমাকে বললেন, আপনিও খুব ক'ষে 'জী' 'জী' বলুন।

আমি বললাম, কেন?

—এইটেই দস্তুর। কেউ কিছু বললেই 'জী' বলতে হয়। হিন্দী তো জানেন না, শিখুন।

মিথ্যে বলব না, তিনি হলদোয়ানী পর্য্যন্ত জেগে রইলেন। কাঠগোদাম ষ্টেশনে নামবার সময় অবশ্য তাঁকে টেনে তুলতে হ'ল। এখানে আলমোড়া যাবার বাস্ ধরলাম। বেজায় ভিড়, তবু সুধীর বাবু তারই মধ্যে পাশের লোকের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলেন। সে লোকটী তা'তে রাজী না হওয়ায় তাঁকে জেগেই থাকতে হ'ল সারা ত্পুরটা।

সে রাতটা আমরা রাণীক্ষেত ব'লে একটা জায়গায় কাটালাম। তারপর সকালে উঠে হ'ল এক মুস্কিল। একেই তো সুধীর বাবু উঠেছেন সবার পরে, তার ওপর আবার মুখ ধুতে গিয়ে তাঁর আর ঝরণা পছন্দ হয় না। তা'তে দেরী হ'তে লাগল, অথচ ওদিকে যাত্রীরা সব তৈরী। আশেপাশে, ওপরে নীচে কত খোঁজা হ'ল, তাঁর পছন্দমাফিক ঝরণা আর পাওয়া যায় না। যাত্রীরা মহা খাপ্পা হয়ে উঠল দেখে অতিকষ্টে তাঁকে যা হ'ক ক'রে মুখ ধুইয়ে বাস্-এ তুললাম। উঠেই তিনি আমাকে বকতে লাগলেন: অত সহজে ঘাবড়াতে হ'লে আর কখনও বিদেশে বেরোবেন না আপনি। আপনার জ্বালায় চা-টুকু পর্য্যন্ত খাওয়া হ'ল না। য়্যা! কি বললেন? আমাকে ফেলেই বাস্ ছেড়ে দিত? মগের মুল্লুক পেয়েছে নাকি? টিকিট কাটি নি নাকি পয়সা দিয়ে?

বাস্ কয়েক মাইল চলে এল। ক্রমে আমরা কোশী বলে একটা গ্রামের ভেতর এসে পড়লাম। নীচে দেখা যায় কোশী নদী, চারপাশে হিমা-

লয়ের বনশোভা। তাই দেখছি, এমন সময় হঠাৎ সুধীর বাবু চীৎকার ক'রে উঠলেন, এই! রোক্‌কো, রোক্‌কো! অমনি ঘ্যাঁচ করে গাড়ীর ব্রেক্ পড়ল, গাড়ী গেল থেমে। থামতে না থামতেই ভদ্রলোক নেমে পড়ে এক দৌড় দিলেন। সবাই ভাবলে যে তাঁর কোনও জিনিষ পড়ে গিয়েছে। কিন্তু তা নয়। পথের ধারে একটা দোকানে দুধ জ্বাল দেওয়া হচ্ছিল, তিনি সেখানে বসে দুধ কিনে খেলেন এক গেলাস। যাত্রীরা কেউ হাসতে লাগল, বেশীর ভাগই রাগ করতে লাগল, কিন্তু তিনি বেপরোয়া। দুধ খাওয়া শেষ ক'রে গদাই লস্করী চালে এসে বাস্-এ উঠলেন। বাস্ আবার ছাড়ল।

সুধীর বাবুর মনটী তখন যেন উথলে উঠেছে, পেটে গরম গরম পাহাড়ী দুধের কাজ সুরু হয়েছে কিনা! তিনি আপন মনে খানিকক্ষণ ফিক্‌ফিক্ ক'রে হেসে হঠাৎ বিশ্রী গলায় গান জুড়ে দিলেন: 'গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে-এ-এ-এ!' সবাই হাসতে লাগল, কিন্তু তাঁর মাথা নাড়া আর ক'মে না। 'আজ সকালে মেঘের ছায়া লুটিয়ে পড়ে বনে' পর্য্যন্ত এসে সেই একটা লাইনই বার তিন-চারেক হ'ল: তারপর খানিকক্ষণ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ চল্‌ল। শেষটায় 'দূর ছাই! আর মনে পড়ছে না!' বলে সুধীর বাবু সেই সাংঘাতিক গান থামালেন।

ততক্ষণে বাস্ আলমোড়ায় এসে পৌঁছেছে। দেখলাম, দূরে নন্দাদেবীর শিখরে সকাল বেলাকার সূর্য্যের আলো জ্বলছে, নীচে পাহাড়ের গায় চিরগাছের বনে ভেসে-যাওয়া মেঘের ছায়া লুটিয়ে পড়ছে।

আত্মোন্নতি সমিতির গল্প

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
এম্. এ, বি. এস্-সি

রণেন্দ্রের দল

আত্মোন্নতি সমিতির সহিত আর যে সব দল অল্পবিস্তর যোগ দিয়াছিল তাহাদের কথা গত বারে কিছু কিছু বলিয়াছি। এই রকম আর একটি দল ছিল রণেন্দ্রের দল। এই দলের প্রধান ছিল রণেন্দ্র গাঙ্গুলী ও তিনকড়ি দে। তিনকড়ির দু'ভাই পতিতপাবন ও সতীশ তখন ছোট ছিল। সতীশ বৈপ্লবিক হিসাবে বেশ নাম করিয়াছিল। কি একটা বৈপ্লবিক গণ্ডগোলে পড়িয়া সে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বিতাড়িত হয়। এখন সে একজন বড় ব্যবসায়ী। পতিতপাবন গৃহ-নির্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার হইয়া বেশ পসার করিয়াছিল। কয়েক বছর হইল সে একটি মোটর দুর্ঘটনায় মারা যায়।

তিনকড়ি ও রণেন খুব ভাবপ্রবণ ছিল। তাহারা অহিংসাবাদী ছিল। পরে আচার্য্য রায়ের উৎকট ভক্ত হইয়া পড়ে, এবং আরও পরে যেন সে মতও পরিবর্ত্তন করে। উহারা দু'জন জীব-হিংসা-বিরোধী ছিল এবং নিরামিষ ভোজনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রচার করিত। এই সম্পর্কে তাহারা কেলগ্ প্রভৃতি আমেরিকান নিরামিষীদের নজির দিত। আমাকেও তাহারা নিরামিষ দলে যোগ দিবার জন্য বিশেষ ভাবে ধরিয়াছিল।

আমার জীবনে উপনয়নের পর ধর্ম্মভাব-প্রবণ হইয়া এক বছর কাল নিরামিষ আহার করিয়াছিলাম। সে সময়ের অভিজ্ঞতা রণেনদের প্রচারের পক্ষে শুভ ছিল না। সাধারণ বাঙ্গালীর গৃহে নিরামিষাশী ছাত্রের পক্ষে শুধু ডাল আর আলু জোটে। উহাতে শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। রণেন ও তিনকড়ি

দু'জনেই তখন ক্ষীণকায় ছিল। আমিও নিরামিষ আহারের পরে রোগা হইয়া গিয়াছিলাম।

এই সময়ে আমি শারীরবিধান বিদ্যার অধ্যাপনা কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছি। পুষ্টি-বিজ্ঞান যে বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় শাস্ত্র তাহা অনুভব করিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছি। ইহার ফলেই পরবর্ত্তীকালে আমার "বাঙ্গালীর খাদ্য ও পুষ্টি" নামক পুস্তকের আবির্ভাব। রণেনরা যখন আমাকে নিরামিষ দলে টানিতে চেষ্টা করিল তখন আমি তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম।

ঠিক এইরূপ এক আক্রমণ আমি পরবর্ত্তীকালেও প্রতিহত করিয়াছিলাম। আমার বালিগঞ্জের বাড়ীর সামনে এক মাদ্রাজী য়্যাকাউন্ট্যাণ্ট জেনারেল ভাড়াটিয়া ছিলেন। তাঁহারই বাড়ীতে মাদ্রাজের (বোধ হয় শৃঙ্গেরী মঠের) এক শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। বিরাট্ ব্যাপার ; বহু লোকজনের সমারোহ। শুনিলাম, হাতী, ঘোড়া সব বাহিরে রাখা হইয়াছে। মহা সমারোহে সেখানে নিত্য হোম, যজ্ঞ, পাঠ ও পূজাদি হইত। শঙ্করাচার্য্যের দলের দুই জন মাদ্রাজী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহারা মাঝে মাঝে আমার পাঠগৃহে আসিয়া গল্প ও আলোচনা করিতেন। একজন বলিলেন, তিনি অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট,—শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য ; তাঁহার ভ্রমণ ব্যাপারের ব্যবস্থা-বিধানে লিপ্ত আছেন। অপর জন বলিলেন, তিনি এক সংবাদপত্রের সংবাদদাতা। বাঙ্গালীরা মাছ-মাংস খায় বলিয়া তাঁহারা প্রায়ই আমাকে শুনাইতেন—'ভারতের অন্য প্রদেশের লোক, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা, বাঙ্গালীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে।' আমারও একদিন ছিল যখন ভারতের অন্য প্রদেশীয়দের নিকটে ঐ বিষয়ের আলোচনায় নিজেকে লজ্জিত ও পরাভূত বোধ করিয়াছি। কিন্তু শাস্ত্র পাঠের পর হইতে আমার সে দুর্ব্বলতা আর নাই। বাস্তবিক মাছ-মাংস খায় বলিয়া বাঙ্গালীর লজ্জিত হইবার কোনও কারণ নাই।

মাদ্রাজী বন্ধুদের আমি যা বলিয়াছিলাম রণেনদেরও সেই কথা বলিতাম। তাহা সংক্ষেপ এই : "মহাভারত পড়িয়াছেন ? পাণ্ডবেরা বনগমন করার পর বহু মুনি তাঁহাদের সঙ্গে যান। শিকার করিয়া ও বন্য শাকাদি দ্বারা পাণ্ডবগণ ক্ষুধা নিবারণ করিতেন। উহাতে এক বনের পশু এত কমিয়া যায় যে বেদব্যাস আসিয়া পাণ্ডবগণকে এক বনে বহুদিন বাস করিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, উহা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, কারণ তাহাতে উক্ত বনের পশুবংশ একবারে নির্ম্মূল হইতে

পারে। এজন্য রাজারা এক বনে বহুদিন মৃগয়া করিবেন না। বেদব্যাসের পরামর্শে পাণ্ডবগণ সে বন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন।

"মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে অহিংসা সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে অনেক রকম অহিংসার বর্ণনা আছে। তাহাতে আছে রামচন্দ্রাদি বিখ্যাত রাজারা সাময়িক অহিংসা মাত্র পালন করিতেন, সর্ব্ব সময়ে নহে।

"ঋক্ বেদের পুরুষ সূক্তে এই বর্ণনা আছে : ব্রহ্ম এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্ব প্রাণী ও সর্ব্ব বস্তু সৃজন করিয়া সকলেরই অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করিতেছেন। তিনিই যজ্ঞ, যজ্ঞের পশু, ঋত্বিক, বেদ, মন্ত্র ইত্যাদি সকলই। মনুসংহিতা ও অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রে বহুবিধ মৎস্য ও মাংসের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধের বিধান আছে।" এই সকল বলিয়া আমি উপসংহার করিলাম— "আমরা—বাঙ্গালীরাই বেদ ও মহাভারতের মত অনুসরণ করিয়া থাকি। আপনারা সম্ভবতঃ বৌদ্ধ প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে সেই মত পালন করিয়া থাকেন।" তাঁহারা আর উত্তর দিতে পারিলেন না।

পরবর্ত্তীকালে আমার খাদ্য ও পুষ্টি গ্রন্থে লিখিয়াছি—নিরামিষ আহারের দ্বারা পূর্ণ শরীর বিকাশ ও স্বাস্থ্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য খাদ্যে দুধ-ঘির প্রয়োজন। অর্থাৎ নিরামিষ আহার দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা বিধান অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। এ দরিদ্র দেশে উহার ফলে দুর্ব্বল জাতিই গঠিত হইবে। গীতায় আছে— 'শ্রেষ্ঠগণ যে আচরণ করেন লোকে তাহা অনুসরণ করে।' অতএব শ্রেষ্ঠ লোকগণকে লোকশিক্ষার জন্যও আমিষ ভোজন করিতে হইবে।

ভাবপ্রবণ রণেনরা আচার্য্য রায়ের কাছে প্রায়ই যাইত। তাহারা তাঁহার উৎকট ভক্ত হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তীকালে তাহাদের এ ভাবের ঠিক উল্টাও দেখিয়াছি।

এই সময়ে আমি সন্ধ্যার সময়ে গোপাল শাস্ত্রী মহাশয়ের ছেলে ঋষীন্দ্র সরকারকে এম্. এ (উদ্ভিদ্-বিদ্যা) পড়াইতাম। ঋষীন্দ্র ও তাহার বন্ধু ডাক্তার জ্ঞান চাটুয্যে আত্মোন্নতি দলের সঙ্গে অনেকটা যোগ দেয়। জ্ঞান বাবু নিজে বেশ ব্যায়ামী ও তাঁহার এক ব্যায়ামের আখড়া ছিল। এক দিন ঋষীন্দ্রকে পড়াইতেছি, এমন সময়ে পাড়ায় বেশ একটী সোরগোল হইল। বন্দুকের গুলির শব্দ ও সেই সঙ্গে কোলাহল ও লোক ছুটাছুটি হইতেছে বুঝিলাম। এমন সময়ে ঋষীন্দ্রের এক আত্মীয় আসিয়া বলিলেন, "আপনি সত্বর এ পাড়া হইতে চলিয়া যান। এখনই পুলিস আসিয়া এখানে ধর-পাকড় করিবে। কাহারা সাব্-ইন্সপেক্টার নরেন চাটুয্যেকে গুলি করিয়া মারিয়াছে!"

নরেন চাটুয্যে বেহারের পুলিসে সাব্-ইন্‌স্‌পেক্টারী করিত। মজঃফরপুরে প্রথম বোমা ফাটানোর পরে ক্ষুদিরাম বসু শীঘ্রই ধরা পড়ে। পরে তাহার ফাঁসি হয়। তাহার সঙ্গী প্রফুল্ল চাকী পলাইতে পারিয়াছিল। সে ট্রেনে চাপিয়া কলিকাতার দিকে আসিতেছিল। সেই ট্রেনে নরেন চাটুয্যে ছিল। মুকুন্দ বাবুর দলের মহাদেব চক্রবর্ত্তীও সেই ট্রেনে ছিল। প্রফুল্ল চাকীর ভাব-ভঙ্গী প্রভৃতিতে নরেন চাটুয্যের তাহার প্রতি বোমা সম্পর্কে সন্দেহ হয়। একটা ষ্টেশনে নামিয়া সে প্রফুল্লকে গ্রেফ্‌তার করিবার চেষ্টা করে। কথিত আছে প্রফুল্ল নিজ পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া নরেন চাটুয্যেকে লক্ষ্য করে। হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন করিয়া বলে, 'তুমি আমার স্বদেশী, তোমাকে মারিব না।' এবং নিজের প্রতিই রিভল্‌ভারের গুলি ছুঁড়ে। আহত হইয়া সে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে।

নরেন চাটুয্যের উপর ভিন্ন ভিন্ন বৈপ্লবিক সমিতি জাতক্রোধ হইয়া ছিল, এবং নানা দিক্ হইতে তাহাকে হত্যার চেষ্টা হইতেছিল।

হত্যাকাণ্ডের পর দিন সন্ধ্যায় ঋষীন্দ্রকে পড়াইতে গেলাম। সেখানে সংবাদ পাইলাম যে জ্ঞান বাবু ও ঋষীন্দ্র প্রভৃতির ধারণা—ঐ কাণ্ড আত্মোন্নতির দলের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে। কারণ পাড়ার লোকেরা হরিশ সিকদার, বিপিন গাঙ্গুলী, রণেন গাঙ্গুলী প্রভৃতিকে কাছাকাছি ঘুরিতে দেখিয়াছিল। ইন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ ঐ দলে ছিল না, কারণ সে সময়ে সে বারীনের দলে যোগ দিয়া সেখানকার কার্য্যে লিপ্ত ছিল। মাস কয়েক হইল ইন্দ্র এক কথাবার্ত্তার মধ্যে বলে, সম্প্রতি সে রণেনের লেখা এক প্রবন্ধ পড়িয়াছে। উহাতে রণেন লিখিয়াছে যে তাহারই ছোঁড়া গুলির আঘাতে নরেন চাটুয্যে মারা যায়। কিন্তু হরিশ সিকদার বহুকাল আগে বলিয়াছিল তাহাদের সহযোগী পূর্ব্ব বাংলার একটি ছেলের গুলিতেই নরেন মারা যায়। গুলি ক রয়াই সকলেই পলায়ন করিয়াছিল। সেই উত্তেজনার সময়ে কাহার গুলিতে যে কাজ হইয়াছিল তাহা কেহ ভাল করিয়া মনে রাখিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

বিচিত্র জগৎ

বাসস্থান হিসাবে মানুষ আজও কত না অদ্ভুত বাড়ী ব্যবহার করছে! তারই কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হ'ল।

(১) গেছোবাড়ী। পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে আজও এমনি বাড়ী ব্যবহৃত হয়।

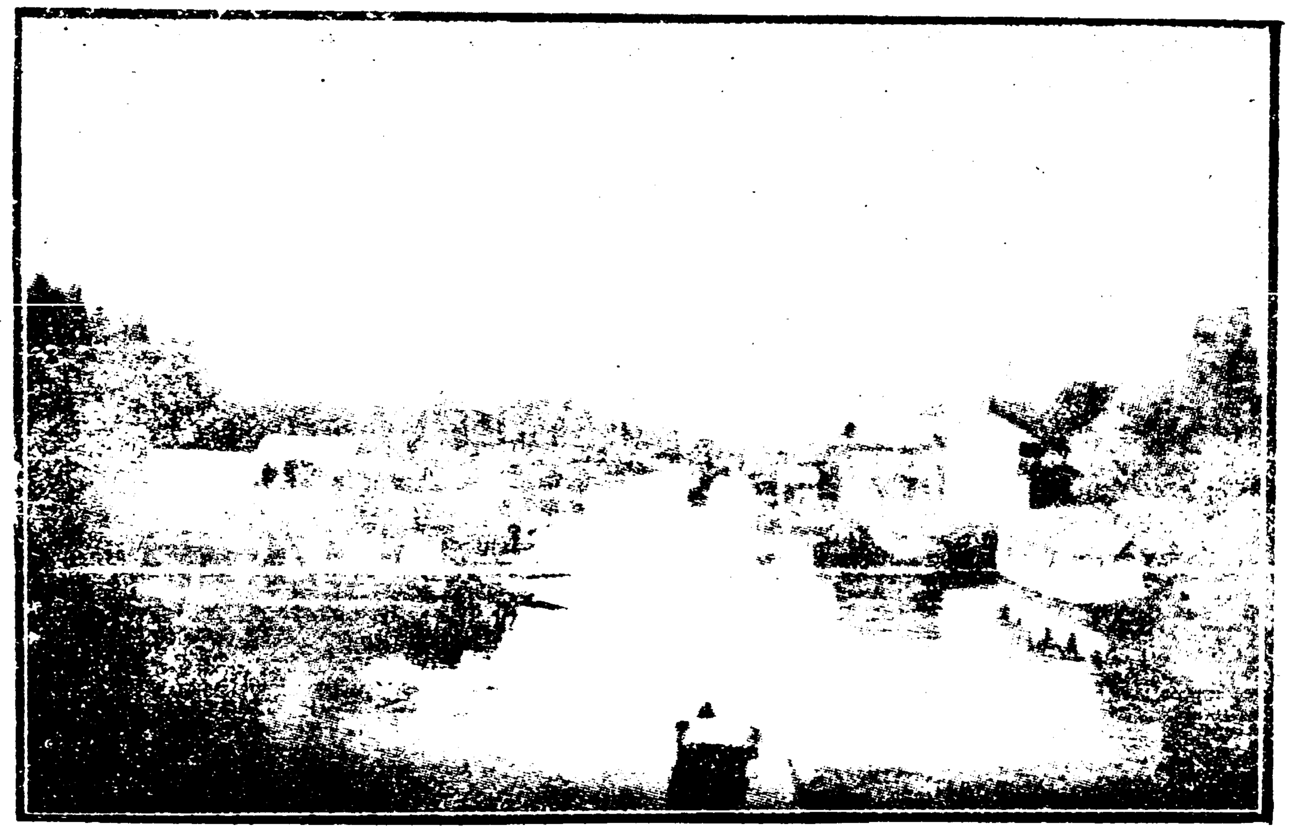

(২) নৌকো-বাড়ী। কাশ্মীরে আজও বহু লোক এই রকম নৌকো-বাড়ীতে (হাউস্-বোট) বাস করে।

উপরে—
(৩) আকাশ-চুম্বী বাড়ী। আমেরিকার বড় বড় সহরে মানুষ এই সব বাড়ীতে বাস করে। এক একটা বাড়ীই যেন এক একটা সহর। কোন কোনটা ৫০।৬০।৭০ তলাও হয়।

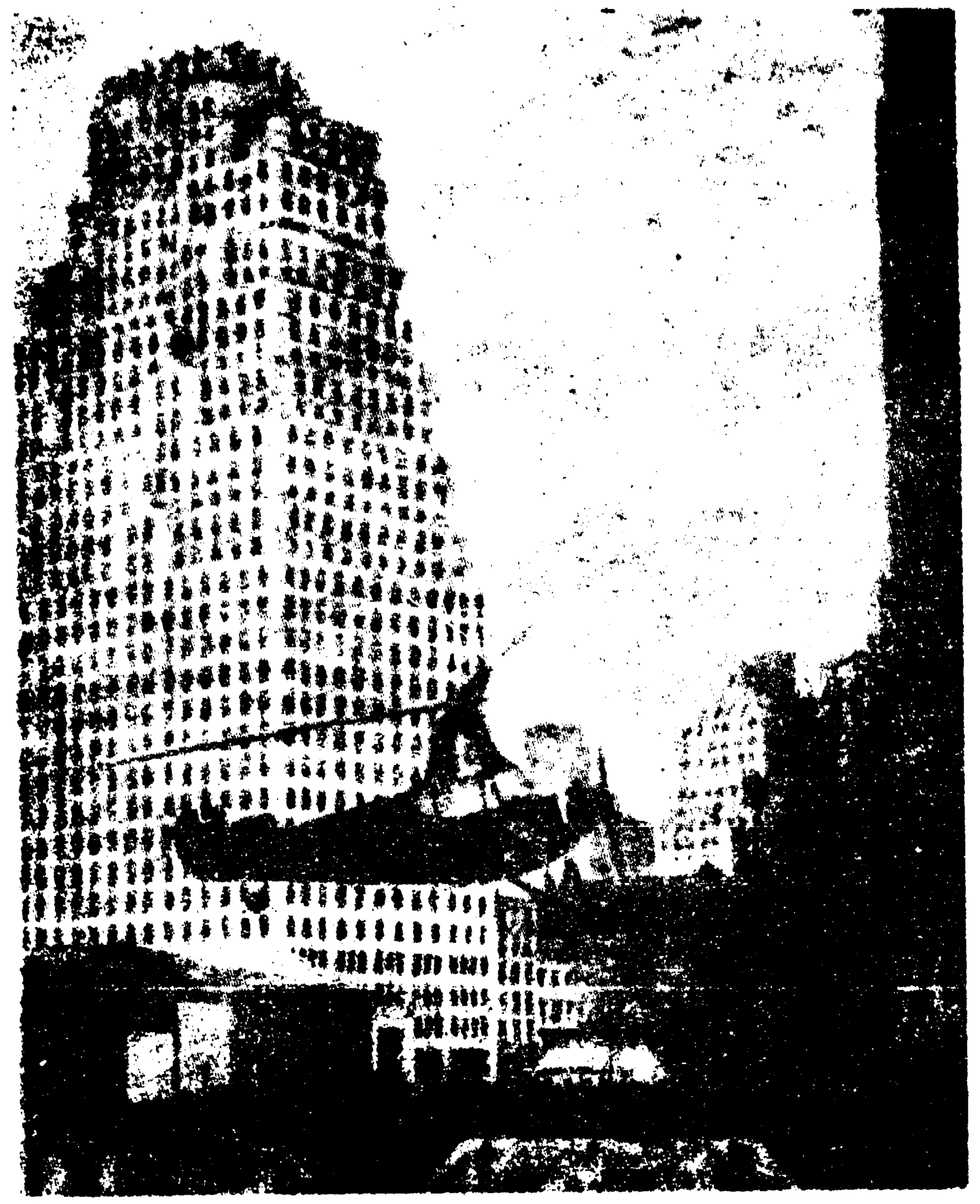

নীচে—
(৪) পিপে-বাড়ী। পুরোনো মদের পিপেকে বদলে বাড়ীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। বাড়ী-ওয়ালার আজব সখ!

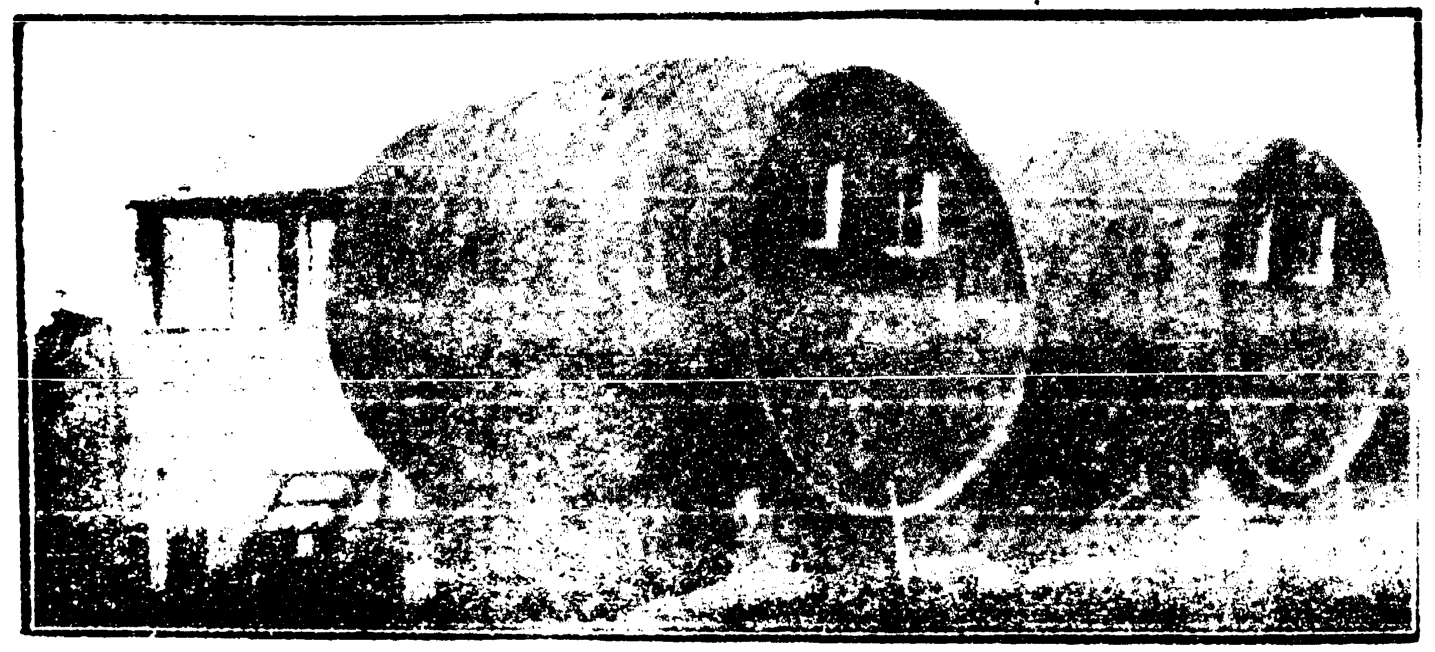

প্রিয়ঙ্গু

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

শক্তি যখন সংযম করে সুরু,
তুষ্টই হয় শত শিষ্টের গুরু।
ঐরাবতকে ভাসায়ে যে ধারা ছোটে
তারি নীরে দেশ তীর্থ হইয়া ওঠে।

প্রিয়ঙ্গুপ্রিয় ছিল এক তুর্দ্দমনীয় কিশোর। বাঙলার এক নিভৃত পল্লীতে ছিল তাহার বাস। ঝুল ঝাপ্পুর ও ডাণ্ডাগুলি খেলে, প্রবল বন্যায় এপার ওপার সাঁতরায়। উপকথার রাজপুত্তুরের ন্যায় তেপান্তর মাঠে মাইলের পর মাইল ঘোড়া ছুটায়; অজয়ের তপ্ত বেলাভূমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'ময়ূর-বাজি' দেয়। পড়া-শুনা যে একেবারে না করে তা নয়।

গ্রামের পাঠশালে এক পণ্ডিত ছিলেন—তাঁর কাছেই প্রিয়ঙ্গুর হাতে খড়ি। তিনখানি প্রথম ভাগ ছিঁড়িয়া প্রিয়ঙ্গু বর্ণমালা শেখে। প্রিয়ঙ্গুর ধরণ-ধারণ দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন, "তুই পাহাড়ে ছেলে, বাঙলা দেশে তোর অন্ন জুটবে না বাপু!"

পণ্ডিত মহাশয়ের বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি ছিল না কিন্তু তিনি প্রিয়ঙ্গুর মাথায় কতকগুলি ভুল ধারণা ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। যথা—বাঙালীরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

জাতি—সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্। শাস্ত্র গ্রন্থ, কাব্য, গণিত, ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান—সবই বাঙালীর লেখা। বিক্রমাদিত্য ও কবি কালিদাস দুই জনেই বাঙালী এবং উভয়েরই বাড়ী প্রিয়ঙ্গুর গ্রাম 'উজানীতে'। 'চাণক্যে'র বাড়ী 'চাণক'। সিংহলে যিনি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন সেই বিজয়সিংহের বাড়ী 'বিজনগর', জ্যোতিষী ভাস্করাচর্য্যের বাড়ী 'গণপুর'; সবই প্রিয়ঙ্গুর জন্মভূমির দুই-তিন ক্রোশের মধ্যে। পণ্ডিত মহাশয় আরও শিখাইয়াছিলেন—বৃটিশরা খুব নোংরা জাত। তাদের পূর্ব্বপুরুষ 'হনু' ছিল,—রামায়ণের হনুমান নহে, সাধারণ হনু। উহারা অহঙ্কারী ও ফন্দীবাজ, ফাঁকি দিয়া ভারতবর্ষ লইয়াছে। প্রথমে এ দেশে ফেরী করিয়া কাঁচের পুতুল বিক্রয় করিত।

প্রিয়ঙ্গু বড় হইয়া যখন ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিল তখন পণ্ডিত মহাশয় প্রদত্ত অমূল্য উপদেশগুলি বেশ কার্য্যকরী হইল।

"রুল্ ব্রিটানিয়া, রুল্ দি ওয়েভ্স্!"

ব্রিটানিয়া, তুমি সাগর শাসন কর। কবিতাটি পড়িয়া প্রিয়ঙ্গু ভাবিল—নির্ব্বোধ, দাম্ভিক ভিন্ন এ কথা কি কেউ মুখে আনিতে পারে? রাজা ক্যানুটের মোসাহেবরাই ইংরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে নিশ্চয়। ইহারা 'গড্ সেভ দি কিং' না বলিয়া 'কিং সেভ আওয়ার গড্' বলে না কেন? তার পর আর একটী কবিতায় পড়িল—"ব্রিটানিয়ানীড্স্ 'নো বুল্ওয়ার্ক।"

বৃটানিয়ার দুর্গ আবেষ্টনীর দরকার নাই।

"রক্ষা করুন ভগবান্! বৃটানিয়ার এত দর্প? তা আবার প্রচার করা হচ্ছে কবিতা লিখে!"

প্রিয়ঙ্গু এ সব বিষয়ে কঠোর সমালোচক হইলেও বাঙালী সম্বন্ধে তাহার ধারণা যে ভ্রমাত্মক তাহা কখনো ভাবিত না। একটা কবিতা ছিল—

কোথা নাই? কোথা নাই? ঘর-মুখো বাঙালী
চিরদিন পরাধীন—অন্নের কাঙালী।
'পিণ্ডিতে' রেল যাবে, পেতে পারে চাকরী—
পেশোয়ারে পড়ে থাকে কালীবাড়ী আঁকড়ি'।
অসিতে সে বড় নয়—বড় শুধু মসীতে,
আর গুণ না থাকুক পারে গুণ কষিতে।

মরিসাস্ ট্রিনিডাডে দাস-খত লিখেছে,
ভোগ করা ভুলে গিয়ে যোগ করা শিখেছে।
মাছ ধরে—ইরাবতী পাড়ি দেয় ডোঙাতে,
খেদাতে খেদায় হাতী, বাস করে টোঙাতে।
মালয়েতে চুঙ্গি দেয় রবারের গাছে হে,
বল দেখি হেন জাতি আর কোথা আছে হে?

প্রিয়ঙ্গু পড়িয়া রাগে গরগর করিতে লাগিল, রোষে ক্ষোভে দু'দিন পর ইহার একটা কড়া উত্তর লিখিয়া ফেলিল।—

কোথা নাই জগতের সেরা জাতি বাঙালী?
বিশ্বের দরবার সদা তার কাঙালী।
ঘর থেকে বেরুলেই ঘুচে তার জড়তা,
উজিরীতে ডাকে তারে কাশ্মীর, বরোদা।
যেথা যায় সেথা পায় সম্মান ন্যায্য,
সম্রাট্ নয় তবু শাসে সাম্রাজ্য।
নদী যদি কর তারে সেই হবে গঙ্গা,
হিমালয়ে অন্ততঃ কাঞ্চনজঙ্ঘা!
বাঙলায় বসে খায় 'চর্চ্চরী', 'শুক্তা',
মানবের সে মাণিক, মনীষার 'মুক্তা'।
মানুষের রাজা তারা—কবি, তুমি বুঝছো,
আকাশেতে পেলে ঠাঁই হ'তো তারা সূর্য্য।

লিখিয়া দুই-তিন বার জোরে জোরে, ভঙ্গীর সহিত পড়িল আর বলিল—'আচ্ছা হয়েছে, আচ্ছা!

বাঙালীর কোনো বীরত্ব বা গৌরবের কথা শুনিলেই প্রিয়ঙ্গু 'আচ্ছা' এই কথাটি জোরে উচ্চারণ করিত। আনন্দের আতিশয্যে উহা উচ্চারিত হইত। ক্রমে উহা তাহার মুদ্রাদোষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

অতিথি

ডাঃ নলিনীমোহন সাগ্যাল,
এম্. এ, পি-এইচ্. ডি

আরব দেশের গল্প তোমরা সকলেই হয়তো কিছু কিছু শুনিয়াছ। এই দেশটির অনেকখানিই প্রায় মরুভূমি। কোথাও কোথাও বহু ক্রোশ দূরে দূরে এক একটী অতি ক্ষুদ্র সবুজ রঙের ঘাস ও সেইরূপ শ্যামল পত্রে আচ্ছাদিত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। খুঁড়িলে উহার নীচে জল পাওয়া যায়। ঐ অঞ্চলের লোকেরা এই রকম এক-একটা জায়গা বাছিয়া লইয়া সেখানে বাসস্থান তৈয়ারী করে। এগুলিকে বলে মরূদ্যান,—ইংরাজীতে বলে "ওয়েসিস্"। যাহারা মরুভূমির মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে করিতে এইরূপ স্থানে আসিয়া পড়ে তাহারা এখানে আশ্রয় ও বিশ্রাম পায়।

ইব্‌রাহিমের গল্প তোমরা কেহ কেহ শুনিয়া থাকিবে। ইব্‌রাহিম এই রকম এক মরূদ্যানে বাস করিতেন। সেখানে তিনি মরুযাত্রীদের জন্য একটি অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই অতিথিশালায় অতিথির আগমনের জন্য তিনি সর্বদা ব্যগ্র থাকিতেন। না আসিলে অত্যন্ত কাতর হইতেন, আসিলে নানাভাবে তাহাদের আদর-যত্নের ব্যবস্থা করিতেন।

একবার এক সপ্তাহ কাল পর্যন্ত তাঁহার অতিথিশলায় কোনো অতিথি আসিল না। তিনি ব্যস্ত হইয়া নিকট দিয়া কোনো অতিথি যাইতেছে কিনা তাহার খোঁজ করিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। অনেক খুঁজিয়া এক বৃদ্ধের সন্ধান পাওয়া গেল। তাহাকে আদর করিয়া অতিথিশালায় আনা হইল।

ইবরাহিম বৃদ্ধ অতিথিকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, আদর-যত্নের পর তাহার সম্মুখে সুখাদ্যপূর্ণ থালা তুলিয়া ধরিলেন। অতিথি, সম্মুখে খাদ্য পাইয়াই ব্যস্তভাবে খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল, একবার ভগবানের নাম লওয়াও আবশ্যক বোধ করিল না। ইবরাহিম এরূপ আচরণ সহ্য করিতে পারিলেন না, অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি তখনই ঐ বৃদ্ধটীকে বাড়ির বাহির করিয়া দিলেন।

ইহার কিছু পরেই ইব্‌রাহিমের বন্ধু ভগবান্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভগবান্ ইব্‌রাহিমকে বলিলেন, 'দেখ বন্ধু, আমি এই বৃদ্ধটাকে এত বছর ধরিয়া সহ্য করিয়া আসিয়াছি, আর তুমি ইহাকে একবারের জন্যও সহ্য করিতে পারিলে না। আমি তোমার উপর নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলাম। ভবিষ্যতে আর কখনও যেন তোমার এরূপ ত্রুটি না হয়।" এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্ধান করিলেন।

শ্রীঅমলকুমার মিত্র

ক্রীড়ামোদীদের কাছে এ বছরের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে ভারতে কমন্‌ওয়েল্‌থ্ দলের আগমন। ইতিমধ্যে দিল্লীতে তাদের সঙ্গে ভারতীয় দলের ১ম টেষ্ট ম্যাচ হয়ে গেছে, সে কথা তোমরা রামধনুতেই পড়েছ।

টেষ্টের প্রথম দিনেই কিন্তু দিল্লীতে এবার এমন একটি নতুন ধরণের রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে টেষ্ট-ইতিহাসে যার বোধ হয় তুলনা নেই! আর কিছু নয়, টসে ভারতবর্ষ আবার পরাজিত হয়েছে। তোমাদের হয়তো মনে আছে, গত বার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের নেতা লালা অমরনাথ পর পর পাঁচবার পাঁচটি টেষ্টেই টসে হেরে গিয়েছিলেন; অর্থাৎ এবার নিয়ে ভারতবর্ষ পর পর ৬টি টেষ্টে টসে হেরে এক নতুন ধরণের মজার রেকর্ড সৃষ্টি করল।

এবার খেলার কথায় আসা যাক। তোমরা হয়তো জান, এবারের আগন্তুক কমন্‌ওয়েল্‌থ্ দলের অধিনায়কত্ব করছেন অষ্ট্রেলিয়ার চৌকস উইকেট-কীপার, লিভিংষ্টোন। দলটী অষ্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড আর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের নামকরা খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত। টেষ্ট ম্যাচ বাদ দিয়ে তাদের প্রথম পাঁচটি খেলায়

তারা তিনটিতেই বিজয়ী হয়েছে, দু'টি শেষ হয়েছে অমীমাংসিত ভাবে; হারে নি কোনটাতেই।

কমন্‌ওয়েল্‌থের প্রথম খেলা হয় বোম্বাইএ, বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিরুদ্ধে। এই খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ফ্রাঙ্ক ওরেল সর্ব্বপ্রথম সেঞ্চুরি (১০৯) রান্ ক'রে বাহাদুরী দেখান। কিন্তু বৃষ্টির জন্য তৃতীয় দিনে খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

দ্বিতীয় খেলা হয় আমেদাবাদে, বিজয় হাজারের অধিনায়কত্বে, পশ্চিম ভারতের বিরুদ্ধে। পেপার ও ট্রাইবের মারাত্মক বোলিংএর ফলে পশ্চিম ভারত করে প্রথম ইনিংস্‌এ মাত্র ১৭০, আর ২য় ইনিংস্‌এ মাত্র ৫৫। কমনওয়েল্‌থ্ দল এক ইনিংস্‌এই করে ৩৪৭।

৩য় খেলা হয় ইন্দোরে, সি. কে. নাইডুর অধিনায়কত্বে হোলকারের বিরুদ্ধে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরে হোলকার দল মাত্র ১ উইকেটে পরাজয় বরণ করে। কেউ শতাধিক রান্ করতে পারেন নি।

৪র্থ খেলা হয় পাতিয়ালায়, উত্তর অঞ্চলের বিরুদ্ধে। কমন্‌ওয়েল্‌থ দল ৭ উইকেটে ৬১৩ রান্ ক'রে খেলা শেষ হ'লো বলে ঘোষণা ক'রে দেয়। (ওল্ডফিল্ড্ ১০৩, ওরেল ১৫৪, রে স্মিথ নট্ আউট্ ১১৯। উত্তর অঞ্চল করে প্রথম ইনিংস্‌এ ১৬৪ রান্। দ্বিতীয় ইনিংস্‌এ বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ৪ উইকেটে ১৫৫ রান্ করবার পর খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

পঞ্চম খেলা অনুষ্ঠিত হয় দিল্লীতে, ভারতীয় সৈনিক একাদশের বিরুদ্ধে। এই খেলায় কমন্‌ওয়েল্‌থ্ দল ১০ উইকেটে জয়লাভ করে। এই খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড় হেমু অধিকারী কমন্‌ওয়েল্‌থের বিরুদ্ধে প্রথম শতাধিক রান্ (১০৯) করেন

এর পর আরম্ভ হয় প্রথম টেষ্ট ম্যাচ্—দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা মাঠে। দুর্ভাগ্য যেন প্রথম থেকেই ভারতীয় দলের পেছন পেছন ঘুরতে থাকে। বিনু মানকড় আহত থাকায় দলভুক্ত হ'তে পারলেন না। অমরনাথ মনোনীত হয়েও শেষ পর্য্যন্ত আহত হয়ে যাওয়াতে খেলতে পারলেন না। বিজয় মার্চ্চেণ্ট টসে হারলেন। এতেই দুর্ভাগ্যের শেষ হ'ল না। ফিল্‌ডিং করবার সময়ে একটা শক্ত বল্ ধরতে গিয়ে তিনি ডান হাতের আঙ্গুল ভাঙ্গলেন। ফলে এই ম্যাচে তিনি আর খেলতেই পারলেন না। উদয় মার্চ্চেণ্টও আহত হয়ে যাওয়ার দরুণ স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রকাশে অসমর্থ হলেন।

কমন্‌ওয়েল্‌থ্ দল গঠিত হ'ল নিম্নলিখিত খেলোয়াড় নিয়ে:—লিভিংষ্টোন (অধিনায়ক), জর্জ ট্রাইব, জ্যাক হোল্ট, সেসিল পেপার, ফ্রাঙ্ক ওরেল, পেটি-ফোর্ড, ল্যামবার্ট, ফ্রিয়ার, ওল্ডফিল্ড, রে স্মিথ, আর বিল য়্যালী।

ভারতীয় দলে স্থান পেলেন—"বিজয় মার্চ্চেণ্ট (অধিনায়ক), উদয় মার্চ্চেণ্ট, মন্ত্রী (উইকেট-কীপার), পলী উমরিগার, হেমু অধিকারী, চন্দ্র সারভাতে, হীরালাল গাইকোয়াড়, সি. এস, নাইডু, বিজয় হাজারে, ফাদকার, আর মোদী।

কমন্‌ওয়েল্‌থ দলের সূচনা হ'ল অনিন্দ্যনীয়। মার্চ্চেণ্ট ভ্রাতৃদ্বয় ওল্ডফিল্ড আর লিভিংষ্টোনের অনেকগুলি ক্যাচ মিস্ করলেন। দিনের শেষে দেখা গেল কমন্‌ওয়েল্‌থের মাত্র ২ উইকেটে ২৮৪ রান্ উঠেছে; অধিনায়ক করেছেন ১২৩ আর ওল্ডফিল্ড ১১০ রান্ ক'রে অপরাজিত রয়েছেন।

দ্বিতীয় দিনের শেষে কমন্‌ওয়েল্‌থ দল ৮ উইকেটে ৬০৮ রান্ তুলে ৩য় দিনে ডিক্লেয়ার করল। ওল্ডফিল্ড করলেন ১৫১ রান্। ফাদকার ১১৯ রানে ৩টি, নাইডু ১৯৪ রানে ৩টি উইকেট পেলেন।

ভারতীয় দলের সূচনা হ'ল তেমনি খারাপ। কোনও রান্ হবার আগেই সারভাতে আউট্ হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন। ৪০ রানের মাথায় মোদী এবং মন্ত্রীও পর পর আউট হয়ে গেলেন। দলের এইরূপ শোচনীয় অবস্থার সময়ে ফাদকার আর অধিকারী সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে পিটিয়ে খেলতে লাগলেন। দিনের শেষে ভারতীয় দলের ৫ জন আউট হয়ে ২৫৫ রান্ উঠল। ফাদকারের হ'ল ১১০ রান্।

চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস্ মাত্র ২৯১ রানে শেষ হয়ে গেল। (অধিকারী—৭৪, উমরিগার—৩৪ নট্ আউট্)। পেপার চতুর্থ দিনে মারাত্মক বোলিং ক'রে ৫৭ রানে ৪টি উইকেট দখল করলেন।

৩১৭ রান্ পশ্চাতে পড়ে ভারতবর্ষ সেদিনই ২য় ইনিংস্ আরম্ভ কর্‌ল। দিনের শেষে ৩ উইকেটে ১৬৫ রান্ উঠ্‌ল। (মন্ত্রী ৫৪, উমরিগার ৫৫)।

পঞ্চম দিনে বিজয় হাজারে ১৪০ রান্ ক'রে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর ২৯৯ রানের মাথায় আউট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দলের মধ্যে ফাটল দেখা দিল। একজনের পর একজন আউট হয়ে যেতে লাগলেন। মারাত্মক বোলিংএর বিরুদ্ধে ভারতীয় দল ইনিংস্ পরাজয়ের হাত হ'তে অব্যাহতি পাবে কিনা এই প্রশ্নই বিশ সহস্র দর্শকের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। এক একটি

রানের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকগণ তুমুল হর্ষধ্বনি সহকারে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে লাগলেন। ইনিংস্ পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ৬ রান্ দরকার, এমন সময়ে নাইডু আউট হয়ে গেলেন। অধিকারী অপর দিকে বাউণ্ডারী মেরে ৪ রান্ তুললেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গাইকোয়াড়ও আউট হয়ে গেলেন। শেষ খেলোয়াড় উদয় মার্চেণ্ট মাঠে নামলেন। তখনও ইনিংস্এর হাত থেকে বাঁচতে হ'লে আরও ২ রান্ দরকার। প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। বিপুল করতালি-ধ্বনি আর আনন্দরোলের মধ্যে মার্চেণ্ট বাউণ্ডারী মারলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দল ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেল। ৩২৭ রানে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস্ শেষ হ'ল। অধিকারী ৪৪ রান্ ক'রে নট্ আউট রইলেন। ট্রাইব ৬৫ রানে ৪টি আর পেপার ১৩৪ রাণে ৩টি উইকেট দখল করলেন। জয়লাভের জন্য ১১ রানের দরকার, এই অবস্থায় কমনওয়েল্থ্ দল দ্বিতীয় ইনিংস্এর খেলা আরম্ভ করল, এবং এক উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় রান্ সংগ্রহ করতে সমর্থ হ'ল। ভারতীয় দল ৯ উইকেটে পরাজিত হ'ল।

কালাহারির যাযাবর

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

ভুটু পাড়াগাঁর ছেলে, বড়দিনের ছুটীতে মামার সঙ্গে কলকাতায় এসেছে বেড়াতে। বিকেলে মামা বললেন, "চল্, সিনেমা দেখে আসি।"

জুতো-মোজা পায়ে দিয়ে, গায়ে গরম সোয়েটার আর পাৎলুন চাপিয়ে ভুটু চল্ল ট্রামে চেপে ছবি দেখতে। 'এয়ার-কণ্ডিশন্ড্' হল্। বাইরে এত ঠাণ্ডা কিন্তু হলের ভিতরটা দিব্যি গরম ক'রে রাখা হয়েছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে। বাতাস-পোরা পুরু গদীর ওপর শরীরটা এলিয়ে দিতেই ভুটুর মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে এল—"আঃ!"

একটু পরেই টুং টুং বাজনা, তার পর সুরু হ'ল ছবি দেখানো। আফ্রিকার ঘন জঙ্গল। থেকে থেকে হিংস্র জন্তুর কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। জলের মধ্যে

বিরাট বিরাট হিপ্পো মাথা তুলে রয়েছে। কোথাও বা রয়েছে বিরাট কুমীর। চিতা বাঘ গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে চলেছে। হায়না তাড়া করেছে হরিণের দলকে। লম্বা ঘাড় উঁচিয়ে একটা জিরাফ আড়চোখে একবার ভুটুর দিকে তাকিয়ে নিল, তার পরই দে ছুট। ভুটু ভেবেছিল তাকে দেখে লজ্জায় পালাল বুঝি জিরাফটা। কিন্তু মামা বললেন, তা নয়, আসলে একটা সিংহ ওর জন্য ওৎ পেতে ছিল, ও টের পেয়ে গেছে, তাই। পরক্ষণেই মেঘগর্জ্জনের মত সিংহনাদ করতে করতে পশুরাজ ভুটুর সামনে দিয়ে চলে গেলেন।

আফ্রিকার অরণ্য-অঞ্চল

তার পরেই দেখা গেল একটা কাফ্রী গ্রাম। গোল গোল, পাতা দিয়ে ছাওয়া অদ্ভুত অদ্ভুত বাসার সামনে বসে কালো কালো একদল মেয়ে চুল বাঁধছে। তাদের হাতে, পায়ে, কানে মজার মজার সব গয়না। গয়নার ভারে কেউ কেউ ভালো ক'রে নড়তেই পার্ছে না! একটু পরেই একদল লোক ডুং ডুং ক'রে বাজনা বাজাতে বাজাতে সামনে এসে দাঁড়াল। সবগুলোই মিশ্ কালো। কেউ কেউ আবার গায়ে-মুখে সাদা রং মেখেছে। কারো বা নাকের মধ্যে লম্বা লম্বা হাড় গোঁজা। একটা লোক, সেই বোধ হয় দলের সর্দ্দার, মাথার মধ্যে গাছের ডালপালা আর পাখীর পালক দিয়ে তৈরী এমন অদ্ভুত একটা টুপি পরেছে যে মুখই দেখা যায় না ভালো ক'রে। তার হাতে একটা মস্ত বড় বল্লম। ঠিক যেন সং! ভুটু দেখে হেসেই বাঁচে না।

"এখনও পৃথিবীতে এই সব জাতের মানুষ আছে!" অবাক্ হয়ে ভুটু বল্ল মামাকে। তার পর একবার হলের চার পাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে

বিজ্ঞের মত বল্‌ল, "আর আমরা কত এগিয়ে গেছি একই পৃথিবীতে—একই সঙ্গে জন্মে!"

মামা শুধু মুখ বুঁজে বল্লেন, "হুঁ।"

বাস্তবিকই পৃথিবী কত এগিয়ে গেছে! কিন্তু তা সত্বেও পৃথিবী থেকে সেই আদিম যুগের মানুষ আর তাদের আদিম যুগের ঘরকন্না আজও লোপ পায় নি। শুধু তাই নয়, ভুটু হয়তো জানে না,— পৃথিবীতে আজও এমন জাতের লোক টিকে আছে যাদের তুলনায় আফ্রিকার ঐ জংলী অসভ্য গ্রামবাসীরাও

আফ্রিকার মরু-অঞ্চল

দস্তুরমত সভ্য বলা যেতে পারে। যে যুগে মানুষ চাষবাস করতে জানত না, পাথর ছুঁড়ে বুনো জানোয়ার শিকার ক'রে তাদের মাংসে জীবন ধারণ করত, গাছের ডালে বা পাহাড়ের গুহার মধ্যে বাস করত, এরা যেন আজও সে যুগেই পড়ে রয়েছে!

এরাও আফ্রিকারই অধিবাসী, কিন্তু জঙ্গল-বাসী নয়, মরুবাসী। আফ্রিকায় যেমন বিরাট বিরাট জঙ্গল রয়েছে, তেমনি মরুভূমিও রয়েছে বিরাট বিরাট। শত শত মাইল যুড়ে ধূ ধূ করছে শুধু বালি আর বালি আর বালি। এখানে ওখানে হয়তো বড় জোর ২।৪টে ঘেসো ঝোপ ক্ব'চিৎ দু'-এক জায়গায় বালি খুঁড়লে এক-আধ ফোঁটা জল মেলে। এমনি ধরণের এক মরুভূমি হচ্ছে কালাহারি। আমাদের আজকের গল্পের নায়করা হচ্ছে এই কালাহারি মরুভূমিরই বাসিন্দা। মরুভূমির মধ্যে ঝোপেঝাপে বাস করে ব'লে সাহেবরা এদের নাম রেখেছেন 'বুশ্‌ম্যান্‌'। ইংরেজী 'বুশ্‌' মানে ঝোপ তা নিশ্চয়ই জান।

বুশ্‌ম্যান্‌রা হচ্ছে যাযাবর জাত—অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট ঘরবাড়ী ব'লে কিছু নেই তাদের। মরুভূমির মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাদের জীবন কাটে। সাধারণতঃ এক-একটি পরিবার এক সঙ্গে থাকে। এক পরিবারে ১৫।১৬টি লোক। ঠিক বন্য পশুরা যেমন জলের কাছাকাছি থাকবার চেষ্টা করে এরাও তেমনি। যেখানে জলের সন্ধান পেল সেখানেই আড্ডা গাড়ল। সেখানকার জল ফুরিয়ে গেলে আবার রওনা হ'ল নতুন জলের গর্ত্তের সন্ধানে। এরা চাষবাস জানে না, কিন্তু শিকার করতে জানে। তীরের ডগায় বিষ মাখিয়ে বুনো জানোয়ার শিকার করে, তার পর তাদের মাংসে জীবন ধারণ করে। কিন্তু মরুভূমির মধ্যে শিকার প্রায়ই জোটে না, কাজেই আহারের অন্বেষণেই এদের সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়। যদি কখনও শিকার জুটল তবে মহা ফূর্ত্তি। সবাই মিলে শিকারের হাড়গোড় আর চামড়াটুকু বাদে সবটুকুই খেয়ে ফেলে—যতটা পেটে ধরে। এত বেশী খায় যে খাবার পরে আর কয়েক দিন তাদের নড়বার চড়বার ক্ষমতা থাকে না। তখন তারা কাছাকাছি কোনও ঝোপ থাকলে তার নীচে, আর না থাকলে বালির মধ্যেই একটা গর্ত্ত খুঁড়ে শুয়ে পড়ে এবং পর পর কয়েকদিন ধরে দিন-রাত ঘুমোয়। প্রত্যহই খাবার জুটবে এমন কোন সম্ভাবনা নেই, তাই এই ব্যবস্থা। ঘুম ভাঙ্গলে আবার তারা বেরিয়ে পড়ে খাবারের খোঁজে।

যখন শিকার একেবারেই জোটে না তখন তারা যা পায় তাই খেতে সুরু ক'রে দেয়। বালি খুঁড়ে শামুক, গুগলি, কেঁচো বার ক'রে খায়। সাপ, টিকটিকি, গিরগিটি—এ সবও খেতে কসুর করে না। আগেই বলেছি চাষবাসের কোন ধার ধারে না এরা। কাজেই ফল-তরকারী বা ঐ জাতীয় খাবারের সঙ্গেও তাদের পরিচয় নেই। তবে ওদেশে সময় সময় বালির নীচে এক রকম শিকড় পাওয়া যায়—যা নাকি বুশ্‌ম্যান্‌দের প্রিয় খাদ্য।

বুশ্‌ম্যান্‌রা ঘর-বাড়ী তৈরী করতে জানে না, ঘেসো ঝোপের নীচে গর্ত্ত খুঁড়ে সেই ঢালু গর্ত্তেই রাত কাটায়। বড় জোর মাথার ওপর খোড়ো ঘাসের একটা ছাউনী মত বানিয়ে নেয়; তবে তাকে ঘর বলা যায় না কোন মতেই। শিকার-করা মৃত পশুর চামড়া হচ্ছে তাদের কাপড়, তবে তা আকারে নেংটির চেয়ে বড় হয় না। কোন মতে কোমরে একটু জড়ানো থাকে এই যা। এদের বাসনপত্র বলতে উটপাখীর ডিমের খোলা। মরুভূমির বালির মধ্যে মাঝে মাঝে

উটপাখীর ডিম পাওয়া যায়। যেদিন হঠাৎ ঐ রকম একটা ডিম মিলে যায় সেদিন এদের ছোটখাট ভোজ বলতে পার। ডিম খাওয়া হ'লে খোলাটা রেখে দেয় পাত্র হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য।

বুশ্‌ম্যান্‌রা তীর-ধনুক ছুঁড়তে জানে। তীরের আগায় বিষ মাখিয়ে নিলে তা দিয়ে শিকার করা যে অনেক সহজ এ কথাও জানে। তা ছাড়া আগুনের ব্যবহারও এদের অজানা নয়। দু' টুকরো কাঠ ঘষাঘষি ক'রে এরা দরকার মত আগুন জ্বেলে নেয়। ইতর প্রাণীদের সঙ্গে এইখানেই এদের তফাৎ।

এরা সাধারণতঃ খুব বেঁটে। গায়ের রং কালো বা ঈষৎ পীতাভ। অবশ্যি, আসল রং যে কি ছিল তা বলা মুশ্‌কিল। কারণ এরা জীবনে কোন দিন স্নান করে না। এদের ধারণা স্নান জিনিষটা শরীরের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর। অবশ্যি ওদেশে জলের যে অভাব তা'তে স্নান করার বিলাসিতা সাজেও না। খাবার জলটুকু যোগাড় করতে পারলেই ভাগ্য বলতে হবে। তবে গায়ে জল না দিলেও এরা বালিতে বেশ ক'রে গড়াগড়ি দিয়ে স্নানের অভাব অনেকটা পূরণ করে।

ভগবান্ এদের আর একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা দিয়েছেন—সেটি হচ্ছে এদের ঘ্রাণশক্তি। মানুষের মধ্যে ও রকম ঘ্রাণশক্তি একেবারেই দুর্ল্লভ। গন্ধ শুঁকে এরা, ঠিক কুকুরের মতই, ব'লে দিতে পারে শিকার কোন্ দিকে গেছে। বালি বা মাটী শুঁকে ব'লে দিতে পারে কোথায় মাটীর নীচে জল আছে। জলের সন্ধান পেলে সেখানে বালির মধ্যে একটা শক্ত খোড়ো নল ঢুকিয়ে দেয়, তার পর সেই নলে মুখ লাগিয়ে চুষে চুষে জল খায়।

বুশ্‌ম্যান্‌রা সাধারণতঃ খুব লাজুক প্রকৃতির, আর তেমনি ভীরু। এই ভীরুতা এবং দুর্ব্বলতাই তাদের কাল হয়েছে। নইলে, পণ্ডিতেরা বলেন, এক সময়ে সমস্ত আফ্রিকায় এদের দেখা পাওয়া যেত এবং সংখ্যায়ও এরা ছিল যথেষ্ট। প্রতিবেশী শক্তিশালী কাফ্রীদের অত্যাচারে এদের সংখ্যা কমতে থাকে। তখন এরা মরুভূমির দিকে পালাতে সুরু করে—এবং ক্রমে মানুষের অগম্য জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। ফলে এদের বংশ লোপ পেল না বটে কিন্তু সভ্য জগৎ থেকে তারা এত ছিটকে পড়্‌ল যে আজ, এই বিংশ শতাব্দীতেও, তারা প্রস্তর-যুগের মানুষ থেকে বেশী দূর এগোতে পারে নি।

নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এদের নিয়ে অনেক গবেষণার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু

এদের সাক্ষাৎ পাওয়া বড় সহজ নয়। অজানা মরুভূমির ভিতর দিয়ে শত শত মাইল এগিয়ে গিয়ে তবে এদের রাজ্যে পৌঁছনো যায়। কিন্তু পৌঁছলেই যে দেখা পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে সম্প্রতি দু'-চার জন সাহসী মিশনারী এবং বৈজ্ঞানিক নানা বিপদ্-আপদ্ তুচ্ছ ক'রে এদের সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য যোগাড় করে এনেছেন। এমন কি এদের জীবনযাত্রার চলচ্চিত্র তুলে আনতেও তাঁরা ছাড়েন নি।

বুশ্‌ম্যান্‌রা তামাক খেতে খুব ভালোবাসে। তামাক এবং নানা রকমারি সখের জিনিষ ভেট দিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা তাদের সঙ্গে খাতির জমিয়েছিলেন। প্রথমটা সন্দেহের চোখে দেখলেও শেষে লোভেরই জয় হ'ল, বুশ্‌ম্যান্‌রা তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলল। বৈজ্ঞানিকেরাও তাদের মধ্যে মিশে তাদের চাল-চলন লক্ষ্য করতে সুরু করলেন,—তাদের ভাষা জানবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বুশ্‌ম্যান্‌দের ভাষায় শব্দসংখ্যা খুবই কম—কয়েকটা কিচিরমিচির বা কড়মড় শব্দের সমষ্টি মাত্র। শুনলে মানুষের ভাষা ব'লে সহজে মনে হবে না। এরা দুইএর বেশী গুণতে জানে না। দুইএর বেশী হ'লেই এদের কাছে তা হ'ল-'অনেক'। চাঁদকে এরা খুব ভক্তি করে। চাঁদের আলোয় সারারাত জেগে নাচ-গান এদের একটা বড় স্ফূর্ত্তির অঙ্গ। তবে শুধু নাচ-গানই, বাজনা নয় কিন্তু। কেননা কোন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে এদের পরিচয় নেই। স্ত্রীপুরুষ মিলে সারারাত ধরে গোল হয়ে এমন নাচাই নাচে যে ভোরের দিকে অনেকেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

পুণ্যবান্

(কবি ভর্তৃহরি হইতে)

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

পুত্র সেই সুচরিতে তোষে যে পিতায়,
কলত্র সে সদা মন পতি হিতেচ্ছায়,
মিত্র সে আপদে কিংবা সুখে যে সমান,
এ জগতে এই তিন লভে পুণ্যবান্।

একটি দৈব দুর্ঘটনা

শ্রীকমলা দত্ত

পশ্চিমের ছোট একটি সহরের মাইল খানেক দূরে এক দেবীস্থান। উঁচুনীচু ঢেউ খেলানো জমি, এরই এক নীচু অংশে দেবীমন্দির;—মন্দির নয়, একটা ছোট ঘর, তারই পাশে একটা গাছের গোড়া বেদীর মত বাঁধানো—গাছটাই হ'লো দেবী। সে অঞ্চলে বাংলার শ্যামস্নিগ্ধ রূপ চোখে পড়ে না; যেন খানিকটা রুক্ষ, শ্রীহীন। এখানে ওখানে পাথরের স্তূপ মাটির বুক ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে; মাটির ঢেউয়ে দিগন্তসীমা আড়াল করে দেয়—তারি মাঝে মাঝে আকাশের গায়ে জেগে থাকে তাদের উদ্ধত শির; এখানে ওখানে দেখা যায় কিছু কিছু স্বল্পপত্র গাছপালা। দেবীস্থানের একটু নীচেই বয়ে গেছে এক ছোট নদী; কোন্ দূর হ'তে নদীটি বহু বঙ্কিম রেখা রচনা করে বিরাট সব কালো পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে ঠিক এই জায়গাটিতেই হঠাৎ কুড়ি-পঁচিশ হাত নীচে প্রপাতের মত পড়েছে। যেখানটাতে পড়েছে ছোট দহের মত তার আকার; অথচ ওপর দিকে পাথরগুলি এমনি সাজানো যে অনায়াসে লাফিয়ে পেরিয়ে যাওয়া যায়। পাহাড়ে নদী—শীতকালে শীর্ণকায়ে ঝরে পড়ে ঝির ঝির শব্দে,—বর্ষাকালে ঘোলা জলের রাশি ছুটে এসে পড়ে—শব্দ হয় সোঁ সোঁ, সাদা সাদা ফেনা ঘুরপাক খেতে থাকে দহে—তারপর জলটা পাথরের ফাঁক দিয়ে চলে যায়—বয়ে যায় আবার এঁকেবেঁকে।

সহর থেকে খুব দূরে না হ'লেও এখানটাতে সহরের ছোঁওয়া লাগে নি একবিন্দু। উদার প্রান্তর, অনেক দূরে দূরে দু'-একটি মাটির বাড়ি দেখা যায়। প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় দু'-একটি সাঁওতাল ছেলে, কষ্টিপাথরে তাদের দেহ গড়া। আর ঘুরে বেড়ায় গরু, ছাগল।

সকাল বেলার দিকে পূজোর সময়টাতে দু'-একজন পূজার্থীর সমাগম হয়, পুরোহিতও দূরের গাঁ হ'তে এসে পূজো দিয়ে চলে যায়। সারাদিন জায়গাটি থাকে স্তব্ধ নিরালা।

সুখন থাকে দূরে যেখানে নদীটা বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেছে সেটানটাতে, এক মাটির বাড়িতে। বাড়িতে আছে তার বাবা, মা আর একটি ছোট ভাই। বাবা অন্য লোকের জমি চাষ করে, মা আর সুখন মিলে বাড়ির খানিকটা জমিতে লাগিয়ে দেয় নানা শাক-সব্জী। আর ঘরে আছে একটা ছাগল, তারই ছানা সুনি। সুখনের অনুচর সুনি,—সেখানে যাবে সুখন সুনি চলে সঙ্গে ঘাড় বাঁকা করে লাফিয়ে লাফিয়ে, উৎসাহে মাঝে মাঝে ডাকে "ম্যা—া—া—া"।

বর্ষা এসে গেছে। কখনো বা দারুণ তাপে চারিদিক্ ঝিম্‌ঝিম্ করে, কখনো কালো মেঘে অন্ধকার ক'রে আসে—আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্। ছোট নদীতে ঢল নেমেছে, তীরবেগে ঘোলা জলের স্রোত চলে। দহের মধ্যে শোনা যায় জলের ক্রুদ্ধ গর্জন। সাদা সাদা ফেনা শুধু উঠছে আর পড়ছে।

সকাল বেলা। আজ সুখনের মনে ভারী স্ফূর্তি। সে বসে আছে দহের ধারে—এক পাথরে পা ঝুলিয়ে। একবার সুনির গলা জড়িয়ে বলে, "জানিস রে বোকা, আজ বুধন আসছে।"

সুনি মাথা দিয়ে ঢুঁ দিতে থাকে।

"বুঝলি না বুধন কে? আমার বন্ধু, ঝমরু চাচার ছেলে। দূরের সহরে কাজ করে। এক বছর পরে আজ আসছে। ছুটি মিলেছে তার।"

আর একজনও কাছেই অপেক্ষা করছে, সে বুধনের বাবা। বিশাল শরীর, গায়ে অসুরের মত জোর। যখন রুখে ওঠে,—হাঁক শুনে আর চেহারা দেখে ছোটদের বুকের ভেতরটা যেন গুর গুর করে ওঠে।

বর্দ্ধিষ্ণু চাষী, অভাব কিছু নেই। তবু ছেলেকে কলে খাটতে দিয়েছে—ছেলেরই জন্য। ছেলে জমিজেরাত চাষ করতে চায় না—পয়সাকে সে চিনেছে। ছেলেরই ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে তাকে দেওয়া। নয় তো যা জমি আছে, আরো দু'টি ছেলেকে নিয়ে সোনা ফলায় তাতে। সরল আদিবাসী এরা, এর বেশী চাইবারই বা কী আছে?

যে পায়ে-চলা পথ উঁচু রেল লাইন হ'তে নেমে এসে মিলেছে মাঠে—সে পথে দেখা দেয় এক সাদা বিন্দু। সাদা বিন্দু ক্রমে বড় হয়,—বুধন এসেছে। গায়ে তার ফিনফিনে পাঞ্জাবী, নীচে রঙিন গেঞ্জীর আভাস, ঢোলা পা-জামা পরা, চুল তেলহীন, উস্কোখুস্কো। বুধনের বাবার মুখের ওপর ক্ষীণ একটা অপ্রসন্নতার ছায়া ভেসে গেল। সুখন অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে। ঝমরু বলে—"এসেছিস্? মা তো তোর শুধু ঘর বার করছে! আর একে তুই চিনতে পারলি না?—এ তো তোর বন্ধু সুখন!"

বুধন ঘাড় নেড়ে স্বীকারোক্তি জানায়, তারপর বলে, "তুই কিন্তু, গেঁয়োই রয়ে গেলি!"

লজ্জিত সুখন কথা বলতে পারে না; ঝমরু তার ছেলেকে নিয়ে এগিয়ে চলে ঘর পানে।

কয়েকদিন যায়, বুধনের সঙ্গে সুখনের যেন নতুন করে আলাপ-পরিচয় হয়। বিস্ময়াহত সুখন শোনে বুধনের গল্প।—কেমন করে কারখানার কাজ চলে, তারই ফাঁকে কেমন করে চলে বুধনের হাতসাফাই। কেমন করে পরকে ঠকিয়ে পয়সা করা চলে, রাত্রি জেগে জুয়াখেলার নেশায় কেমন মেতে ওঠে তার দলবল। শুনে সুখন থই পায় না।

আরো কয়েকদিন যায়, বুধনের মেজাজ খারাপ। এখানে তার সঙ্গীসাথী, জুয়ার নেশা—কোনও কিছুর অভাব মিটছে না। তার ওপর নেই পয়সা। দরকার থাক্ বা না থাক, পয়সার রূপ না দেখলে মন তার ভালোই লাগে না। সুখন তার এই মনোবৃত্তি বুঝতে পারে না।

সেদিন সকাল বেলা; আকাশ কখনো বা মেঘমেদুর, কখনো বা রৌদ্রদীপ্ত—এমনি আলোছায়ার মেলা চলছে ভোরবেলা হ'তে। এক ভদ্রলোক সস্ত্রীক এলেন সহর থেকে মানত পূজো দিতে। সঙ্গে ছোট একটি বছর পাঁচেকের মেয়ে—প্রজাপতির মত চঞ্চল।

বুধন বসে ছিল একটা পাথরের ওপর। তার চোখ ছু'টিতে হঠাৎ যেন এক টুকরো আলো ঝলক দিয়ে ওঠে।

ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা পূজোর আয়োজন করছেন—ভারী ব্যস্ত দু'জনেই। মেয়েটি একবার এখানটাতে যায়, আর একবার যায় ওখানটাতে,—কখনো বা এ পাথরের আড়ালে, কখনো বা ও পাথরের পেছনে। মাঝে মাঝে সচকিত হয়ে উঠছেন বাবা মা, ডাকেন—"ও খুকী, কোথায় তুই?"

"এই যে!"—হাসতে হাসতে ছুটে আসে খুকী, "আমি তো এইখানেই আছি।"

পূজো আরম্ভ হয়েছে, বাবা মায়ের মনোযোগ তাতেই। খুকী একটু একটু করে নদীর ধারে নেমে যায়। খানিকটা এগিয়ে যেতে যেতে অনেকগুলি বিশাল পাথরের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় সে। একটা জায়গায় গোটা নদীটাই হঠাৎ হাত দুই নীচে নেমে গেছে, খুকী সেখানটাতে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে মুগ্ধ বিস্ময়ে।

খুকী পাথরের আড়ালে ঢাকা পড়তেই বুধন একবার সতর্ক দৃষ্টি ফেলে চারিদিকে। নাঃ, কেউ লক্ষ্য করছে না। প্রান্তরও একেবারে জনশূন্য। সে মন্দিরের সামনের রাস্তা ধরে খানিকটা চলে যায়। মন্দিরটা মাটির ঢেউয়ে ঢাকা পড়তেই সে ঘুরে যায় খুকী যে দিক্ পানে গিয়েছিল সেদিকে।

বুধনকে সামনে দেখে খুকীর ভয় করে না একটুও। বুধন তার পাশে গিয়ে হাতখানা তার ধরে ফেলেই চাপা গলায় বলে, "চুপ; চেঁচাবি তো মেরে ফেলব।" মুহূর্তে খুকী আতঙ্কে নীল হয়ে যায়। বুধন ওর হাত থেকে বালা দু'টো ও গলার হারটা খুলেই সামনের দিকে বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

খুকী ভয়ে শব্দ করে না। পেছন দিকে ফিরে ফিরে তাকায় আর ছোটে, মায়ের কাছে পৌঁছে তাঁর পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে কেঁদে উঠলো। মেয়ের মা-বাবা তো মেয়ের গয়না চুরি হয়েছে বলে সোরগোল করে উঠলেন। দু'-একজন গ্রামবাসীও এলো এগিয়ে। সুখনও এলো। সুখনের কেন যেন প্রশ্ন জাগে মনে—বুধনকে তো একবার জল নিতে এসে ও এখানটাতেই দেখেছিল, সে গেল কোথায়? গয়নার সন্ধান কিছু পাওয়া গেল না। বলল সবাই, কাছাকাছি দু'-একটা কয়লার খনি আছে, তারই কোনও লোকের কাণ্ড হয় তো। অনুসন্ধান নিস্ফল জেনে ফিরে গেলেন তাঁরা।

সেদিন সন্ধ্যায়। অস্তরবি-রশ্মির ম্লান আভা জেগে আছে পশ্চিম দিক্‌প্রান্তে; ধূসর ছায়া ঘনিয়ে এসেছে প্রান্তরে—দূরে দেখা যায় দু'-একটা আলোর বিন্দু; আকাশে তৃতীয়ার চাঁদের বঙ্কিম রেখা। বুধন আর সুখন দহের ওপরে একটা পাথরে বসেছে, পায়ের কাছে জলের গর্জন চলছে একটানা। সুনি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে।

বুধনের মনে সেদিন খুসীর জোয়ার এসেছে। খানিকটা কথাবার্ত্তার পর সুখন প্রশ্ন করে, "কি রে, আজ তোর মন এমন ভালো হ'লো কি করে? পয়সা পেয়েছিস নাকি?"

এক চোখ ছোট করে হাসতে হাসতে জবাব দেয় বুধন, "ছোঃ, পয়সা কেন? সোনা পেয়েছি।"

সোনা! সকাল বেলাকার কথা মনে পড়ে সুখনের। বন্ধুর বিরুদ্ধে মনটা তার বিষিয়ে ওঠে। একটু থেমে বলল, "তা হ'লে সকাল বেলাতে তুই-ই......"

"আমিই। কিন্তু হয়েছে কি তাতে? তুই যে একেবারে ধর্মপুত্তুর! যা, তোকে একদিন সহর থেকে ছবি দেখিয়ে আন্‌ব।"

"ঐ পয়সায় ছবি আমি দেখব না; কিন্তু আমি তোর বাবাকে বলে দেব।"

বুধনের চোখের সামনে পিতার রুদ্রমূর্তি ভেসে ওঠে। সেও ভীষণ হয়ে ওঠে; বলে—"খবরদার বলবি না—তা হ'লে খুন করে ফেলব তোকে।"

সুখন উঠে দাঁড়ায়।—"আমাকে খুন করার আগে তোর বাবাই তোকে খুন করবে।"

সহসা সুখনের পিঠে এক প্রচণ্ড ধাক্কা! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একমুহূর্তে ঘুরপাক খেয়ে গেল তার চোখে। হাত বাড়িয়ে কিছু একটাকে আশ্রয় করতে গেল। মাথায় এক দারুণ আঘাত। দহের জলে ঝপাং করে শব্দ। শব্দ মিলিয়ে গেল জলের গর্জনে। বুধনও যেন হঠাৎ শিউরে ওঠে, তারপরই নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সুনি কি যেন কি একটা অবুঝ আশঙ্কায় ছুটে গেল দহের ধারে; আর্ত্তকণ্ঠে উর্দ্ধমুখে ডাকতে থাকে ক্রমাগত। সুখনের বাবা-মা ব্যাপার জানবার জন্য ছুটে আসে, দেখে দহের জল লাল—সুখনের দেহ আটকে আছে পাথরে। হাহাকার করে ওঠে তারা, ছুটে আসে প্রতিবেশীরা। সুখনকে তোলা হয়। মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে—জীবনের লক্ষণ নেই কোথাও। আলোচনা হয় বহু, সিদ্ধান্ত হয়—হয়তো অন্ধকারে দহ লাফিয়ে পার হ'তে পা ফস্কে পড়ে গেছে দহের ভেতর! নিতান্তই দৈব দুর্ঘটনা। দহের অপর প্রান্তের পাথরে রক্তের দাগও এই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে।

দিন যায়। ক্রমে শোক ও আলোচনা দুই-ই পড়ে স্তিমিত হয়ে। শুধু মাঝে মাঝে জনহীন দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে সুনি করুণ সুরে ডেকে ওঠে—"ম্যা—া—া—া। ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তার ছড়িয়ে পড়ে দিক্‌দিগন্তরে—আ—া—া—া—া।

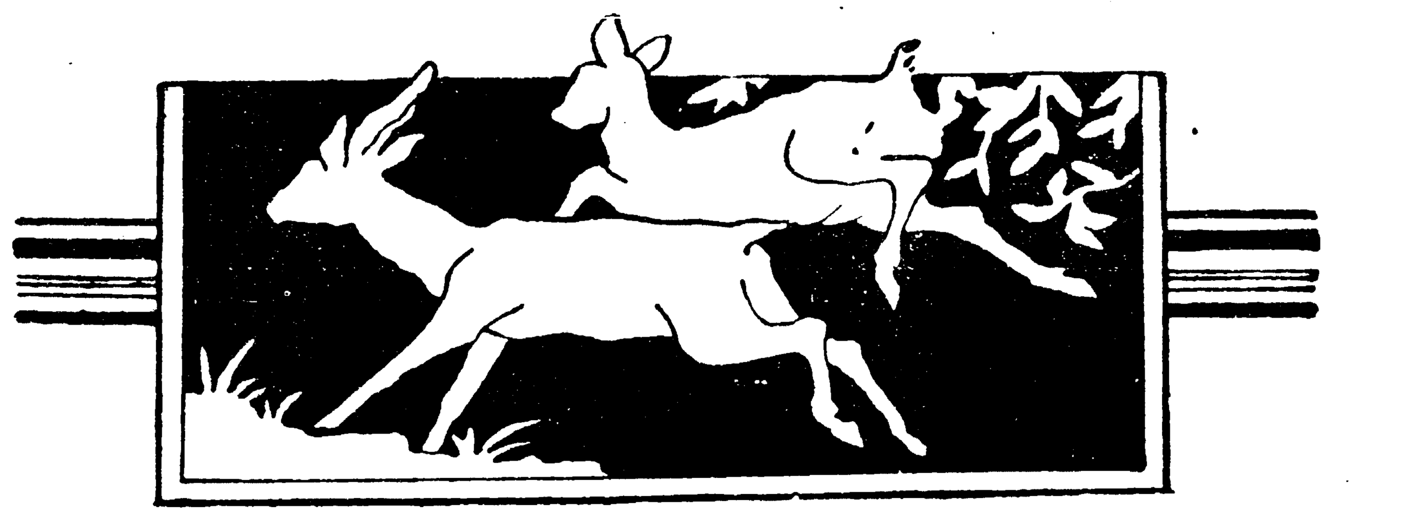

শরীরচর্চ্চার গোড়ার কথা

পরিদর্শক স্কুল দেখতে এসেছেন। একটি ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন, "বল তো তোমার মেরুদণ্ড কোথায়?" ছাত্রটি, ভাবে মনে হ'ল শব্দটি তার অপরিচিত নয়, কিন্তু চট্ ক'রে জবাব দিতে পারল না। শেষে বল্‌ল, "ওটি আমার স্বাস্থ্যের বইএর মধ্যে আছে, তবে ওটা যে কি তা ঠিক মনে পড়ছে না।" পরিদর্শক এর পর তাকে আফ্রিকা আর অষ্ট্রেলিয়ার কয়েকটি ভৌগোলিক স্থানের বিষয় প্রশ্ন করলেন কিন্তু এবারে আর তাকে ঠকাতে পারলেন না।

ঘটনাটি একটি সত্য ঘটনা। প্রথমটা শুনলে মজাই লাগে বটে, কিন্তু এর মধ্যে যে করুণ সত্য লুকিয়ে আছে তা ভাবলে হতাশা ছাড়া আর কিছু মনে আসবে না। কেননা ঐ ছেলেটি একটি নমুনা মাত্র; এ দেশে অনেক বয়স্ক শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও, দেখা যায়, নানা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তারা হৈচৈ করে কিন্তু নিজের শরীর সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও তাদের নেই। অথচ এই শরীর হচ্ছে তার জীবন-মরণের সাথী, একে বাদ দিয়ে তার এক মুহূর্ত্ত কাটাবার উপায় নেই। এর কোনও অংশ একটু বিকল হ'লে তার ফল কত বিষময় হ'তে পারে; কারণ অসুস্থ শরীরের মত অভিশাপ আর নেই। মনের ওপরেও তার প্রভাব অপরিসীম।

কাজেই যত দিন বেঁচে থাকতে হবে, সুস্থ দেহে মানুষের মতই যাতে বেঁচে থাকা যায় তার চেষ্টা করা উচিত। আমার এক পূর্ব্ববঙ্গীয় আত্মীয় বলতেন, "আমসত্ব হইয়া বাচনের কোন কাম?"—অর্থাৎ আমসত্বের মত শুঁটকো হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি? যদি বাঁচতেই হয় তবে আমের মত সজীব হয়েই বাঁচব। জীবনকে সব দিক্ দিয়ে পূর্ণ ক'রে গড়ে তুলতে পারলে তবেই না তার নাম বাঁচা? অটুট স্বাস্থ্য ছাড়া তা কখনও সম্ভব নয়। আর অটুট স্বাস্থ্য পেতে হ'লে নিয়মিত শরীরচর্চ্চার প্রয়োজন।

শরীরচর্চ্চা বলতে অনেকের একটু ভুল ধারণা আছে। শরীরচর্চ্চা বললেই যে বড় বড় পালোয়ানদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করা বা নানা রকম কসরৎ দেখান বোঝায় তা যেন মনে ক'র না। শরীরকে সুস্থ, নীরোগ রাখা, নিত্যকার প্রয়োজনীয় কাজের উপযুক্ত ক'রে গড়ে তোলা—এক কথায় ইরেজীতে যাকে বলে 'টু কীপ্ দি বডি ফিট্', শরীর চর্চ্চার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাই। এ জন্য আধুনিক ব্যায়ামীরা তিনটে জিনিষের ওপর খুব ঝোঁক দেন। এগুলি সম্বন্ধে মোটামুটী একটু জ্ঞান না থাকলে ঠিক মত শরীরচর্চ্চা কঠিন হয়ে পড়ে। এগুলি হচ্ছে: প্রথম—শরীরের গঠনপ্রণালী, কোথায় কোন্ কলকব্জা বসানো আছে তা জানা। দ্বিতীয়—শরীরের কোন্ কলকব্জা কি ভাবে চলে, কোন্‌টাতে কি কাজ হয় সে সম্বন্ধে ধারণা থাকা, এবং তৃতীয়—কি উপায়ে এদেরকে মজবুত রেখে ঠিক ভাবে পরিচালনা করা যায় তা বার করা এবং সে সব নিয়ম মেনে চলা।

এক সময়ে লোকের, এমন কি পালোয়ানদেরও, ধারণা ছিল মাংসপেশী, বুক এবং বাহুর গড়ন সুপুষ্ট হ'লেই বুঝি শরীর খুব ভালো হ'ল। এখন সে ধারণা বদলে গেছে। এখনকার ব্যায়ামীরা জানেন, শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ পুষ্ট না হ'লে সম্পূর্ণ শরীর গড়ে ওঠে না। বুকের ছাতি এবং বাহুর পেশী বাড়াতে গিয়ে পেট, কোমর বা পা তদনুযায়ী দুর্ব্বল হয়ে পড়লে তাকে সত্যিকার শরীর-গঠন বলা চলে না। কাজেই শরীরচর্চ্চায় এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যাতে সমস্ত অঙ্গ সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এরই নাম আসল ব্যায়াম। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আর একদিন ভালো ক'রে আলোচনা করা যাবে।

তুমি কি জান

সা রে গা মা: গান শিখতে গেলে প্রথমেই শিখতে হয় সা রে গা মা পা ধা নি। যারা গান জানে না তারাও এই শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু আসলে এগুলি কি জান?—এক একটি স্বরের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ। সঙ্গীত শাস্ত্রে স্বরকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা—ষড়্‌জ, ঋষভ গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ। এদেরকেই সংক্ষেপে বলা হয় সা রে গা মা পা ধা নি।

ত্রিশরণ: এই শব্দটির ব্যবহার মাঝে মাঝে তোমরা নিশ্চয়ই পেয়েছ। এটি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি মন্ত্র। মন্ত্রটি হচ্ছে "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং

শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"। অর্থাৎ 'বুদ্ধের শরণ নিলাম, ধর্ম্মের শরণ নিলাম, সঙ্ঘের শরণ নিলাম'। এই তিন শরণ থেকে মন্ত্রের নাম হ'ল ত্রিশরণ।

বাস্: ট্রাম আর বাস্ আমাদের শহরের জীবনের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে ও ছাড়া এখন আমাদের চলাফেরাই অসম্ভব ব'লে মনে হবে। বাস্ শব্দটি কি ক'রে হ'ল শোন। আসল কথাটা হচ্ছে 'ওম্‌নিবাস্'। 'বাস' হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত রূপ। বিলেতে এখনও বেশীর ভাগ লোক ওকে 'ওম্‌নিবাসই' বলে। ওম্‌নিবাস্ কথাটার মানে 'সকলের বাহন'—অর্থাৎ যাতে সকলেই চড়তে পারে। ওম্‌নিবাসের চলন, যতদূর জানা গেছে, প্রথম হয় ফ্রান্সের প্যারিস্ শহরে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে। তখন অবশ্যি মোটরের আবিষ্কার হয় নি—সে 'বাস্' টানত ঘোড়ায়। কলকাতায় মোটর বাসের প্রচলন ২৫ বছরও হয় নি।

আবার হিন্দী শেখা

গত বছর (১৩৫৫ সালে) রামধনুতে ধারাবাহিক ভাবে 'হিন্দী শেখা' বিভাগটি দেওয়া হয়েছিল। তা'তে হিন্দী শেখার প্রাথমিক বিষয়গুলি,—যেমন ধর উচ্চারণ এবং ব্যাকরণের মোটামুটি নিয়মকানুনগুলি, উল্লেখ করা হয়েছিল। এর পরের ধাপ হচ্ছে হিন্দী বই পড়া এবং শুদ্ধ হিন্দী লিখতে শেখা। এবারে তাই নিয়ে একটু আলোচনা করব।

তোমাদের মধ্যে যাদের কাছে ১৩৫৫ সালের রামধনু আছে তারা পুরোনো পাঠগুলো একটু ঝালিয়ে নিতে পার।

নীচে একখানি হিন্দী বই থেকে খানিকটা নমুনা অংশ তুলে দিচ্ছি। এর ঠিক ঠিক উচ্চারণ এবং অর্থ বার করার চেষ্টা কর এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে যাও শব্দের লিঙ্গ অনুযায়ী বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদ কেমন ক'রে বদলে যাচ্ছে। কোন্ শব্দ কোন্ লিঙ্গ তাও এ থেকে কিছু কিছু জানতে পারবে। পরে তোমার উত্তর নীচের দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

নমুনা—"জহাজ সমুদ্রমেঁ চলনে লগা। ব্যাপারী পহলে কভী জহাজপর নহীঁ চঢ়া থা। সমুদ্রকা নীলা পানী ঔর উপর নীলা আকাশ দেখকর উসকো বড়ী খুশী হুঈ।

"থোড়ী দের বাদ হবা তেজ হুঈ। সমুদ্রকী লহরেঁ উছলনে লগী। জহাজ ডোলনে লগা। সৌদাগর ঘবড়ায়া। বহ রোনে লগা।"

উত্তর (১) উচ্চারণ:—"জহাজ্ সমুদ্র্‌মেঁ চল্‌নে লগা। ব্যাপারী পহ্‌লে কভী জহাজ্‌পর্ নহীঁ চঢ়া থা। সমুদ্র্‌কা নীলা পানী অ-অর্ উপর্ নীলা আকাশ্ দেখ্‌কর্ উস্‌কো বড়ী খুশী হুঈ।

"থোড়ী দের্ বাদ্ হওয়া তেজ্ হুঈ। সমুদ্র্‌কী লহ্‌রেঁ উছল্‌নে লগী। জহাজ্ ডোল্‌নে লগা। স-অদাগর্ ঘব্‌ড়ায়া। উয়হ্ রোনে লগা।" (অ-কারান্ত শব্দের উচ্চারণ ঠিক 'অ' নয়, অ ও আ'র মাঝামাঝি।)

(২) অর্থ:—"জাহাজ সমুদ্রে চলতে লাগল। ব্যবসায়ী আগে কখনও জাহাজে চড়ে নি। সমুদ্রের নীল জল আর উপরের নীল আকাশ দেখে তার খুব আনন্দ হ'ল।

"অল্পক্ষণ পর হাওয়া জোরাল হ'ল, সমুদ্রের ঢেউ উছলাতে লাগল। জাহাজ দুলতে লাগল। সদাগর ঘাবড়ে গেল। সে কাঁদতে লাগল।

জহাজ পুংলিঙ্গ, খুশী, দের, হবা এবং লহর স্ত্রীলিঙ্গ।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

এ সংখ্যা তোমাদের সামনে হাজির করতে বেশ একটু দেরী হয়ে গেল। অপরাধ অমার্জ্জনীয় সন্দেহ নেই, তবে মাঝে মাঝে ছাপাখানার গণ্ডগোলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ রকম ব্যাপার ঘটে যায়, যার ওপর আমাদের কোন হাত থাকে না। সুতরাং তোমরা নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না।

ইতিমধ্যে চিঠির ঝাঁপিতে এত চিঠি জমে গেছে যে জবাব দিতে কয়েক সংখ্যা লাগবে। বিশেষতঃ এবারে একেবারেই স্থানাভাব। এবার থেকে যারা নতুন চিঠি পাঠাবে তারা জবাবের জন্য অন্ততঃ কয়েক সংখ্যা অপেক্ষা করবে এই অনুরোধ।

শ্রীতরুণ সান্যাল (বর্ধমান)—তুমি যে অভিযোগ করেছ তা গুরুতর। আষাঢ় সংখ্যা রামধনুতে প্রকাশিত শ্রীহিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য লিখিত 'ঝড় ও বৃষ্টি' কবিতাটি সাপ্তাহিক 'সৈনিকে' বেরিয়েছিল শ্রীবিকাশ বসু এই নামে। কোন্‌টা আগে বেরিয়েছিল জানতে পারলেই আমরা এ বিষয়ে যা করবার করব। তোমার চিঠিতে অনেক ভাববার বিষয় আছে। শ্রীমুকুলরাণী মণ্ডল (কশাড়িয়া)—কবিতা দিলেই কি সঙ্গে সঙ্গে বেরোয়? বহু কবিতা জমে থাকে যে! ধৈর্য্য ধরতে হবে অনেক দিন। শ্রীশম্ভুনাথ সিংহ (রামগোপালপুর)—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এবারে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীরাধাবিনোদ সুরাল (শিলদা)—স্থান বাঁচাবার জন্যই ঐ ব্যবস্থা, নইলে আমরা সকলেই শ্রী-যুক্ত। এম্. এ. সালেহিন (এবাদুল্লা) (রাজশাহী মুসলিম হাই স্কুল, নবম শ্রেণী)—তোমার অনুরোধ মত সবাইকে জানাচ্ছি যে তুমি ডিব্রুগড়ের কোন গ্রাহকের সঙ্গে আলাপ করতে চাও এবং ওখানকার খবর জানতে চাও। 'ঘৃণার' কথা ওঠে কি ক'রে বুঝলাম না। শ্রীরুণু বসু (কাঁচড়াপাড়া)—ক্যাপ্‌টেন ব্যানার্জির পরামর্শ মেনে চোখের উপকার পেলে কি? নালন্দা সম্বন্ধে আলাদা প্রবন্ধ দেবার ইচ্ছা রইল। শ্রীরীণা সেনগুপ্ত (পাটনা)—তুমি গ্রাহিকাদের ভিতর লেখনীবন্ধু চাও এ খবর জানিয়ে দিলাম। যারা তোমার ঠিকানা চাইবে তাদের জানিয়ে দেব। এবার ম্যাট্রিক দিচ্ছ জেনে খুশী হলাম। শ্রীবিমলভূষণ রায় (কলিকাতা-৯)—ফটো বিভাগ আগামী বৈশাখ থেকেই সুরু করা হবে ঠিক হ'ল। রামধনু-সম্পাদককে ছুটীর দিন বাদে দুপুরে ২—৫টায় রামধনু কার্য্যালয়ে পাবে। টেলিফোন: সাউথ ১২৬। শ্রীবেণু ঘোষ (দিনাজপুর)—পুরোনো রামধনু পাঠিয়েছি, পেয়েছ কিনা জানাবে। শ্রীসুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়—তোমার কথামত জানাচ্ছি ইতিমধ্যে 'পরিবর্তন' নামে ছোটদের একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র তৈরী হয়েছে। ছবিটি দেখে আমাদের বেশ ভালো লাগল। নিখুঁত না হ'লেও স্কুলের ছেলেদের জীবনযাত্রা নিয়ে তৈরী এই বইটি সর্ব্বাংশে ছোটদের উপযোগী হয়েছে। পথপ্রদর্শক হিসাবে এর উদ্যোক্তারা নিশ্চয়ই অভিনন্দন পাবার যোগ্য।

কিন্তু আজ এখানেই শেষ করতে হবে। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। জয় হিন্দ।

—ইতি রাঃ সঃ

শোকসংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, তোমাদের প্রিয় লেখক, রামধনুর পরম বন্ধু নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় আর ইহলোকে নেই। গত ২৮শে নভেম্বর অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি চলে গেছেন। তাঁর জীবন-কথা তোমাদের আগামী বারে বলব।

মোহনবাগানের হীরক-জয়ন্তী

বাংলার ফুটবল ক্লাবগুলির মধ্যে মোহনবাগানের মত জনপ্রিয় বোধ হয় আর কোনটাই নয়। এর কারণ, কলকাতার খেলার মাঠে যখন ইংরেজ খেলোয়াড়দের প্রতিপত্তি ছিল একচেটিয়া তখন বাঙ্গালীদের মধ্যে মোহনবাগানই প্রথম তাদের সমকক্ষ হয়ে দেশবাসীর মুখ উজ্জ্বল করে। ১৯১১ সনে যখন সমস্ত হোমরা-চোমরা বিদেশী দলকে হারিয়ে মোহনবাগান আই. এফ্. এ শীল্ড বিজয়ী হ'ল তখন সমস্ত দেশ যুড়ে যে প্রবল আনন্দ-উল্লাস দেখা গিয়েছিল সে কথা ভুলবার নয়। কিছুদিন ধরে পথে-ঘাটে লোকের মুখে সর্ব্বদা ছিল ঐ এক কথা। ছেলেরা ছড়া কাটত—

"সাবাস্ সাবাস্ মোহনবাগান, খেলেছ তো
ভাই বেশ!
গোল দিয়েছে গোরা দলে—বাঙ্গালীদের জিৎ।
আজকের এই জয়ের কথা ভুলবে নাকো দেশ।"

বাস্তবিক দেশ সে কথা ভোলে নি। তারপর আরও অনেক ভারতীয় দল আই. এফ. এ শীল্ড জিতেছে, নানা দিকে হয়তো আরও কৃতিত্ব দেখিয়েছে, কলকাতার মাঠে ইংরেজ খেলোয়াড়দের সব দিক্ দিয়ে হঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ১৯১১ সনের সে বিজয়-কাহিনী ইতিহাসের পাতায় তেমনি জ্বল্ জ্বল ক'রে জ্বলছে।

অবশ্যি, মোহনবাগান সম্বন্ধে আর একটা বড় কথা, আজ পর্য্যন্ত মোহনবাগানের খেলার 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' তেমনি অব্যাহত আছে। ইতিমধ্যে কত দল উঠল, নামল, কিন্তু মোহনবাগান তেমনি মাথা উঁচু ক'রে আছে। শুধু ফুটবলে নয়, খেলাধূলার অন্যান্য বিভাগেও মোহনবাগানের নাম বড় কম নয়।

এ বছর এই ক্লাবের বয়স হ'ল ষাট বছর। সেই উপলক্ষ্যে সমারোহের সঙ্গে এর হীরক-জয়ন্তী উৎসব হয়ে গেল। আমরা এই সুযোগে মোহনবাগানকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কলকাতায় সুইডিশ খেলোয়াড়ের দল

ফুটবল খেলায় বর্ত্তমানে সুইডেন হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় তারাই হয়েছে বিশ্ববিজয়ী বা ওয়াল্ড্ চ্যাম্পিয়ন্। সেই সুইডেনের একটি বিখ্যাত দল হেল্‌সিংবর্গ্ ক্লাব (যার মধ্যে কয়েকটী অলিম্পিক্ খেলোয়াড়ও ছিল) মোহনবাগানের

হীরক-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলকাতার মাঠে কয়েক দিন খেলে গেছে। ইতিমধ্যে তারা চীন, ব্রহ্মদেশ, হংকং প্রভৃতি জায়গায়ও খেলে এসেছিল এবং সেখানকার প্রত্যেকটি খেলাতেই জয়ী হয়ে এসেছিল। কলকাতায় এসে তাদের বিজয়-অভিযানে প্রথম বাধা পড়ল মোহনবাগানের কাছে। মোহনবাগানকে তারা হারাতে পারে নি, বরঞ্চ খেলায় মোহনবাগানই যেন জিতবার সুযোগ পেয়েছিল বেশী। খেলা শেষ পর্য্যন্ত ড্র হয় (০—০)। কিন্তু তার পর তারা ইষ্ট বেঙ্গলকে ২—০ গোলে এবং সম্মিলিত আই. এফ. এ দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। এই দলের গোলকীপারের (অলিম্পিক্-বিজয়ী) খেলা বহুদিন ক্রীড়ামোদীদের মনে থাকবে।

অন্যান্য খেলাধূলা

ইতিমধ্যে আরও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য খেলা হয়ে গেছে এবং হচ্ছে। কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের ২য় টেষ্ট হয়ে গেছে বোম্বাইএ। এ খেলাটি হয়েছে ড্র। (কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌—প্রথম ইনিংস্‌ ৪৪৮, ২য় ইনিংস্‌ ১১০ (৩ উইকেট)। ভারতীয় দল—প্রথম ইনিংস্‌ ২৮৯, ২য় ইনিংস্‌ ৪৩০ (৮ উইকেট ডিঃ)।

বাংলার ব্যাডমিণ্টন্‌ প্রতিযোগিতায় সিংগল্‌স্‌এ দেবীন্দ্রমোহন জর্জ্জ লুইস্‌কে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হয়েছেন (১৫-৬, ১৫-৪)। মেয়েদের সিংগল্‌সএ বিজয়ী হয়েছেন মিস্‌ পাল গস্‌, মিসেস নবীনা লুইস্‌কে হারিয়ে (১১-৭, ১১-৬)।

বঙ্গীয় লন্‌ টেনিস্‌ প্রতিযোগিতায় সুমন্ত মিশ্র নরেশকুমারকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্‌ হয়েছেন (৫-৭, ৪-৬, ৬-২, ৬-৩, ৬-২)।

নিখিল বিশ্ব শান্তি সম্মেলন

সম্প্রতি ভারতে নিখিল বিশ্ব শান্তি সম্মেলনের আয়োজন হয়েছে। পৃথিবীর ৩৩টি দেশ থেকে ৯১ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে। তার পর কলকাতায় এর প্রকাশ্য অধিবেশন হবার পর গান্ধীজীর সেবাগ্রামে এর পরবর্ত্তী অধিবেশন বসছে। যুগে যুগে ভারতবর্ষই পৃথিবীর দিকে দিকে শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার ক'রে এসেছে আর এই শান্তি-মৈত্রীর মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী। তাই বিশেষ ক'রে শান্তিনিকেতন ও সেবাগ্রামে এই সম্মেলনের স্থান নির্ব্বাচন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরলোকে

সম্প্রতি বাংলা-মা পর পর তাঁর কয়েকটি সুযোগ্য সন্তানকে হারিয়েছেন।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের নাম তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই অজানা নয়। কৃতী ছাত্র, কৃতী অধ্যাপক, কৃতী লেখক হিসাবে এবং অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রাজরোষে বহু দিন তাঁকে স্বদেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে কাটাতে হয়েছিল। এই সময়ে তিনি পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন দেশবাসীকে তার অংশ দিয়ে গেছেন। দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল

গভীর। দেশের তরুণরা যাতে সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠতে পারে সে জন্য তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। মাতৃভূমি থেকে বহুদূরে সুদূর ওয়াশিংটন সহরে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর জীবনদীপ নিভে গেছে।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষও ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌। অধ্যাপনা-ক্ষেত্রে এবং অধ্যক্ষ রূপে তাঁর যেমন সুনাম ছিল দেশপ্রেমের জন্যও তিনি তেমনি ত্যাগ স্বীকার ক'রে গেছেন। অধ্যাপক বিনয়কুমারের মত তাঁকেও দীর্ঘ ২০ বছর আমেরিকায় নির্ব্বাসিত জীবন কাটাতে হয়েছিল।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে আমরা বাংলার সম্ভবতঃ প্রবীণতম সাহিত্যিককে হারালাম। কেদারনাথ ছিলেন প্রায় রবীন্দ্রনাথেরই সমবয়সী। রসসাহিত্য রচনা ক'রে বাঙ্গালীর মুখে হাসি ফোটাবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তিনি। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন তাঁকে একাধিকবার সভাপতির পদে বরণ করেছিল; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ সম্মান জগত্তারিণী পদক দিয়ে সম্মানিত করেছিল। মানুষ হিসাবে কেদারনাথ ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক। মধুর ব্যবহারে তিনি সবাইকে মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনার ক'রে নিতে পারতেন।

পশ্চিম বাংলায় কুচবিহার

কুচবিহার রাজ্যটি ভারত রাষ্ট্রে যোগ দেবার পর সেটিকে এত দিন কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে রাখা হয়েছিল, যদিও ন্যায়তঃ ওটা বাংলা দেশেরই একটা অংশ। তোমরা শুনে সুখী হবে, আগামী ১লা জানুয়ারী থেকে কুচবিহার পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত হবে ব'লে ঠিক হয়েছে।

এত্তোটুকু ছেলে ?

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

কি হয়েছে খোকন, তোমার কি হয়েছে বলো,
কিসের তরে চক্ষু দু'টী অশ্রু-ছলোছলো ?
কারুর সনে কও নি কথা, গোম্‌রা মুখে রও,
কেউ কি তোমায় গাল দিয়েছে ? —সত্যি ক'রে কও।
ছোড়্‌দি সাথে আড়ি বুঝি পশম বোনা নিয়ে,
মিন্টি বোধ হয় দেবে না তার রাঙা কনের বিয়ে ?
পাও নি বুঝি সকাল থেকে মায়ের সোহাগ-চুমা,
বক দেখিয়ে পালিয়ে গেছে পাশের বাড়ীর উমা ?

হোঁৎকা হাঁদা বিচ্ছু কেলো লজেঞ্চুসের ভাগ
দেয়নি বুঝি, খোকনমণি, তাই কি হ'ল রাগ ?
মিষ্টি মাসীর কুলের আচার পাও নি এবার খেতে,
ঘুমের ঘোরে নস্তু বোধ হয় খামছে দেছে রেতে ?
হয় নি কি গো নতুন স্যরের ইতিহাসের পড়া,
জামাইবাবু তোমার নামে লিখলো বুঝি ছড়া ?
ঠান্‌দি বোধ হয় বলতে না চায় রূপকথা এই শীতে,
দাতুর ধমক খেলে, পেনের খাপটা খুলে নিতে ?
বাবার কাছে উড়ো-গাড়ী খুঁজছো ক'দিন ধরে,
পাওনি বুঝি, তাই খোকনের তু' চোখে জল ঝরে ?
"তোমরা সবাই যখন তখন"—খোকন কেঁদে ফেলে,
"বলবে খোকা,—আমি কি আর এত্তোটুকু ছেলে ?"

———

ষষ্ঠ

এই গভীর অরণ্যে এমন এক পরমা সুন্দরীর আকস্মিক আবির্ভাব একেবারেই অপ্রত্যাশিত। স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস হয় না। এ কি বনদেবী, না চোখের মায়া ?

অহত হরিণটা তখন টুনুর আলিঙ্গনের ভিতরে একেবারে এলিয়ে পড়েছে, পালবার চেষ্টাটুকু করবার শক্তিটুকুও তার নেই।

মেয়েটি করুণ স্বরে বললে, "ওরে আমার হরিণরে, কোন্ নিষ্ঠুর তোকে মেরেছে ? আহাহা, তোর গা দিয়ে যে রক্ত ঝ'রে পড়ছে !"

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে নরেন্দ্র পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে। মেয়েটি হঠাৎ চোখ তুলে ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "কে তুমি ? কেন আমার হরিণকে মেরেছ ?"

নরেন্দ্র বিস্মিত স্বরে বললে, "তোমার হরিণ ?"

মেয়েটি বললে, "হ্যাঁ, আমার হরিণ। এ বনে যত হরিণ আছে সব আমার। কেন তুমি এর গায়ে গুলি মেরেছ ?"

নরেন্দ্র অপরাধীর মত আস্তে আস্তে বললে, "আমি তো একে মারি নি !"

—"তবে কে একে মারলে ?"

—"বোধ হয় আমার কোন বন্ধু।"

পিছন থেকে কর্কশ হেঁড়ে গলায় কে বললে, "আমি মেরেছি এই হরিণটাকে।"

তু'জনেই সচমকে ফিরে দেখলে, একটা নূতন লোক সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ভীষণ তার চেহারা। প্রকাণ্ড, সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ, গায়ের রঙ্ কালো-কুচকুচে। আতুড় গা, কোমর বেঁধে মালকোঁচা মেরে কাপড় পরা, ডান হাতে একটা বন্দুক।

এই পরমা সুন্দরী কন্যাটির মত এখানে ঐ বীভৎস ও বিভীষণ মূর্ত্তিটির আবির্ভাবও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। মেয়েটি তাকে দেখে ভয় পেয়ে নরেন্দ্রের মুখের পানে তাকিয়ে বললে, "এই কি তোমার বন্ধু ?"

নরেন্দ্র মাথা নেড়ে বললে, "না, আমার কোন বন্ধুরই চেহারা এমন উল্টো-কার্ত্তিকের মত নয়।"

লোকটা হুমকী দিয়ে ব'লে উঠল, "মুখ সামলে কথা কও হে ছোকরা, সাক্ষাৎ যমকে ঠাট্টা করবার চেষ্টা কোরো না। জানো, আমি কে ?"

নরেন্দ্র বললে, "জানি না। জানবার ইচ্ছেও নেই।"

লোকটা শুকনো হাসি হেসে বললে, "আমারও গায়ে প'ড়ে পরিচয় দেবার ইচ্ছে নেই। এখন বাজে কথা থাক্। এই ছুঁড়ী, দে, হরিণটাকে ছেড়ে দে !"

হরিণটাকে আরও ভালো ক'রে জড়িয়ে ধরে মেয়েটি বললে, "না, একে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।'

লোকটা ব'ললে, "কিছুতেই ছাড়বি না ? আচ্ছা, ছাড়িস্ কিনা দেখা যাক্। আমার শিকার আমি নিয়ে যাবই।" বলতে বলতে সে এগিয়ে এল।

মেয়েটি প্রাণপণে চীৎকার ক'রলে, "রুণু! রুণু! শীগ্‌গির এসো, এই যমদূতটাকে তুলে আছাড় মারো! রুণু! রুণু!"

লোকটা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নরেন্দ্র অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগল, রুণু আবার কে? নামটি তো মেয়েলী, তা'র গায়ে এমন কি শক্তি আছে যে তুলে আছাড় মারবে এই যমদূতটাকে!

প্রশ্নের উত্তর পেতে বিলম্ব হ'ল না। দেখা গেল, বন ভেঙে, মাটি কাঁপিয়ে, শুঁড় তুলে ধেয়ে আসছে প্রকাণ্ড এক ক্রুদ্ধ মাতঙ্গ।

ষণ্ডা লোকটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে টুনু হুকুম দিলে, "রুণু! এই লোকটা আমায় ভয় দেখাচ্ছে! ওকে তুমি শাস্তি দাও।"

সক্রোধে গর্জ্জন ক'রে উঠল রুণু।

নরেন্দ্র সভয়ে নিজের হাতের বন্দুকটার দিকে তাকালে। এ হাতী-মারা বন্দুক নয়, এর গুলিতে ঐ মত্ত মাতঙ্গের কিছুই হবে না। সে তখনি বুদ্ধিমানের মত সেখান থেকে দৌড় মেরে স'রে পড়লে।

ষণ্ডা লোকটাও ত্রস্তভাবে বেগে পাশের জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল এবং রুণুও ছুটল তার পিছনে পিছনে।

টুনু দুই হাতে হরিণটাকে ধরে দাঁড়িয়ে উঠল। ছোট্ট হরিণ, তাকে তুলতে তার কিছুই কষ্ট হ'ল না। তারপর সে তার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বললে, "চল তো ভাই হরিণ, এইবারে আমরা দু'জনে বাড়ী ফিরে যাই।"

সপ্তম
বনদেবীর ঠিকানা

জমিদার-বাড়ীখানি বেশ বড়সড়। চারিদিকে ঘেরা জমির ভিতরে সাজানো ফল-ফুলের বাগান, তারপর একটি বড় পুষ্করিণী, তার চারধারের চারটি ঘাট মার্ব্বেল পাথরে বাঁধান। সেই পুষ্করিণীর উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে টুকটুকে লাল রঙের প্রাসাদখানি যেন কালো জলের ভিতরে নিজের ছায়া দেখবার চেষ্টা করছে। বাগানের ফটকে বন্দুকধারী দ্বারী, এবং বাড়ীর প্রধান দরজার পাশে একখানি টুলের উপরে বসে একটা ভোজপুরী দ্বারবান বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে খৈনি পিষতে পিষতে ভোরের ভজন ভাঁজছে—

"মনোয়া, ভজ লে সীতারাম।
ভজ লে সীতারাম, মনোয়া,
কাহে না জপতে নাম।"

গাড়ী-বারান্দার উপরে একখানি চেয়ারের উপরে ব'সে নরেন্দ্র নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে পুষ্করিণীর দিকে।

পুকুরে বাতাসে-দোলানো ও ছোট ছোট ঢেউ-খেলানো স্নিগ্ধ জলের উপরে এসে পড়েছে প্রাতঃসূর্য্যের সোনালী আলোর মায়া। ওখানে পদ্মকুঞ্জের উপরে গুঞ্জন ক'রে উড়ছে মধুকরপুঞ্জ। এখানে সন্তরণ-পুলকে মেতে উঠেছে মরাল আর মরালীরা। কোথাও বা টুপটুপ ক'রে জলের ভিতরে ডুব দিচ্ছে ডাহুক পাখীরা।

কিন্তু পুকুরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও নরেন্দ্র এ-সব কিছুই লক্ষ্য করছিল না। তার দৃষ্টি চলে গিয়েছে তখন গহন বনের অন্তঃপুরে।

সেই অপূর্ব্ব রূপবতী মেয়ে! কে সে? বনের আনাচে-কানাচে কয়েক ঘর বাসিন্দা আছে বটে, কিন্তু তারা তো, আমরা যাকে বলি ছোটলোক! তাদের ঘরে অমন অদ্ভুত রূপের জন্ম হওয়া কি সম্ভব? না, কখনই নয়। কিন্তু—

কিন্তু ও যে বনের মেয়ে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তার ভাবভঙ্গী, তার কথাবার্ত্তা ও তার সাজ-পোষাকে কোথাও নেই নাগরিকতার ছাপ। এ এক আশ্চর্য্য সমস্যা!

বলে কিনা, 'বনে যত হরিণ আছে সব আমার!' আবার ও ডাক দিলে সাহায্য করতে ছুটে আসে মত্ত মাতঙ্গ! এমন ব্যাপার কেউ কখনো দেখেছে, না এ সব কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে? হয়তো বনের বাঘগুলো পর্য্যন্ত ঐ মায়াবিনীর পোষ মেনেছে!

হোক মায়াবিনী, হোক কুহকিনী, কিন্তু কী সুন্দরী!

যেমন ক'রে হোক, তার সঙ্গে পরিচয় করতেই হবে। আজকেই আবার যাব আমি বনের ভিতরে।

সঙ্কল্প স্থির ক'রে নরেন্দ্র চেয়ার ছেড়ে বাড়ীর ভিতরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পোষাক বদলে বেরিয়ে এল আবার বাড়ীর ভিতর থেকে। সেদিন আর কোন বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে নিলে না সে।

আজ নরেন্দ্র একখানি সাইকেলের আরোহী। মাইল দশেক পথ পায়ে হেঁটে পার হ'তে কম সময় লাগে না। তাড়াতাড়ি কালকের ঘটনাস্থলে গিয়ে

পৌঁছবার জন্যে আজ সে সাইকেলের সাহায্য গ্রহণ করেছে। অবশ্য আজও সে নিরস্ত্র নয়, তার পিঠে বাঁধা একটি বন্দুক।

ঘণ্টা দুই পরে সে বনের প্রান্তদেশে এসে প'ড়ল। আরো খানিকটা এগুবার পর পায়ে-চলা পথের রেখাটি হ'য়ে গেল লুপ্ত এবং অত্যন্ত ঘন হ'য়ে উঠল বনজঙ্গল। নরেন্দ্র তখন বাধ্য হ'য়ে নেমে প'ড়ে সাইকেলখানি একটা ঝোপের ভিতরে রেখে দিয়ে পদযুগলেরই সাহায্য গ্রহণ ক'রলে।

প্রায় আধঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল আবার সেই কালকের ঘটনাস্থলটি। কিন্তু আজ সেখানে জনপ্রাণী নেই। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধ'রে এদিকে-ওদিকে ঘোরাঘুরি করলে, কিন্তু কোথায় সেই আশ্চর্য্য মেয়ে?

এক জায়গা দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ছুটে চলে গেল একপাল বন্য বরাহ। মাঝে মাঝে দু'-একটা শৃগাল জঙ্গলের ভিতর থেকে একবার দেখা দিয়ে উঁকি মেরেই আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকারেই। শুক্‌নো পাতার ভিতরে এক জায়গায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল মস্ত একটা কালো সাপ, নরেন্দ্রের পায়ের শব্দে চমকে উঠে ফণা তুলে তীব্র দুই চক্ষে জ্বলন্ত ঘৃণা বৃষ্টি ক'রে সাঁৎ ক'রে ঢুকে গেল কোন্ অন্তরালে। এক জায়গায় গাছের উপরে মুখ খিঁচিয়ে কিচির-মিচির ক'রে গালাগাল দিয়ে উঠল একদল বাঁদর, এখানে নরেন্দ্রের মত চেহারা দেখতে তারা অভ্যস্ত নয়।

একটা গাছের গোড়ায় পা ছড়িয়ে ব'সে প'ড়ে নরেন্দ্র শুনতে লাগল এখানে-ওখানে বুনো কপোতদের ক্লান্ত-কাতর ঘু ঘু ঘু ঘু স্বর। গাছের তলায় ঝিলমিল করছে আলো আর ছায়া। ওদিকের স্নিগ্ধ-সবুজ মাঠটির উপরে সচল ছবির মত পট-পরিবর্ত্তন করছে আলো আর ছায়া, ছায়া আর আলো। চারিদিকে বেশ একটি নিশ্চিন্ত শান্তির ভাব। নরেন্দ্রের দুই চোখে লাগল ঘুমের আমেজ। কিন্তু হিংস্র জন্তুদের এই স্বদেশে ঘুমিয়ে পড়বার ভরসা হ'ল না তার। জোর ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাত তুলে 'আলিস্যি' ভেঙে নরেন্দ্র নিজের মনেই বললে, "নাঃ, বনদেবী দেখছি আজ আমার উপরে সদয় হবেন না! বেলাও হয়েছে, ক্ষিদেও পেয়েছে। আজকের মত এইখানেই বনবাসের ইতি করা যাক্......"

(ক্রমশঃ)

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

বিকেলের গান

শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী

গাছের সবুজে সোনার রোদের অঞ্জলি ;
মৃদুলা বাতাসে শাখা-পল্লব চঞ্চলি'
রঙের জোয়ারে আকাশের প্রাণ উচ্ছলি'
এসো বিকেল!

মাথার উপরে মৌন আকাশ শান্ত নীল,
মন্দ বাতাসে ডানা মেলে ভাসে ক্লান্ত চিল,
সবুজের ফ্রেমে মোড়া ওই দূরে স্বচ্ছ বিল।
এসো বিকেল!

এসেছে বিকেল—সোনার বিকেল কোথা থেকে,
মনের খাতায় রসের লিখন গেছে এঁকে,
ক্ষণিকের তরে আমারে সে আজ গেল ডেকে।
আহা বিকেল!

তরুণের ব্রত এই

এ. এস্. নূর মোহাম্মদ

সাহারার মরুভূমি—জল নেই,
কাঠ-ফাটা রোদ্দুর জ্বলছে ;
যাত্রীরা হারিয়েছে সব খেই,
ক্যারাভান্ নিঃসাড়ে চলছে।
কারো শিরে নাই কোন আবরণ,
সন্ধানী-আলো কেউ জ্বালে নাই ;
আঁধি আর মানুষের চলে রণ,—

ধ্রুবতারা কালো মেঘে ঢাকা, ভাই!
খাবারের থলিয়ায় সব শেষ,
বেদুইনও আঁধারেতে ঘুরছে ;
বাঁচবার আশা আর নাই লেশ—
আকাশেতে শকুনিরা উড়ছে।
মরণের হাত থেকে ইহাদের
বাঁচানোর কাজ, ভাই, তরুণের।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

পশ্চিম বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ ভবন
কবিরাজ শ্রীঅতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
বিনা মূল্যে রোগী দেখা হয়।

উত্তরদাতাদের নাম :—মঞ্জু, মা, লব, কুশ, বাপ্পা (ভবানীপুর); সুমান্ত গংগোপাধ্যায় (কলিকাতা-২৬); শ্রীপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ (কাজলধারা—শ্রীহট্ট); শ্রীরাধাবিনোদ সুবাল, সমরেন্দ্র, গৌরী (শিলদা—মেদিনীপুর); শম্ভু নাথ ও বিষ্ণুপদ সিংহ (রামগোপালপুর); গৌরী, ছায়া, শাস্তি, চিত্ত, বিভা, স্বপ্না, মিন্টু (জলপাইগুড়ি); দেবু, চন্দন, সুভাষ, বিবেক, টুটুল, নারু, নিখিল, অনিল (জলপাইগুড়ি); বিভাসবিহারী বসু (পাটনা); নিতাইচন্দ্র রায় (পানিহাটী); দ্বিজেশ, সুশীল, শৈলেশ, নিশি, নরেন্দ্র (কলিকাতা ২৯); রমা মৈত্র (দিল্লী); প্রভা বসু (বালিগঞ্জ); ইলা সেন (কলিকাতা), কল্যাণ ও লীলা রায় (কলিকাতা); উমা চট্টোপাধ্যায় (কুচবিহার); সুদেব মুখোপাধ্যায় (পাটনা) এ. এস্. নূর মোহাম্মদ (আংশিক) (বাদলগাছি)।

নূতন ধাঁধা

এক কয়লার দোকানে একখানা ৩০ সের ওজনের পাথর ছিল। কয়লাওয়ালা সেই পাথরখানা দিয়ে খদ্দেরকে কয়লা ওজন ক'রে দিত। ফলে সকলকেই ৩০ সের ক'রে কয়লা নিতে হ'ত, কম-বেশী নেবার উপায় ছিল না।

একদিন একটি লোক দু'টো ঝুড়ি নিয়ে এসে বল্ল, "এ ঝুড়িতে ৫ সের আর এ ঝুড়িতে ১০ সের—মোট ১৫ সের কয়লা দেখি?" কয়লাওয়ালা বল্লে, "সে কি ক'রে হবে! আমার ৩০ সের ছাড়া ওজন করবার উপায় নেই।" ব'লে সেই পাথরটি বার ক'রে দেখালে। লোকটি বলল, "আচ্ছা, আমি এটাকে এমন ভাবে ভেঙ্গে দিচ্ছি যে এবার থেকে এর টুক্রোগুলোর সাহায্যেই তুমি ১ থেকে ৩০ পর্য্যন্ত যে কোন সের পরিমাণ কয়লা ওজন করতে পারবে। এই বলে সে হাতুড়ী দিয়ে পাথরটাকে পাঁচ টুকরো ক'রে ফেল্ল। কয়লাওয়ালা অবাক্ হয়ে দেখল সত্যি ঐ টুকরোগুলোর সাহায্যে ১ থেকে ৩০ পর্য্যন্ত যে কোন সের পরিমাণ কয়লা ওজন করা যাচ্ছে। বল দেখি পাথরের টুক্রোগুলোর কোন্‌টার ওজন কত হয়েছিল?

(এ মাসের ধাঁধার উত্তর ২৯শে পৌষ পর্য্যন্ত পাঠালেও চলবে।)

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

যমুনা
স্নানের সাবান

যে কোন ভাল সাবানের সমকক্ষ
অথচ মূল্য হিসাবে নিতান্ত সুলভ।

নিত্য ব্যবহারে অপরিহার্য

প্রতি বাক্সে ১২ খানি

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

সকলেই বলেন

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিশু-মাসিক

শুকতারা

- কবিতা
- জীবনী
- নাটক
- বিজ্ঞান
- ভূগোল
- গল্প
- ভ্রমণ
- খেলাধুলা
- বৈচিত্র্য
- বিদেশী সাহিত্য
- উপন্যা
- শিকার
- ব্যায়াম
- ইতিহা
- ধাঁধা-রহস

প্রত্যেকখানি ছয় আনা

ছেলেমেয়েদের কাগজে এমন নির্ভীক সমালোচনা সম্পূর্ণ নূতন। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, তাদের স্বাস্থ্য ও তাদের দেশ—সব-কিছুর আলোচনা একমাত্র "শুকতারায়ই" সর্ব্বপ্রথম।

বার্ষিক সডাক ৪৲

স্বাধীন দেশে আজ
এরই দরকার সবচেয়ে বেশী

ঝক্‌ঝকে চিত্র-সমুজ্জ্বল ! আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যের খনি !

দেব-সাহিত্য-কুটীর ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

...ব চৌধুরীর ঘড়ি	১।০
...রাগ	১॥০
...নার হরিণ	১॥০
...ন পুরাণ	৸৵০
...স্য ও রহস্য	৸৵০
...য়ের ধোঁয়া	৸০
...কাশির গল্প	৸০
...মাদম্ দামোদর (নাটক)	।৵০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের

মহাভারতের গল্পগুচ্ছ (১ম)	৸০
ঐ (২য়)	৸০
দিগ্বিজয়ী বীর	৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲

শিবরাম ও মনোরঞ্জনের

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে	৸৵০

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর

রং চং	৸০

শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়ের

নতুন কিছু	৸৵০

শ্রীমাধব্য ও শ্রীরসোদর শর্ম্মার

আজব গল্প	।৵০
অনেক গল্প	।৵০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	[illegible]
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲
আকাশের গল্প	১।০
আবিষ্কারের গল্প	৸০
ধূমকেতু	৸০
অয়েল পেন্টিং (নাটক)	।০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা	১॥০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি	৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

দি লাষ্ট্ অফ্ দি মোহিকান্স্	॥৵০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের

অলিভার টুইষ্ট	॥৵০

শ্রীলীলা মজুমদারের

বদ্যিনাথের বড়ি	৸০

মনোরঞ্জন ও ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

গল্পসল্প	।০
ছুটীর গল্প	।০

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়ের

যে জার্মানী হেরে গেছে	২৲
ইউরোপের আলো	১।০

শ্রীসুনীল ঘোষ সম্পাদিত

রাতের ছায়া	॥৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রমা রোড, কলিকাতা ২৫

Regd. No. C—1641

বাজে খরচ জিনিষটা কি ভাল ?

নিশ্চয়ই নয়,—বিশেষতঃ এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে।

কিন্তু একটির বেলায় একথা খাটে না—,
সেটি হচ্ছে বই কেনার বাজে খরচ।

বাইরে থেকে খরচ ব'লে মনে হ'লেও
আসলে এটি জমা;—মনের ভাণ্ডারে
এর সম্পদ্ জমা হয়ে থাকে অক্ষয় হয়ে।

বই মানুষের সুসময়ের সখা, দুঃসময়ের বন্ধু.
সঙ্গীহীনের সাথী

তোমরা জান কি ?

বাংলা ভাষায় আজকাল কত সুন্দর সুন্দর বই বেরোচ্ছে! এই সব বই সর্ব্বদা হাতের কাছে রাখতে ইচ্ছা করে না কি? সব রকম বইএর—সব রকম ভালো বইএর খবর জানতে হ'লে আমাদের কাছে লেখ বা নিজে এসে বেছে নাও।

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

—ছোটদের উপহারের সেরা বই—

ফ ট্ কে ৸৹

বড় বড় অক্ষরে ছাপা, পাতা-যোড়া ছবিতে ভরপুর

ছোটদের সচিত্র কৃত্তিবাস ৸৹

রঙিন কালিতে বড় বড় অক্ষরে ছাপা,
অসংখ্য ছবি।

কলিকাতার

পথের নিশানা ও তথ্যপঞ্জি ।৵৹

কলকাতার মানচিত্রসহ। সর্ব্বদা পকেটে রাখবার মত।

প্রাপ্তিস্থান : গ্রন্থজগৎ—৫২।৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড. কে. বি. দাশগুপ্ত—৭২।২, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা

কবি প্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু)

সম্পাদিত

ভাই-বোন

বার্ষিক ৪৲, ষান্মাসিক ২।৹, যে কোনো মাস থেকে যে কোনো মাস পর্য্যন্ত গ্রাহক হওয়া যায়। এমন দিন আসছে যে দিন প্রতি ঘরে ভাইবোনের জন্যে 'ভাই-বোন' না হলেই চলবে না। যারা দেখ নি, বিজ্ঞাপন শুধু তাদের জন্যে, নইলে গ্রাহকরাই এর চলন্ত বিজ্ঞাপন। এজেণ্ট কিংবা গ্রহক হবার জন্যে.—কার্য্যাধ্যক্ষ, ভাই-বোন কার্য্যালয়, ৪-এ ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা—৬

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তোমার সাধের ভারত আজি স্বাধীন হ'ল দু'শ' বছর পরে—
পূর্ব্ গগনে জাগ্‌ল ঊষা নব,
যেথা-ই থাক, হে নেতাজী, প্রণাম তোমায় জানাই বারে বারে
পুণ্য শুভ জন্মদিনে তব।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরক্ষিত

২২শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৫৬ { ১০ম সংখ্যা

সে রূপকথার দেশ

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

খড়ো ঘরের মুখ দেখি যে ধান-ক্ষেতের পারে,
রোদের আঁখি মারছে উঁকি বনের আঁধিয়ারে।
বাঁশ তেঁতুলের ঘন বনে হাঁপিয়ে ফেরে হাওয়া,
মেঠো পথের বুকটি ব্যাকুল বকুল দিয়ে ছাওয়া।
তালীবনে প'রে ময়ূরকণ্ঠী ভোরের চেলি,
কে যায় সবুজ ঘাসে কোটি ফুলের ফেণা ফেলি'।
দীপ্ত প্রবাল শিখা মত দূরে শিমুল-বন,
পাখীর মধুর বৈতালিকে জাগে মেঠো মন ;

গাছের সারি ছায়ার হাতে মোছে মাটির পথ,
শুকনো পাতা মাড়িয়ে ফেরে দমকা বায়ু-রথ;
শাখায় শাখায় গলাগলি, ভালবাসার সুর,
কাজলা নদী ছলছলিয়ে উধাও বহুদূর,—
এর মাঝে, মা, কোন্‌খানে বল্ সে রূপকথার দেশ—
নেইকো যেথায় গরীব ঘরের কান্না ব্যথা ক্লেশ!

সন্ধ্যা আসে ঘন বনের ছায়ার পথে হেঁটে,
রাতের কুসুম ফুটে ওঠে আঁধার মাটি ফেটে।
নদীর মেয়ে কুয়াশা ফুল ছড়ায় দু'টি হাতে,
চাঁদের বধূ দাঁড়ায় চুপে মেঘের দরজাতে;
চালের নীচে কপোত ঘুমায়, চখাচখি চরে,
বুনো ঘাসের বনে বাতাস কপাল খুঁড়ে মরে।
শাঁখের স্বরে চমকে ওঠে ঝিমিয়ে পড়া গ্রাম,
ঘাটের পথে ভরা ঘটের শব্দ অবিরাম;
বন-জোনাকি জ্বলে নেভে বনের মনের মত,
মাটির কান্না ঝিঁঝি স্বরে গুমরে অবিরত।
আকাশ ছাওয়া তারার বীণে বাজে আলোর সুর,
ঘুমতী নদীর পায়ে নাচে ঘুঙুর সুমধুর,—
এর মাঝে, মা, কোন্‌খানে বল্ সে রূপকথার দেশ—
নেইকো যেথায় গরীব ঘরের কান্না ব্যথা ক্লেশ

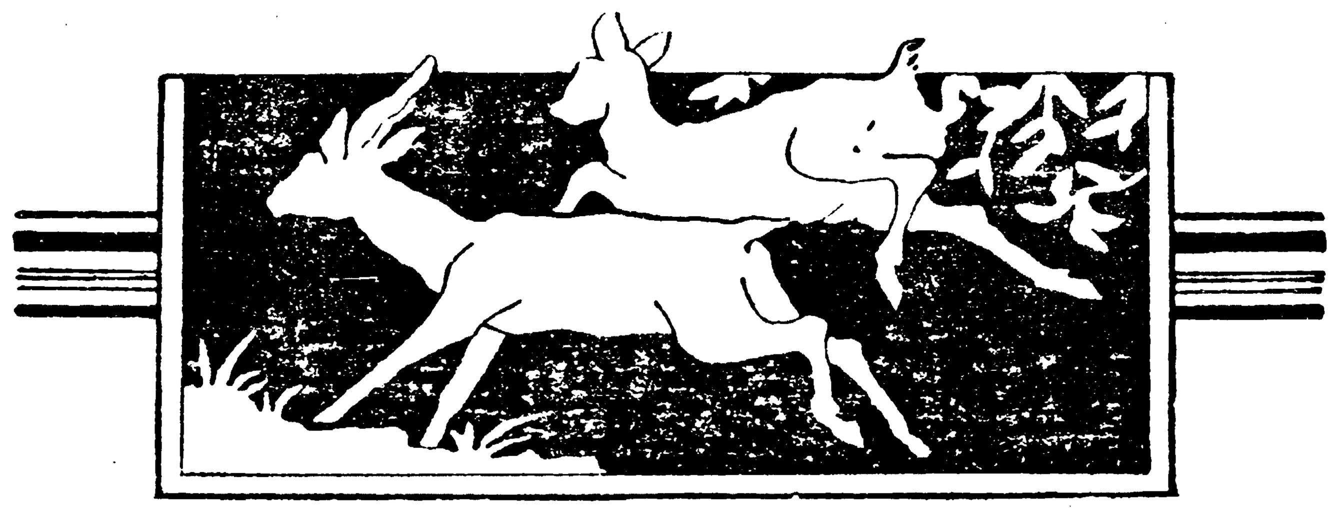

সূত্র

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

দেহটা সব আগে চোখে পড়লো খানসামার। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য! দশ বছর ধরে সে এখানে কাজ করছে—ব্যাঙ্কের মালিকের পেয়ারের খানসামা হয়ে; কিন্তু এহেন দৃশ্য সে আর কখনো দেখে নি। দেহটা পড়ে রয়েছে খাবার ঘরের মেজেয়। মালিকের আপন দেহ।

মালিক ধরাশায়ী। চেয়ারটা ওল্‌টানো। খাবার টেবিলে, পিরিচের ওপরে একটা অম্‌লেট আধ-খাওয়া অবস্থায়। ফলমূলরাও অবহেলায় পড়ে আছে। আর মালিক পড়ে আছেন অমলেটের থেকে পাঁচ হাত দূরে। তাঁর চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে, জিভ্ আধহাত বার করা। অম্‌লেটের জন্যই লালায়িত কিনা ঠিক করে বলা কঠিন।

মালিকের ইদানীং গবৃহজ্‌মি যাচ্ছিল। মেজাজটাও হয়ে উঠেছিল তিরিক্ষে। অম্‌লেটদের তিনি প্রীতির চক্ষে দেখতেন না আজকাল। কাউকেই না। তা হ'লেও তিনি অম্‌লেটের থেকে পাঁচ হাত পিছিয়ে থাকবেন এমনটা ধারণা করা যায় না। খানসামা এগিয়ে মালিককে তুলে ধরতে গেল। আর, ধরতে না ধরতেই টের পেল যে এখানকার অন্নজল তার উঠেছে। মালিকের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই। তাকে অন্যত্র খানসামাগিরির চাকরি খুঁজতে হবে এখন।

কর্ত্তার দেহত্যাগের জন্যে সে তেমন দুঃখ বোধ করল না। ইদানীং তিনি এমন খিটখিটে হয়ে উঠেছিলেন—দিনরাতই তাঁর মেজাজ চড়ে থাকত। কি ঘরের আর কি আপিসের, সবার সঙ্গেই এমন রূঢ় ব্যবহার করতেন যে তাঁর তিরোধানে কারোই বিচলিত হবার কথা নয়।

খানসামা কর্ত্রীর কাছে গিয়ে খবরটা নিবেদন করলো।

গিন্নী শুনে মর্ম্মাহত হলেন। "কী সর্ব্বনাশ!" তিনি বল্লেন, "টিকিটগুলো নষ্ট হোলো দেখছি! আজ আর তো তা হ'লে সিনেমায় যাওয়া যায় না!"

খানসামা ঘাড় নাড়লো।

"কী করতে হবে এখন?" শুধোলেন মালিকের স্ত্রী।

"আমি যদ্দুর জানি মা", জবাব দিলো খানসামা: "মানে, গোয়েন্দা-কাহিনীর বই পড়েই আমার জানা,—এ রকম অবস্থায় নাকি থানায় খবর দিতে হয়। পুলিস ডাকাই হচ্ছে দস্তুর।"

"হ্যাঁ, তাই বটে! বেসরকারি কোনো গোয়েন্দার সন্ধান না জানা থাকলে তাই করতে হয় বটে। নইলে প্রাইভেট গোয়েন্দারাই এসে খুনের কিনারা করে দেয়—পুলিসের এসে পড়বার আগেই। তাই না কি? তুমি কি বলো?"

"ডিটেকটিভ বইয়ে সে রকমও পড়েছি বটে।" খানসামা সায় দেয়।

"তা হ'লে মিষ্টার কল্‌কেকাশিকে টেলিফোনে খবর দাও। বিখ্যাত ডিটেকটিভ হুকা-কাশির ভায়রা ভাই কল্‌কেকাশি। তাঁর চেয়ে বড় সখের গোয়েন্দা আর কে আছে এখন? তা ছাড়া, ওঁর সঙ্গে কর্ত্তার বন্ধুতাও ছিলো খুব।"

রাগান্বিত হয়েই···সাড়া দিলেন।

শ্রীযুক্ত কল্‌কেকাশি মাঘের শীতে নিজেকে রাগ্‌-এ জড়িয়ে বসেছিলেন আরামে—এমন সময়ে ফোন্ এল। রাগান্বিত হয়েই টেলিফোনের ডাকে সাড়া দিলেন। কিন্তু খবর পেয়ে আর রাগত হয়ে থাকা গেল না। ছুটতে হোলো তাঁকে তক্ষুনি।

অকুস্থলে পৌঁছুতেই খানসামা তাঁকে নিয়ে গেল খানার ঘরে। হাজির করলো মালিকের কাছে। কর্ত্রীও গেলেন সাথে সাথে।

মালিক শুয়ে ছিলেন তেমনি।

ঝুঁকে পড়ে মৃতদেহটা পরীক্ষা করলেন কল্‌কেকাশি। কিন্তু পরীক্ষা করার কিছু ছিল না। মৃতদেহরা যেমন হয়ে থাকে—অবিকল সেইরকম! একেবারে নট্ নড়ন্ চড়ন্, নট কিচ্ছু।

'খতম্!" বল্লেন কল্‌কেকাশি: "সাবাড় করে দিয়েছে।"

খানসামা বল্‌লো—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কিন্তু করলো কে?" কল্‌কেকাশি প্রথমে খানসামা, তারপরে গিন্নীর মুখে তাকালেন। তারপরে কর্ত্তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন। কিন্তু তিনজনের কেউই তাঁর কথার জবাব দিতে পারলো না।

অতঃপর আবার তিনি কর্ত্তাকে নিয়ে পড়লেন। যদি কোনো সূত্র মেলে। কর্ত্তার বুক-পকেট হাতড়ে এক টুকরো কাগজ মিললো—সেটা পড়ে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল আরো। কাগজটা নিজের পকেটে পুরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন—"এবার আমি আপনাদের

কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। ইচ্ছে না করলে জবাব নাও দিতে পারেন। প্রথম কথা, তাঁর কি কেউ শত্রু দাঁড়িয়েছিল ইদানীং?"

কর্ত্রী খানসামার দিকে তাকালেন। তারপরে বল্লেন—"কই, শত্রুর কোনো খবর তো শুনি নি। বরং শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে উনি—"

"শত্রুতা না হোক—এমনি ঝগড়া?" বাধা দিয়ে বল্লেন কল্‌কেকাশি—"কারো সাথে বিশেষ ঝগড়াঝাঁটি হোতো কি ওঁর? পরিবারের মধ্যে কিম্বা বাইরে?"

"পরিবারের মধ্যে? না, এ প্রশ্নের আমি জবাব দেব না।" জানালেন মালিকের পরিবার।

"যে আজ্ঞে। এবার আমি তোমাকে একটা কথা শুধোব।" এই বলে কলকেকাশি খানসামার দিকে ফিরলেন: "আচ্ছা, তুমি বলতে পারো আজকাল সবার সঙ্গে ওঁর সদ্ভাব ছিলো, কেমন? আত্মীয়স্বজন কি আপিসের লোক—বন্ধুবান্ধব—অধীনস্থ কর্ম্মচারী—কিম্বা চাকরবাকর—সকলেই কি ওঁকে পছন্দ করতো বেশ?"

"আপনার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম।" জবাব দিলো খানসামা। —"মানে, আপনার ঐ চাকরবাকরের কথাটার।"

"আর আপনার প্রশ্নের প্রথম ভাগের—মানে, আত্মীয়স্বজনের বিষয়ে জানাতে আমার আপত্তি আছে।" বল্লেন কর্ত্রী।

"বহুৎ আচ্ছা।—এইবার আপনাদের পাচক ঠাকুরকে আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই ডাকবেন একবার তাকে?"

"ঠাকুরকে ডাকো।" কর্ত্রী খানসামাকে হুকুম দিলেন।

ঠাকুর এলো। উড়িষ্যাজাত নয়, বাঙালী ঠাকুর। ভীতভাবে এলো। খবরটা সে পেয়েছিল আগেই।

"এসো। ভয় নেই, একটা কি দু'টো কথা খালি জিজ্ঞেস করবো তোমায়। কর্ত্তার জলখাবার রোজকার মত আজও তুমিই বানিয়েছিলে—কেমন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ঐ অম্‌লেট তা হ'লে তোমারই তৈরী? অম্‌লেট বানাতে রোজ যা মশলা দাও আজও তাই দিয়েছিলে তো?"

রাঁধুনীর মুখ শুকিয়ে গেল। একটু ইতস্ততঃ করে সে বললো—"যখন আপনি কথাটা তুললেন তখন বলি। আজকের অমলেট বানাতে গিয়ে একটু গড়বড় হয়েছিল—তা—সেটা আমি তারপরেই শুধরে নিয়েছি।"

"গড়বড়টা কী, জানতে পারি?" কল্‌কেকাশি শুধোলেন।

"ডিম গোলাটায় প্যাঁজের, টম্যাটোর কুচি ইত্যাদি দিয়ে তারপরে নুন দিলাম। নুন দেবার পর আমার হুঁস্ হোলো নুন মনে করে যে সাদা গুঁড়োটা ডিমের গোলায় দিয়েছি

সেটা নুন নয়। নুনের পাত্র তাকে তোলা রয়েছে আমার নজরে পড়লো তখন।"

"বটে? ঐ সাদা গুড়োটা কী জিনিস?"

"তা আমি বলতে পারবো না। রান্নাঘরের তাকে কে ওটাকে রেখেছিলো তাও আমি জানি নে। ও-জিনিস এর আগে আর কখনো আমি চোখে দেখি নি।"

"হুম্, বুঝতে পারছি।" কল্‌কেকাশি বেশ একটু গুম্ হয়ে গেলেন।

ঠাকুর ঘাবড়ে গিয়ে বল্‌লো—"আমার কোনো কসুর নেই হুজুর! অল্পদিন হোলো এখানকার কাজে লেগেছি। আর ঐ যে সাদা গুঁড়োটা! টের পাবা মাত্রই আমি চামচে করে ডিম গোলার ভেতর থেকে সেটুকু তুলে বাদ দিয়েছিলাম।"

"সেই সাদা গুঁড়োর একটু নমুনা আনো তো দেখি?"

ঠাকুর চলে গেল, এবং খানিক পরে একটা চামচে করে সাদা রঙের একটু গুঁড়ো নিয়ে ফিরে এলো।

"এই সাদা গুঁড়ো? দেখি!" কল্‌কেকাশি জিনিষটা শুঁকলেন। তার পরে লালা-রসে আঙুল ভিজিয়ে নিয়ে সেটা গুড়োর মধ্যে বুড়োলেন। তার পরে আঙুলটা গালে দিলেন। গালের ভিতরে। জিভ দিয়ে পরখ করার পর অর্থপূর্ণ চাহনিতে তিনি তাকালেন গৃহকর্ত্রীর দিকে।

"পুলিস ডাকতে হয় এবার।" বল্লেন কল্‌কেকাশি: "ফোন্‌টা কোন্ ঘরে?"

"আপনি—আপনি নিশ্চয় আমাকে—" বলতে গিয়ে ঠাকুরের কথা আটকে গেল। —"আমাকে সন্দেহ করছেন না?" সে কাঁপতে লাগলো।

"যথা সময়ে জানবে।" জানালেন কল্‌কেকাশি: "এখন তুমি যেতে পারো।"

তার পরে খানসামাকে হুকুম করলেন: "থানায় ফোন্ করে জানাও।"

খানসামা চলে গেলে গৃহকর্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিনি হাসলেন একটু—"বেশ শীত পড়েছে। হাড় কাঁপানো শীত, কী বলেন?"

"বলতে পারি নে।" বললেন গিন্নী। তাঁকে বেশ ভাবিত দেখা গেল।

পুলিস এসে পড়লো দেখতে না দেখতে। সদলবলে থানার বড় দারোগা এলেন। খানসামাই আগু বাড়িয়ে নিয়ে এলো তাঁদের।

ঘরে ঢুকে সব আগে লাশটা নজরে পড়লো দারোগার। সেটা তখনো সেখানে ছিল। তেমনি অবিচলিত ভাবে।

তার পরে তিনি কল্‌কেকাশিকে দেখতে পেলেন—"এই যে, আপনি! আপনি দেখছি এর মধ্যেই এসে গেছেন!"

"আসতেই হয়।" কল্‌কেকাশি হাসলেন।

দারোগা বাবু ঝুঁকে পড়ে মৃতদেহটিকে পরীক্ষা করলেন, তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"খুন। বলাই বাহুল্য।"

"আপনার মতে আমি সায় দিতে পারলাম না।" কল্‌কেকাশি দুঃখের সহিত জানালেন।

"পারবেন না, সেটা জানা কথা। বেসরকারী গোয়েন্দারা কদাচই সরকারী পুলিসের সঙ্গে একমত হয়।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সব ডিটেকটিভ বইয়েই সেই কথা লেখে।" খানসামাও না বলে পারে না।

"আপনি যে বলছেন খুন নয়, তার আপনি সূত্র পেয়েছেন কোনো?" দারোগা শুধোলেন।

"পেয়েছি বই কি। ঐ দেখুন। ঐ সূত্র!" কল্‌কেকাশি দেখালেন।

লাশটা যেখানে পড়েছিল তার ঠিক ওপরেই সিলিং ফ্যানের সঙ্গে জড়ানো একটা মিশকালো মোটা সুতো। সুতোটা ফ্যানের ডাণ্ডার সাথে শক্ত করে বাঁধা।

কল্‌কেকাশি চেয়ারের ওপর খাড়া হয়ে চাকু দিয়ে ঝোঝুল্যমান সুতোর খানিকটা কেটে আনলেন—"দেখুন, এটা সাধারণ সুতো নয়। টোন সুতোর মতই দেখতে, কিন্তু তাও না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বানানো এক বিশেষ ধরণের সুতো। অত্যন্ত মজবুত। খুব ভারী জিনিসও অক্লেশে বহন করবার ক্ষমতা এর আছে।"

"থাকলোই বা, তাতে কি? এটাকে আত্মহত্যা ব'লে যদিই বা মানা যায়, তার সঙ্গে এই সুতোর কী সম্বন্ধ আমি বুঝতে পারছি না।" দারোগা মাথা নাড়লেন।—"আমার মনে হয় টেবিলের ঐ খাবারের সঙ্গে এই ব্যাপারের যোগাযোগ আছে। ঐ ভুক্তাবশেষের রাসায়নিক পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই বলা যায় না।"

"ঠাকুর যে ওঁকে বিষ দেয় নি তা কি আপনি ঠিক জানেন?" জিজ্ঞেস করলেন গিন্নী: "লোকটা নতুন। অল্পদিন হোলো কাজে লেগেছে, আর তার আজকের আচরণটাও কেমন যেন সন্দেহজনক।"

"একটু ভয় খাওয়া। এই কথা বল্‌ছেন?" বল্লেন কল্‌কেকাশি: "তা, এ রকম একটা কাণ্ড ঘটলে কাছাকাছি সকলেই একটু ভয় খায়। সে কিচ্ছু না।"

"আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, কর্ত্তা নিজেই ঐ সাদা গুঁড়োর পাত্রটা রান্নাঘরের তাকে রাখেন নি? যাতে কিনা, ঠাকুর ভুল করে নুনের সঙ্গে গুলিয়ে—"খানসামাও নিজের গোয়েন্দাগিরির বিদ্যা জাহির করতে চায়।

"মানে, তুমি বলতে চাইছো যে এটা খুন হলেও—খুনের ছলনায় আসলে আত্মহত্যাই। তাই না কি? কিন্তু তা নয়।"

"তা হ'লে ঐ সাদা গুঁড়োটা?" জানতে চাইলেন গিন্নী।

"সোডি-বাইকার্ব। মনে হয়, কর্ত্তার হজমের গোলমাল ছিল। মাঝে মাঝে ওটা খেতেন। কিন্তু ও খেলে মানুষ মরে না।"

"তা হ'লে মৃত্যুর কারণ?" দারোগার প্রশ্ন হয় এবার—"আত্মহত্যার কী সূত্র আপনি পেয়েছেন শুনি?"

"ঐ যে, সিলিং ফ্যানে লটকানো। কিন্তু ওই সুতোই সব নয়। তার সঙ্গে এই চিরকুটটা পড়ুন।" কলকেকাশি তাঁর পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করলেন। বের করে একটু মুচকি হাসলেন "এইবার ঐ সুতোর সঙ্গে এই চিঠি মিলিয়ে দেখুন—দুয়ে দুয়ে যোগ করুন। এই প্রাণবিয়োগের রহস্য পরিষ্কার হবে।"

দারোগা বাবু চিরকুটখানা পড়লেন— "...ব্যাঙ্কের বিস্তর টাকা আমি তছরূপ করেছি। ...এ ছাড়া আমার আর কোনো পথ ছিল না।..."

"আত্মহত্যাই মনে হচ্ছে।" দারোগাবাবু অবশেষে মানলেন: "কিন্তু তারও তো প্রমাণ চাই মশাই! তারও সূত্র দরকার।"

"ঐ যে—ঐ সূত্র! পাখার থেকে ঝুলছে! সূত্রটি খুব সূক্ষ্ম। কিন্তু দেখতে সরু হ'লে কি হবে, কাছির দড়ির মতই লাগসই। বেশ একজন ভারিক্কী মানুষেরও এর ওপরে নির্ভর করে দুর্গা বলে ঝুলে পড়বার বাধা নেই—"

"কিন্তু এ তো ছিন্ন সূত্র—" দারোগাবাবু বাধা দিয়ে বলতে যান।

"হ্যাঁ, সূত্রের সবটা নয়। ওর বাকী আধখানা ভদ্রলোকের গলায় পাবেন। কোটের কলার তুলে দেখুন।"

যাঁদের মৃত্যু নেই

রঞ্জিত ভাই

সশব্দে ঘরের দরজা খুলে গেলো।

প্রবেশ করলো এক নতুন আগন্তুক। এ বাড়ীতে সে এই প্রথম আসছে।

চিঠি লেখা বন্ধ করে শুবার্ট চোখ তুলে তাকালেন।

আগন্তুক এ বাড়ীতে নতুনই বটে। সেই কালকের রুটিওয়ালা নয়। দর্জির দোকানে কাজ করে লোকটি। তার কাছে অনেক ধার আছে; কিছুই দেওয়া হয় নি।

আগন্তুক বললে: বার বার আসতে পারবো না বলে দিলাম। আজই টাকা চাই।

শুবার্ট বললেন: টাকা আজ দিতে পারবো না।

আগন্তুক গলা ছেড়ে বললে: ওসব জানি না। টাকা দেবেন কিনা বলুন?

স্তিমিত কণ্ঠে শুবার্ট বললেন: কাল এসো। কিছু দেব।

আগন্তুক চোখ রাঙিয়ে বিদায় নিলো। গোলমাল শুনে ছোট ভাইবোনেরা এসে ভিড় করেছিল। ধমক খেয়ে ভিতরে চলে গেলো। আবার সেই নিস্তব্ধতা।

বন্ধুকে চিঠি লিখতে লাগলেন শুবার্ট:

—'তোমার কথা আমার মনে আছে। কথা মত একটা গানের বই আর পিয়ানো অনেক

টাকা দিয়ে কিনেছি। জিনিসটা খুব সুন্দর। দেখে যেতে পারো। আমার কাছে কিন্তু একটি মার্কও নেই, ধার করতে হয়েছে। সুতরাং টাকা চাই। আসবার সময় গ্যেটের সেই বইখানা নিয়ে এসো। ভারি সুন্দর বই। আমার খুব ভাল লেগেছে।—'

আবার দরজায় কার পদশব্দ!

চিঠি লেখা শেষ করে শুবার্ট উঠে দাঁড়াতেই দরজা ঠেলে প্রবেশ করলে একটি লোক। কালকের সেই রুটিওয়ালা আবার এসেছে! রুটির দাম চাই।

এইভাবেই শুবার্টের দিন কেটেছে। প্রতিদিনই রাত্রে ঘুমোবার আগে শুবার্ট ভাবতেন পরদিন তাঁর সংসার কি করে চলবে! প্রতিদিন ভোরে উঠে শুবার্টের চিন্তার শেষ ছিলো না—কেমন করে আজকের আহারের সংস্থান হবে! দুঃখ, দৈন্য, অভাব, অভিযোগ আর অপমান ছিলো শুবার্টের প্রাপ্য। তাই একদা তাঁরই এক বন্ধু লিখেছিলেন:

"উৎপীড়িত দারিদ্র্য, অবমাননা, অপমান, হতাশা ও অজস্র ব্যর্থতা ছিল শুবার্টের জীবনের একমাত্র প্রাপ্য। জীবনে এর বেশী তিনি আর কিছুই পান নি!"

শুবার্টের জীবনে একটি রাত্রির ঘটনা বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে!

ভিয়েনার কোন একটি পল্লীতে সবেমাত্র সন্ধ্যা নেমেছে। আকাশে একফালি চাঁদের রেখা। সুন্দর একটি বিকেল, ঘরে বসে উপভোগ করার মত। বাতাসে সব পরিচিত ফুলের গন্ধ ভেসে আসে।

একটি ছোট বাড়ী। ঘরের ভেতর স্বচ্ছ এক টুকরো আলো। মোমবাতি জ্বলছে বোধ হয়। শুবার্ট বসে আছেন চুপ করে পিয়ানোর সামনে। আজ কয়েকটা সিম্ফনি আর অর্কেস্ট্রা লিখে ফেলতে পারলে কালই প্রকাশকের কাছে গিয়ে কিছু টাকা নিয়ে আসা যাবে—যদিও প্রকাশকরা ইতিপূর্বে অনেক বার জানিয়ে দিয়েছে যে শুবার্টের লেখা প্রকাশ করবার মত নয়! কিন্তু তবুও শিল্পীর সাধনার বিরাম নেই। আজই কিছু একটা লিখতে হবে! নয়তো আবার সেই রুটিওয়ালার তাগাদা সহ্য করতে হবে! এদিকে বাড়ীতে একটি দানাও নেই। ভাই-বোনেরা কাল থেকে অনাহারে আছে বোধ হয়.....

বাইরে জ্যোৎস্না রাত। পাখী ডাকছে দু'-একটা দূরে গাছের ডালে বসে।

হঠাৎ এলো ঝড়। ধুলো উড়িয়ে, আকাশকে কালো করে, বন কাঁপিয়ে, সমস্ত আকাশ যুড়ে এলো কালো মেঘের সমারোহ। তারপরেই শুরু হ'লো বৃষ্টি আর বিদ্যুতের চমকানি! চুপ করে বসে থাকতে ভালো লাগছে না। পিয়ানোর কাছ থেকে উঠে শুবার্ট টেবিলের সামনে এসে বসলেন। কি করা যায়? মন অত্যন্ত চঞ্চল ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। কিছু একটা করতে হবে, কিছু একটা চাই! টেবিলের ওপর ছিলো গ্যেটের কয়েকখানা বই। তার ভেতর থেকে শুবার্ট তুলে নিলেন তাঁর প্রিয় বইখানা—'দি আর্ল কিং'; পড়তে লাগলেন আপন মনে!

এদিকে বাইরে তখন চলেছে ভীষণ ঝড় আর বৃষ্টি। সেদিকে শিল্পীর খেয়াল নেই। তিনি বইয়ের পাতায় অবগাহন করেছেন। 'দি আর্ল কিং'—দীর্ঘ এক কবিতার বই—

তারই পরিবেশের ভেতর স্বপ্নে মশ্‌গুল হয়ে গেছেন শুবার্ট। গহন বন। অন্ধকার আর হিংস্র বনভূমি। ঝড় ও বিদ্যুৎ। বাতাসের অবিশ্রান্ত গর্জন। ঝড় উঠছে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে। বনের অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে পথ। আলো কই? শুধু ঘন অন্ধকার।……কাব্যের প্রতি অক্ষরে যেন প্রকৃতির যাদুস্পর্শ লেগেছে অনুভব করলেন শুবার্ট। তিনি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন—খুঁজে পেলেন প্রতি লাইনে গানের সুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে·· গান আর সুর! সুরের দোলা লাগলো তাঁর হৃদয়ে, মনে, সমস্ত সত্তায়।

তিনি কলম তুলে নিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে গেলো গানের সুর। সমস্ত কবিতাটি গানে রূপান্তরিত হ'লো। গ্যেটের আর্ল কিং শুবার্টের প্রতিভার স্পর্শে অমর হয়ে রইলো।

পরদিন তিনি ডেকে পাঠালেন তাঁর প্রিয় ছাত্রদের। তারা এসে সমস্ত গানটি গাইলো। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন শুবার্ট। ছাত্রেরা বললে এ জিনিস ইতিপূর্বে তারা কোনদিন শোনে নি। একটি আশ্চর্য সৃষ্টি করেছেন শুবার্ট!

খবর ছড়িয়ে পড়লো ভিয়েনায়। তাঁর বন্ধু ছুটে এলেন খবর পেয়ে। তাঁরই উদ্যোগে প্রকাশককে ডেকে পাঠানো হ'লো। তারা আদর করে শুবার্টের লেখা নিয়ে গেলো। কিছুদিন পরেই বই প্রকাশিত হ'লো। কিন্তু শুবার্টের খুব আর্থিক লাভ হ'লো না। সুতরাং তিনি অসীম উৎসাহ নিয়ে গান লিখতে শুরু করলেন।

ছেলেবেলা থেকেই তিনি গান লিখতে পারতেন। ১১ বছর বয়স থেকে তিনি গান লিখতে শুরু করেন। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি অজস্র সিম্‌ফনি আর অর্কেষ্ট্রা লিখে ফেলেছিলেন: তার সংখ্যা (প্রায় ৫০০) এত হয়েছিলো যে সে সব গান একসঙ্গে কেউ পেলে সে একটা দোকান করতে পারে! যে কোন জিনিস তিনি রচনা করতে পারতেন। সিম্‌ফনি, অর্কেষ্ট্রা, চার্চ-সঙ্গীত, যন্ত্র-সঙ্গীত, অপেরা প্রভৃতি তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে অমর হয়ে আছে। কিন্তু তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর। কারণ তাঁর জীবিতাবস্থায় এমন অনেক দিন গিয়েছে যে মাত্র একবেলার আহারের পরিবর্তে তিনি গান রচনা করেছেন। শুবার্টের প্রতিভার পুরস্কার লাভ করবার সময় তখনো আসে নি।

তবু জার্মেনীর শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসেবে শুবার্ট অমর হয়ে থাকবেন। আর্ল কিং-এর জন্য পৃথিবী তাঁকে মনে রাখবে।

অতি দরিদ্র ঘরে শুবার্টের জন্ম হয়। তাঁরা ছিলেন আঠারো ভাইবোন। তাই সমস্ত জীবনটাই তাঁদের দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে কেটেছে। কিন্তু প্রতিভা মানুষের জীবনে আকাশের সূর্যের মত, শত মেঘান্ধকার ও ঝড়ের ভেতরও সে আপনাকে বিকশিত করবেই। তাই শুবার্ট সঙ্গীত-জগতে এসেছিলেন দিগ্বিজয়ী সম্রাটের মত। কারো প্রতিরোধ তাঁর সৃষ্টির পথে বাধা আনতে পারে নি।

১৮২৮ সালে তাঁর যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৮ বছর। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ

শুনে বেঠোফেন এসেছিলেন ভিয়েনায়। মৃত্যুশয্যায় শুবার্টকে দেখে তিনি কেঁদেছিলেন ছেলেমানুষের মত।

মোজার্টের সঙ্গে শুবার্টের জীবনের অনেক মিল আছে। দু'জনার ভাগ্য ও দুঃখযন্ত্রণা ছিলো একই রকমের। তাই জীবনের শেষ মুহূর্তে শুবার্ট তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুকে কাছে ডেকে বলেছিলেন: 'আমার সঙ্গীত হচ্ছে আমার প্রতিভা আর দুঃখের ফল।'

শুবার্ট ছিলেন সেই জাতের শিল্পী—যিনি সমস্ত জীবন শুধু সাধনা করে মৃত্যুকে জয় করে গেছেন।

প্রিয়ঙ্গু

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

২

নাগিনা

ভক্তি এবং বিশ্বাসে হয় সব—
মোর কাছে নাই কিছুই অসম্ভব।
যাহা বলি, যাহা করি সবই তাঁর জোরে,
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা চালায় মোরে।

অজয়ের তীরে প্রতাপপুর নামক পল্লীতে একখণ্ড উচ্চ ভূমির উপর একটী বহু প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ ছিল—বোধ হয় এখনো আছে। তাহার তলে 'মনসা দেবীর বেদী'। জনশ্রুতি—ঐখানে বেহুলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন সেখানে মনসার এক দেয়াসিনী বাস করিত। তাহাকে লোকে 'নাগিনা' বলিত। তার পরিধানে ঘোর লাল পট্টবস্ত্র, মাথায় একরাশ জটা—লাল সূতার গোছা দিয়া উঁচু করিয়া বাঁধা। মুখ ও দেহ ভস্মমাখা, কপালে সিঁদূরের গাঢ় প্রলেপ এবং দুই পায়ে দু'গাছা রূপার মোটা বাঁকমল, হাতে খাড়ু—দেখিলে কেমন ভয় ভয় লাগে।

বেদীতে চূণ আর সিঁদূর ঢালা, বহু সর্পের মৃৎ ও প্রস্তরমূর্ত্তি—মধ্যে মনসা দেবীর আটন। নাগিনা বহু মন্ত্র-তন্ত্র জানিত, বহু সর্পদষ্ট রোগী রক্ষা করিত। তাহার ভক্তেরা তার অদ্ভুত দৈব শক্তির কথা রচনা ও রটনা করিত। সে নাকি ভেলায় ভাসাইয়া দেওয়া সর্পদংশনে মৃত অনেক রোগী বাঁচাইয়াছে।—তাহাদের মধ্যে একজনকে 'ভূত হইয়াছে' বলিয়া গ্রামের লোকে ভয়ে তাড়াইয়া দেয়, পরে নাগিনার কথায় উল্লাসে তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যায়। নাগিনা আহার করিতে বসিলে বিষধর সর্পেরা তাহার সহিত আহার করে এবং সে ঘুমাইলে মাথায় ফণা ধরিয়া থাকে। সত্য মিথ্যা অনেক কাহিনী নাগিনার খ্যাতি বৃদ্ধি করিয়াছিল। সন্ধ্যায় নাগিনা যখন রক্তাসনে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অজয়ের পানে উর্দ্ধশ্বাসে উদাস নয়নে চাহিয়া থাকিত তখন সত্যই মনে হইত সে যেন নাগলোকের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কহিতেছে। সেখানে নিত্য বহু দর্শকের ভিড় হইত।

দুই ক্রোশ দূরে অজয়ের অপর পারে 'জাহানাবাদ'। সেখানে নীলকর সাহেবদের 'কুটি'। শুভ্র সৌধগুলি দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইত। 'কুটি'-সংলগ্ন বিশাল উদ্যান ও তাহার বৃক্ষাদির শ্যামল শোভা পথিকের নয়ন জুড়াইত। সেখানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আম, জাম, পেয়ারা লিচু, বেল প্রভৃতি ফলের এবং দেশী ও বিদেশী বহু ফুলের গাছ ছিল। বিভিন্ন ফুলের বিবিধ ও বিচিত্র রঙ লোকে বিস্ময় ও আনন্দের সহিত দেখিত। সাহেবের বাগানের ফলের দেশ-যোড়া সুখ্যাতি ছিল—যাহারা উহা উপহার পাইত নিজেদের ভাগ্যবান্ মনে করিত।

প্রধান কুটিয়ালের নাম ম্যাল্‌কম্। তাহার সহকারী চার-পাঁচ জন সাহেব ছিল। ম্যাল্‌কম্ স্ত্রী ও এক শিশুকন্যা সহ বাস করিত। তার নানা দোষ সত্বেও এমন সব গুণ ছিল যাহার জন্য লোকে তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। তাহার একটু আভিজাত্য-গৌরবও ছিল।

সাহেবের কন্যাটি ২।৩ বছরের—তার নাম 'মে-বেল'। টেনিস্ খেলার মাঠে আয়ার কাছে মেয়েটী ছিল—একদিন হঠাৎ ছোট এক বিষধর সর্পে তাহাকে দংশন করে—মেয়েটি শাকমূর্ত্তি ও অজ্ঞান হইয়া যায়। সাহেব অনিচ্ছা সত্বেও সকলের অনুরোধে ও মেম সাহেবের কাতরতায় নাগিনাকে ডাকিতে পাঠান;—সে মন্ত্র পড়িয়া কন্যার দক্ষিণ বাহুতে উল্কী দিয়া এক নাগমূর্ত্তি অঙ্কিত করে এবং অদ্ভুত উপায়ে মুমূর্ষু কন্যাকে বাঁচায়। সাহেব একশত টাকা পুরস্কার দেন। কন্যার বাহুতে স্থায়ী উল্কীটি সাহেব অপছন্দ করিলেও প্রাণ রক্ষা পাওয়ায় খুব সন্তুষ্ট হ'ন।

সর্পদংশন ব্যাপারে অসাবধানতার জন্য 'আয়া'কে সকলে অতিরিক্ত তিরস্কার করে। কিন্তু একমাস না যাইতেই তার বিষময় ফল ফলিল। একদিন কন্যা সহ আয়া অদৃশ্য হইল—কোথায় গেল তাহার কোনো সন্ধান মিলিল না। পুলিশ অতিমাত্র তৎপরতার সহিত তদন্ত চালাইতে লাগিল, জনসাধারণও পূর্ণভাবে সহযোগিতা করিল। দিকে দিকে লোক ছুটিল কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কোনো সংবাদই পাওয়া গেল না।

(ক্রমশঃ)

কেঁচোর চাষ

শ্রীঅরুণমোহন চক্রবর্ত্তী

নানা রকম শস্যের চাষ হ'য়ে থাকে সে কথা তোমরা জানো; মাছের চাষের কথাও শুনেছো। কিন্তু কেউ যদি বলে 'কেঁচোর চাষের কথা শুনেছো কি?' তা হ'লে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না! কিন্তু বিশ্বাস করো আর না-ই করো, সত্যিই কিন্তু চাষ হয় কেঁচোর!

পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বড় কেঁচো-চাষের কেন্দ্র হচ্ছে নিউইয়র্ক চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানার কেঁচো-ভুক্ জন্তুদের জন্যে এখানে কেঁচোর চাষ হ'য়ে থাকে।

তোমরা হয়তো অনেকে জানো, মাটির সব চাইতে বড় বন্ধু হচ্ছে কেঁচো। অনেক অসার জমিকে কেঁচো সারবান্ ক'রে তোলে। কেঁচো মাটিতে যে গর্ত করে তাই দিয়ে জল-হাওয়া প্রভৃতি গিয়ে মাটিকে উর্ব্বর করে তোলে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কোনো অনুর্ব্বর জমিকে উর্ব্বর ক'রে তুলবার শক্তি কেঁচোর অসাধারণ। যারা মাছ ধরো তারাও হয়তো জানো, মাছের একটি প্রিয় খাদ্য হচ্ছে এই কেঁচো। মৎস্যশিকারীদের কাছেও তাই কেঁচোর কদর নেহাৎ কম নয়।

এই সব কারণে আজকাল নানা জায়গায় কেঁচোর চাষের রেওয়াজ হয়েছে। মাটির মধ্যে থাকলে তো আর ইচ্ছেমত কেঁচো ধরা যায় না, তাই কোনো নির্দিষ্ট স্থানে কোঁচোর চাষ করা হয়।

ঘরের মধ্যে বা বাইরে—দু'জায়গাতেই কেঁচোর চাষ করা চলে। এ জন্যে বড় বড় কাঠের বাক্স ব্যবহৃত হয়। এই বাক্সের মধ্যে থাকে কেঁচোর বাসোপযোগী মাটি। তাদের খাদ্যের যাতে কোনো অভাব না হয় সে জন্যে নানা রকম শস্যের ভূষি, ডিমের গুঁড়ো প্রভৃতিও ঐ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। আর এই মাটিকে রাখতে হয় স্যাঁৎসেঁতে; কারণ, স্যাঁৎসেঁতে মাটিতেই

কেঁচোরা থাকতে ভালোবাসে। স্যাঁৎসেঁতে রাখবার জন্তে মাটিকে ভিজিয়ে রাখতে হয় সব সময়ে জল দিয়ে।

কেঁচোরা এই বাক্সে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা বড় হ'লে তাদের সরিয়ে রাখা হয় অন্য বাক্সে। কারণ, তা না হ'লে বাক্সে স্থানাভাব দেখা দেয়। প্রথম অবস্থায় বাচ্চাদের রং থাকে সাদা। তারপর আধঘণ্টার মধ্যেই সেই সাদা রং বদলে হয় মাটির মত। বড় হ'লে কিন্তু ওদের রং আর মাটির মত থাকে না, তখন ওদের রং হয়ে যায় অনেকটা লালচে।

বর্তমানে আমেরিকার বহু লোক কেঁচোর চাষ ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে। কেঁচোর ক্রেতা যাঁরা তাঁরা হচ্ছেন সেই সব লোক যাঁরা মাছ ধরেন বা চাষবাস করেন। কেঁচো সামান্য জীব হ'লেও এর দাম কিন্তু সামান্য নয়। মাটি শুদ্ধ এক গ্যালন কেঁচোর দাম কত জানো? —প্রায় দশ ডলার।

বিক্রি করবার সময়ে কাঠের বাক্সগুলো থেকে আগে কেঁচোদের একটা পাত্রে তুলে নেওয়া হয়। তারপর সেই পাত্রের ওপর খুব জোর বৈদ্যুতিক আলো ফেলা হয়। কেঁচো আলো সহ্য করতে পারে না, সেই জন্যেই ওরা মাটির নীচে অন্ধকারে বাস করে। তীব্র আলো জ্বালবার ফলে কেঁচোরা ঐ পাত্রের তলায় গিয়ে জমা হয়। তখন পাত্রের তলাকার মাটি শুদ্ধ কেঁচো উঠিয়ে ওজন করা হ'য়ে থাকে।

বিদেশেও কেঁচো চালান দেওয়া হয়। কাঠের বাক্সে ভরে তাদের পাঠান হয়। আলো এবং হাওয়া যাবার জন্যে এই বাক্সের গায়ে থাকে অসংখ্য ছোট ছোট ফুটো। এই সব ফুটো দিয়ে কেঁচোরা বাইরে বেরোতে পারে না কিন্তু আলো এবং হাওয়া ঠিক পায়। গন্তব্য স্থানে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্যে বিমানে কেঁচো পাঠান হয়। এই সমস্ত বাক্সের মধ্যে কেঁচোরা বড় জোর সাত-আট দিন বেঁচে থাকতে পারে। কাজেই যখন বহু দূর দেশে চালান দেওয়া হয় তখন কেঁচো না পাঠিয়ে পাঠান হয় তার ডিম।

তাজা কেঁচোর চাইতে মরা কেঁচোই নাকি জমির পক্ষে বেশী উপকারী। কেঁচো মরে গেলে তাদের দেহ থেকে এক রকম রস বেরোতে থাকে। এই রসে জমি উর্বর হ'য়ে ওঠে। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে জমিতে তাজা কেঁচো থাকলে যে পরিমাণ ফসল হয় তার থেকে বেশী ফসল হয় মরা কেঁচো থাকলে।

আজকাল কৃষিকার্যের জন্যে বহু দেশ প্রচুর পরিমাণে কেঁচো কিনছে,— কেঁচোর চাষও এই জন্যে বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন।

আত্মোন্নতি সমিতির গল্প

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
এম্. এ, বি. এস্-সি

মন্মথ ও বিভূতি

মন্মথ রায় ও তাহার শ্যালক বিভূতি চক্রবর্ত্তী আমাদের সঙ্গে বি. এস্-সি পড়িত। তাহাদের সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হইয়া গেল। বিভূতিকে আমরা কংগ্রেসে যোগ দিবার কথা বলাতে সে আপত্তি করিল। বলিল, তাহার বাবা রাজভক্ত ডেপুটী, তিনি তাহা হইলে তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু গুপ্ত সমিতির কথা যখন তাহার কাছে পাড়িলাম সে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া তাহার সভ্য হইল। মন্মথ, আমি, সতীশ, পঞ্চানন নিয়োগী প্রভৃতি ক্লাসের ছাত্র মিলিয়া রেলে চাপিয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনও ষ্টেশনে নামিয়া বনে-জঙ্গলে গিয়া রিভল্ভার প্র্যাক্‌টিস্ করিতাম। বিভূতি অত্যন্ত ক্ষীণকায় ছিল বলিয়া দৌড়ঝাঁপের কাজে বেশী যোগ দিত না। কিন্তু বিভূতির রাসায়নিক পরীক্ষা করিবার ভাল হাত ছিল। বিভূতি ও মন্মথ তখন মির্জাপুর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট জংশনের কাছে (বোধ হয় মুসলমান-পাড়া লেনে) এক মেসের তেতালার ঘরে থাকিত।

এই তেতালার ঘরটি একটি স্মরণীয় গৃহ। আমরা, বিজ্ঞানের ছাত্রগণ, এই সময়ে বিস্ফোরক সম্বন্ধীয় সাহিত্য অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরীতে এক ব্যবহারিক রসায়নের গ্রন্থ পড়িয়া বোমার একটু সন্ধান পাইলাম। এই পুস্তক ও তাহার লেখকের নাম এখন ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক

ছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধটি খুব বড় ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন: "একজন ইটালী দেশীয় ভদ্র যুবক একদিন আমার সহিত দেখা করিয়া কিছু গোপন কথা কহিতে চাহিল। তখন ম্যাট্‌সিনি-প্রণোদিত ইটালিয়ানরা অষ্ট্রীয়ার বিপক্ষে নানারূপ বৈপ্লবিক অভিযান করিতেছিল। যুবকটির নাম অর্সিনি। সে বলিল, "আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। অষ্ট্রীয়ান সৈন্যদের উৎকৃষ্ট অস্ত্রের সামনে আমাদের নিকৃষ্ট অস্ত্রে সজ্জিত দেশের স্বাধীনতা-প্রয়াসী বৈপ্লবিকেরা ভাল যুদ্ধ করিতে পারে না। আমাদের লোকক্ষয় বেশী হইতেছে। আপনি আমাকে এমন কোনও বোমা করিতে শিখাইয়া দিন যাহা ক্ষুদ্র হইবে,—সহজেই জামার পকেটে লুকাইয়া রাখা চলিবে।" অর্সিনির স্বভাব এমন ভদ্র ও কোমল ছিল যে আমি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া গেলাম এবং তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলাম। আমি দেখিলাম মার্কারী ফালমিনেট এরূপ ছোট বোমার পক্ষে আদর্শ সামগ্রী। অর্সিনিকে উহা প্রস্তুত করিতে শিখাইয়া দিলাম।

"তার পর অর্সিনি আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। অনেক দিন তাহার আর কোনও সংবাদ নাই। বছর খানেক পরে হঠাৎ একদিন সংবাদপত্র পাঠে স্তম্ভিত হইলাম। প্যারী নগরে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের গাড়ি যাইতেছিল। উহার উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সম্রাটের গাড়ীর উপর বোমা পড়ে নাই, জনতার মধ্যে পড়িয়া কয়েকজন লোক হত ও আহত হইয়াছে।

"এই ঘটনার পর ষড়যন্ত্রকারীদের কয়েকজন ধরা পড়ে। ধৃতদিগের মধ্যে অর্সিনিও ছিল। তাহার প্রাণদণ্ড হয়। অর্সিনি কিরূপে ঐ বোমা করিতে শিখিল তাহা অনুসন্ধানের চেষ্টায় পুলিস শেষ পর্য্যন্ত আমার পিছনেও কয়েক দিন লাগিয়াছিল।"

বিভূতিকে ঐ বিবরণ দেখাইলাম। তাহার নির্জ্জন ত্রিতলগৃহে পরীক্ষা হইতে লাগিল। পরীক্ষার সময়ে একদিন আমিও ছিলাম। বিভূতি বলিল, 'অনেকগুলি পরীক্ষা করা হইয়াছে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না।' বিভূতির পরীক্ষা দেখিলাম। সে একটি ছোট ফ্লাস্কে পারদ রাখিয়া তদুপরি নাইট্রিক য়্যাসিড নিক্ষেপ করিল। বহু রক্তাভ নাইট্রাস্ 'ফিউম্' (ধোঁয়া) বাহির হইল। কতকটা ফিউম্ ফ্লাস্কের বাহির হইয়া গেল। তার পর সে

ফ্লাস্কে য়্যালকহল্ নিক্ষেপ করিল। পরীক্ষা কৃতকার্য্য হইল না। আমি বলিলাম, বোধ হয় ঐ রঙ্গিন গ্যাস সবটাই পাত্রের মধ্যে থাকা আবশ্যক। একটা বড় ফ্লাস্ক লইয়া পরীক্ষা করা যাক্। এবারে পরীক্ষা কৃতকার্য্য হইল।

পরে শুনিয়াছিলাম বারীন ও তাহার বন্ধুরা বিভূতির এই পরীক্ষা দেখিয়াছিল।

মাঝে ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার যে বোমায় হাত উড়িয়া গিয়াছিল তাহা কি ফাল্‌মিনেট বোমা?' সে বলিল, 'না, উহার বিস্ফোরক কালো ছিল।' তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বারীনের বোমা কি ফাল্‌মিনেট বোমা?' সে বলিল, 'হ্যাঁ।'

এই বোমার ব্যাপার স্মরণ করিয়া বহুকাল দুঃখিত ছিলাম। ফলে তো দু'টি নিরীহ স্ত্রীলোক মারা গেল এবং দু'টি সুকুমার বয়স্ক বালকের প্রাণ গেল—একটির ফাঁসিকাষ্ঠে ও একটির নিজের গুলিতে।

তখনও আমি ভাগবত মতে আসি নাই। 'এই বিশ্ব বিধাতার ক্রীড়নক মাত্র। ভালমন্দ সকলেই তাঁহার নির্দ্দেশেই চলিতেছে'—এই ভাগবত মত।

বহুকাল পরে বোমার প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নূতন স্থান হইতে অতর্কিত ভাবে আলোক পাইলাম।

অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। তৎপূর্ব্বে হিন্দু ইউনিভার্সিটি ও কুচবিহার কলেজে ছিলেন। জয়গোপাল বাবু ও আমি কয়েক বছর হইল আমার বৈবাহিক ও বন্ধু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্যারীগঞ্জের (পানাগড় ষ্টেশনের সন্নিকটে) কাছারী বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। অধ্যাপক মহাশয় শুধু ইংরাজী সাহিত্যের নহে, বাংলা ভাষা, হিন্দুদর্শন, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার সমজদার ও সমালোচক। তাঁহার আলাপকুশলতা ঐ জঙ্গল-দেশে বড়ই উপভোগ্য ছিল। আমরা বনে-জঙ্গলে, মাঠে ও নদীর ধারে বেড়াইবার সময় তাঁহার নানা কাহিনী শুনিয়া পথশ্রম ভুলিয়া যাইতাম।

একদিন তাঁহার ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিলেন। তিনি বলিলেন, "পেশোয়ারে গিয়া এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত দেখা হইল। তিনি সীমান্তদেশের এক সর্দ্দারের সহিত পরিচিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। উৎফুল্ল হইয়া সে প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম। যথা সময়ে পাহাড়, বন-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া সর্দ্দারের গৃহে উপস্থিত হইলাম। তিনিও আমার ভাষা বুঝেন না, আমিও তাঁহার ভাষা বুঝি

না। সঙ্গী দোভাষীর কার্য্য করিলেন। প্রথম প্রশ্ন, 'কোন্ দেশী লোক?' উত্তর—'বাঙ্গালী'। দ্বিতীয় প্রশ্ন—'বোমা প্রস্তুতকারী বাঙ্গালী?' প্রশ্ন শুনিয়া ফাঁফরে পড়িলাম। একদিকে গভর্ণমেণ্টের ভয়, অপর দিকে যদি বলি বোমা-ওয়ালা নই তা হইলে হয়ত, যে রকম বদমেজাজী লোক, অসম্মান করিয়াই তাড়াইয়া দিবে। যা থাকে কপালে ভাবিয়া বলিলাম, 'হাঁ'। উত্তর শুনিয়া সেই বৃদ্ধ পাঠান সর্দ্দার উঠিয়া আসিয়া আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং আমার জন্য তাঁহার সর্ব্বোত্তম দুম্বা ভেড়া কাটিবার ব্যবস্থা হইল।"

বোমা আসল কাজ যত না করুক, বিরাট কোলাহল করিয়াছিল,—ভারতবর্ষীয়দিগের উপর ইংরাজেরা যে নিজেদের অজেয়তার সম্মোহন (হিপ্নোটিজ্‌ম্) সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ভঙ্গ করিয়াছিল। সে কাজটাও জাতীয় জীবনের পক্ষে কম প্রয়োজনীয় নয়! বোমা ইংরাজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর অসন্তোষ ও বিদ্রোহের এক প্রকাণ্ড অভিব্যক্তি—যাহা দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এই উগ্র অসন্তোষ-বাণী প্রচারিত না হইলে প্রথম জার্ম্মান্ যুদ্ধই হইত না। ভারতবাসী ইংরাজের প্রতি সন্তুষ্ট জানিলে জার্ম্মান্‌রা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নামিতই না। এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ না হইলে হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও হইত না। এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না হইলে ভারতও স্বাধীন হইত না।

কলকাতার তৃতীয় টেষ্ট

শ্রীসুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়

৩০শে ডিসেম্বরের মিঠে রোদ-ঝরা ঠাণ্ডা সকাল। সবুজ মখমলে ছাওয়া দেবদারু গাছে ঘেরা ইডেন উদ্যানের চারদিকে লোক জমতে শুরু হ'ল ভোর থেকেই। সবার মুখে এক কথা, প্রথম টেষ্টে তো ভারত হেরেছে ন' উইকেটে, দ্বিতীয় টেষ্টে বেঁচে গেছে হারতে হারতে। দেখা যাক, কলকাতার মাটিতে কি হয়!

কমনওয়েল্‌থ দলে খেলছিলেন—লিভিংষ্টোন (অধিনায়ক), ফ্রিয়ার, ওল্ডফিল্ড, ওরেল, হোল্ট, য়্যালে, পেটিফোর্ড, ট্রাইব, স্মিথ, ল্যাম্বার্ট আর ল্যাংডন। ভারতীয় দলে—হাজারে (অধিনায়ক), মানকাদ, মুস্তাক আলি, মোদি, ফাদকার, অধিকারী, কিষেণচাঁদ, উম্রীগড়, মন্ত্রী, নাইডু আর আমাদের নীরদ ওরফে স্টুটু চোধুরী।

দশটা আঠারো মিনিটে খেলতে নামলো ভারতীয় দল, টসে জিতে। পর পর দশটি টেষ্টে টসে হেরে ভারত যে রেকর্ড করেছিল, হাজারের হাতে তার অবসান হ'ল। নতুন আশার আলো পেয়ে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মাঠে নামলেন মুস্তাক আর মানকাদ। খেলার বাঁধাধরা নিয়ম মানা মুস্তাকের স্বভাববিরুদ্ধ। যে বল যে রকম ভাবে মারা উচিত নয় সেই রকম ভাবেই তিনি মারেন। তাঁর এই অদ্ভুত খেলাই তাঁকে প্রিয় করেছে দর্শকদের কাছে। ৪০ রান্ ক'রে মুস্তাক ফিরে গেলেন ট্রাইবের বলে। এলেন মোদি। কিন্তু তিনি টিকলেন না বেশীক্ষণ। দলের অধিনায়ক হাজারে নামলেন ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে, তুমুল উল্লাসধ্বনির মধ্যে। তখনো কিন্তু মানকাদ খেলে চলেছেন ধীরে ধীরে নিজের রান্ তুলতে তুলতে। এই জুটি অপরাজিত রইলো চা-এর বিরতি পর্যন্ত। মানকাদ রইলেন ৯১ নট্ আউট। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বিরতির পর তাঁর রান্ আর এগোল না। রে স্মিথের বলে বোল্ড আউট হয়ে গেলেন আর এক রান্‌ও না করে। এবার নামলেন তরুণ ফাদকার। দিনের শেষে ভারতবর্ষ করলো তিন উইকেটে ২১৩ রান্।

পরের দিন ফাদকার আউট হ'লে নামলেন অধিকারী। ছোটখাটো মানুষটি, অধিনায়কের সংগে ধীরে ধীরে খেলে তিনি হাত জমিয়ে ফেললেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্য খারাপ, হাজারেকে একটি রান্ নিতে ডেকে তিনি বিপরীত দিকের উইকেটে পৌছবার আগেই দেখলেন, য়্যালের ক্ষিপ্র অব্যর্থ মৃত্যুবাণরূপ 'থ্রো' তাঁর উইকেট ভেঙে দিয়েছে। তার পর উম্রীগড়ও টিকতে পারলেন না। এলেন কিষেণচাঁদ। ওদিকে লাঞ্চের আগেই হাজারে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে টেষ্টে তাঁর ব্যক্তিগত ষষ্ঠ সেঞ্চুরী করলেন। ইডেন উদ্যানের বুকে এই তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী।

তখন ছ' উইকেট পড়েছে, আর তিনশ' রান্‌ও ওঠে নি। আর বেশী রান্ যে উঠবে তা কেউ আশা করে নি। একা হাজারে আর কি করবেন? কিন্তু কিষেণচাঁদের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলায় মোড় ঘুরল। কিন্তু ৪২ রান করে কিষেণচাঁদকেও ফিরে যেতে হ'ল স্মিথের বলে তাঁরই হাতে চমৎকার ক্যাচ আউট হয়ে। তারপর মন্ত্রী নামলেন ও যথারীতি ৫ রান্ করেই ট্রাইবের বলে লিভিংষ্টোনের হাতে আটকে গেলেন। মন্ত্রীর নিম্নস্তরের উইকেট কীপিং ও ব্যাটিং-ব্যর্থতা সত্ত্বেও বুদ্ধি করে নির্বাচকেরা তাঁকেই পছন্দ করছেন। যাই হোক, এবার বিপুল হাততালির মধ্যে নামলেন নাইডু। তাঁর বেপরোয়া পেটানো দেখতে দর্শকেরা উন্মুখ হয়ে রইলো। কখন যে তাঁর রান্ ০ থেকে ২৫-এ উঠে গেছে তা আমরা বুঝলুম যখন পেটিফোর্ডের বলে হাঁকড়াতে গিয়ে তিনি বোল্ড হয়ে ফিরে এলেন। সব শেষে এলেন চৌধুরী, যিনি তাঁর শূন্য রানের জন্যে বিখ্যাত। তবু বাংলার খেলোয়াড় তো, গগনভেদী হাততালি

উঠলো। তিনি যখনই বল ঠেকাচ্ছেন তখনই হাততালি। হাজারে চেষ্টা করলেন প্রতি ওভারের শেষ বলে রান্ নিয়ে চৌধুরীকে বিপদ্ থেকে বাঁচাতে। সেজন্যে অনেক সহজ রান্ও তিনি নিলেন না। কিন্তু ৪০০ রান্ ওঠার পর একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। একটি রান্ নিয়ে লিভিংষ্টোন দু'জন আম্পায়ারের সংগে তর্ক করতে করলেন, যেটা খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির দিক্ দিয়ে একান্ত অশোভন।

যাই হোক, এই জুটি চা পান পর্যন্ত টিকে রইলো। বিরতির পর সবাই অবাক্ হ'ল চৌধুরীর খেলা দেখে। ট্রাইবের এক ওভারে দু'টো বাউণ্ডারী মারলেন তিনি। টেষ্টে নেমে তাঁর হাত খুলে গেল নাকি? কিন্তু ৯ রান্ করে তিনি ট্রাইবের বলে ওরেলের হাতে আটকে ফিরে এলেন। বিজয় হাজারে ১৭৫ রানে রইলেন অপরাজিত। দলের রান্ হ'ল ৪২২, ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে সব চেয়ে বেশী স্কোর।

এবার কমনওয়েলথের হয়ে নামলেন ওলফিল্ড আর লিভিংষ্টোন, ফাদকার আর মোদির বলের বিরুদ্ধে। দিনের শেষে কোন উইকেট না খুইয়ে কমনওয়েল্থ করলো ১৫ রান্।

পরের দিন দর্শকেরা এই ভেবে খেলা দেখতে গেলো যে কমনওয়েল্থ নিশ্চয়ই যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবে। কিন্তু তৃতীয় দিন হ'ল বোলারদের দিন। ওল্ডফিল্ড ফাদকারের বলে উম্রী-গড়ের হাতে শক্ত ক্যাচ তুলে চমৎকার ক্যাচ্ আউট হ'লেন মাত্র ১৯ রানে। দলের অধি-নায়ক লিভিংষ্টোন ছোটখাটো মানুষ হ'লেও পাকা খেলোয়াড়। নির্ভুল জোরালো মার মেরে তিনি খেলছিলেন, কিন্তু ওল্ডফিল্ডের পরেই ফাদকারের বলে পরিষ্কার বোল্ড হয়ে তাঁকেও ফিরে আসতে হ'ল। তার পর চৌধুরী এসে টপাটপ্ ওরেল আর ম্যালেকে তাঁবুতে ফেরৎ পাঠালেন। হোল্টও গেলেন মাত্র ২ রানে ফাদকারের বলে। মাত্র ৮১ রানে ৫টা উইকেট পড়ে গেল। লাঞ্চের পর পোটিফোর্ডও চমৎকার খেলতে খেলতে চৌধুরীর বলে ফাদকারের হাতে সুন্দর ক্যাচ আউট হলেন।

ল্যাংডন আর ফ্রিয়ার এসে খেলার মোড় ফেরালেন। তাঁরা মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেলে দলের দেড়শ' রান ওঠালেন। কিন্তু ল্যাংডন ৩০ রান্ করে গেলেন মন্ত্রীর হাতে মানকাদের বলে। তাঁর শূন্য স্থান পূরণ করেই শূন্য রানে আউট হলেন ট্রাইব। ল্যাম্বার্ট খেলছিলেন ভালো, কিন্তু ফ্রিয়ার ৩৪ রানে চৌধুরীর বলে আউট হওয়ায় কমনওয়েল্থের ইনিংস শেষ হ'ল ১৯০ রানে। রে স্মিথ খেলতে পারলেন না অসুস্থতার জন্যে। এত তাড়াতাড়ি ইনিংস শেষ হ'ল যে ভালো বোঝাই গেল না কে কেমন ব্যাট করেন। এর চেয়েও কম রানে সবাইকে আউট হ'তে হ'ত যদি ভারতীয় দল সহজ বল না ফস্কাতেন। সব চেয়ে নৈরাশ্য-জনক হয়েছিল মন্ত্রীর খেলা। লিভিংষ্টোনের অনবদ্য উইকেট্ কীপিং-এর কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল তাঁর খেলা।

দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামলো কমনওয়েল্থ, ফলো অন্ করে। নামলেন ওল্ডফিল্ড আর ফ্রিয়ার। দিনের শেষে বিনা উইকেটে রান্ উঠলো ৪২।

চতুর্থ দিনের গোড়ায় কমনওয়েল্থ্ খেলা দেখালো। তাদের প্রথম উইকেট পড়লো

১২১ রানে, ফ্রিয়ার ৪০ রান্ করে নাইডুর বলে এল. বি. ডব্লিউ. হ'লেন। ওল্ডফিল্ড চমৎকার খেলতে লাগলেন। ১৫৮ রান্ করে তিনি প্রথম ইনিংসের মতই ফাদকারের বলে উম্রীগড়ের হাতে আউট হলেন। লিভিংষ্টোন তার আগেই আউট্ হয়েছিলেন ৫৯ রানে। কিন্তু আবার শুরু হ'ল দলের ভাঙন। পেটিফোর্ড ৭ রান্ করে আহত হওয়ায় দলের দুর্ভাগ্যের সূচনা হ'ল। ল্যাংডন আর হোল্ট আসতে না আসতেই নাইডুর বলে ফিরে গেলেন। ওরেল খেলছিলেন ভালোই, কিন্তু চৌধুরীর বল্ তাঁকে ২৮ রানের বেশী করতে দিল না। বোলিং দেখালেন নাইডু; তাঁর মারাত্মক বোলিং খেলার রং বদলালো আবার। ৬ উইকেটে ৩১৭ রান্ উঠলো দিনের শেষে। এইদিন হাজারে, কিষেণচাঁদ আর মানকাদ আউট করবার যে-সমস্ত সহজ সুযোগ হারিয়েছেন তা ক্ষমা করা যায় না।

শেষ দিন ছুটির দিন না হওয়া সত্ত্বেও মাঠ ভরে গেলো লোকে। আজকেই হবে খেলার চরম নিষ্পত্তি। খেলার প্রথম এক ঘণ্টার ঢের আগেই ম্যালে ১৬ রানে আর ল্যাম্বার্ট শূন্য রানে নাইডুর বলেই আউট হলেন। ট্রাইব ২৭ রানে নট আউট রইলেন। কমনওয়েল্থের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো ৩৪৮ রানে। সমস্ত মাঠে সে কী চাঞ্চল্য! ভারতের জয় প্রায় নিশ্চিত।

মুস্তাক আর মানকাদ নামলেন। জিততে হ'লে আর ১১৭ রান্ করতে হবে। কিন্তু সবাইকে নিরাশ করে মানকাদ মাত্র ২ রানে ফিরে গেলেন। মুস্তাকের খেলা গত বারের মতই চমৎকার হচ্ছিল। তারপর মোদি। তিনি ১৭-র বেশী করতে পারলেন না। এলেন অধিনায়ক। কিন্তু ৮৪ রানের মাথায় মুস্তাককে সরতে হ'ল (৪৫)। তরুণ অল-রাউণ্ডার ফাদকার নামলেন। একটা বাউণ্ডারী ও একটা খুচরো রান্ পর পর করে ফাদকার লাঞ্চের কিছু পরেই ভারতের প্রয়োজনীয় রান্ তুলে ফেললেন। চক্ষের নিমেষে কমন্ওয়েল্থের খেলোয়াড়রা ষ্টাম্প উপড়ে নিয়ে ছুটলেন। ভারতের হ'ল গৌরবময় বিজয়—সাত উইকেটে জয়, বড় সহজ কথা নয়। আর দর্শকদের সে কি বিজয়োল্লাস! চেয়ার, বেড়া মাড়িয়ে, ভেঙে হাজারে হাজারে সবাই ছুটলো যুদ্ধজয়ী অধিনায়ক হাজারেকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে, মালা দিতে। তুললো জাতীয় পতাকা। বাংলার মাঠেরই প্রথম সৌভাগ্য হ'ল ভারতকে বিজয়ী রূপে দেখতে।

শিশুসাহিত্যিক নলিনীভূষণ

ছোটদের প্রিয় লেখক, রামধনুর প্রিয় বন্ধু নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত মশাই আর ইহলোকে নেই। সে দুঃসংবাদ তোমরা গত মাসের রামধনুতেই পড়েছ।

নলিনীভূষণের বাড়ী ছিল বরিশাল জেলায়। সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ গৈলা গ্রামে তিনি ১৯০০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে অল্প বয়স থেকেই তিনি সুনাম অর্জ্জন করেন। পরে ইংরাজী ও বাংলা দু'বিষয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে এম্. এ পাশ ক'রে তিনি শিক্ষাব্রতীর কাজ গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই ব্রতই পালন ক'রে গেছেন।

জলপাইগুড়ির ফণীন্দ্রদেব ইন্‌ষ্টিটিউশন্‌, চুঁচুড়ার দেশবন্ধু স্কুল, গৌহাটীর এস্‌. জে. এ. বি. স্কুল, খুলনার বি. কে. ইন্‌ষ্টিটিউশন্‌, এবং পরিশেষে বঙ্গ বিভাগের পর ভদ্রেশ্বর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রূপে তিনি নিজের কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। গৌহাটী আর. এইচ. গার্লস্‌ কলেজ ও খুলনা গার্লস্‌ কলেজে অধ্যাপক রূপেও তাঁকে দেখেছি। ছাত্রদের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল গভীর। গৌহাটীতে তিনি ছিলেন প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রসম্মিলনীর সভাপতি।

কিন্তু শিক্ষাব্রত ছাড়াও নলিনীভূষণের জীবনে আর একটা বড় দিক্‌ ছিল; সেটি হচ্ছে সাহিত্যিক নলিনীভূষণ। অল্প বয়স থেকেই সুলেখক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করেন—বিশেষ ক'রে শিশুসাহিত্যে। ছাত্রজীবনেই তিনি 'সন্দেশ' প্রভৃতি শিশুপত্রিকায় লিখতে সুরু করেন। পরবর্ত্তী জীবনে শিশুসাথী, রামধনু, কৈশোরক প্রভৃতি বিভিন্ন শিশুপত্রিকায় তাঁর অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। গল্প এবং কবিতা—দু'দিকেই তাঁর হাত ছিল চমৎকার। তাঁর অনেক বই পুস্তকাকারেও বেরিয়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই তা পড়েছ।

অত্যন্ত অমায়িক ছিল তাঁর স্বভাব, আর তেমনি সাদাসিধে ছিল তাঁর চাল-চলন। রামধনু-সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর চিঠিতে আলাপ ছিল বহুদিনের। ক্রমে তা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, যদিও দু'জনের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ছিল যথেষ্ট। আবার মজা, এত অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও বহুদিন পর্য্যন্ত কেউ কাউকে চাক্ষুষ দেখেন নি। অবশেষে নলিনীভূষণ একদিন এসে পরিচয় দিয়ে আলাপ করলেন। বন্ধুত্ব হ'ল আরও গভীর। তার পর যখনই কলকাতায় আসতেন একবার রামধনু অফিসে না এলে তাঁর চলত না। রামধনুকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। ছোটদেরও তিনি ছিলেন সত্যিকারের বন্ধু। শিশুসাহিত্যকে কি ক'রে আরও উন্নত করা যায় এ নিয়ে কত আলোচনা হ'ত তাঁর সঙ্গে। বাংলা ভাষায় কিশোরদের জন্য কয়েকখানি মাসিক পত্র আছে কিন্তু আরও ছোটদের জন্য কিছুই নেই এ অভাব তিনি অনুভব করতেন। এ বিষয়ে তাঁর একটি সুন্দর পরিকল্পনা ছিল কিন্তু তা আর কাজে পরিণত করতে পারেন নি।

অল্প কিছুদিন আগেও তাঁর একখানা চিঠি এল। "শীগ্‌গিরই কলকাতা যাচ্ছি, অনেক কিছু আলোচনা এবং পরামর্শ করবার আছে" কিন্তু আর আসা হ'ল না, হঠাৎ শোনা গেল তিনি আর নেই। ছোটরা তাদের একটি অকৃত্রিম বন্ধুকে হারিয়েছে।

তোমাদের স্মরণ করি

১২ই মাঘ—২৬শে জানুয়ারীর পুণ্য প্রভাতে ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। দীর্ঘ শতাব্দীর অধীনতার নাগপাশ-ছিন্ন ক'রে ভারত এবার সম্পূর্ণ স্বাধীন হ'ল। যে মহাপুরুষদের জীবনব্যাপী ত্যাগ ও সাধনার ফলে এই স্বাধীনতা অর্জ্জিত হ'ল, এই পুণ্যদিনে তাঁদের নমস্কার জানাই।

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের জনক, বাংলার মুকুটহীন রাজা
সুরেন্দ্রনাথ

ঋষি শ্রীঅরবিন্দ

ত্যাগিশ্রেষ্ঠ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত মতিলাল

ভারতের বুলবুল্ সরোজিনী

মহামাত্য
পণ্ডিত জওহরলাল

সীমান্ত-গান্ধী আবদুল গফ্ফর খাঁ
ও জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী

দেশবরেণ্য মালব্যজী

নবযুগের দধীচি যতীন্দ্রনাথ দাস

—এবারে মাত্র কয়েকজনের ছবি দেওয়া হ'ল, পরে আরও দেওয়া হবে।—

স্মরণে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

গান্ধী, তোমার নান্দী রচি
ভক্তি, শ্রদ্ধা, নতির সনে,
হাসি হাসি মুখটি তোমার
বারে বারে পড়ছে মনে।

শিশুর ছিলে ঠাকুরদাদা,
বড়র 'বাপু', দীনের মিতা,
দেশের দশের ভাল করাই
ছিল তোমার জীবন-গীতা।
যারা ছিল পিছন ফিরে
টানলে তাদের সমুখ পানে,

বামুন চামার বিভেদ ভুলি
বাঁধল রাখী প্রেমের টানে।
দধীচি গো, তোমার দানে
ভরল দেশের শূন্য ডালা,
তাই ত' সর্বোদয়ের দিনে
গাঁথছি মোরা স্মৃতির মালা।

চন্দননগর

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্

ছেলেবেলায় একবার রাত্রির ট্রেনে মধুপুর না কোথায় যেন যাচ্ছিলাম। হাওড়া ছেড়ে আসবার কিছুক্ষণ বাদেই একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামতে হাঁক শুনলাম, 'কলা! কলা!' বর্দ্ধমান ষ্টেশনে যেমন সীতাভোগ মিহিদানার জন্য, এখানেও তেমনি কলার জন্য একটা হাঁকাহাঁকি লেগে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি প্ল্যাটফর্মের এক কোণে একেবারে কলার ডাঁই, কাঁচা ডাঁশা পাকা পচা কাঁদির গাদি! জায়গাটার নাম দেখে রাখলাম চন্দননগর।

জায়গাটা দেখলাম অনেক বছর বাদে। মোটরে কলকাতা থেকে চুঁচুড়া যাচ্ছিলাম। পথে এক জায়গায় রাস্তার উপর নীল উর্দ্দিপরা একটী লোক আমাদের গাড়ী থামাল। শুনলাম যে গাড়ী এবার ইংরাজ-রাজ্য ছেড়ে ফরাসী-রাজ্য চন্দননগরে ঢুকবে, তাই ফরাসী পুলিশ দেখে নিল যে আমরা বিদেশ থেকে অর্থাৎ কলকাতা থেকে বে-আইনী কোনও জিনিষ ফরাসী মুল্লুকে নিয়ে যাচ্ছি কিনা।

ভাবতে আশ্চর্য্য লাগল। বাংলা দেশেরই মধ্যে মাইল চারেক লম্বা আর মাইল খানেক

চওড়া এক ফোঁটা একটু জায়গা, সেটা আমাদের পক্ষে বিদেশ! তার প্রথম পরিচয় পেলাম পুলিশের পোষাকে আর এই ব্যাপারে। তারপর সহরে ঢুকে ঘুরে দেখলাম যে আমাদের এদিকে ইংরাজী ভাষার মত চন্দননগরে সর্ব্বত্র ফরাসী ভাষার ছড়াছড়ি,—পথেঘাটে, দোকানের সাইন-বোর্ডে, হোটেলের নামে।

এর ইতিহাস হচ্ছে এই: ইংরাজ বণিক্‌রা এ দেশে আসবার কিছু আগে-পরে পোর্টুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার এবং ফরাসী জাতি এ দেশে ব্যবসা করতে আসে। তার মধ্যে ফরাসীরা বাংলা দেশে তাদের আপিস বা 'কুঠী' স্থাপন করবার চেষ্টা প্রথম করে ১৬৭৩ সনে। ফরাসী বণিক্‌দের কর্ত্তা ডু-প্লেসি সাহেব বড়-কিষণপুর, খলিসানি আর গোন্দলপাড়া নামে তিনখানা গ্রাম বন্দোবস্ত নিয়ে ফরাসীদের কুঠী পত্তন করেন। কাছাকাছি সহর হুগলীতে তখন ওলন্দাজ বণিক্‌দের খুব প্রতিপত্তি। তাদের শত্রুতার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ফরাসীরা এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরে ড্য-স্লাঁদ্ সাহেবের আমলে ১৬৮৮ খৃঃ তারা আবার এখানে ফিরে এসে আরও কয়েকখানা গ্রাম বন্দোবস্ত নিয়ে কুঠী, কেল্লা ইত্যাদি তৈরী করে নিয়ে পাকাপাকি রকমে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে সুরু করে।

তাদের এই কুঠীর নাম যে কি করে এবং কবে থেকে চন্দননগর হ'ল, তা বলা শক্ত। তবে এ কথা ঠিক যে ড্য-স্লাঁদ সাহেবের ডায়েরীতে এ নামটা প্রথম দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন যে এখানে অনেক চন্দনগাছ ছিল, কেউ বা বলেন যে এখান থেকে প্রচুর চন্দনকাঠ রপ্তানী হ'ত, তাই এর নাম চন্দননগর হয়। আবার কেউ কেউ বলেন যে তা নয়, আসলে এই জায়গাটার নাম ছিল চন্দ্রনগর, কারণ গঙ্গার ওপার থেকে এদিকে দেখলে নাকি চন্দননগরকে দেখা যেত বাঁকা চাঁদের মত। তা থেকে ক্রমে চন্দননগর হয়েছে। তখনকার কাগজপত্রে দেখা যায় যে কোথাও বা জায়গাটাকে 'চাঁদের সহর' (Vill'e de la Lune) বলা হয়েছে, আবার কখনও বা 'চন্দনের বন' (Ville du bois de Santal) বলা হয়েছে।

কলকাতা সহর পত্তন হবার আগেই চন্দননগরের বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়। পরে বিখ্যাত ফরাসী শাসনকর্ত্তা ডুপ্লে সাহেবের আমলে চন্দননগর সহর খুব সুন্দরভাবে গড়ে তোলা হয়। কিন্তু বেশী দিন এ সুখ সইল না। ইংরাজ আর ফরাসী জাতির মধ্যে সর্ব্বদা ঝগড়া চলত ইউরোপে। এ দেশেও বাণিজ্যের ব্যাপারে রেষারেষি খুব চলছিল। ক্রমে যুদ্ধ লেগে গেল। ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইভ চন্দননগর দখল করে নিলেন। এখানেও একজন দেশদ্রোহীর সাহায্যে তিনি কাজ হাসিল করেন। সে ছিল টেরেনো নামে একটি ফরাসী যুবক।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বন্দিবাসের যুদ্ধে হেরে ফরাসীদের এ দেশে রাজত্ব করবার আশা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু গোলমাল একেবারে মিটল গিয়ে ফরাসীসম্রাট্ নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর। ১৮১৬ সনে যে সন্ধি হ'ল, তাতে ইংরাজরা চন্দননগর সহরটুকু দয়া করে ফরাসীদের ফিরিয়ে দেন। সেই থেকে জায়গাটা ফরাসীদের দখলে আছে। তাই চন্দননগরের আর এক নাম ফরাসডাঙ্গা।

এই ফরাসীরাজত্বও এবার শেষ হয়েছে।

ভারতবর্ষ যখন ইংরাজ শাসন থেকে মুক্তি পেল তখনও বাংলাদেশের এই মাটীটুকুতে ফরাসীদের দখল। চন্দননগরের বাঙালীরাও দাবী তুললেন যে ফরাসীদের চলে যেতে হবে। অনেক আন্দোলনের পর ঠিক হ'ল যে বেশীর ভাগ লোকে যা চাইবে তাই হবে। সেই অনুসারে গত ১৯শে জুন তারিখে যে ভোট নেওয়া হয় তাতে জানা গেল যে শতকরা নিরানব্বই জন অধিবাসীই চান স্বাধীনতা। তার পর ২৬শে জুন তারিখে চন্দননগরে স্বাধীনতা-উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। এখন পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশের মধ্যে চন্দননগরকে ফিরিয়ে দেবার তোড়জোড় চলছে।

বিপ্লবীবীর কানাইলাল আর রাসবিহারীর দেশ এই চন্দননগর। প্রথম মহাযুদ্ধে প্রথম যে কুড়িজন বাঙালী সৈন্যদলে যোগ দেন, তাঁরা চন্দননগরেরই লোক ছিলেন। আগেকার দিনে এর গৌরব ছিলেন এখানকার কবিওয়ালারা, যাঁরা মুখে মুখে ছড়া বেঁধে গানের প্রতিযোগিতা করতেন। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন আণ্টনী ফিরিঙ্গী, নিতাই দাস ইত্যাদি। নিতাই দাস আর ভবানী বেণের মধ্যে যখন গানের লড়াই হ'ত, তা শুনতে অনেক দূর থেকে পর্য্যন্ত লোক আসত। আমরা যেমন বলি 'গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ', তখনকার দিনে বলতে হ'লে লোকেরা বলত 'নিতে-ভবানীর লড়াই'।

কলকাতা থেকে ট্রেনে ২১ মাইল উত্তরে চন্দননগর সহর। গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়ে গেলে আরও কিছু কমই হবে। গঙ্গার পশ্চিম কূলে সহরটী। গঙ্গার ধারে বেশ একটী রাস্তা এবং ভাল বাঁধানো ঘাট আছে। এই রাস্তার উপরেই বড় বড় আপিস, হোটেল ইত্যাদি। ২২৫ বছরের পুরোনো একটী গির্জ্জাও এখানে আছে। বেশী পুরোনো জিনিষ বড় একটা আর নেই, ক্লাইভ প্রায় সবই ধ্বংস করেন। নতুন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এবং কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির উল্লেখযোগ্য। এখানকার বিখ্যাত জিনিষের মধ্যে এখনও আছে তাঁতীদের হাতে বোনা কাপড়, যাকে বলা হয় ফরাসডাঙ্গার ধুতি বা শাড়ী। চন্দননগরের তৈয়ারী কাঠের চেয়ারেরও বেশ আদর আছে।

অনর্থের মূল?

ব্রহ্মচারী মুকুন্দ

গত কার্ত্তিক সংখ্যা রামধনুতে 'অনর্থের মূল' নামে একটি লেখা তোমরা পড়েছ। সেই দস্যু আর সন্ন্যাসীর কথা। ব্যাপারটি কিন্তু ঐখানেই শেষ হয় নি। সন্ন্যাসী ঠাকুর তার পর কি করলেন সেই কথা এবারে শোন।

বনের মধ্যে এক ঘড়া মোহর পেয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর খুবই চমকে উঠেছিলেন। অর্থ অনর্থের মূল ভেবে তিনি লোভ ত্যাগ করে দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করলেন। তারপর দূরে—বহু দূরে আর এক বনের মধ্যে চলে গেলেন। সন্ন্যাসী সেই বনেই রয়ে গেলেন এবং বনের ফলমূল খেয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। এইভাবে দিনের পর দিন—মাসের পর মাস— বছরের পর বছর কেটে গেল।

বহুদিন পরের কথা। সন্ন্যাসী ঠাকুর তখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর ইচ্ছা হ'ল, লোকালয়ে এসে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবেন। তাই হ'ল। সন্ন্যাসী ঠাকুর বন হ'তে লোকালয়ে এসে মাধুকরী করতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে সাধন-ভজনও চলতে লাগল। এইরূপে সন্ন্যাসী ঠাকুরের কিছুদিন বেশ চলল।

এখন, সন্ন্যাসী ঠাকুর যে গ্রামে ছিলেন, তার কাছেই ছিল একটি নগর। হঠাৎ একদিন বন্যা এসে গ্রাম ও নগর ভাসিয়ে নিয়ে গেল। দেখতে দেখতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিল, চারিদিকে হাহাকার পড়ে গেল; রাস্তা-ঘাটে কেবলই নর-কংকাল, মৃত জীব-জন্তুর ছড়াছড়ি; আকাশ-বাতাস দুর্গন্ধময় হ'য়ে উঠল। এদিকে লোকে কু-খাদ্য খেতে লাগল; শেষে তা-ও জোটে না, দিনের পর দিন উপবাস! লোকেরা প্রাণের ভয়ে পালাতে লাগল; চারিদিকে ক্রন্দনের রোল উঠল। ক্রমে গ্রাম ও নগর শ্মশান হয়ে উঠল।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রাণে ভীষণ ব্যাকুলতা এল, তিনি কাতর প্রাণে রাত-দিন ভগবান্‌কে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ আর থামল না—বরং ক্রমান্বয়ে আরো বেড়েই চলল। সন্ন্যাসী ঠাকুরের আর ভিক্ষা জুটল না; তিনি বাধ্য হয়ে সেই গ্রাম ছাড়লেন এবং মনের দুঃখে একটি নদীর তীর ধরে চলতে লাগলেন। এই ভাবে দিনের পর দিন চলতে চলতে শেষে তিনি একটি বনের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই তিনি বনের একটি

গাছের তলায় বসে পড়লেন, আর ভাবতে লাগলেন, শ্রীভগবানের কি অপূর্ব্ব লীলা! মুহূর্ত্তের মধ্যে আজ শত শত লোক আপন জনকে বিসর্জ্জন দিয়ে কোথায় কোন্ এক অজানার দেশে চলে যাচ্ছে! এইভাবে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন কিছু দূরে—একটা নরকংকাল। ওঃ, নর-কংকাল! কি আশ্চর্য্য! এই সুদূর নিভৃত বনানী-পথেও নরকংকাল! না—না, এ অন্য কোন জীবের কংকাল। তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। এমনি সময়ে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, বহুদিন পূর্ব্বে এমনি এক জায়গায় এক ঘড়া মোহরের লোভে তিন জন দস্যুর মৃত্যু হয়েছিল। তবে কি এই সেই স্থান?

তার পর সন্ন্যাসী ঠাকুর মনের খেয়ালে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ খোঁজার পর হঠাৎ চোখে পড়ে গেল—সেই পূর্ব্বের এক ঘড়া মোহর তেমনি রয়ে গেছে,—দিনের আলোয় তেমনি ঝক্‌ঝক্ করছে! তখন সন্ন্যাসী ঠাকুরের সেই দুর্ভিক্ষ-মহামারী-আক্রান্ত গ্রাম ও নগরের কথা মনে পড়ল। আর সেই সঙ্গে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি ভাবলেন, নিশ্চয়ই এই মোহরের দ্বারা তাদের অনেক উপকার হ'তে পারে। সন্ন্যাসী ঠাকুর আর দেরী করলেন না, তখনই সেই মোহর নিয়ে ছুটলেন তাঁর নির্দ্দিষ্ট গ্রাম ও নগরের দিকে।

অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সেই গ্রাম ও নগরে এসে পৌঁছলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে দেরী না করে মোহরগুলি ভাঙ্গিয়ে সুকার্য্যে ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করলেন। তাড়াতাড়ি ডাক্তার-কবিরাজ ডেকে ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করলেন, সেবা করবার জন্যে বেতনভুক্ লোক নিযুক্ত করলেন। চারিদিক্ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দাতব্য চিকিৎসালয়, পানীয় জলের সুব্যবস্থা প্রভৃতি করলেন। আর এদিকে যারা না খেয়ে মরছিল তাদের জন্যে বহুদূর হ'তে চাল-ডাল, তরি-তরকারী নিয়ে এসে প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করতে লাগলেন। অন্নসত্র খুলে দিলেন, পোষাক-পরিচ্ছদের সুব্যবস্থা করলেন। চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেল; ধীরে ধীরে সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রাম ও নগর সবল, সুস্থ হ'য়ে উঠল। লোকের মুখে আবার হাসি দেখা দিল।

সন্ন্যাসী ঠাকুর দেখলেন, অর্থ অনর্থের মূল নয়। অর্থ যেমন একদিকে মৃত্যু নিয়ে আসে, আবার অপর দিকে ঠিক তেমনি জীবনও নিয়ে আসে। অর্থের কোন দোষ নেই, মানুষ তার সৎ-অসৎ ব্যবহারের জন্য দায়ী। সন্ন্যাসী ঠাকুরের ভুল ভেঙ্গে গেল।

তারপর, সন্ন্যাসী ঠাকুর উভয় দিক্ দেখে, সমস্ত ছেড়ে গভীর সমাধি-মগ্ন হলেন।

এবারকার বিজ্ঞান কংগ্রেস

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

তোমাদের মধ্যে যারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড় তারা নিশ্চয়ই জান, মাত্র কয়েকদিন আগে পুণা সহরে মহা সমারোহের সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৭তম অধিবেশন হয়ে গেছে।

১৯১৪ সনে কলকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি হলে স্যর আশুতোষের সভাপতিত্বে প্রথম যে বার এই কংগ্রেসের উদ্বোধন হয় তখন বোধ হয় কেউই ভাবতে পারে নি যে ভবিষ্যতে এই কংগ্রেস এত বড় হয়ে উঠবে। আজ এই কংগ্রেস শুধু ভারতীয় পণ্ডিতদেরই মিলন-ক্ষেত্র নয়—এটি এখন একটি আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রতি বছরই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা এসে এতে যোগ দিয়ে সম্মেলনের গৌরব বাড়াচ্ছেন; আমরাও সেই সুযোগে সেই সব মনীষীদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পাচ্ছি। তাঁদের চাক্ষুষ দেখে, তাঁদের বক্তব্য শুনে, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে ধন্য হচ্ছি।

এবারেও এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ থেকে ২২ জন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী এসে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বৈজ্ঞানিক দম্পতি মাদাম আইরিন কুরি (মাদাম কুরির মেয়ে) ও তাঁর স্বামী অধ্যাপক ফ্রেডরিক জোলিও কুরি—যাঁরা নতুন রেডিও-য়্যাকৃটিভ ধাতু আবিষ্কার ক'রে ও সেই সম্বন্ধে নতুন নতুন গবেষণা ক'রে কয়েক বছর আগে এক সঙ্গে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ছিলেন বিলাতের রয়াল্ সোসাইটির বর্ত্তমান সভাপতি, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক স্যর্ রবার্ট্ রবিন্সন্—যিনি ১৯৪৭ সনে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। আর ছিলেন আয়ার্ল্যাণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত এক্স-রে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বার্নাল্, আমেরিকার ওয়াশিংটন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর কোয়ণ্টামবাদ ও কস্‌মিক্ রশ্মি-বিশারদ ডক্টর কম্প্‌টন্ (যিনি ১৯২৭ সনে নোবেল পুরস্কার পান), আমেরিকার ন্যাশনাল ব্যুরো অব্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড্‌স্-এর অধ্যক্ষ ডক্টর কণ্ডন্, বার্লিনের (বর্ত্তমানে আমেরিকাবাসী) প্লাষ্টিক-বিশারদ অধ্যক্ষ ডক্টর হেরমান্ মার্ক, রাশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত জৈব রসায়নবিদ্ অধ্যাপক এঙ্গেলহার্ট ও অধ্যাপক অগার (ইউ. এন্. ও'র বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি শাখার অধ্যাপক), ক্যানাডার ডক্টর মিলার, ফ্রান্সের ডক্টর ফিশার, ডক্টর ব্লুমপট, সুইডেনের অধ্যাপক ভোল্ড,

অধ্যাপক ব্রাইডবেক্ এবং ঐ রকম আরও কয়েকজন। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা হবে পাঁচ হাজারেরও বেশী। একসঙ্গে এতগুলি পণ্ডিতের সমাবেশ বড় সহজ কথা নয়!

সম্মেলনের মূল সভাপতি হয়েছিলেন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। ইনি দীর্ঘদিন কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেছেন, কিছুদিন ঐ কলেজের অধ্যক্ষও ছিলেন। কিন্তু এঁর আসল খ্যাতি হচ্ছে ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ বা পরিসংখ্যান বিদ্যায়। ঐ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ এ দেশে বোধ হয় বিশেষ কেউ নেই। ঐ বিষয়ে গবেষণা ক'রে তিনি ইতিপূর্ব্বেই অক্সফোর্ডের সুবিখ্যাত ওয়েল্‌ডন্ পুরস্কার পেয়েছেন এবং বিলাতের রয়াল্ সোসাইটির সদস্য (এফ্. আর. এস্) হয়েছেন। ১৯৪১ সনে ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ বিভাগের অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। এ ছাড়া মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সঙ্গেও তিনি দীর্ঘকাল ধরে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। সভাপতির অভিভাষণে ইনি ভারতের বিরাট লোকবলকে কি ক'রে জাতীয় সম্পদ্ বৃদ্ধির পরিকল্পনায় কাজে লাগানো যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেন।

মূল সভাপতি ছাড়া সম্মেলনের বিভিন্ন শাখায় আর যে সব বৈজ্ঞানিক সভাপতিত্ব করেছেন তাঁদের মধ্যে আরও পাঁচ জন ছিলেন আমাদের বাংলা দেশের লোক। পদার্থবিজ্ঞান (ফিজিক্স) শাখার সভাপতি হয়েছিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর আর. এন্ ঘোষ। ইনি আগে মহেন্দ্র সরকার প্রতিষ্ঠিত কলকাতার ভারতীয় বিজ্ঞান-পরিষদে (ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন্ ফর্ দি কাল্‌টিভেশন্ অব্ সায়ান্স) গবেষণা করতেন। শব্দ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে ইনি প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছেন। রসায়ন (কেমিস্ট্রি) শাখার সভাপতি হয়েছিলেন ডক্টর জে. কে. চৌধুরী। ইনি তৈল-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ; কয়লা, সেলুলোজ এ সব নিয়েও গবেষণা করেছেন। ১৯৪৭ সন পর্য্যন্ত ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। বর্ত্তমানে কলকাতায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে রসায়ন বিভাগের ভার নিয়ে আছেন। গণিত শাখার সভাপতি হয়েছিলেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর নলিনীমোহন বসু। এর আগে ১৯৪৮ সন পর্য্যন্ত ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলরও হয়েছিলেন। শরীর-বিজ্ঞান (ফিজিয়লজি) শাখার সভাপতি হয়েছিলেন ডক্টর কালিদাস মিত্র। ইনি বর্ত্তমানে ভারত সরকারে পুষ্টিবিজ্ঞান

বিষয়ে পরামর্শদাতা রূপে নিযুক্ত আছেন। এর আগে বিহার সরকারেও পুষ্টি-বিজ্ঞানবিদ্ হিসাবে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি হয়েছিলেন ডক্টর ভূদেবচন্দ্র বসু। ইনি বর্ত্তমানে আইজৎনগরের ভারতীয় পশুচিকিৎসা-গবেষণামন্দিরে গবেষকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ম্যালেরিয়া, কীট-তত্ত্ব ও পশুস্বাস্থ্য সম্বন্ধে ইনি মূল্যবান্ গবেষণা করেছেন।

অন্যান্য শাখা-সভাপতিদের মধ্যে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছেন সংযুক্তপ্রদেশবাসী ডক্টর মাহেশ্বরী। ইনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ। এর আগে গত বছর পর্য্যন্ত ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিদ্যা (বায়োলজি) বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। শীগ গিরই ইয়োরোপে ষ্টকহল্ম্ সহরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানীদের একটি আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন হচ্ছে। ডাঃ মাহেশ্বরী ঐ সম্মেলনের অন্যতম সহ-সভাপতি মনোনীত হয়েছেন। কৃষিবিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছেন ভারত সরকারের কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রামলাল শেঠী। ইনি পাঞ্জাব প্রদেশবাসী। মনো-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেছেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কালীপ্রসাদ। ভূতত্ত্ব (জিওলজি) শাখার সভাপতিত্ব করেছেন শ্রীযুক্ত জে. কোট্স্। খনিজ তেল ও ভূস্তর সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে ইনি খ্যাতিলাভ করেছেন। ইনি জাতিতে ইংরেজ। নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতিত্ব করেছেন ডক্টর হাইমেনডর্ফ। ইনি বিদেশী (ভিয়েনায় জন্ম) হ'লেও গবেষণা করেছেন আমাদেরই দেশে। আসাম সীমান্তের উপজাতিদের সম্বন্ধে এবং হায়দ্রাবাদের আদিমবাসীদের নিয়ে এঁর গবেষণা উল্লেখ-যোগ্য। কিছুদিন হায়দ্রাবাদের ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক রূপেও কাজ করেছেন ইনি। সম্প্রতি ইনি হায়দ্রাবাদ সরকারের আদিম অধিবাসী সম্পর্কে পরামর্শদাতা হয়েছেন। পূর্ত্ত ও ধাতুবিজ্ঞান (এঞ্জিনীয়ারিং ও মেটালার্জি) শাখার সভাপতিত্ব করেন ডক্টর মালহোত্র। ইনিও পাঞ্জাবের লোক। ধাতুবিজ্ঞানীদের পক্ষে পরম সম্মানজনক লণ্ডনের কাউন্সিল অব আয়রন্ এণ্ড ষ্টীল ইন্ষ্টিটিউট্ থেকে কার্ণেগী বৃত্তি লাভ এঁর কৃতিত্বের অন্যতম পরিচায়ক। বর্ত্তমানে ইনি ভারত সরকারের রেলওয়ে এবং ধাতু ও জ্বালানী সম্পর্কে পরামর্শদাতা। চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসা শাখার সভাপতিত্ব করেন ডক্টর রাধাকৃষ্ণ রাও। ইনি বোম্বাই সরকারের পুষ্টিবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রধান পরামর্শদাতা, বাড়ী গুণ্টুর। শিশুদের অসুখ—বিশেষ ক'রে লিভারের অসুখ নিয়ে গবেষণা ক'রে ইনি খ্যাতিলাভ করেছেন।

সম্মেলনের শাখা-সভাপতিদের মধ্যে সব চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন ডক্টর সুখাত্মা। এঁর বয়স ৩৮ বছর। ইনি পুণারই ছাত্র। ইনি ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ বা পরি-সংখ্যান বিদ্যা বিভাগে সভাপতিত্ব করেন। ঐ বিভাগে এরই মধ্যে ইনি দেশবিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। ১৯৪৭ সনে ওয়াশিংটনে যে আন্তর্জ্জাতিক ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ সম্মেলন হয় তা'তে ইনি ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। ডক্টর সুখাত্মা বর্ত্তমানে দিল্লীর কৃষি-গবেষণা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

মহাত্মা গোখেলের স্মৃতি-বিজড়িত পুণার সুবিখ্যাত ফার্গুসান্ কলেজের সুরম্য ভবনে সাত দিন ধরে এই মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন ভারত সরকারের শিল্পসচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধনের দিন প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালও বিজ্ঞানীদের সম্বোধন ক'রে একটি ভাষণ দেন এবং নতুন ভারত গড়ে তুলতে তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম রাও জয়াকর। সম্মেলনের আলোচনা-সভায় বিদেশী বিজ্ঞানীরাও বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন।

আসছে বছর কলকাতায় এই সম্মেলন হবে ব'লে ঠিক হয়েছে।

নামের আগে

আমাদের দেশে নামের আগে শ্রদ্ধা, সম্মান, ভদ্রতা বা স্নেহসূচক কতকগুলি শব্দ ব্যবহারের নিয়ম অনেক দিন থেকে চলে আসছে। গুরুজন বা শ্রদ্ধেয় কারো নাম উল্লেখ করতে গেলে আমরা বলি 'শ্রীযুত' বা 'শ্রীযুক্ত' (বা 'শ্রীযুক্তা')। আগে শ্রীযুক্তের আগে একটা 'শ্রীল' শব্দও অনেক সময়ে ব্যবহার করা হ'ত। স্নেহসম্পর্কীয় কারো নাম উল্লেখ করতে

হ'লে বলি 'শ্রীমান্' বা 'শ্রীমতী'। অপর কারো নাম উল্লেখ করতে হ'লে ভদ্রতাস্বরূপ 'শ্রী' শব্দটি যোগ করা হয়। নিজের নামেও। আজকাল অবশ্যি অনেকে নিজের নামে 'শ্রী' শব্দটি যোগ করা পছন্দ করেন না। রবীন্দ্রনাথও শেষ জীবনে ওটা বাদ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ আবার অপরের নাম থেকেও সৌজন্যসূচক শ্রী শব্দটি বাদ দিতে সুরু করেছেন।

মনে পড়ে ছেলেবেলা ঠাকুরদা' আমাদের আত্মীয়-স্বজনের এবং পূর্ব্বপুরুষদের নাম মুখস্থ করাতেন। যেমন—"তুমি কার পুত্র ?—তুমি কার পৌত্র ?—তুমি কার প্রপৌত্র ? তোমার পিতামহ কে ?—তোমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ কে ? তার পর তুমি কার দৌহিত্র ?—কার প্রদৌহিত্র ?" ইত্যাদি। প্রত্যেক বার নামের সঙ্গে, এমন কি নিজের নামের সঙ্গেও, ঐ রকম বিশেষণ যোগ না করলে ধমক খেতে হ'ত। এখনকার ঠাকুরদা'রা নাতিদের ও রকম শেখান কিনা জানা নেই, তবে আজকালকার ছেলেদের ভিতর নিজের দু'পুরুষের ওপর নাম বলতে পারে এমন ছেলে আমার নজরে খুব বেশী আসে নি। শ্রী, শ্রীযুক্ত তো চুলোয় যাক্!

ইংরেজীতে নামের আগে বলা হয় 'মিষ্টার', সংক্ষেপে Mr.। বিবাহিতা মেয়েদের 'মিসেস্' (Mrs.), অবিবাহিতা মেয়েদের 'মিস্'। ছোট ছেলেদের বলা হয় মাষ্টার (Mr.)। ইংরেজীর অনুকরণে বাংলায়ও অনেক অবিবাহিতা মেয়ে শ্রীমতীর বদলে 'কুমারী' লিখে থাকেন। লিখবার সময়ে আগে মিষ্টার যোগ না ক'রে শেষে 'এস্কোয়ার' কথাটি যোগ করার রেওয়াজও আছে। কিন্তু দু'টো একসঙ্গে চলে না। ইংরেজদের অনুকরণে আমাদের মধ্যেও মিষ্টার শব্দটি চলে এসেছে।

আমাদের দেশে 'বাবু' শব্দটিও নামের পরে সম্মানসূচক ভাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন বঙ্কিম বাবু, রবি বাবু। কিন্তু ইংরেজ আমলে সাহেবরা এই 'বাবু' শব্দটি নামের আগেও ব্যবহার করতেন এবং একটু ইতর বিশেষ ক'রে করা হ'ত বলে 'বাবু'র সম্মান অনেকটা নেমে গিয়েছিল। সাহেবরা অধীনস্থ কেরাণীদেরও বলতেন 'বাবু'। সরকারী কাগজ-পত্রেও এই বাবু ও মিষ্টারের পার্থক্য মেনে চলা হ'ত। নিম্নপদের সরকারী কর্ম্মচারীর (এমন কি সাবডেপুটি, ডেপুটি, মুন্সেফ প্রভৃতি উচ্চকর্ম্মচারীদেরও) নামের আগে লেখা হ'ত 'বাবু'। আবার সেই লোকটিই যদি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা ঐ রকম পদে প্রমোশন পেতেন অমনি সরকারী কাগজে তাঁর নামের আগে 'বাবু' শব্দ ঘুচিয়ে 'মিষ্টার' কথাটি বসিয়ে দেওয়া হ'ত। যে বিকৃত মানসিক অবস্থা থেকে এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়েছিল তা তোমাদের কাছে হয়তো খুবই হাস্যকর মনে হবে। কিন্তু সে আমলের সরকারী নিয়মকানুনে এ রকম মজার মজার অনেক কাণ্ডই দেখা যেত, এবং বোধ হয় এই জন্যই কোন কোন 'বাবু' এজলাসে 'বাবু' বলে সম্বোধন করলে ক্ষেপে যেতেন। মাত্র কয়েক বছর আগেও খবরের কাগজে দেখেছি, সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে সাক্ষী হাকিমকে 'বাবু' বলে সম্বোধন করায় সেই হাকিম সাহেব (?) তাকে জরিমানা করে ছেড়েছেন। সুখের বিষয়, স্বাধীন ভারতে এ সব বাবু-মিষ্টারের বালাই ঘুচিয়ে সকলেরই আগে 'শ্রী' ব্যবহার করার নিয়ম হয়েছে।

কিন্তু এই শ্রী নিয়েও অনেক গোলমাল হয়ে গেছে। শ্রী হচ্ছে সম্পদ্ এবং জ্ঞানের

প্রতীক্। কাজেই এর মধ্যে পৌত্তলিকতার ছাপ আছে মনে ক'রে মুসলমানরা এ নিয়ে এক সময় খুব আন্দোলন করেন—যার ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও তার প্রতীক্ চিহ্ন থেকে 'শ্রী' বাদ দিতে হয়। এর আগে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের নামের আগেও নির্বিচারে শ্রী ব্যবহার করা হ'ত। এমন কি নবাবী আমলেও। সেকালকার পুরোনো দলিলপত্রে ও রকম বহু দেখা গেছে। যাই হোক, বর্ত্তমানে তাঁদের নামের আগে সাধারণতঃ 'জনাব' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। 'মৌলবী' কথাটিও অনেকে ব্যবহার করেন, মিষ্টার লিখলেও আপত্তি করেন না,—যেমন করেন না বিদেশী ইয়োরোপীয়রা তাঁদের নামের আগে শ্রী বা শ্রীযুক্ত ব্যবহার করলে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই রকম নামের আগে বিশেষণ শব্দ প্রয়োগের রীতি আছে। ফরাসীরা নামের আগে ব্যবহার করেন মঁসিয়, (বিবাহিতা মেয়েরা মাদাম, কুমারীরা মাদাময়জেল), জার্মানরা 'হের্', ইটালিয়ানরা সিনর, ওলন্দাজরা (হল্যাণ্ডের লোকেরা) মান্হীর, বর্ম্মীরা 'উ'।

পোকামাকড়ের শব্দ

ঝিঁঝিঁপোকার 'তান' বা 'সঙ্গীত আমাদের দেশের বহু কবিকে বিচলিত করেছে—অন্ততঃ সেই রকম আভাস তাঁরা তাঁদের কবিতার মধ্যে দিয়েছেন। কিন্তু ঝিঁঝিঁপোকার শব্দ মোটেই তার কণ্ঠসঙ্গীত নয়। প্রাণিবিজ্ঞানীরা বলেন, ঝিঁঝির পাখায় করাতের মত ছোট ছোট দাঁত বসানো আছে, আর অন্য পাখায় আছে একটা উঁচু অংশ—দেখতে অনেকটা আলির মত। ঐ উঁচু জায়গাটা পাখার দাঁতের ওপর ঘষলে একটা একটানা শব্দ হয় এবং ঝিঁঝির সঙ্গীত আসলে পাখার এই ঘষাঘষি ছাড়া আর কিছু নয়। গঙ্গাফড়িং যে শব্দ করে সেও ঠিক এই ভাবে।

পোকামাকড়দের মধ্যে মুখে শব্দ করার ক্ষমতা প্রায় কারোই নেই। ভ্রমরের গুঞ্জন আসলে তার পাখা নাড়ার শব্দ। মশার গুণ গুণ, মাছির ভন্ ভন্, মৌমাছির গুণগুণানি—এ সমস্তই ঐ একই জিনিষ—খুব দ্রুত পাখা নাড়ার ফলে বাতাসে কাঁপুনি ওঠে, আর তাইতেই ও রকম শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

কাঠপোকা কট কট শব্দ করে এ হয়তো অনেকে লক্ষ্য করেছ। কিন্তু সেও তার মুখের শব্দ নয়—কাঠের গায়ে মাথা ঠোকার শব্দ।

পণ্ডিতেরা বলেন, বেশীর ভাগ পোকামাকড়ই যে শুধু শব্দ করতে পারে না তাই নয়, শব্দ তারা শুনতেও পায় না। প্রজাপতির সামনে হর্ণ বাজিয়ে তাঁরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন প্রজাপতির চালচলনে কোন পরিবর্ত্তনই দেখা যায় নি। শুনবার ক্ষমতা থাকলে ওই ভীষণ শব্দে সে নিশ্চয়ই ঠিক থাকতে পারত না।

তুমি কি জান

আল্‌ফাবেট্—ইংরেজী অক্ষরকে বলা হয় আল্‌ফাবেট। কথাটা এসেছে গ্রীক্

থেকে। ইংরেজীতে যেমন এ. বি (A, B), গ্রীক ভাষায় তেমনি 'আল্‌ফা' আর 'বিটা' (α, β)। সেই থেকে হ'ল আল্‌ফাবেট। আরবী ভাষায়ও প্রথম দু' অক্ষরকে বলা হয় 'আলিফ' আর 'বে'।

মন্বন্তর—কথাটার মানে ছোটখাট প্রলয়,—চলতি কথায় খুব বড়দরের দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতিকে বলা হয়; যেমন ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, পঞ্চাশের মন্বন্তর। কথাটার আসল অর্থ কিন্তু—'মনুর অন্তর' অর্থাৎ মনুর রাজত্বের শেষ। হিন্দু শাস্ত্রে বলে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা একবারে যত দিন জেগে থেকে সৃষ্টি পালন করেন সেই হচ্ছে এক 'কল্প'। কল্পের শেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন, সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় প্রলয়। এক-একটি কল্পে আবার পর পর ১৪ জন মনু রাজত্ব করেন। এক মনুর রাজত্বশেষে এক একটি ছোটখাট প্রলয় দেখা দেয়—সেই হচ্ছে মন্বন্তর। ঐ শাস্ত্রমতে এখন পৃথিবীতে চলছে বৈবস্বত মনুর রাজত্ব।

চতুরঙ্গ—এক রকম খেলার নাম। চলতি কথায় বলে 'দাবা'। অনেকটা যুদ্ধের মত ক'রে খেলতে হয় বলে 'চতুরঙ্গ' নাম দেওয়া হয়েছে। এর ঘুঁটিগুলিও সেই রকম—রাজা, মন্ত্রী, অশ্ব, গজ, নৌকা, পদাতিক (ব'ড়ে)।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

গত সংখ্যার তুলনায় এ সংখ্যা রামধনু অনেক আগেই বার করা গেছে, যদিও মাসের একেবারে গোড়ায় বার করা সম্ভব হয় নি। একবার দেরী হয়ে গেলে তা সামলে নিতে একটু দেরী হবে বৈকি! আগামী বারেও হয়তো একটু দেরী হবে।

এই চিঠি যখন তোমাদের হাতে পড়বে তখন ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র—আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন জাতি। ভারত-ইতিহাসের এই স্মরণীয় দিনে প্রার্থনা করি—আমরা যেন এ স্বাধীনতার যোগ্য হ'তে পারি। কবি অতুলপ্রসাদের বাণী—"ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে" যেন সার্থক হয়।

একজন গ্রাহিকা, শ্রীমতী কমলা নিয়োগী (কাশী) জিজ্ঞাসা করেছেন, আমরা সত্যি

স্বাধীনতা পেলাম কিনা। এর উত্তর—"অবশ্য পেয়েছি।" ভারতের শাসন ব্যাপারে বিদেশীর কর্তৃত্ব লোপ পেয়েছে এবং সে ভার সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের হাতে এসেছে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। যে সব ভারতীয়ের হাতে বর্ত্তমানে দেশের শাসন-ক্ষমতা রয়েছে তাঁরা জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধি কিনা—তাঁদের সে যোগ্যতা আছে কিনা তা জনগণই স্থির করবে পরবর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচনে। যদি তাঁরা অধিকাংশের সমর্থন না পান তবে নেতৃত্বের ভার নেবেন নতুন দল—জনগণ যাদের বেছে নেবে। পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন দেশেই এই নিয়ম। ইংলণ্ডের শাসন-কর্তৃত্ব কখনও রক্ষণশীল দলের হাতে, কখনও শ্রমিক দলের হাতে, কখনও বা অন্য কোন দলের হাতে চলে আসে, তাই বলে কি সে দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করতে পারে? এখন যাঁরা এ দেশের শাসন-কর্তৃত্ব চালাচ্ছেন ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে তাঁরাই যে ছিলেন সব চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধি—এ তো অস্বীকার করার উপায় নেই!

রামধনুর একজন পুরোনো গ্রাহিকা শ্রীবেলা সরকার (মাধিপুরা) চিঠিপত্র বিভাগ সম্বন্ধে লিখেছেন—"এতদিন রামধনুর একটা বৈশিষ্ট্য এবং মৌলিকত্ব ছিল ব্যক্তিগত চিঠির জবাব না দেওয়া; এখন তা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে দেখে দুঃখিত।" এ বিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বেও আলোচনা করেছি, এবং বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরীক্ষামূলক ভাবে করা হচ্ছে এও জানিয়েছি। গ্রাহকদের যদি এ ব্যবস্থা ভাল না লাগে তবে অবশ্যই পরিবর্ত্তন করা হবে। এ বিষয়ে আবার তোমাদের মতামত জানিও। আর কয়েকখানি চিঠির অংশ:—শ্রীশর্মিলা সরকার (কলিকাতা)—"পাঠ্য পুস্তকের নীরস অধ্যায়গুলি পাঠ করতে করতে মন যখন ক্লান্ত হয়ে ওঠে তখন রামধনুর মধুর স্পর্শই আমার প্রাণে জাগায় জীবনের স্পন্দন। তাই তো রামধনু আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এর প্রতিটি গ্রাহক-গ্রাহিকাকেই আমি আমার ভাইবোনের মত ভালবাসি।" শ্রীঅমলকুমার মিত্র (গৌহাটী)—"শুনে সুখী হবেন, আমাদের কটন কলেজের বার্ষিক সুকুমার কলা-প্রতিযোগিতায় গত বারের মত এবারেও আমি 'বেষ্ট ম্যান্' পুরস্কার লাভ করেছি।" নিশ্চয়ই সুখী হয়েছি। কবি ঠিকই লিখেছেন—"এ ক্রাউডেড্ আওয়ার অব গ্লোরিয়াস্ লাইফ্ ইজ্ ওয়ার্থ্ ম্যান্ এজ্ উইদাউট এ নেম্।" এ. এস্. নূর মোহাম্মদ (ঢাকা)—"একটা সুসংবাদ জানাই। আমি এবার বি. এ পরীক্ষায় সাধারণ ইতিহাসে ২য় শ্রেণীতে ১ম হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি।...সত্যি বলতে কি, বি. এ পাশ করলেও আমি সেই ছোটটিই রয়ে গেছি। রামধনুর সাথে আমার যেন প্রাণের টান। একে ছাড়তে পারবো বলে মনে হয় না। ছোটদের সাথী হয়ে বেঁচে থাকতে পারলে কী আনন্দই যে হবে! সম্ভব হবে না তা?" নিশ্চয়ই হবে। রবীন্দ্রনাথকেও লোকে বল্‌ত 'চিরকিশোর'।

শ্রীসুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা) অভিযোগ করেছেন—'পৌষ সংখ্যা রামধনুতে প্রকাশিত শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী লিখিত 'বিকেলের গান' কবিতাটি শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর 'বিকেল' নামে একটি কবিতার ভাব নিয়ে লেখা। শুধু ভাব নয়—কবিতাটির ভাষা, ছন্দ এবং কয়েকটি লাইনও সেই কবিতার অনুকরণ।' আমরা দু'টি কবিতাই মিলিয়ে দেখলাম। হুবহু মিল

না থাকলেও দু'টির মধ্যে সাদৃশ্য বেশ খানিকটা আছে, ২টি লাইনেও খানিকটা মিল আছে। তবে 'বিকেলের গান' কবিতাটি আকারে বড়। আমরা এ বিষয়ে উক্ত লেখকের বক্তব্য শুনে মতামত দেব।

এবারে কয়েকটি ব্যক্তিগত চিঠির জবাব দেই। শ্রীলক্ষ্মীপদ নন্দী (মেদিনীপুর)—সেলুলয়েডকে প্লাষ্টিকের পূর্ব্বপুরুষ বলা চলে। এ বছরের পূজাবার্ষিকী 'নবারুণে' 'প্লাষ্টিকের গল্প' নামে রামধনু-সম্পাদকের লেখা একটি প্রবন্ধ আছে, সুবিধা পেলে সেটি পড়ে নিও। বিনা আগুনে সাবানের বিষয় ইতিপূর্ব্বেই রামধনুতে বেরিয়েছে। শ্রীশেখরচাঁদ মল্লিক (হাওড়া)—ফটোর বিষয়ে গত বারেই লিখেছি। 'তোমাদের ল্যাবরেটরী' মনোজ সান্যালেরই লেখা। ৩৬০ পৃষ্ঠার ছবিটি আলোক-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারেই হয়েছে। বড় হয়ে যখন ফিজিক্স পড়বে তখন এর বিশদ কারণ জানতে পারবে। তবে ব্যাপারটা সাধারণতঃ ও রকম ঘটে না বলেই ওকে 'আজব' বলা হয়েছে। শ্রীবিমলভূষণ রায় (কলিকাতা)—নতুন প্রতিযোগিতা ২।১ মাসের মধ্যেই দেওয়া হবে। শ্রীঅশোককুমার চৌধুরী (নবদ্বীপ)—তুমি এমন অনেক প্রশ্ন করেছ যার উত্তর তোমার নিজেরই খুঁজে বার করা উচিত। তাই শুধু ২।১টির উত্তর দিচ্ছি। অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথের ভাইয়ের পৌত্র। আমাদের এত গ্রাহক আছে যে তালিকা দেওয়া অসম্ভব। 'খেলাধুলা' পত্রিকা, 'ব্যায়াম' পত্রিকা, এবং 'ছেলেদের খেলা', 'সহজ খেলা ও ব্যায়াম', 'ব্রতচারী সখা' প্রভৃতি বইএর নাম করা যেতে পারে। আবৃত্তির উপযোগী কবিতার তালিকা পরে দেব।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। জয় হিন্দ। ইতি—রাঃ সঃ

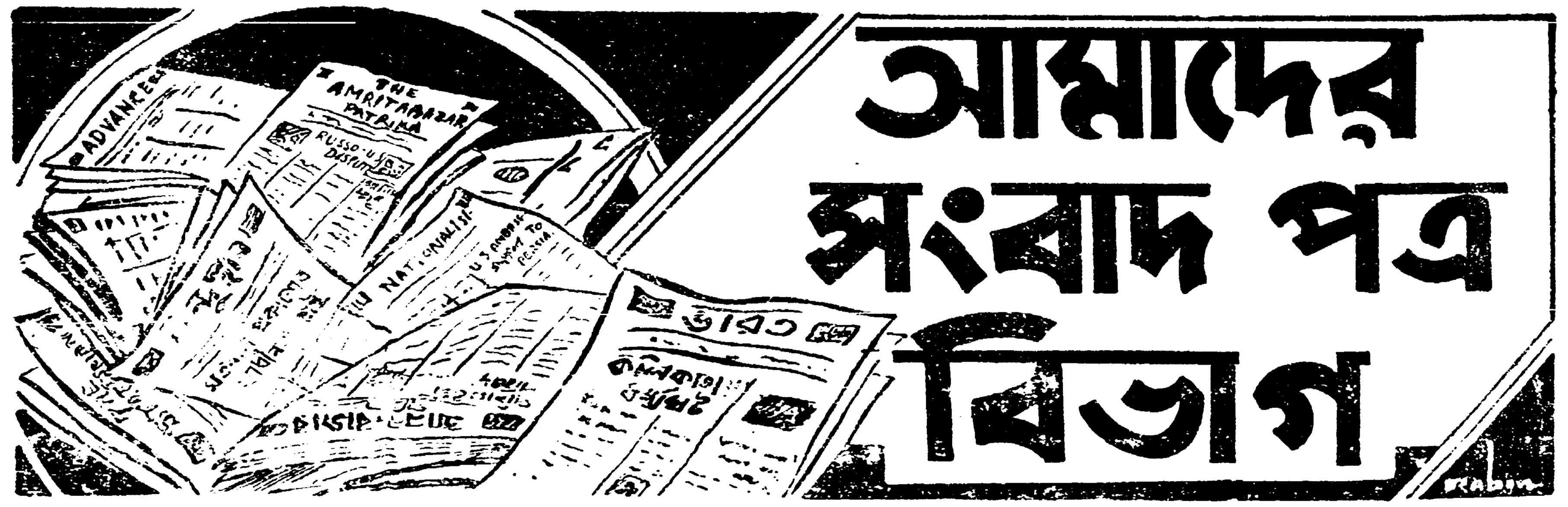

ছাব্বিশে জানুয়ারী

ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে ২৬শে জানুয়ারী তারিখটি স্বাধীনতা-দিবস ব'লে বহু দিন থেকে পরিচিত হয়ে আসছে। কারণ বৃটীশ শাসন কালে এই তারিখেই একদিন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল—১৯৩০ সনে। এবারে এই পুণ্য তারিখটিতে সত্যি সত্যি আমরা ভারতকে

স্বাধীন সার্ব্বভৌম সাধারণতন্ত্র রূপে পেলাম। ভারতের ইতিহাসে তারিখটি অমর হয়ে রইল।

২৬শে জানুয়ারীর পর ভারত আর বৃটীশ ডোমিনিয়ন রূপে পরিচিত হবে না—বৃটীশ রাজত্বের সঙ্গে রাজা-প্রজার সমস্ত সম্পর্ক ঐ দিন থেকে শেষ হ'ল।

ভারতের এই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন এক দিনে একজনের দ্বারা হয় নি। লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিকের দীর্ঘ দিনের সাধনার ফলে এ স্বাধীনতা অর্জ্জিত হয়েছে। রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, বিপ্লবী, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, জনসাধারণ—প্রত্যেকেই এতে কিছু না কিছু অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সকলে আজ আমাদের মধ্যে নেই, সকলের নামও হয়তো আমরা জানি না। কিন্তু এই স্মরণীয় দিনে তাঁদের নমস্কার জানিয়েই আমরা যাত্রা সুরু করব।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ

গণপরিষদ্ থেকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভারত প্রজাতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। কৃতী ছাত্র, পণ্ডিত, কর্ম্মদক্ষ এবং সবার উপর অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক হিসাবে তাঁর নাম ভারতে সুবিদিত। যে দায়িত্বপূর্ণ পদে আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত হ'লেন যোগ্যতার সঙ্গেই তিনি তা পালন করবেন এই আমরা কামনা করি। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারবাসী হ'লেও বাংলা দেশের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত—ছাত্রজীবন তাঁর বাংলা দেশেই কেটেছিল। জাতির কর্ণধার রূপে বাংলা দেশের বিভিন্ন সমস্যা—বাঙ্গালীর নানা অভাব-অভিযোগ এবং বিশেষ ক'রে বাংলা ভাষাভাষী এলাকায়

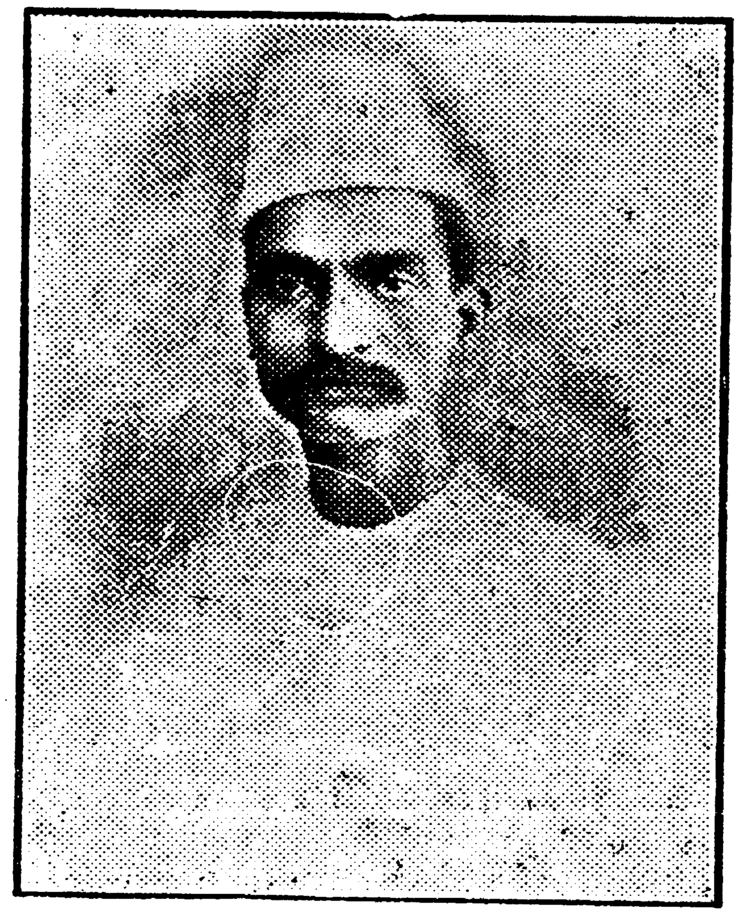

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ

উপর তার দাবী সম্পর্কে তাঁর সহানুভূতিও তাই আমরা কামনা করি।

নেতাজীর জন্মদিন

ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের তিন দিন আগে ভারত মাতার পরম প্রিয় সন্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। স্বাধীনতার প্রাক্কালে এই মহাপুরুষের নাম স্মরণ করবার—তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার সৌভাগ্য লাভ ক'রে দেশবাসী ধন্য হ'ল। এ সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু বলেছেন: "এই জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের এক বিশিষ্ট অংশ ছিল এবং এতে কোন সন্দেহই নেই যে আজাদ হিন্দ ফৌজের মারফৎ তিনিই ভারতে বৈদেশিক

শাসনের বিরুদ্ধে শেষ ও চরম আঘাত হানেন। দিল্লীর লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের সময়ে যে কাহিনী উদ্‌ঘাটিত হ'তে থাকে তা সমস্ত দেশে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং সেই আগুনেই বৃটীশ শাসন ও কর্ত্তৃত্ব চিরকালের মত ভস্মীভূত হয়েছে। নেতাজীর 'জয় হিন্দ' ধ্বনি চিরকালের জন্য জাতীয় ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।"

মহাত্মাজীর তিরোভাব-তিথি

স্বাধীনতার আনন্দ-অনুষ্ঠান শেষ হ'তে না হ'তেই দেশবাসীকে আর একটি বিশেষ তারিখের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। সেটি হচ্ছে ৩০শে জানুয়ারী—জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাব-দিবস। আমাদের শুধু এই বিশেষ দিনটি স্মরণ করলেই হবে না—মহাত্মার আদর্শ মনে-প্রাণে গ্রহণ করলে তবেই কেবল আমরা তাঁকে যথার্থ মর্য্যাদা দিতে পারব।

কানপুরে ৪র্থ টেষ্ট ম্যাচ

কলকাতার উত্তেজনাপূর্ণ খেলার পরে কানপুরে কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে ভারতীয় দলের ৪র্থ টেষ্ট ম্যাচ হয়ে গেছে। এবারে এই খেলাটি হয়েছে অমীমাংসিত। কমনওয়েলথ দল প্রথম ইনিংসএ করে ৪৪৮ রান, ২য় ইনিংসএ ৩ উইকেটে ২৩৭ রান ক'রে ডিক্লেয়ার করে। প্রত্যুত্তরে ভারতীয় দল করে প্রথম ইনিংসএ ৩৮৬ রান এবং ২য় ইনিংসএ ৪ উইকেটে ৮৪ রান। ওরেলের আউট না হয়ে ২২৩ রান এবং মুস্তাক আলির ১ম ইনিংসএ ১৪৯ রান এই খেলার ২টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

অষ্টম

তার পরদিন, আবার তার পরদিন, আবার তার পরদিন নরেন্দ্র আবার এল বনভ্রমণে। এই বন তাকে যেন একেবারে পেয়ে বসেছে। দূর থেকে কোন্ এক অজানা টানে বন যেন তাকে এখানে টেনে আনে। যে আশায় এখানে আসা তা সফল হয় না, তবু কোন এক সম্ভাবনার ইঙ্গিতে রোজ তাকে এখানে

ছুটে আসতে হয়। ছুটে আসে অসীম আগ্রহে, কিন্তু ফিরে যায় নিস্তেজ দেহে, ম্রিয়মাণের মত। কেবল সেই ঘটনাস্থলে নয়, বনের নানা জায়গায় সে ঘুরে বেড়িয়েছে।

চতুর্থ দিন বনের ভিতরে এসে নরেন্দ্র দূর থেকে দেখলে একটা হাতীকে। সে বাঁশঝাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে শুঁড় দিয়ে কচি কচি বাঁশপাতা ছিঁড়ে ভক্ষণ করছিল। নরেন্দ্র তাকে দেখেই চিনলে। এ হচ্ছে সেই হাতী বনদেবীর যে প্রহরী, নাম যার রুণু।

নরেন্দ্র আন্দাজ করতে পারলে, হাতীর দেখা যখন পাওয়া গিয়েছে, মেয়েটিও নিশ্চয় আছে কাছাকাছি কোন জায়গায়। কিন্তু মেয়েটি সত্যিসত্যিই যদি এখানে আসে, তাহ'লে তাকে কেমন ক'রে অভ্যর্থনা করবে তা আগে থাকতে বলা যায় না। কে জানে আজকেও সে আবার এই হাতীটাকে তার পিছনে লেলিয়ে দেবে কিনা!

হাতীর কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ ব্যবধানে রাখবার জন্যে নরেন্দ্র একটা প্রকাণ্ড বনস্পতির উপরে আরোহণ করলে। তারপর ডালপালার আড়ালে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

যা ভেবেছে তাই! বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না, মেয়েটি বোধ হয় কোঁচড়-ভরা ফুল নিয়ে চঞ্চল পায়ে ছুটতে ছুটতে হাতীটার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর বললে, "রুণু, আমার ফুল তোলা শেষ হয়েছে, এইবারে আমাকে বাড়ীতে নিয়ে চল।"

নরেন্দ্র অবাক্ হয়ে দেখলে, হাতীটা তার শুঁড় খানিকটা নীচে নামিয়ে দিলে, আর মেয়েটি সেই শুঁড় ধরে অনায়াসেই হাতীর মাথার উপরে উঠে এসে বসল! তারপর হাতীও ধীরে ধীরে তাকে নিয়ে এগিয়ে চল্‌ল।

নরেন্দ্র নিজের মনেই বললে, "হুঁ, তাহ'লে এই বনেই মেয়েটির বাড়ি আছে। আচ্ছা, চুপিচুপি ওদের পিছনে পিছনে গিয়ে বাড়ীটা দেখে আসা যাক্।"

নরেন্দ্র গাছের উপর হ'তে আবার হ'ল ভূমিষ্ঠ। তারপর হাতীর অনুসরণ করলে অত্যন্ত সন্তর্পণে।

প্রায় মাইল দুই পথ অতিক্রম ক'রে হাতী যেখানে এসে থামল, তার কাছেই রয়েছে কতকগুলো কুঁড়ে ঘর। হাতী আস্তে আস্তে মাটির উপরে থেবড়ি খেয়ে ব'সে পড়ল, এবং মেয়েটিও লাফিয়ে পড়ল তার দেহের উপর থেকে। হাতীর দিকে ফিরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে খুব নরম গলায় বললে, "রুণু ভাই, আজ তবে

আসি !" ব'লেই ছুটতে ছুটতে সে কুড়ে ঘরগুলোর দিকে চলে গেল। কোন্ ঘরে সে ঢোকে, সেটাও দেখবার ইচ্ছা ছিল নরেন্দ্রের। কিন্তু হাতীটা আবার এই পথেই ফিরে আসছে দেখে তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না। সে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল সেখান থেকে।

সেদিনের ব্যাপার এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এইটুকুতেই তার মনে মনে নেচে বেড়াতে লাগল হাসিখুসি। বনদেবীকে আবার আবিষ্কার করতে পেরেছে, এ হচ্ছে মস্ত সৌভাগ্যের কথা। নরেন্দ্র সেদিন পরিপূর্ণ প্রাণ নিয়ে বন ছেড়ে নিজের বাড়ীর দিকে চল্‌ল।

তার পরদিন বনের ভিতরে নরেন্দ্রের দেখা পাওয়া গেল খুব সকাল সকাল। আজ ভোরের পাখী ডাকবার আগেই সে করেছে গৃহত্যাগ এবং যথাস্থানে গিয়ে যখন পৌঁছলে তার হাতঘড়িতে বেজেছে তখন বেলা সাতটা। বনের পাখীদের কণ্ঠে তখনো স্তব্ধ হয়নি প্রভাত-সঙ্গীত। নরেন্দ্র একটা ঝোপের ভিতরে গা ঢাকা দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

একটু পরেই একটি ছোট ডালা হাতে ক'রে সেই মেয়েটি একখানি কুড়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

দুখীরাম তখন বনে যাবার আগে পান্তা ভাত খেয়ে দাওয়ায় বসে হুকোয় দিচ্ছিল শেষ টান। টুনুকে দেখে বললে, "কি গো টুনটুনি, এত সকালে কোথায় চলেছ ?"

টুনু বললে, "বাবা, পুণ্যিপুকুর ব্রত নিয়েছি কিনা, তাই বন থেকে গোটাকয় ফুল আর বেলপাতা তুলে আনতে যাচ্ছি।"

এ গাছ ও গাছ থেকে ফুল তুলতে তুলতে টুনু এগিয়ে চল্‌ল। তারপর একটি বেলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে উপর দিকে তাকিয়ে বললে, "পাতাগুলো যে বড্ড উঁচুতে রয়েছে, কেমন ক'রে পাড়ি ? বাব্বাঃ, বেলগাছে যা কাঁটা ! ও গাছে কে চড়বে ? দুষ্টু রুণু তো আজ এখনো এল না, আমায় বেলপাতা পেড়ে দেবে কে ?"

পাশের ঝোপের ভিতর থেকে কে বললে, "বনদেবী, আমি যদি তোমার রুণুর হয়ে বেলপাতা পেড়ে দি, তাহ'লে কি তুমি রাগ করবে ?"

টুনু চমকে উঠে পাশের ঝোপটার দিকে তাকালে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "তুমি আবার কে ? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি এখানকার কেউ নও। ঐ ঝোপে বসে কী করছ তুমি ?"

"তোমার কথাই ভাবছি" এই বলতে বলতে ঝোপের ভিতর থেকে আত্ম-প্রকাশ করলে নরেন্দ্র।

টুনু সবিস্ময়ে দুই পা পিছিয়ে গেল। তারপর নীরবে অবাক্ হ'য়ে খানিকক্ষণ নরেন্দ্রের মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

নরেন্দ্র হেসে বললে, "আমাকে দেখে কি তোমার ভয় হচ্ছে ?"

টুনু বললে, "ভয় ? ভয় আমি কারুকেই করি না। তুমি তো দেখছি সেদিনকার সেই শিকারী !"

নরেন্দ্র বললে, "আমাকে তাহ'লে চিনতে পেরেছ ?"

টুনু বললে, "চিনতে পারব না কেন ? কিন্তু আজও দেখছি তোমার পিঠে বাঁধা বন্দুক। এখানে আবার কি করতে এসেছ ?"

—"শিকার করতে নয়।"

—"তবে ?"

—"তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রতে।"

টুনু খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। এবং হাসতে হাসতেই দুই চোখ নাচিয়ে বললে, "ওহো, কী মজার কথা ! আমার সঙ্গে আবার কেউ আলাপ করতে আসে নাকি ? আমি কি খুব একটা মস্ত লোক ?"

—"তুমি বনদেবী।"

টুনু প্রাণপণে আরো জোরে হেসে নিলে খুব খানিকটা। তারপর বললে, "না গো শিকারী মশাই, আমি বনদেবী-টেবী কিচ্ছু নই। আমি হচ্ছি টুনু।"

—"টুনু ? বাঃ, দিব্যি নামটি তো ! আমিও শিকারী নই।"

—"তবে তুমি কী ?"

—"আমার নাম নরেন।"

—"তোমার নামটিও ভাল লাগল। তোমার বাড়ী কোথায় ?"

—"এই বনের বাইরে।"

—"সেখানে তুমি কী কর ?"

—"খাইদাই, আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি।"

—"বটে ? তবে তো তুমি খুব কাজের মানুষ ! এত কাজ কর কি ক'রে, কষ্ট হয় না ?"

—"কষ্ট হয় বৈকি ! বড় একঘেয়ে লাগে। তাই তো সে-সব কাজ ছেড়ে আজকাল আমি বনের ভেতরে বেড়াতে আসি।"

টুনু মুখ গম্ভীর ক'রে বললে, "বেড়াতে আসো, না হরিণ মারতে আসো?"

নরেন্দ্র কাঁচুমাচু মুখে বললে, "তুমি তো জান টুনু, সেদিনকার সেই হরিণটাকে আমি মারি নি।"

—"মার নি, মারতে পারতে তো?"

—"তা হয়তো পারতুম।"

—"তোমার মত নিষ্ঠুর লোকের সঙ্গে আমার আর কথা কইতে ইচ্ছে হচ্ছে না।" টুনু সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হ'ল।

নরেন্দ্র কাতরভাবে তাড়াতাড়ি বললে, "না টুনু, যেও না। তুমি যখন মানা করেছ, আমি আর কখনো হরিণ মারব না।"

—"হরিণ মারবে না, কিন্তু পাখীটাখী মারবে তো?"

—"বেশ, তা-ও মারব না।"

—"সত্যি বলছ?"

—"সত্যি বলছি।"

—"তবে তিন-সত্যি গালো!"

মনে মনে হাসতে হাসতে নরেন্দ্রকে তিন সত্যি গালতে হ'ল গম্ভীর মুখে।

টুনু এগিয়ে এসে অসঙ্কোচে নরেন্দ্রের একখানি হাত ধ'রে বললে, "তাহ'লে নরেন, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার ভাব হ'য়ে গেল।"

"তাহ'লে রোজ আমি এখানে আসব?"

—"এসো।"

—"তোমার সেই হরিণটি বেঁচে আছে?"

—"অনেক কষ্টে তাকে বাঁচিয়েছি! কিন্তু এখনো সে উঠতে পারে না। ঘাসের বিছানা পেতে আমি তাকে শুইয়ে রেখেছি।"

—"তোমার মা-বাবা কোথায়?"

হাত দিয়ে নিজেদের কুড়ে ঘরটা দেখিয়ে টুনু বললে, "ওইখানে।"

—"তোমার বাবা কী করেন?"

—"বনে বনে কাঠ কাটেন।"

—"বনে বনে কাঠ কাটেন?"

—"হ্যাঁ। তিনি কাঠুরে।"

বিস্মিতভাবে নরেন্দ্র একটুখানি চুপ করে রইল। তারপর একটি নিঃশ্বাস

ফেলে বললে, "টুনু, কথায় কথায় আমরা আসল কথাই ভুলে গিয়েছি। একটু দাঁড়াও, তোমার জন্যে বেলপাতা পেড়ে দিই।"

টুনু বললে, "না নরেন, আর তোমাকে গাছে চড়তে হবে না। বেল-পাতা যে পেড়ে দেবে, ঐ দেখ, সে আসছে।"

টুনুর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে নরেন ফিরে দেখলে, ধীরে ধীরে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে সেই প্রকাণ্ড হাতীটা।

সঙ্কুচিত ভাবে সে বললে, "ঐ হাতীটা আমাকে দেখে রেগে যাবে না তো?"

—"না, না, আমার রুণু ভারি ভালো মানুষ। আমার যাকে ভাল লাগে, তাকে সে কিছুই বলে না।"

রুণু তাদের কাছে এসে দাঁড়াল। নরেন্দ্র সন্দিগ্ধভাবে আড়ষ্ট হ'য়ে রইল। রুণু শুঁড়টা নরেন্দ্রের দেহের কাছে নিয়ে গিয়ে একবার আঘ্রাণ নিলে, পরীক্ষার ফল বোধ হয় হ'ল সন্তোষজনক। রুণু বুঝতে পারলে, এই নতুন মানুষটা তা'র টুনুরই বন্ধু।

টুনু বললে, "নরেন, আমার পূজোর সময় হ'ল। আজ তুমি বাড়ী যাও।"

—"কিন্তু কাল আবার আসব তো?"

টুনু হাসতে হাসতে বললে, "বলেছি তো, এসো। 'রুণু! আমার পূজোর বেলপাতা পেড়ে দাও।" সে বেল গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করল।

তারপর থেকে বনের ভিতরে নরেন্দ্রের আগমন হ'তে লাগল প্রতিদিনই।

রোজ সকালে সে বেলগাছের পাশে সেই ঝোপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকত, এবং টুনুও তা'কে দেখলেই এলো চুল উড়িয়ে ছুটে আসত হাসতে হাসতে।

সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা নরম ঘাস-বিছানায় ব'সে তারা দু'জনে গল্প ক'রত। টুনু ব'লত বনের গল্প, আর সহরের গল্প সে শুনত নরেন্দ্রের মুখে। নরেন্দ্র টুনুর মত বনকে ভাল ক'রে চেনে না, আর টুনু তো জানে না সহরের কোন কথাই। কাজেই দু'জনেরই গল্প দু'জনেরই খুব ভাল লাগত।

নরেন্দ্র ক'লকাতা সহর দেখেছে, এবং যখন সেখানকার গল্প ব'লত, তখন টুনুর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হ'য়ে উঠত উচ্ছ্বসিত বিস্ময়ে।

নরেন্দ্র ব'লত, "কলকাতা সহরটা তোমাদের এই বনের মতই প্রকাণ্ড। এই বনে যেমন বড় বড় গাছ গুণে ওঠা যায় না, তেমনি ক'লকাতা সহরে এত বড় বড়

বাড়ী আছে যে তার হিসাব কেউ রাখতে পারে না। তোমাদের এই কাঠুরে গ্রাম-টাকে কলকাতার এক-একটী মাঝারি বাড়ীর ভিতরে পূরে ফেলা যায়।"

টুনু ব'লত, "বল কি নরেন?"

নরেন্দ্র ব'লত, "হ্যাঁ। আর সেখানে এমন সব বড় বড় বাড়ীও আছে, তোমাদের এই বনের সবচেয়ে বড় গাছগুলোকেও তাদের তলায় পুঁতে দিলেও দেখাবে যেন ছোট ছোট ফুলগাছের চারা।"

টুনুর মুখে বিস্ময়ে আর কথা ফোটে না। (ক্রমশঃ)

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১ সের, ২ সের, ৪ সের, ৮ সের ও ১৫ সের। এইটিই সব চেয়ে ভালো উত্তর। ওজন দাঁড়ির ২ দিকে বসালে আরও অনেক রকম উত্তর হ'তে পারে।

উত্তরদাতাদের নাম:— আরতি, জয়ন্তী, মেজদি, দিদিভাই, দাদা, ছোটদা, মা-বাবা প্রভৃতি (কলিকাতা ২৯); শম্ভুনাথ সিংহ ও কৃষ্ণপদ সিংহ (রামগোপালপুর); বিষ্ণুপদ, বামকৃষ্ণ, শক্তিপদ (বালিঘাই); জহরলাল পাল, আরতি পাল (কাঁচড়াপাড়া); বিভাসবিহারী বসু (পাটনা); জয় (কলিকাতা); জয়া ও বিজয়া রায় (আইজটনগর); মঞ্জু, রঞ্জু, গৌরী ও মীনাক্ষী (দিল্লী); কনককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পানিহাটী); অশোককুমার নাহার ও হেমেনদা (ডুমকা); গুঁড়ি, টুটু, গজু, কেবু, ভুড্ডুং (বেলগাছিয়া, কলিকাতা); শেখরচাঁদ মল্লিক (হাওড়া); বিমলভূষণ রায় (কলিকাতা); শ্রীরাধাবিনোদ সুরাল ও শ্রীঅশ্বিনী মল্লিক (শিলদা); ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান); অনন্ত, ঝরণা, রেণুকা, লতিকা, যূথিকা, কুমারেশ, সমরেশ চট্টোপাধ্যায় (জয়পুর); সান্ত্বনা মুখোপাধ্যায় (এলাহাবাদ); অনু, ঝরণা, আভা, আরতি ও প্রণতি (বগুড়া); বুলু, খুকু, খোকন, খুচু, বিলা, বরুণ (মাধিপুরা); নিতাইচন্দ্র রায় (পানিহাটী); বেবী, রেখা, মমতা, অপু, বাচ্চু, (জামসেদপুর); মীনা, রঞ্জন, নীলা সিংহ (পূর্ব্বধলা); অনিলকুমার সরকার (আমতলা); ছায়া, শান্তি, চিনু, সাধনা, নারু, অনিল প্রভৃতি (জলপাইগুড়ি)।

নূতন ধাঁধা

কানু, বীণা আর হাসি তিন জনেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল। পরীক্ষার ফল বেরুলে বাড়ীর সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল কে কে পাশ করেছে জানবার জন্য। বীণাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "হ্যাঁরে, কানু পাশ করেছে?" সে বললে, "না।" তার পর হাসিকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "কানুর খবর জানিস?" সে বললে, "কানু পাশ করেছে।" সব শেষে কানুকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল বীণার আর হাসির খবর। কানু গম্ভীর ভাবে বল্‌ল, "ওরা দু' জনেই ফেল করেছে।"

পরে জানা গেল, ওদের মধ্যে যারা যারা ফেল করেছে তারা কেউই সত্যি কথা বলে নি। বলতে পার ওদের মধ্যে সত্যি কেউ পাশ করেছিল কিনা এবং করলে কে বা কারা?

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

যমুনা

স্নানের সাবান

যে কোন ভাল সাবানের সমকক্ষ
অথচ মূল্য হিসাবে নিতান্ত সুলভ

নিত্য ব্যবহারে অপরিহার্য

প্রতি বাক্সে ১২ খানি

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই

বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার

কেবল ইংরেজী
Book of Knowledge
গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ নহে
দেব সাহিত্য-কুটীর
কর্তৃক প্রকাশিত
বার্ষিকী
গ্রন্থমালায়
উন্মুক্ত ঐশ্বর্য্যে দেদীপ্যমান!

বার্ষিকী গ্রন্থমালার সম্পাদক-মণ্ডলী
গিরিজা বসু
সুনির্মল বসু
সুবিনয় রায়
সুধীর সরকার
নরেন দেব
রাধারাণী দেবী
ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য্য
হেমেন্দ্র রায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র
সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব বসু
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

যাবতীয় বিখ্যাত লেখক-লেখিকা ও চিত্র-শিল্পিগণ ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

আমাদের
বার্ষিকী-গ্রন্থমালা
ছোটদের গল্প-সঞ্চয়ন
ছোটদের চয়নিকা
ঝলমল
আজব বই
শিশু-গল্পিকা
সোনার কাঠি
যাদুঘর
চিত্রদীপ
মায়া-মুকুর
সোনালী ফসল
মধুমেলা
রূপরেখা
বর্ষ-মঙ্গল
আলপনা
অঞ্জলি
রাঙারাখী
নবারুণ
আবাহন

প্রত্যেকখানির দাম তিন টাকা

দেব-সাহিত্য-কুটীর ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের
ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি ১।০
পদ্মরাগ ১॥০
সোনার হরিণ ১॥০
নূতন পুরাণ ৸৵০
হাস্য ও রহস্য ৸৵০
চায়ের ধোঁয়া ৸০
হুকাকাশির গল্প ৸০
দমাদম্ দামোদর (নাটক) ।৵০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের
মহাভারতের গল্পগুচ্ছ (১ম) ৸০
ঐ (২য়) ৸০
দিগ্বিজয়ী বীর ৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ১৲

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ১৲
বিজ্ঞান-বুড়ো ১৲
আকাশের গল্প ১।০
আবিষ্কারের গল্প ৸০
ধূমকেতু ৸০
অয়েল পেন্টিং (নাটক) ।০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের
শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা ১॥০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর
ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের
দি লাষ্ট অফ দি মোহিকান্স্ ॥৵০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের
অলিভার টুইষ্ট ॥৵০

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়ের
যে জার্মানী হেরে গেছে ২৲

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

এইচ. জি ওয়েল্সের
গল্প ২৸০

সম্পাদক—
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
দি আইল্যাণ্ড অব
ডক্টর মোরো ২৸০
এইচ জি ওয়েলস

অমিয়কুমার চক্রবর্ত্তীর
দি কোর্য়াল আইল্যাণ্ড ১।০
অপূর্ব্ব সুন্দর অনুবাদ
ব্ল্যাকমেল ১৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
অদৃশ্য কালো হাত ৸০

মণিলাল অধিকারীর
রক্তাভ-বুদ্ধ ১।০
মৃত্যু-বিভীষিকা ৸৵০

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
বিশালগড়ের দুঃশাসন ২৲
বিদেহী আত্মা ড্রাকুলার ভয়াবহ কাহিনী
হত্যা এবং তারপর ১৲
মুলুসাগরের ভুতুড়ে দেশ ১॥০

সুকুমার দে সরকারের
নিশাচর ১৲
চব্বিশে এপ্রিল, চুপ ১৲
নূতন ধরণের রহস্য-উপন্যাস

V.P.P.র জন্য লেখো—অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, ১০৯-এ লেক রোড, কলিকাতা ২৯

Regd. No. C—1641

বাজে খরচ জিনিষটা কি ভাল ?

নিশ্চয়ই নয়,—বিশেষত: এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে।

কিন্তু একটির বেলায় একথা খাটে না—,
সেটি হচ্ছে বই কেনার বাজে খরচ।

বাইরে থেকে খরচ ব'লে মনে হ'লেও
আসলে এটি জমা;—মনের ভাণ্ডারে
এর সম্পদ্ জমা হয়ে থাকে অক্ষয় হয়ে।

বই মানুষের সুসময়ের সখা, দুঃসময়ের বন্ধু,
সঙ্গীহীনের সাথী

তোমরা জান কি ?

বাংলা ভাষায় আজকাল কত সুন্দর সুন্দর বই বেরোচ্ছে!
এই সব বই সর্ব্বদা হাতের কাছে রাখতে ইচ্ছা করে না কি ?
সব রকম বই-এর—সব রকম ভালো বইএর খবর জানতে
হ'লে আমাদের কাছে লেখ বা নিজে এসে বেছে নাও।

সবরকম বই এর জন্য আমাদের কাছে আসুন

ভট্টাচার্য্য সন্স এণ্ড কোং লিঃ

১বি, রসা রোড, কলিকাতা

মেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

২২শ বর্ষ
ল্গুন, ১৩৫৬
ষান্মাসিক ২৷৹
প্রতি সংখ্যা ।৶৹

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ন ভট্টাচার্য্য, এম্. এস-সি

রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির প্রাদেশিক সঞ্চালক
অধ্যাপক শ্রীরেবতীরঞ্জন সিংহ প্রণীত

প্রাথমিক অনুবাদ শিক্ষা

(হিন্দী-বাংলা ও বাংলা-হিন্দী)

পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত ২য় সংস্করণ

বাঙ্গালীদের হিন্দী শিখবার এবং অবাঙ্গালীদের
বাংলা শিখবার সহজ বই

—দাম ৷৵৹—

রাষ্ট্রভাষার প্রথম সোপান

— দাম ৸৹ —

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

কবি প্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু)

সম্পাদিত

ভাই-বোন

বার্ষিক ৪৲, ষান্মাসিক ২৷৹, যে কোনো মাস থেকে যে কোনো মাস পর্য্যন্ত গ্রাহক হওয়া যায়। এমন দিন আসছে যে দিন প্রতি ঘরে ভাইবোনের জন্যে 'ভাই-বোন' না হলেই চলবে না। যারা দেখ নি, বিজ্ঞাপন শুধু তাদের জন্যে, নইলে গ্রাহকরাই এর চলন্ত বিজ্ঞাপন। এজেণ্ট কিংবা গ্রহক হবার জন্যে.—কার্য্যাধ্যক্ষ, ভাই-বোন কার্য্যালয়, ৪-এ ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা—৬

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বদেশী আন্দোলনের কবি
মাতৃপূজারী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২২শ বর্ষ } ফাল্গুন ১৩৫৬ { ১১শ সংখ্যা

প্রণাম

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভাতের আলো
ভালোবেসে হেসে এসে
আশিস্ ছড়ালো।
আলোর কমলদল
থরে থরে ঝলমল,
অমৃত পরিমল
হৃদয় ভরালো।

মধুর মধুর
বীণায় বাজিল এ কি
সুন্দর সুর!
সকল আকাশ-ধরা
পরম পুলকে ভরা,
প্রণামে পরাণখানি
চরণে গড়ালো।

রাধামাধবের চাকরি-জীবনের দু'টি দিন

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

রাধামাধবের চাকরি-জীবনের মাত্র তিনটি দিন ও রাতের ঘণ্টা কতক কেটে গেল। সে কাজে এসেচে বেলা ন'টায়, ছুটি হ'ল রাত দশটার পরে। এখনই বইয়ের বাজারের মরশুম কিনা। এতদিন তো দোকানগুলো মরা বোয়ালের মতো হাঁ করে হাওয়া টানছিল। এবার খাবার হিড়িক। তাই দোকানের সামনে ফিকে বা গাঢ়, লম্বা বা চৌকো লাল শালুতে বড় বড় সাদা হরফে লেখা "স্কুলের বই"। পুঁচকে, বাচ্চা, ডাগর, প্রমাণসই যেমন খরিদ্দারের ভিড়, তেমনই তাদের হরেক রকমের গলায় নানা রকম ভঙ্গিতে কত রকমেরই বইয়ের চাহিদা! ওর ভেতর গিয়ে দাঁড়ালে ভরা পৌষ মাসে পাঁচ মিনিটে কপালে ঘাম দেখা দেয়, গা থেকে কোট-আলোয়ান খুলে ফেলতে ইচ্ছে করে। দোকানের কর্তার চক্ষু ঘাসের বনে আলো-পোকার মত ভ্রূর তলায় স্থির হয়ে জ্বল্‌তে থাকে। কেবল ক্যাস-মেমোয় হিসেবে টাকার অঙ্ক কম হলেই হয়ে ওঠে চঞ্চল। দোকানদারি কি ঝকমারি! যে না করেচে সে জানে না। তবে কর্তাব্যক্তিকে বেচা-কেনা করতে হয় না, তিনি ব্যবসা-সাগরে মাঝির মত হাল ধরে বুঁদ হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। আর, বইয়ের জালে থেকে থেকে ঝুন্ ঝুন্ খুস্ খুস্ কড়ি পড়ে। রাধামাধবদের দোকানে কিন্তু খুচরো খরিদদারের হাজারো ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নেই। সব "পাইকেড়।" তারা বোঝা আনে, তার ওপরেও বোঝা বাঁধে। বোঝাটা কখন হয় বোঝার ওপর শাকের আটির মতো, কখন যেন গোদের ওপর বিষ-ফোড়া।

রাধামাধব দোকান-ঘর থেকে বেরিয়ে কলতলা পেরিয়ে জলে-ভেজা, শেওলা-ধরা, দাঁতের

মতো ইট-বার-করা পৈঠা দিয়ে রাস্তায় পড়লো। দোকান-ঘরের দেওয়াল ও মেঝের স্যাঁত-সেঁতে গন্ধের সঙ্গে বই, নতুন চট, কাই, ধুলো, ধোঁয়া ও বিড়ি-সিগরেটের গন্ধ মিশে তার শ্বাস-প্রশ্বাসে যে অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটাচ্ছিল তা সে অনুভব করলো ফাঁকা রাস্তাটায় এসে। কিন্তু রাত দশটা বেজে গেলেও রাস্তাও দু'-পাশের বড় বড় বাড়ি, আলোর সারি ও চলন্ত যান-বাহন নিয়ে যেন শীতের কামড় এড়াতে ধোঁয়ায়, কুয়াশায় ও ধুলোয় গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করচে। তবুও রাধামাধবের সোয়াস্তি বোধ হতে লাগলো। কিন্তু তাকে যেতে হবে সেই উল্টোডিঙির খালের ধারে। তাই রাস্তাটাকে ঠেকচে খুব ফাঁকা। যতদূর দেখা যায় চেনা মানুষ একটিও নেই। একেবারে পথের শেষে সেই পুরোনো স্যাঁতধরা একতলা বাড়িখানার ভেতর দিকে দু'খানি ছোট ছোট ঘরে, সামনে নীচু বারান্দা, একদিকে একটু রাঁধবার জায়গা—সেখানে যে কয়টি ছোট-বড় মানুষকে সে মনে মনে দেখ্‌চে, কেবল তারাই তার চেনা।

রাধামাধবের শীত করচে। গায়ে হাতকাটা ছিটের শার্ট, তার ওপর সুতীর স্লীভলেস্ গেঞ্জি, পায়ে সাদা কেডস্, পরনে খাকির হাফপ্যাণ্ট। সবই পুরোনো, ময়লা, বহুব্যবহারে ক্ষয়ে পাতলা হয়ে গেচে, কোন্‌দিন কোন্‌টা ফাঁসে ঠিক কি? সে হাত দু'খানা বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগ্‌লো, যেন নেপোলিয়ন। বুক-পকেটে রয়েচে একটি দু'-আনি ও একটি আনি। বাবু রোজ তাকে যে চার আনা জলখাবারের জন্য দেন তার অবশিষ্ট। আজ সে চীনেবাদামওলার ফেরৎ আনি-দু'আনি দু'টো বেশ ভাল করে দেখে নিয়েচে। সেদিন বেটা দিয়েছিল দু'টোই পাকিস্তানের—চাঁদ-তারার ছাপ দেওয়া। পরদিন বাজারে আলুর দোকানে দিয়ে বেয়াকুব। সে নিতে চায় না। শেষে কুচো চিংড়ী কিনে মেছুনী বুড়ীটাকে দাম দেয়। বুড়ী এক রকম না দেখেই আর সব পয়সার সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছিল। মাছ খাওয়া ঐ সপ্তাহে একদিন।

বেলা ন'টা থেকে রাত দশটা অবধি বই তোলা-পাড়া, বাঁধা-ছাদা করে রোজ গোল-দীঘি থেকে উল্টোডিঙি হেঁটে পাড়ি দেওয়া চৌদ্দো-পনেরো বছরের হাড়-বার-করা ছেলের পক্ষে অ্যাডভেঞ্চার। যার সুপারিশে তার চাকরিটা হয়েচে সে কাজ করে কলেজ ষ্ট্রীটের একটা বড় বইয়ের দোকানে। তার ফিরতে আরও রাত হয়। সে থাকে মাণিকতলার পোলের কাছে। প্রথম দিন তার সঙ্গে সে বাড়ি ফিরেছিল। পথটা সে রাতে মন্দ লাগে নি। কিন্তু একখানা বই খুলে পড়া আরম্ভ করতেই বাবুর ছোট ধমকটুকু তার মনে যে খোঁচা দিয়েছিল সেটা অনেকক্ষণ জ্বালা করেছিল। এখনও করে। কারণ সে বই নাড়া-চাড়া করে, বইয়ের মধ্যেই থাকে, কিন্তু পড়তে পায় না। যে বই বেচে সে বই পড়ে না। পড়বার দরকারই বা কি? লেখা-পড়া না করে "বইয়ের দোকান করে যে দুধে ভাতে থাকে সে।"

কেষ্টদা', মানে তার মুরুব্বি, সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, "মন দিয়ে কাজ কর। চাকরিটা তোর বাঁধা হয়ে যাবে। ডাল্ সীজনে কিচ্ছু কাজ থাকবে না, তখন যত খুশি বই পড়িস্। তবে বাবুর সামনে নয়।"

রাধামাধব বলে, "কুড়ি টাকায় এত খাটনি—"

"তার বেশি কোথায় পাবি? তুই পাস্-পুস্ হ'লে কিছু বেশি পেতিস্। সেকেন্‌ড্ ক্লাস অবধি পড়লে চাকরিই পাওয়া যায় না। এখন নিতান্ত বইয়ের বাজারের মরশুম আর উনি আমার দেশের লোক, আমায় খুব 'ফেভার' করেন, তাই তোর চাকরিটা হয়ে গেল।"

"তুমি বলেছিলে তিরিশ টাকা মাইনে হবে—"

"কুড়ি টাকা তো বাঁধা রেট। বড় দোকানের রেট চল্লিশ টাকা। বড় দোকানে চাকরি কি চারটিখানি কথা? কত বি. এ., এম. এ. ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে! ঘাবড়াস্ নি। কুড়ি টাকা মাইনে, চার আনা জলখাবার। এখন এই পাবি। চাই কি এক কালে তুইও বইয়ের দোকান করতে পারিস্। এই যে সব বইয়ের দোকান দেখছিস, এত নাম—এত হাঁকডাক, এগুলোর বেশির ভাগেরই মালিক তোর মতো বইয়ের দোকানে চাকরি করতো। লেখাপড়াও তোর চেয়ে বেশি শেখে নি। ওরাই আবার 'অথর'।"

"তার মানে?"

"মানে ওদের নামে বই আছে।"

"সে বই ওরা লেখে নি?"

"তুই-আমি কি বই লিখতে পারি?"

রাধামাধব থ হয়ে যায়। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, "সে সব কারা লেখে?"

"যারা লেখে তারা লেখাপড়া জানে। লেখক তারা। আরে, বেশি কথা কি? অনেক লেখাপড়া-জানা, বড় বড় চাকরি করে এমন লোকও নিজেরা বই লেখে না, অন্য লোকে লিখে দেয়। তারা তাতে নাম দিয়ে পয়সা লোটে।"

"আর যারা লিখে দেয়?"

"তাদের কথা আর শুনিস নি। তোর বাবুও এক সময়ে বইয়ের দোকানে চাকরি করতো। লেখাপড়ায় আমাদেরই মতো। ওরও দু'খানা বই আছে। ক্লাস থ্রী-ফোরের গণিত আর ক্লাস ফাইভের ইতিহাস! বই দু'খানা খুব চলে। যে লিখে দিয়েচে সে এখন খেতে পায় না! আমাদের দোকানে লোকটা মাঝে মাঝে আসে।"

কথাগুলো রাধামাধবের কাছে অদ্ভুত ঠেকে; বলে, "আমি তো এ সব জানতুম না।"

"তুই কি বা জানিস্! দু' দিন থাক্, সব জান্‌তে পারবি। দেখবি, মাষ্টাররাও কি রকম ব্যবসা চালায়। আরও কত কি হয়। খালি টাকার খেলা রে, টাকা ছাড়া এখানে কথা নেই। শিক্ষা-টিক্ষা ও সব বাজে কথা।"

"কেষ্টদা', আমায় একটা বড় দোকানে চাকরি করে দাও। দেবে—?"

কেষ্টদা' বিড়িতে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, "আগে কিছু কাজ শেখ্। না হ'লে সেখানে তোকে নেবে কেন? বড় দোকানের ঝক্কি কত!"

রাধামাধব চুপচাপ চল্‌তে থাকে। বাড়ি গিয়ে সে গোগ্রাসে ঠাণ্ডা ভাতগুলো গিলে ছেড়া লেপের তলায় ঢুকে যায়। মায়ের কথার দু'-একটা উত্তর দিতে দিতে কখন ঘুমিয়ে পড়ে। চাকরি করতে তার মন চায় না, কিন্তু না করে উপায় কি? পড়াশুনো আর

তার হবে না। কে পড়াবে? তার বাবা চাকরি করতো একটা কাপড়ের দোকানে। ভাই-বোনে তারা পাঁচটি। সে-ই সকলের বড়। সে সেকেণ্ড ক্লাসে প্রোমোশন পাবার দশ দিন পরেই হঠাৎ তার বাবা মারা গেল। কেষ্টদা'র বাবাও সেই কাপড়ের দোকানে খাতা লেখে।

কুড়ি টাকা বড্ড কম। কিন্তু ঠিক যে কত টাকা হ'লে তাদের চলে তা সে বুঝে উঠ্‌তে পারে না।

চল্‌তে চল্‌তে রাধামাধবের গরম বোধ হ'তে লাগ্‌লো। আর নেপোলিয়ন সাজা হ'ল না, এবার সে হাঁটতে লাগলো হাঁটার প্রতিযোগীদের মতো।

চলতে চলতে সারাদিনের কথা-বার্তা, ঘটনা, লোকের মুখ তার মনে পড়চে। তার বাবু একবার একজন কর্মচারীকে বলেছিলেন, "ঘাবড়াচ্ছো কেন? তোমরা এক্‌স্‌ট্রা পাবে।"

এক্‌স্‌ট্রা আবার কি? জ্যামিতিতে এক্‌স্‌ট্রা কষতে হ'ত। এখানেও এক্‌স্‌ট্রা? তাদের অঙ্কের মাষ্টার রাখালবাবু পাগলা। জ্যামিতি যে যত ভালই লিখুক তাকে ছ' নম্বরের বেশি দিতেন না।

সে একদিন বলেছিল, "স্যর, ওর চেয়ে এত ভাল লিখলুম, একটাও ভুল নেই, আমি কেন ছয় পাবো?"

রাখালবাবু উত্তর দিয়েছিলেন, "দেখ বাপু, আমি 'পারশিয়ালিটি' করতে পারবো না। সবাইকেই সমান নম্বর দেবো। তুমি ভাল লিখেচো বলে যে তুমি ওর চেয়ে বেশি নম্বর পাবে তা আমার কাছে হবে না। ঐ ছয়।"

রাধামাধব নিজের মনেই হেসে ফেললো। 'এক্‌স্‌ট্রা' কথাটার মানে সে কাল কেষ্টদা'কে জিজ্ঞেস করবে। ওদেরও কি এক্‌স্‌ট্রা ক'রতে হয়?

সে রাস্তার শেষ অবধি তাকিয়ে দেখল। ধোঁয়ায়, মনে হচ্ছে, আলোগুলো যেন কম্বলের তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে। তার পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে পথিকরা একা, জোড়ায় বা তিনজনে এক সঙ্গে গল্প করতে করতে চলেচে। কিন্তু তার মতো তাড়া কারো নেই অথচ তাদের বেশির ভাগেরই গায়ে শীতবস্ত্র বল্‌তে যা আছে, তা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করলে প্রতিবাদ করার কিছু থাকে না। পথের ধারে, রোয়াকে, বারান্দার তলায় ময়লা ন্যাকড়া বা চটের পুঁটলি পড়ে আছে, একটুও নড়চে না। ওগুলোর তলায় আছে মানুষ। ওদের ঘর-দোর নেই। এক জায়গায় ছিল স্তূপাকার ছেঁড়া কাগজ। তার তলা থেকে আসছিল একটা ভাঙা গলার গানের আওয়াজ। রাধামাধব তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে কাগজের স্তূপের তলা থেকে একখানা কালো হাত বেরিয়ে এল, আর ভাঙা গলাটা বলে উঠলো, "একটা বিড়ি আছে ভাই?"

রাধামাধবের শরীর-মন শিউরে উঠলো। কোন উত্তর না দিয়ে সে হন হন্ করে তাকে ছাড়িয়ে গেল। লোকটা আবার গান ধরলো! ও গান গেয়ে শীত তাড়াবার চেষ্টা করচে! রাধামাধব নিজের দীনতার কথা ভুলে গিয়ে লোকটির জন্য বেদনা বোধ করলো।

শহরের মধ্যে সে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ শীত তাকে তেমন পীড়া দিতে পারে নি। কিন্তু খালের ধারে আসতেই সেই লোকটার মতো তারও গান ধরতে ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু সেখান থেকে তার বাড়িও বেশী দূর নয়। সে যখন বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে কড়া

নাড়তে লাগলো, তখন পাশের বাড়ির বৈঠকখানায় ঘড়িতে টং টং ক'রে বাজলো এগারোটা।

সে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো, খালের দু' কিনারে ছোট-বড় ব্যাপারি নৌকোগুলো অন্ধকার ও স্থির হয়ে আছে। জলে পড়েচে রাস্তার আলোর স্থির প্রতিবিম্ব। সব শীতে জড়-সড়, ধোঁয়ায় স্বপ্নের মতো। হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল রেলের বাঁশী। গাড়িখানা পোলের ওপর দিয়ে হুড় হুড় করে চলে গেল শিয়ালদার দিকে।

রাধামাধব আবার কড়া নাড়লো, একটু বিরক্তির সঙ্গে। কেন তার জন্যে কেউ জেগে থাকে না?

খুট্ করে দরজা খুলে গেল। রাধামাধব একটু জোরে ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। সামনে আলো হাতে তার ছোট বোন। গায়ে একটা বুক-খোলা ময়লা ঘাগরা। মাথায় ঝাঁকড়া, কোঁকড়া চুল, গায়ের রঙ কালো, চোখ দু'টি ডাগর, মুখখানি মিঠে। তার ওপর একটু কারুণ্য।

রাধামাধব বল্‌লে, "তুই কেন? মা কৈ?"

তার বোন দরজা বন্ধ করতে করতে বল্‌লে, "মার দুপুর থেকে জ্বর।"

রাধামাধব কোন উত্তর না দিয়ে সান-ফাটা, শ্যাওলায় পিছল উঠোনটুকু পেরিয়ে ঘরে ঢুক্‌লো।

রাধামাধবের চাকরি-জীবন বড়লোকের চরিত-কথা নয়। তার পারিবারিক জীবনও অতি সাধারণ ঘরের কথা। কাজেই তার পরের দিনগুলি বাদ দিয়ে মাত্র আর একটি দিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করচি।

রাধামাধব সামান্য মানুষ; তাই ঘটনাটিও সাধারণ।

তখন বইয়ের বাজারের মরশুম চৈতী ঘূর্ণীতে উড়ে গেচে। তার দোকানের ছুটি হয় সন্ধ্যা হ'তেই। সারাদিনই প্রায় সে দোকানে এক রকম বসেই থাকে। কখন কখন বাবুর পান-সিগরেট ও ডাব কিনে আনে। সে দোকানের কাজ-কর্ম শিখেচে বেশ।

সেদিন সে মাইনে পেল, জলপানিও পেল। বাবু লোকটি ভাল। একখানি পাঁচ টাকার নোটের ভাঁজ খুলতে খুলতে বললেন, "মাধব, বেচাকেনা তো দেখচিস্? এখন দোকান-খরচই ওঠে না। কাল থেকে তুই আর এসে কি করবি? আবার আগামী বছর—"

রাধামাধবের হাত-পা কাঁপতে লাগ্‌লো। সে ঢোক গিলে বললে, "কেষ্টদা' বলেছিল আপনি আমাকে বরাবরকার জন্যে রাখবেন।"

"ইচ্ছে তো ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের বাজার বন্ধ। তুই আগাম নিয়েছিলি দশ টাকা তেরো আনা। বাকি ন' টাকা সাত আনা। আর এই নে আরও পাঁচ টাকা।"

রাধামাধব টাকা কয়টি সাগ্রহে নিয়ে আস্তে আস্তে পথে বেরিয়ে পড়লো।

কেষ্টদা' আস্‌ছিল তার কাছেই; জিজ্ঞেস করলে, "মাইনে পেয়েচিস্?"

রাধামাধব ঘাড় নেড়ে জানালে, 'হাঁ'। তারপর বললে, "তুমি যে বলেছিলে আমাকে বরাবরকার জন্যে রাখবে?"

"যা বাজার! কথা ঠিক রাখা কঠিন রে। যাই হোক্, তুই আরও একমাসের মাইনে বেশি পেয়েচিস তো?"

"বাবু পাঁচ টাকা বেশি দিয়েচে।"

"সে কি? আমায় যে বললে, একমাসের মাইনে বেশি দেবে! আচ্ছা, কাল দেখ্‌বো।"

"কেষ্টদা', আমাকে একটা বড় দোকানে চাকরি দাও।"

"আমারই চাকরি থাকে কি না ঠিক নেই। কাল পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি যাচ্চি। তোর বাবুও সেই গাড়িতেই যাবে। দেশে যে সেদিন একশো বিঘে ধেনো জমি কিনেচে। তাই বোধ হয় টাকায় টান। তুই ভাবিস্ নি। তোর ও পনেরো টাকা আমি আদায় করে দেবো। তবে দেরি হবে।"

রাধামাধব পিছনে হাত দু'খানা দিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আস্তে আস্তে চলতে লাগ্‌লো। কেষ্টদা' কখন যে তার পাশ থেকে সরে গেচে সে জানতেও পারলো না, জানবার চেষ্টাও করলো না।

সে যখন বাড়ি পৌছলো তখন একটু রাত হয়েচে। তার মা চুপ্ করে ঘরের দরজায় বসে। ঘরে চাল বাড়ন্ত। রান্নার ঝঞ্ঝাট নেই।

রাধামাধব রোয়াকের ওপর অবসন্ন দেহে বসে পড়লো।

প্রিয়ঙ্গু

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৩

প্রস্তুতি

তারাও কর্ম্মী, ভাব লয়ে যারা থাকে,
চিন্তামণির খপর তারাই রাখে।

শিক্ষালাভের জন্য প্রিয়ঙ্গু কয়েক বছর বিদেশে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই

ভাবে জীবন কাটাইতে লাগিল। ডুমুরের ফুলের সন্ধান করে, পাকা হরিতকীর জন্য বনে বনে ঘোরে, 'ভ্রমরার দহে' 'কমলে কামিনীর' দর্শন লাভের জন্ত ঠিক দুপুরে নদীকূলে দাঁড়াইয়া থাকে।

নদীর এত জল কোথায় যায়? কেন যায়? মেঘগুলি কোন্ দেশের পানে ছোটে? পৃথিবী ও গ্রহ-তারা কেন আবর্ত্তন করে? এ সব গতির উদ্দেশ্য কি? সব গতিই ভগবানের দিকে। অগতিরও তিনিই গতি।

ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া 'স্বাধীনতা' আনিতে তাহার ইচ্ছা হয়। সে নিজের নয়, দেশের মুক্তি চায়। সোমনাথের মন্দির ধ্বংসের কথা পড়িয়া দরদর ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করে। ইহার প্রতিকার ও প্রতিশোধের তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে।

একদিন গভীর রাত্রে 'বনের বুড়ার' দর্শনলাভের জন্য গ্রাম-প্রান্তে বিজন অরণ্যে সে ধ্রুবের ন্যায় ব্যাকুলতার সহিত ভগবান্‌কে ডাকিতেছিল। 'বনের বুড়া'র দর্শন মিলিল না বটে কিন্তু গ্রামের এক মহৎ উপকার সাধিত হইল। একদল ডাকাত গ্রামে হানা দিতে আসিতেছিল, তাহারা গ্রাম সজাগ হইয়াছে ভাবিয়া ফিরিয়া গেল।

নিষ্কর্ম্মা প্রিয়ঙ্গুর জীবন নানা খেয়ালেই কাটিত। সে শুনিয়াছিল কুরুক্ষেত্রের পাণ্ডারা বাঙালী, শিমলা শৈলের রাজবংশ বাঙালী, কাশ্মীরের সব হিন্দুই ব্রাহ্মণ এবং তাহারা বাঙালী, তাই মাছ-ভাত আহার করে। সে কাবুলীদের কাছে শুনিয়াছে সেখানে নাকি বাঙালী আছে, তাই সে স্থির করিল সমস্ত ভারত পরিভ্রমণ করিয়া বাঙালীদের কীর্ত্তি-কলাপ ও তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা তাহার জীবনের ব্রত ও কর্ত্তব্য হইবে। সে থাকে বাঙলার পল্লীতে কিন্তু তাহার মন ঘুরিয়া বেড়ায় হিমালয়ের শিখরে শিখরে। রাজপুতদের বীরত্বের কাহিনী তাহাকে মুগ্ধ করে, দ্রাবিড়, কর্ণাট, সৌরাষ্ট্রের নাম তাহাকে উল্লসিত করে— 'বিন্ধ্য পর্ব্বতকে সে উদ্দেশে প্রণাম করে, বলে,—কি চমৎকার পর্ব্বত! গুরু অগস্ত্যের আদেশে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াই রহিল, আর উঠিল না! নতুবা উঁচুতে তো হিমালয়কে ছাড়াইয়া যাইত! এই সব ভাব-বিলাসে তার দিন কাটে।

গ্রামে তাহার এক বন্ধু জুটিয়াছে বৃদ্ধ বক্‌সী মহাশয়। তিনি সুরসিক ও সদানন্দ। প্রিয়ঙ্গুর সব অদ্ভুত পরিকল্পনাই তিনি ধৈর্য্যের সহিত শুনিতেন। একদিন দেখিলেন এক কাবুলীর কাছে প্রিয়ঙ্গু কি পড়িতেছে।

বক্‌সী—"কি করছ হে?"

প্রিয়ঙ্গু—"আজ্ঞে, পুস্তু ভাষা শিখছি। ওটা কাবুলীদের ভাষা, কাশ্মীরেও চলন আছে। বক্‌সীমশাই, কাবুলে বহু বাঙালী আছে, আমাকে ও-দিকে যেতেই হবে।"

বক্‌সী—"কাবুল যদি নিতান্তই যাও—কিছু মেওয়া ফল আনবে। খাস কাবুলের জিনিষ কেমন দেখা যাবে। আর কাশ্মীরে গেলে, শাল দামী জিনিষ, যদি আন্‌তে না-ই পার, জাফ্রাণ আন্‌বে, পোলাও রঙানো যাবে। জাফ্রাণ ঘরে থাকলে আর ভাবনা কি? মাছ, চাল আর ঘি হ'লেই তো পোলাও!"

প্রিয়ঙ্গু—"তা আনবো। আচ্ছা বক্‌সীমশাই, এ গ্রাম থেকে কোন লোক সুদূর বিদেশে গিয়ে গ্রামের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন?"

বক্‌সী—"এক শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহল যাত্রার পর, আমার পিতামহের পিস্‌তুতো ভাই চৈতন্য মজুমদার। তিনি কেবল উর্দ্দু নয়, আরবী, ফারসী, হিন্দি ভাল জানতেন—তাই বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুর তাঁকে মহাফেজ নিযুক্ত করেন। পরোয়ানা পেয়ে ষোল জন বেহারা ও চারজন পাইক সহ পাল্‌কীতে বর্দ্ধমান রওনা হয়েছিলেন কিন্তু পৌঁছতে পারেন নি। বিশ মাইল গিয়ে গৌরী নদীর দক্ষিণে শিয়াল দেখে অযাত্রা হয়েছে এই ভয়ে বাড়ী ফিরে আসেন, আর কোথাও যান নি।"

প্রিয়ঙ্গু—"তিনি বিশ মাইল থেকে ফিরেছেন, আমি বিশ হাজার মাইল ঘুরে আসবো। তিনি আট ঘণ্টা পরে ফিরেছেন, আমি তিন আট চব্বিশ বছর পরে ফিরবো। বক্‌সীমশাই, মজুমদার কর্ত্তার এ কাহিনী আর কাউকে বলবেন না।"

বক্‌সী—না, কেবল তোমাকেই বল্‌লাম, আর সবাই জানে।"

প্রিয়ঙ্গুর কাজও ছিল না, অবসরও ছিল না, তাই কিছু দিনের জন্য জাহানাবাদ নীল-কুটিতে একটী চাকুরী লইল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত জেফ্‌রী সাহেবকে চপেটাঘাত করিয়া শীঘ্রই সে কাজে ইস্তফা দিয়া আসিল। কুটিয়াল ও তাহার মেম প্রিয়ঙ্গুকে খুব স্নেহ করিতেন। প্রিয়ঙ্গুকে মাত্র জেফ্‌রীর কাছে ক্ষমা চাহিতে বলিলেন, কিন্তু প্রিয়ঙ্গু উত্তর দিল—'মাতলামি করেছিল তাই মেরেছি। তার জন্ত মোটেই আমি দুঃখিত নই, কাজেই ক্ষমা চাইব না। চাইলে বাঙালীকে খাটো করা হবে।'

চাকরী গেল, কিন্তু সাহেবের কন্যা মে-বেল চুরি যাওয়ায় প্রিয়ঙ্গু মর্ম্মাহত হইয়াছিল। সে গিয়া সাহেবকে বুঝাইল—মরার চেয়ে হারানো ভাল, একদিন না একদিন পাওয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ নাগিনা খড়ি পাতিয়া গণিয়া বলিয়াছে—'মে-বেলকে কেহ মারিতে পারিবে না, সে বাঁচিয়া আছে এবং রাজরাণী হইবে।' সাহেব ও মেমের সজল নয়ন ও ব্যাকুল ভাব প্রিয়ঙ্গুকে ব্যথিত করিল। সেও অনুসন্ধানে বহু সাহায্য করিল। গ্রামের নিকটে এই ঘটনা ঘটায় প্রিয়ঙ্গু বড়ই লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছিল—সহানুভূতি ও বেদনায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

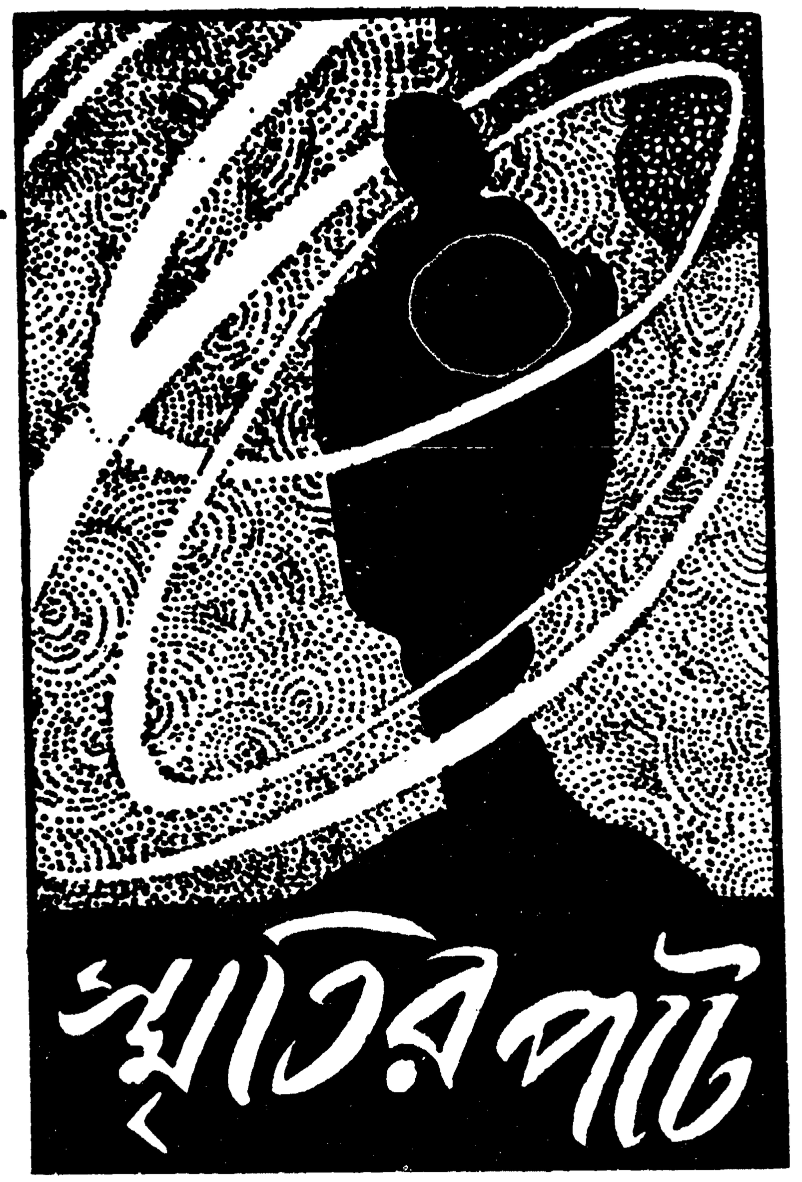

আত্মোন্নতি সমিতির গল্প

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
এম্. এ, বি. এস্-সি

অরবিন্দ

বিভূতিদের সেই তেতালার মেস্-গৃহে আমাদের প্রথম অরবিন্দের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী হইল। যতীন বাঁড়ুয্যের দলে যোগ দেওয়ার পর হইতেই অরবিন্দকে আমরা নেতা বলিয়া গণ্য করিতাম। কাজেই তাঁহার সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ের জন্য আমরা সকলেই উদ্গ্রীব ছিলাম। কিন্তু এই সময়ে পুলিসের কড়াকড়ি বড় প্রবল হইয়াছিল, সে জন্য নিরাপদ স্থান নহিলে মন্ত্রণা-সভা করা যায় না। এ জন্য বিভূতির ঘরটিই উপযুক্ত স্থান বিবেচিত হইল। এই মন্ত্রণা-সভায় বিভূতি, মন্মথ, আমি, সতীশ, প্রভাস, ভুবনেশ্বর এবং সম্ভবতঃ আরও দু'-তিন জন ছিলাম। কি কি কথা হইয়াছিল এখন মনে নাই। কিন্তু আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া বলিয়াছিলেন, "আত্মোন্নতি সমিতিই বোধ হয় বাংলা দেশের সর্ব্ব পুরাতন দেশভক্ত বৈপ্লবিক সমিতি। অবশ্য বহুকাল পূর্ব্বে আমার মাতামহ রাজনারায়ণ বসু ও তাঁহার বন্ধুগণ এক বৈপ্লবিক সমিতি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাজ বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।"

রাজা সুবোধ মল্লিকের ওয়েলিংটন স্কোয়ার-স্থিত বাড়ীতেও অরবিন্দের সহিত কয়েকবার দেখা হইয়াছিল। তখন শুধু কাজের কথা ছাড়া অন্য কথা কহিবার সুযোগ ছিল না। স্বদেশী যুগের প্রথম অবস্থায় কুমিল্লায় দাঙ্গার পরে ময়মনসিংহে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ ঘটিবার উপক্রম হয়। সেখানকার কোন কোন স্থানের হিন্দুরা ভীত হইয়া কলিকাতায় সাহায্য প্রার্থনা করে। কলিকাতা হইতে কয়েক দল যুবক তাহাদের সাহায্যার্থ গমন করে।

প্রথম দলে ইন্দ্র নন্দী, ভুপেন দত্ত প্রভৃতি ছিল। দ্বিতীয় দল আত্মোন্নতি সমিতির পূর্ণ বন্দোবস্তে প্রেরিত হয়। ইহাতে প্রভাস দে, হরিশ শিকদার, মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী (?), সুরেশ মুখার্জী, বিপিন গাঙ্গুলী প্রভৃতি ছিল। অরবিন্দের কাছ হইতে ও আচার্য্য রায়ের কাছ হইতে অর্থ সাহায্য কতক পাওয়া গিয়াছিল। আত্মোন্নতির অনেকগুলি রিভলভার এই

উপলক্ষে খোয়া যায়। ইন্দ্র ও হরিশের হঠকারিতায় রাত্রে জামালপুরে মুসলমানদের সহিত বিবাদ বাধে। বহু সংখ্যক স্থানীয় মুসলমান ৮৷১০ জন মাত্র বিদেশ হইতে আগত যুবককে লাঠি, সরকি লইয়া আক্রমণ করে। কাজেই গুলি করা ছাড়া তাহাদের আর আত্মরক্ষার উপায় ছিল না। কয়েকজন মুসলমান হত বা আহত হয় এবং দেশভক্তদিগের পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হয়। উহারা পূর্ব্বেই কাছারী-বাড়ীতে (ব্রজেন্দ্রকিশোরের?) আস্তানা লইয়াছিল, সেইখানেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইতিমধ্যে আরও বহুসংখ্যক মুসলমান ও পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন কাছারীর অধ্যক্ষের পরামর্শ মত রিভলভারগুলি একটি পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করা হয়। পুলিস উচ্চ-কর্ম্মচারীদের কিন্তু সহানুভূতি ছিল যুবকদের উপর। কাজেই খানা-তাল্লাসী তেমন ভাল করিয়া করা হয় নাই। মুসলমানদের কথায়, এবং কতকটা তাহাদের রক্ষার জন্য, বৈপ্লবিকগণকে গ্রেপ্তার করা হয়। কয়েক দিন হাজত ভোগের পর, অন্ধকারে লোক চিনিতে পারার অসম্ভাবনার অছিলায়, আসামীরা খালাস পায়।

কলিকাতার যুবকদিগের পূর্ব্ব বাংলার হিন্দুদিগের প্রতি এই সহানুভূতির ফলে পূর্ব্ব-বাংলার হিন্দুদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রতিষ্ঠার বিশেষ সুযোগ ঘটিল। প্রভাস এই সময়ে সুরেন্দ্র-মোহন ঘোষকে দেশহিতার্থে গুপ্ত-সভার কার্য্যে দীক্ষিত করে। চারিদিকে গুপ্ত-সমিতি প্রতি-ষ্ঠিত হইতে থাকে।

ব্যারিষ্টার পি. মিত্র

'এইখানে আমার সময়-ক্রম সম্বন্ধে কিছু গোলোযোগ ঘটিতেছে। যতীন বাঁড়ুয্যের বিপ্লব-ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হওয়ার পর, মনে হয়, যেন অরবিন্দ আসিয়া শ্রীযুত পি. মিত্রের সভাপতিত্বে সমগ্র বাংলায় বিপ্লব-সমিতি স্থাপন করিয়া আবার বরোদায় চলিয়া যান। মিত্র মহাশয় প্রকাণ্ডকায়, কৃষ্ণবর্ণ ও বলবান্ পুরুষ ছিলেন। যাহারা তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিল তাহারা বলিত তিনি খুব কালী-ভক্ত ছিলেন। ইহারই ভ্রাতা হেমেন্দ্র মিত্র আলিপুরের বিখ্যাত গভর্ণমেণ্ট উকীল ও প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাত্মার শিষ্য ছিলেন। এক ভাই বৈষ্ণব, অপর ভাই ঘোরতর শাক্ত। মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমগ্র বাংলার বিপ্লব-সমিতি-গুলির এক অধিবেশন হয়—রাজা সুবোধ মল্লিকের ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ীর একটি হল্-ঘরে। আত্মোন্নতির পক্ষে সতীশ, প্রভাস ও আমি উপস্থিত ছিলাম।

স্বদেশী ডাকাতি

বৈপ্লবিক কার্য্যের জন্য প্রচুর টাকা আবশ্যক। সকল সমিতির সভ্যরাই এই অর্থাভাবের কথা তুলিলেন। কেন্দ্র তাঁহাদের সকলের অর্থাভাব ঘুচাইবার অসামর্থ্য জানাইলেন। চাঁদার কথা উঠিল। বৈপ্লবিকরা অধিকাংশই এমন অবস্থাপন্ন নহেন যে বেশী টাকা চাঁদা দিতে পারেন। দেশের ধনীরা এরূপ কার্য্যে চাঁদা দিতে ভয় পান। প্রকাশ্য ব্যাপারসমূহে চাঁদা

দিলে দেশে যে নাম ও কীর্ত্তি রটিত হয় তাহা অনেক ধনীর কাম্য। অতএব সেরূপ ব্যাপারে চাঁদা সহজেই উঠে।

শেষে কেহ কেহ (বোধ হয় মফঃস্বলের কর্ম্মীরা) প্রস্তাব করিল, ডাকাতি করিয়া টাকা সংগ্রহ করা যাউক। ধনীরা যেরূপ নানা অপকার্য্যে টাকা ব্যয় করে তাহাতে তাহাদের কিছু টাকা কাড়িয়া সৎকর্ম্মে লাগাইতে কাহারোই আপত্তি ছিল না। ডাকাতি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করাই অধিকাংশ সভ্যের মত হইল—সভাপতিরও। কেবল আমি আপত্তি করিয়াছিলাম এবং সতীশ আমাকে সমর্থন করিয়াছিল। প্রভাস বলে, সেও আমাকে সমর্থন করিয়াছিল—কিন্তু ভিন্ন কারণে। সে বলে, 'আমি বলিয়াছিলাম, ডাকাতি করিলে আমরা দেশের বড়-লোকদের সহানুভূতি হারাইব।' আমি অধ্যাপক বংশের ছেলে, কুসংস্কারের হাত হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাই নাই। আমি বলিলাম, 'ডাকাতি করিবার সময় বড়লোকের অনেক নিরীহ দরিদ্র কর্ম্মচারী মারা যাইবার সম্ভাবনা; এই নিরীহদের অভিসম্পাতে আমাদের কার্য্যে সাফল্য আসিবে না।' কিন্তু অধিকাংশের মতে আমার কথা অগ্রাহ্য হইল।

ক্রমে স্বদেশী ডাকাতি আরম্ভ হইল। তৎকালীন সংবাদপত্রে ইহাদের বিবরণ বিবৃত আছে। বেড়া নামক স্থানের ডাকাতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ডাকাতরা কয়েকখানা নৌকায় করিয়া এক বড়লোকের বাড়ী লুঠ করিয়া বহু সম্পত্তি লইয়া যখন পলাইতেছিল তখন কয়েকখানা পুলিসের নৌকা ডাকাতদের অনুসরণ করে। মাঝে মাঝে উভয় পক্ষে গুলি চলিতে থাকে। ডাকাতদের গুলির জন্য পুলিস তাহাদের নৌকার বেশী সন্নিকটে আসিতে পারে না, কিন্তু তাহাদের নৌকা লক্ষ্য করিয়া অনুসরণ বন্ধ করে নাই। এরূপ কয়েকদিন অনুসরণ চলিতে থাকে। শেষ দিন পুলিস যখন নৌকাখানাকে একস্থানে স্থির থাকিতে দেখে তখন সাহস করিয়া উহার কাছে গিয়া দেখে নৌকা জনশূন্য, মালপত্র কিছুই নাই। ইন্দ্রনাথের ধারণা উহা হরিশ শিকদারের দল করিয়া ছিল। কারণ হরিশের এক আত্মীয় ঐ দলের নেতা ছিল।

এই ডাকাতির ফলে পি. মিত্রের বৈপ্লবিক দল জমিতে পারিল না। কয়েক দল ডাকাত ধরা পড়িয়া গেল। ডাকাতিতে আবার অনেক দেশভক্তিহীন লোকও শুধু লুঠের লোভে যোগ দিতে লাগিল। তাহাদের কেহ কেহ 'য়্যাপ্রুভার' (রাজসাক্ষী) হইল, বৈপ্লবিক কর্ম্মী অনেকের জেল প্রভৃতিও হইল।

ডাকাতির গহনা প্রভৃতি অধিকাংশ স্থলে স্বার্থপর বড়লোক বা স্বর্ণকারের হাতে পড়িল; কর্ম্মীরা তাহার স্বল্প অংশই পাইল।

মাঝে মাঝে বৈপ্লবিক দলভুক্ত বড়লোকেরাও ডাকাতির হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। কারণ সকল দলের সহিত সকল দলের পরিচয় ছিল না। এরূপ একটি ঘটনার কথা বারান্তরে বলিব।

নিঃশব্দ যে শব্দ

শ্রীদিলীপ ঘোষ, বি. এস্ সি.

ঢং...ঢং...ঢং...ঢং-ঢং-ঢং......

বেজেই চলেছে পাশের বাড়ীর বড় ঘণ্টা। কানের ওপর কী অত্যাচারই না করছে এরা! ভাবে নবু।

"কি রে, অঙ্কটা হ'ল?" প্রশ্ন করলেন বড়দা', অর্থাৎ নবুর মাষ্টার মশাই।

"কি ক'রে করব? কানের কাছে ঐ রকম শব্দ হ'লে কেউ অঙ্ক কষতে পারে? ইচ্ছে হ'চ্ছে দিই গিয়ে ঘণ্টাটার গলা টিপে।"

"তা তো দেবে," হাসতে হাসতে বড়দা' বলেন, "কিন্তু ঘণ্টাটাও যদি বদমাইসী করে তোমার সঙ্গে? যা জোর, যদি তেড়ে আসে, তোমার মত ছেলেকে এক ঘুষিতেই কাৎ করে ফেলতে পারে।"

"ইস্-স্! কি ক'রে আসবে?"

"ওইখানেই তো মজা! খু-উব আস্তে আস্তে, বেড়ালের পায়ের চেয়েও অনে-ক কম আওয়াজ ক'রে শব্দ যদি আসে অতি নিঃশব্দে,—"

"বা-রে! শব্দ আবার নিঃশব্দে আসবে কি রকম? তাও হয় নাকি?"

"কেন হবে না? মায়ের ভাঁড়ার ঘর থেকে যখন আচার চুরি করতে যাও তুমি, তখন কি শব্দ হয় খুব?"

"সে তো পা টিপে-টিপে যাই—"

"ঠিক সেই রকম পা টিপে-টিপে শব্দও আসতে পারে। আচ্ছা, বল দেখি, ঘণ্টার আওয়াজ আমরা শুনি কি ক'রে?"

"এই তো সেদিনই বললেন! ঘণ্টার গায়ে যখন আঘাত করি, সেটা কাঁপতে থাকে, আর কাঁপতে কাঁপতে বাতাসে ধাক্কা মেরে মেরে ঢেউ-এর সৃষ্টি করে। সেই ঢেউ ভাসতে ভাসতে আবার ধাক্কা মারে এসে আমাদের কানের পরদায়, আর তখনই আমরা শব্দ শুনতে পাই।"

"ঠিক। কিন্তু আর একটি কথা আছে ওর মধ্যে। ঘণ্টাটা শুধু কাঁপলেই চলবে না, সে কাঁপুনিও হওয়া চাই ঠিক নিয়ম মত। যদি গুণে দেখা যায় যে, প্রতি সেকেণ্ডে তার কাঁপুনি ষোল বারের কম, তা হ'লে সে শব্দ এত আস্তে হবে যে তা শোনা যাবে না। আবার সেই কাঁপুনি যদি সেকেণ্ডে ষোল হাজারেরও বেশী হয়, তা হ'লেও সেই একই দশা। সে শব্দ এত জোরে হবে যে আমাদের কান তা ধরতেই পারবে না। অথচ শব্দ তো হচ্ছে ঠিকই। তা হ'লে এই শব্দকে "নিঃশব্দ শব্দ" বলতে বাধা কি?"

"কিন্তু অত জোরে কি ক'রে বাজানো যাবে ঐ ঘণ্টা?"

"তার জন্যে অবশ্য দরকার বিশেষ ধরণের ঘণ্টা কিংবা বাঁশীর। এই সব যন্ত্র বাজিয়ে

সেকেণ্ডে পাঁচ কোটি বারেরও বেশী কাঁপুনির শব্দ বের করা যেতে পারে। এই নিঃশব্দ শব্দ শুধু যে তোমাদের সংগে মারামারিই করতে পারে তা ভেবো না। এর কাজের ফিরিস্তি শুনলে—"

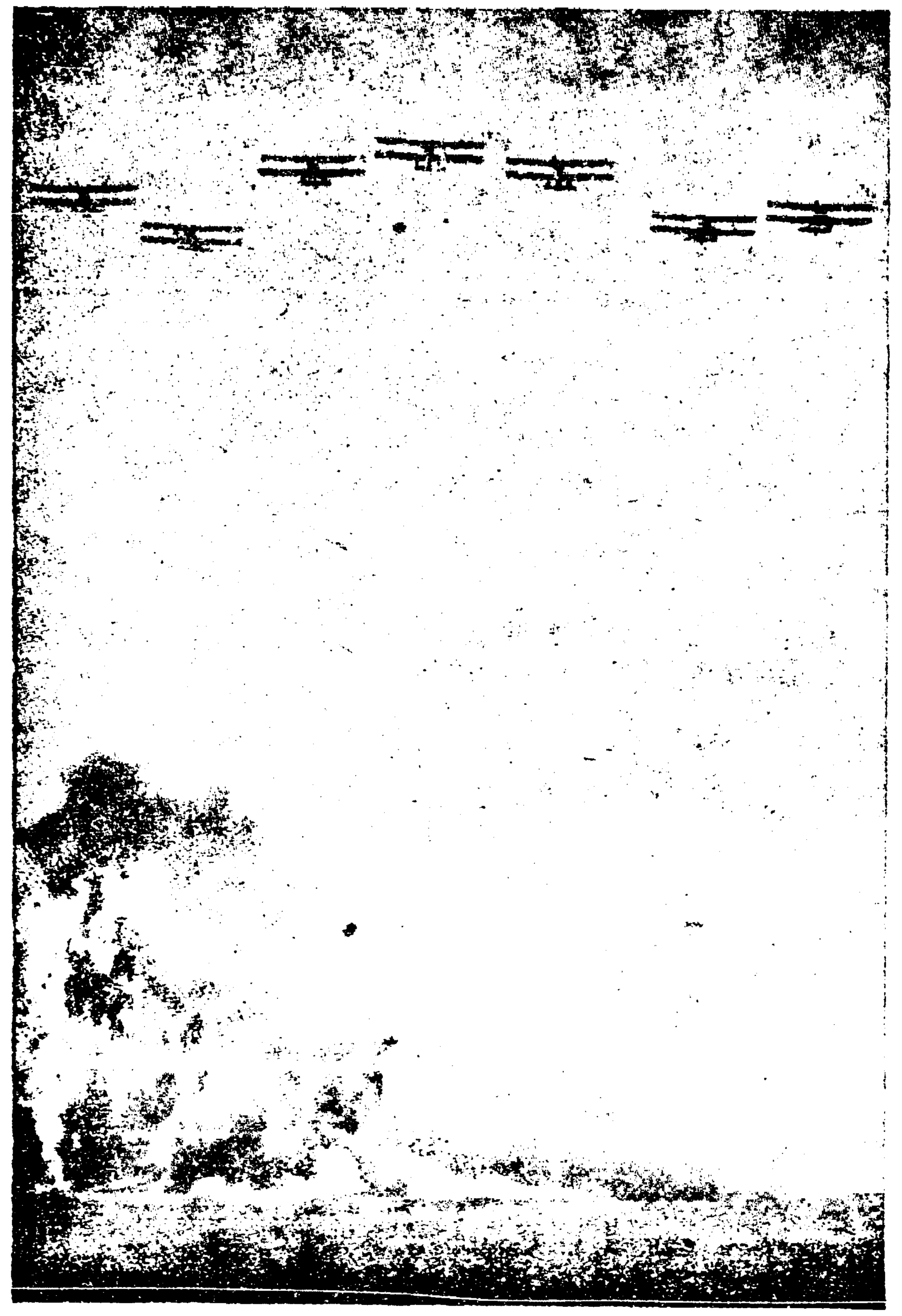

এরোপ্লেন আক্রমণ করতে আসছে। আসবার আগেই নিঃশব্দ শব্দ সে খবর সংগ্রহ ক'রে হুশিয়ার ক'রে দেবে।

"আচ্ছা, ওরা কি সত্যি-সত্যিই ঘুষি মারতে পারে?" জিজ্ঞেস করল নবু, একটু ভয়ে ভয়েই।

"নিশ্চয়ই। তবে ওদের কায়দাটা একটু আলাদা। শুনেছ তো, প্যারিসের 'নোতর দাম্' গীর্জার নাম? তার মাথায় আছে বিরাট একটা ঘণ্টা। সেই ঘণ্টা যখন বাজে, তখন তা থেকে বেরোয় নানারকম কাঁপুনিওয়ালা শব্দ। তার কোন কোনটা কানে শোন যায় না কিন্তু তার এত জোর যে যারাই তার কাছে যায় তাদেরই নাক-মুখ থেঁতলে একাকার! অর্থাৎ ওই শব্দগুলো কানে শোনা না গেলেও তাদের জন্যে বাতাসে আলোড়ন তো হচ্ছে ঠিকই! এই আলোড়ন এত তাড়াতাড়ি হচ্ছে যে, এগুলো প্রায় শিলাবৃষ্টির মতই নাকে-মুখে এসে পড়তে থাকে।"

নিজের নাকে একটু হাত বুলিয়ে নেয় নবু। চুপিচুপি, বড়দা' যাতে দেখতে না পান। নাঃ, ঠিকই আছে। এবার সে প্রশ্ন করে,—"কিন্তু শব্দ, সে আবার কাজ করবে কি রকম?"

"ওরে ব্বাস্ রে! ভীষণ কাজের লোক' এই নিঃশব্দ শব্দ। বৈজ্ঞানিক, যাঁরা এদের নিয়ে পরীক্ষা করছেন, তাঁরা বলেন, এরা নাকি আলাদীনের গল্পের দৈত্যের মতই। সম্ভব অসম্ভব এমন সব কাজ এরা করতে পারে যা শুনলে সত্যিই অবাক্ হয়ে যেতে হয়। অবশ্য

রাজকন্যে এনে দিতে পারবে না; কিন্তু তোমার রাজকন্যে যদি আসেন এরোপ্লেনে চড়ে তো তাঁর জন্যে পথ করে দিতে পারবে।"

"বা-রে! শব্দ আবার পথ করে দিতে পারে নাকি?"

"পারেই তো। মাঘ মাসের ঘন কুয়াসার মধ্যে তোমার রাজকন্যের যন্ত্ররাজের চোখ যদি নামবার পথ দেখতে না পায় তো এগিয়ে আসবে ওই নিঃশব্দ শব্দ। এসেই চোঁ-ওঁ চাঁ-আঁ—! অবশ্যি আওয়াজ হবে না কিন্তু তবে দেখবে, তাদের সেই শক্তিশালী ঢেউয়ের ধাক্কায় তারা কুয়াসা-টুয়াসা তাড়িয়ে দিয়ে সব ফর্সা ক'রে দেবে। এ ছাড়াও পরীক্ষা ক'রে জানা গেছে, কোন জায়গার বাতাস যদি ধুলো-বালি, কয়লা-ঝুলে ভরতি থাকে—যা নাকি নিঃশ্বাসের সংগে নিলে আমাদের স্বাস্থ্যহানির বিশেষ আশংকা, সেই সব ময়লা পরিষ্কার করতেও এই নিঃশব্দ শব্দ খুব ওস্তাদ্। একবার যদি সেখানে ছেড়ে দেওয়া হয় এই ভূতুড়ে শব্দকে, সংগে সংগেই দেখবে, ওই সব ময়লা জঞ্জালগুলো তালগোল পাকিয়ে নীচে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর বাতাস,—সে একেবারে পরিষ্কার ফিটফাট হয়ে জায়গা-টাকে দার্জিলিং-সিমলার মতই স্বাস্থ্যকর বানিয়ে তুলেছে। এ সবই কিন্তু ওই শব্দ-তরংগের কারসাজি।

চিমনির ধোঁয়ায় সহরের স্বাস্থ্য নষ্ট হ'তে চলেছে।
নিঃশব্দ শব্দ এই ধোঁয়া পরিষ্কার ক'রে দেয়।

"এই নিঃশব্দ শব্দকে হেন কাজ নেই যাতে লাগানো হচ্ছে না। এদের ব্যবহার ক'রে যত সুফল পাওয়া যাচ্ছে ততই বাড়ছে এদের ব্যবহার। যেমন ধর না, সাগরে যে জাহাজটা ডুবে গেছে কিংবা যে সাবমেরিনটা জলের তলায় বদ্ মতলবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের যদি সন্ধান্ জানতে চাও তো পাঠিয়ে দাও এই নিঃশব্দ শব্দকে। চারদিক্ ঘুরে ঘুরে ঠিক সে আসল খবরটা জানিয়ে দেবে তোমাকে। এমনি ক'রেই জানা যাচ্ছে আকাশে শত্রুপক্ষের বিমানবহরের আগমন, আর সংগে সংগেই গর্জে উঠছে বিমান-বিধ্বংসী কামানের দল।

"শুধু যুদ্ধ কেন, আরও কত কাজে যে লাগানো হচ্ছে এই যাদু-শব্দকে তা শুনলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। জানো হয়ত, যন্ত্রপাতির কারখানা—যেখানে বিরাট বিরাট ছাঁচের কাজ হয়, সেখানে ঢালাই-করা অংশগুলোর জোর পরীক্ষা ক'রে দেখা বিশেষ দরকার। তা নইলে কোন অংশের ভেতরে যদি কোন ফাঁপা কিংবা ফুটো-ফাটা থেকে যায়, তাতে

সেটা কম-জোরী হয়ে গিয়ে পরে কোন বিপদ্-আপদ্‌ও ঘটাতে পারে। সেই অনুসন্ধানের কাজ ক'রে দেয় এই নিঃশব্দ শব্দ, জানিয়ে দেয় ঠিক কোন্ জায়গায় কোন খুঁতটা সারাতে হবে।

"এই নিঃশব্দ শব্দই আবার সাহায্য করছে "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলনের। রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, শস্যবীজাগারের মধ্যে যদি এই যাদুশব্দকে পাঠানো যায়, তবে তারা জোরালো শব্দতরংগ দিয়ে বেশ করে দলাই-মলাই করে দেয় সমস্ত বীজগুলোকে, আর তাদের উৎপাদন-ক্ষমতাও যায় অনেক বেড়ে।

"এই নিঃশব্দ শব্দ ব্যবহার ক'রে চিকিৎসকেরাও অনেক সুফল পেয়েছেন। শরীরের ভেতরে যে সব অসুখের জন্যে আগে দরকার হ'ত অপারেশনের, তার অনেক ক্ষেত্রেই আজকাল এই নিঃশব্দ শব্দই বিনা অস্ত্রে কাজ হাসিল করছে। এ সব ছাড়াও বিনা সাবানে লণ্ড্রীর কাপড়-চোপড়ের ময়লা পরিষ্কার করা থেকে সুরু ক'রে বিনা আগুনে জল গরম করা পর্যন্তও সম্ভব হয়েছে এই নিঃশব্দ শব্দের দৌলতে।

"আর—" বড়দা' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, "সম্প্রতি আর একটা কাজ করেছে এই অদ্ভুত শব্দ। তোমাকে অঙ্ক কষার হাত থেকে রেহাই দিয়েছে ও।"

একটি ছোট্ট কাহিনী

অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ

স্থান—নিউইয়র্ক সহরের বিমান-ঘাঁটি "লা গুরার্ডিয়া"। সময়—১৯৪৯ সালের ৭ই নভেম্বর, বেলা ২-৫৫। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এক বিশিষ্ট অতিথিকে লইয়া যাইবার জন্য একটি এরোপ্লেন অপেক্ষমান। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ, প্রবাসী ভারতীয়গণ, আমেরিকার বহু গণ্যমান্য অধিবাসী সমবেত হইয়াছেন এই বিদেশী নেতাকে বিদায়সম্ভাষণ জানাইতে। দেখা গেল, তিনি ব্যস্ত হইয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিতেছেন কাহারও খোঁজে; শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রহমন কোথায়?"

অবশেষে রহমনের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি জনতার মধ্য দিয়া আগে গিয়া তাহার সহিত সস্মিত করমর্দ্দন করিলেন—আন্তরিক, শুভেচ্ছাপূর্ণ এবং সপ্রশংস করমর্দ্দন।

এই বিশিষ্ট অতিথি ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। আফজল রহমন ওয়াশিংটনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের অতি সামান্য একজন কর্ম্মচারী। পণ্ডিত নেহরুর যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণকালে তাঁহার সেবার কার্য্যে রহমন নিযুক্ত হইয়াছিল।

বুড়া মিঞা

৺অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(ছড়ার সুরে পড়তে হবে)

পদ্মাপাড়ের বুড়া মিঞা বয়স মোটে আট-পঞ্চাশ,
কাঁচা-পাকা চুল আর দাড়ি, অধরকোণে করুণ সে হাস।

পাড়াগাঁয়ের সরল ছন্দে জীবন-সুরটী বাঁধা তাহার,
কথার ভঙ্গী সহজ, মিঠে, মনের কোণে কুণ্ঠারি ভার।
বয়স হ'লো প্রবীণ, কিন্তু বুদ্ধিটি যে বড্ড নবীন,
ছল-কপটী নেইকো মোটে, ভাবটা কিছু উদাসীন।

বুড়োর বাপ আজও বেঁচে—বয়স্ তাহার একশো পাঁচ,
মায়ের বুকের স্নেহে শীতল, পাক্‌ল' নাকো মনের ছাঁচ!
বাতাসেতেই বুড়ো হ'ল, বিষয়-বায় আর লাগ্‌ল না,
আকাশেতেই ফেলে যে পা খাঁচার পাখী চন্দনা।

হিসাব-নিকাশ, জমির কালি, পাটের দরের ঝক্‌মারি,
মোকর্দ্দমার নথিপত্র, জাল দলীলের বাট্‌পাড়ি,
ধর্ম্ম রাখার বুক্‌নি দিয়ে মানুষ মারার কায়দাটা
বুড়া মিঞা শিখতে কভু পারল নাকো, হায় দাদা!

পাঁচ "ওক্ত" নমাজ পড়ে, সেবার ব্রতে নিষ্ঠাবান্,
ইসলামেরি শান্তিবাণী কর্‌ল তায় প্রতিষ্ঠা দান।
পদ্মা-বায়ের মুক্তগীতি গুঞ্জরিত কর্ণে তার,
বুড়া মিঞা সাধল খোদায় ভুলি ভেদে বর্ণে আর।*

* ৺নৃপেন্দ্রচন্দ্রের একটি অপ্রকাশিত কবিতা। এটি ১৯৩০ সালে কারাকক্ষে রচিত। বুড়া মিঞার আসল নাম আবদুল লতিফ মুন্সী (মালিকান্দা)। ১২ দিন সে তাঁর সেবা করেছিল।

গল্প না—সত্যি !

ক্যাপ্‌টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এস্‌-সি, এম্‌, বি

"বিশু, একটু এদিকে এস না দাদা ?"—ঠাকুমা একখানা বই হাতে নিয়ে ডাক দিলেন।—"একটু বই পড়ে শোনাবে ? শুয়ে শুয়ে শুনব।"

বিশু এবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। সামনে অফুরন্ত অবসর, সময় কাটে না বললেই চলে। ঠাকুমার ডাকে সাড়া দিয়ে বল্‌ল, "কি বই ওখানা ঠাকুমা ?"

"পৌরাণিক উপাখ্যান। আমাদের ইউনিভার্সিটির বই—জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য ক'রে বেঁচে থাকবার শিক্ষা যার মধ্যে আছে। তোমাদের একেলে ইউনিভার্সিটির বই নয় এ।"

"তার মানে কেবল কতকগুলি আজগুবি গল্প, এই তো ?" বিশু হাসতে হাসতে বল্‌ল।

ঠাকুমা বল্লেন, "ঐখানেই ত' তোমাদের সঙ্গে আমাদের শিক্ষার প্রভেদ। আমরা জ্ঞান বলতে বুঝি নিজেকে জানবার স্পৃহা এবং সেটা মানুষের হিতার্থে সম্পূর্ণ নিয়োগ করা। আর তোমরা বোঝ কোন বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানা। বিজ্ঞান বলতে আমরা বুঝি বিশেষ জ্ঞান—যা বিশিষ্টরূপে মানুষের উন্নতি বিধান করে। আর তোমরা বোঝ বিকৃত জ্ঞান, যা সৃষ্টিকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। পুরাণ শিক্ষা দেয় নিজেকে, দেশকে, সভ্যতাকে গড়বার সাহায্য করতে; আর তোমাদের বই শিক্ষা দেয় কি ক'রে ভাঙতে পারবে নিজেকে, দেশকে, সভ্যতাকে। তাই তোমরা যাকে নিছক গল্প বলে উড়িয়ে দাও আমরা তারই মধ্যে খুঁজে পাই ঐতিহাসিক সত্য। আমাদের মতে সাজাহান, নানক, শিবাজী, সিপাহী-বিদ্রোহ প্রভৃতি যেমন ঐতিহাসিক সত্য, তেমনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ, রাম, হরিশ্চন্দ্র, ধ্রুব—এ সবও ঐতিহাসিক সত্য। তফাৎ এই, এগুলো কিছু বেশী আগেকার ইতিহাস এই ভারতবর্ষের। পুরাণ মানে পুরাতন—অতি প্রাচীন। তখন ত' আর এত সুবিধার কাগজ, কলম, ছাপাখানা ছিল না, তাই সে সব ঘটনা মুখে মুখেই চলে এসেছে যুগ-যুগান্তর ধরে। গল্পের মধ্যে যদি রস না থাকে সে গল্প বেশীদিন মনে থাকে না। তাই তার মধ্যে অনেক অলৌকিক—অবান্তর ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে, রং ফলানের জন্যে।"

বিশু অবাক্‌ হয়ে বল্‌ল, "সত্যি ? আচ্ছা, দাও তোমার বই, আমি তোমাকে পড়ে শোনাই।"

—"বেশ ত', কিন্তু তার আগে তোমার সত্যিকার জ্ঞানের ইচ্ছা যাতে প্রবল হয় তার ব্যবস্থা করি। ও ঘরের আলমারী থেকে "পুরাণ প্রবেশ"* বইখানা নিয়ে এসো দেখি !"

* ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত।

বিশু তক্ষুণি ছুটে গিয়ে বইখানা নিয়ে এল। ঠাকুমা বইখানা নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন—"আচ্ছা, 'অশোক যাহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি শেষ' মনে আছে ত' ? সেই অশোক থেকেই সুরু করা যাক। এই অশোক তোমাদের ইতিহাসের লোক—আজ স্বাধীন ভারতের প্রতীক "অশোকচক্র" যাঁর কীর্তি অশোকস্তম্ভের মধ্যে থেকেই এসেছে। সেই অশোক মগধে রাজত্ব ক'রে গেছেন ২৭১ খৃঃ পূর্বে। তার আগে চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খৃষ্ট পূর্বে। তার আগে "অজাতশত্রু রাজা হ'ল যবে পিতার আসনে বসি" ...সে হ'ল ৫২৭ খৃঃ পূর্বে। তার আগে "নৃপতি বিম্বিসার, নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল পাদ-নখ-কণা তাঁর"। তিনি রাজত্ব করেছেন ৬১২ খৃঃ পূর্বে। আর বুদ্ধদেব তাঁর সমসাময়িক ৬৩৪ খৃঃ পূঃ। এঁরা সবাই তোমাদের ইতিহাসের খ্যাতনামা ব্যক্তি। এর আগে প্রায় ৭০০ বছরের মধ্যে বিশেষ কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা পাওয়া যায় না। যা পাওয়া গেছে সেটা হ'ল মহাভারতের জন্মেজয়ের কাহিনী। যিনি তাঁর বাবা পরীক্ষিৎকে সাপে কামড়াবার প্রতিশোধ নেবার জন্যে সর্পযজ্ঞ করেছিলেন। সেই জন্মেজয় হস্তিনাপুরে রাজত্ব করেছিলেন ১৩৫৬ খৃঃ পূর্বে। আর পরীক্ষিৎ ১৩৮০তে। সাপের ভয়ে পরীক্ষিৎ লোহার ঘরে নিজেকে আবদ্ধ রেখেও সেই সাপের হাতে মরেছিলেন। সেই রাগে তাঁর ছেলে জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ ক'রে দেশের সব সাপকে মেরে ফেলেছিলেন। এই সাপের কাহিনীটাই রূপক। সেখানে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল অন্য এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতি,—'নাগ' জাতি, যাদের সঙ্গে ভীম-অর্জুন, এমন কি শ্রীকৃষ্ণকেও লড়তে হয়েছিল "কালীয় দমন" ক'রে। এই 'নাগ' বংশীয় তক্ষক রাজের রাজধানী ছিল তক্ষশিলা (বর্ত্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে), যেখানে পরে বৌদ্ধ যুগে খুব বড় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। পরীক্ষিতের বাবা অভিমন্যু ১৪১৬ খৃঃ পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন প্রভৃতি মহাভারতের মহারথিগণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পাণ্ডব পক্ষের সবচেয়ে বড় জেনারেল, তাঁর জন্মতিথি আজ পর্যন্তও চলে আসছে জন্মাষ্টমীর দিন। সেটা হ'ল ১৪৫৮ খৃঃ পূর্বে। তাঁর ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান দেখবার দৃষ্টি কত প্রখর ছিল তা তাঁর গীতার মধ্যে থেকে জানা যায়। সেই প্রায় ৩৪০০ বছরের পুরোনো কাহিনী আজও ধার্মিককে ধর্ম আহরণের, পণ্ডিতকে পাণ্ডিত্য, শোকার্তকে সান্ত্বনা, দার্শনিকের দর্শন, বৈজ্ঞানিকের গবেষণার খোরাক জুগিয়ে আসছে। তুমি কর্ম করতে এসেছ, কর্ম করে যাও। সেইটাই তোমার ধর্ম। ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামিও না। কর্মের উপযুক্ত ফল ভগবান্‌ দেবেনই।"

একটু থেমে ঠাকুমা আবার বলতে লাগলেন, "আরও পেছিয়ে চল। এবার 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতা রাম'। আমরা এলাম রামচন্দ্রের যুগে। রাম-রাবণের যুদ্ধ। সেখানে রাবণ রাক্ষস জাতীয় অনার্য, তার সঙ্গে আর্য নরপতি রামের যুদ্ধ ও শত্রুর পরাজয়। সেই রাম রাজত্ব ক'রে গেছেন অযোধ্যায় ২১২৪ খৃঃ পূর্বে। তাঁর বাবা দশরথ ২১৫৮ খৃঃ পূঃ। তাঁর পূর্বপুরুষ রঘু—যাঁর থেকে রঘুবংশের সৃষ্টি,—তিনি রাজা

ছিলেন ২২২৫ খৃঃ পূঃ। এঁদেরও আগে ভগীরথ (২৮৬৩), যিনি স্বর্গ থেকে গঙ্গা এনে সগর রাজার (২৯৫৮) ষাট হাজার ছেলেকে বাঁচিয়েছিলেন। এই গঙ্গা নদী তাঁর সময়ে হিমালয়ের পাথর বেষ্টনীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এদিকে জলের অভাবে তাঁর রাজত্বে হাহাকার উঠে গেল—যেমন এখন হয় রাজপুতানায়। সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র—মানে তাঁর পুত্র-সম প্রজা। জলের অভাবে ফসল না হওয়ায় দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন ভগীরথ জলের সন্ধানে স্বর্গ অর্থাৎ হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে অনুসন্ধানের ফলে দেখলেন অফুরন্ত পার্বত্য জলস্রোত চারিদিকের পাথরের দেওয়ালে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। তার না আছে প্রকাশ, না আছে বিকাশ। আর এদিকে হাজার হাজার প্রজা জল বিহনে মৃতপ্রায়। তখন তিনি পাথরের দেওয়াল ফুটো ক'রে দিলেন আর সেই রুদ্ধ জলস্রোত প্রবলবেগে হরিদ্বারের ভেতর দিয়ে এসে সমতল ভূমিতে পড়ে নিজের গতিবেগে বর্তমান গঙ্গা হয়ে পাতালে অর্থাৎ সমুদ্রতলে এসে মিশ্‌ল। তারও আগে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র (৩১৬৯), যিনি সত্য পালনের জন্যে সমস্ত রাজ্য, সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র সব ছেড়ে দিয়ে কাশীর গঙ্গাতীরে চণ্ডালের কাজ ক'রে জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। তারও আগে মহারাজ ভরত (৩৩৭৯) যাঁর নামে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ নাম পেয়েছে।"

গল্প করতে করতে বেলা পড়ে এসেছিল। বিশু তবু ছাড়বে না। ঠাকুমা বললেন, "আচ্ছা, সন্ধ্যার পর আবার বল্‌ব। আরও অনেক নতুন কথা—যা তোমরা, একেলে-বই-পড়া ছেলেরা, বিশ্বাস করতেই চাইবে না।"

জ্যোতিষী

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

নহবৎখানায় বাজনা বেজে উঠ্‌ল। সন্ধ্যার সঙ্কেত। একটু পরেই রাজসভা বসবে, তার জন্য তৈরী হয়ে নিতে হবে। বাদশাহ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন।

সম্রাট আকবর। হিন্দুস্থানের শাহান্‌শা বাদশা—ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ তিনি,—তাঁর সামান্য অঙ্গুলি হেলনে লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়, সামান্য একটু হুকুমের অপেক্ষায় কত বড় বড় লোক শশব্যস্ত হয়ে থাকে। লোকে বলে তিনিই নাকি ইচ্ছাময়, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছুর একচুল এদিক্ ওদিক্ হবার উপায় নেই।

কিন্তু আজ এ কি হ'ল তাঁর! এ কী ভীষণ কথা শুনলেন তিনি! এই রাজত্ব,—এই বিপুল সম্মান,—সসাগরা হিন্দুস্থানের এই বাদশাহী, এর আয়ু আর মাত্র সাত দিন! আগামী সোমবার সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হবার দু'দণ্ড পরে তাঁকে এই হাস্যময়ী পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হবে? বাদশাহের কপালে কুঞ্চন দেখা দিল। মনে মনে বললেন, 'অসম্ভব'। কিন্তু তাই বা কেমন ক'রে বলা যায়! যে জ্যোতিষী এ কথা গুণে বলেছে তার ক্ষমতা সম্বন্ধেও তো সন্দেহ করবার কিছু নেই! বাদশাহ তার অসংখ্য প্রমাণ পেয়েছেন। জ্যোতিষী যখন যা বলেছে প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। এবারেই বা সে ভুল করবে কেন?

সম্রাট্ সভায় গিয়ে বসলেন। আজ আর কোন কিছুতে মন লাগছে না। কে কি বলছে কানেও যাচ্ছে না যেন! কোন রকমে খানিকটা সময় কাটিয়ে তিনি উঠে এলেন।

এক এক ক'রে দিন এগিয়ে চল্‌ল। আকবর শা'র অবস্থাও ক্রমেই জটিল হয়ে উঠল। মুখে সে হাসি নেই, চুল অর্দ্ধেক শাদা হয়ে গেছে, অসম্ভব রোগা হয়ে গেছেন তিনি। খেতে ইচ্ছে করে না, কথা কইতে ইচ্ছে করে না, রাতে ঘুমও হয় না একটুও। বাদশাহীর ওপর ধিক্কার ধরে গেছে তাঁর।

ব্যাপারটা সকলের আগে চোখে পড়ল রাজা বীরবলের। আকবর-শা'র তিনি শুধু মন্ত্রী ন'ন,—অন্তরঙ্গ বন্ধুও। বাদশাহের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী তিনি। রকম-সকম দেখে তাঁর সন্দেহ হ'ল, এমন কিছু একটা ঘটেছে যার জন্য বাদশাহের আয়ু ফুরিয়ে আসছে অথচ তিনি মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছেন না।

বীরবল গিয়ে বললেন, "সম্রাট্, আপনাকে দেখে যেন কেমন কেমন লাগছে। কোথায় যেন একটা গোল বেধেছে কি হয়েছে আমাকে বলবেন না?"

আকবর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বীরবলকে সব কথা খুলে বললেন। জ্যোতিষী গণনা ক'রে বলেছে আগামী সোমবার সন্ধ্যার পর তাঁর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এর আর নড়চড় নেই।

"কিন্তু—, জ্যোতিষীর কথা অমন ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিচ্ছেন কেন? এমনও তো হ'তে পারে তাঁর গণনায় ভুল হয়েছে। রাজ্যে কোথাও যুদ্ধ-বিগ্রহ নেই, অশান্তি নেই, বিদ্রোহের সম্ভাবনাও নেই। সুস্থ, নীরোগ দেহে হঠাৎ আপনার মৃত্যুই বা হ'তে যাবে কেন?"

"না, না, তুমি জান না ভাই, এ জ্যোতিষী কত বড় পণ্ডিত। আজ পর্য্যন্ত বহু বার আমি এঁর গণনা লক্ষ্য ক'রে এসেছি, কখনও একচুল এদিক্-ওদিক্ দেখতে পাই নি। এঁর কখনোই ভুল হ'তে পারে না। আমি দৈব বিশ্বাস করি, বীরবল!"

বীরবল আর সম্রাট্কে ঘাঁটালেন না। শুধু বললেন, "আচ্ছা, আমাকে একবার জ্যোতিষীর নাম আর ঠিকানাটা দিন। আমি তাঁকে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।"

"তা দিচ্ছি, কিন্তু কোন দরকার ছিল না তার। এ ব্যাপারের যে কোন প্রতিকার নেই এ কথাও আমি জ্যোতিষীর কাছ থেকে ভাল ক'রে জেনে নিয়েছি।"

"তবু একবার দেখা যাক্।" বীরবল চিন্তিত মুখে বেরিয়ে এলেন।

বীরবল সটান গিয়ে হাজির হ'লেন জ্যোতিষীর বাড়ী। জ্যোতিষী এক-রাশ পুঁথিপত্রের আড়ালে বসেছিলেন, মাঝে মধ্যে খড়ি পেতে মেঝেতেও কি লিখছিলেন। বীরবলের মত রাজসভার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিজের বাড়ীতে দেখে তিনি একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন—কি ক'রে তাঁর যথাযোগ্য সমাদর করবেন।

বীরবল বাধা দিয়ে বললেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি শুধু আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। শুনলাম, আপনি বাদশাহের কোষ্ঠি গণনা ক'রে জানতে পেরেছেন আগামী সোমবারই তাঁর মৃত্যুদিন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ আপনি ঠিকই শুনেছেন।"

"আপনার কি ধারণা এ গণনায় কোন ভুল হ'তে পারে না?"

"আজ্ঞে না। এত বড় একটা কথা, বিশেষ ক'রে স্বয়ং দিল্লীশ্বরের সম্পর্কে, আমি ভাল ক'রে—নিঃসন্দেহ না হয়ে কি বলতে পারি? আমি বার বার গণনা ক'রে বুঝেছি এ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত।"

বীরবল খানিকক্ষণ মাথা নীচু ক'রে কি ভাবলেন, তার পর বললেন, "দেখুন, আমি নিজে জ্যোতিষ-শাস্ত্র ভাল না জানলেও, লক্ষণগুলি বলে দিলে অনেকটা বুঝতে পারি। কি কি লক্ষণ দেখে আপনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন তা জানাবেন কি? বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা কেমন গুরুতর!"

জ্যোতিষী কি বলতে যাচ্ছিলেন, বীরবল বাধা দিয়ে বললেন, "আচ্ছা থাক্,

এখন নয়। আজ সন্ধ্যাবেলা আপনি বরঞ্চ একবার বাদশাহের দরবারে আসুন। সেখানে আরও কয়েকজন জ্যোতিষী উপস্থিত থাকবেন। আপনি তাঁদের সামনে লক্ষণগুলি জানিয়ে ভাল ক'রে বিচার ক'রে দেখবেন। আচ্ছা, আমি তবে আসি। মনে থাকে যেন, আজই সন্ধ্যায়, দরবারে। আমি বরঞ্চ পাল্কী পাঠিয়ে দেব।"

সন্ধ্যায় দরবার-সভা বস্ল। পাত্রমিত্র সবাই হাজির। বাদশাহ তেমনি ম্লান মুখে বসে আছেন। শুধু বীরবলকে যেন একটু ব্যস্ত—একটু চিন্তিত মনে হচ্ছে।

এমন সময়ে জ্যোতিষী এসে ঢুকলেন। বীরবল তাঁকে সামনে এগিয়ে নিয়ে এলেন। তার পর সভার লোকদের সম্বোধন ক'রে বাদশাহের আয়ু সম্বন্ধে জ্যোতিষীর গণনার কথা প্রকাশ করলেন। বললেন, "এখানে আরও কয়েক জন গুণী লোক আছেন। জ্যোতিষী মশাই যদি দয়া ক'রে উল্লেখ করেন কি কি লক্ষণ দেখে তিনি সম্রাটের আয়ু সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন তা হ'লে সবাই মিলে আর একবার বিচার ক'রে সিদ্ধান্তটা নির্ভুল কিনা ঠিক করা যেতে পারে।"

জ্যোতিষী তখন খড়ি পেতে গণনার বিভিন্ন লক্ষণ বুঝিয়ে দিলেন, বললেন, "বাস্তবিক, নিঃসন্দেহ না হ'লে এত বড় একটা কথা বল্বার সাহস আমার কখনই হ'ত না।"

সভা নিস্তব্ধ, একটা সূচ পড়লেও বোধ হয় তার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। আকবরের দিকে তাকালে মনে হবে তাঁর চোখের দীপ্তি যেন নিভে গেছে।

ঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলেন বীরবলই। বললেন, "আচ্ছা, জ্যোতিষী মশাই, আপনি যখন এই শাস্ত্র এত চর্চ্চা করেন এবং বিশ্বাস করেন তখন আপনার নিজের আয়ু সম্বন্ধেও আপনি নিশ্চয়ই গণনা ক'রে দেখেছেন?"

"আজ্ঞে হাঁা, তা করেছি বই কি!"

"তাতেও কি আপনি এমনি নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্তে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কত দিন সে আয়ু জানতে পারি কি?"

জ্যোতিষী একটু সলজ্জ ভাবে বললেন, "তা, একটু দীর্ঘায়ুই বলা যেতে পারে। আমার জীবনের ৭৫ বছর পূর্ণ হয়ে প্রথম যে শুক্লা-৫মী আসবে, সেই দিন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে আমার আয়ু নিঃশেষ হবে এবং আমি দেহত্যাগ করব।"

"এখন আপনার বয়স কত?"

"গত সপ্তাহে আমার বয়স সবে পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছে।"

"তা হ'লে আরও পঁচিশ বছর আপনি বাঁচবেন—আপনার গণনায় এই রকম জানা গেছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই।"

জ্যোতিষীর মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তে শূন্যে যেন একটা বিদ্যুতের ঝলক খেলে গেল। বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে সভাশুদ্ধ লোক কম্পিত বক্ষে লক্ষ্য কর্‌ল জ্যোতিষীর ছিন্ন মুণ্ড সভার মাঝখানে পড়ে আছে। তাজা রক্তে সমস্ত ঘর ভরে গেছে। আর বীরবল পাশে দাঁড়িয়ে, তাঁর হাতে রক্ত-মাখা খোলা তরোয়াল।

বীরবলই আবার ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। বাদশা'কে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "জাঁহাপনা, পবিত্র দরবার-গৃহে হঠাৎ এ রকম রক্তপাতের জন্য আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু শাহান্‌শা বাদশা'র জীবনের তুলনায় এই তুচ্ছ জ্যোতিষীর জীবনের মূল্য অনেক কম, তাই আমাকে এই অপ্রিয় কাজটি করতে হয়েছে। আপনি এই মাত্র শুনলেন, জ্যোতিষী নিজ মুখে স্বীকার করল যে, সে গণনা ক'রে নিঃসন্দেহ হয়েছিল আরও ২৫ বছর সে বাঁচবে। সে গণনা যে কত অসার তাই প্রমাণ করার জন্য আমাকে এই লোকটিকে হত্যা করতে হ'ল। যে লোক গণনা ক'রে এই সামান্য তথ্যটা বার করতে পারে নি যে তার কপালে আজকের এই সভায় অপাঘাত মৃত্যু লেখা আছে, স্বয়ং শাহান্‌শা বাদশা'র আয়ু নিয়ে ঐ রকম গণনা করার স্পর্দ্ধা তার কি ক'রে হয় আমি ভেবে অবাক্ হচ্ছি। জাঁহাপনা, আপনি নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছেন যে এই জ্যোতিষীর গণনার এমন কোনই মূল্য নেই যার কথা ভেবে ভেবে আপনি শরীর ও মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আগামী সোমবার কেন—তার পরেও বহু বহু বছর পর্য্যন্ত মৃত্যু আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।"

বীরবলের ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হয় নি। বাদশাহ্ আকবর এর পরে আরও বহু বৎসর বেঁচে বহাল তবিয়তে রাজত্ব করে গিয়েছিলেন। *

* বীরবল সম্বন্ধে একটি গল্প অবলম্বনে

তোমাদের স্মরণ করি

বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের ঋষি
বঙ্কিমচন্দ্র

স্বদেশী সঙ্গীতের অমর কবি
দ্বিজেন্দ্রলাল

মাতৃদরদী ঔপন্যাসিক
শরৎচন্দ্র

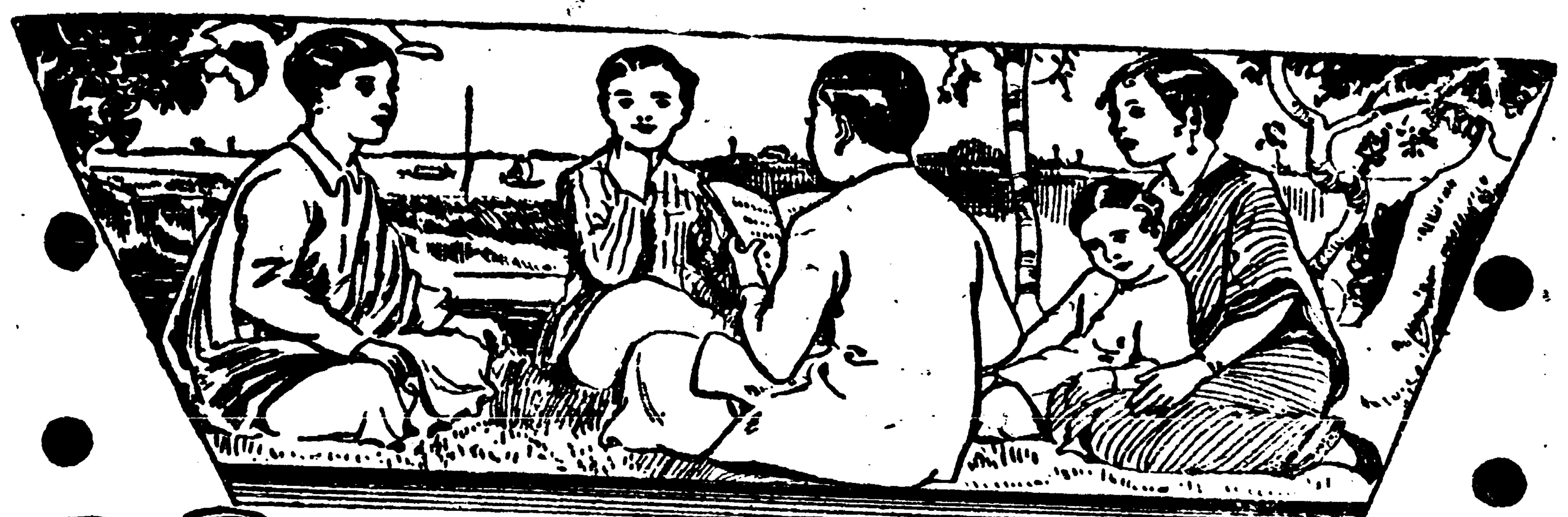

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গান্ধীজীর ভারত

কুমারী দীপালী সেনগুপ্তা

আমার ধ্যানের ভারতবর্ষ!
সেথায় রবে না জাতি-ভেদাভেদ,
রবে না হিংসা, দুঃখ ও খেদ,
উচ্চ-নীচের ভুলিয়া প্রভেদ
লভিবে জ্ঞানের আলোক-স্পর্শ।
আমার ধ্যানের ভারতবর্ষ!

সেথায় জাগিবে ভারতের নারী
হস্তে স্নিগ্ধ কল্যাণ-বারি,
সীতা, সাবিত্রী, খনা, মৈত্রেয়ী
হবে যাহাদের জীবনাদর্শ।
আমার ধ্যানের ভারতবর্ষ!

সকলে সেথায় সকলের সাথী,
'ক্ষুদ্র' 'মহৎ' নহে কোন জাতি,
'ভারতবর্ষ—এ আমারি দেশ'
মিলিত কণ্ঠে উঠিবে হর্ষ।
আমার ধ্যানের ভারতবর্ষ!

খোকন সোনা

শ্রীবিজলী সরকার

খোকন আমার, সোনা আমার,
যাদু আমার, ওরে মাণিক,
আয়রে সোনা, আয়রে বুকে
নয়ন ভ'রে দেখি খানিক।

এমন ক'রে সুধায় ভ'রে
পাঠিয়ে দেছে তোরে কে বা?
মাখিয়ে দেছে মুখে যাদু,
বুকে নেবে দেখবে যে বা।

আপন মনে ঘরের কোণে
কতই যে তুই খেলা করিস্!
কোন্ যাদুকর শিখিয়ে দেছে
সেইটা কি তুই বল্‌তে পারিস্?

হাসিস্ যখন ফুলের মতন
কতই মধুর লাগে ওরে,
এমন ক'রে বশ করতে
কে শেখালো বল তো তোরে?

ঝড়ের দিনে

শ্রীতরুণকুমার সান্যাল

সজল মেঘে আঁধার হ'ল ধরা,
ঝড়ের কাঁপন লাগ্‌ল বাঁশের বনে;
মেঘে মেঘে মাদল বেজে ওঠে,
চমক্ দিল তড়িৎ গগন-কোণে।
বাদ্‌লা রাণীর বাজল ঘুঙুর, সাথে
স্থরু হ'ল ঝিম্‌ঝিমানি গান।
দরজা বেয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে
নিবিয়ে দিল প্রদীপখানির প্রাণ।

আঁধার রাণী অমনি ছুটে এল,
ফেল্‌লে ঢেকে আমার চারিধার,
বাইরে শুধু পৃথ্বী কাঁপে ঝড়ে,
তাহার সাথে ঝর্‌ছে বারিধার।

ঝড়ের সাথে তাল মিলিয়ে মন
ছুটল বেগে অনেক দূরে—দূরে,
কতই জানা অজানা সব কথা
ভীড় জমাল আমার মনের পুরে।

"এমনি দিনে ভাঙ্গা কুটীর মাঝে
কাঁপছে ভয়ে দুঃখী নরনারী,
অন্যদিকে জীবন কাটায় স্থখে,
ধনীরা সব,—যাদের দালান বাড়ী।"

"এমনি সময়, পাহাড়-চেরা পথে,
তুষার-ঝঞ্ঝা ছুটছে অনুক্ষণ;
দুঃসাহসী জমায় সেথা পাড়ি,
পথের পানে ছুটছে তাহার মন।"

কতই কথা, কতই ব্যথা মোর
পড়ছে মনে এমনি ঝড়ের দিনে,
একটু পরে মিল পাওয়া তার ভার,
খুঁজতে নারি আবার তাদের চিনে।

দুপুর

শ্রীদেবকুমার বসু

তোমরা কি কেউ দুপুর দেখেছ?

দেখি নি আবার! রোদে ঝাঁঝাঁ-করা নীরব নিস্তব্ধ দুপুর—সে তো রোজই চোখে পড়ে। গা পুড়িয়ে-দেওয়া রোদ্দুর, অজস্র ঘাম, আর ঠাণ্ডা শান্ত অন্ধকার ঘরে ঘুমোবার আহ্বান নিয়ে সে তো রোজই আসে। দুষ্টু ছেলের মত ইস্কুল-পালানো মন তার নেই। শান্ত স্থবোধ ছেলের মত সে ঠিক সময়ে এসে হাজিরা দেয়।

কিন্তু তাকে কি কেউ ভালবেসেছ?

ও কথা তো ভেবে দেখি নি। চিরকেলে সঙ্গী সে, রোজ তার সঙ্গে দেখা হয়, তাই তাকে ভাল লাগে কিনা কোনো দিন ভাবিও নি।

আমাদের মীনা কিন্তু তাকে ভালবেসেছে। দুপুরকে ওর ভাল লেগেছে—তাই সে ভালবেসেছে। ছোট্ট মীনা পৃথিবীর নতুন আগন্তুক। বেচারা ভাল-মন্দ বুঝি কিছু জানে না, তাই না দুপুর ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছে!

তোমরা মীনাকে চেন কি?

চেন না। চিনবে কোথা থেকে? তোমরা হয়তো ওর জানলার নীচে দিয়ে কত বার যাওয়া-আসা করেছ। যদি মুখ তুলে খোলা খড়খড়ির দিকে চাইতে তা হ'লে ওর শাদা ছোট্ট মুখ, কালো কালো শান্ত চোখ হয়তো চোখে পড়ত। তোমরাও ওকে চেনো না, সেও তোমাদের চেনে না। তুমি যদি গিয়ে বল, আমি ওই রাস্তার পথিক, তা হ'লে ও তোমাকে চিনবে। কিন্তু গিয়ে যদি বল আমার অমুক নাম, আমার ছুঁচলো নাকের ওপর কালো ফ্রেমের চশমা আছে, আর আছে চিবুকের কাছে কাটার দাগ তা হ'লে ও তোমাকে চিনবে না।

রোজই দুপুরে মীনা বসে থাকে রাস্তার ধারের জানলাটার খড়খড়ি তুলে। কী-ই বা করে বেচারী সারা দুপুরটা! বাবা বেরিয়ে যান অফিসে—দাদা যায় ইস্কুলে, আর মা পড়েন ঘুমিয়ে। সারা বাড়াটা নিঝ্‌ঝুম হয়ে পড়ে। কাঁহাতক আর এ-ঘর ও-ঘর ক'রে ঘুর-ঘুর ক'রে বেড়ান যায়? আর ঘর তো মোটে দু'টো! তেমন খেলনাপাতিও নেই যে বসে খেলবে! মাগো, কেবল কাঠের ঘোড়া, আর হাত-ভাঙা পুতুল আর কতকগুলো হাঁড়ি-কড়া। ওই নিয়ে আর কদ্দিন খেলা যায়! জ্ঞান হওয়া অবধি তো দেখছে ওই কাঠের ঘোড়াটাকে। ঠুকে ঠুকে রঙ সব উঠে গেছে। ঘুমও, ছাই, আসে না। তাই খানিক ঘুর ঘুর ক'রে, এটা ওটা নেড়ে-চেড়ে শেষে তাকে রোজ ওই জানলার পাশে এসে বসতে হয়।

যেখানে গিয়ে রাস্তাটা বাঁক ঘুরে ট্রাম-রাস্তার উপরে পড়েছে সেই অবধিই দেখা যায়। এই দিকেই চেয়ে মীনা বসে থাকে, খড়খড়ির চৌকো চৌকো ফাঁকে মুখ রেখে আর

সাসির কপাটটাতে আলসে ভাবে ঠেশান দিয়ে। নিস্তব্ধ দুপুরে ট্রামের ঘড়ঘড়ানি এখান থেকে শোনা যায়। তার একটানা শব্দটা আস্তে থেকে জোর হয়—আবার জোর থেকে আস্তে হয়ে কোন্ দূরে যেন মিলিয়ে যায়। তার মনটাও যেন ওই শব্দর পেছনে পেছনে ধাওয়া ক'রে চলে দূর থেকে দূরান্তরে। ইচ্ছে করে ঐ ট্রামে চড়ে কত দূর ঘুরে আসি। দুপুরের রাস্তাটা ভারী নির্জ্জন। রোদ্দুর রাস্তা থেকে আর ওপারের টিনের চালার থেকে ঠিকরে এসে চোখে লাগে। চকচকে রাস্তা, মাঝখানটা কালো। একটা ভারী লরী গম্ভীর চালে চলে গেল। বাড়ীটা একটু কেঁপে উঠল আর তার চাকার দাগ পড়ে গেল। রাস্তার ওপর সেই দাগ—কোথাও স্পষ্ট কোথাও বা অস্পষ্ট।

পাশের বড় বাড়ীটার ছায়া তির্য্যক ভাবে ফুটপাথ আর অর্দ্ধেক রাস্তা জুড়ে এসে পড়েছে। তার সেই ছায়ায় বুড়ো মুচিটা তার জিনিষপত্তর ছড়িয়ে বসেছে। রোজ দুপুরে এসে সে বসে। তার মুখে ছোট ছোট খোঁচা খোঁচা শাদা দাড়ী, মাথাটা প্রায় নেড়া, ছুঁচলো মুখের গড়ন, চোয়ালের হাড় দু'টো উঠেছে ঠেলে আর চোখ দু'টো গেছে বসে। পরনে একটা ময়লা ফতুয়া আর ছোট্ট কাপড়। মীনা চেয়ে চেয়ে দেখে তার কাজ। বড় কাজ বুঝি তার হাতে আসে না। লোকে যত সব পুরোনো ধ্যাড়ধেড়ে জুতোগুলো এনে তার কাছে হাজির করে। কার চটির স্ট্র্যাপটা গেছে ছিঁড়ে, দু'টো পেরেক মেরে দিতে হবে; কার জুতোর সামনেটা হাঁ হয়ে গেছে, সেখানটা একটু সেলাই করতে হবে—বড় জোর একটা হাফ্‌সোল দিতে হবে। সমস্ত দিন কেবল সে তার তিন-ডাঁটিওলা লোহার 'যন্তর'টার ওপর জুতো রাখছে আর পেরেক মারছে।

একটা দমকা হাওয়া উঠলো। ছোট্ট ছোট্ট কাগজের কুচিগুলো গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটু ওপরে উঠে সামনে ভেসে গিয়ে আবার পড়ে যায়। বড় বড় কাগজগুলো সর সর করে সামনে এগিয়ে যায়। সেই হাওয়া অবাধ্য হয়ে খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে তার চুলগুলো নাড়িয়ে দেয়। লাল ফ্রকটাও একটু ওড়ে। কপালে আর গলায় ঘাম জমে উঠেছে, তাই দুপুরের গরম হাওয়ায় কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে। বাড়ীতে বাড়ীতে দরজা-জানলা বন্ধ। ওপাশের দোকানগুলোরও দরজা বন্ধ। শুধু খোলা আছে মোড়ের পানের দোকানটা; তার সামনে পুরু চট টাঙানো। আর আধ-খোলা আছে মায়া কেবিন। ওরা দরজা দু'টো সব বন্ধ ক'রে মাঝখানটাতে একটু ফাঁক ক'রে রেখেছে। ওটুকু ফাঁক যেন নীরবে খদ্দেরদের ডাকবার জন্যে। মীনার হাসি পায় এই দুপুর রোদে চা খাওয়ার কথা ভেবে।

রাস্তার ও পাশটা রোদ্দুরে পুড়ে যাচ্ছে, আর এ পাশটায় ছোট বড়, সরু মোটা, বেঁটে লম্বা সার সার ছায়া আর তার ফাঁকে ফাকে রোদ্দুরের ফালি। ওগুলোকে দেখলেও মীনার কেমন একটা মজা লাগে।

আসলে এই দুপুরটাই ভারী ভাল লাগে মীনার। কেমন একটা ক্লান্ত, উদাস করা পরিবেশ। পরিশ্রম-শেষের যে ক্লান্তি এ ক্লান্তি সে রকম নয়—এ ক্লান্তি ভাল লাগে। দুপুরের নিস্তব্ধতাও

যেন অদ্ভুত। গভীর কালো রাত্তিরের মত থমথমে ভয়-পাওয়া নিস্তব্ধতা এ নয়। অবশ্য এত সব কথা ছোট্ট মীনা ভাবতে পারে না, এত বিচিত্র রকম অনুভূতির খবরও সে রাখে না। তবে সে এইটুকু জানে যে সব কিছু মিলিয়ে এই দুপুরটা ভাল লাগে। আরও ভাল লাগে কেননা মনে হয় যেন দুপুরটা তার ভারী নিজস্ব। এটার ওপর আর কারুর ভাগ নেই। দাদা যেমন ভালবাসে তার ফাউন্টেন পেনটাকে, পেছনের বাড়ির ডলি যেমন ভালবাসে তার বড় সেলুলয়েডের পুতুলটাকে, তারও অমনি ভালবাসা আছে দুপুরটার ওপর। দাদা, মা, বাবা কেউ এর খবর রাখে না। ওর যত সঙ্গী-সাথীরা, তারাও বড় কেউ জানে না এই দুপুরটার কথা। দুপুরটার যত ভাব যেন কেবল তারই সঙ্গে।

কিন্তু এবার আর দুপুর নয়। দুপুর এবার বিকেলে গড়িয়ে চলেছে। আসল দুপুর ভারী ছোট্ট—সে কথা মীনা জানে। ওই বড় বাড়ীটার ছায়া যখন বেঁকতে বেঁকতে গ্যাসপোষ্টটাকেও গিলে ফেলে আর ছড়িয়ে পড়ে ওপারের ফুটপাথ অবধি, তখনই, মীনা জানে, দুপুর আর নেই—তাতে বিকেলের আমেজ লেগে গেছে। রোদ্দুরের রঙ বদলাচ্ছে, লোক চলাচল আরম্ভ হচ্ছে। এবার দোকানগুলো আস্তে আস্তে খুলবে, চায়ের দোকানে একটি দু'টি ক'রে লোক আসর জমাবে। হল্লা করতে করতে ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে ফিরবে আর একটু পরে। মা উঠবেন, দাদা ফিরবে, বাড়ী বাড়ী জানলা-দরজা খুলে যাবে। দুপুরের পর বিকেল—বাবুরা আসবেন অফিস থেকে, ছেলেমেয়েরা সেজেগুজে বার হবে। কলরব-মুখরিত এই রাস্তাই যে উদাস, বিষণ্ণ ভাবে মরার মত সারা দুপুর শুয়ে কাটিয়েছে কে তা বিশ্বাস করবে?

যারা সারাদিন আফিসে বসে কলম পেষে, কি ইস্কুল কলেজে বসে শুকনো বই গেলে, কি বাড়ীতে শুয়ে শুয়ে ঘুমোয়, তারা কি জানে মীনার এই সুন্দর দুপুরের কথা? কিন্তু মীনাই বা ক'দিন এ দুপুরকে পাবে? সে-ও তো পরের বছর ইস্কুলে ভর্ত্তি হবে। বাবা বলে রেখেছেন, দুপুরে এ রকম না ঘুমিয়ে ঘুরে বেড়ান খারাপ, তার চেয়ে দুপুরটা ইস্কুলে বন্ধ হয়ে থাকা ভাল। তাই সে ভর্ত্তি হবে ক্লাস্ টুতে।

বীর হাম্বীর

মুসলমান আমলে যে সব হিন্দু নৃপতি বীরত্বের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁদের কারো কারো নাম তোমরা জান, কিন্তু সকলের কথা হয়তো জান না। এই রকম একজন বীর ছিলেন হাম্বীর—বিষ্ণুপুরের রাজা। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এটি একটি ঐতিহাসিক জায়গা—প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের রাজধানী। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন আদিমল্ল রঘুনাথ। তাঁর থেকেই তাঁর বংশের নাম হয় মল্লবংশ। হাম্বীর ছিলেন এই মল্লবংশেরই একজন রাজা।

তখন বার ভুঁইয়া বাংলায় প্রবল হয়ে উঠছে। মোগলদের সঙ্গে পাঠানদেরও বিরোধ চলছে। বিদ্রোহীদের বশে আনবার জন্য দিল্লী থেকে মানসিংহকে পাঠান হয়েছে। হাম্বীর হচ্ছেন সেই সময়কার লোক।

কথিত আছে, হাম্বীর প্রথমে পাঠান নায়ক কতলু খাঁর দলে ছিলেন, পরে একবার মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহকে রক্ষা ক'রে পাঠানদের বিরাগ-ভাজন হ'ন। পাঠানরা তখন তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে। হাম্বীর মোগলদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তাদের দমন করেন।

বাংলার নবাব সুলেমান কর্‌রাণীর পুত্র দায়ুদ খাঁও একবার হাম্বীরের রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু হাম্বীর এত বীরত্বের সঙ্গে তাঁকে বাধা দেন যে বহু সৈন্য হারিয়ে শেষ পর্য্যন্ত দায়ুদ খাঁকে পরাজিত অবস্থায় সরে পড়তে হয়। এই যুদ্ধে নাকি নবাবের সৈন্য এত নিহত হয়েছিল যে তাদের ছিন্নমুণ্ড জমে স্তূপাকার হয়ে গিয়েছিল। যেখানটায় ঐ ঘটনা ঘটে আজও সেখানটা মুণ্ডমালা-ঘাট নামে পরিচিত হয়ে আছে।

হাম্বীর শুধু শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীই গড়ে তোলেন নি, সুদৃঢ় দুর্গ তৈরী ক'রে রাজধানীকে যথাসাধ্য সুরক্ষিত করেছিলেন। সে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজও বিষ্ণুপুরে দেখতে পাওয়া যায়।

হাম্বীর পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং পরম ভক্ত রূপে পরিচিত হ'ন। তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে একটা ভারী সুন্দর গল্প আছে। একবার আচার্য্য শ্রীনিবাস ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী বৃন্দাবন থেকে কতকগুলি মূল্যবান্ বৈষ্ণব গ্রন্থ নিয়ে আসছিলেন। পুঁথিগুলি একটি সুন্দর পেটিকার মধ্যে পূরে গরুর গাড়ীতে ক'রে তাঁরা চলেছিলেন বিষ্ণুপুরের ভিতর দিয়ে গৌড়ের দিকে। এখন, হাম্বীরের এক জ্যোতিষী গুণে বললেন, ঐ পেটিকার মধ্যে বহু মূল্যবান্ ধনরত্ন রয়েছে। শুনে হাম্বীরের লোকেরা সেগুলো লুঠ করে নিয়ে এল। শ্রীনিবাস এই উৎপাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার জন্য হাম্বীরের রাজসভায় গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে তাঁর সৌম্য মূর্ত্তি, অপূর্ব্ব ভগবদ্‌ভক্তি এবং অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে হাম্বীর এত মুগ্ধ হলেন যে তিনি শুধু পুঁথিগুলো ফেরৎ দেবারই ব্যবস্থা করলেন না, আচার্য্যের শিষ্যত্বও গ্রহণ করলেন। সেই থেকে বীর হাম্বীর হলেন পরমভক্ত বৈষ্ণব। তাঁর নতুন নাম হ'ল চৈতন্যদাস।

চৈতন্যদাস কয়েকটি বৈষ্ণব পদাবলীও রচনা ক'রে গেছেন।

তুমি কি জান

নীচের কথাগুলি আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি কিন্তু ওগুলির আসল অর্থ হয়তো সকলের জানা নেই। এগুলি জেনে রাখা ভাল।

উপনিষদ্—হিন্দুদের প্রাচীন শাস্ত্র। এর নামকরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের মত বিভিন্ন। একদল বলেন, এই বিদ্যার কাছে 'উপ' অর্থাৎ উপস্থিত হয়ে 'নি'—নিশ্চয়তার সঙ্গে তা অনুশীলন করলে অবিদ্যা প্রভৃতি বিনষ্ট হয় (সদ্), তাই এর নাম 'উপনিষদ্'। আবার আর একদল বলেন, পুরাকালে শিষ্যেরা গুরুর কাছে গিয়ে (উপ) ছোট ছোট বৈঠকে বসে (নি-সদ্) আলোচনা করতেন। ঐ সব বৈঠকের নাম ছিল উপনিষদ্। সেই থেকে পরে ঐ সব বৈঠকে বসে যে শাস্ত্রের আলোচনা হ'ত তারও নাম হয় উপনিষদ্।

তরাই—হিমালয়ের নীচে জলা-জঙ্গলময় বনভূমি। কথাটার আসল মানে ভিজে জায়গা। জায়গাটা স্যাঁৎসেঁতে এবং নানা রকম বৃক্ষসম্পদে ও বন্য

জন্তুতে ভরা। আজকাল অবশ্যি এর অনেক জায়গা পরিষ্কার ক'রে লোকে বসবাস সুরু করেছে।

প্রয়াগ—বর্ত্তমান এলাহাবাদ। গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী এই তিনটি পবিত্র নদী এখানে একত্র মিলিত হওয়ায় হিন্দুদের কাছে এটি একটি পরম তীর্থ। প্রয়াগ কথাটার আসল অর্থ—যেখানে প্রকৃষ্ট রূপে অর্থাৎ ভাল ক'রে যাগ অর্থাৎ যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়। অনেকের মতে মহাভারতে উল্লিখিত বারণাবত নগরও এখানেই ছিল।

তোমার সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা কর

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা কর; না পারলে শেষ পৃষ্ঠা দেখ।

১। কোন্‌টা ঠিক?—

(ক) কর্ব্বুর মানে (১) সমুদ্র (২) রাক্ষস (৩) বন (৪) ফুল।

(খ) চর্ম্মচটিকা মানে (১) চামড়ার জুতো (২) চর্ম্মকার (৩) চামচিকে (৪) চটের থলি।

(গ) বিম্ব মানে (১) তেলাকুচা (২) গাছের পাতা (৩) সুন্দর (৪) ঠোঁট।

(ঘ) শাখামৃগ মানে (১) এক জাতের হরিণ (২) একরকম ফুল (৩) হরিণের শিং (৪) বানর।

২। নীচের শব্দগুলির কোন্‌টা বলতে কি বোঝায়?

(ক) কিরঘিজ (খ) খরোষ্ঠী (গ) শ্যামদেশের যমজ (ঘ) ইরিডিয়াম্ (ঙ) ডোডো (চ) আই. এ. এস্ (ছ) রডোডেনড্রন্।

৩। নীচের কবিতাগুলির কোন্‌টি কার লেখা?

(ক) "বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়, সে কি গো বিস্ময়!"

(খ) "রাজেন্দ্র সঙ্গমে, দীন যথা যায় দূর তীর্থ পর্য্যটনে।"

(গ) "সমুদ্রের পার আছে, তল আছে তার, অপার—অতল মাতৃস্নেহ পারাবার।"

(ঘ) "ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, ওটি লজ্জাবতী লতা।"

(ঙ) "জোয়ান মাঝি ধর্ রে দাঁড়, কর্ রে তরী তুফান পার।"

(চ) "চৌদ্দ দিন জ্বরে ভুগে উদ্ধব পোদ্দার, কলাসিদ্ধ ভাত খেয়ে তুলিছে উদ্গার।"

(ছ) মেঘায় মেঘায় সূর্য্য ডোবে—আকাশ লালে লাল,
ঢাকল মেঘের খুঞ্চেপোষে তাল পাটালির থাল।"

৪। এঁদের কে কোন্ দেশের বা প্রদেশের লোক?—

(ক) আইন্‌ষ্টাইন্ (খ) ভিক্টর হুগো (গ) পার্ল বাক্ (ঘ) ম্যাক্সিম গোর্কি (ঙ) কার্ল্ মার্ক্স্ (চ) বালগঙ্গাধর তিলক (ছ) পট্টভি সীতারামিয়া।

৫। (ক) রাজা না হয়েও 'প্রিন্স' নামে পরিচিত ছিলেন কোন্ বাঙ্গালী? (খ) স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম জীবনে কি নাম ছিল? (গ) কোন্ মারাঠী লেখক বাংলা সাহিত্যিক হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন? (ঘ) রবীন্দ্রনাথের পত্নীর নাম কি ছিল? (ঙ) রবীন্দ্রনাথ ও রামন্ ছাড়া আর কোন্ এশিয়াবাসী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন?

কেন?

কাকের ডাক কর্কশ কিন্তু কোকিলের স্বর মিষ্টি কেন?

এ বিষয়ে বিশদভাবে কোন গবেষণা না হ'লেও প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এর কিছু কিছু কারণ বার করেছেন। তাঁরা বলেন, পাখীর গলার মধ্যে একটা ঝিল্লীর পর্দ্দা আছে। ফুস্‌ফুস্ থেকে বাতাস এসে যখন ঐ ঝিল্লীকে কাঁপায় তখনই গলা দিয়ে শব্দ বেরুতে থাকে। ঐ পর্দ্দার সঙ্গে আবার অনেকগুলি ছোট ছোট পেশী যোড়া; কিন্তু সব পাখীর পেশী এক রকম নয়। কোন পেশীর জন্য শব্দ মিষ্টি হয়, সেটির অভাবে স্বর কর্কশ হয়ে পড়ে। কাকের গলায় ঐ পেশী নেই, কিন্তু কোকিলের আছে।

এ ছাড়া গলার দৈর্ঘ্য এবং মুখের গহ্বরের গড়নও স্বর কর্কশ বা মিষ্টি হওয়ার জন্য খানিকটা দায়ী। কাকের গলা লম্বা, এবং তার মুখগহ্বরেও তেমন কোন বায়ু-কুঠরী (এয়ার-চেম্বার) নেই। কিন্তু কোকিলের গলার দৈর্ঘ্য সেই তুলনায় অনেক কম, এবং বায়ুকুঠরীও কাকের চেয়ে সুগঠিত। দু'জনের স্বরের বিভিন্নতার এও একটা কারণ।

ইংরেজী সাত বারের নাম কি ক'রে হ'ল?

সপ্তাহের সাত বারের ইংরেজী নাম যথাক্রমে সান্‌ডে, মন্‌ডে, টিউস্‌ডে, ওয়েড্‌নস্‌ডে, থার্স্‌ডে, ফ্রাইডে এবং স্যাটার্‌ডে। এদের মধ্যে সানডে, মন্‌ডে ও স্যাটার্‌ডের নাম সূর্য্য (সান্), চন্দ্র (মুন্) ও শনির (স্যাটার্ণ) নাম থেকে হয়েছে। বাকি চারটি বারের নাম এসেছে প্রাচীন স্যাক্‌শন্ জাতির মধ্যে প্রচলিত চারটি গ্রহ বা দেবতার নাম থেকে। টিউস্‌ডে হয়েছে টিউথ্ (মঙ্গল) থেকে, ওয়েড্‌নস্‌ডে

হয়েছে ওডেন্ (বুধ) থেকে, থার্স্‌ডে-হয়েছে থর (জুপিটার বা বৃহস্পতি) থেকে এবং ফ্রাইডে হয়েছে ফ্রিগা (ভিনাস্ বা শুক্র) থেকে।

যে বই তোমরা পড়তে পার

নীচে কয়েকখানা ভাল বইএর,—যা তোমরা পড়তে পার, নাম দেওয়া হ'ল। সুবিধা পেলে প'ড়ে দেখ।

গল্প ও উপন্যাস :— কথা সরিৎসাগরের গল্প—কুলদারঞ্জন রায়, চাঁদের পাহাড়—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, দিন-দুপুরে—লীলা মজুমদার, দু' চোখ যেদিকে যায়—ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বিশালগড়ের দুঃশাসন—হেমেন্দ্রকুমার রায়, রাত যখন সাতটা—ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

বিবিধ :— ঘরের ছেলে বাইরে (অনুবাদ)—ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, আমার বাংলা—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, যে জার্ম্মানী হেরে গেছে—অমলশঙ্কর রায়, প্রিয়দর্শী অশোক—ধীরেন্দ্রলাল ধর, বিশ্বপরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মরেও যারা রইল বেঁচে—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

শিশুসাহিত্য-সংবাদ

কিশোর গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড)—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। কমলা বুক ডিপো, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ২৲

বাংলা ভাষায় বড়দের জন্য গ্রন্থাবলী সিরিজের অভাব নেই কিন্তু শিশুসাহিত্যে এ যাবৎ এদিকে বড় কেউ একটা নজর দেন নি। ছোটদের প্রিয় লেখক ধীরেন্দ্রলালের কিশোর গ্রন্থাবলী এদিক্ দিয়ে উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই। আলোচ্য ১ম খণ্ডে তাঁর দু'খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস স্থান পেয়েছে।—'নীল নায়ের মাঝি' এবং 'হে বীর, প্রণাম করি'। শেষোক্তটি রামধনুতে ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল কিন্তু ইতিপূর্ব্বে পুস্তকাকারে বেরোয় নি। কাজেই যাদের এটি রামধনুতে পড়বার সুযোগ হয় নি তাঁদের কাছে নতুন বলেই মনে হবে। দু'খানি উপন্যাসই সুন্দর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। গ্রন্থাবলী হ'লেও ছাপা, কাগজ এবং বাঁধাই মনোরম।

নেতাজীর জয়যাত্রা—শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউ বুক ষ্টল, ৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ছোটদের নাটক। নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের আদর্শে ছোটদের অনুপ্রাণিত করাই লেখকের উদ্দেশ্য, তাই অনেক জায়গায়ই তিনি ইতিহাস ছেড়ে কাল্পনিক ঘটনার

সাহায্য নিয়েছেন। লেখকের ভাষায়—"যাহা ইতিহাসের পুস্তক নহে তাহার মধ্যে কেহ ইতিহাসের সন্ধান করিবেন না।" নাটকটির এক জায়গায় বিভিন্ন প্রদেশবাসী পাত্রপাত্রীর মুখে তাঁদের মাতৃভাষা ব্যবহার ক'রে লেখক বৈচিত্র্যসৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। ছাপা, কাগজ ভালো। মলাটটিও রঙ্গিন এবং বাঁধানো।

খোকাখুকুর পড়া—শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২১৮, মাণিকতলা মেইন্ রোড, কলিকাতা-১১। দাম ॥৴০

'হাসিখুসী', 'খোকার দপ্তর' প্রভৃতি বইএর অনুকরণে লেখা আর একখানি ছড়া-ছবির বই। ছবিগুলি সুন্দর এবং বিভিন্ন পৃষ্ঠা বিভিন্ন রংএ মুদ্রিত হওয়ায় ছোটদের আকৃষ্ট করবে। ছড়া-কবিতাগুলি কিন্তু তেমন হয় নি। অনেকগুলিতেই জায়গায় জায়গায় ছন্দ ও মিলের ত্রুটী সহজেই চোখে পড়ে। 'আজব খাওয়া' কবিতাটির সঙ্গে ৺সুকুমার রায়ের একটি কবিতার বেশ খানিকটা মিল আছে। ছাপা, কাগজ এবং মলাটটি ছোটদের পক্ষে লোভনীয়।

ছেলেবেলার দিনগুলি—শ্রীতারাকান্ত দে, এম্. এ, বি. টি। সাহিত্যায়ণ, ২৩ডি, কুমারটুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৫। দাম ১॥০

রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, মহাত্মাজী, আইনষ্টাইন্, লেনিন ও বার্নার্ড্ শ'র ছেলেবেলার কাহিনী নিয়ে লেখা একখানি সুখপাঠ্য বই। লেখকের গল্প বলার ভঙ্গীটি যেমন সরস, ভাষাও তেমনি মিষ্টি। সস্তা, মন-গড়া উপন্যাসের বদলে এই সব সত্যিকার সরস অথচ শিক্ষাপ্রদ কাহিনী বাংলা শিশুসাহিত্যের সম্পদ্ বাড়াক্ এই আমরা চাই।

ছাপা-কাগজ সুন্দর, ভিতরের ছবিগুলিও সুমুদ্রিত। কিন্তু মলাটের ছবিটি রঙ্গিন এবং আরও চিত্তাকর্ষক হ'লেই শোভন হ'ত—মলাটের পরিকল্পনাটি যখন মন্দ ছিল না। সেই হিসাবে বইএর দামটাও যেন কিছু বেশী হয়েছে।

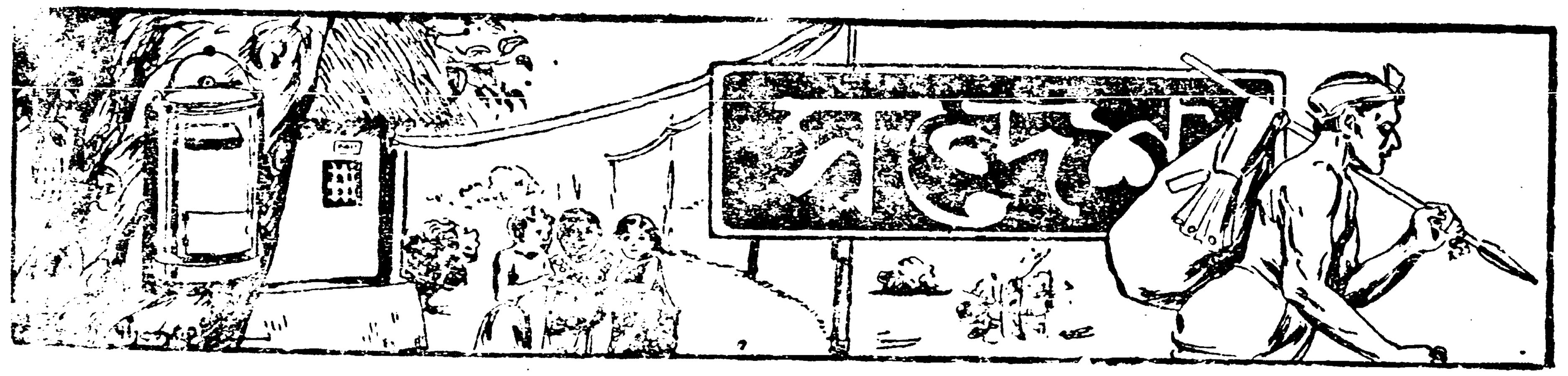

প্লাষ্টিকের তৈরী বিভিন্ন জিনিষের সঙ্গে প্লাষ্টিকের জামাকাপড়ও আজকাল প্রচুর ব্যবহৃত হচ্ছে। হাল্কা ব'লে মেমসাহেবরা এ জামা খুব পছন্দ করেন। তা ছাড়া এর আর একটা গুণ—জলে ভেজে না। ও পাতার ছবিতে দেখ, নিগ্রো সাহেবটি

মেমসাহেবের মাথায় ঝারি ক'রে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু মেমসাহেব হেসেই খুন, জলে তাঁর জামার কিছুই হচ্ছে না!

* * * *

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী লোকে কথা বলে চীনা ভাষায়। তার পর ইংরেজীতে। সমস্ত এশিয়ায় প্রায় ৯০০ রকম ভাষা প্রচলিত আছে।

প্লাষ্টিকের জামা—জলে ভেজে না।

* * *

মুক্তা ঝিণুকের ভিতরে পাওয়া যায় তা বোধ হয় জান। মুক্তাকে মানুষ চিরকালই খুব মূল্যবান্ রত্ন ব'লে মনে ক'রে আসছে। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত সব চেয়ে বড় যে মুক্তা পাওয়া গেছে তার ওজন প্রায় ১০ তোলা। পারস্য-রাজের কাছে একখানি মুক্তা আছে যা অত বড় না হ'লেও সেটাকেই সব চেয়ে দামী ব'লে ধরা হয়।

* * * *

আমাদের দেশের প্রথম খবরের কাগজ হচ্ছে "হিকির বেঙ্গল গেজেট"। হিকি সাহেবএই সংবাদপত্রটি বার করেন ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে। দু'বছর চলে কাগজটি বন্ধ হয়ে যায়।

* * * *

ফটো তোলার ক্যামেরা আবিষ্কার করেছিলেন দু'জন ফরাসী বৈজ্ঞানিক ১৮৩৯ সালে। ফটো তোলার যে কৌশল,—অর্থাৎ আলোর সাহায্যে যে কোন কোন রাসায়নিক পদার্থের পরিবর্ত্তন ঘটানো যায়, তা অবশ্যি এর আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। আধুনিক ক্যামেরায় যে ফিল্ম্ ব্যবহার করা হয় তা আবিষ্কার করেন একজন আমেরিকান—জর্জ্জ ইষ্টম্যান, ১৮৮০ সালে।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

এবারে মাসের গোড়াতেই তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। আশা করি এবারে আর তোমাদের কাছ থেকে তেমন অনুযোগ শুনতে হবে না।

আজ বার বার মনে পড়ছে বাংলা দেশের দুর্ভাগ্যের কথা। ঘটনাচক্রে বাংলা দু' ভাগ হয়ে দু' রাষ্ট্রে চলে গেছে, কিন্তু বাঙ্গালী বাঙ্গালীই আছে, এবং, আমরা জানি, থাকবেও। বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, বাঙ্গালীর ঐতিহ্য, সর্ব্বোপরি বাঙ্গালীর ভাষা দুই বাংলাকে যে দৃঢ় আত্মীয়তার বাঁধনে বেঁধে রেখেছে, মানুষের গড়া কোন কৃত্রিম ব্যবস্থারই সাধ্য নেই তা ছিন্ন করতে পারে। তবু মাঝে মাঝে যখন দেখি এক শ্রেণীর নির্ব্বোধ লোক হঠাৎ একটা গোলমাল পাকিয়ে শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের জীবন অশান্তিময় ক'রে তোলে—সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে সমাজ-ব্যবস্থায় আঘাত হানতে চায় তখন বেদনার আর সীমা থাকে না। তোমরা, ছোটরা, এই বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে দূরে থাকবে এবং পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টা করবে এই কামনা করি। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই রামধনুর অসংখ্য পাঠক, গ্রাহক ও শুভার্থী বন্ধু আছেন। তাঁরা এই ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন তাও আমরা জানি।

গত সংখ্যায় শ্রীসুস্নাত গংগোপাধ্যায় "বিকেলের গান" কবিতাটি সম্বন্ধে যে অনুযোগ করেছিলেন সে সম্বন্ধে ঐ কবিতাটির লেখক শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরীর জবাব আমরা পেয়েছি। তার খানিকটা অংশ তুলে দিলাম :— "বুদ্ধদেব বাবুর 'বিকেল' কবিতাটি আমি পড়েছিলাম এবং আমার খুব ভাল লেগেছিল। ... অনেক দিন পর, কেন জানি না, বিকেল সম্বন্ধে আমারও একটা কবিতা লিখবার বাসনা জাগে—কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখব এটাও ঠিক করেছিলাম মনে মনে। .. এখন দেখছি বুদ্ধদেব বাবুর প্রভাব এড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। আমার কবিতাটি কিরূপ স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয়েছে তা আশা করি সকলেই দেখেছেন। এ থেকেই প্রমাণিত হবে যে ঠিক চেষ্টা করে, এবং অনুকরণ করবার মনোভাব নিয়ে 'বিকেলের গান' অনুকৃত হয় নি বা রচিত নয়, কিন্তু শক্তিমান্ লেখকের প্রভাব তরুণ লেখকদের লেখায় থাকবে এটা বেশী দোষের বলেও মনে হয় না।...যাই হোক, ভবিষ্যতে বুদ্ধদেব বাবুর 'বিকেলে'র মতো

'মারাত্মক' কবিতা সম্বন্ধে সাবধান হওয়া যাবে।" লেখক নিজে যখন ভাল কবিতা লিখতে পারেন তখন গোড়াতেই সাবধান হ'লে ভাল হ'ত। যাই হোক্, এ বিষয়ে আর আলোচনার দরকার আছে বলে আমরা মনে করি না।

শ্রীবেলা সরকারের চিঠির জবাবে ব্যক্তিগত চিঠির জবাব দেওয়া বন্ধ না করার জন্য আমরা গ্রাহক-গ্রাহিকাদের কাছ থেকে অনেকগুলি চিঠি পেয়েছি। শ্রীবিমলভূষণ রায় (কলিকাতা-৯) জানতে চেয়েছেন কি ক'রে হাতের লেখা ভাল করা যায়। উত্তর—চেষ্টা ও সাধনা করলেই করা যেতে পারে। অবশ্য এক দিনে হয় না, এজন্য প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে হাতের লেখা অভ্যাস করতে হবে। অনেক বয়স্ক লোককেও এ ভাবে হাতের লেখার উন্নতি করতে দেখেছি।

এবারে কয়েকটি ব্যক্তিগত চিঠির জবাব দেই। শ্রীশম্ভুনাথ সিংহ (রামগোপালপুর)—সূচীপত্র বছরের শেষে বর্ণানুক্রমিক ভাবে দেওয়া হবে। কবিতা আমিও খুব পছন্দ করি কিন্তু অনেকেই দেখেছি ও রসে একেবারে বঞ্চিত। গ্রাহকদের আঁকা বা তোলা ছবি বৈশাখ থেকে আবার সুরু করা হবে ঠিক হয়েছে—যদি না ইতিমধ্যে কাগজ-সঙ্কট দেখা দেয়। ব্যায়াম সম্বন্ধে পরে আরও বেরুবে। শ্রীঅমলকুমার মিত্র (গৌহাটী)—উদয়সঙ্ঘ থেকে আবৃত্তিতে মেডেল পেয়েছ জেনে সুখী হলাম। শ্রীবেণু ঘোষ (দিনাজপুর)—তোমার ছোট্ট চিঠিগুলি বেশ লাগে। পর পর দু'বারের প্রাইজ পাচ্ছ জেনে আরও খুশী হয়েছি। শ্রীঅশোককুমার চৌধুরী (নবদ্বীপ)—রামধনুর শুভাকাঙ্ক্ষী রূপে তোমার প্রস্তাবগুলি পেয়েছি। এতে রামধনুর প্রতি তোমার গভীর ভালবাসাই সূচিত হচ্ছে। খেলাধূলা, ব্যায়াম ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জানতে হ'লে—'অরূপ, ২৫, বলরাম দে স্ট্রীট, কলিকাতা' এই ঠিকানায় রামধনুর নাম ক'রে চিঠি দিতে পার। এম্. এ, সালেহিন (রাজশাহী)—আসাম থেকে এখনও কোনও গ্রাহক তোমাকে লেখনী-বন্ধু ক'রে চিঠি দেয় নি জেনে দুঃখিত হ'লাম। যদি চাও, কয়েকজনের ঠিকানা রামধনু-অফিস থেকে নিতে পার। শ্রীতরুণ সান্যাল—তোমার দীর্ঘ চিঠির জবাব সংক্ষেপে দেওয়া সম্ভব নয়। তর্ক-বিতর্কের ব্যাপার।—সুবিধা মত পরে এ বিষয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা করব। তোমার শরীর সুস্থ হয়ে উঠুক এই কামনা করি। তোমার পূর্ব্ব-মনোনীত কবিতাটি এ মাসে দেওয়া হ'ল।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মত চিঠি শেষ করি। জয় হিন্দ। ইতি —রাঃ সঃ

নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

বিষয়—'উক্তি সংগ্রহ'। পৃথিবীর বিখ্যাত লোকদের রচনা বা উক্তি দেখে ১০টি বাছাই ক'রে পাঠাতে হবে। কোনটিই যেন ৪০ অক্ষরের বেশী না হয়। যার সংগ্রহ আমাদের মতে সব চেয়ে ভাল হবে তাকে ১ম পুরস্কার ও তার পরের জনকে ২য় পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতা কেবল গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য। গ্রাহক নং সহ পাঠাবার শেষ তারিখ—১০ই চৈত্র, ১৩৫৬।

নবম

খাসা বন্দুক, লক্ষ্মী বন্দুক

নরেন্দ্র বলে, "কলকাতার এক একটা বড় রাস্তা তোমাদের এই বনের ছোট ছোট মাঠের মত চওড়া। সে সব রাস্তা আগাগোড়া পাথর দিয়ে বাঁধানো। আর তার উপর দিয়ে রোজ চলাফেরা করে লক্ষ লক্ষ লোক।"

টুনু রুদ্ধশ্বাসে অস্ফুটস্বরে বলে, "লক্ষ লক্ষ লোক! সে কত, নরেন? আমি হাজার পর্য্যন্ত গুণতে পারি।"

নরেন হেসে বলে, "একশো হাজারে হয় এক লক্ষ। কলকাতায় চল্লিশ লক্ষ লোক আছে। কলকাতার রাস্তায় খালি লক্ষ লক্ষ লোক নয়, তার উপরে তীরের মত ছোটাছুটি করে ট্যাক্সি, বাস্, ট্রাম!"

—"সে আবার কি?"

—"ওগুলো হচ্ছে এক এক রকম গাড়ীর নাম।"

—"আমি একবার ঘোড়ার গাড়ী দেখেছি। ওগুলো কি সেই রকম দেখতে?"

—"না। কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ী আছে, মানুষে-টানা রিক্সা গাড়ী আছে, আবার গরুর গাড়ীও আছে বটে, কিন্তু ট্যাক্সি, বাস্ আর ট্রাম, মানুষ বা জন্তু টানে না। ওগুলো কলের গাড়ী, আপনিই চলে। আর এত জোরে ছোটে যে, প্রতিদিনই দলে দলে লোক তার তলায় প'ড়ে মারা যায়।"

টুনু শিউরে উঠে বলে, "ওগো মাগো, আমি কোনদিন কলকাতায় যাব না। তার চেয়ে আমার এই বনই ভাল।"

"তোমাদের এই বনেও তো মানুষ-খেকো জন্তু আছে?"

"তা' আছে। কিন্তু তারা তো রোজ মানুষ মারে না! আমাদের এই গাঁয়ের কেউ কোনদিন তাদের খপ্পরে প'ড়ে মারা যায় নি।"

তারা এমনি সব গল্প করে, আর ইতিমধ্যে রুণু তাদের কাছটিতে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। প্রথম প্রথম রুণুর খুব হিংসে হয়েছিল। সে ছাড়া টুনুর সঙ্গে আর কেউ যে এত বেশী মেলামেশা করে, এটা তার ভাল লাগে নি। তখন মাঝে মাঝে বোধ হয় তার মনে হ'ত, 'লোকটার পিঠে শুঁড়ের বাড়ি এক ঘা দেব নাকি?' কিন্তু তার পর সে যখন দেখলে, টুনু এই ছেলেটিকে খুব পছন্দ করে আর ভালও বাসে, তখন তার মনের রাগ ধীরে ধীরে মুছে ফেললে, মনে মনেই।

একদিন সকালে এসে টুনু বললে, "হ্যাঁ নরেন, তুমি তো খালি খালি সহরের গল্পই বল। কিন্তু এই বনের ভিতরটা কোনদিন ভাল ক'রে দেখেছ কি?"

নরেন্দ্র বললে, "না।"

—"তাহ'লে চল, আজ আমরা রুণুর সঙ্গে বনের চারদিক্‌টা একবার ঘুরে আসি।"

নরেন্দ্র বললে, "রুণুর সঙ্গে মানে?"

—"রুণু আমাদের পিঠে ক'রে বেড়িয়ে নিয়ে আসবে।"

নরেন্দ্র সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "তোমার রুণু কি আমাকে তার পিঠে চড়তে দেবে?"

—"কেন দেবে না? আমি বললেই দেবে।" এই ব'লে টুনু গেল রুণুর কাছে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে তার শুঁড়ের উপর হাত বুলোতে বুলোতে ডান হাত দিয়ে নরেন্দ্রকে দেখিয়ে বললে, "হ্যাঁ রুণু, আমার সঙ্গে নরেনকেও তোমার পিঠে ক'রে বেড়িয়ে আনবে কি?"

রুণু মুখ ফিরিয়ে নরেন্দ্রের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে। তারপর চার পা মুড়ে মাটির উপরে ব'সে পড়ল। টুনু তার মাথার কাছে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল, এবং নরেন্দ্র উঠে বসল তার পিঠের উপরে। তারপর রুণু আবার উঠে দাঁড়াল এবং হেলে দুলে বনের ভিতর দিকে অগ্রসর হ'ল।

দুই হাতে রুণুর দুই কান চেপে ধরে টুনু বসেছিল দিব্যি জাঁকিয়ে। নরেনেরও হাতীতে চড়ার অভ্যাস আছে, কিন্তু সে হাওদাতে বসে। হাওদা-ছাড়া হাতীর এই তেলা পিঠের উপরে ব'সে ধরবার কোন অবলম্বন না পেয়ে

নরেন্দ্র পড়ল বড়ই অসুবিধায়। প্রতিক্ষণেই তার মনে হ'তে লাগল, এই বুঝি গড়গড়িয়ে গড়িয়ে হাতীর পিঠের উপর থেকে হই পপাত ধরণীতলে!

তার অসুবিধা বুঝে টুনু খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠল। বললে, "ও নরেন, যদি আছাড় খেতে না চাও তাহ'লে পিছন থেকে দু'হাতে আমার দু' কাঁধ চেপে ধর।"

চলল রুণু গজেন্দ্রগমনে। কখনো বনে বনে, কখনো মাঠে মাঠে, কখনো নদীর তীরে তীরে—চারিদিক্‌কার নিবিড় ও তরুণ শ্যামল উৎসবের মাঝখান দিয়ে। দূরে দূরে নীল পাহাড়গুলো যেন তাদের মুখের পানেই তাকিয়ে আছে অবাক্ বিস্ময়ে। বনের ভিতরে ঘন পাতার আড়লে লুকিয়ে পাখীরা সব ডেকে ডেকে ওঠে—তাদের মুখে মুখে ফোটে কত রাগ-রাগিনী, কত রকম সুর ও ছন্দ! পাহাড়ের বুক থেকে সূর্য্যকিরণে বিদ্যুৎবালিকার মত ঝরণা নাচতে নাচতে আসে পৃথিবীর সবুজ প্রাণের উপরে আসর পাতবে ব'লে।

নরেন্দ্রের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এতদিন সে বনের এখানে-ওখানে আসত শিকারীর হিংস্র চক্ষু নিয়ে। অরণ্যের অন্তঃপুরে এমন বিপুল সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার আছে, এটা দেখবারও অবকাশ কোনদিনই তার হয় নি। রুণুর পিঠের উপরে টুনুর কাঁধ ধ'রে ব'সে আজ সে প্রথম উপলব্ধি করতে পারলে, প্রকৃতি কত সুন্দরী!

টুনু বললে, "দেখছ নরেন, তোমাদের কলকাতার রাস্তার মত এখানে বিপদের কোন ভয় নেই?"

এদিকে ওদিকে তৃপ্ত চোখে তাকাতে তাকাতে নরেন্দ্র অভিভূত কণ্ঠে বললে, "দেখছি! তোমার মত আমারও এই বনের ভিতরেই বাসা বাঁধতে সাধ হচ্ছে।"

ঠিক তার দিন-তিনেক পরের ঘটনা।

রুণুর পিঠে চেপে সেদিনও বনের ভিতরে গিয়েছিল তারা দু'জনে। সেদিন একটু বেশী দূরেই গিয়ে পড়েছিল। সেখানটা এত নির্জ্জন যে, দুনিয়ায় পাখী ছাড়া আর কোন জীব আছে ব'লে সন্দেহ হয় না।

খানিকটা তফাতে রয়েছে একটি ঝর্ণা-তলা। নির্ঝরের স্বচ্ছ শুভ্র জল সেখানে পাথরের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে মাটির উপর এসে সৃষ্টি করেছে ছোট্ট একটি নদী।

টুনু হঠাৎ বললে, "রুণু, আমাকে নামিয়ে দাও। আমার জলতেষ্টা পেয়েছে।"

রুণু মাটির উপরে ব'সে পড়ল।

নরেন্দ্র বললে, "আমারও তেষ্টা পেয়েছে।"

রুণুর পিঠ ছেড়ে দু'জনে নীচে নেমে ঝর্ণা-তলায় গিয়ে অঞ্জলি ভ'রে জলপান করতে লাগল।

রুণু আসতে আসতেই দেখে নিয়েছিল, একটা গাছে ফলে আছে অনেকগুলো পাকা ফল। এই অবসরে সেও চলল ফলাহার করতে।

জলপানের পর টুনু দাঁড়িয়ে উঠে উপর দিকে মুখ তুলে সশব্দে ঘ্রাণ নিতে নিতে বললে, "নরেন, কী চমৎকার ফুলের গন্ধ আসছে! তুমি এইখানে বোসো, ফুলগুলো কোথায় ফুটেছে, দেখে আসি।" ব'লেই নরেনকে জবাব দেবার কোন ফাঁক না দিয়েই এক দিকে চ'লে গেল সে চুল আর আঁচল উড়িয়ে।

নরেন্দ্র জানে, বনের ভিতরে টুনুর খবরদারি করে রুণু। কাজেই সে আর কোন মাথা না ঘামিয়ে একখানা পাথরের উপরে ব'সে ব'সে একমনে দেখতে লাগল ঝরণার নাচ। খালি নাচ নয়, শুনতে লাগল তার গানও।

খানিক পরেই সে সচমকে শুনতে পেলে, বনের ভিতর থেকে টুনুর আর্ত্তস্বর।

একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে সে টুনু যেদিকে গিয়েছিল সেইদিকে বেগে দৌড়তে লাগল।

টুনু সকাতরে চীৎকার ক'রে বলছে, "নরেন! নরেন! রুণু, রুণু, রুণু!"

ফল খাওয়া ফেলে রুণুও দুই কান উপর দিকে তুলে দ্রুতপদে উত্তেজিত ভাবে ছুটে এলো।

পাগলের মতন বনের ভিতর থেকে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে এল টুনু, তার দুই চক্ষে বিষম আতঙ্কের ভাব! আরো কয়েক পা এগিয়েই হঠাৎ সে হোঁচট খেয়ে মাটির উপরে প'ড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, তার কাছ থেকে হাত দশেক দূরে একখানা উঁচু বড় পাথরের উপরের জঙ্গল ভেদ ক'রে আবির্ভূত হ'ল মস্ত একটা বাঘ! পাথরের উপরে এসে লাঙ্গুল আছড়াতে লাগল সশব্দে। তার পরেই নীচে টুনুর উপরে লাফ মারবার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

রুণু শূন্যে শুঁড় তুলে বন-কাঁপানো ভীষণ গর্জ্জন ক'রে উঠল—কিন্তু টুনুর কাছ থেকে সে এখনো খানিকটা দূরে রয়েছে, টুনুর কাছে যাবার আগেই বাঘ লাফিয়ে পড়ে শিকার নিয়ে আবার বনের ভিতরে পালিয়ে যাবে। রুণু তার

গতি আরও বাড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলে, আর সে তার টুনুকে বাঁচাতে পারবে না।

হঠাৎ গুড়ুম ক'রে গর্জ্জে উঠল নরেন্দ্রের হাতের বন্দুক, এবং পরমুহূর্ত্তেই বাঘটা ধপাস ক'রে নীচেকার মাটির উপরে পড়ে চিৎ হ'য়ে চার পা তুলে যেন শূন্যকেই থাবা মারতে লাগল।

টুনু তাড়াতাড়ি মাটির উপর থেকে উঠে পড়ে আবার এদিকে ছুটে এল।

কিন্তু বাঘটা তখনো মরে নি। মুখের শিকার পালায় দেখে সে আবার চার পায়ে ভর দিয়ে উঠে গর্জ্জন ক'রে উঠল দুর্জ্জয় আক্রোশে। আবার সে সামনের দিকে লাফ মারবার চেষ্টা করছে, কিন্তু রুণু এবারে আর তাকে কোন সুযোগই দিলে না। সে লাফ মারবার আগেই রুণু তার কাছে গিয়ে পড়ল, এবং তারপর চোখের নিমেষে নিজের অজগরের মত মোটা শুঁড় দিয়ে বাঘের দেহকে জড়িয়ে ধ'রে মাটির উপরে সক্রোধে আছাড় মারতে লাগল বারংবার। যতক্ষণ না বাঘের দেহটা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হ'ল ততক্ষণ তাকে ছাড়লে না।

টুনু ছুটতে ছুটতে এসে নরেন্দ্রের পায়ের কাছে বসে পড়ে সভয়ে দুই চক্ষু দুই হাতে ঢেকে ফেলে কাঁদতে লাগল আকুল ভাবে। নরেন্দ্র তার পাশে ব'সে পড়ে সস্নেহে বললে, "না টুনু, "কেঁদ না। আর কোন ভয় নেই, বাঘকে রুণু একেবারে মেরে ফেলেছে।"

টুনু দু'টি সজল চোখ তুলে বললে, "বাঘটাকে রুণু মেরেছে, না তুমি মেরেছ? তুমি না থাকলে আজ কি আমি বাঁচতুম?"

নরেন্দ্র বললে, "দেখছ তো টুনু, তুমি আমাকে বন্দুক আনতে মানা করেছিলে! এই বন্দুকটা সঙ্গে না থাকলে আজ তোমার কী হ'ত বল দেখি?"

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে টুনু হঠাৎ ফিক্ ক'রে হেসে বললে, "খাসা বন্দুক, লক্ষ্মী বন্দুক বন্ধু! এবার থেকে রোজ বন্দুক সঙ্গে এনো! কিন্তু দেখো, যেন হরিণ আর পাখী মেরো না।"

নরেন্দ্র অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগল! বনের মেয়ে টুনু, তাই এত শীঘ্র এত বড় বন্য বিপদ্‌টাকে ভুলে হাসতে পারলে।

ইতিমধ্যে রুণুও তাদের কাছে এসে দাঁড়ালো—তার শুঁড়টা তখনো রক্ত মাখা। একবার নরেন্দ্রের দিকে তাকালে, সে দৃষ্টিতে মাখানো ছিল যেন কৃতজ্ঞতার

ভাব। হয়তো সে বুঝতে পেরেছে, নরেন্দ্র না থাকলে তার টুনু আজ কিছুতেই বাঁচতো না।

রুণু আর সেখানে থাকতেও রাজি নয়। মাটির উপরে তাড়াতাড়ি ব'সে পড়ে তাকালে সে টুনুর মুখের দিকে। তার মনের ভাবটা এই, "ওহে টুনু, এই সাঙ্ঘাতিক জায়গায় আর থাকা উচিত নয়। চট্‌পট্ আমার পিঠে উঠে পড়ো।"

(ক্রমশঃ)

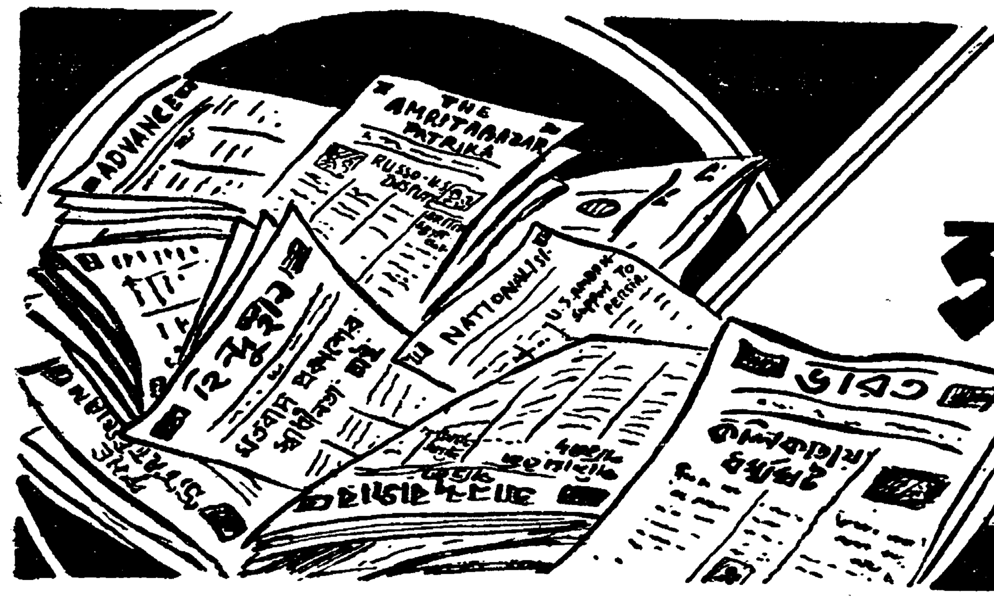

আমাদের সংবাদ পত্র বিভাগ

পরলোকে ব্রজেন্দ্রলাল

স্যর্ ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুতে বাংলা তার একজন কৃতী সন্তানকে হারাল। বাংলার এডভোকেট্ জেনারেল, ভারত সরকারের আইন-সচিব, ভারতের এডভোকেট জেনারেল এবং শেষে বরোদা রাজ্যের দেওয়ান হিসাবে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। স্বাধীনতালাভের পর ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি একে একে ভারত রাষ্ট্রে যোগ দিতে সুরু করে। এই ব্যাপারেও ব্রজেন্দ্রলালের হাত বড় কম ছিল না। রাজাজীর অনুপস্থিতিতে তিনি কিছু দিন পশ্চিম বাংলার প্রদেশপালের পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন।

চীন-সোভিয়েট বন্ধুত্ব-চুক্তি

সম্প্রতি চীনের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে এই দুই রাষ্ট্রের কোনটির সঙ্গে যদি অন্য কোনও রাষ্ট্রের যুদ্ধ সুরু হয় তবে এরা পরস্পরকে সামরিক ও অন্যান্য সব রকম সাহায্য করবে। এই দুই রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা পৃথিবীর প্রায় চার ভাগের এক ভাগ। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক মহলে এই চুক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই।

চ্যাং কাই শেকের নেতৃত্বে চীনের কুওমিণ্টাং সরকার চীনের মূল ভূভাগ ছেড়ে ফরমোসায় আশ্রয় নিয়েছে সে খবর হয়তো জান। পৃথিবীর

অনেক দেশই চীনের নতুন সরকারকে মেনে নিয়েছে, কিন্তু আমেরিকা এখনও নেয় নি। রাষ্ট্রসঙ্ঘে (ইউ. এন্. ও) এই নিয়ে খুব হট্টগোল চলছে।

সীমানা-সমস্যা

ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নিয়ে যে বিরোধ চলছিল এবং যা নিয়ে বিচারপতি বাগের অধীনে পাকিস্তান ও ভারতের দু' জন প্রতিনিধি সহ আলোচনা চলছিল তার ফলাফল বেরিয়েছে। চারটি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি সম্পর্কে ৩ জনই একমত হয়েছেন, ২টি ব্যাপারে ভারতের মতই মেনে নেওয়া হয়েছে। একটিতে ৩ জনের কেউই একমত হন নি, তবে এটিতে বাগে মোটামুটি পাকিস্তানেরই অনুকূলে মত দিয়েছেন।

নতুন রেলপথ

সম্প্রতি আসাম থেকে কলকাতা পর্য্যন্ত সরাসরি ভারত রাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে একটি নতুন রেল লাইন খোলা হয়েছে এবং ২৫শে জানুয়ারী থেকে এই পথে যাত্রী-চলাচল সুরু হয়েছে। এ লাইনটি অবশ্যি চওড়ায় একটু ছোট—মিটার গেজ্। এর আগে কলকাতা বা ভারতের অন্য কোন জায়গা থেকে আসাম বা উত্তর বঙ্গের জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে যেতে হ'লে পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে ছাড়া যাবার উপায় ছিল না। এখন আর সে বাধা রইল না—যদিও নতুন ব্যবস্থায় কিছু সময় বেশী লাগবে।

খেলাধূলা

কলকাতায় নিখিল এশিয়া টেনিস্ প্রতিযোগিতা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দেশ-বিদেশের বহু বিশিষ্ট খেলোয়াড় যোগ দিলেও শেষ পর্য্যন্ত সিংগ্‌ল্‌স্ ফাইনালে উঠেছিলেন দিলীপ বসু এবং সুমন্ত মিশ্র। দিলীপ বসুই শেষ পর্য্যন্ত বিজয়ী হয়েছেন। ডাবল্‌স্ খেলাতেও এঁরা দু'জনেই চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছেন। মেয়েদের সিংগল্‌স বিজয়ী হয়েছেন মিস্ টড, ডাবল্‌স্‌এ—মিস্ টড ও মিস্ মর‍্যান্। এঁরা দু'জনেই আমেরিকান্। মিক্সড ডাবল্‌স্‌এ বিজয়ী হয়েছেন পি. ওয়াগার (বেল্‌জিয়াম্) ও মিস্ মর‍্যান্ (আমেরিকা)।

কমন্‌ওয়েল্‌থ ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণ এখনও শেষ হয় নি। শীঘ্রই মাদ্রাজে ভারতের সঙ্গে তাদের ৫ম টেষ্ট সুরু হবে। কলকাতায় হকি লীগ আরম্ভ হয়েছে।

নন্দন

ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে অভিনয় ও বিচিত্র অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে আনন্দলাভ করতে পারে সেজন্য 'নন্দন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে। সেদিন শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর পরিচালনায় এর প্রতিষ্ঠা-উৎসব হয়ে গেল। এই উপলক্ষ্যে ছেলেমেয়েরা "আমার দেশ" নামে একটি নির্ব্বাক্ নাট্য অভিনয় করেছিল। এটি রচনা করেছিলেন শ্রীঅবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাস্কো ডা গামার আগমন থেকে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাস এতে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

১। (ক) রাক্ষস (খ) চামচিকে (গ) তেলাকুচা (ঘ) বানর। ২। (ক) মধ্য এশিয়ার একটি জাতি (খ) প্রাচীন ভারতে প্রচলিত এক রকম অক্ষর (গ) যে যমজ ভাই বা বোনের দেহ পরস্পরের দেহের সঙ্গে যোড়া। (ঘ) এক রকম মূল্যবান্ ধাতু (ঙ) এক জাতের পাখী—এখন লোপ পেয়ে গেছে। (চ) ইণ্ডিয়ান্ য়্যাড্‌মিনষ্ট্রেটিভ্ সারভিস্—যা আই. সি. এস্-এর পরিবর্ত্তে হয়েছে। (ছ) এক রকম ফুল—পাহাড়ী অঞ্চলে দেখা যায়। ৩। (ক) রবীন্দ্রনাথ (খ) মাইকেল (গ) যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় (ঘ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঙ) কাজী নজরুল ইস্‌লাম (চ) মনোমোহন সেন (ছ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ৪। (ক) জার্ম্মেনী (খ) ফ্রান্স (গ) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (ঘ) রাশিয়া (ঙ) জার্ম্মেনী (চ) বোম্বাই (ছ) মাদ্রাজ। ৫। (ক) প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (খ) নরেন্দ্রনাথ দত্ত (গ) সখারাম গণেশ দেউস্কর (ঘ) মৃণালিনী দেবী (ঙ) হিদেকি য়ুকাওয়া (জাপানী বৈজ্ঞানিক)।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

বীণা ও হাসি দু'জনে দু'রকম কথা বলেছে, কাজেই ওদের একজনের কথা মিথ্যা। আবার কানু বলছে ওরা দু'জনেই ফেল—অর্থাৎ দু'জনেই মিথ্যাবাদী। কিন্তু তা ঠিক নয়, সুতরাং কানুও মিথ্যা কথা বলছে। অতএব একমাত্র বীণাই সত্যি কথা বলেছে এবং কেবল সে-ই পাশ করেছে।

উত্তরদাতাদের নাম:— সুস্নাত গংগোপাধ্যায় (কলিকাতা-২৬); বিভাসবিহারী বসু (পাটনা); এ. এস্. নূর মোহাম্মদ ও পল্লীসংস্কার সমিতির সভাবৃন্দ (বাদলগাছী); বিমলভূষণ রায় (কলিকাতা-৯); অনু, ঝরণা, আভা, আরতি ও প্রণতি (বগুড়া); সবিতা, এ. হক, এম্. এ. সালেহিন (রাজশাহী); মেজদা, চন্দনা, মায়া, আরতি, এউজী, ছায়া, জয়ন্তী বসু (কলিকাতা-২৯); অনন্ত, ঝরণা, রেণুকা, লতিকা, যূথিকা, কুমারেশ, অরুণ, সমরেশ চট্টোপাধ্যায় (জয়পুর); সিপ্রা কুণ্ডু (বারাকপুর); অমলকুমার মিত্র, বাচ্চু রায় চৌধুরী (গৌহাটী); দীপ্তি ও দীপালি সেনগুপ্তা (গৌহাটী); নীলিমা দাশ (ডেরিং চা-বাগান); অগ্নিশিখা মণিমেলার মণিভাইবোনেরা (গৌহাটী); ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান); টাটা, টুটু, টিটি, টিটো, টোটা (জামসেদপুর); মণিদি, বৌদি ও বেণু ঘোষ (দিনাজপুর); প্রণতি, আরতি, মিনতি, মুক্তি, সুশান্ত (মুজঃফরপুর)।

নূতন ধাঁধা

ভোঁদা, নেড়া আর খেঁদী তিনজনে এক সঙ্গে অঙ্কের পরীক্ষা দিয়েছিল। ফল বেরুলে দেখা গেল তিন জনে মিলে মোট ৬৬ নম্বর পেয়েছে। খাতা খুব কড়া ক'রে দেখা হয়েছে অনুযোগ করায় মাষ্টার মশাই তিন জনকেই সমান সংখ্যক নম্বর বাড়িয়ে দিলেন। তখন দেখা গেল নেড়া প্রথমে যে নম্বর পেয়েছিল ভোঁদা তার চেয়ে ৫ নম্বর বেশী পাচ্ছে, খেঁদী পাচ্ছে ভোঁদার প্রথমকার নম্বরের চেয়ে ৮ নম্বর বেশী এবং নেড়া পাচ্ছে খেঁদীর প্রথমকার নম্বরের চাইতে ১৭ নম্বর বেশী। তা হ'লে প্রথম বার কে কত নম্বর পেয়েছিল?

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

যমুনা

স্নানের সাবান

যে কোন ভাল সাবানের সমকক্ষ
অথচ মূল্য হিসাবে নিতান্ত সুলভ

নিত্য ব্যবহারে অপরিহার্য

প্রতি বাক্সে ১২ খানি

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

ছোটদের
আনন্দ-মেলা !

অতি দুরন্ত শিশুও হাসিয়া খেলিয়া লেখাপড়া শিখিবে

আশুতোষ দেব প্রণীত

মজার বই—১ম ভাগ… ॥০
মজার বই—২য় ভাগ… ॥০

সুনির্ম্মল বসু প্রণীত
যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত

হাসিমুখ … ॥০
জানোয়ার … ॥০
বেড়ে মজা … ॥০

যুক্তাক্ষর-সমন্বিত

হৈ চৈ—১ম ভাগ … ॥০
হৈ চৈ—২য় ভাগ … ॥০
প্রাচীন কথা … ॥৵০

সুনির্ম্মল বসু প্রণীত
যুক্তাক্ষর-সমন্বিত

ছানাবড়া … ॥০
রাজভোগ … ॥০
মশগুল … ॥০
খোকাখুকুর A. B. C. ॥০

অনিমা দেবী প্রণীত

খোকাখুকুর
অ, আ, ক, খ, … ।৵০
দুশো মজা … ॥০
অবাক্ কাণ্ড … ॥০

ঝক্ঝকে ছাপা, ঝল্মলে ছবি

দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা ৯

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি ১।০
পদ্মরাগ ১॥০
সোনার হরিণ ১॥০
নূতন পুরাণ ৸৵০
হাস্য ও রহস্য ৸৵০
চায়ের ধোঁয়া ৸০
হুকাকাশির গল্প ৸০
দমাদম্ দামোদর (নাটক) ।৵০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের

মহাভারতের গল্পগুচ্ছ (১ম) ৸০
ঐ (২য়) ৸০
দিগ্বিজয়ী বীর ৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ১৲

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ১৲
বিজ্ঞান-বুড়ো ১৲
আকাশের গল্প ১।০
আবিষ্কারের গল্প ৸০
ধূমকেতু ৸০
অয়েল পেন্টিং (নাটক) ।০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা ১॥০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

দি লাষ্ট্ অফ্ দি মোহিকান্স্ ॥৵০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের

অলিভার টুইষ্ট ॥৵০

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়ের

যে জার্মানী হেরে গেছে ২৲

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

Regd. No. C—1641

ছোটদের উপহারের কয়েকখানি সেরা বই

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি

বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ্‌ হুকাকাশির একখানি রহস্যময় উপন্যাস

নূতন সংস্করণ ১।০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ধূমকেতু

অভিনব বৈজ্ঞানিক রহস্যপূর্ণ উপন্যাস

দাম ৮০

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর কাহিনী

নূতন সংস্করণ ১৲

রামধনু

মেয়েদের
চিত্র
ক-পত্রিকা

২২শ বর্ষ
চৈত্র, ১৩৫৬
৪৲ ষান্মাসিক ২।০
প্রতি সংখ্যা ।৶০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস-সি

রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির প্রাদেশিক সঞ্চালক
অধ্যাপক শ্রীরেবতীরঞ্জন সিংহ প্রণীত

প্রাথমিক অনুবাদ শিক্ষা

(হিন্দী-বাংলা ও বাংলা-হিন্দী)

পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত ২য় সংস্করণ

বাঙ্গালীদের হিন্দী শিখবার এবং অবাঙ্গালীদের বাংলা শিখবার সহজ বই

—দাম ॥৶৹—

রাষ্ট্রভাষার প্রথম সোপান

— দাম ৶৹ —

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ
১বি, রমা রোড, কলিকাতা ২৫

কবি প্রভাতকিরণ বসু (কাকাবাবু)

সম্পাদিত

ভাই-বোন

বাষিক ৪৲, ষান্মাসিক ২।৹, যে কোনো মাস থেকে যে কোনো মাস পর্য্যন্ত গ্রাহক হওয়া যায়। এমন দিন আসছে যে দিন প্রতি ঘরে ভাইবোনের জন্যে 'ভাই-বোন' না হলেই চলবে না। যারা দেখ নি, বিজ্ঞাপন শুধু তাদের জন্যে, নইলে গ্রাহকরাই এর চলন্ত বিজ্ঞাপন। এজেন্ট কিম্বা গ্রাহক হবার জন্যে.—কার্য্যাধ্যক্ষ, ভাই-বোন কার্য্যালয়, ৪-এ ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা—৬

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দিনের শেষে

চিত্রকর ঃ শ্রীরথীন ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২২শ বর্ষ } চৈত্র ১৩৫৬ { ১২শ সংখ্যা

খোকাখুকুর গল্প

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

খুকু যখন কান্না জুড়ে—খোকন ব'সে হাসে,
খোকন আছাড় খেলে খুকু বক দেখিয়ে আসে।
খুকু যখন রান্না করে খেলার ঘরে গিয়ে—
খোকন ছুটে যায় পালিয়ে পুতুল তারি নিয়ে।
এক জায়গায় দুই জনারি মিল,
আমসত্ত খায় তারা রোজ দোরে এঁটে খিল।

খোকন যখন লাট্টু ঘুরায়—ছিঁড়ে তাহার খাতা
খুকুরাণী আরাম ক'রে লিখতে বসে যা-তা।
খুকুর যদি মোটর এলো, খোকার ঘোড়া চাই,
খোকন যখন হাসে তখন তুলবে খুকু হাই।

এক জায়গায় দুই জনারি মিল,
ঠাণ্ডা জলে নাইতে হ'লে লাগায় দোরে খিল।

দিন-রাত্তির ঝগড়াঝাঁটি, কথায় কথায় আড়ি,
নালিশ ক'রে দু' ভাইবোনে মাথায় তোলে বাড়ী।
খোকন যখন ভেংচি কাটে মায়ের কোলে চেপে
গোমরা মুখে দাঁড়িয়ে খুকু যায় সে শেষে ক্ষেপে।
এক জায়গায় দুই জনারি মিল।
আরসোলাটা দেখলে তাঁরা বন্ধ করে খিল।

প্রিয়ঙ্গু

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৪

সুদূরের পিয়াসী

পরমানন্দে বুক যার সদা তাজা
ভিখারী হ'লেও বিধির গড়া সে রাজা।

প্রিয়ঙ্গু শুধু সুদূরের নয়, দুর্লভেরও পিয়াসী। দীপঙ্কর প্রভৃতি মনীষীগণ যে আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিব্বত অভিযান করিয়াছিলেন, হোয়েন্ত সাঙ, আল্‌বেরুণি যে আকর্ষণে পর্য্যটক হইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন—কলম্বস্‌ যে উচ্চাভিলাষ লইয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন—প্রিয়ঙ্গুও সেই ভাবের ভাবুক। সে ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া বাঙালীর বিরাট অভ্যুদয়ের স্বপ্ন দেখিত। সে সমস্ত ভারত প্রদক্ষিণ করিবে। তবে সম্প্রতি তাহার লক্ষ্য হইতেছে কাবুল ও কাশ্মীর। যাইবার পোষাক-পরিচ্ছদ ও পাথেয়ের অভাব সত্য, কিন্তু আর যাহারই অভাব থাক, উদ্যমের অভাব তাহার ছিল না এবং ভাবেরও অতি-প্রাচুর্য্যই ছিল। সে প্রবাসী বাঙালীদিগকে ডাক দিয়া এক কবিতা লিখিয়া ফেলিল—

আয় বাঙালী, ঘরের ছেলে,
আয়রে ফিরে আয় রে,
ওই যে বোধন বাঁশীর সাড়া
আবার শোনা যায় রে।
ভরলো দীঘি কমলদলে,
কাটবি সাঁতার সুনীল জলে,
শিশির-ভেজা পল্লীবীথি
আবার তোরে চায় রে!

কাবেরী কি রেবার বাঁকে
কিম্বা পাহাড়-শীর্ষে,
'রেঙ্গুন', 'লাদাক' যেথায় থাকিস
আবার দলে ভিড় 'সে।
'লুণ্ডি', 'কোহাট', 'পিণ্ডি' ছাড়ি
বঙ্গ-দুলাল আয় রে বাড়ী,
সন্ধ্যামণি, শিউলি ফুলে
তোর আঙিনা ছায় রে।

ছেড়ে আঙুর, আমরুদ-আনার,
অড়হর আটার আড্ডা
এসো ডাকে মিষ্টি ডাঁটা
মাছ-তেঁতুলের খাট্টা।
ক্ষেত ভরেছে পোনকা পুঁয়ে,
শশায় মাচা পড়ছে নুয়ে,
আয় পিপাসী, অমৃতের যে
ঝরণা বহে যায় রে!

কিন্তু ডাকে বড় কেহ সাড়া দিল না, তাই তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আবার এক কবিতা আঘাত করিল—

কাবুলে কাবুলী বেশ পরে পীত পাগড়ী,
কাশ্মীরে কাশ্মীরী, 'কাঙ্গারী'কে আঁকড়ি।

কোথা প'রে পায়জামা, কোথা প'রে লুঙ্গি,
তিব্বতে লামা কভু, বর্ম্মাতে ফুঙ্গি।
ভিন্ দেশ ভিন্ বেশ, হ'ক ভিন্ ধর্ম্ম,
যত ভাষা শেখে আর করে যেই কর্ম্ম,
এক প্রাণে এক সুরে জননীকে ডাকবে,
বাংলার সন্তান বাঙালীই থাকবে।

যে ভাষার ডাকে চাঁদ দিয়ে যেত টিপ্‌টি,
সোহাগেতে চঞ্চল সন্ধ্যার দীপটি।
ঘুমে ঢুলু ঢুলু কচি নেত্রের কজ্জল,
যে ভাষার সঙ্গীতে হ'ত নিতি উজ্জ্বল।
সুধাময়ী যে ভাষার সুধা ঝরে বর্ণে,
ডাক নামে ডাক দেয় মর্ম্মে ও কর্ণে;
আদরিণী সে ভাষাকে বুকে করে রাখবে,
বাঙলার সন্তান বাঙালীই থাকবে।

ত্রয়োদশ সাগরের মন্থন সুধা হে
এনে দেবে নিবারিতে জননীর ক্ষুধা হে।
বার নদী বারি দিবে নিবারিতে তৃষ্ণা,
এক হবে ভাগীরথী, সিন্ধু ও কৃষ্ণা।
মাধুকরী করি জগতের ভাষাতীর্থে
জননীর মন্দিরে হবে সবে ফিরতে।
তাঁরি পদে স'পি সব তাঁর কৃপা মাগবে,
বাঙলার সন্তান বাঙালীই থাকবে।

এই রূপে মনের মধ্যে ভাবের বিপুল পসরা সাজাইতে প্রিয়ঙ্গুর ছয়-সাত বছর কাটিয়া গেল। তারপর এক শুভদিনে গ্রামের সমস্ত মায়া-মমতা ছিন্ন করিয়া সত্য সত্যই সে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিল—পদব্রজে।

গ্রাম হইতে চারিশত মাইল দূরে আসিতেই তাহার ছয় মাস অতীত হইল। এক বৎসর না যাইতেই তাহার সে উৎসাহ যেন হ্রাস পাইতে লাগিল। অপ্রীতিকর সঙ্গীদের সহিত বৈচিত্র্যবিহীন জীবনযাত্রা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। অর্থ প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে,—আয়েরও কোনো স্থায়ী উপায় অবলম্বন করিতে পারে নাই। দূরের সে মোহিনী মাধুরী মিলাইয়া যাইতেছে—'বারিধি-বারি যথা তুলিলে করপুটে—থাকে না যায় চলি' নীলিমা!'

পালোয়ানদের সঙ্গে মিশিয়া দেখিয়াছে—তাহাদের শক্তি পশুশক্তি, বিচারবুদ্ধি ও মনুষ্যত্বের স্ফূর্ত্তির অবকাশ নাই, খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তিরও অভাব। ভ্রমণকারীর সঙ্গে মিশিয়া দেখিয়াছে তাদের মধ্যে হীনতা, হিংসা, লোভ এবং তৎসঙ্গে দৈন্য মানুষকে কোনো ভাল পথ দেখায় না—উচ্চ ভাবের কোনো চেষ্টা নাই। ক্বচিৎ কেহ ধর্ম্মচর্চ্চা করে, তাহাতেও ভণ্ডামিই অধিক।

সাধুদের মধ্যেও প্রকৃত সাধুর সঙ্গ এখনো তার ভাগ্যে জুটিল না। রাজার চাটুকারদের ন্যায় তাহাদেরও কতকগুলি অন্ধ ভক্ত ও ভণ্ড শিষ্য আছে।

কানপুর পার হইয়া প্রিয়ঙ্গুর সহিত দুইজন ভদ্র-দর্শন যুবকের আলাপ হইল এবং কয়েক দিনেই তাহা বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তাহারাও তাহার মত পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। তাহাদেরও ইচ্ছা কাশ্মীরে গিয়া শালের ব্যবসা করিবে। দুই দিন গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া যাওয়ার পর তাহারা এক বনপথ ধরিল—রাস্তা সংক্ষেপ করিবার জন্য। যখন অরণ্য গভীর হইয়া আসিল তখন তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে লাগিল। বন্ধুরা বলিল, 'পথটী দুর্গম—আমাদিগকে গন্ধের দ্বারা পথ চিনিয়া দুই দিকে এই দড়ি ধরিয়া যাইতে হইবে, নতুবা পথভ্রান্ত হওয়া ও নিম্নে খাতে পতন অবশ্যম্ভাবী।' প্রথমে চন্দন, তার পর খস্‌খস্, তার পর গোলাপের গন্ধে অতিমাত্রায় সাবধানতায় ও শঙ্কায় প্রিয়ঙ্গু অগ্রসর হইতে লাগিল, কারণ প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব। এই ভয়াল দুর্গম পথের শেষে প্রিয়ঙ্গু দেখিল তাহারা প্রকাণ্ড এক শ্মশান-ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছে। সেখানে ভীষণ-দর্শন বারো-তেরো জন লোক বসিয়া রহিয়াছে। প্রিয়ঙ্গুকে দেখিয়াই বিকট-আকৃতি এক ব্যক্তি, লাল রঙের বড় গামছার খুঁটে একটা টাকা বাঁধা, তাই ঘুরাইয়া লাফ দিয়া তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। প্রিয়ঙ্গু একখানা রক্তমাখা শাণিত তরবারি দেখিলেও ইহা অপেক্ষা অধিক ভীত হইত না। সে বুঝিল সে ঠগীদের হাতে পড়িয়াছে, আর উদ্ধার নাই। সঙ্গী দু'জন ইহারই মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

"ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, রুশ—এমন কোন্ সভ্য দেশ আছে যার ইতিহাস নিজের দেশের জন্যে চুরির ইতিহাস নয়?"

—রবীন্দ্রনাথ।

"একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মধু সংগ্রহ করিতে শেখ—হুল ফুটাইতে শেখ।"

—বঙ্কিমচন্দ্র।

"আপনারা, ভারতীয়েরা, যখন নিজেদের হাতে দেশের শাসনভার পাবেন তখন আপনাদের প্রথম কর্ত্তব্য যেন হয় প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেওয়াটা একটা দণ্ডযোগ্য অপরাধ—দরকার হ'লে প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ ব'লে গণ্য করা।...বুদ্ধিমান লোকেরা কখনও কথা বলে না।"

—বার্নার্ড শ

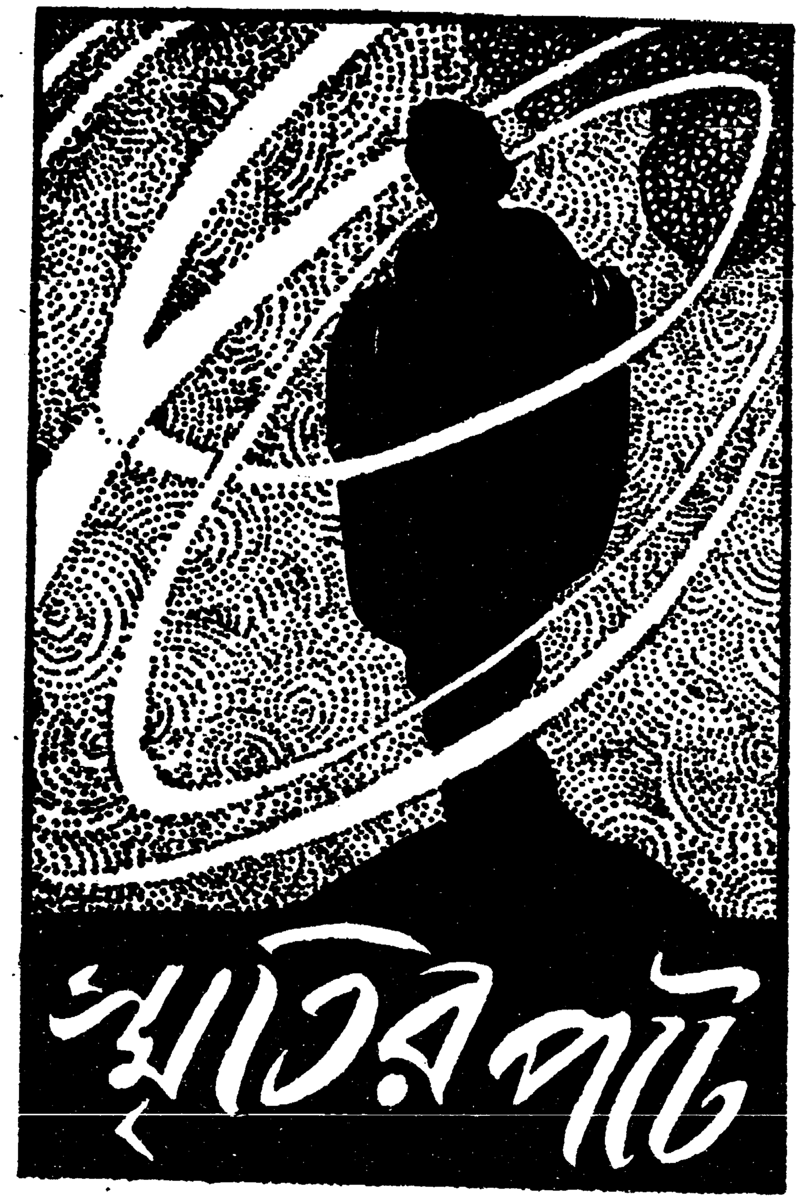

আত্মোন্নতি সমিতির গল্প

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
এম্. এ, বি. এস্-সি

হরদয়ালের দল

বর্দ্ধমানের জমিদার চারু মুখার্জী আত্মোন্নতি সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। একদিন তাঁহার বাড়ীতেও ডাকাতি হইয়া গেল। প্রায় সত্তর হাজার টাকার গহনা লোপ পাইল। চারু বাবু পরবর্ত্তীকালে যে সংবাদ পাইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার ধারণা হয় যে হরদয়ালের দল চারু বাবুর এক আত্মীয়ের সাহায্যে এই কার্য্য করিয়াছিল। হরদয়ালের সঙ্গে আমরা অনেক পূর্ব্বে মিলিয়াছিলাম। সে পশ্চিম দেশের লোক, কিন্তু বাংলা দেশে বহুকাল বাস করায় বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিল। তাহার বাড়ীতে কোনও আত্মীয়-স্বজন ছিল না। অবস্থা ভালই ছিল। পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর সে শিষ্য ছিল। স্বামিজী কলিকাতায় তাহার বাড়ীতে অনেক সময় বাস করিতেন। আমরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতাম। স্বামিজীর এক ভ্রমণ-কাহিনী ছিল। আমরা উহা পড়িয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলাম। তিনি অত্যন্ত দেশহিতৈষী ছিলেন। দয়ানন্দ সরস্বতীর মত হিন্দু জাতির অভ্যুদয় তাঁহার বিশেষ কাম্য ছিল। তাঁহার ধর্ম্মমত আমরা তখন ঠিক বুঝিতাম না। তিনি বলিতেন, 'ব্রহ্মের প্রতীক স্বরূপ আকাশ-বিহারী ঐ সূর্য্যনারায়ণের উপাসনা কর, উহাতেই শ্রেয়ঃলাভ হইবে।' তিনি মাঝে মাঝে আগুন জ্বালিয়া যজ্ঞ করিতেন। তৎকালীন বড়লোক মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ও তাঁহার ভক্ত বা শিষ্য ছিলেন। স্বামিজী নিজে কুস্তি করিতেন, লাঠি খেলিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বেশ বলবান্ পুরুষ ছিলেন। স্বামিজীর তিরোধানের পর আমরা বহুকাল হরদয়ালের সন্ধান পাই নাই। পরে শুনিয়াছিলাম কোনও স্বদেশী ডাকাতিতে তাহার জেল হইয়াছিল।

মলঙ্গা লেনের দল

আত্মোন্নতির বিকাশের পর হইতে আমরা আর সকল সংবাদ রাখিতে পারিতাম না। মলঙ্গা লেনের এক মুখুজ্যে-বাড়ীতে আত্মোন্নতির ধরণে চর্চ্চা বা আলোচনা-সভা হইত।

আমি উহাতে কয়েকবার সভাপতি বা শ্রোতা হিসাবে গিয়াছি। গিরিন বাঁড়ুয্যে ঐ বাড়ীর এক ছেলে। সে ক্রমশঃ বড় নেতা হইয়া পড়ে,—হরিশ ও বিপিনের সহিত মিলিত হইয়া দেশের নানা কাজে লিপ্ত হয়। গিরিনের দুই শিষ্য শিবপদ মুখার্জী ও তিনকড়ি গাঙ্গুলী দেশভক্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহারা সকলেই দেশের জন্য কারাবাস বরণ করিয়াছিল।

মলঙ্গা লেনের অনুকূল মুখার্জী বৈপ্লবিক নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অনুকূল খুব বলবান্ লোক ছিল। তাহার বড় ভাই রমনও খুব বড় ব্যায়ামী ছিল। সে বিবিধ সার্কাসের খেলা দেখাইতে পারিত। পরবর্ত্তীকালে মহারাজ মণীন্দ্র নন্দীর সাহায্যে এক সার্কাস দল গঠন করিয়া সমগ্র এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খেলা দেখাইয়া বেড়াইত। রমনের ছেলে গোপাল কলিকাতার গত দাঙ্গার সময়ে বহুবাজার অঞ্চলকে আত্মরক্ষার জন্য শৃঙ্খলাযুক্ত করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে।

অনুকূল বন্দীজীবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলেজ ষ্ট্রীটের শিব-মন্দিরের নিকট প্রসিদ্ধ 'রাজবন্দী অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের মাংসের দোকান' স্থাপন করে। কোন কার্য্যই হেয় নয় আত্মোন্নতি এই মত প্রচার করিত। অনুকূল ঐ দোকান খুলিয়া বিশেষ সৎ-সাহস দেখাইয়াছিল।

রডা কোম্পানীর বন্দুক লুট

এই সময়ে একটি বিশিষ্ট ঘটনা ঘটে। একদিন প্রভাস আসিয়া (সঙ্গে ভুবনেশ্বর, সতীশ এবং বোধ হয় অহীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) বলিল, পরামর্শের বিশেষ প্রয়োজন। আমার ক্রাউচ লেনের উপরের ঘরেই এরূপ পরামর্শ হইত। প্রভাস বলিল, অবিলম্বে চার-পাঁচ শত টাকা দরকার। একটা বড় কাজ হইয়াছে। রডা কোম্পানীর বন্দুকের মত কার্য্যকর তের শত রিভলভার ও তদুপযুক্ত বহু টোটা মলঙ্গা লেনের দল সরাইয়াছে। এই দলের শ্রীশ মিত্র নামক এক দেশভক্ত যুবক উক্ত কোম্পানীর সরকারের কার্য্য করিত। সে এই সংবাদ জানিত এবং কিরূপে উহা সরাইতে পারা যায় তাহাও জানিত। সমস্ত মাল সে সরাইয়াছে। কিন্তু উহা কলিকাতা হইতে অবিলম্বে বাহিরে পাঠান আবশ্যক। তজ্জন্য উক্ত টাকার প্রয়োজন। সময় নষ্ট করিবার যো নাই, অবিলম্বে কাজ করিতে হইবে। এই ব্যাপারে বিপ্লবীদের সকলেরই খুব আনন্দ হইল। তখনই প্রায় শ' চারেক টাকা উঠিয়া গেল। প্রভাস হয়ত অন্য স্থান হইতেও কিছু টাকা উঠাইয়া থাকিবে।

শ্রীশ মিত্র ও রডা কোম্পানীর মাল কলিকাতা হইতে উপিয়া গেল। পরবর্ত্তীকালে শ্রীশের আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ঐ সকল অস্ত্র সমগ্র বঙ্গদেশে ও ভারতের অন্য প্রদেশে প্রচারিত হইয়া সেই সেই স্থানে বৈপ্লবিক সমিতিসকল দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইল। চট্টগ্রামের বিদ্রোহ প্রভৃতি সম্ভবপর হইল। বিপিন বলে, সূর্য্য সেন তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করিতেন। তাহাকে যুদ্ধ-সংক্রান্ত পুস্তকাদি ও অস্ত্রাদি বিপিনের দল সরবরাহ করিয়াছিল। রডা কোম্পানীর ব্যাপার উপলক্ষে ভুজঙ্গ ধর নামক সমিতির এক সভ্যের

কয়েক বৎসর জেল হয়। ভুজঙ্গদের বাড়িতে রডা কোম্পানীর মাল এক রাত ছিল। পুলিস চরেরা উহা নির্ণয় করিয়াছিল, কিন্তু পরদিন সে মাল আর পায় নাই। শ্রীশ মিত্রের বন্ধু ও সহকর্ম্মী নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি শ্রীশের একটি ছোট জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন।

বিপিন গাঙ্গুলী

বিপিনের কথা আমার এ কাহিনীতে বিশেষ নাই। আত্মোন্নতি কেন্দ্র-বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর বিপিনের পূর্ণ বিকাশ। সে একজন বড় নেতা হইয়া পড়ে, এবং সমগ্র বাংলা দেশে তাহার কার্য্য ছড়াইয়া পড়ে। রাউলেট রিপোর্ট—বিপিনের উৎকৃষ্ট ব্যাজস্তুতি। ঐ রিপোর্ট অনুসারে যতীন মুখার্জ্জী (বাঘা যতীন) ও বিপিন তাহাদের দলবলের সাহায্যে কলিকাতার কেল্লা ও সহর দখল করিবে এইরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। তখন প্রথম বিশ্ব-মহাসমর চলিতেছে। জার্ম্মানরা ভারতে বিদ্রোহের আশা করিয়াছিল। ভারতীয় বৈপ্লবিকদিগের সহিত জার্ম্মান্ রাষ্ট্রের সংযোগ হইয়াছিল। জার্ম্মানরা অস্ত্র সাহায্য করিবে, সুন্দর বনের কোনও এক নির্জ্জন সমুদ্রতটে এই অস্ত্র বিদ্রোহীদিগকে দেওয়া হইবে। যতীন মুখার্জ্জীর দল বালেশ্বরের সমুদ্রতটে এজন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। এম্‌ডেন্ নামক এক জার্ম্মান্ রণতরী তখন বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসমুদ্রে বিচিত্র জল-রণ-নৈপুণ্য দেখাইয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতেছিল। পরে এম্‌ডেন্ ইংরাজের বড় রণতরীর সহিত যুদ্ধে জলমগ্ন হয়। পুলিসে যতীন মুখার্জ্জীদের সন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। যতীন ও তাহার সঙ্গীগণ সংখ্যায় অনেক অধিক ও উৎকৃষ্টতর অস্ত্রসজ্জিত বিপক্ষ দলের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করিয়া বীরের মত প্রাণত্যাগ করে। তৎকালীন সংবাদ পত্রে এই কাহিনীর বিশদ বর্ণনা আছে।

গাছপালার অসুখ

শ্রীঅজয়কুমার দত্ত, বি. এস্-সি (কৃষি)

'অসুখ' কথাটা শুনলেই তোমাদের চট্ করে মনে আসে জল-বার্লি, দুধ-সাগু আর বিছানায় চুপচাপ পড়ে থাকা—এক কথায় মহা বিরক্তিকর সব অনুভূতি। গাছপালারা অসুখে পড়লে ও রকম কিছু ভাবে কিনা বলা যায় না তবে আমাদের বেশ কিছুটা ভাবিয়ে ছাড়ে।

গাছেরা রোগে পড়ে কেন? একটা কারণ হ'তে পারে ওদের শরীরে

প্রয়োজনীয় কোন পদার্থ কমে গেলে। ডাক্তারদের তোমরা প্রায়ই বলতে শোনো অমুকের ক্যালসিয়াম্-স্বল্পতা ঘটেছে, অমুকের আয়রন্ অর্থাৎ লোহা। একই কারণে গাছেরাও রুগ্ন হ'য়ে পড়তে পারে।

আসল যে কারণে গাছের অসুখ বেশী দেখা যায় তা অন্য কোন্ উদ্ভিদের আক্রমণে। সবুজ গাছপালা ছাড়া এক রকম নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্ আছে, যেমন ফাঙ্গাস, ব্যাক্‌টিরিয়া ইত্যাদি—যাদের ক্লোরোফিল বা সবুজ অংশ না থাকায় ওরা নিজেদের পুষ্টি নিজেরা তৈরী করতে পারে না। খাদ্য সংগ্রহের জন্যে, কাজেই, এদের

এক্স-রে'র সাহায্যে রোগগ্রস্ত আলুর ভিতরকার ক্ষত ধরা পড়েছে।

অন্য কোন জীবিত বা মৃত উদ্ভিদ্, প্রাণী ইত্যাদির ওপর নির্ভর করতে হয়। ক্লোরোফিল আছে এ রকম অনেক উদ্ভিদ্ও অন্য সুবিধা আদায়ের জন্য পরগাছা হিসাবে অন্য কোন গাছকে আশ্রয় ক'রে থাকে। এদের ক্রমাগত শোষণে আশ্রয়দাতা গাছ প্রায়ই স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলে।

ফাঙ্গাস আর ব্যাক্‌টিরিয়ার অজস্র জাতি আছে। এদের কোন এক জাতি কোন এক অথবা একের বেশী শস্য আক্রমণ করতে পারে। এই সব প্রায়-অদৃশ্য উদ্ভিদ্দের দেখার জন্যে মাইক্রস্কোপের সাহায্য নিতে হবেই। অবশ্য ফল-ফুল, পাতা বা ডালের পচে যাওয়া অংশ বা রং পাল্‌টে যাওয়া ইত্যাদি দেখেও অনেক সময় রোগ ধরা যায় তবে সেটা আন্দাজ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বর্ষাকালে পড়ে থাকা জুতো বা চামড়ার অন্য কোন জিনিষে, কাটা

ফল, তরীতরকারীর গায়ে যে সাদা সাদা তুলোর মত জিনিষ গজিয়ে উঠতে দেখ তাও ফাঙ্গাসেরই দেহাংশ। ব্যাঙের ছাতাও এক রকমের ফাঙ্গাস, অবশ্য একটু উঁচু জাতের।

এমন কোন জাতের গাছ নেই যাদের কোন না কোন ফাঙ্গাস বা ব্যাকটিরিয়া আক্রমণ করে না। উদ্ভিদ-জগতের রোগের কারণ অবশ্য ফাঙ্গাসই বেশীর ভাগ। এরা গাছের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তোফা আনন্দে তাদের লুঠ করতে থাকে। ফসল ঘনভাবে জন্মায় ব'লে খুব শীগ্‌গিরই সারা ক্ষেতে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। একটা ক্ষেত ধ্বংস হয়ে গেলে বা ফসল কাটার সময় হ'লে এরা অসংখ্য অতিক্ষুদ্র বীজাণু চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। বীজাণুর গঠন, তাদের ছড়িয়ে দেওয়ার রীতি বা অন্য গাছকে আশ্রয় ক'রে রোগ বিস্তার করার পন্থা প্রত্যেক জাতেরই প্রায় আলাদা। আমাদের পক্ষে এর চেয়ে শুভ ঘটনা আর হ'তে পারে না। কারণ এর সাহায্যে কোন্ গাছের কি রোগ হয়েছে তা ধরে ফেলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত ক'রতে পারা যায়। হাওয়া, জল, পোকামাকড় বা অনেক সময় মানুষের অসাবধানতার ফলে এই সব বীজাণু চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে সুস্থ গাছপালাকে আক্রমণ ক'রে বসে। এইভাবে এদের বিজয়-পতাকা ক্রমশঃ দিকে দিকে এগিয়ে চলে।

বীজাণুর আক্রমণে মাটী 'বিষাক্ত' হওয়ায় সেখানকার সমস্ত গাছ মরে যাচ্ছিল। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় মাটীকে জীবাণু-মুক্ত ক'রে সেখানে এই সুপুষ্ট ট্যমাটো গুলো ফলানো হয়েছে।

কোন বাগানে কিংবা ক্ষেতে একটু ভাল ভাবে লক্ষ্য করলে তোমরাও রুগ্ন গাছদের চিনে ফেলতে পার। এদের গঠন ও রং প্রায়ই বদলে যায়, আকারও

বেশির ভাগই খর্ব্ব বা কখনও কখনও সরু ও দীর্ঘ হয়ে যায়। এ ছাড়া জলাভাব না ঘটলেও শুকিয়ে যাওয়া, গাছের কোন কোন অংশ পচবার উপক্রম হওয়া, পাতায় বিচিত্র সব চিহ্ন ফুটে ওঠা ইত্যাদিও বিভিন্ন রোগের লক্ষণ। সারা ক্ষেতের ফসল অকালে শুকিয়ে মরমর হয়ে গেছে এ রকম ঘটনাও বিরল নয়।

গাছ অসুখে পড়ায় আমাদের কতটা যে ক্ষতি সইতে হয় সে সম্বন্ধে তোমরা হয়ত সঠিক ধারণা করতে পার না। ধান, গম, আখ, আলু, চা, তামাক, পাট ও আরও সব কৃষিজাত দ্রব্য বা ফসল রোগাক্রান্ত হওয়ায় প্রতি বছর আমাদের ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। অনেকের মতে শুধু রোগের হাত থেকে শস্য বাঁচাতে পারলে যেটুকু সাশ্রয় হবে তা দিয়েই আজকাল আমাদের দেশে যতটুকু খাদ্যের অভাব তা পূরণ হয়ে যায়। আয়র্ল্যাণ্ডে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ফাইটফথোরা রোগে আলুর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, ফলে বহু লোক খাদ্যাভাবে প্রাণ হারায়। বছর দশেক আগে উত্তর বিহারে আখের "রেড্ রট্" রোগ (অনেক আখের ভেতর যে লাল চিহ্ন দেখতে পাও) ভীষণ ভাবে বেড়ে যাওয়ায় বহু চিনির কল বাধ্য হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। গোলাজাত শস্য বা নানা উপায়ে রক্ষিত ফলেও রোগের উপদ্রব কিছু কম হয় না।

গাছের রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে আমাদের দেশ এখনও বেশি অগ্রসর হ'তে পারে নি। দিল্লীর ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল্ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ও কোন কোন প্রদেশের রিসার্চ ষ্টেশনে কিছু কাজ হচ্ছে। যুক্তপ্রদেশের গাছ রক্ষা বা "প্লান্ট প্রোটেক্‌শন" বিভাগ অসুখ ও পোকা-মাকড়ের হাত থেকে গাছেদের বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

গাছেদের রোগের চিকিৎসা করতে হ'লে রোগের কারণ ফাঙ্গাস বা ব্যাক্‌টিরিয়ার বিষয়ে গভীর জ্ঞান খুবই দরকারী। কিই বা তার জীবনের ইতিহাস, কোন্ সময়ে তার আক্রমণ বেশী হয়, কি ভাবে তার বীজাণু ছড়িয়ে প'ড়ে সুস্থ গাছপালাকে আক্রমণ ক'রে বসে তার নির্ভুল বিবরণ জানা চাই। এর পর বিশেষজ্ঞেরা প্রজনন-বিদ্যার সাহায্যে এমন গাছ আবিষ্কার করেন যাদের হয়ত রোগ আক্রমণ করতেই পারে না। যেমন শক্ত ছালের আখ লাগান ইত্যাদি। গমের গাছের 'ব্ল্যাক্ রাষ্ট' রোগ বেশির ভাগ জানুয়ারীর পরে দেখা যায়। কাজেই যদি এমন জাতের গম লাগান যায় যা ঐ সময়েই পেকে ওঠে তা হ'লে

রোগকে কলা দেখানো যেতে পারে। ফাঙ্গাসরাও অবশ্য এ বিষয়ে কম যায় না। ওরাও সময়ে নিজেদের এমন জাত তৈরী করে যা আজকে না পারলেও কিছুদিন পরে নিজেদেরও স্বভাব বদলে ওদের আক্রমণ ক'রে বসে। এ ছাড়া নানা রকম ওষুধপত্তরের ব্যবস্থাপত্রও আছে যা সময়ে ও ঠিক পরিমাণে দিতে পারলে রোগ সেরে যায়। এ সব কাজ অনেকের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না। একজন যদি নিজের ক্ষেতে চিকিৎসা সুরু করে কিন্তু তার প্রতিবেশী হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে তবে দ্বিতীয়ের ক্ষেত থেকে প্রথমের ক্ষেতে রোগ ছড়াতে কতক্ষণ?

চাষীদের অজ্ঞতার জন্য অনেক সময় এ সব কাজে এগোনো মুস্কিল হয়ে পড়ে। আমার এক বন্ধু মিঃ সেন 'প্লাণ্ট প্রোটেক্‌শন' বিভাগে কাজ করেন। রোগ সার্ভে করার সময়ে তিনি গোরখপুর জেলার এক গাঁয়ে কয়েকটি ক্ষেতের আখ 'রেড রট্' রোগে শোচনীয় হয়ে পড়েছে দেখতে পান। এমনিতেই ও আখের কোন পদার্থ নেই, তার ওপর রোগের বীজাণুর আড়ৎ হয়ে পড়ে থাকে কেন ভেবে ও সব ক্ষেতে তিনি আগুন লাগিয়ে দিতে হুকুম দেন। আর যায় কোথায়! নিমেষে লাঠি সোটা নিয়ে একদল লোক তাঁদের আক্রমণ ক'রে তাড়িয়ে দেয়। পরে অবশ্য ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্য নিয়ে মিঃ সেন কাজ উদ্ধার করেছিলেন। কার্য্যগতিকে আমাদেরও এদিক্ ওদিক্ থেকে আখ ইত্যাদি কেটে নিয়ে আসার দরকার হয় ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার জন্যে। এ কাজে কত বার যে চাষীদের রক্তচক্ষুর সামনে পড়তে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

ভারতবর্ষের রাবার লাভ

শ্রীঅমলকুমার মিত্র

স্বাধীনতা পাবার পরে বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষ যেমন সুনাম অর্জ্জনের জন্য সচেষ্ট হয়েছে, তেমনি নিজের দেশেও নানাদিকে কৃতিত্ব দেখাতে সুরু করেছে। খেলাধূলার উদার ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটি বিশেষ ক'রে চোখে পড়ছে। হকিতে ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত অপরাজেয়—অলিম্পিকে বিজয়মাল্য ভারতবর্ষই নিয়ে এসেছে প্রত্যেক বার। টেনিসেও ভারতবর্ষ এ বছর বেশ নাম করতে পেরেছে। ব্যাডমিণ্টনে আমাদের দেশ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। আর ক্রিকেটে বৈদেশিক কমন্‌ওয়েল্‌থ দলের বিরুদ্ধে 'রাবার' লাভ ক'রে ভারতীয় একাদশ আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে সমর্থ হয়েছে। সব দিক্ দিয়ে বিচার ক'রে দেখলে বলতে হবে, স্বাধীন ভারত এদিক্ দিয়ে নিজের মর্য্যাদা যথেষ্ট বাড়িয়ে চলেছে।

ভারত বনাম কমন্‌ওয়েল্‌থের পঞ্চম ও শেষ বেসরকারী টেষ্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রাজে। ক্রীড়ামোদীদের কাছে এ খেলাটির আকর্ষণ ছিল অসাধারণ; কারণ আগের চারটি টেষ্টের দু'টি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে, আর একটিতে কমন্‌ওয়েল্‌থ ও অপরটিতে ভারতবর্ষ জয়লাভ করেছে। এই রকম যখন অবস্থা, তখন মাদ্রাজের টেষ্টের ওপর কোন্ দলের ভাগ্যে 'রাবার' জোটে সেটি নির্ভর করছিল বিশেষ ভাবে।

৫ম টেষ্টেও কমন্‌ওয়েল্‌থের অধিনায়ক লিভিংষ্টোন টসে ভারতবর্ষের অধিনায়ক বিজয় হাজারেকে পরাজিত ক'রে নিজ দলের ব্যাটিং করবার পথ প্রশস্ত করলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচের মধ্যে ভারতবর্ষকে চার বার টসে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।

কমন্‌ওয়েল্‌থের প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনা দেখে কারোও হিংসে করবার মত মনের অবস্থা হ'ল না। টপাটপ্ উইকেট পড়তে লাগ্‌ল। অধিনায়ক লিভিংষ্টোনের ভাগ্যে মস্ত বড় একটি গোল্লা লাভ হ'ল। ভারতবর্ষের বোলিং হ'তে লাগ্‌ল বন্দুকের গুলির মত মারাত্মক। বোম্বাইএর তরুণ উইকেট-কীপার নবাগত যোশী অপূর্ব্ব কৃতিত্বের সঙ্গে উইকেট রক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাট্‌স্‌ম্যান্ ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের বিরুদ্ধে ঘন ঘন বোলার পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও কিছুই করা গেল না। অনায়াস ভঙ্গীতে, অবলীলাক্রমে 'অন্ ড্রাইভ',

'গ্ল্যান্স', 'হুক্' আর 'লেট-কাটের' সাহায্যে তিনি রানের পর রান্ তুলে যেতে লাগলেন। কমন্‌ওয়েল্‌থের প্রথম ইনিংস যখন ৩২৪ রানে শেষ হ'ল, তখন দেখা গেল ওরেল একলাই প্রায় অর্দ্ধেক রান্ তুলে, ১৬১ রান্ ক'রে আউট হয়েছেন। ওরেলের পরে ম্যালের ৪৮ রানের কথা উল্লেখ করা চলে। বোলিংএ ফাদকার ৮৯ রানে ৪টি, বিজয় হাজারে ২৭ রানে ২টি, মানকড় ৩৭ রানে ১টি ও মোদী ৮ রানে ১টি উইকেট দখল করলেন।

ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসে ব্যাট ধরতে গেল। তাদের সূচনাও হ'ল বিপর্য্যয়মূলক। অল্প রানের মাথায় মোদী ও মুস্তাক প্যাভিলিয়নে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। এর পর অবশ্যি অধিনায়ক হাজারে ও ফাদকার খেলার গতির কিছুটা পরিবর্ত্তন সাধন করতে প্রয়াসী হ'ন, কিন্তু ফাদকার আউট হবার পরে আবার তাড়াতাড়ি উইকেট পড়তে শুরু করল। এক মাত্র কিষেণচাঁদ ছাড়া সকলকেই জর্জ ট্রাইবের বোলিং বেশ সমীহ ক'রে খেলতে হ'ল। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস যখন শেষ হ'ল তখন দেখা গেল তাদের রান্-সংখ্যা কমন্‌ওয়েল্‌থের প্রথম ইনিংস থেকে ১১ রান্ পিছিয়ে পড়ে রয়েছে। মোট হয়েছে ৩১৩। এর মধ্যে হাজারের ৭৭ রান্, কিষেণচাঁদের ৭২, ফাদকারের ৪০ আর অধিকারীর ২৯ রান্। বোলিংএ ট্রাইব ৯০ রানে ৪টি, ফিজ্‌মরিস্ ৪০ রানে ৩টি ও ওরেল ৩৬ রানে ১টি উইকেট দখল করেছেন।

দুই দলের প্রথম ইনিংস প্রায় সমসংখ্যক রানে শেষ হয়ে যাওয়ার দরুণ মাদ্রাজের তিরিশ হাজার দর্শকের মনে আশা জাগল খেলাটির হয়তো একটা মীমাংসা হবে। সে আশা আরও বর্দ্ধিত হ'ল যখন দেখা গেল কমন্‌ওয়েল্‌থের প্রথম দু'টি উইকেট নীরদ চৌধুরীর মারাত্মক বলে মাত্র ৪৫ রানে পড়ে গেছে। চতুর্থ দিনের শেষে ফাদকার নতুন বল নিয়ে রীতিমত বিপর্য্যয় আরম্ভ করলেন; ফলে সমগ্র দল ২৪৭ রানে কুপোকাৎ হয়ে গেল। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অপর্ব্ব ব্যাট্‌স্‌ম্যান্ জ্যাক্ হোল্ট রান্-সংখ্যা তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু সহযোগীদের কাছে আশানুরূপ সহযোগিতা না পাওয়ার দরুণ ৮৪ রানেই শেষ করতে বাধ্য হলেন—অবশ্যি অপরাজিত থেকে। অন্যান্য খেলোয়াড়দের মধ্যে বিল ম্যালের ৪০ আর ওরেলের ৩২ রান্‌ও উল্লেখ করা যেতে পারে। বোলিংএ ফাদকার ২৮ রানে ৩টি, চৌধুরী ৭০ রানে ৩টি, আর মানকড় ৫৭ রানে ২টি উইকেট দখল করলেন।

২৫৮ রান্ পেছনে পড়ে ভারতবর্ষ অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ব্যাট করতে নাম্‌ল। মুস্তাক তাঁর স্বভাবসুলভ দর্শনীয় ভঙ্গীতে রানের পর রান্ তুলতে লাগলেন, কিন্তু চতুর্থ দিনের শেষ অবস্থায় আঙ্গুলের হাড় ভেঙ্গে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হ'লেন। ফলে পঞ্চম দিনের গোড়ায় তিনি আর খেলায় যোগদান করলেন না; তাঁর স্থানে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদীয়মান খেলোয়াড় পলি উমরিগর যোগদান করলেন। হাজারের সঙ্গে তিনি জোর পিটিয়ে খেলতে শুরু করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হাজারে ৮৪ এবং উমরিগর ৫৯ রান্ ক'রে আউট্ হলেন। শেষের দিকে খেলায় তুমুল উত্তেজনা দেখা দিল। ভারতবর্ষের একটির পর একটি উইকেট পড়তে লাগল। এদিকে সময় কম, জিতবার জন্য প্রয়োজনীয় রান্-সংখ্যাও কম, আবার

খেলোয়াড়ের সংখ্যাও ফুরিয়ে আসছে! মুস্তাক আর চুপ্‌চাপ্ বসে থাকতে পারলেন না, দলের অবস্থা দেখে ভাঙ্গা আঙ্গুল নিয়েই ফিরে এলেন ব্যাট চালাতে। অধিকারী অপর দিকে সমানে পিটিয়ে যেতে লাগলেন। আরও চারটি রান্ দরকার, হাতে পনের মিনিট সময়, সাতজন আউট! দু'জনে দু'টো খুচরো রান্ তুললেন; তারপর মুস্তাক মারলেন জোর বাউণ্ডারী। জিতে গেল ভারতবর্ষ তিন উইকেটে! টসে হেরেও পেয়ে গেল রাবার! শেষ হয়ে গেল ভারতের ওয়াটারলু মাদ্রাজের চেপক মাঠে!

বিশু আর ঠাকুমা

ক্যাপ্‌টেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এস্-সি, এম্. বি

সন্ধ্যা হ'তেই বিশু গিয়ে ঠাকুমাকে পাকড়াও করল।—"কই ঠাকুমা, সেই যে বলেছিলে সেকালের গল্প আরও শোনাবে! এবারে বল।"

ঠাকুমা হাসতে হাসতে বললেন, "বলছি, বলছি, দাদুর আর তর সয় না! আচ্ছা, এর আগে পৌরাণিক এঞ্জিনীয়ারদের গল্প বলেছি, এবারে শোন সেকালকার বিজ্ঞানের গল্প। প্রথমেই ধর গঙ্গাজল। হাজার হাজার বছর ধরে গঙ্গা নদী ভারতের বুকের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। ওর জলকে হিন্দু মাত্রই অত্যন্ত পবিত্র ব'লে মনে করে। অবশ্যি তোমাদের ইউনিভার্সিটির দু'-একজন হালের পণ্ডিত হয়তো ঐ ময়লা জলকে অত সমীহ করেন না কিন্তু তাঁদের গুরু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কি বলেছেন জান? তাঁরা বলেছেন, গঙ্গাজল নাকি অদ্ভুত—আশ্চর্য্য পদার্থ! ইংল্যাণ্ডের এক বড় ডাক্তার সেদিন খবরের কাগজেও এই কথা লিখেছেন। যে সব জাহাজ কলকাতা থেকে বিলেতে আসে তারা কলকাতা থেকে গঙ্গার জল ভর্ত্তি করে নেয় সারা রাস্তায় খাবার জন্যে। সেই জল যখন বিলেতে পৌছয় তখন পর্য্যন্ত তা অবিকৃত অবস্থায় থাকে। তা'তে না হয় পোকা, না হয় কোন বিস্বাদ। কিন্তু বিলেত থেকে যে জল জাহাজে নেওয়া হয়, কলকাতায় যাবার পথে তাকে রাস্তায় তিন-চার বার বদলাতে হয়। একজন ফরাসী জীবাণুতত্ত্ববিদ্ বলেছেন যে কলেরা ও আমাশার বীজাণু গবেষণা-ঘরে তৈরী ক'রে তাতে গঙ্গাজল দিয়ে দেখা গেছে বীজাণুর বংশবৃদ্ধির পরিবর্ত্তে বীজাণু অনেক মরে গেছে। তা হ'লেই দেখছ, গঙ্গাজলের অদ্ভুত গুণ,—যাকে বলা হয়েছে 'পবিত্রতা', তা কত খাঁটী সত্য, আর কত হাজার হাজার বছর আগে এ দেশের পণ্ডিতেরা তা আবিষ্কার করেছিলেন!

"পরবর্ত্তী যুগে অশোকস্তম্ভের উন্নত ধরণের পালিশ, যা এত দীর্ঘ দিনেও ম্লান হয় নি, এবং

দিল্লীতে চন্দ্রবর্ম্মার লৌহস্তম্ভ, যাতে নাকি আজ পর্য্যন্ত একটু মরচে পড়ে নি, দেখে এ যুগের বিজ্ঞানীরাও অবাক্ হয়ে গেছেন।

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা পৃথিবীর বয়স আর ক্রমবিবর্ত্তন নিয়ে বহু গবেষণা ক'রে তার বিবরণ আমাদের শুনিয়েছেন। কিন্তু আমাদের অতি প্রাচীন কালের পুরাণ থেকে সংগ্রহ ক'রে কবি জয়দেব কয়েকটি শ্লোকের ভেতর দিয়ে পৃথিবীর ক্রমপরিবর্ত্তন কেমন সুন্দর ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর "দশ অবতার" স্তোত্রে! শ্রীকৃষ্ণ যেন এক এক যুগে, এক এক অবতার হয়ে জন্মেছেন, এমনি দশ বার। প্রথম অবতার মীন,—মানে মাছ। মাছ থাকে কোথায়? গভীর জলে। পৃথিবীর আদি ইতিহাস হচ্ছে জল—জল—জল, কেবল জল। ২য় অবতার—কূর্ম্ম,—মানে কচ্ছপ। কচ্ছপ উভচর,—থাকে ডাঙ্গায় আর অগভীর জলে। তখন মাটি হয়ে গেছে, তাই জলের গভীরতাও কমে গেছে। তৃতীয় অবতার—বরাহ বা শূকর। শূকর থাকে কাদার মধ্যে আর বনে। তখন পৃথিবীতে মাটি বেশ সৃষ্টি হয়ে গেছে, আর বনজঙ্গল ও বন্য পশুরও সৃষ্টি হয়েছে। চতুর্থ অবতার—নরসিংহ। অর্থাৎ অর্দ্ধেক মানুষ আর অর্দ্ধেক পশু। তখন মানুষের সৃষ্টি হয়েছে বটে কিন্তু তাদের প্রকৃতি পশুর মত, তারা বনে-জঙ্গলে, পর্ব্বতগুহায় বাসা বেঁধে থাকতে আরম্ভ করেছে। যাকে বলে প্রস্তর-যুগ। পঞ্চম অবতার—বামন। অর্থাৎ পশু-প্রকৃতি চলে গিয়ে অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। তখন বনজঙ্গল পরিষ্কার ক'রে দলবদ্ধ হয়ে মানুষ বসতি বিস্তার আরম্ভ করেছে। ষষ্ঠ অবতার—ভৃগুপতি। অর্থাৎ পরশুরাম—যিনি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন একুশ বার। তাঁর অস্ত্র ছিল কুঠার। তার মানে তখনকার দিনে লোকে লোহা দিয়ে অস্ত্র তৈরী করতে শিখেছে আর বেঁচে থাকবার জন্যে, আপনাদের প্রভুত্ব বজায় রাখবার জন্যে, মারামারি কাটাকাটি করে কাটিয়েছে। এ এক অশান্তির যুগ বলতে পার—যাকে বলে লৌহ যুগ। সপ্তম অবতার—রাম। কথায় বলে রাম-রাজত্ব। তখন পৃথিবীতে মারামারি, কাটাকাটি থেমে গিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এটা মানব-সভ্যতার আদি যুগ। অষ্টম অবতার—হলধর, মানে চাষী। অর্থাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠার পর দেশের সমৃদ্ধির যুগ,—কৃষি ও অন্যান্য শিল্পের যুগ। মানব সভ্যতার পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে তখন। নবম অবতার—বুদ্ধ। অর্থাৎ যখনই দেশে চরম শান্তি বিরাজিত তখনই হয় মহা মহা পণ্ডিতের আবির্ভাব। সাহিত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি নানান্ জ্ঞানের আলোক উদ্ভাসিত হবার যুগ। দশম অবতার—কল্কী। অর্থাৎ আমাদের বর্ত্তমান যুগ।—বিজ্ঞানের যুগ—যন্ত্রের যুগ। বিজ্ঞান যখন প্রাণবন্ত করবে এই সব যন্ত্রদানবকে তখন আসবে এক বিরাট সংঘর্ষ। এই সভ্যতা নষ্ট হয়ে গিয়ে তখন নতুন এক সভ্যতার যুগের সৃষ্টি হবে। এই যে বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার, পুরাণ-কাহিনী অর্থাৎ তোমাদের মতে 'নিছক গল্পের' মধ্যে থেকেই পৃথিবীর সকলে তা পাচ্ছে। তাই ত' পণ্ডিতেরা বলেছেন, 'যা নাই ভারতে, তা নাই ভূভারতে'।"

"আচ্ছা ঠাকুমা", বিশু হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, "তুমি ত' চশমা ছাড়া এখনও বেশ পড়তে পার! বাবা কিন্তু তা পারেন না। আর আমার চোখে ত' চশমা উঠেছে কত আগে! তা হবেই ত'। তোমাদের যুগে তোমরা কেমন ভাল ভাল খাঁটি জিনিষ খেয়ে

এসেছ, আর আমরা খাই কিনা কাঁকর-ওয়ালা চাল আর তেঁতুল-বীচি আর পাথরের গুঁড়ো-মেশান আটা। দুধ-ঘি ত' আমরা চোখেই দেখি না। তোমরা যে কথায় কথায় বল 'তোদের বয়সে লোহা খেয়ে হজম করেছি' সেটা কিন্তু ডাহা গাঁজাখুরি কথা। সে কথা আমরা বরঞ্চ বল্‌তে পারি—'আমরা পাথর খেয়ে হজম করি'।"

ঠাকুমা—"সত্যি, তোমরা তা বল্‌তে পার। আর ঐ যে বল্লে চশমার কথা, এটাও খাওয়ার উপরে কতকটা নির্ভর করে সত্যি। চোখ দু'টোও শরীরেরই অঙ্গ বিশেষ, আর শরীরটা একটা বিরাট যন্ত্র। যন্ত্রকে ঠিক কার্য্যকরী অবস্থায় রাখতে গেলে তার ভাল আহার চাই, তবে ত' সে শক্তি উৎপাদন করবে! আবার সে শক্তিকে কাজে লাগাতে হ'লে তাকে নিয়মিত ও পরিমিত খাটাতেও হবে। বন্ধ ক'রে রাখলে বা কম খাটালে যন্ত্রে জং ধরে। তেমনি আমাদের এই শরীর-যন্ত্রকেও কার্য্যকরী অবস্থায় রাখতে গেলে তাকে ভাল জিনিষ খাওয়াতে হবে। আর কার্য্যশক্তি বাড়াতে গেলে প্রতিটি অঙ্গকে নিয়মিত পরিচালনা করতে হবে—পরিশ্রম করতে হবে, শুধু ভাল খেলেই হবে না।"

বিশু—"তা ত' দেখতেই পাচ্ছি। আমাদের স্কুলের বড়লোকদের ছেলেদেরও ত' চোখে চশমা আছে। তারা আমাদের চেয়ে খায়ও ভাল, আর পরিশ্রম যে কি করে জানি না। কিন্তু দেখি ত' মোটরে চড়েই ঘুরে বেড়ায়। আর আমরা ভাল খাবার পাই না অথচ হাঁটা-হাঁটির ত' কম নেই! পরিশ্রম হয়ত অপরিমিত ক'রে বসি। তাই বুঝি আমাদের চোখের শক্তি কমে যায়?"

ঠাকুমা—"আচ্ছা বিশু, যন্ত্রকে কেবল খাওয়ালে আর নিয়মিত কাজ করালেই কি তার কর্ম্মশক্তি ঠিক থাকে? তা ত' নয়! তার যে চালক তার ওপর নির্ভর করে যন্ত্রের কর্ম্মশক্তির বিকাশ। চালককে জানতে হবে কখন তেল দিতে হবে, কখন কত জোরে চালাতে হবে। সেই-ই বসে বসে কল-কাঠি নাড়ছে আর বিরাট যন্ত্র ঠিক মত চলছে। আনাড়ির হাতে পড়লেই যন্ত্র খারাপ হ'তে আরম্ভ করে। তেমনি আমাদের দেহ-যন্ত্রকে চালাচ্ছে মন। মনের খামখেয়ালির ওপরেই আমাদের দেহযন্ত্রের ঠিক চলা, না চলা নির্ভর করছে। মন যখন ভাল থাকে না তখন শরীরও যে খারাপ হয় এ ব্যাপার নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ? আর চোখ তো শরীরেই অঙ্গ!

"আমাদের যুগে দিন কাটত খুব সাধারণ ভাবে। তাই মানসিক বিকৃতি হ'ত কম। আজকালকার মত এত সমস্যা ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, যতই আমরা ধাপে ধাপে সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাব ততই চশমাধারীর আধিক্য হয়ে পড়বে। এখনই দেখ না, গ্রামের ছেলেরা তোমাদের মত এতটা সভ্যতার আলোক পায় নি, তাই চশমার প্রাবল্য তাদের মধ্যে খুব কম, তোমাদের অনুপাতে। মনকে সংযত, শক্ত রাখতে পারলে এর হাত থেকে অনেকটা রেহাই পাওয়া যায়। আমাদের পুরাণে সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে।"

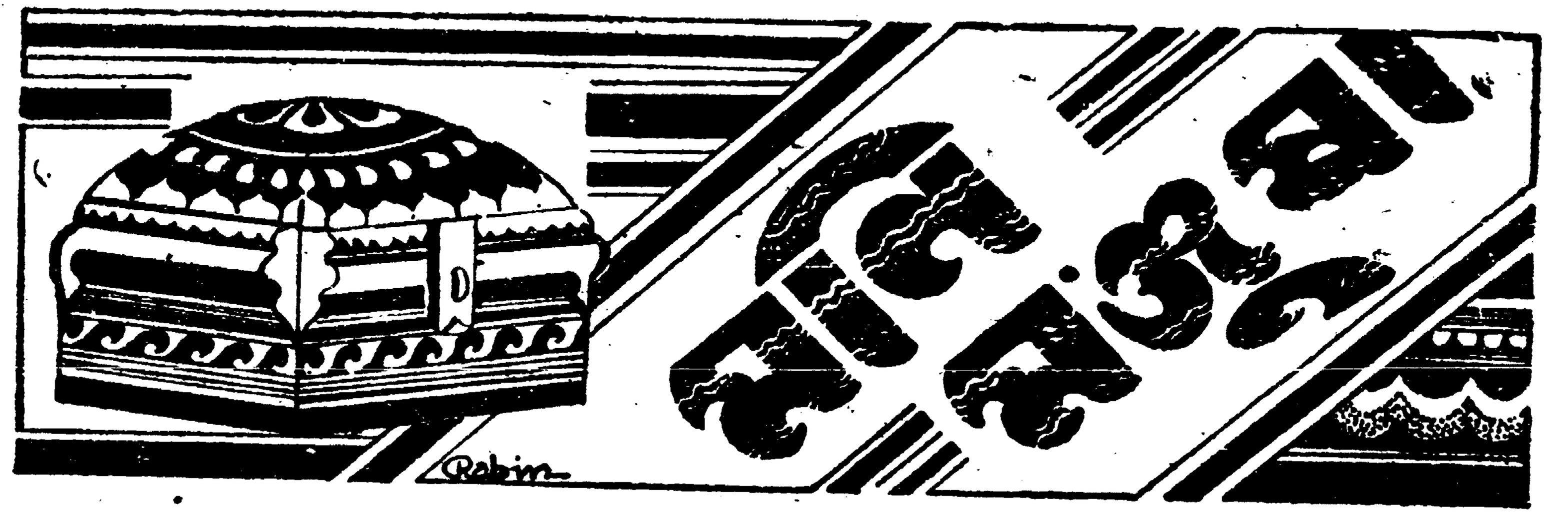

ফেয়ারী-কুইন

'ফেয়ারী কুইন' একখানি বিখ্যাত ইংরেজী কাব্য। ঠিক কাব্য না ব'লে কবিতায় লেখা গল্প-সমষ্টি বলা যেতে পারে। এর প্রত্যেকটি গল্পই রূপক। এখানে তার একটি গল্পের সারাংশ দেওয়া হ'ল। এই বইএর লেখক হচ্ছেন বিখ্যাত কবি এডমণ্ড্ স্পেন্সার। ইনি ১৬শ শতাব্দীর লোক।

গ্লোরিয়ানা ছিলেন পরীদের রাণী। একদিন রাণী সভায় বসে আছেন, এমন সময়ে পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে এসে সেখানে হাজির হ'ল। মেয়েটির নাম ইউনা, সে এক দেশের রাজকুমারী। কিন্তু রাজকুমারী হয়েও তার মনে সুখ নেই; কারণ এক দুরন্ত দৈত্য এসে তার বাপের রাজ্য ধ্বংস ক'রে ফেলেছে, দৈত্যের ভয়ে তার বাবা-মা দুর্গের ভিতর থেকে বেরোতে পারছেন না। আসলে এই ইউনা হচ্ছে সত্যের প্রতীক্।

ইউনা গ্লোরিয়ানার কাছে এসেছে একজন বীর পুরুষের সন্ধানে—যে নাকি ঐ দৈত্যকে বধ ক'রে তার বাপের রাজ্য উদ্ধার করতে সাহায্য করবে।

গ্লোরিয়ানা তার সঙ্গে একজন অল্পবয়স্ক নাইটকে (বীর পুরুষ) দিয়ে দিলেন। এই ছেলেটির নাম হচ্ছে জর্জ্জ। জর্জ্জের হাতে সব সময় থাকত একটা ঢাল—তাতে লাল ক্রস্ চিহ্ন। এইজন্য তাকে সবাই বল্‌ত 'রেড ক্রস্ নাইট্'। আসলে জর্জ্জ হচ্ছে ধর্ম্মের প্রতীক্।

জর্জ্জ ইউনার সঙ্গে রওনা হ'ল দৈত্যের সন্ধানে, কিন্তু বনের পথে যেতে যেতে হঠাৎ তারা পথ হারিয়ে ফেল্‌ল। ঘুরতে ঘুরতে শেষে তারা একটা গুহা দেখতে পেল। ঐ গুহার মধ্যে বাস করত এক দৈত্য—তার নাম হচ্ছে 'এরর্' অর্থাৎ 'ভুল'। ইউনা তা জানতে পেরে জর্জ্জকে ওর ভিতর ঢুকতে নিষেধ করল, কিন্তু জর্জ্জ তা না মেনে ইউনাকে নানা কথায় ভুলিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে

পড়্‌ল। 'ভুল' দৈত্যও সুযোগ বুঝে এক বিকটাকার ড্রাগনের রূপ ধরে তাকে আক্রমণ কর্‌ল। বাধল ভীষণ লড়াই। ইউনা জর্জ্জকে উৎসাহ দিতে লাগ্‌ল। অবশেষে বহুক্ষণ যুদ্ধের পর জর্জ্জ ড্রাগনের মাথা কেটে ফেল্‌ল।

গুহা থেকে মুক্তিলাভ ক'রে আবার দু'জনে চল্‌ল পথ খুঁজতে খুঁজতে। হঠাৎ দেখা গেল সামনে একজন বুড়ো সন্ন্যাসী আসছে। সন্ন্যাসী সব কথা শুনে বললে, 'এই বনের মধ্যে এখন কোথায় যাবে, তার চেয়ে আমার বাড়ী চল, সেখানে খাওয়া-দাওয়া ক'রে বিশ্রাম করবে।' ইউনা ও জর্জ্জ খুসী হয়ে সন্ন্যাসীর বাড়ী চল্‌ল। এদিকে, সন্ন্যাসীটি কিন্তু আসলে মোটেই সন্ন্যাসী নয়—সে হচ্ছে এক যাদুকর সয়তান, তার নাম আর্কিমেগো। তার উদ্দেশ্য কোন রকমে ওদের দু'জনকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আলাদা ক'রে দেওয়া।

যাদুকর আর্কিমেগো সেই রাত্রে জর্জ্জকে স্বপ্ন দেখাল—ইউনা অত্যন্ত মন্দ প্রকৃতির মেয়ে, জর্জ্জকে বিপদে ফেলাই তার উদ্দেশ্য। জর্জ্জ স্বপ্ন বিশ্বাস কর্‌ল এবং ইউনাকে না জাগিয়েই সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

অজানা বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে জর্জ্জের সঙ্গে দেখা হ'ল আর একজন নাইটের। আসলে সে হচ্ছে 'ফেথ্‌লেস্' অর্থাৎ অবিশ্বাসী। এই নাইটটির সঙ্গেও ছিল একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে।

দেখতে দেখতে নতুন নাইটের সঙ্গে রেড ক্রস্ নাইটের লড়াই বেধে গেল। কিন্তু একটু পরেই জর্জ্জ নতুন নাইটকে হারিয়ে দিয়ে মেরে ফেল্‌ল। তার সঙ্গিনী মেয়েটি তখন ঘোড়ায় চড়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাতে লাগ্‌ল। কিন্তু জর্জ্জ তাকে ছাড়বে না, মেয়েটিকে তার ভারী পছন্দ হয়েছে। একটু পরেই সে তাকে ধরে ফেল্‌ল।

মেয়েটী বল্‌ল, "আমার নাম 'ফেথ'—বিশ্বাস। আমি আগে এই নাইটকে জানতাম না। ও আমার সঙ্গীকে মেরে আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে।"

মেয়েটীর সঙ্গে জর্জ্জের বেশ ভাব হয়ে গেল। মেয়েটী তাকে একটী সুন্দর রাজবাড়ীতে নিয়ে হাজির কর্‌ল।

এখন, এ মেয়েটীও কিন্তু সত্যি কথা বলে নি। সে মোটেই 'বিশ্বাস' নয়, সে হচ্ছে 'ফল্‌স্‌হুড্'—অর্থাৎ 'মিথ্যা'। জর্জ্জকে ভুলিয়ে সে যে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসেছে সেটা হচ্ছে অহঙ্কারের রাণীর বাড়ী। এই রাণীর অহঙ্কার ছিল অসম্ভব। তার ধারণা, পৃথিবীতে তার মত সুন্দরী বুঝি নেই। তাই রাত-দিন সে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপ দেখত আর নিজেই মুগ্ধ হ'ত।

এই রাজপ্রাসাদে জর্জ্জের সাক্ষাৎ হ'ল 'জয়লেস্' বা 'নিরানন্দের' সঙ্গে। সে হচ্ছে অবিশ্বাসী নাইটের ছোট ভাই। দেখতে দেখতে জর্জ্জের সঙ্গে তারও যুদ্ধ বেধে গেল। যুদ্ধে অবশ্যি জর্জ্জই জিতল কিন্তু নিরানন্দকে মারবার আগেই 'মিথ্যা' এসে সেখানে কালো মেঘ ছড়িয়ে দিল। নিরানন্দ তার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে কোন রকমে রক্ষা পেল। সেই রাত্রেই জর্জ্জ তার বামন ভৃত্যের কাছে জানতে পারল জায়গাটার স্বরূপ। সে আর দেরী না ক'রে চট্‌পট্ সেখান থেকে পালিয়ে এল। অহঙ্কারের প্রাসাদ কি রকম বাজে মালমশলা দিয়ে তৈরী তাও তার চোখে ধরা পড়ে গেল।

কিন্তু মিথ্যার মোহ কাটিয়ে এলেও মিথ্যা তাকে ছাড়তে রাজী নয়। জর্জ্জ একটা নদীর ধারে ব'সে বিশ্রাম করছিল, এমন সময় মায়াবিনী মিথ্যা একটা ঝরণা সেজে কুলকুল ক'রে তার সামনে দিয়ে বয়ে যেতে লাগ্‌ল। পরিশ্রান্ত জর্জ্জ্ কিছু না বুঝে অঞ্জলি ভরে সেই ঝরণার জল পান কর্‌ল।

যেই জল খাওয়া অমনি তার বিষময় ফল ফল্‌ল। জর্জ্জের দেহ অবসন্ন হয়ে পড়্‌ল, দাঁড়াবার ক্ষমতাও নেই যেন! ঢাল আর বর্ম্ম খুলে এক পাশে রেখে সে সেখানেই শুয়ে পড়্‌ল। ঠিক সেই সময় সেখানে এসে হাজির হ'ল এক কুৎসিৎ চেহারার দৈত্য। সে হচ্ছে 'সিন্' অর্থাৎ 'পাপ'। জর্জ্জ তখন এত দুর্ব্বল যে পাপের সঙ্গে যুদ্ধ করার সামর্থ্য তার নেই। এদিকে মিথ্যা এসে পাপকে জর্জ্জের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগ্‌ল। পাপ জর্জ্জকে সহজেই বেঁধে ফেলে নিয়ে গেল তার দুর্গে। সেখানে অন্ধকার কারা-কক্ষে জর্জ্জ বন্দী হয়ে রইল।

এদিকে ইউনা যখন ঘুম থেকে উঠে দেখল তার রেড ক্রস্ নাইট্ তাকে না ব'লেই চলে গেছে তখন তার মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সে মনের দুঃখে পাগলের মত জর্জ্জের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। কিন্তু কোথায় পাবে সন্ধান? শেষে রাত হ'লে সে পরিশ্রান্ত হয়ে একটা গাছের তলায় শুয়ে পড়ল।

হঠাৎ সেখানে হাজির হ'ল এক বিকটকায় সিংহ। কিন্তু এমনি ছিল ইউনার লাবণ্য যে সিংহ পর্য্যন্ত তা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারল না। ইউনার কোন অপকার করা দূরে থাক্, উল্টে সে মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে পড়্‌ল তার অনুচর। এর পর থেকে এই সিংহই সারারাত ইউনাকে পাহারা দিয়ে বিপদ্-আপদ্ থেকে রক্ষা করতে লাগ্‌ল।

ইউনা রেড ক্রস্ নাইটের খোঁজে ঘুরছে, হঠাৎ দেখতে পেল নাইট

তারই দিকে আসছে। তার হ'ল ভীষণ আনন্দ। সে খুসী মনে তার কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু আসল রেড ক্রস্ নাইট তো পাপের দুর্গে বন্দী হয়ে আছে, ইউনা যাকে জর্জ্জ ব'লে মনে করেছে সে আর কেউ নয়—সয়তান যাদুকর আর্কিমেগো। ইউনা তা বুঝতে পারল না।

কিন্তু বেশীক্ষণ এ ভাবে চল্‌ল না। হঠাৎ সামনে উদয় হ'ল আর একজন নাইট। এ হচ্ছে 'ল-লেস্' অর্থাৎ 'আইন-দ্রোহী',—অবিশ্বাসী এবং নিরানন্দের আর এক ভাই।

আইন-দ্রোহী রেড ক্রস্-বেশী আর্কিমেগোকে আক্রমণ করল। আর্কিমেগো ঘোড়া থেকে পড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার হেলমেট গেল খসে। এবার আর ইউনার তাকে চিনতে দেরী হ'ল না। যাই হোক, আর্কিমেগো এই যুদ্ধে প্রাণ হারাল। কিন্তু ইউনাও রক্ষা পেল না, আইন-দ্রোহী তাকে গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে টেনে নিয়ে চল্‌ল।

সেই বনে বাস করত ছোট ছোট বামনের দল। ইউনার কাতর চীৎকারে তারা ছুটে এল তার সাহায্যের জন্য। তাদের দেখে আইন-দ্রোহী ভয়ে পালিয়ে গেল। ইউনা সেই বনে বামনদের সঙ্গে বাস করতে লাগ্‌ল।

এদিকে, সেই যে বামন ভৃত্য, যে নাকি জর্জ্জকে অহঙ্কারের রাণীর বাড়ীর খবর দিয়েছিল, একদিন সে এসে সেখানে হাজির। তার সঙ্গে রয়েছে জর্জ্জের ঘোড়া, পরিত্যক্ত বর্ম্ম আর ক্রস-আঁকা ঢাল। তাকে সেই অবস্থায় দেখেই ইউনা ভাবল তবে বুঝি জর্জ্জ আর বেঁচে নেই। সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

জ্ঞান হ'লে বামন তাকে জানাল আসলে ব্যাপারটা তা নয়। জর্জ্জ মরে নি, সে পাপের দুর্গে বন্দী হয়ে আছে।

ইউনার তখন এক চিন্তা, কি ক'রে সে জর্জ্জকে পাপের হাত থেকে উদ্ধার করবে। এমন সময় হঠাৎ সেখানে হাজির হ'লেন প্রিন্স আর্থার,—যিনি নাকি বীরত্বের জন্য সে যুগে অসম্ভব খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। ইউনার কাছে সব শুনে আর্থার চললেন পাপের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। আর্থারকে দেখেই পাপ হুঙ্কার দিয়ে লাঠি নিয়ে তেড়ে এল, আর আর একটা দৈত্যের কাঁধে চেপে সঙ্গে এল মায়াবিনী মিথ্যা। আর্থারের কৌশলে পাপের লাঠি ফসকে গেল, আর্থারও সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের এক কোপে তার একখানা হাত কেটে ফেললেন। তখন মিথ্যার বাহন সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যটিও এল তেড়ে। কিন্তু আর্থারের অনুচর

তাকে আটকে দিল। কিন্তু মিথ্যা তার গায়ে খানিকটা বিষ ছড়িয়ে দিতে সেও মাটীতে লুটিয়ে পড়ল। এদিকে পাপ ততক্ষণে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে এবং কাটা হাত নিয়েই আর্থারকে আক্রর্মণ ক'রে বসেছে। আর্থার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঢালের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা মণি। সেই মণির দিকে চোখ পড়তেই পাপ আর তার সঙ্গী দৈত্যের চোখ ঝলসে অন্ধ হয়ে গেল। আর্থার সহজেই তাদের কেটে ফেললেন। মিথ্যার ছদ্মবেশও এইবার খসে পড়ল। দেখা গেল—আসলে সে মোটেই সুন্দরী নয় —অতি কদাকার, রোগা—কঙ্কালসার তার চেহারা! দেখলেই গা ঘিন্ ঘিন্ করে। তার আসল চেহারা দেখে জর্জ্জের মোহও ঘুচে গেল।

এর পর জর্জ্জ মুক্তি পেয়ে ইউনার সঙ্গে তার পিতৃরাজ্যে গিয়ে হাজির হ'ল এবং সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যকে যুদ্ধে হারিয়ে বধ ক'রে ইউনার বাবার রাজ্য উদ্ধার ক'রে দিল। রাজ্যের সুখ-শান্তি আবার এল ফিরে। আর ইউনার সঙ্গে রেড ক্রস্ নাইটের বিয়ে হ'য়ে গেল।

দলের লোকদের বলো

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

বিছানায় বসে সকালের চায়ের পেয়ালা সবে মুখে তুলছি, রাজেন এলো লাফাতে লাফাতে। একটা চিরকুট হাতে ক'রে।

"আজ রাত্তিরে আমাদের ব্যাঙ্ক লুট হবে।" হাঁফাতে হাঁফাতে বল্লে।

পেয়ালার চা চল্‌কে উঠলো, চাদরের ওপর পড়ে গেল খানিক,—কিন্তু আমি বিচলিত হলাম না।

এই বার্ত্তা ওর আরেক বার্ত্তালা বলে আমার মনে হোলো। রোজ নতুন নতুন গুজব নিয়ে আসা কাজ ছিল রাজেনের। ও ছিল রাজা ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চী, আর আমি ছিলাম সেখানকার এক কেরাণী। কাজটা ওই জুটিয়ে দিয়েছিল আমাকে।

আফিস যাবার পথে, আমার বরাত, রোজই ওর বকুনি শুনতে হোতো আমায়। এমনও হয়েছে, ওর নাম ভুলে গিয়ে, রাজেন না ব'লে গজেন বলে ডেকে বসেছি ওকে—ওর গজগজানিতেই। ওর গজালি শুনে শুনে কান রপ্ত ছিল আমার। সেই সব রপ্তানির পর ফের আরেক নতুন আমদানি—এই আমার মনে হোলো।

"জানি আমি।" আমি বল্লাম: "আজকের কাগজেই পড়লাম তো। লুঠের বিশদ বর্ণনা দিয়েছে। একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ।"

"যাও, বোকার মতো বোকো না বাজে। খবর-কাগজে পড়বে কাল। কালকের কাগজে সব। আর তার সমস্ত খবর আছে এই—"

এই ব'লে সে তার হাতের চিরকুটখানা নাড়তে লাগলো—"এই আমার হাতের কাগজে।"

আমি চিরকুটটার দিকে ভিরকুটি করি।

"আমি আসছিলাম তোমার বাসায়," তার-স্বরে বলতে লাগলো সে: "এই কাগজের টুক্‌রোটা উড়তে উড়তে এসে পড়লো আমার মুখের ওপর। কোথ থেকে এলো কে জানে! আমি মুখ থেকে সরিয়ে ফেলতে যাচ্ছি, এমন সময়ে হঠাৎ আমার চোখে পড়লো কী যেন লেখা। পড়ে দ্যাখো না। পড়লেই টের পাবে।"

পড়ে দেখলাম। কাগজটার এক কোণে পেন্‌সিলের লেখা আঁচড়ে:

"রাজা ব্যাঙ্ক। ৩-৩০, দলের সবাইকে বলো।"

"বুঝলে এবার?..." রাজেনের ধারাবাহিক বিবৃতি সুরু হয় ফের: "দলের যে সর্দার সে-ই এই চিরকুট পাঠিয়েছিলো তার সাকৃরেদের কাছে—দলের সবাইকে খবরটা দেবার জন্যে। খুব সম্ভব সাকৃরেদ্ দোতলা-বাসে হাওয়া খেতে খেতে যাচ্ছিল—মনে হয়, দলের লোকদের আড্ডায় গিয়ে জানাতেই—এমন সময়ে কি ক'রে তার হাত ফস্‌কে—হাওয়ার চোটেই হবে হয়ত বা—বাসের দোতলায় কি রকম জোরালো হাওয়া জানো তো?—কাগজখানা উড়তে উড়তে আমার মুখের ওপর এসে পড়ে...আর আমার নাকে লেগে আটকে যায়..."

"তার পরের খবর আমার জানা। তোমাকে আর বিস্তৃত করে বলতে হবে না।" আমি জানালাম।

"তোমার জানা? ছাই জানা তোমার!" রাজেন যেন লাফিয়ে ওঠে: "তুমি জানো কচু! তারপরের খবর হচ্ছে, এই চিরকুট নিয়ে আপিসে গিয়ে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে আমি দেখাব। তিনি পুলিসে খবর দেবেন। পুলিস এসে যথাসময়ে লুঠেরাদের হাতেনাতে পাকৃড়াবে। দুর্দ্দান্ত দস্যুদের ধরিয়ে দেবার জন্যে সরকার থেকে আমি মোটা রকম পুরস্কার মারবো। আর ব্যাঙ্কে? ব্যাঙ্কে আমার বড় চাকরী হবে। চাই কি, এইজন্যেই হয়ত আমি সাব্-অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট ম্যানেজারের কাজটা পেয়ে যেতে পারি। সাতশো টাকা মাইনে হবে আমার।"

"খুব ডিটেকটিভ বই পড়ছো বুঝি আজকাল?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"ডিটেকটিভ বই পড়ার সঙ্গে এর কী?" রাজেন আমার প্রশ্নের পাশ কাটায়—"এ ছাড়া এই চিরকুটের আর কী মানে হতে পারে শুনি?"

কী মানে হতে পারে? মনে মনে ভাবি খানিক। কিন্তু শক্ত শক্ত কথার মানে কোনদিনই আমার মাথায় আসে না। আমি মাথা চুলকাই। অভিধানেও যে এর মানে মিলবে তা আমার মনে হয় না। মাথা চুলকে আমি বলি—"লুঠের কথা এই চিরকুটের

কোথায় আছে বল দেখি? সামান্য একটু বুদ্ধি খেলালেই বুঝতে পারতে, জনকয়েক লোক এমনি সখ ক'রে ব্যাঙ্কে এসে মিলতে চাইছে—এই তো!"

"তিনটে ত্রিশে? আজ শনিবার না? ব্যাঙ্ক বন্ধ না তখন? তখন বুঝি ব্যাঙ্ক খোলা থাকে বাইরের লোকের জন্যে? আর, কোনো ব্যাঙ্ক বুঝি সাধারণের মিলন-স্থান?"

"তা হ'লে তারা ব্যাঙ্কের বাইরেই এসে মিশবে।" আমি বলি। —"এ ছাড়া কী?"

"ব্যাঙ্কের বাইরে এসে মিশবে? কিন্তু কেন শুনি? তার কারণ কী, তা আমি জানতে পারি? শনিবারের বাজার আজ! তখন আপিস দপ্তর বন্ধ সব। ক্লাইব ষ্ট্রীটের তিন সীমানায়ও কোনো সিনেমা হাউস্ নেই যে তারা বায়স্কোপ দেখার জন্য জুটবে! তা ছাড়া, থাকলেও তিনটে ত্রিশে ম্যাটিনি শো সুরু হয়ে যেতো তখন। আমাদের ব্যাঙ্কের সামনে কোনো বাস্ ষ্টপ্ নেই যে বাসের জন্য এসে দাঁড়াবে। অবশ্য এটা খুব দুঃখের বিষয় ক্লাইব ষ্ট্রীট দিয়ে এখনো কোনো বাস্ যায় না..."

ওর কথাগুলো আমার মনে লাগে। বিশেষ ক'রে কোনো বাস্ না যাবার কথাটা।

"......তারপর দল! দলের কথা কেন হে? দলের সবাইকে বলো—এ কেমন কথা? খবরের কাগজে দলাদলির কথা থাকে আমি মানি। কিন্তু তা নিয়ে আমি কিছু মনে করি না। তবে কিনা, এই সামান্য চিরকুটে দলের কথা থাকলেই সন্দেহ জাগে। মনে হয় মিলন-স্থান ওদের ব্যাঙ্কই বটে কিন্তু মিলন-লগ্নটা বিকেলে না, রাত্তিরের তিনটে ত্রিশ। আর রাতের শেষ পহরে কোন্ ধরণের ওস্তাদরা ব্যাঙ্কের কাছে এসে মিলতে চায়, ভেবে দ্যাখো!"

আমি ভেবে দেখি। ইদানীং এ তল্লাটে ছোটখাট রাহাজানি হচ্ছিল বটে, কিন্তু তাই বলে রাজা ব্যাঙ্কের হানি হবে তা ভাবা যায় না। ব্যাঙ্ক লোটা কি এতই সোজা? আজ রাত্তিরেই যে কেন ঐ কাণ্ড ঘটতে যাবে তা ভাবতে পারি না। কাল কিম্বা পরশু রাত্তিরেও তো হতে পারে! তিনটে ত্রিশ কিছু আজকের রাত্রেরই একচেটে নয়। কথাটা বলি রাজেনকে।

"হ্যাঁ, ওটা একটা কথা বটে।" সে আমার কথাটা মানে: "কিন্তু বাপু, ব্যাঙ্ক লুটের মত কাজ হঠাৎ কিছু ঝপ্ ক'রে হয় না। অনেকদিন ধরে ফন্দী ক'রে, প্ল্যান এঁটে, অনেক আট ঘাট বেঁধে সমস্ত ঠিক করা হয়। এসব করে দলের পাণ্ডা। তারপর সব কিছু ঠিক-ঠাক হয়ে গেলে তখন জানানো হয় দলের লোকদের—একেবারে চরম মুহূর্তে। কেননা আগে থেকে তাদের জানালে তারা গল্পগুজবে বাইরের লোকের কাছে বেফাঁস করে বসতে পারে। তার থেকেই আমার ধারণা......"

কিন্তু তখনো-আমার বিশ্বাস হয় না। এমন কি, এও আমার মনে হয়, ঐ চিরকুট, পেন্সিলের লেখা আর ঐ কাহিনী ও বানিয়ে এনেছে—আজ সকালে আমাকে ফলাও ক'রে বলার জন্যেই!

কিন্তু আপিসে গিয়ে ধারণা আমার টলে গেল। খবর পেলাম প্রচুর টাকা এসে পড়েছে ব্যাঙ্কে, অন্যান্য ব্যাঙ্কে পাচার হবার জন্যে। কিন্তু সোমবারের আগে সে-টাকা স্থানান্তরিত হবার নয়।

যাও বা সন্দেহ ছিল আমার, এই যোগাযোগ দেখে দূর হোলো। দুয়ে দুয়ে যোগ করে যেমন চার মেলে তেমনিই যেন রাজেনের সমাচার মিলে গেল। রাজা ব্যাঙ্কে, আমি নই, আরেকজন রাজা হতে চললে স্বভাবতঃই ভালো লাগবার কথা নয়, তা হ'লেও রাজেনকে গিয়ে মুক্তকণ্ঠে আমার অভিনন্দন জানালাম।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।" উদার ভাবে ও হাসলো: "তোমার প্রতিবাদে আমি কিছু মনে করিনি। হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না। সবার মাথা কিছু সমান নয়।"

লজ্জিত হয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে চলে এলাম। চলে এলাম আমার নিজের টেবিলে। চড় খেয়ে ফিরে নিজের চরখায় মন দিলাম।

কাজ করতে করতে আমার মাথা ঘামে। পুলিশ এসে ডাকাতদের কেমন করে পাকড়াবে তাই ভাবি। ব্যাঙ্কের মালখানার মধ্যে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকবে নাকি? যেই না ওরা সিঁধ কেটে, কিম্বা দরজার তালা ভেঙে, গিয়ে সেঁধুবে অমনি খপ্ করে একেবারে, যাকে বলে, হাতে নাতে গেরেপ্তার? অথবা, হয়তো তারা ব্যাঙ্কের বাইরেই কোথাও-গা ঢাকা দিয়ে ওৎ পেতে থাকবে। লোকগুলো এসে লুঠ ক'রে চলে যাবার পর তাদের পিছু পিছু ফলো করে আড্ডায় গিয়ে হানা দেবে। বামাল সমেত সবাইকে এক সঙ্গে...? যাকে, ফলাও করে বলা চলে, ফলোয়েন পরিচিয়তে!

ভাবতে ভাবতে আমার যেন কী হয়! তারপর থেকে যাকেই দেখি তাকেই আমার সন্দেহ লাগে। যারাই চেক ভাঙাতে কি টাকা জমা দিতে আসে, আমার মনে হয়, এক একটি পাকা বদমায়েস! কারো হাবভাব চালচলন সুবিধের মনে হয় না। চেহারাগুলোও যেন কেমন! ঠিক চোর ডাকাতদের যেমন হয়ে থাকে। লুঠেরাদের চরই যেন চোরগুণ্ডা ঘুরছে চারদিকে—আসছে যাচ্ছে ব্যাঙ্কের অন্ধিসন্ধির খবর নেবার তালে।

টিফিনের সময় পাঁউরুটিতে কামড় দেবার ফাঁকে পাশের একজনের খবরের কাগজে আমার নজর পড়ল। কাগজের এক জায়গায় কালি দিয়ে দাগ মারা একটা কথা—

রাজা ব্যাঙ্ক ৩.৩০

চৌকো চৌহদ্দির মধ্যে চৌকস্ খবরটা জল্জল্ করছে ছাপার অক্ষরে। চোখ পড়লো আমার।

কাগজের সেটা ঘোড়ার পাতা—যেখানে শনিবারের ঘোড়দৌড়-খেলার খবর থাকে। রাজা ব্যাঙ্ক নামক ঘোড়াটা সেদিন সাড়ে তিনটেয় দৌড়চ্ছে।

"রাজা ব্যাঙ্কের জানো কিছু?" জিজ্ঞেস করলাম লোকটাকে। "খবর রাখো কোনো?"

"ওটা বাজি মারার ঘোড়া। নির্ঘাৎ জিতবে আজ।"

কাগজের কোণাটা ছিঁড়ে নিয়ে ছুটলাম রাজেনের খোঁজে।—"ওহে, শোনো শোনো। তুমি কি ম্যানেজারকে বলেছো নাকি কথাটা?"

"না, বলিনি এখনো। এইবার বলব। তাঁর লাঞ্চ আগে শেষ হোক।"

"তা হলে আর বোলো না। এই দ্যাখো।"—আমার হাতের টুক্‌রোটা ওকে দিলাম: "খুব বেঁচে গেছো। আর একটু হলেই সকলের উপহাসের পাত্র হতে। ঠাট্টা করতো তোমায় সবাই। এমন কি, পুলিসরাও।"

বলেই আমি ভ্রম সংশোধন করি: "উঁহু, পুলিশরা ঠাট্টা করে না। ঠাট্টা করার পাত্র না তারা। ডাকাত ধরতে এসে না পেলে উলটে তোমাকেই পাকড়ে নিয়ে যেত থানায়।"

রাজেনের চোয়াল ঝুলে পড়ে। ওর সাত্‌শো টাকার সাব্‌-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্‌ ম্যানেজার হবার স্বপ্ন ঘোড়ার খুরের চোটে উড়ে যায়। মুহূর্তেই।

ওকে মুষড়ে পড়তে দেখে আমি ওকে উস্‌কে দিতে লাগি—"মনমরা হোয়ো না, ছি! এর জন্য আমি কিছু মনে করিনি। অশ্বরাজ আর রাজা ব্যাঙ্কে তালগোলে পাকিয়ে বসেছো—তা, অমন হয়েই থাকে। অনেকেই করে অমন! হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না। সবার মাথা কিছু সমান নয়।"

আস্তে আস্তে ঘাড় তোলে সে—"যাক্‌, আজ আমি ঐ ঘোড়াই ধরবো। মাঠে যাবো আজ। ঘোড়ার খবরটা যখন আপনার থেকে ভেসে এসে আমার কপালে লেগেছে—"

"কপালে নয়, নাকে।" আমি ওকে শুধরাই।

"একই কথা। কপাল থেকেই নাক। তখন যা থাকে কপালে।" আবার ওর মুখে হাসি ফোটে।

"হ্যাঁ, যদি কপালে লাগে, তা হ'লে সাতশো টাকার মাইনে কী, তুমি নিজেই একটা রীতিমত রাজা বনতে পারো। মনে করো, যদি বাজি জিতে হাজার দশেক টাকা পাও, তুমি একটা ছোটখাট কারখানা খুলতে পারো। পারো না কি? আর, এই আক্রার বাজারে একখানা কারখানা হাঁকাতে পারলে তো রাতারাতিই রাজা!" হাত পা নেড়ে আমি বাৎলাই! "আর, তখন নিজেই তুমি ব্যাঙ্ক। রাজেন ব্যাঙ্ক।"

এই ব'লে, আমি ওর কল্পনানেত্র উন্মীলিত করতে চাই: 'তোমার আজকের ঐ মাঠের কাণ্ড। আর ঐ কাণ্ড থেকেই কারখানার সূত্রপাত—তারপরেই তোমার কারখানা। কাণ্ডকারখানা হচ্ছে জগাই-মাধাইয়ের মত—মাণিকজোড়।"

সে মাসের সমস্ত মাইনেটা সেদিনের তিনটে ত্রিশে রাজেন রাজা ব্যাঙ্কের ওপর লাগালো। কিন্তু ঘোড়াটা আশামত আগালো না। এলো সবশেষে। রেসের মাঠে হার হোলো রাজেনের।

তারপর থেকে রাজেন আর আমার সঙ্গে কথা বলেনি। আজ পর্য্যন্ত না। কথা না, বার্ত্তা না—বার্ত্তালা তো নয়ই। রাজেনের রাজত্ব থেকে আমার প্রজাত্ব গেছে।

তার কারণ? তার কারণ মাঠের সেই ডিগবাজি না, সেই হয়রাণি (বা হয়-running) নয়, তার কারণ হচ্ছে......

মাঠের সেই হরির লুঠের পর আরেক হরিবল্‌ লুঠ হোলো। সেই রাত্তিরেই। সেও প্রায় সাড়ে তিনটেই হবে রাত—জানা গেল যদ্দূর। উক্ত চিরকুটের লেখামত, কাঁটায় কাঁটায় রাজা ব্যাঙ্ক ভেঙে লুঠ করে নিয়ে গেল ডাকাতরা।

বরেন বাবুর বিপদ্‌

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্‌. এ, বি. এল্‌

বেশী দিন নয়, মোটে মাস দুই হ'ল বরেন বাবু শ্যামবাজার থেকে বরাহনগরে উঠে এসেছেন। নিবিরোধ মানুষ, কারু সাতে পাঁচে থাকেন না। বেশ আছেন।

একদিন তিনি বিকেল বেলা বেড়াতে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এলেন। রোজই তিনি ঠিক এই পথে এত দূরে আসেন বেড়াতে। বাঁধাধরা নিয়মমাফিক কাজ করাই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

পথের ধারে এক জায়গায় একটা গলির মোড়ে তিনি একজন ফুলওয়ালাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। এ পথে তো তিনি রোজই আসেন, কখনও কোনও ফুলওয়ালাকে দেখেছেন বলে তো মনে পড়ে না। যাই হ'ক, সুন্দর ফুলগুলি দেখে তাঁর বড় ভাল লাগল। ফুল তিনি বড় ভালবাসেন। একবার পকেটে হাত দিয়ে দেখে তিনি এগিয়ে গেলেন ফুলওয়ালার দিকে। বেছে বেছে কিছু ফুল কিনলেন। মুখেও বললেন, খাসা ফুলগুলি তো!

ফুলওয়ালা বললে, এ আর এমন কি বাবু! ফুল দেখতে হয় তো ঐ বাড়ীটায়!

এই বলে সে গলির ভিতরে একটা পাঁচীল-ঘেরা জায়গার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। বোধ হয় কোনও বাড়ীর পেছন দিক্‌কার বাগান-টাগান হবে।

ফুলওয়ালা আবার বললে, বাড়ীর মালিক কিন্তু কাউকে তার বাগান দেখতে দেয় না। ভারী খুঁতখুঁতে লোক। আমি যে দেখেছি তা ঐ পাঁচীল বেয়ে উঠে। আপনিও দেখে যান না, বাবু! বাগান করেছে বটে একখানা, হ্যাঁ!

বরেন বাবু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। দেখবার প্রবল ইচ্ছা, কিন্তু চোরের মত পাঁচীলে ওঠেন কি করে? কিন্তু সে দ্বিধাও বেশীক্ষণ থাকল না তাঁর। মনকে বোঝালেন যে এতে দোষের কিছু নেই। চুরি করতে তো যাচ্ছেন না। একটীবার শুধু দেখে নিয়েই নেমে পড়বেন।

গলিতে ঢুকে পাঁচীলের পাশে দাঁড়িয়ে বরেন বাবু একবার চারদিক দেখলেন। আশ-পাশে কেউ নেই। এই সুযোগ।

পাঁচীলের উপরে উঠে বাগানের দিকে একবার তাকিয়েই তাঁকে হতাশ হ'তে হ'ল। বাগান না বলে সেটাকে একটা দোপাটি গাছের জঙ্গল বললেই ভাল হয়। গোলাপ নয়, চন্দ্রমল্লিকা নয়, নিতান্তই মামুলী দোপাটী গাছ।

কিন্তু আর একটু ভাল করে দেখতেই বরেন বাবুর চক্ষুঃস্থির হয়ে গেল। এ কি! দোপাটী গাছগুলি এমনভাবে সাজান যে স্পষ্ট দেখা যায় যে তা দিয়ে লেখা হয়েছে—

বরেন বাবুর রক্ত চাই!

একটা মালী বরেন বাবুর দিকে পিছন ফিরে গাছগুলিতে জল দিচ্ছিল।

লেখাটা দেখে বরেন বাবু চমকে গিয়েছিলেন। যদি হঠাৎ দেখা যায় যে ফুলগাছের মত নিরীহ জিনিষরা পর্য্যন্ত দাঁত খিঁচিয়ে বলছে যে তাঁর রক্ত চাই, তা হ'লে চমকাবার তো কথাই! কিন্তু বরেন বাবু ভেবে পেলেন না যে এমন শত্রু সংসারে তাঁর কে আছে? কে ফুলগাছ সাজিয়ে তাঁকে শাসাচ্ছে? বরেন বাবু ভাবতে লাগলেন।

এমন সময় মালীটা তাঁকে দেখতে পেল। দেখে সে বললে, কে রে ওখানে?

বরেন বাবু জোয়ান এবং সাহসী লোক। তিনি বললেন, আমি বরেন বাবু। বুঝলে?

নাম শুনে মালীটা একবার আড়চোখে ফুলগাছগুলো দেখে নিয়ে আমতা আমতা করে কি যেন বললে।

বরেন বাবু একলাফে বাগানে নেমে পড়লেন। দেখেই মালীটা জলের ঝারি-টারি ফেলে এক দৌড়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল। বরেন বাবুও ছুটে গিয়ে তার পিছনে পিছনে বাড়ীতে ঢুকলেন। বেলা-শেষের আধ-আলোতে বাড়ীর ভিতরটা রহস্যপুরীর মত হয়ে উঠেছে। বরেন বাবু কোনও মানুষের দেখা পেলেন না। মালীটা গেল কোথায়?

শেষে বাড়ীটার সামনের দিকে একটা ঘরে এসে মানুষের দেখা পাওয়া গেল। একটী মেয়ে রাস্তার ধারে জানালার পাশে বসে পথের দিকে চেয়ে আছে। বরেন বাবুর পায়ের শব্দ পেয়েও সে মুখ ফেরাল না। রাস্তার দিকে চোখ রেখেই জিজ্ঞাসা করলে,—কে?

বরেন বাবু একজন রীতিমত ভদ্রলোক। তিনি পিছন থেকেই নমস্কার করে বললেন,—আজ্ঞে, আমি বরেন মিত্তির।

মেয়েটী সেই একভাবেই বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, উঃ, ভগবান্! আবার একজন! আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেল, তবু আমি গুপ্তধনের সন্ধান দেব না তোমাদের।

বরেন বাবু বললেন, আপনি কাদের কথা বলছেন জানি না। আমি কিন্তু এসেছি অন্য একটা কাজে। জানতে এসেছি যে আপনার বাগানে আমার নামে ও রকম কথা লিখে রাখবার মানে কি?

ঘড়িতে এমন সময় টং টং করে বাজল সাতটা। মেয়েটী অমনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পিছন ফিরল। তারপরে কপালে হাত রেখে বললে, তিনটী বছর পার হয়ে গেল। রোজ সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত পথপানে চেয়ে বসে থাকি, কখন আমার মুক্তিদাতা আসবে। এল না আজও! কি অভিশাপ!

এ কিসের মধ্যে এসে পড়েছেন বরেন বাবু! রক্ত চাই, গুপ্তধন, মুক্তিদাতা, অভিশাপ! রহস্য, যাকে বলে, ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে! তিনি বললেন, আমি—

এই পর্য্যন্ত বলতেই একটা বীভৎস চীৎকার ভেসে এল বাইরে থেকে—বরেন বাবু! বরেন বাবু! কন্ধকাটার মুণ্ড কই? তারপরেই সব চুপ।

সেই আওয়াজ শুনে মেয়েটীর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। সে হাতখানা তুলে কাঁপতে কাঁপতে বললে—ঐ, ঐ!

বরেন বাবু একলাফে বেরিয়ে এলেন। কোথাও কিছু নেই। একটু অপেক্ষা করে তাঁকে ফিরতে হ'ল। অমনি আবার শুনলেন সেই অমানুষিক চীৎকার—

বরেন বাবু! বরেন বাবু! রক্তচোষা মরল কিসে?

এবার বরেন বাবু দেখতে পেলেন। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। ঘরের পাশে উঠোনে একটা মুণ্ড পড়ে আছে, ধড়-টড় তার কিছু নেই। ঝাঁকড়া চুল, দুই কানে দু'টো আংটা ঝুলছে, বিকট মুখ। চীৎকার করেই সেটা মাটির ভিতরে ঢুকে গেল।

ঐ প্রশ্নের পর আবছায়া আলোতে ঐ রকম দৃশ্য দেখলে অনেকেরই দাঁতে দাঁত লেগে যেত। কিন্তু বরেন বাবু সাহসী লোক, তিনি ছুটে উঠোনে চলে গেলেন। গিয়ে যা দেখলেন তাতে কাটামুণ্ডুর রহস্যটা বোঝা গেল। উঠোনের মাঝখানে ড্রেনের গর্ত্ত, তার ঢাকনাটা এক পাশে পড়ে আছে। বুঝলেন যে শুধু মুণ্ডু নয়, মুণ্ডুর মালিক কোনও বদমাইস লোক ঐ গর্ত্তে লুকিয়ে থেকে তাঁদের ভয় দেখাচ্ছে। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে তিনি পেছন ফিরলেন।

কিন্তু তাঁকে আর ঘর পর্য্যন্ত আসতে হ'ল না। তিনি ফিরতেই প্রকাণ্ড একখানা কালো লোমওয়ালা হাত পিছন থেকে এসে তাঁর মুখ চেপে ধরল, অপর একখানা হাত চক্ষের নিমেষে তাঁকে কোমরে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল। বরেন বাবুও ছাড়বার পাত্র ন'ন। রীতিমত ঝটাপটি লেগে গেল তখন। একবার বরেন বাবু নীচে পড়েন, পরক্ষণেই তাঁর শত্রু তাঁর তলায়। খানিকক্ষণ এই রকম গড়াগড়ি মারামারি চলবার পর হঠাৎ লোকটা বরেন বাবুর হাত ছাড়িয়ে উঠে দৌড়ে পালিয়ে গেল। তিনি তাকে ধরবার জন্য লাফিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু নাগাল পেলেন না। কেবলমাত্র শত্রুর জামার একটা টুকরো ছিঁড়ে তাঁর হাতে থেকে গেল।

তিনি সাবধানে আগেকার ঘরে ফিরে এলেন। এসে দেখেন যে ঘরের মধ্যে সেই মেয়েটী তো নেইই, এমন কি ঘরে সামান্য আসবাবপত্র যা ছিল তারও চিহ্ন নেই। ফাঁকা ঘর খাঁ খাঁ করছে। ভোজবাজির মত ব্যাপার!

চিন্তিত হয়ে বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে বরেন বাবু বেরিয়ে এলেন। সমস্ত ব্যাপারটা

ধাঁধার মত, স্বপ্নের মত লাগতে লাগল তাঁর। রাত্রিতে যে তাঁর ভাল করে ঘুম হ'ল না সে কথা না বললেও চলে।

সকালে উঠে বরেন বাবু ছেঁড়া জামার টুকরোটা দেখছিলেন। সাধারণ টুইলের জামা, বোধ হয় শার্টই হবে। তার একটা পকেট শুদ্ধ ছিঁড়ে এসেছে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে বরেন বাবু দেখলেন আনা দুই পয়সা আর এক টুকরো কাগজ রয়েছে। কাগজটাতে লেখা—

১১৩।এ নং হ্যারিসন রোড
কলিকাতা
৯ই, বৈশাখ ১৩৫৬

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল

বরাবরেষু—

তিন মাসের মধ্যেও বরেন বাবুর একটা ব্যবস্থা করিতে পারিলে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। এ ভাবে চলিলে মক্কেল হাতছাড়া হইয়া যাইবার আশঙ্কা। সুতরাং বরেন বাবুকে আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবে। অধিক লিখা বাহুল্য। ইতি—

শ্রীনটবর দত্ত

ঠিকানাটা দেখে বরেন বাবু লাফিয়ে উঠলেন। একটা সূত্র পাওয়া গেল তা হ'লে। কিন্তু কে এই নটবর? কোনও নটবরকে তো তিনি কখনও দেখেছেন বলে মনে পড়ে না! তবে সে কেন তাঁকে মারবার জন্যে লোক নিযুক্ত করছে? ভাবতে ভাবতে উঠে পড়লেন বরেন বাবু। দেখে আসতে হয় লোকটা কে। হয়তো বা নাম ঠিকানা সবই বাজে, তবুও একবার স্বচক্ষে দেখে আসাই ভাল। এই ভেবে বরেন বাবু বাড়ী থেকে বেরোলেন।

হ্যারিসন রোডের ১১৩।এ নম্বর বাড়ীটা যেন একটা বিরাট পায়রার খোপের মত। অসংখ্য ঘরে অসংখ্য আপিস আর অসংখ্য লোকের বাস। বরেন বাবু এসে দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, নটবর বাবু এ বাড়ীতে থাকেন?

তিনি ভেবেছিলেন যে দরোয়ান নিশ্চয় বলবে, না। কিন্তু শুনে আশ্চর্য্য হলেন যে দরোয়ান বললে, হাঁ হাঁ! নোটোবর দৎ বাবু তো? ওহি পান্‌তলামে আসে। আটাত্তন নম্বর ঘর।

হাতের মোটা লাঠিটা ভাল করে বাগিয়ে ধরে বরেন বাবু সটান পাঁচতলাতে উঠে এলেন। আটান্ন নম্বর ঘরের সামনে এসে দেখেন যে সেটা একটা আপিস্‌এর মত। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লেন।

ঘরে একটী ভদ্রলোক বসে ছিলেন, তিনি মুখ তুলে বললেন, কা'কে চান?

বরেন বাবু বললেন, নটবর দত্ত কার নাম?

ভদ্রলোক বললেন, আমার নামই নটবর দত্ত। মশায় কে?

উত্তরটা শুনে লোকটা কি রকম চমকে যাবে তাই ভাবতে ভাবতে বরেন বাবু লাঠিটা শক্ত করে ধরে বললেন, আমার নাম বরেন বাবু বললেই চিনতে পারবেন বোধ হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, এ কথা শুনে ঘাবড়ান দূরে থাকুক বরং যেন খুসী হয়েই নটবর দত্ত বললেন, বিলক্ষণ! তা আর চিনব না? এর আগে আর দেখা হয় নি বটে, কিন্তু চিঠিপত্তরে আপনাকে খুব জানি। বসুন, বসুন!

বরেন বাবু এই অদ্ভুত ব্যবহারে হকচকিয়ে গেলেন। লোকটা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল না তো! অথবা, ঝাঁপিয়েও পড়ল না তাঁর ওপর!

নটবর দত্ত ইতিমধ্যে দেরাজ খুলে একখানা কাগজ বের করলেন। তারপর বললেন, আপনি নিজে এলেন, ভালই হ'ল। এই নিন আপনার বিল। কালকের ব্যাপারটা সব আপনার সন্তোষ মত হয়েছে তো?

হতভম্ব হয়ে বরেন বাবু খুলে দেখলেন কাগজখানা। তাতে লেখা রয়েছে—

হিসাব—শ্রীযুক্ত বরেন বাবু

জমা—	খরচ—	
মাহ মাঘ ১৩৫৫	দং একমাসের বাড়ীভাড়া—	২০৲
১২ রোজ	দং আসবাব আদির ভাড়া—	৩৲
মাং মনি অর্ডার	৫০০ দোপাটি গাছের বীজ খরিদ বাবদ—	৶০
যোগে—২০৲	ঐ লওয়ার গাড়ীভাড়া গয়রহ—	১৶০
	প্রভাসচন্দ্র পালের মজুরী মায় শার্ট ছেঁড়ার ক্ষতি পূরণ—	৪।৴০
	মিস্ ডলি (ছোট) এক ঘণ্টার পারিশ্রমিক—	৮৲
	খুচরা ফুলওয়ালার বকশিশ—	॥০
	মোট—	৩৭॥৶০
	উসুল—	২০৲
	বাকী—	১৭॥৶০

শ্রীনটবর দত্ত

বরেন বাবু বললেন, এ আবার কি? এটা নিয়ে কি করব আমি?

নটবর বাবু উত্তর দিলেন,—ওটা আপনার হিসাব। বাকী টাকাটা দিতে হবে, বুঝতে পারছেন না?

বরেন বাবু তাঁর ভাবভঙ্গী আর কথাবার্ত্তা শুনে অবাক্ হয়ে বললেন, তার মানে? টাকা দেব!

আরও আশ্চর্য্য হয়ে নটবর বাবু বললেন, সে কি? আপনার চিঠি অনুযায়ী আমরা এতগুলি খরচপত্র করলাম, এখন আপনি সব অস্বীকার করতে চান নাকি মশায়? টাকা দেবেন না কি রকম?

—আমার চিঠি? আমি, বরেন মিত্তির, আপনাকে, মানে নটবর দত্তকে, কখনও চিঠি লিখেছি?

—কি নাম বললেন? বরেন মিত্তির? হ্যাঁ? বরানগরের বরেন মুখুয্যে নয়?

—কক্ষণো নয়। সে তো আর একজন। আমি যে বাড়ীতে আছি, তাতে আগে যে ভাড়াটে ছিল তার নাম ছিল শুনেছি বরেন মুখুয্যে। সে আমি নই।

নটবর বাবু একটু থমকে গেলেন। তারপর হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, এঃ হে! বড্ড ভুল হয়ে গেছে দেখছি! আমারও কতকগুলো খরচান্ত, আপনাকেও মিছিমিছি কষ্ট পেতে হ'ল। ছি, ছি, আপনার কাছে আমি মাপ চাইছি।

লোকটা বদমাইস না উন্মাদ পাগল তা ঠিক করতে না পেরে বরেন বাবু সাবধানে বললেন, কি বলছেন এ সব?

নটবর বাবু বললেন, শুনুন তবে। এটা হচ্ছে গিয়ে বিপদ্-ঘটক আপিস। এর ম্যানেজার বলুন, মালিক বলুন, সবই আমি।

—বিপদ্-ঘটক!

—হ্যাঁ, এ একটা নতুন ব্যবসা, আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব আবিষ্কার। বিয়ের ঘটক যেমন থাকে, আমি তেমনি বিপদের ঘটক—লোকের বিপদ্ ঘটাই। অবশ্য, ফি নিয়ে। আমারও তো পেট চলা চাই মশায়!

—তা তো বটেই! কিন্তু বিপদ্ ঘটাতে আবার কে আপনাকে টাকা দেবে?

—দেবে না? অনেক লোক আছে। ডিটেকটিভ নভেলের কৃপায় সে রকম লোক ঘরে ঘরে। মাঝে মাঝে একটু বিপদের চাটনী না থাকায় জীবনটা তাদের একেবারে পানসে লাগে। অথচ সকলের জীবনে তো আর ষড়যন্ত্র, রহস্য-বা এডভেঞ্চার জোটে না। তা যোগাই আমি। তাই আপিসের নাম দিয়েছি বিপদ্-ঘটক কোম্পানী। বুঝেছেন?

—তা হ'লে কালকের অত কাণ্ড সব সাজানো ব্যাপার?

—ঠিক তাই। এর জন্যে কত হ্যাঙ্গাম করতে হয়েছে, বিল দেখেই তা বুঝেছেন। কিন্তু সবই বৃথা হ'ল। বরেন মুখুয্যে কি আর আপনার বিপদ্ ঘটাবার খরচা দেবে?

—বরেন মুখুয্যে আপনার এডভেঞ্চার-সন্ধানী মক্কেলদের মধ্যে একজন বুঝি?

—হ্যাঁ। আপনিও হয়ে যান না ভর্ত্তি! আমার ফিস্ও বেশী নয়। খরচ-খরচা বাদে আপনি না হয় গোটা দশেক টাকাই দেবেন। অনেক নতুন নতুন প্লট আছে আমার মাথায়। ঝড়াকসে এমন প্যাঁচে ফেলে দেব যে মহানন্দে হাবুডুবু খেতে পারবেন। হবেন আমাদের মেম্বার?

বরেন বাবু আর অপেক্ষা করলেন না। পাছে নটবর বাবু আবার বিনা পারিশ্রমিকেই তাঁর কোনও বিপদ্ ঘটিয়ে ফেলেন, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।*

* একটি বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

বল তো কিসের ছবি?

একটি বিখ্যাত লোকের জীবনের একটি ঘটনা নিয়ে ওপরের ছবিটি আঁকা হয়েছে। বলতে পার কে তিনি এবং কোন্ সে ঘটনা?

শিল্পী—শ্রীফণিভূষণ গুপ্ত

উত্তর শেষ পৃষ্ঠায় দেখ।

কোচবিহার

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

তোমরা নিশ্চয়ই জান, গত ১লা জানুয়ারী থেকে কোচবিহার রাজ্য পশ্চিম বাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তার কয়েক মাস আগে কোচবিহার আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারত রাষ্ট্রে যোগ দেয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পৃথক্ একটি প্রদেশ হিসাবে পরিচিত হয়। কিন্তু অত ছোট একটুখানি রাজ্য আলাদা ভাবে চালানো তেমন সুবিধাজনক নয়, তাই শেষ পর্য্যন্ত তাকে বাংলা দেশের সঙ্গেই যুড়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্যি এই দাবী সেখানে অনেক দিন থেকেই উঠেছিল—কারণ কোচবিহার আসলে বাংলা দেশেরই একটা অংশ এবং ওখানকার লোকেরা নিজেদের বাঙ্গালী ব'লেই জানে। ওখানকার ভাষাও বাংলা ভাষা। কিন্তু একদল লোক,—এদের মধ্যে কোচবিহারের মহারাজাও একজন,—নিজেদের সুবিধার জন্য কোচবিহারকে আসামের মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করেছিলেন; অসমীয়রাও সুযোগ বুঝে কোচবিহারকে দাবী করতে ছাড়ে নি। এই নিয়ে কিছু দিন দু'পক্ষে বেশ একটু আন্দোলন চলতে থাকে এবং ভারত সরকার কি করবেন ভেবে না পেয়ে বোধ হয় একটু মুশকিলেই পড়েন। তাই প্রায় সাড়ে তিন মাস কোচবিহারকে কোন প্রদেশেই যুক্ত না ক'রে আলাদা ক'রে রাখা হয়। তার পর কোচবিহারের ভারতীয় চীফ কমিশনার শ্রীযুক্ত নানজাপ্পা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কোচবিহারকে বাংলা দেশেরই অংশ ব'লে মত দেন এবং এই পরিবর্ত্তনের কথা ঘোষণা করা হয়।

কোচবিহারের এই বঙ্গভুক্তির ফলে স্বভাবতঃই লোকের দৃষ্টি কোচবিহারের

ওপর পড়েছে এবং ওর সম্বন্ধে নানা কথা জানবার আগ্রহ হয়েছে। কাজেই কোচবিহারের গল্প তোমাদেরও হয়তো ভালোই লাগবে।

ইংরেজ আমলে কোচবিহার ছিল বৃটীশ ভারতের অধীন একটি করদ রাজ্য,—ইংরেজীতে যাকে বলত 'নেটিভ ষ্টেট্'। আভ্যন্তরিক শাসন-ব্যাপারে মহারাজের অনেকটা কর্তৃত্ব ছিল, তবে সব ব্যাপারে নয়। এ ছাড়া তাঁকে ইংরেজ সরকারে একটা মোটা টাকা করও দিতে হ'ত। তোমরা হয়তো জান, ইংরেজ আমলে বিভিন্ন করদ রাজ্যের রাজাদের সম্মান দেখাবার জন্য প্রত্যেকের জন্য এক-একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক তোপধ্বনি করার রেওয়াজ ছিল। যে যত বড় সামন্ত-রাজ তার জন্য ততগুলি তোপের আওয়াজ। কোচবিহারের রাজার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল ১৩টা। আমাদের চোখে এই সব নিয়ম-কানুন বেশ মজার এবং খানিকটা হাস্যকর মনে হ'লেও সামন্ত-রাজরা নিশ্চয়ই এগুলিকে খুব খাতির ব'লে মনে করতেন। কোচবিহার রাজ্যের আয়তন ছিল ১৩:৮ বর্গ মাইল, আর বাৎসরিক রাজস্বের আয় ছিল ১ কোটি ১ লক্ষ টাকা।

কিন্তু কোচবিহার রাজ্য চিরকাল এমনটা ছিল না। এমন এক সময় ছিল যখন তার রাজ্যের এলাকা ছিল যেমন অনেক বেশী, ক্ষমতা এবং স্বাধীনতাও ছিল তেমনি প্রচুর। এমন কি কোন কোন সময়ে এই রাজ্যের আয়তন ৮০।৯০ হাজার বর্গ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। উত্তরে তিব্বতের পাদদেশ, পশ্চিমে মিথিলা-সীমান্ত এবং দক্ষিণে চট্টগ্রামের কাছে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত তা ছড়ানো ছিল। এ ছাড়া অহোম, কাছাড়, মণিপুর, শ্রীহট্ট, জয়ন্তীয়া, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানও সময়ে সময়ে তার অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন কোচবিহার-রাজ।

ঐতিহাসিকেরা বলেন প্রাচীনকালে কোচবিহার ছিল কামরূপ খণ্ডের অধীন। কামতা রাজ্যের শেষ রাজা ছিলেন নীলধ্বজ। তাঁর রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আজও লালবাজার সহরে পড়ে আছে। নীলধ্বজের পতনের পর বিশু নামে একজন কোচ সর্দ্দার নিজের পরাক্রমে আশপাশের নানা জায়গা জয় ক'রে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সেটা হচ্ছে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দ। তখন থেকে তাঁর নাম হয় বিশ্বসিংহ। বিশ্বসিংহের বাবার নাম ছিল হরিদাস, ইনি জাতিতে ছিলেন মেচ; আর মা'র নাম ছিল হীরা—জাতিতে কোচ। প্রবাদ, হীরা মহাদেবের খুব ভক্ত ছিলেন এবং তাঁকে আরাধনা ক'রে তাঁরই বরে পুত্রলাভ করেন।

বিশ্বসিংহ নিজেও ছিলেন শিবের খুব ভক্ত। কোচবিহারের লোকেরা আজও তাই তাদের দেশকে শিবভূমি ব'লে পরিচয় দেয়। বিশ্বসিংহ মিথিলা, শ্রীহট্ট, কাশী, কান্যকুব্জ প্রভৃতি জায়গা থেকে কয়েক জন ব্রাহ্মণ এনে নিজের রাজ্যে বসান।

এখানকার অধিবাসীদের বলা হয় কোচ বা রাজবংশী। তারা নিজেদের পার্ব্বত্য ক্ষত্রিয় ব'লে দাবী করে। এই কোচ থেকেই দেশের নাম কোচবিহার হয়েছে। অবশ্যি এই নামকরণ সম্বন্ধে নানা রকম গল্প আছে। কেউ বলে, পরশুরামের ভয়ে ক্ষত্রিয়েরা এখানে এসে পার্ব্বতীর 'কোচে' অর্থাৎ কোলে আশ্রয় নেওয়ায় এদের নাম হয় কোচ। কেউ বলে, ক্ষত্রিয়দের 'সঙ্কোচ' থেকে এরা হয়েছে—তাই সংক্ষেপে বলা হয় 'কোচ', কারণ সঙ্কোচ শব্দের প্রতিশব্দ হচ্ছে কোচ। আবার এই রাজ্যের ভিতর সঙ্কোষ নামে একটা নদী আছে। কেউ কেউ বলে ঐ নদীর নাম থেকেই তার তীরবর্ত্তী বাসিন্দাদের নাম প্রথমে 'সঙ্কোচ' এবং শেষে 'কোচ' হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোচবিহার নামটি সম্বন্ধেও এই রকম রয়েছে নানা মত। যেমন—(১) কোচ জাতির বাসস্থান বা বিহারকেন্দ্র, তাই এর নাম কোচবিহার। (২) কোচকুমারী হীরা আর তাঁর আরাধ্য মহাদেব এখানে একত্র বেড়াতেন, তাই এর নাম কোচ-বিহার। (৩) জায়গাটার আসল নাম বিহার। মোগলদের 'বিহার' থেকে পৃথক্ ক'রে বোঝাবার জন্য বিহারের আগে কোচ যোগ ক'রে কোচবিহার করা হয়েছে। ইংরেজীতে আবার এই কোচ-বিহার বানান লেখা হয় Cooch Behar। তাই থেকে অনেকেই আজকাল কুচবেহার উচ্চারণ ক'রে থাকেন—যদিও আসলে ওটা ভুল উচ্চারণ।

বিশ্বসিংহের পরে মহারাজ মল্লদেব বা নরনারায়ণের সময়ে কোচবিহার আরও বড় হয়ে ওঠে। এঁরই সময় থেকে নারায়ণী মুদ্রার চলন হয়। তাঁর ভাই শুক্লধ্বজ বা চিলা রায় ছিলেন মস্ত বড় যোদ্ধা। তিনি আশপাশের বহু রাজ্য—যেমন অহোম, কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, জয়ন্তীয়া, মণিপুর ইত্যাদি জয় ক'রে কোচ-সাম্রাজ্যে যুক্ত করেন। শোনা যায়, কামাখ্যার বর্ত্তমান বিখ্যাত মন্দিরটিও তাঁরই তৈরী। যাই হোক্, চিলা রায় শেষ পর্য্যন্ত গৌড়ের নবাবের হাতে বন্দী হ'ন। নরনারায়ণ তখন সম্রাট্ আকবরের সঙ্গে যোগ দিয়ে মোগলের সাহায্যে গৌড় আক্রমণ করেন এবং তার খানিকটা দখল করতেও ছাড়েন না।

নরনারায়ণের মৃত্যুর পর কোচবিহার রাজ্য নিজেদের ভিতর দু'ভাগ হয়ে যায়।—কোচবিহার আর কোচহাজো। জলপাইগুড়ীর রায়কত রাজারাও নাকি এদেরই একটির বংশধর।

তার পরে এল কোচবিহারের দুর্দ্দিন। ভুটিয়া-রাজ দেবযুধুর কোচবিহার আক্রমণ করলেন। ভুটিয়ারা কোচবিহারে এসে দারুণ উৎপাত সুরু করল। সে হ'ল ১৭৭২ সালের কথা। বাংলা দেশে তখন কোম্পানীর রাজত্ব সুরু হয়েছে। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করছেন। তাঁরই সাহায্যে কোচবিহার ভুটিয়া-আক্রমণ থেকে রক্ষা পেল। অবশ্যি তিব্বতের (লাসার) লামাও নাকি এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেছিলেন।

ভুটিয়াদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল কিন্তু এই ব্যাপারে কোচবিহার পড়ল কোম্পানীর খপ্পরে। ১৭৭৩ সালে কোচবিহার-রাজের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটা সন্ধি হ'ল। সন্ধির সর্ত্তগুলি কোচবিহারের পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নয় এবং এই সন্ধির ফলেই কোচবিহারের সত্যিকার স্বাধীনতা লোপ পেল—কোচবিহার কোম্পানীর অধীনে একটা করদ রাজ্যে পরিণত হ'ল। কোম্পানী, অর্থাৎ ইংরেজ, ক্রমে ক্রমে নানা রকম সুবিধা আদায় ক'রে নিতে লাগল এবং ধীরে ধীরে রাজ্যের নানা অংশ গ্রাস ক'রে ফেল্‌ল। শেষে ১৮৬৪ সালে দেখা গেল রাজ্যের আয়তন কমতে কমতে ৩২০০ বর্গ মাইল থেকে ১৩১৮ বর্গ মাইলে এসে ঠেকেছে। আগে কোচবিহার-রাজ্যের নিজেদের টাঁকশাল ছিল,—১৮৪৫ সাল থেকে ইংরেজরা তাও দিল বন্ধ ক'রে। ঠিক হ'ল, এর পর শুধু রাজ্যাভিষেকের সময়ে রাজার সম্মানের জন্য তাঁকে সোনা ও রূপার আধুলি তৈরী করতে দেওয়া হবে—তবে সে মুদ্রা রাজ্যে চালু করা চলবে না।

ইংরেজ আমলে অবশ্যি কোচবিহার নানা দিকে উন্নতি লাভ করেছে। এজন্য মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ ক'রে নানা দিক্ দিয়ে কোচবিহারকে আধুনিক ক'রে গড়ে তুলবার চেষ্টা করেন। এঁরই আমলে কোচবিহার শিক্ষা, সংস্কৃতি, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নানা দিকে প্রসার লাভ করে—রাজধানী কোচবিহার শহরটিও একটি আধুনিক সুরম্য শহরে রূপান্তরিত হয়। এঁর সুযোগ্য দেওয়ান কালিকাদাস দত্তের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। তাঁরই চেষ্টায় কোচবিহারে নানা দেশের পণ্ডিতদের সমাবেশ হয়—ভারত-বিখ্যাত মহাপণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতির সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়ে কোচবিহারবাসী ধন্য হয়।

মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মেয়ে সুনীতি দেবীকে বিবাহ করেন (১৮৭৮)। বিবাহ হিন্দুমতে হ'লেও নৃপেন্দ্রনারায়ণ পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম

গ্রহণ করেন। নৃপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজা হ'ন, কিন্তু মাত্র দু'বছর পরেই তাঁর মৃত্যু হওয়ায় দ্বিতীয় পুত্র জিতেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসনে বসেন। জিতেন্দ্রনারায়ণ বরোদার গাইকোয়াড়ের (রাজা) কন্যাকে বিবাহ করেন। বর্ত্তমান মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ এঁদেরই ছেলে। ১৯১৫ সনে তাঁর জন্ম হয়। ইনিও বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং খেলাধূলায়,—বিশেষতঃ ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে, এঁর সুনাম আছে।

বর্ত্তমান কোচবিহার শহরটি উত্তর বাংলায় তোরসা নদীর ধারে। পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী—অত্যন্ত সাজানো-গোছানো শহরটি। অনেকে বলেন, বাংলা দেশে এমন সুন্দর শহর খুব কমই আছে। নানা দ্রষ্টব্য জিনিষ শহরটিকে আরও লোভনীয় ক'রে তুলেছে। যেমন ধর—মদনমোহনের সুবিখ্যাত মন্দির, দেবী-বাড়ী, রাজপ্রাসাদ, গ্রন্থাগার, ভিক্টোরিয়া কলেজ, ছেলেদের জেঙ্কিন্‌স্ স্কুল, মেয়েদের সুনীতি একাডেমী প্রভৃতি। এ ছাড়া বড় বড় বাগান-পার্ক, দীঘি-সরোবর, গাছপালা-সাজানো বড় বড় রাস্তা শহরটির শোভা আরও বাড়িয়েছে। সাগরদীঘি নামে সুবিশাল সরোবরটিও এখানকার একটি বড় আকর্ষণ।

কোচবিহার জায়গাটা তেমন গরম নয়—বরঞ্চ একটু স্যাঁতসেঁতে। লোক-সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ। অধিকাংশই রাজবংশী, কিছু মুসলমানও আছে। এদের মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যাই বেশী। জেলে, মাঝি, তাঁতী প্রভৃতিও কিছু কিছু আছে। ধান, পাট এবং বিশেষ ক'রে তামাক এখানকার একটি বড় সম্পদ্। এ ছাড়া বন-বিভাগ থেকেও বেশ আয় হয়। জঙ্গলে বাঘ, ভালুক, বুনো মোষ, হরিণ, এমন কি গণ্ডারও মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়।

এখানকার তৈরী মেখলী এবং এণ্ডিরও বেশ নাম আছে। মেখলী হচ্ছে পাট থেকে তৈরী একরকম মোটা কাপড়, আর এণ্ডি হচ্ছে একরকম রেশমী কাপড়—এরণ্ড গাছের গুটিপোকার সাহায্যে যা তৈরী হয়।

"চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

যাঁর গড়া বেথুন বিদ্যালয়

সম্প্রতি কলকাতার বিখ্যাত বেথুন বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। খবরের কাগজে তার বিবরণ হয়তো তোমরা অনেকে দেখেছ। কিন্তু যাঁর নামে ঐ বিদ্যালয়ের নামকরণ হয়েছিল তাঁর সম্বন্ধে হয়তো অনেকেই বিশেষ কিছু জান না। আজ একশ' বছর পরে বাঙ্গালীর সেই পরম বন্ধু মহাত্মা বেথুনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত।

বেথুন সাহেবের পুরো নাম হচ্ছে জন ইলিয়ট্ ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। তাঁর বাড়ী ছিল স্কটল্যাণ্ডে। এ দেশে তিনি এসেছিলেন গভর্ণর জেনারেলের মন্ত্রিসভার ব্যবস্থা-সচিব হয়ে, কিন্তু আর ফিরে যান নি। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এখানেই কাটিয়ে গেছেন।

লেখাপড়ায় বেথুন ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন খুব মেধাবী। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তাই ব'লে সাহিত্যেও তিনি কম ছিলেন না। সুলেখক হিসাবে তাঁর নাম ছিল, আর জানতেন অনেকগুলি ভাষা।

কেম্ব্রিজ থেকে র‍্যাংলার হয়ে বেথুন ব্যারিষ্টারী পড়তে থাকেন এবং ব্যারিষ্টারীতেও বেশ কৃতিত্ব দেখান। এর পর ইংল্যাণ্ডের সরকারী আইন-বিভাগে কতকগুলি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হবার পর তিনি চলে আসেন ভারতবর্ষে বড়লাটের আইন-সচিব হয়ে। ঐ পদটি কেমন গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানের তা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ।

আইন-সচিব বেথুন কিন্তু এখানে এসে বেছে নিলেন তাঁর নিজের কাজ। এখানকার শিক্ষা-পরিষদের তিনি হলেন সভাপতি, আর এই কাজে তিনি এমন ভাবে আত্মনিয়োগ করলেন যে ডেভিড্ হেয়ার প্রভৃতি ২।১ জন ছাড়া খুব অল্প বিদেশীই অমন ধারা করতে পেরেছিলেন।

সে সময়ে ইংরেজী শিক্ষা এ দেশে সবে প্রবর্ত্তিত হয়েছে। একদল প্রতিভাবান্ বাঙ্গালী ছাত্র এদিক্ দিয়ে অল্প দিনেই খুব এগিয়ে যায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শিক্ষার কুফলও তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। নিজেদের দেশ, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতিকে তারা উপেক্ষা করতে সুরু করে—অনেকের নৈতিক চরিত্রেও অধঃপতন দেখা দেয়।

ভারত-বন্ধু বেথুন এ অনাচার সহ্য করতে রাজী হলেন না, এর প্রতিকারের জন্য তিনি এগিয়ে এলেন। ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষার জন্যও তিনি আকুল হয়ে উঠলেন। ইংরেজ হয়েও তিনি ছেলেদের বোঝাতে লাগলেন—মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা ক'রে কেউ কখনও বড় হ'তে পারে না—নিজের ভাষা চর্চ্চা করেই তাদেরকে বড় হ'তে হবে। মাইকেল মধুসূদন যখন প্রথমে ইংরেজী ভাষায় সাহিত্য-সাধনা সুরু করলেন তখন বেথুনই তাঁর ভুল বুঝিয়ে দিয়ে তাঁকে বাংলা সাহিত্য চর্চ্চায় উদ্বুদ্ধ করেন—যার ফলে মাইকেলের মত মহাকবিকে আমাদের হারাতে হয় নি।

বেথুন সাহেব ছাত্রদের ভালবাসতেন নিজের ছেলের মত। কত দুঃস্থ ছাত্র তাঁর খরচে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে বড় হয়ে গেছে! শোনা যায়, বেথুন যখনই কোন স্কুল বা পাঠশালা দেখতে যেতেন, নিজের খরচে ছাত্রদের জন্য নানা রকম পুরস্কার কিনে নিয়ে যেতেন।

বেথুনের সব চেয়ে বড় কীর্ত্তি বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। দেশের এই মস্ত অভাব প্রথমেই তাঁর চোখে পড়ে। নানা প্রতিকূল অবস্থা এড়িয়ে অবশেষে তিনি এ দেশের মেয়েদের জন্য তাঁর বিখ্যাত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ কাজে তাঁর প্রধান বন্ধু ছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শম্ভু নাথ পণ্ডিত, প্যারী-চাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, লেডী ডালহৌসী প্রভৃতি। ১৮৪৯ সালে দক্ষিণারঞ্জনের বাড়ীতে ৯টি মেয়ে নিয়ে এই স্কুলের পত্তন হয়। স্কুলের সমস্ত খরচ দেন বেথুন সাহেব। পরের বছর বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ী তৈরী হয়। বাড়ীর জায়গা দেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন এবং বাড়ী তৈরীর যাবতীয় ব্যয় বহন করেন বেথুন সাহেব।

বেথুন সাহেব শুধু স্কুলের বাড়ী তৈরীর আর স্কুল চালাবার টাকা দিয়েই ক্ষান্ত হ'ন নি, শত কাজের মধ্যেও একবার ক'রে স্কুলে গিয়ে নিজে মেয়েদের তত্ত্বতল্লাস না করলে তাঁর মন উঠত না। এবং, যখনই যেতেন, মেয়েদের জন্য খেলনা, জামা, বই ইত্যাদি কিছু না কিছু উপহার হাতে নিয়ে যেতেন। মেয়েরাও তাঁকে নিতান্ত আপনার জন ব'লে মনে করত; তাঁর সঙ্গে অসঙ্কোচে মিশত, তাঁর সঙ্গে গল্প করত—খেলা করত। এমন অনেক বার দেখা গেছে—বেথুন সাহেব হামাগুড়ি দিয়ে ঘোড়া সেজেছেন আর ছোট ছোট মেয়েরা তাঁর পিঠে চেপে ঘোড়া ঘোড়া খেলছে। বিদ্যালয়ের প্রথম দিকের ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন মদন-মোহন তর্কালঙ্কারের দুই মেয়ে ভুবনমালা ও কুন্দমালা। প্রায়ই দেখা যেত, বেথুন সাহেব তাঁদের দু'জনকে দুই কোলে চাপিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি শম্ভু নাথ পণ্ডিতের মেয়ে মালতী দেবীও তাঁর একজন প্রিয় ছাত্রী ছিলেন।

একবার জনাইএর স্কুলে প্রাইজ দিতে গিয়ে বেথুন সাহেব বৃষ্টিতে খুব ভিজে এলেন। এই ভেজাই কাল হ'ল। কলকাতায় ফিরে এসেই তিনি অসুখে পড়লেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হ'ল। তখন তাঁর বয়স সবে ৫০ বছর।

বেথুনের মৃত্যুর পর কিছুদিন লেডী ডালহৌসী তাঁর বিদ্যালয়ের সমস্ত ভার নেন;

তারপর লর্ড ডালহৌসীর ভারত ত্যাগের পর গভর্ণমেণ্ট থেকেই বেথুন বিদ্যালয় চালাবার ব্যবস্থা করা হয়।

কলকাতায় লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধি-ক্ষেত্রে মহাত্মা বেথুনের নশ্বর দেহ সমাহিত করা হয়েছে। তোমরা সুবিধে পেলে একদিন গিয়ে সেই পুণ্য সমাধি-স্থান দেখে এস।

খোস গল্প

(সংগ্রহ)

পারস্য-সম্রাট্ নওশেরওঁয়া একদিন কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে গ্রামের ভিতর বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, হঠাৎ দেখলেন একটি খুব বুড়ো লোক অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে একটা জলপাই গাছের চারা পুঁতছে। সাধারণতঃ জলপাই গাছ বড় হয়ে ফল ধরতে ৪০।৫০ বছর লাগে। এই লোকটি এত বুড়ো যে চল্লিশ কেন, আর চার বছর বাঁচাই তার পক্ষে ভাগ্যের কথা। তার কাণ্ড দেখে রাজার খুব হাসি পেল, ভাবলেন, লোকটা কি বোকা! এর সঙ্গে একটু মজা করা যাক্। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, "কি হে, তুমি বুঝি জলপাই খেতে খুব ভালবাস?"

বৃদ্ধ সলজ্জভাবে বল্‌ল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা, তুমি কি আশা কর এই গাছ বড় হয়ে যখন ফল ধরবে তখন তুমি তা পেড়ে খাবার জন্য টিকে থাকবে?"

লোকটি তৎক্ষণে সম্রাট্‌কে চিনতে পেরেছে। মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানিয়ে বল্‌ল, "না হুজুর! জলপাই গাছে ফল ধরতে প্রায় চল্লিশ বছর লাগে এ আমি জানি। আমি এত দিন যে সব গাছের ফল খেয়ে আসছি সে সবই অন্যের পোঁতা। তাঁদের কেউই এখন বেঁচে নেই। তাঁদের ঋণ তো আর আমি শোধ করতে পারলাম না, তাই এই গাছ পুঁতে যাচ্ছি ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য। এই ভাবেই পূর্ব্বপুরুষদের ঋণ আমরা কিছুটা শোধ করতে পারি।"

বৃদ্ধের কথা শুনে রাজার ভারী ভালো লাগ্‌ল। তিনি তখনই সঙ্গের অনুচরদের হুকুম দিলেন, "একে এখনই হাজার মোহর বখশিস্ দাও।"

বখশিস্ পেয়ে বুড়ো আবার সেলাম ক'রে বল্‌ল, "দেখলেন তো হুজুর, লোকে বলে জলপাই গাছের ফল ফলে চল্লিশ বছরে, কিন্তু আমার এই জলপাই গাছের ফল সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল।"

বৃদ্ধের কথাবার্ত্তা শুনে সম্রাট্ আরও খুশী হলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে আরও হাজার মোহর বখশিস্ দিয়ে ফেললেন। বুড়ো বল্‌ল, "আরও দেখুন হুজুর, অন্য লোকের বোনা জলপাই গাছে বছরে একবার ফল হয়, কিন্তু আমার বোনা গাছে এক মুহূর্ত্তে দু'বার ফল ফল্‌ল।"

সম্রাট্ তাকে তাড়াতাড়ি আরও হাজার মোহর দিয়ে সঙ্গীদের বললেন, "ওহে, চল, শীগ্‌গির পালাই। এই লোকটির সঙ্গে আর খানিকক্ষণ কথা বলতে গেলে আমার গোটা রাজ-কোষটাই হয়তো খালি হয়ে যাবে। আর একেই কিনা আমি ঠাউরেছিলাম বোকা!"

তুমি কি জান

বয়কট্—কারো-সঙ্গে কথাবার্ত্তা বা অন্য সব রকম আদান-প্রদান বন্ধ রাখাকে বলে 'বয়কট্' করা।—অনেকটা একঘরে করার মত। কথাটা এসেছে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে। চার্লস্ বয়কট ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের এক জমীদারের অত্যন্ত অত্যাচারী এক কর্ম্মচারী। তাঁর অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে প্রজারা একজোট হয়ে তাঁকে সব বিষয়ে বর্জ্জন ক'রে জব্দ করে। এমন কি বাজারে গেলে তিনি কোন কিছু কিনতে পর্য্যন্ত পারতেন না—কেউ তাঁর কাছে কোন জিনিষ বিক্রী করত না। সেই থেকে ঐ ব্যাপারটিরই নাম হয়ে যায় 'বয়কট করা'।

নবরত্ন—মহারাজ বিক্রমাদিত্য নানা গুণী লোকদের এনে তাঁর সভা সাজিয়েছিলেন। এই গুণী লোকদের তিনি হীরা-জহরতের মতই মনে করতেন—তাই তাঁদের বলা হ'ত রত্ন। বিক্রমাদিত্যের সভায় ছিলেন এই রকম নয় জন রত্ন—তাই বলা হ'ত নবরত্ন। এঁদের নাম—কালিদাস, বররুচি, বরাহমিহির, বেতালভট্ট, ক্ষপণক, ঘটকর্প্পূর, অমরসিংহ, শঙ্কু ও ধন্বন্তরি।

হোঁৎকা বাবু

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ, বি.টি

হোঁৎকা বাবু কোঁৎকা হাতে মারতে গেলেন মাছি,
কোমর বেঁধে, বাগিয়ে নিয়ে গলায় পৈতেগাছি।
'হিস্‌সো জোয়ান্', বলেন হেঁকে,—পালাও সমুখ থেকে,
একটি ঘায়েই ভাঙবে পাঁজর, মুণ্ডু যাবে বেঁকে।
তখন কি আর পরাণ-বায়ুর পাত্তা পাবে কোনো,
কাঁদতে গিয়ে দেখবে জিভের ডগ্‌টি যে তুম্‌ড়োনো।

আগে-ভাগে ভাগা-ই তবে বুদ্ধিমানের কাজ,
কোঁৎকা মাথায় পড়বে যখন, ভাববে বুঝি বাজ!
পালাও, পালাও,—এই যে দিলাম প্রচণ্ড এক ঘা'—
মরবে মাছি, মাছির বাবা, কিংবা মাছির ছা'।
এই-না ব'লেই-হোঁৎকা বাবু দিলেন-তেড়ে লাফ,
গদাম্ ক'রে শব্দ ওঠে, ডাক ছাড়িলেন 'বাপ্!'
মাছি-মশাই সুরুৎ ক'রে গেলেন কোথায় উড়ে,
কোঁৎকা-ঘায়ে বাসন-কোশন লোপাট ভেঙে' চুরে'।
কোঁৎকা ভেঙে' দু'খান হ'লো, ভাঙলো মেঝের শান,
হোঁৎকা বাবু ভাঙা গলায় ধরেন 'ভাঙার গান'।

অপরাহ্নে

শ্রীসুস্নাত গংগোপাধ্যায়

সূর্যের তেজ কমে, বিদায়-বেলার রবি ঢলে পড়ে পশ্চিম আকাশে,
সুনীল আকাশ ঘন মেঘের তূলোয় ছাওয়া, হিমেল আমেজ মাখা বাতাসে।
ঘণ্টা ছুটির বাজে, শেষ হ'লো ইস্কুল, পথে পথে ছেলেদের কলরব,
নির্জন পথঘাটে শুরু হ'লো আনাগোনা, গুঞ্জনমুখরিত হ'ল সব।
ক্লান্ত কর্মচারী ফিরে আসে ধীর পদে চাকুরী-সাগর করি' মন্থন,
দোকান-পশার খোলে, পথে হাঁকে ফেরিওলা, চারিদিকে জীবনের স্পন্দন।
বিকেলের হাওয়া খেতে যায় সবে, লোকজনে গম্‌গম্ করে ঐ ময়দান,
মনের কোণেতে নেই অভাবের চিন্তাও, দূর হয়ে গেছে সব শয়তান।

মাঠে মাঠে খেলা করে মুক্ত শিশুর দল, সবুজের সজীবতা স্নেহময়,
গাছের পাতায়, ডালে মৃদুল হাওয়ার চুম, তার মাঝে কী গভীর স্নেহ রয়!
কুঞ্জকাননে দোলে কুসুম-কলির দল, চারিদিকে অলিদের গুঞ্জন,
সাতরঙা প্রজাপতি উড়ে চলে দিকে দিকে সবাকার চিত্ত করি' রঞ্জন।
শয্যায় বসে রোগী বাতায়ন-পথে দেখে আধভোলা পৃথিবীর দৃশ্য,
ক্লান্ত হৃদয়ে তার হয়ে সর্ব আশাময় ধরা দেয় এ বিশাল বিশ্ব।
গাছের সবুজে লালে মধুর রঙের খেলা, রোদের হলুদ রং তার পর,
হঠাৎ হাওয়ার দাপে চকিত তরুরা কাঁপে, বাতাসে শিহরি' ওঠে মর্ম্মর।
মধুর বিকেলবেলা ক্ষণিকে মিলায় হায়, গোলাপের মতো সে যে ভংগুর,
ভাবুক কবির মনে ক্ষণিক মায়ার মোহে বোনা হয় কবিতার অংকুর।

তরুণ, তোমরা জাতির শক্তি

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

তরুণ, তোমরা জাতির শক্তি—প্রাণে ভরা নব আশা,
অরুণ আলোর প্রতীক্ তোমরা—কণ্ঠে নতুন ভাষা।
যুগ যুগ ধরি ঘুমাল যাহারা,
যে জাতি ছিলরে স্বাধীনতা-হারা,
আজ যদি পেয়ে থাকে স্বাধীনতা—গৌরব তোমাদের,
তোমাদের গান মুক্তিমন্ত্র—জাতিকে জাগাল ফের।

তরুণ, তোমার দ্বারে আজ প্রিয় স্বাধীনতা আসিয়াছে,
ভায়ে ভায়ে যত প্রীতি-ভালবাসা তাহারেও নাশিয়াছে।
বন্ধ কর এ বিভেদের নীতি,
ভায়ে ভায়ে ফের জাগুক সে প্রীতি,
কত যে শহিদ ডালি দিল হৃদ্ বাঁধিতে মিলন-রাখী,
তাদের প্রাণের পরশে জাগাও জাগিতে যাহারা বাকী।

তরুণ, তোমরা জাতির শক্তি, শক্ত সুঠাম দেহ,
চিরবন্দিতা সোনার বাংলা তোমাদেরি ভাই গেহ।
গাহ গাহ ফের, 'বন্দি জননি,
সারা ভারতের মুকুটের মণি,
হিন্দু আমরা—মুসলিম মোরা—সন্তান একই মার!"
তরুণ তোমরা জাগো, কাঁধে তোল পতাকা মানবতার।

পরলোকে শরৎচন্দ্র

বাংলা-মার প্রিয় পুত্র, দেশবরেণ্য জননায়ক শরৎচন্দ্র বসু আর নেই। অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গত ৮ই ফাল্গুন তিনি মহা-প্রয়াণ করেছেন। অবশ্যি, কিছুদিন থেকেই তাঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না,—হৃদ্‌যন্ত্র দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল, মাঝে মাঝে শয্যাশায়ীও হয়ে পড়তেন। কিন্তু এত শীঘ্র যে তিনি চলে যাবেন তা কেউ ভাবতে পারে নি। মৃত্যুর আধ ঘণ্টা আগে পর্য্যন্ত তিনি তাঁর 'নেশন্' পত্রিকার জন্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনা ক'রে গেছেন। কে জানত তার আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হবে!

১৮৮৯ সনে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন কটকের স্বনামধন্য সরকারী উকীল ৺জানকীনাথ বসু। শরৎচন্দ্র তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। শরৎচন্দ্রের আর সব ভাইএরাও কৃতী; এঁদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাম ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। শরৎচন্দ্র তাঁরই বড় ভাই।

শরৎচন্দ্রের বাবা কটকে আইন-ব্যবসা করতেন। শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবনও সেইখানেই সুরু হয়। কটকের পড়াশোনা শেষ ক'রে তিনি পড়তে আসেন কলকাতায়, এবং তার পর ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তা শেষ করেন। ইংল্যাণ্ড থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ ক'রে এসে ১৯১৩ সনে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন।

ব্যারিষ্টারীতে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। তাঁর সমকক্ষ ব্যারিষ্টার কলকাতায় কেন, সারা ভারতবর্ষে খুব কম দেখা গেছে। কিন্তু শুধু বড় ব্যারিষ্টার হিসাবেই তাঁর আসল পরিচয় নয়, দেশবাসীর কাছে তিনি প্রিয় হয়েছিলেন তাঁর অসাধারণ স্বদেশপ্রেমের জন্য।

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন সুরু হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে। তাঁরই প্রভাবে শরৎচন্দ্র দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এজন্য তাঁকে বারে বারে নানা রকম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে, ইংরেজ সরকার তাঁকে বছরের পর বছর বিনা বিচারে বন্দী ক'রে রেখেছেন। কিন্তু তাতে তাঁর মনের জোর বা অদম্য দেশপ্রেমকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি—বরঞ্চ দেশবাসীর কাছে তাঁকে আরও প্রিয়—আরও শ্রদ্ধেয় ক'রে তুলেছে।

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন অত্যন্ত ঘটনা-বহুল। বন্দী অবস্থায়ই তিনি

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। তার পরে ১৯৪৬ সনে রাষ্ট্র পরিবর্ত্তনের আগে তিনি ঐ পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা হ'ন। ঐ ছাড়া লীগ্ আমলে অখণ্ড বাংলার ব্যবস্থা পরিষদেও তিনি ছিলেন বিরোধী দলের নেতা। শরৎচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরও সভাপতি হয়েছিলেন এবং ১৯৩৯ সনে জলপাইগুড়ীতে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হয় তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন। কলকাতা করপোরেশনের সঙ্গেও তিনি দীর্ঘ দিন অল্ডারম্যান্ হিসাবে জড়িত ছিলেন।

এ ছাড়া শরৎচন্দ্রকে আমরা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য রূপেও পেয়েছি। ভারতবর্ষে ডোমিনিয়ন শাসন প্রবর্ত্তিত হবার ঠিক আগে যখন পণ্ডিত নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তর্ব্বর্তী মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তখন শরৎচন্দ্রও অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে তা'তে যোগ দেন, কিন্তু পরে যখন মুসলিম্ লীগ ওর মধ্যে যোগদান করতে আসে তখন তাদের অনুকূলে পদত্যাগ করেন।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব এবং তেজস্বিতা ছিল অসাধারণ। যা তিনি অন্যায় মনে করতেন—দুর্ব্বলতা মনে করতেন, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে কখনও ইতস্ততঃ করতেন না। এই জন্যই ১৯৩৬ সনে যখন কংগ্রেস কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রকারান্তরে মেনে নিল তখন তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করেন এবং প্রবল আন্দোলন শুরু করেন। কংগ্রেসের ঐ নীতির ফল কি রকম বিষময় হয়েছিল তা দেশবাসী পরে উপলব্ধি করতে পেরেছে।

ঠিক এই কারণেই স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী সরকারের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের মনের মিল হয় নি। কংগ্রেসের কতকগুলি নীতি শরৎচন্দ্র স্বাধীন দেশের উপযোগী ব'লে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে 'সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিক্' নামে নতুন এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং নানা ব্যাপারে কংগ্রেসী সরকারের কড়া সমালোচনা শুরু করেন। কংগ্রেস পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন না করায় তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁর দলের শক্তি যাই হোক না কেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং দেশপ্রেমের ওপর দেশবাসীর শ্রদ্ধা কতখানি ছিল তার পরিচয় পাওয়া গেল যখন তিনি পশ্চিম বাংলার আইন-সভার একটি নির্ব্বাচনে কংগ্রেস-প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালেন। কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের আপ্রাণ প্রচার ও প্রচেষ্টা সত্বেও শরৎচন্দ্র তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপুল ভোটে শোচনীয় ভাবে হারিয়ে দেন। দুঃখের বিষয় নির্ব্বাচিত হয়েও তিনি

আইন-সভার অধিবেশনে যোগ দেবার আর সুযোগ পেলেন না। সমস্ত ব্যবস্থা যখন তৈরী,—পরিষদে তাঁর জন্য বিশেষ জায়গা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, ঠিক তখনই এল মহাকালের ডাক।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

এই সংখ্যার সঙ্গে রামধনুর বয়স বাইশ বছর পূর্ণ হ'ল। বাংলা দেশে ছোটদের পত্রিকার আয়ু খুব দীর্ঘ হয় না। 'সন্দেশের' মত পত্রিকাও শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকতে পারে নি। আর রামধনুর জন্মের পর এই ২২ বছরে কত পত্রিকা এল, আবার চলে গেল তা বোধ হয় গুণে শেষ করা যায় না। রামধনুর চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ শিশুমাসিক বর্ত্তমানে বোধ হয় মাত্র খান দুইএর বেশী নেই। সুতরাং আজ বাইশ বছর পূর্ণ হওয়ায় রামধনু নিশ্চয়ই গৌরব বোধ করতে পারে। অবশ্যি, এ গৌরব রামধনুর নয়—এ গৌরব তোমাদেরই—যাদের ভালবাসা রামধনুকে এই দীর্ঘজীবন লাভ করতে সাহায্য করেছে।

রামধনুর গ্রাহিকা শ্রীঅঞ্জলি দেবী লিখেছেন—"আজ ২২ বছর আমি রামধনুর গ্রাহিকা আছি। তখন ভাইবোনদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি ক'রে রামধনু পড়তাম, এখন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি ক'রে রামধনু পড়ি। এখনও রামধনু তেমনি ভাল লাগে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এমন দিন আসুক যেদিন নাতি-নাৎনীদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি ক'রে রামধনু পড়তে পারব।"

আর একটি পুরোনো গ্রাহক শ্রীমলয় মজুমদার লিখেছেন—"আমার বড় ছেলে শ্যামল সেদিন বলছিল, "বাবা, রামধনু-অফিসে লিখে দাও, আগামী বছর থেকে তোমার নাম বদলে যেন আমার নামে রামধনু পাঠায়।" বল্লাম, "সেটি হবে না। ইচ্ছে হ'লে তুমিও নতুন ক'রে রামধনুর গ্রাহক হও বা অন্য কোন কাগজ নাও—আমার রামধনুর গ্রাহক আমিই থাকব।"

শ্রীবেলা বসু লিখেছেন—"আমরা তিন পুরুষ সমান আগ্রহে রামধনু পড়ি, যদিও

গ্রাহিকা হিসাবে আমারই দাবী বেশী। আগে রামধনু এলে বাবা-কাকা টানাটানি করতেন। এখন আমার মেয়ে, ভাইপো-ভাইঝি—এরাও সমানে ভাগ বসায়।"

তাই বলছিলাম, রামধনুর ২২ বছর পূর্ণ হওয়ার গৌরব তোমাদেরই—যারা রামধনুকে ভালবাস।

নতুন বছরের রামধনু কেমন হবে এ বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন করেছ। শ্রীঅহিভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করেছেন রামধনুতে ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস ইত্যাদির চেয়ে ছোট গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি বেশী দেবার জন্য। শ্রীমাধব রায়, শ্রীরেবা সোম ও শ্রীমঞ্জুলিকা সেন আর একখানি নতুন ধারাবাহিক উপন্যাসের ফরমাস দিয়েছেন। আসছে বছর নাম করা লেখকের লেখা নতুন আর একখানি ধারাবাহিক উপন্যাস বার করব ব'লে আমরাও ঠিক করেছি। তা ছাড়া বাংলা সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কয়েকজন লেখক,—যাঁরা আগে প্রচুর লিখতেন কিন্তু ইদানীং লেখা কমিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের লেখাও বেশী ক'রে বার করার চেষ্টা হচ্ছে।—বিশেষতঃ তাঁদের লেখা গল্প। নতুন নতুন কয়েকটি বিভাগ, আরও ছবি—বিশেষ ক'রে গ্রাহকদের আঁকা ছবি ও তাদের তোলা ফটো দেবার আয়োজন হচ্ছে। গ্রাহকদের জন্য একটি বিতর্ক-সভার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। মোট কথা, আগামী বছরের রামধনু যাতে তোমাদের মনের মত হয় সেই চেষ্টা হচ্ছে।

বাংলা দেশের জীবনযাত্রায় নতুন ক'রে যে ঝড়-ঝাপটা সুরু হয়েছে সেই বেদনাময় কাহিনী তোমরা নিয়তই শুনছ। মনুষ্যত্ব আজ পদদলিত—মানুষ পশুর পর্য্যায়ে নেমে গেছে। হিংসা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা কখনও কোন দেশকে বা জাতিকে বড় করতে পারে না—বরঞ্চ ধ্বংসই ডেকে আনে। ইতিহাসে বার বার এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। কে জানে কবে এ দুর্দ্দিনের অবসান হবে! তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা ক'রে যেও—এই অনুরোধ।

এবারে কয়েকটি ব্যক্তিগত চিঠির জবাব দেই :

শ্রীকৃশাণু বন্দ্যোপাধ্যায় (মুঙ্গের)—ফটো সম্বন্ধে আমাদের পরিকল্পনার কথা লিখেছি। আগামী বছর থেকে তার ব্যবস্থা হবে। তোমাদের 'তরুণের আলোর' জন্য 'বিশেষ চিঠি' শীগ্গিরই পাবে। ইতিহাস সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করেছ তার জবাব পরে দিচ্ছি। শ্রীজহরলাল পাল ও শ্রীআরতি পাল (কাঁচড়াপাড়া)—বাংলা পত্রিকার প্রতিযোগিতার উত্তর বাংলাতেই লেখা উচিত নয় কি? শ্রীবেণু ঘোষ (দিনাজপুর)—তোমার প্রেরিত দোলের আবীর পেয়ে খুব খুশী হ'লাম। রামধনুর বন্ধুদের কাছে তোমার ভালবাসা পৌঁছে দিচ্ছি। রোজ হাজার হাজার না হ'লেও অনেক চিঠিই আসে। পড়ে জবাব দিতে হ'লে বুঝতে কেমন হিমসিম খেয়ে যেতে হয়! শ্রীমুকুলরাণী মণ্ডল (কশাড়িয়া)—লেখা পাঠিয়েই অমন জোর তাগিদ দিলে চলে কি? অপেক্ষা করতে হয়। যাদের লেখা আগে এসেছে তাদের দাবীও যে আগে! আর কত অসংখ্য লেখা যে আসে তা যদি জানতে! রামধনু না পেলে আরও আগে জানাবে, পরে ফুরিয়ে যাবার ভয় থাকে। শ্রীসুব্রতকুমার চক্রবর্ত্তী (রংপুর)—রামধনুর সব গ্রাহকই লেখা পাঠাতে পারে, তার জন্য অনুমতির কোনই দরকার নেই। তবে পাঠাবার

আগে দেখে নেবে সেটা সত্যিই রামধনুর উপযুক্ত কিনা। শ্রীগোবিন্দ চট্টোরাজ (এলাহাবাদ)—কখনও বাংলা দেশ দেখ নি! সুবিধা পেলেই চলে এস। শহরে নয়, পাড়াগাঁয়ে। শ্রীমন্দিরা বসু (মেদিনীপুর)—হিন্দী শেখায় দোষ কি? যে কোন ভাষাই শেখা যেতে পারে, তবে মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে নয়। আজ এইখানে শেষ করি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। জয় হিন্দ।

—ইতি রাঃ সঃ

নবম

বন্ধুদের মাথাব্যথা

এদিকে কাঠুরে-পাড়ায় প'ড়ে গেছে সাড়া।

টুনুর বনের সঙ্গিনীরা খেলা করতে এসে তাকে খুঁজে না পেয়ে প্রথম দিন কয়েক ভারী অবাক্ হ'য়ে গেল। তারা আসবার আগেই টুনু রোজ সকালে খেলা করবার জন্যে তাদের অপেক্ষায় দাওয়ায় ব'সে থাকত। কিন্তু এখন সেই টুনুর টিকি দেখবার জো নেই! ব্যাপার কী?

তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে পার্ব্বতী বলে, "টুনু কোথায় গেছে, জানি না তো! বোধ হয় রুণুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে।"

তারা বলে, "বা-রে, আমাদের সঙ্গে দেখা না ক'রেই?"

পার্ব্বতী বলে, "টুনু এখন ধেড়ে মেয়ে হ'ল, আর কতদিন তোদের সঙ্গে খেলা করবে রে? যা, পালা!"

কিন্তু টুনুর ঠিকানা আবিষ্কার ক'রতে সঙ্গিনীদের বেশী দেরী লাগে নি। একদিন তারা দূর থেকে উঁকি মেরে দেখে নিলে, টুনু গল্প করছে একটি চমৎকার-দেখতে ছেলের সঙ্গে।

সেদিন যখন টুনু ফিরে এল, তার কাছে তার সঙ্গিনীরা ধর্ণা দিয়ে পড়ল। কেউ বললে, "ও টুনু, ওই সোন্দর ছেলেটি কে ভাই?"

কেউ বললে, "এবার থেকে আমাদের ছেড়ে তুই কি ওরই সঙ্গে খেলা করবি?"

কেউ বললে, "ওকি তোর বর হবে, ভাই?"

শেষ কথাগুলো যে বললে, টুনু ধাঁ ক'রে তার গালে বসিয়ে দিলে এক চড়।

সে গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "মারলি কেন ভাই?"

টুনু চোখে রাগ ফুটিয়ে বললে, "তুই নরেনকে আমার বর বললি কেন? ও তো আমার বন্ধু!"

—"তোর বন্ধুর নাম বুঝি নরেন?"

—"হ্যাঁ।"

—"তা বন্ধু যখন হয়েছে বর হ'তে আর, কতক্ষণ!"

টুনু আবার রেগে চড় তুললে, কিন্তু সে চড় কারুর গালে পড়বার আগেই তার সঙ্গিনীরা দৌড় মেরে খিলখিল ক'রে হাসতে হাসতে স'রে পড়ল।

কথাটা পার্ব্বতীরও কানে উঠল। সেও একদিন কৌতূহলী হ'য়ে দূর থেকে উঁকি মেরে দেখে এলো নরেনকে। মনে মনে বললে, 'বাঃ, কী মিষ্টি ছেলেটি!'

এ সহরের ব্যাপার নয়, বনের ব্যাপার। টুনু সহুরে মেয়ে হ'লে, পরের ছেলের সঙ্গে ভাব ক'রেছে বলে আজ তাকে মায়ের কাছ থেকে অনেক বকুনি খেতে হ'ত। কিন্তু পার্ব্বতী টুনুকে কিছু না ব'লে সন্ধ্যার সময় স্বামীর কাছে সব কথা জানালে। সঙ্গে সঙ্গে টীকা ক'রলে, "ঐ রকম একটি ছেলের সঙ্গে যদি টুনুর বিয়ে হয়, তাহ'লে দেখতে শুনতে কেমন চমৎকার হয় বল দেখি?"

দুখীরাম খানিকক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে রইল। তারপর বললে, "ও ছেলেটির সঙ্গে টুনুর ভাব হ'ল কেমন ক'রে?"

পার্ব্বতী বললে, "সে-কথা আমি জানি নে, তোমার মেয়েই জানে। তাকে জিজ্ঞেস করব নাকি?"

দুখীরাম বললে, "না, আজ আর কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। কাল সকালে আগে আমি ছেলেটিকে দেখি।"

পরদিন সকালে দুখীরামও দূর থেকে লুকিয়ে দেখে নিলে নরেন্দ্রকে। দেখেই তার দুই চোখ উঠল চমকে। সে এক রকম ছুটতে ছুটতেই ঘরে এসে ডাকলে "পার্ব্বতী, অ পার্ব্বতী!"

পার্ব্বতী ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, "কি গা?"

দুই চোখ কপালে তুলে দুখীরাম বললে, "ওরে পার্ব্বতী, ও রাজার ছেলে রে!"

পার্ব্বতী প্রথমটা বুঝতে না পেরে বললে, "কে রাজার ছেলে?"

—"আমদের টুনুর সঙ্গে যার ভাব হ'য়েছে!"

—"বল কি?"

—"হ্যাঁ রে, হ্যাঁ! ওরা এখানকার মস্ত বড় জমিদার। ওর বাপের নাম রাজা ভুপেন নারাণ। রাজা যখন বেঁচে ছিল, তখন তার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেতো।. কিরে পার্ব্বতী, আমি তোকে বলেছিলুম না, যার তার সঙ্গে কোনদিনই টুনুর বিয়ে হবে না? দেখলি, আমার কথা ফল্‌ল কি না?"

পার্ব্বতী হেসে ফেলে বললে, "যাও যাও, বাজে বক্ বক্ কো'রো না! কোথায় বিয়ে তার ঠিক নেই, উনি এখনি ধেই ধেই করে নাচতে সুরু করেছেন! তোমার ভীমরতি ধরেছে গো, ভীমরতি ধরেছে।"

ওদিকে নরেন্দ্রের বন্ধু-বান্ধবেরা রোজ সকালে জমিদার-বাড়ীতে এসে দেখে বাসা ছেড়ে উড়ে গেছে পাখী।

দ্বারবানের মুখে খবর পায় নরেন্দ্র বন্দুক নিয়ে শিকারীর সাজ পরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়।

তারা মাথা চুলকোতে চুলকোতে ভাবে, ব্যাপারটা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না! কুমার বাহাদুর বন্দুক নিয়ে রোজ শিকার করতে বেরিয়ে যান একলা? কেন? আগে তো তাদের সঙ্গে না হ'লে তাঁর চলত না। আজকাল আবার হঠাৎ এই একলা শিকারে যাবার বেয়াড়া সখ হ'ল কেন?

কেউ কেউ মাথা নেড়ে বলে, "এ যেন কেমন কেমন লাগছে, না?"

কেউ সায় দিয়ে বলে, "একেবারে অভিনব আর কি!"

কেউ বা বলে, "কুমার বাহাদুর কি হঠাৎ কোন কারণে আমাদের উপরে চটে গেলেন?"

অন্য সকলে বলে, "চটবেন কেন? আমরা তো কেউ কোন দোষ করি নি!"

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় তারা সকলে মিলে নরেন্দ্রকে গিয়ে গ্রেপ্তার করলে। মুখের পর মুখ থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্নবৃষ্টি হ'তে লাগল।

—"হ্যাঁ কুমার বাহাদুর, রোজ সকালে আপনি কোথায় যান বলুন দেখি?"

—"শিকার করতে।"

—"তা, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যান না কেন?"

বন্ধুরা সবাই জানত, নরেন্দ্রের কবিতা রচনা করবার বাতিক আছে। সে সেই বাতিকের আশ্রয় গ্রহণ করলে। বললে, "বনের ভিতরে যাই কেন জানো? কবিতা লিখতে।"

—"জঙ্গল আবার কবিতা লেখবার জায়গা নাকি!"

—"না হে অসীম, বন হচ্ছে অতি নির্জ্জন স্থান। সেকালের মুনি-ঋষিরা সাধনার জন্যে বনে যেতেন, তা কি শোনো নি? কবিতাও হচ্ছে দস্তুর মত সাধনার জিনিষ। বেশ নিরবিলি জায়গা না হ'লে কি কবিতা লেখা যায় হে?"

উত্তরটা কারুরই মনের মত হয় না।

অসীম বলে, "কবিতা লেখার জন্যে তো দরকার হয় কলম। রোজ তুমি বন্দুক নিয়ে যাও কেন?"

নরেন্দ্র বলে, "বনের বাঘ যদি হালুম ক'রে তেড়ে আসে, তখন কি আমি কবিতা পাঠ ক'রে তার মাথা ঠাণ্ডা করব? তখন যে মসীর বদলে দরকার হয় অসির। আমি না হয় অসির আর এক ধাপ উপরে উঠে ব্যবহার করি বন্দুক। তা' এজন্যে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন বাপু?"

কিন্তু নরেন্দ্রের এত কথা শুনেও বন্ধুদের মাথাব্যথা একটুও কমল না। নরেন্দ্রের অজ্ঞাতসারে তার পিছু পিছু গিয়ে বনের রহস্য ভেদ করবার সাধ তাদের হয়, কিন্তু সাধ্য হয় না। কারণ শেষরাত্রে কাকপক্ষী ডাকবার আগেই নরেন্দ্র যখন বনে গমন করে, তখন তার প্রত্যেক বন্ধুই থাকে গভীর নিদ্রায় অচেতন।

(ক্রমশঃ)

আমাদের সংবাদ পত্র বিভাগ

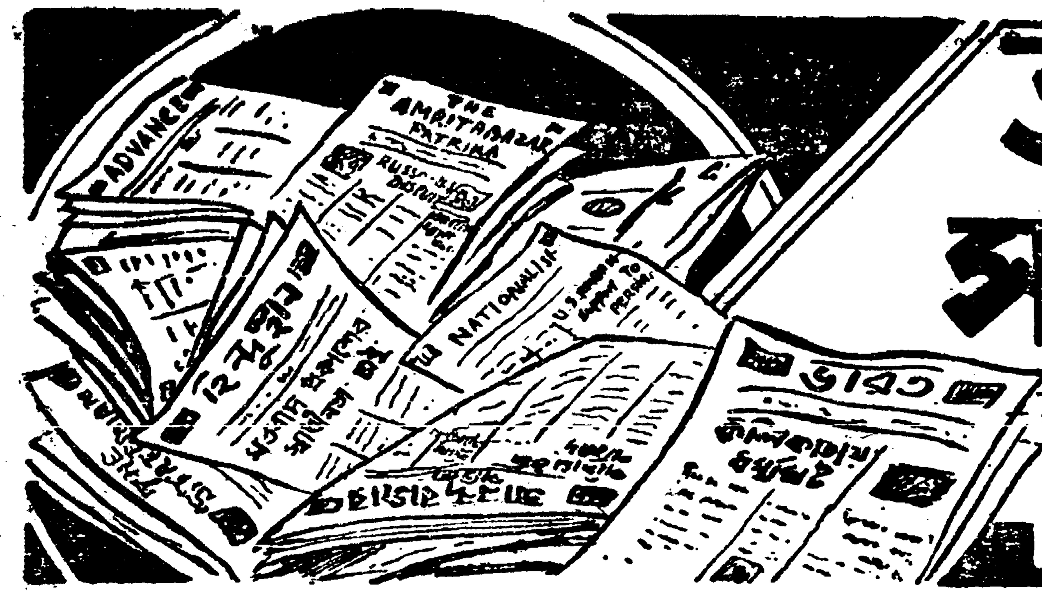

পরলোকে শরৎচন্দ্র বসু

বাংলার জনপ্রিয় নেতা, প্রবীণ দেশপ্রেমিক শরৎচন্দ্র বসুর আকস্মিক মৃত্যুতে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল। কংগ্রেসের স্বাধীনতা-যুদ্ধের অন্যতম সেনানায়ক হিসাবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। দেশকে তিনি সত্যিকার ভালবাসতেন এবং দেশের ভালর জন্য যা কর্ত্তব্য মনে করতেন নির্ভীক চিত্তে তার অনুসরণ করতেন। এই জন্যই স্বাধীনতা লাভের পর তিনি কংগ্রেস থেকে সরে এসে নিজের জন্য স্বতন্ত্র কর্ম্মপন্থা বেছে নেন। দেশের লোকেরা তাঁকে কি রকম শ্রদ্ধা করত তা গত নির্ব্বাচনে প্রমাণিত হয়। শরৎচন্দ্রের জীবন-কথা এ সংখ্যায় অন্যত্র দেওয়া হ'ল।

ইংলণ্ডে সাধারণ নির্ব্বাচন

প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে ইংলণ্ডের সাধারণ নির্ব্বাচন হয়ে গেল। ২য় মহাযুদ্ধের পর এই হ'ল ২য় নির্ব্বাচন। এবারে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল শ্রমিক দল ও রক্ষণশীল দলের মধ্যে। শেষ পর্য্যন্ত শ্রমিক দলই জয়লাভ করেছে— অর্থাৎ এতদিন যে দলের হাতে গভর্ণমেণ্ট চলছিল নতুন নির্ব্বাচনেও সেই দলই আবার শাসন-ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে। এটলি সাহেবই আবার প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন। রক্ষণশীল দলের নেতা চার্চ্চিল অবশ্যি ব্যক্তিগত ভাবে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। তবে এবারকার শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের আয়ু কত দিন থাকবে বলা কঠিন, কেননা তাঁদের দলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা এবারে এত কম হয়েছে যে যে কোন বিপাকে গভর্ণমেণ্টের পতন ঘটতে পারে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যি আবার নতুন ক'রে নির্ব্বাচন হবে।

মীর লায়েক আলির পলায়ন

হায়দ্রাবাদের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মীর লায়েক আলি। তাঁরই আমলে হায়দ্রাবাদে রাজাকর দলের অত্যাচার সুরু হয় এবং হায়দ্রাবাদ সরকার ভারতের বিরুদ্ধে এমন সব কাণ্ড সুরু করেন যাকে মোটেই বন্ধুজনোচিত বলা চলে না। এরই ফলে ভারত সরকার হায়দ্রাবাদের ভিতর সৈন্যবাহিনী পাঠাতে বাধ্য হ'ন এবং মাত্র ৩।৪ দিনের মধ্যে কেমন ক'রে লায়েক আলি সরকারের পতন ঘটে সে কাহিনী হয়তো তোমাদের মনে আছে। ভারত সরকার মীর লায়েক আলিকে জেলে না পুরে ভদ্রতা ক'রে তাঁর নিজের বাড়ীতেই তাঁকে অন্তরীণ ক'রে রাখেন তদন্ত সাপেক্ষে। সম্প্রতি লায়েক আলি এর সুযোগ নিতে ছাড়েন নি, তিনি

সপরিবারে গোপনে হায়দ্রাবাদ থেকে সরে পড়েছেন। বলা বাহুল্য এই ঘটনায় সমস্ত দেশ যুড়ে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে এবং কর্তৃপক্ষ মনে করছেন এই পলায়নের পেছনে বেশ গভীর একটি ষড়যন্ত্র রয়েছে।

কলকাতায় হকী লীগ্

হকী খেলার মরশুম সুরু হয়েছে এবং কলকাতায় হকী লীগ্ চলছে। প্রথম বিভাগে কাষ্টমস্ এবং মোহনবাগানই এবার খেলছে সবচেয়ে ভাল। এ পর্য্যন্ত পর পর ৮টি ম্যাচে কেউ তাদের হারাতে তো পারেই নি, ড্র রাখতেও পারে নি তাদের সঙ্গে। এরা ছাড়া ভবানীপুর এবং পাঞ্জাব স্পোর্টস্ দলও বেশ ভাল খেলছে।

সীমান্তে পাখতুনিস্থান আন্দোলন

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত রাষ্ট্রের নানা ব্যাপারে খিটিমিটি লেগেই আছে, ওদিকে পশ্চিম সীমান্তেও যে পাকিস্তান রাষ্ট্র খুব শান্তিতে আছে এমন মনে হয় না। সেখানে পাঠানরা স্বাধীন পাখতুনিস্থান গঠনের জন্য প্রবল আন্দোলন সুরু করেছে, আফগান সরকারেরও সহানুভূতি তাদেরই দিকে। সীমান্তের পাঠানদের সঙ্গে পাকিস্তানী সরকারের সংঘর্ষের খবরও মাঝে মাঝে কাগজে বেরুচ্ছে। দেশপ্রেমিক পাঠান নেতা খাঁ আবদুল গফ্ফর খাঁ ও তাঁর ভাই খাঁ সাহেব এখনও জেলে বন্দী রয়েছেন।

ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র

ভারতে সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার ঠিক আগে স্বাধীন ভারতের জন্য নতুন শাসনতন্ত্র তৈরী হয়েছে এ খবর নিশ্চয়ই জান। যে পরিষদ্ এই শাসনতন্ত্র তৈরী করেছে তার মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৩০৮ জন। শাসনতন্ত্র তৈরী করতে সময় লেগেছে ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিন, আর এর জন্য টাকা খরচ হয়েছে ৬৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭২৯।

রাজা লিওপোল্ড

বেলজিয়ামের নির্ব্বাসিত রাজা লিওপোল্ডকে আবার ফিরিয়ে আনা হবে কিনা তাই নিয়ে সে দেশে আন্দোলন চলছিল। সম্প্রতি এ নিয়ে সেখানে গণভোট নেওয়া হয়েছিল; তাতে শতকরা ৫৭.৬৮ জনই রাজাকে ফিরিয়ে আনার পক্ষে ভোট দিয়েছে। বেলজিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট এখনও এ বিষয়ে তাঁদের মতামত দেন নি।

নানা দেশে সাধারণ নির্ব্বাচন

গত বছর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ নির্ব্বাচন হয়ে গেছে। এবারে ইংল্যাণ্ড, গ্রীস্, ফ্রান্স প্রভৃতি কয়েকটি দেশেও নির্ব্বাচন হয়ে গেল। সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ায়ও নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হচ্ছে—যদিও সেখানে একটি দলেরই প্রাধান্য ব'লে লোকের ধারণা। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রেও প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনের জন্য জনসাধারণ আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ এখনও তেমন তোড়জোড় সুরু করেন নি।

দ্রষ্টব্য ঃ রামধনুর বার্ষিক বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র (১৩৫৬) আগামী সংখ্যায় দেওয়া হবে।

মনোরঞ্জন চিরস্মৃতি-পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতি স্মরণ ক'রে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতার বিষয় :—৬৩৬ পৃষ্ঠার ছবিটি দেখে একটি কবিতা লিখে পাঠাতে হবে। যে কোন গ্রাহক বা গ্রাহিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে যারা আগামী বছরের জন্য নতুন গ্রাহক হবে তাদেরও যোগ দিতে বাধা নেই। প্রত্যেক লেখার সঙ্গে প্রতিযোগীর নাম, ঠিকানা ও নিজের গ্রাহক নম্বর লিখে আগামী ১০ই বৈশাখের মধ্যে রামধনু-সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। আমাদের বিচারে যার কবিতা সবচেয়ে ভাল হবে সে-ই পুরস্কার পাবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

ভোঁদা ২১, নেড়া ২৬ এবং খেঁদী ১৯ নম্বর পেয়েছিল।

উত্তরদাতাদের নাম ঃ—সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা ২৬); জহরলাল পাল ও আরতি পাল (কাঁচড়াপাড়া); বিশ্বান্থদা, গোবিন্দ মামা, সান্ত্বনা মুখোপাধ্যায় (এলাহাবাদ); মায়া, ছায়া, আরতি, জয়ন্তী, রমেন বসু (কলিকাতা ২৯); ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান); স্বদেশ ও সলিল মিত্র (এলাহাবাদ); টাটা টুটু, টিটি, টিটো, টোটা (জামসেদপুর); অন্তু, ঝরণা, আভা, আরতি, প্রণতি, মা-বাবা, ও মাসীমা (বগুড়া); সিপ্রা কুণ্ডু (বারাকপুর); বাবলু, ছটু, খোকন, মহারাজ (ঘাটশিলা); বিভাসবিহারী বসু পাটনা); বড়দা ও বেণু ঘোষ (দিনাজপুর); দীপংকর সেন (সিঙ্গুর); দিলীপকুমার সমাদ্দার (কলিকাতা-৪); অনন্ত, ঝরণা, রেণুকা, লতিকা, যূথিকা, অরুণ, কুমারেশ, সমরেশ চট্টোপাধ্যায় (জয়পুর); এষা সেনগুপ্তা (নিউ দিল্লী); নরেন্দ্রনাথ, বাণী, রুবি, অমল মিত্র (গৌহাটী); নীলিমা দাশ (ডেবিং চা-বাগান); শুক্লা ও শঙ্কর, বাচ্চু, অগ্নিশিখা মণিমেলার মণি ভাইবোনেরা (গৌহাটী); কনককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পানিহাটী); ভাস্কর সেনগুপ্ত (কলিকাতা-২৬); সুচরিত সরকার, বুলু, খুকু, বরুণ, বিলু, খোকন (মাধিপুরা); অনিলকুমার সরকার (আমতলা); দীপু, অপু, বাচ্চু, বেবী, রেখা, মমতা (জামসেদপুর); নন্দিনী বসু (দিল্লী); মমতাজ বেগম (রংপুর); কৈলাসচন্দ্র পট্টনায়ক (কটক); সীতা রায় (লক্ষ্ণৌ); ভুটু ও চন্দ্রা (কাশী); রমা মৈত্র (দিল্লী); চঞ্চলকুমার দত্ত (নাগপুর); চিত্ততোষ সান্যাল (কলিকাতা); মন্দিরা ও সোমা (বালীগঞ্জ)।

নূতন ধাঁধা

নীচে একটি সাঙ্কেতিক চিঠির অংশ তুলে দেওয়া হয়েছে। এমনি পড়লে অদ্ভুত মনে হবে কিন্তু ওর ভিতর ভিতর কিছু কিছু শব্দ বদলে তার ঠিকমত প্রতিশব্দ বা ভাবার্থ বসিয়ে নিতে পারলেই চিঠিখানা পড়া যাবে। তোমরা চেষ্টা ক'রে দেখ তো :—

সহোদর শিমাথা, এপিঙ্গল ক-হীন মাথা মছেলের খশ্রেষ্ঠ একটি নদী। মনাসিকায় ভ্রমিস নি বোধ অশ্ব? সাপের দেবীর পা চাঁদ? শ্যাউগ্রণানীয়ের পদবাঘের অথবাড়ীর টাটকা নয়ন্দা? ইংরাজী অক্ষরচিঠি খেতে ও কি ভাবটিই না গন্ধতো! সময় সখেয়াল কারখানায় তাক্রীত রান্নাড়ে নিয়ে গা-হীন স্থান চাঁদ দানবশিল্পীরার হিন্দী দুইকর্ণে। টেলিগ্রাম অনাত্মীয় সে কী গুঁড়ি!

চিত্রপরিচয়

৬১৩ পৃষ্ঠায় 'বল তো কিসের ছবি' বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি ঘটনা নিয়ে আঁকা। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল। ঐ সময়ে একবার তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যান। সাহেব টেবিলের ওপর দুই পা তুলে বসে ছিলেন, বিদ্যাসাগরকে দেখে সে পা নামানো প্রয়োজন মনে করলেন না। এর পর একদিন ঘটনাচক্রে কার সাহেবকে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের কাছে আসতে হ'ল। বিদ্যাসাগর খবর পেয়েই টেবিলের ওপর চটীজুতো শুদ্ধ পা দু'টো তুলে দিয়ে সাহেবকে আহ্বান করলেন।

প্রতিযোগিতার ছবি

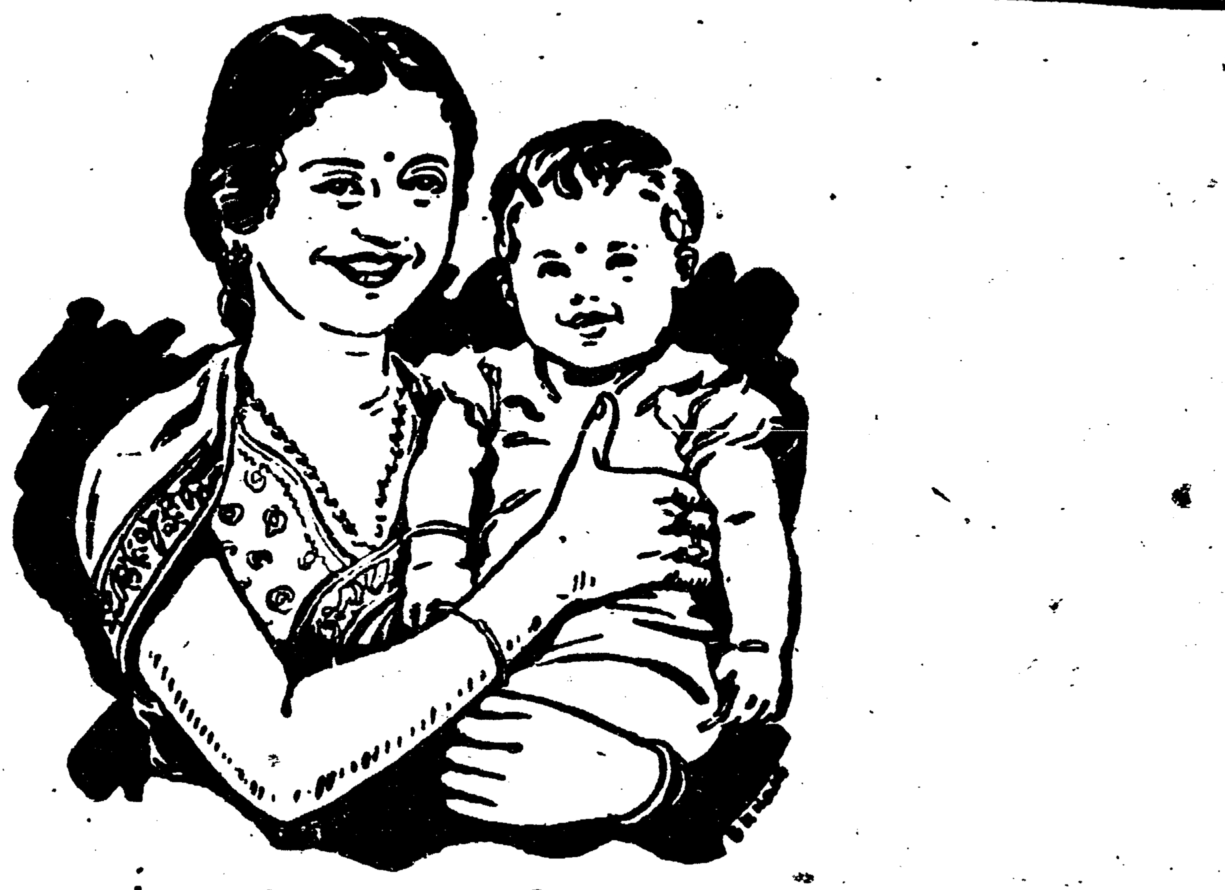

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

যমুনা

স্নানের সাবান

যে কোন ভাল সাবানের সমকক্ষ
অথচ মূল্য হিসাবে নিতান্ত সুলভ

নিত্য ব্যবহারে অপরিহার্য

প্রতি বাক্সে ১২ খানি

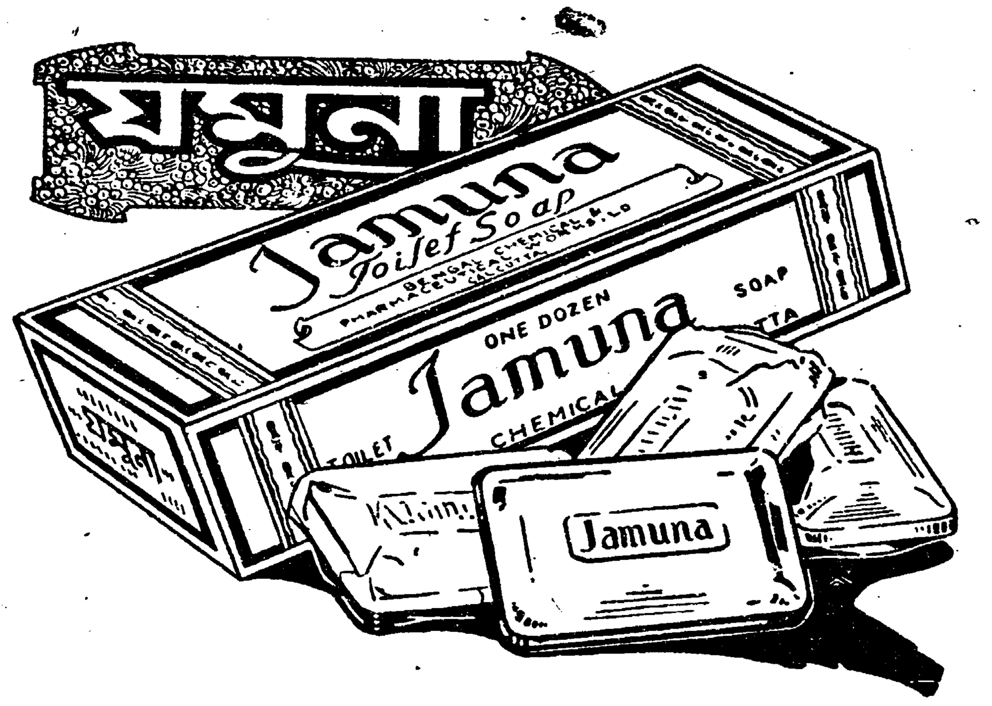

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই

—দেব-সাহিত্য-কুটীরের—

গল্প ✱ উপন্যাস

গল্প-উপন্যাস

রহস্যের মায়াজাল ৸০
খুনে জমিদার ১৲
বামনের দেশ ৸০

বিশ্ব-বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের যুগান্তর ৸০
বিজ্ঞানের মায়াজাল ৸০

নাটক

বন্দীবীর ॥০
চন্দ্রগুপ্ত ॥০

জীবন-চরিতাবলী

দ্বাদশ সূর্য্য ১।০
এনি বেসান্ত (জীবনী) ৸০

ভ্রমণ ও শিকার-কাহিনী

বোমার ভয়ে বর্ম্মাত্যাগ ১৲
রাক্ষুসে আফ্রিকা ১৲

ঐতিহাসিক জীবনী
(আর্য্যলক্ষ্মী সিরিজ)

কৃষ্ণকুমারী ।৶০
রাজ্যশ্রী ।৶০

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিশু-মাসিক

শুকতারা

[১৩৫৬ সালের ফাল্গুনে তৃতীয় বর্ষ আরম্ভ]

প্রতি মাসের পয়লা তারিখে

ছেলেমেয়েদের প্রতি ঘরে 'শুকতারা'

বয়ে নিয়ে আসে

গল্প কবিতা উপন্যাস শিকার আবিষ্কার ভ্রমণ
ইতিহাস কৌতুক স্বাস্থ্য খেলাধূলা ধাঁধা
চিত্র ফটো ও নির্ভীক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ

মূল্য প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা
সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা

দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা ৯

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি ১।০
পদ্মরাগ ১॥০
সোনার হরিণ ১॥০
নূতন পুরাণ ৸৶০
হাস্য ও রহস্য ৸৶০
চায়ের ধোঁয়া ৸০
হুকাকাশির গল্প ৸০
দমাদম্ দামোদর (নাটক) ।৶০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের

মহাভারতের গল্পগুচ্ছ (১ম) ৸০
ঐ (২য়) ৸০
দিগ্বিজয়ী বীর ৸০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন ১৲

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ১৲
বিজ্ঞান-বুড়ো ১৲
আকাশের গল্প ১।০
আবিষ্কারের গল্প ৸০
ধূমকেতু ৸০
অয়েল পেন্টিং (নাটক) ।০

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা ১॥০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি ৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

দি লাষ্ট্ অফ্ দি মোহিকান্স্ ॥৶০

শ্রীসুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের

অলিভার টুইষ্ট ॥৶০

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়ের

যে জার্ম্মানী হেরে গেছে ২৲

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

Regd.No. C—1641

ছোটদের উপহারের কয়েকখানি সেরা বই

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি

বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ্‌ হুকাকাশির একখানি রহস্যময় উপন্যাস

নূতন সংস্করণ ১৷০

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ধূমকেতু

অভিনব বৈজ্ঞানিক রহস্যপূর্ণ উপন্যাস

দাম ৸০

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর কাহিনী

নূতন সংস্করণ ১৲